ordance with the Approved Syllabus of the Board of Education, West Bengal, for **Classes IX, X & XI**
r **Secondary** *and* **Multipurpose Schools**
of **West Bengal.**
e circular No. HS. */1/58, dated March, 1958*

ভারতের ইতিহাস ও বিশ্ব কাহিনী

মাধ্যমিক ইতিহাস]

ইত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী নবম, দশম ও একাদশ
শ্রেণীর জন্য লিখিত।

াহন কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক
ট্টাচার্য্য, এম. এ. [ট্রিপল্];
ইতিহাস, বাংলা ও সংস্কৃত।

হিন্দু ও মুসলমান যুগ], "ভারতের ইতিহাস"
[১৮১৫—১৯৩৯], "গ্রীসের ইতিহাস",
"ইতিহাস" ইত্যাদি।

কাতা-৬

প্রকাশক :
শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
ও
শ্রী শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য
৭, মুন্সীপাড়া লেন, কলিকাতা-৬

প্রাপ্তিস্থান—
হিন্দুস্থান লাইব্রেরী
৫৪/১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-
দ্বিতীয় সংস্করণ

মূল্য সাত টাকা পঞ্চাশ

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক নির্দ্ধারিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য এই পুস্তকখানি রচিত হইল। নূতন পাঠ্যসূচীতে ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশদভাবে আলোচনার জন্য নির্দ্দেশ রহিয়াছে; অধিকন্তু ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত বিশ্বের ইতিহাস বর্ত্তমান পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সূচী অনুযায়ী সমস্ত বিষয়ই এই গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে, কোন প্রয়োজনীয় তথ্যই বাদ পড়ে নাই। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাহাতে পাঠযোগ্য হইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পরিমিত আয়তনের মধ্যে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির উন্নতিকল্পে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের অভিমত সাদরে গৃহীত হইবে।

উত্তরপাড়া,
ফেব্রুয়ারী,
১৯৬০

শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

DISTRIBUTION OF MARKS IN HISTORY

Paper I— (a) Ancient Indian History—50 Marks

(b) Medieval Indian History—50 Marks,

Paper II—(a) Modern Indian History—50 Marks.

(b) Modern World History—50 Marks.

সূচীপত্র

[নবম শ্রেণীর পাঠ্য]

ভারতের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

[দশম শ্রেণীর পাঠ্য]

মধ্যযুগ

একবিংশ অধ্যায়

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

[একাদশ শ্রেণীর জন্য]

বৃটিশ যুগ

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

চতুর্বিংশ অধ্যায়

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ষড়বিংশ অধ্যায়

সপ্তবিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

ত্রিংশ অধ্যায়

একত্রিংশ অধ্যায়

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

[একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য]

বিশ্বকাহিনী

(১৭৬৩—১৯৪৯)

বিষয় | পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতের ইতিহাস ও বিশ্ব কাহিনী

প্রথম অধ্যায়

হিন্দুযুগের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের মৌলিক তাৎপর্য্য

ইতিহাসের উদ্দেশ্য মাত্র অতীত তথ্য বা কাহিনীর যথার্থ সঙ্কলন নহে। ইতিহাসের ধাতুগত অর্থ হইল 'ইতি-হ-আস' বা ইহাই ছিল। অর্থাৎ অতীত কালের কাহিনীই হইল ইতিহাস। এই সংজ্ঞা স্বীকার করিয়া লইলে সমাজতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব-সমস্ত কিছুই ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে হিন্দু ইতিবৃত্ত-কারগণ এই সংজ্ঞাকে মানিয়া চলেন নাই। তাঁহাদের নিকট ইতিহাস ছিল 'ভূতার্থকথন'—'ভূত' অর্থে অতীত কাহিনী এবং তাহার 'অর্থ-কথন' অর্থাৎ অতীত ঘটনার কার্য্যকারণ সম্পর্কিত বিশ্লেষণ। তাঁহাদের নিকট রাজাদের কাব্যাবলী, যুদ্ধবিগ্রহের বৃত্তান্ত, মহাপুরুষদের কর্ম্মকৃতি, কখনও বা আকস্মিক বা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের ঘটনাই ছিল ইতিহাসের বিষয়বস্তু। অবশ্য তাঁহারা মাত্র অতীত ঘটনা-বিবৃতির মধ্যে ইতিহাসের তাৎপর্য্যকে নিহিত করিয়া রাখাকে ইতিহাস বলেন নাই। অতীত ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে মৌলিক যোগসূত্র স্থাপন করাকেই তাঁহারা প্রকৃত ইতিহাস বলিতেন। ইতিহাস রচনাক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য খুব কমই অনুসৃত হইয়াছে। তথাপি এই রীতি অনুসরণ করিলে ইতিহাসের বহু জটিল ও নীরস কাহিনী সরল ও উপভোগ্য হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিন্দুযুগের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসকে এই রীতিতে বিশ্লেষণ করিলে ইহার অন্তর্নিহিত মৌলিক স্বরূপ অত্যন্ত সহজ ও সরল হইয়া পড়ে।

ইতিহাসের উদ্দেশ্য

হিন্দুযুগের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস প্রধানতঃ বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনের কাহিনী। হিমালয় হইতে সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র দেশ যেমন মহাভারতের কাল

হইতে এক নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে, তদ্রূপ এদেশের কবি ও শাসকগণ আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। সেইজন্যই মৌর্য-সুঙ্গ-কান্ব-অন্ধ্র-গুপ্ত-পুষ্যভূতি-প্রতীহার পাল-সেন প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তের এবং সাতবাহন চালুক্য-পল্লব রাষ্ট্রকূট-চোল প্রভৃতি দক্ষিণাপথের রাজবংশের কাহিনীর পশ্চাতে আমরা সেই একরাট্ বা একচ্ছত্র সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার আদর্শের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। সমগ্র ভারতব্যাপী সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য স্থাপনের আদর্শ সকল রাজবংশকে কম বেশী প্রভাবিত করিয়াছিল এবং এই

একরাট্ বা একচ্ছত্র সাম্রাজ্য

আদর্শকে বাস্তবক্ষেত্রে রূপায়িত করার প্রচেষ্টায় উপরোক্ত কোন কোন রাজবংশ পূর্ণ বা আংশিকভাবে যে কৃতকার্য্য হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের আদর্শকে জয়যুক্ত করিতে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও রাষ্ট্রনৈতিক ভাবাদর্শ যেমন সাহায্য করিয়াছে তদ্রূপ অন্য একটি ঘটনা ইহার ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে—তাহা হইল বিদেশীয়গণ কর্তৃক বারংবার ভারত আক্রমণ। ইহা অবশ্য একমাত্র ভারতবর্ষেরই বৈশিষ্ট্য নহে, পৃথিবীর অন্যত্রও বিদেশী আক্রমণ বিভিন্ন দেশ ও জাতির ভাগ্য নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। প্রাচীন

ভারতের ইতিহাস প্রাকৃতিক ও বৈদেশিক আক্রমণের প্রভাব

এথেন্স ও গ্রীসদেশ পারস্য কর্তৃক আক্রান্ত না হইলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে এথেন্সের উদ্ভব ও পেরিক্লিসের স্বর্ণযুগ ঘটিত কিনা সন্দেহ। ডেন আক্রমণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল বলিয়া ওয়েসেক্সের নেতৃত্বে পরবর্ত্তী ইংলণ্ডের ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং স্পেনিস আর্ম্মাডার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া এলিজাবেথীয় ইংলণ্ড স্বর্ণ যুগের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে এই বিদেশী আক্রমণ কেবল একক বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে—যুগ পরম্পরায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিদেশী জাতি ভারতের ধনৈশ্বর্য্যের প্রতি লুব্ধ হইয়া ইহার প্রচলিত রাষ্ট্রকাঠামোকে আঘাত করিয়াছে। বিদেশী জাতির আঘাতে দুর্ব্বল রাষ্ট্রকাঠামো কখনও ধূলিসাৎ হইয়াছে, কখনও বা সবলতর রাষ্ট্র এই আঘাতকে প্রত্যাহত করিয়া অধিকতর শক্তিমান হইয়াছে এবং বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী হইতে সমর্থ হইয়াছে। বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার ফলে হিন্দুযুগে যে কেবলমাত্র বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নহে—আত্মরক্ষাসমর্থ আক্রান্ত রাষ্ট্র স্বীয় দৈহিক সামর্থ্যের স্বীকৃতির সঙ্গে মনন ক্ষেত্রেও সৃষ্টিনৈপুণ্যের আশ্চর্য্য পরিচয় দিয়াছে। এই কারণেই দেখা যায় শিল্পে সাহিত্যে ও চিত্রকলায় মৌর্য, গুপ্ত বা

হর্ষবর্দ্ধনের যুগ এত সমৃদ্ধ। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে দরায়ুসের অভিযান হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীক-শক-পহ্লব-হূণ আক্রমণের মধ্য দিয়া দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান অধিকার পর্য্যন্ত এই বিদেশী আক্রমণ শতাব্দী-পরম্পরায় চলিয়াছে। কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নহে ভারতের সামাজিক ইতিহাসেও এই বিদেশী-অভিযানের পরোক্ষ প্রভাব কম নহে।

ভারতবর্ষের সভ্যতা যে সুপ্রাচীন সিন্ধু-বিধৌত মহেঞ্জোদড়ো ও হারাপ্পার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়ার পরে তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় সহস্রকেও ভারতবর্ষে আধুনিক কালের সভ্য জীবনের উপযুক্ত পর্য্যাপ্ত উপকরণ ছিল। সিন্ধু সভ্যতার যুগের ইতিহাসের পরবর্তীকাল বেদ-উপনিষদ-মহাকাব্যের যুগ। এই যুগেও ভারতবর্ষের ইতিহাসে সভ্যতা ও সংস্কৃতির পর্য্যাপ্ত উপাদানের অভাব দেখা যায় না। পরবর্ত্তী যুগের নামকরণ করা যাইতে প্রাক্ মৌর্য্য যুগ—বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পর হইতে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের অন্তর্বর্ত্তী সময়। এই যুগেই মনে হয় ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন দানা বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে—ভারতের রাষ্ট্রীয় সত্তায় কেন্দ্রানুগ-প্রবণতা আসিয়াছে। এই সময়েই ভারতের তদানীন্তন ষোলটি রাষ্ট্রের মধ্য হইতে ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়া নানা আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া—এ্যাংলো স্যাক্সন, ইংলণ্ডের সপ্ত রাজ্যের মধ্য হইতে ওয়েসেক্সের মত প্রথম সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র মগধের আবির্ভাব। শ্রেণিক বিম্বিসার ও অজাতশত্রু মগধের প্রতিপত্তির সূচনা করিলেন। শৈশুনাগ ও নন্দবংশের হস্তে তাহা এত বিস্তৃত ও প্রতিপত্তিশালী হইল যে তাহা আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ী গ্রীক বাহিনীকে পর্য্যন্ত মগধ সাম্রাজ্য আক্রমণ হইতে বিরত রাখিতে সমর্থ হইল। উপরোক্ত প্রথম তিন যুগের ইতিহাসের উপকরণ-স্বল্পতা এত অধিক যে ইহাদের উপর ভিত্তি করিয়া উক্ত তিন যুগ সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচনা করা দুরূহ। মাত্র সিন্ধু সভ্যতার উপর আলোকপাত করার উপযুক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান আছে। পরবর্ত্তী বৈদিক ও প্রাক্ মৌর্য্য যুগ সম্বন্ধে কোন ধারণা করিতে হইলে মাত্র সাহিত্যগত উপাদানের উপর নির্ভর করিতে হয়। কোন যুগ সম্বন্ধে সাহিত্যগত পরিচয় থাকিলেও বাস্তব রাজনৈতিক ইতিহাস নন্দবংশের রাজত্ব ও সমসাময়িক গ্রীক-আক্রমণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলা চলে। অতঃপর আমরা ভারত-ইতিহাসের আলো-আঁধারী অনুমানের যুগ হইতে অধিকতর যুক্তিসহ সিদ্ধান্তের যুগে উপনীত হইতে পারি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপাদান

ভারতের বাস্তব রাজনৈতিক ইতিহাস প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রীক আক্রমণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মাসিদনপতি আলেকজাণ্ডার পৃথ্বীবিজয়ে বহির্গত হইয়া ভারতের

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপথে ভারতে প্রবেশ করেন এবং অসংখ্য রাষ্ট্র ও জনপদকে গ্রীসের পদানত করেন। আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকাসের আধিপত্য হইতে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল উদ্ধার করিয়া মৌর্য্য নরপতি চন্দ্রগুপ্ত মগধের আধিপত্য ও মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সূচনা করেন। দুই শতক পূর্ব্বে বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর সময় হইতে ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে মগধের প্রতিপত্তির যে সূচনা হয় এবং শৈশুনাগ ও নন্দবংশের আমলে তাহার যে বিস্তৃতি ঘটে—মৌর্য্য নরপতি চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার পুত্র ও পৌত্র বিন্দুসার ও অশোকের সময়ে তাহা পূর্ণ পরিণতিতে উপনীত হয়। মগধের রাজধানী পাটলীপুত্র সাম্রাজ্যের প্রথম নগরের মর্য্যাদাভূষিত হইয়া ক্রমান্বয়ে মৌর্য্য-সুঙ্গ-কাণ্ব বংশের অভ্যুদয় ও বিলয় প্রত্যক্ষ করিতে থাকে। দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্র সাতবাহন বংশের হস্তে কাণ্ববংশের পতন হয়।

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস

মৌর্য্যসাম্রাজ্যের ভগ্নাবস্থার কালেই সাম্রাজ্যের সামরিক দুর্ব্বলতার সুযোগে ভারতবর্ষ পুনরায় বিদেশী আক্রমণের লক্ষ্য হয়। যে সকল গ্রীক এই সময়ে ভারতের সীমান্ত সন্নিহিত সিরিয়া বাহ্লীক প্রভৃতি অঞ্চলে রাজত্ব করিতেছিল তাহারা ক্রমান্বয়ে ভারত-অভিযান করিতে লাগিল। সিরিয়ার নরপতি তৃতীয় এন্টিয়োকাস, তাঁহার জামাতা ডিমেট্রিয়স এবং মিনাণ্ডার ভারতীয় অধিকার হইতে বহু জনপদ বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করেন। ইহাদের হস্তে পেশোয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া পাঞ্জাব ও সিন্ধু পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অধিকার আসিল। সুঙ্গবংশের রাজারা যবন বা গ্রীক আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন স্থান উদ্ধার করিতে পারেন নাই। গ্রীক আক্রমণের পর আসিল মধ্য-এশিয়া ও চীন হইতে আগত দুর্দ্ধর্ষ পার্থিয়ান (পহ্লব), শক ও ইউচি জাতির বিজয় অভিযান। গ্রীকগণ ইহাদের নিকট পরাভূত হইল। পার্থিয়ান নরপতি গণ্ডোফারনিস, শক নরপতি অয়, মোগ ও শক মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামন নহপান প্রভৃতি এবং ইউচি জাতির কুষাণ শাখাভুক্ত কদ্‌ফিস কনিষ্ক প্রভৃতি খ্যাতনামা নরপতি ও তাহাদের বংশধরগণ কেন্দ্রীয় শক্তি মগধরাষ্ট্রের দুরবস্থার যুগে প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন। এই বিদেশী কর্ত্তৃত্ব গুপ্ত বংশের অভ্যুত্থানের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত কম-বেশী বর্ত্তমান ছিল। অতঃপর শক-মহিমা ম্লান করার কৃতিত্বের ফলস্বরূপ গুপ্তসাম্রাজ্যের বৈজয়ন্তীযুগের অভ্যুদয় হয়।

মৌর্য্য-যুগের সার্দ্ধ পঞ্চশতাব্দী পরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়ে পাটলীপুত্র পুনরায় ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রের প্রথম নগরীর মর্য্যাদায় ভূষিত হইল।

খৃষ্টীয় ৩২০ অব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে গুপ্তসাম্রাজ্যের সূচনা হইল ও প্রথম চন্দ্রগুপ্ত-সমুদ্রগুপ্ত-দ্বিতীয়চন্দ্রগুপ্ত-কুমারগুপ্ত-স্কন্দগুপ্ত পর্য্যন্ত সম্রাট পঞ্চকের সুদীর্ঘ দেড়শত বৎসর কাল রাজত্ব সময়ে ভারতের একচ্ছত্রী ক্ষমতা গুপ্তবংশের হস্তে অক্ষুণ্ণ রহিল। এই সার্ব্বভৌম আধিপত্যের মূলেও রহিয়াছে বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করার ঐতিহ্য। মগধের মৌর্য্য-সম্রাটদের বাহুবলে গ্রীক আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছিল, আর শকদের আধিপত্য বিনষ্ট হইয়াছিল মগধের গুপ্তসম্রাটদের পরাক্রমে।

ভারতের শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিমাঞ্চলে শকক্ষত্রপদের পরাক্রম বিনষ্ট করিয়া আরব সাগরের তীরে পর্য্যন্ত গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তার করেন। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই (ইতিহাসবিশ্রুত বিক্রমাদিত্য) শকবিজয়ের পরে পশ্চিমে উজ্জয়িনী নগরে তাঁহার অন্যতম রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভগ্নদশায় পুনায় ভারতবর্ষ বিদেশী আক্রমণের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইল। দুর্দ্ধর্ষ পুষ্যমিত্র নামে এক বর্ব্বর জাতি এবং নিষ্ঠুর ও ভীষণদর্শন হূণগণ তোরামান ও মিহিরগুল-এর নেতৃত্বে আর্য্যাবর্ত্ত আক্রমণ করিয়া গুপ্তসাম্রাজ্যকে ত্রাস-কম্পিত করিয়া তুলিল। গুপ্তসাম্রাজ্যের শেষ উল্লেখযোগ্য নরপতিদ্বয় প্রথম কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত বহু আয়াসে হূণদের আক্রমণ হইতে সাম্রাজ্যের পতন স্থগিত রাখিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পরবর্ত্তী দুর্ব্বল বংশধরগণের রাজত্বকালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য্য-

ভারত ইতিহাসের উত্থান-পতন

রূপে আসিল; ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিল এবং পাটলীপুত্র নগর বিদেশী আক্রমণে দ্বিতীয়বার হতমান হইল। গুপ্ত মহিমা ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া শ্মশানশয্যা রচনা করিল। পাটলীপুত্রের হৃতমর্য্যাদার পুনরুদ্ধার আর ভবিষ্যতে হইল না। পরবর্ত্তী হিন্দুযুগের অবশিষ্ট কয়েক শতাব্দী কনৌজ আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়া রহিল।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে সপ্তম শতাব্দীর প্রাক্কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস শুধু হূণ উপদ্রব ও হূণ আক্রমণকারীদের সহিত ভারতীয় রাজন্যবর্গের সঙ্ঘর্ষের ইতিহাস। মগধের পরবর্ত্তী গুপ্তবংশের নরপতি বালাদিত্য, মালবের অন্তর্গত দশপুর বা মান্দাসোরের নরপতি যশোধর্ম্মা, অযোধ্যাপ্রদেশের মৌখরীবংশ ও থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ হূণবিতাড়নে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। হূণ আক্রমণের বিরুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার পুরস্কার স্বরূপ সমগ্র উত্তরাপথে পুষ্যভূতি ও মৌখরীবংশ কেন্দ্রীয়শক্তির মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইল। পুষ্যভূতি বংশীয় নরপতি হর্ষবর্দ্ধন বাহুবলে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে তাঁহার অধিকার এবং প্রভাব বিস্তৃত করেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে স্বল্পকালের জন্য হইলেও সমগ্র উত্তরাপথ এক নায়কের অধীনে আসিল। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকাল হইতে

আরম্ভ করিয়া হিন্দুযুগের অবশিষ্ট সময় কনৌজ ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রধান নগরীর মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রহিল। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকাল হইতে কনৌজের প্রতিপত্তির সূচনা —পাল রাষ্ট্রকূট-প্রতিহার ত্রিশক্তির দ্বন্দ্বে কনৌজই ছিল সকলের লক্ষ্যবিন্দু। হর্ষবর্দ্ধনই আর্য্যাবর্ত্তের শেষ বিশিষ্ট হিন্দু সম্রাট। হর্ষবর্দ্ধনের পরে উত্তরাপথে গুর্জ্জর-প্রতিহার,রা পাল বংশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল সত্য কিন্তু ইহাদের কৃতিত্ব হর্ষবর্দ্ধনের সমতুল্য ছিল না। অতঃপর আর্য্যাবর্ত্ত বহুখাণ্ডত হইয়া বাংলার সেনবংশ, চন্দেল্ল, চেদী, পরমার চৌহান, গাড়হবাল, সোলাঙ্কী প্রভৃতি বংশাধিকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পারস্পরিক ঈর্ষা-বিরোধের লীলাভূমিতে পরিণত হইল। এই বিরোধ বিসম্বাদের রন্ধ্রপথে শেষ বিদেশী শক্তি ইসলাম আর্য্যাবর্ত্তে প্রবিষ্ট হইবার সুযোগ পাইল। দিল্লী ও কনৌজ বিজয়ের দ্বারা ইহার সূত্রপাত হয়, ক্রমে ইসলামের অর্দ্ধচন্দ্র লাঞ্ছিত পতাকা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বত্র উড্ডীন হইল।

ভারতীয় রাজন্যবর্গের অনৈক্য ও বৈদেশিক মুসলমান আক্রমণকারীদের প্রবেশ

দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন উত্তরাপথের মত এত বিচিত্র উত্থান পতনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয় নাই। দাক্ষিণাত্য স্বভাবতই বিদেশীর পক্ষে দুরধিগম্য ছিল বলিয়া দাক্ষিণাত্যকে বারংবার বিদেশী শক্তির আক্রমণের অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। দক্ষিণের বহু বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রাজবংশের মধ্যে অন্ধ্র বা সাতবাহন, চালুক্য (বাদামী), রাষ্ট্রকূট এবং সুদূর দক্ষিণস্থ চোলবংশই সাময়িকভাবে দাক্ষিণাত্যের আধিপত্য ব্যতীত উত্তরাপথের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত প্রায় অধিকাংশ সময়ই দক্ষিণাপথের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস প্রধানতঃ দক্ষিণাঞ্চলেই নিবদ্ধ ছিল। সাতবাহন বংশের হস্তে মগধের কাণ্বগণ পরাজিত হয়। সাতবাহন বংশের গৌতমীপুত্র শাতকর্ণী পুলোমায়ী শক, গ্রীক, পার্থিয়ান প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিদের দ্বারা অধিকৃত অঞ্চল পরাজিত করিয়া বিশেষ গৌরব অর্জ্জন করেন এবং দাক্ষিণাত্যেরও বিস্তৃত অঞ্চল সাতবাহন বংশের অধিকারভুক্ত করিতে সমর্থ হন। সাতবাহন বংশের পতনের পরে এই রাজ্য ভাঙ্গিয়া পল্লব, কদম্ব প্রভৃতি রাজবংশের উদ্ভব হয়। সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের সময়ে দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চী নামে এক রাজ্য ও উহার অধিপতি বিষ্ণুগোপের উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহের মধ্যে বাতাপীপুর খুব প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া পড়ে এবং ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি চালুক্যবংশের দ্বিতীয় পুলকেশীর পরাক্রমে সমসাময়িক 'সমগ্র উত্তরাপথনাথ' হর্ষবর্দ্ধনও 'বিগলিতহর্ষ' হন। নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণস্থ সমগ্র অঞ্চল চালুক্যবংশের অধীনে আসে। অতঃপর দক্ষিণের

দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস

উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রকূট বংশের বিভিন্ন শক্তিধর নরপতি তৃতীয় গোবিন্দ, প্রথম অমোঘবর্ষ ও তৃতীয় গোবিন্দ অষ্টম হইতে দশম শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র দাক্ষিণাত্যেই যে এই বংশের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা নহে—উত্তরাপথের রাষ্ট্রনৈতিক কেন্দ্রনগরী কনৌজকে কেন্দ্র করিয়া যে পাল-রাষ্ট্রকূট প্রতীহার শক্তি দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল উক্ত নরপতিবর্গ এই ব্যাপারেরও অন্যতম নায়ক ছিলেন। হিন্দুযুগের শেষ সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের ন্যায় দাক্ষিণাত্যেও কোন একক 'প্রবল শক্তি, ছিল না। দেবগিরিতে, যাদববংশ ও দ্বারসমুদ্রে হোয়সাল বংশ মাত্র এই দুইটির নাম উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য

পাঠ্যসূচী :— ১) মানুষ ও তাহার পরিবেশ—ইতিহাসের দুইটি মুখ্য উপাদান। তন্মধ্যে ভৌগোলিক পরিবেশ সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য। গ্রীস ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব।

(২) ভারতবর্ষ পাঁচটি প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত—তাহাদের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য। হিমালয় ও তৎসংলগ্ন ভূখণ্ড—নেপাল, তিব্বত, চীন, ব্রহ্মদেশ, আফগানিস্থান ও মধ্য এশিয়ার সহিত সম্পর্ক বিন্ধ্য পর্ব্বতমালার গুরুত্ব—উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে ঐক্যের বিঘ্নস্বরূপ। ভারত মহাসাগরের গুরুত্ব—সামুদ্রিক বাণিজ্যের যোগাযোগ। ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ—ভারতীয় বাণিজ্যের স্বরূপ, সমুদ্র সম্পর্কে উত্তর ও দক্ষিণভারতের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য

(৩) ভারতের অধিবাসী মানবগোষ্ঠী বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন ধর্ম্ম, জীবনযাত্রার বিভিন্ন পদ্ধতি - সমন্বয়ী সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ।

(৪) বিভেদের মধ্যে ঐক্য।

সূচনা :—পূর্ব্বে ইতিহাস বলিতে বুঝাইত বড় বড় সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ও রাজরাজড়াদের কার্য্যকলাপ, তাহাদের দিগ্বিজয় ও যুদ্ধবিগ্রহ, মহামান্য ব্যক্তিদের জীবন-যাত্রা, ধর্ম্মবীরদের কীর্ত্তিকলাপ ইত্যাদি। 'আলেকজাণ্ডারের ক'টা ছিল হাতি, রাজা অশোকের ক'জন ছিল নাতি—ইতিহাস ছিল প্রধানতঃ এই শ্রেণীরই বর্ণনামূলক কাহিনী। সংক্ষেপে বলিতে গেলে—ইতিহাসে উচ্চকোটির সমাজের লোকদেরই প্রাধান্য ছিল। সাধারণ জনের স্থান ছিল সেখানে নিষিদ্ধ। সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনযাত্রাপদ্ধতি, আমোদ-আহ্লাদ, অর্থনৈতিক অবস্থা কোন কথাই ইতিহাসে স্থান পাইত না। কিন্তু ইতিহাসের এই পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গী বর্ত্তমানকালে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সাধারণ মানুষের স্থান হইয়াছে। বর্ত্তমান কালের ইতিহাসে মানুষকে মোটেই উপেক্ষা করা হয় না—বরঞ্চ মানুষের সামগ্রিক জীবন ও সামগ্রিক কাহিনীর পর্য্যালোচনাই ইতিহাসের মুখ্যবস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ বিভিন্ন মানব বা মানব জাতিগোষ্ঠীর কার্য্যকলাপ, তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, তাহাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্ত্তনের কাহিনীই ইতিহাসের প্রাণবস্তু হইয়াছে। এক কথায় মানুষই ইতিহাসের একমাত্র ধারক ও বাহক।

আধুনিক কালের ইতিহাসে মানুষই নায়ক

মানুষ ও তাহার পরিবেশ :—মানুষের অগ্রগতির কাহিনীই ইতিহাসের বিষয়বস্তু। এই অগ্রগতি মানুষ কি ভাবে সাধন করিয়াছে—আদি মানব হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত মানুষ কি ভাবে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া ধীর ও স্থির পদক্ষেপ সভ্যতার বর্ত্তমান স্তরে পদার্পণ করিয়াছে তাহাই মূলতঃ ইতিহাসের প্রাণবস্তু এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার নামান্তর হইল পরিবেশ। পরিবেশের মৌলিক উপাদান হইল প্রাকৃতিক সংস্থান—বিশেষ বিশেষ ভূখণ্ডের বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক গঠন-বৈশিষ্ট্য। নদনদী, গিরিকান্তার, মরুভূমি, জলবায়ু, অরণ্যাঞ্চল, ভূমির উর্ব্বরতা বা উষরতা—সব কিছু মিলিয়া পরিবেশের সৃষ্টি করে। পরিবেশের পার্থক্য অনুযায়ীই মানুষের দৈহিক গঠন বা জীবনযাত্রাপ্রণালীর মধ্যে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

তবে মানুষ পরিবেশের একান্ত দাস নহে। বুদ্ধিজীবী মানুষ পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া জীবন ধারণের চেষ্টা করিয়াছে, কখনও বা প্রয়োজন মত প্রকৃতি ও পরিবেশকে স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে পরিবর্ত্তিত করিয়া স্বীয় জীবনযাত্রার ধারা সহজ ও মসৃণ করিয়াছে। এই জন্যই দেখা যায় একদা যেখানে দুর্গম অরণ্য ছিল সেই স্থান আজ জনপদ হইয়াছে, যেই স্থান মরু বা জলাভূমি ছিল সেই সকল শস্যশ্যামল প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। গিরিদরী তুষার-পর্ব্বত-অরণ্য সকলকেই আজ মানুষের বুদ্ধির নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। মাত্র প্রকৃতি ও পরিবেশকে জয় করা নহে, মানুষ তাহাদিগকে তাহার ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছে—জলধারা-বিদ্যুৎ-অণু-পরমাণুকে মানুষ নিজের প্রয়োজনে নিযুক্ত করিয়াছে।

ভৌগোলিক সংস্থান ও জাতীয় ইতিহাস গঠনে তাহার দান

গ্রীস ও ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত :—কোনও দেশের ভৌগোলিক সংস্থান সেই দেশের ইতিহাস ও জাতীয় চরিত্রকে কি ভাবে প্রভাবিত করে তাহার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত প্রাচীন গ্রীস ও ইংলণ্ডের ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যায়। গ্রীস দেশ তিন দিকে সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত—দেশের অভ্যন্তর ভাগ অসংখ্য পাহাড়-পর্ব্বতের দ্বারা পরস্পরের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বহুধাবিভক্ত। উপরন্তু গ্রীসের পূর্ব্বাঞ্চলে অসংখ্য দ্বীপময় সেতু বিদ্যমান। সমুদ্রমেখলা রাষ্ট্র হওয়ার জন্য গ্রীকরা নৌবাহন বা বাণিজ্যে সুদক্ষ হইয়াছে, অসংখ্য পর্ব্বত প্রকারের জন্য সমগ্র দেশব্যাপী কোন অখণ্ড রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে নাই - গ্রীসের ইতিহাস কয়েকটি বিচ্ছিন্ন নগররাষ্ট্রের ইতিহাসে পরিণত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি পূর্ব্বাঞ্চলে দ্বীপময় সেতু থাকার জন্য এই অঞ্চলের গ্রীকরা পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা ব্যবসাবাণিজ্যে বা সমুদ্র যাত্রায়

কুশলতা দেখাইয়াছে—এশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া উপনিবেশ স্থাপনে অগ্রণী হইয়াছে। স্বল্প কথায় নৌবাহনযোগ্যতা, উপনিবেশ স্থাপন ও নগররাষ্ট্রের সৃষ্টি—গ্রীকজাতির এই তিনটি বৈশিষ্ট্য প্রধানতঃ ভৌগোলিক সংস্থানের ফলেই আসিয়াছে।

ইউরোপের মূল ভূখণ্ড হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং সমুদ্রের দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত বলিয়া ইংলণ্ডের ইতিহাসও সম্পূর্ণ পৃথক বৈশিষ্ট্য লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের জলবায়ু বর্ষা ও শীতপ্রধান বলিয়া ভূমির উৎপাদনশক্তি স্বল্প—খাদ্যের জন্য ইংলণ্ড সর্ব্বদাই পরমুখাপেক্ষী। খাদ্যশস্যের প্রয়োজনানুপাতিক স্বল্পতা হেতু ইংরেজ জাতি বাণিজ্য ও শিল্পাশ্রয়ী। সমুদ্রবেষ্টিত বলিয়া ইংলণ্ড সমুদ্রযাত্রায় উন্মুখ এবং নৌশক্তিতে বলীয়ান। মোট কথা পৃথিবীর সকল দেশই তাহার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ভৌগোলিক পরিবেশ বা সংস্থানের উপর একান্ত নির্ভরশীল।

ভারতের ভৌগোলিক পরিচয়ঃ—পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষের ইতিহাসও তাহার ভৌগোলিক অবস্থানসংস্থানের উপর নির্ভরশীল। ভারতের ভৌগোলিক সীমা প্রকৃতির দ্বারা চিরনির্দ্দিষ্ট। এই প্রাকৃতিক সীমানা অপরিবর্ত্তনীয়। ভারতবর্ষের উত্তরদিকে হিমালয় পর্ব্বতমালা, উত্তরপশ্চিমে হিন্দুকুশ ও সুলেইমান এবং উত্তরপূর্ব্বে আরাকান, লুসাই ও অগণ্য পর্ব্বতমালা বিরাজ করিতেছে। অবশিষ্ট তিনদিকে - পূর্ব্বে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে যথাক্রমে বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর ও ভারতমহাসাগর রহিয়াছে। উত্তরের হিমালয় পর্ব্বতমালা ভারতবর্ষকে এশিয়া মহাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অপরদিকে হিন্দুকুশ ও সুলেইমান পর্ব্বতমালা ভারতবর্ষকে রাশিয়া, আফগানিস্থান, ইরাণ প্রভৃতি দেশ হইতে পৃথক করিয়াছে। উত্তরপূর্ব্বে আরাকান পর্ব্বত থাকায় ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশ হইতে পৃথক হইয়াছে। অবশিষ্ট তিনদিকে সাগর থাকায় ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারা চতুর্দ্দিক হইতেই সুরক্ষিত।

ভৌগোলিক সীমারেখা

ভারতবর্ষের বিশালত্ব হেতু ইহাকে একটি মহাদেশের সমতুল্য মনে করা যাইতে পারে। এই বিশালতার জন্য ভারতের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অঞ্চলভেদে বিচিত্র হইয়াছে। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের মানদণ্ড অনুযায়ী বিচার করিলে ভারতবর্ষকে পাঁচটি সম্পূর্ণ পৃথক অংশ হিসাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—(১) উত্তরের হিমালয় অঞ্চল, (২) সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমভূমি অঞ্চল (৩) মধ্যভারতের মালভূমি এবং (৪) দক্ষিণের মালভূমি এবং (৫) সুদূর দক্ষিণের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী নিম্ন সমভূমি।

পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত

(১) উত্তরে হিমালয় অঞ্চলঃ সুদীর্ঘ আড়াই হাজার মাইলব্যাপী এই

অঞ্চল পশ্চিমে পামির পর্ব্বতসন্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে আরাকান অর্থাৎ ব্রহ্মের
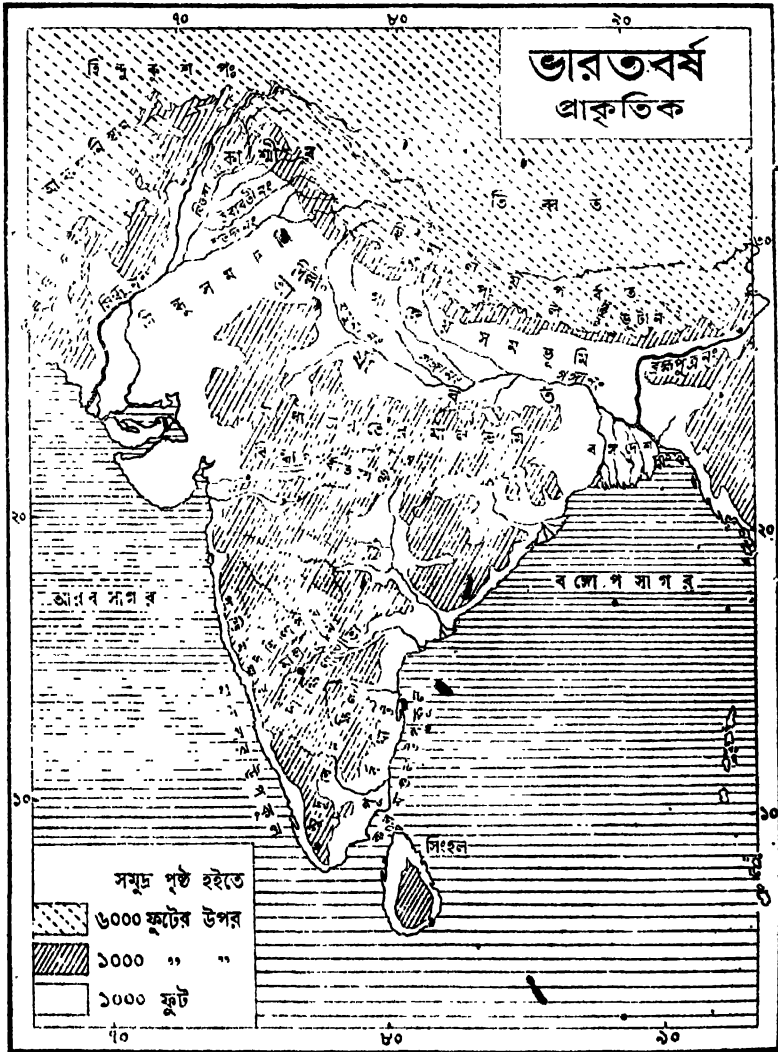
সীমান্তে আসিয়া পরিসমাপ্ত হইয়াছে। হিমালয় সংলগ্ন এই অঞ্চলে গান্ধার, কাশ্মীর, গাড়োয়াল, কুমায়ুন, তিব্বত, ভুটান, সিকিম, নেপাল প্রভৃতি দেশ অবস্থিত। এই সমস্ত অঞ্চলই একদা ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিগণিত হইত।

(২) **সিন্ধু-গঙ্গা যমুনা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমভূমি অঞ্চল** :—এই অঞ্চলেই আর্যগণ বাহির হইতে আসিয়া প্রথমে বসবাস করেন। আর্য্যগণ এই অঞ্চলকে তিনটি অংশে বিভক্ত করিয়া তিনটি নামকরণ করেন—ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষিদেশ ও মধ্যদেশ। সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকা অঞ্চলে এই বিশাল সমতলক্ষেত্র অবস্থিত। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য ও জলপথে যোগাযোগের সুবিধার জন্য ভারতবর্ষের ইতিহাসের বহু সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন এইস্থানে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

(৩) **মধ্যভারতের মালভূমি অঞ্চল** :—বিন্ধ্য-আরাবল্লী পর্ব্বতের পূর্ব্ব হইতে ছোটনাগপুর, বঙ্গদেশ এবং উড়িষ্যার প্রান্ত পর্য্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত।

৪) **দক্ষিণের মালভূমি** :—বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণ হইতে কৃষ্ণা, তুঙ্গভদ্রা নদী পর্য্যন্ত 'দ্বীপ' খণ্ড, উড়িষ্যার কিয়দংশ, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ এবং বোম্বাই-র কিয়দংশ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। ভারতের প্রাচীন জাতি দ্রাবিড়দের পিতৃভূমি বলিয়া এই অঞ্চল বিশেষভাবে পরিচিত। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া কৃষ্ণা, কাবেরী, নর্ম্মদা, গোদাবরী, তপ্তী প্রভৃতি খরস্রোতা নদী প্রবাহিত।

(৫) **সুদূর দক্ষিণের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী নিম্ন সমভূমি** :—'সেতুর্নর্ম্মদয়োমধ্যে' অর্থাৎ নর্ম্মদা ও সেতুবন্ধের অন্তর্ব্বর্ত্তী অঞ্চল লইয়া এই অংশ গঠিত। ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত এই সঙ্কীর্ণ উপদ্বীপ অঞ্চল ভারতের ইতিহাসে সুদূর দক্ষিণ নামে খ্যাত। এই অঞ্চলে প্রাচীন চের, চোল, পাণ্ড্য এবং বর্ত্তমান কেরল, মহীশূর এবং মাদ্রাজের দক্ষিণাঞ্চল অবস্থিত।

আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য :—ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যানুযায়ী ভারতবর্ষ আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য মোটামুটি এই দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। সিন্ধু-গঙ্গা যমুনা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমভূমি ও মধ্যভারতের মালভূমি লইয়া গঠিত উত্তরের ভূখণ্ড আর্য্যাবর্ত্ত নামে পরিচিত এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্য নামে অভিহিত। ভারতের ইতিহাসে দাক্ষিণাত্য অপেক্ষা আর্য্যাবর্ত্তের দান ও কৃতিত্ব অধিক। মৌর্য্য যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মুঘল রাজত্বকাল পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তের অসংখ্য নরপতি দাক্ষিণাত্যে তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন; কিন্তু দাক্ষিণাত্যের অল্পসংখ্যক নরপতিই অনুরূপভাবে আর্য্যাবর্ত্তে তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত করিতে পারিয়াছেন।

ভারতের ইতিহাসে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রভাব

হিমালয়ঃ—ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের পর্ব্বত, সমুদ্র ও স্রোতস্বিনী তৎতৎ অঞ্চলের জনসাধারণ এবং ভারতের ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রবাহিত করিয়াছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে হিমালয়ের প্রভাব অত্যাধিক। নগাধিরাজ হিমালয় পশ্চিমে আরবসাগর হইতে পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত দুই সহস্র মাইলের অধিক বাহুবিস্তার করিয়া ভারতের উত্তর সীমান্তে প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান।

হিমালয়ের গুরুত্ব—সাংস্কৃতিক

হিমালয় মাত্র শিলাখণ্ডের সমষ্টি নহে—ভারতবর্ষের হিন্দুর নিকট ইহা দেবতাদের লীলা নিকেতন। ইহা হিন্দুদের কাছে দেবতাত্মা নামে পরিচিত—দেবাদিদেব মহাদেবের আবাসভূমি কৈলাস হিমালয়েই অবস্থিত। হিন্দুদের পবিত্র অসংখ্য তীর্থভূমি, কৈলাশ ও মানস সরোবর, কেদারবদরী, হরিদ্বার গঙ্গোত্রী প্রভৃতি হিমালয়েই অবস্থিত। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে হিমালয় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। হিমালয় যেন দক্ষিণে ও বামে দুই বলিষ্ঠ বাহুবিস্তার করিয়া ভারতবর্ষকে আফগানিস্তান, ইরাণ, মধ্য এশিয়া, তিব্বত, চীন ও ব্রহ্মদেশ হইতে পশ্চিমে, উত্তরে ও পূর্ব্বে সযত্নে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

হিমালয় মাত্র ভারতবর্ষকে এশিয়ার প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে তাহা নহে—ভারতবর্ষের নিরাপত্তা বিধানেও হিমালয়ের গুরুত্ব কম নহে। হিমালয়ের সু-উচ্চ প্রাচীরমালা থাকার ফলে ভারতবাসীরা হিমালয়ের অপর পারে অবস্থিত দেশগুলির রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতন সম্পর্কে চিরদিনই নির্ব্বিকার ছিল। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি প্রতিবেশী রাষ্ট্রবর্গকে প্রভাবিত করিয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষ ইহাদের দ্বারা মোটেই প্রভাবিত হয় নাই—চিরদিন এ সম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ভারতীয় দিগ্বিজয়ী নরপতিবর্গ তাহাদের সাম্রাজ্যবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা ভারতের অভ্যন্তরেই অভিযান করিয়া তৃপ্ত করিয়াছে; ভারতের বাহিরে রণতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য কখনও কোন অভিলাষ পোষণ করেন নাই। মৌর্য্য, বাহ্লীক, গ্রীক, কুষাণ বা মুঘল সম্রাটদের আমলে কখনও কখনও ভারতের আধিপত্য বহির্ভারতে বিস্তৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই আধিপত্য দীর্ঘস্থায়ী নয় নাই। আফগানিস্তানের কতকাংশ অবশ্য সুদূর ঐতিহাসিক কাল হইতে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল-মুঘল রাজত্বের শেষভাগে ইহা একপ্রকার স্বাতন্ত্র্যলাভ করে এবং ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তবে বাহ্লীক, গ্রীক, কুষাণ ও মুঘলগণের পিতৃভূমি ভারতের বাহিরে ছিল বলিয়া ইহাদের আমলে হিমালয়ের

হিমালয়ের গুরুত্ব-রাজনৈতিক

পরিস্থিতি কতক অঞ্চল তাহাদের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় সাম্রাজ্যকামী রাজাদের আদর্শ ছিল 'আসমুদ্র-ক্ষিতীশানাং অধীশ্বর' অর্থাৎ হিমালয় হইতে সেতুবন্ধ পর্যন্ত এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হওয়া।

ভারতবর্ষের রক্ষাপ্রাচীর

হিমালয়ের অপর পারে অবস্থিত দেশগুলির গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নির্বিকার থাকার ফল ভারতবর্ষের পক্ষে শুভঙ্কর হইতে পারে নাই। হিমালয়ের গিরিপ্রাচীরের স্থানে স্থানে কয়েকটি গিরিবর্ত্ম রহিয়াছে—যথা পেশোয়ার সীমান্তে খাইবার গিরিপথ, পশ্চিম ভারতে প্রবেশে অন্যতম বোলান গিরিবর্ত্ম। এই সকল দুর্গম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া বিভিন্ন সময়ে আর্য্য, পারসিক, গ্রীক, শক, কুষাণ, হুণ, তুর্কী, আফগান এবং মুঘল জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয়ই বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে পর্য্যাপ্ত এই সরল বিশ্বাসে ভারত কখনও এই অঞ্চলে কোন প্রতিরক্ষার বন্দোবস্ত করে নাই। ফলে ভারতকে বারংবার বিদেশীর কাছে হার মানিতে হইয়াছে। উত্তর-পূর্ব্বে অহোম জাতিও এইভাবে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। হিমালয়ের গিরিবর্ত্ম দিয়া উত্তর দিক হইতে তিব্বতও একদা এইভাবে ভারত আক্রমণ করিয়াছিল।

ভারতের সভ্যতা পুষ্ট ও বিভিন্ন জাতির মিলনক্ষেত্র

এই সকল বিদেশী জাতির আগমনের ফলে ভারতবর্ষ যে শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা নহে—অন্য দিক দিয়া যথেষ্ট লাভবান হইয়াছে। এই সমস্ত গিরিবর্ত্ম দিয়াই পারসিক, গ্রীক, মুঘল ও ইসলামের প্রভাব ভারতের সভ্যতাকে পুষ্ট ও প্রভাবিত করিয়াছে। পক্ষান্তরে ভারতীয় ধর্ম্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঐ পথ বাহিয়াই মধ্য এসিয়া, তিব্বত, চীন, ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও জাপানে বিস্তার লাভ করিয়াছে। আফগানিস্তান যে একদা ভারতের সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল 'গান্ধার শিল্প' এই নামের মধ্যেই তাহার পরিচয় রহিয়াছে। হিমালয়ের বিভিন্ন গিরিবর্ত্ম দিয়া চিরদিন অসংখ্য মানব জাতির গমনাগমন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিনিময় হইয়াছে।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

অর্থনৈতিক দিক দিয়াও হিমালয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। হিমালয় হইতে উদ্ভূত সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং ইহাদের উপনদী ও শাখানদীগুলির দ্বারা উত্তর ভারত পুষ্ট হইয়াছে। হিমালয় তুষারাবৃত থাকায় এই সকল নদী বারোমাসই জলপূর্ণ থাকে ও আর্য্যাবর্ত্তকে সুজলা ও শস্যশ্যামলা করিয়া রাখে। আরবসাগর ও বঙ্গোপসাগর হইতে উদ্ভূত মৌসুমী বায়ুও হিমালয়ে প্রতিহত হইয়া ভারতবর্ষকে বারিপূর্ণ রাখিয়া ঊষরতার কবল হইতে রক্ষা করিতেছে।

বিন্ধ্যপর্ব্বতের গুরুত্ব :—হিমালয়ের ন্যায় বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার গুরুত্বও ভারতের ইতিহাসে কম নহে। হিমালয় যেমন ভারতকে এশিয়ার অবশিষ্ট অঞ্চল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে অনুরূপ বিন্ধ্যপর্ব্বতও ভারতের উত্তরাঞ্চলকে দক্ষিণাংশ হইতে পৃথক করিয়াছে এবং দাক্ষিণাত্য আর্য্যাবর্ত্ত হইতে পৃথক এক সামাজিক রীতিনীতি ও সভ্যতা সংস্কৃতির গঠনের নিমিত্তস্বরূপ হইয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম দিকে হয়তো বিন্ধ্যপর্ব্বতের প্রতিবন্ধকতা ভারতের দুই অঞ্চলকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু চিরকাল এই বাধা অলঙ্ঘনীয় থাকে নাই। পৌরাণিক অগস্ত্য-বিন্ধ্য পর্ব্বতের কিংবদন্তী কাহিনীর মধ্যে এবং রামচন্দ্রের কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কা-অভিযানের মধ্যে আর্য্যজাতির দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে অনুপ্রবেশের কাহিনী প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। পরবর্ত্তীকালে মৌর্য্য-খিলজী-মুঘল সম্রাটদের আমলে এবং বৃটিশের শাসনকালে বিন্ধ্যপর্ব্বতের প্রতিবন্ধকতা বারংবার অপসৃত হইয়াছে এবং দাক্ষিণাত্য ও আর্য্যাবর্ত্ত সম্মিলিতভাবে এক অখণ্ড ভারতের সৃষ্টি করিয়াছে।

একথা বলা অসঙ্গত হইবে না যে বিন্ধ্য পর্ব্বতের মত দুরতিক্রমণীয় বাধা থাকার জন্য দাক্ষিণাত্য আর্য্যাবর্ত্ত অপেক্ষা কম বিদেশী ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে এবং দাক্ষিণাত্যের শিল্প সৃষ্টি সমূহও অবিকৃত রহিয়াছে বা মুসলমানদের দ্বারা বিনষ্টির হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেক কিছু এই জন্যই এখন পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে অবিকৃত আছে।)

ভারতের ইতিহাসে ভারত মহাসাগরের গুরুত্ব :—হিমালয়ের ন্যায় সমুদ্রও ভারতবর্ষের ইতিহাসকে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। ভারতের দক্ষিণে ভারত-মহাসাগর, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিমে আরবসাগর। ভূতাত্ত্বিকদের মতে ভারত-বর্ষের দাক্ষিণাত্য অঞ্চল নাকি একদা আফ্রিকার সহিত একই ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং যে অঞ্চল আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া পরিচিত সেই স্থান জলপূর্ণ ছিল। কোনও নৈসর্গিক বিপর্য্যয়ের ফলে যেমন ভারতমহাসাগরের জলধারা আফ্রিকা ও দক্ষিণ ভারতকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে অনুরূপভাবে ভারতমহাসাগরের গর্ভ হইতে আর্য্যাবর্ত্ত নামক ভূখণ্ডেরও অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। বাস্তবিক ভারতবর্ষকে ভারতমহাসাগরের মানস-সন্তান বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। ভারতবর্ষের ন্যায় সুমাত্রা, বলিদ্বীপ, যবদ্বীপ, মালয়, শ্যাম, প্রভৃতি পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপ ও উপদ্বীপকে ভারতমহাসাগরের অংশস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুদূর অতীতকাল হইতে এই পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপাবলীর সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। বৈদিক যুগে আর্য্যগণ যে সমুদ্রপথে ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন ঋগ্বেদে উল্লিখিত ভুজ্যুর পোত জলমগ্ন হওয়ার কাহিনীতে তাহার

উল্লেখ রহিয়াছে। বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ সমূহেও সমুদ্রপথে বহির্ব্বাণিজ্যের কাহিনী পাওয়া যায়। সমুদ্রপথেই ভারতের নাবিক ও বণিক দেশ দেশান্তরে ভারতের বাণিজ্যপণ্য বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং বাহিরের দেশ হইতে পণ্যদ্রব্য ভারতে আনয়ন করিয়াছে। বাণিজ্যের আদানপ্রদানের সঙ্গে ভারতের বাহিরের বহু দেশের সঙ্গে ভারতের সভ্যতার বিনিময় ঘটিয়াছে। ভারতীয় সভ্যতার প্রসার মাত্র পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সীমাবদ্ধ থাকে নাই—পশ্চিমে আরব, সিরিয়া, গ্রীস ও রোম পর্য্যন্ত ইহার বিস্তার ঘটিযাছিল। প্রাচীন মিশরের সমাধিক্ষেত্রে ভারতীয় বস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষ ভারতের বাহিরে স্বীয় সভ্যতা বিস্তার করিয়া ক্ষান্ত ছিল না—প্রয়োজনমত ভারতের বাহির হইতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করিতে দ্বিধা করে নাই। ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানীরা রোমের জ্যোতির্ব্বিদদের দ্বারা সম্পাদিত 'রোমক সিদ্ধান্ত' তাঁহাদের জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে ইতস্ততঃ করে নাই।

বহির্ভারতের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সংযোগ

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য :—সমুদ্রপথই ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন ছিল। ভারতীয় পণ্যদ্রব্য সমুদ্রযোগে আরবসাগর অতিক্রম করিয়া আফ্রিকায় লোহিত সাগরের তীরে নীত হইত এবং তথা হইতে স্থলপথে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে আসিত। স্থলপথে ভারতীয় পণ্য পারস্য ও কাস্পিয়ান সাগরের তীরাঞ্চল অতিক্রম করিয়া সিরিয়ার অন্তর্গত পালমিরা (Palmyra)র বাণিজ্যকেন্দ্রে আনীত হইত। আলেকজান্দ্রিয়া ও পালমীরা হইতে ইটালীর বণিকগণ ইউরোপের সর্ব্বত্র পণ্যদ্রব্য লইয়া যাইত ও বিক্রয় করিত। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় বণিকগণ সমুদ্রপোতে বাণিজ্য পণ্যসম্ভার ব্রহ্মদেশ, সুবর্ণ দ্বীপ, যবদ্বীপ প্রভৃতি পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে রপ্তানী করিত। ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের মধ্যে মণিমুক্তা, মসলাদ্রব্য, মূল্যবান প্রস্তর, ভারতীয় সূক্ষ্মবস্ত্র মসলিন, সোরা, গন্ধক প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাণিজ্যপথ ও পণ্যদ্রব্য

সমুদ্র সম্বন্ধে ভারতবাসীর দৃষ্টিভঙ্গী :—সমুদ্র সম্বন্ধে ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল। পশ্চিম উপকূলে ভৃগুকচ্ছ (বরোচ) ও পূর্ব্বকূলে তাম্রলিপ্ত ব্যতীত উত্তর ভারতে আর কোন উল্লেখযোগ্য বন্দর ছিল না। উপরন্তু উত্তর ভারতের খ্যাতনামা রাজনৈতিক কেন্দ্রপ্রধান নগরসমূহ সমুদ্র হইতে বহু দূরে অবস্থিত। এই কারণেই ভারতের উত্তরাংশের জনসাধারণের মধ্যে সমুদ্র প্রীতি বিস্তার লাভ করে নাই। পক্ষান্তরে দাক্ষিণাত্যের

ভারতের দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী

প্রায় তিন দিকেই সমুদ্রবেষ্টিত; সুতরাং দক্ষিণ ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলের অধিবাসীগণ সমুদ্রসান্নিধ্য লাভ করায় সমুদ্রের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীরা সুদক্ষ নৌযাত্রী হইতে পারিয়াছিল। সমুদ্রপথে বাণিজ্যের জন্যই দক্ষিণের অধিবাসীরা দেশান্তরে যাত্রা করিয়াছে, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার করিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের চোলরাজাদের সময়ে চোলদের বিরাট নৌবাহিনী ছিল। এই নৌবহরের সাহায্যে চোল রাজগণ পেগু, আন্দামান, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে বিজয় অভিযান করিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারত হইতেই পণ্যপোত ব্রহ্মদেশ, মালয়, ইন্দোনেশিয়া চীন, আরব, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশের সহিত
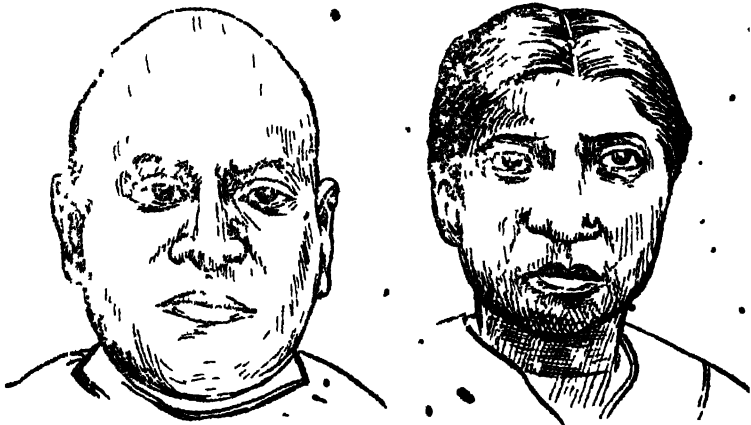
দ্রাবিড় নরনারী

ভারতের অধিবাসী :—এককালে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে আর্য্যগণ ভারতের আদিমতম অধিবাসী। বর্ত্তমানে এই ধারণা পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর্য্যগণে ভারত-প্রবেশের বহু পূর্ব্ব হইতেই অসংখ্য জাতিগোষ্ঠী ভারতবর্ষে বসবাস করিত। এই সব জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে দ্রাবিড়রাই সমস্ত দিক দিয়া বিশে উল্লেখযোগ্য ছিল।

ভারতের আদিমতম অধিবাসীকে পুরাতাত্ত্বিকগণ নাম দিয়াছেন "প্রস্তর যুগ"-এ (Stone Age) লোক। এই যুগের লোকেরা প্রস্তরকে সরু ও তীক্ষাগ্র করিয়া

আত্মরক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহার করিত। প্রথম দিকে তাহাদের নির্মিত প্রস্তরের অস্ত্র-শস্ত্র তাদৃশ সূক্ষ্ম ও মসৃণ ছিল না। ক্রমশঃ অভিজ্ঞতার ফলে কালক্রমে
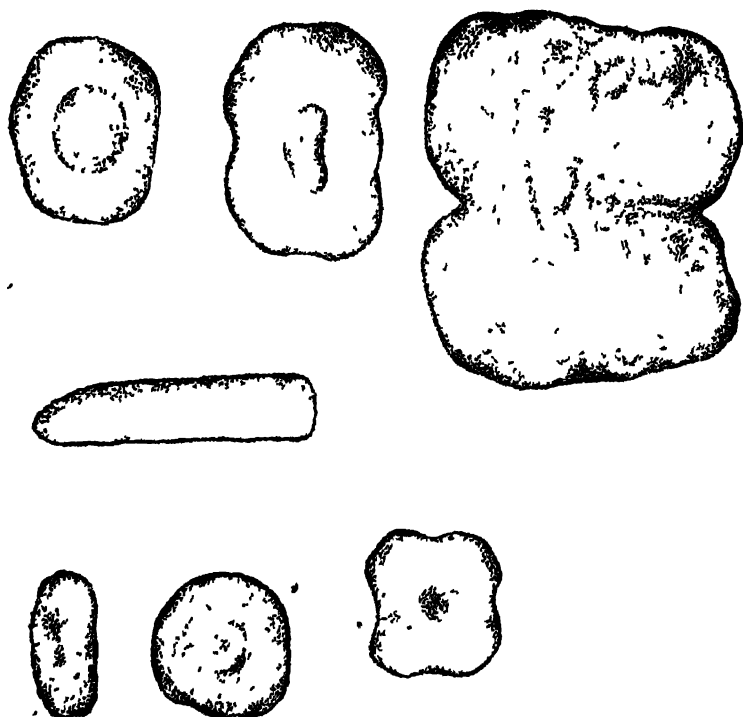
প্রস্তর যুগের অস্ত্র

এই সকল প্রস্তরনির্মিত অস্ত্র শস্ত্র বা যন্ত্রপাতি সূক্ষ্মতর, তীক্ষ্ণতর ও মসৃণ হয়। ঐতিহাসিকগণ এই পার্থক্যের ভিত্তিতে প্রস্তর যুগকে দুইটি উপভাগে বিভক্ত করিয়াছেন —পুরাপ্রস্তর যুগ (Palæolithic Age) ও নব্য প্রস্তর যুগ (Neolithic Age)। নব্য প্রস্তর যুগ শেষ হওয়ার পরে আসিল ধাতুব্যবহারের যুগ। মানুষ ক্রমশঃ তামা, টিন স্বর্ণ, লৌহ ইত্যাদি ধাতু আবিষ্কার করিয়া নিজেদের প্রয়োজনে লাগাইতে শিখিল। এইভাবে প্রস্তর যুগের পরে দেখা দিল 'তাম্র যুগ' (Copper Age)। পরবর্তী যুগের নাম তাম্র ও টিনের মিশ্রণে উৎপন্ন মিশ্র-ধাতু ব্রোঞ্জের (Bronze) নাম অনুসারে হয়

'ব্রোঞ্জযুগ' (Bronze Age)। ইতিমধ্যে স্বর্ণের আবিষ্কারও হইয়া গেল। সর্ব্বশেষ আবিষ্কৃত হইল লৌহ। ব্যবহারিক উপযোগিতার দিক দিয়া লৌহ সকল ধাতুকে অতিক্রম করিয়া গেল। এইরূপে আসিল 'লৌহ যুগ' (Iron Age)। বলা বাহুল্য
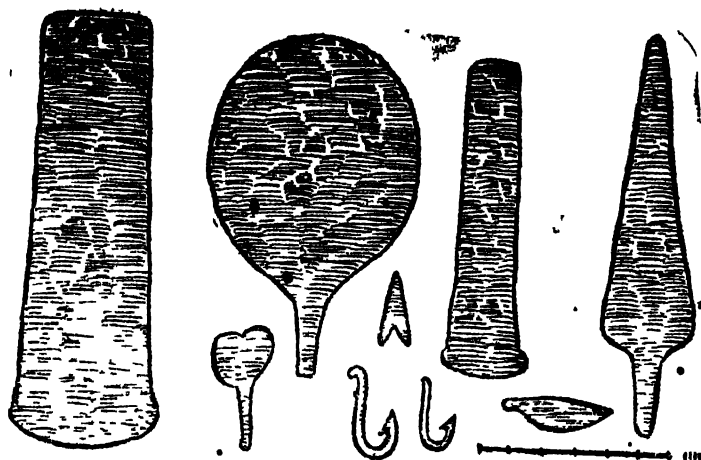
ব্রোঞ্জ যুগের অস্ত্র

পৃথিবীর অপরাপর দেশের ন্যায় উপরোক্ত বিভিন্ন 'যুগ'-বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ভারতের সভ্যতা অগ্রসর হইয়াছে।

পুরা তাত্ত্বিকদের মতে ভারতের মানবগোষ্ঠীকে ছয়টি প্রধান শাখায় বিভক্ত করা যায়—(১) নিগ্রিটো (Negrito) (২) প্রটো-অস্ট্রোলয়েড (Proto-Austroloid), (৩) মোঙ্গলয়েড (Mongoloid) (৪) মেডিটারেনিযান (Mediterranean) (৫) আলপাইন (Alpine) ও (৬) নর্ডিক (Nordic)।

আধুনিক নৃতত্ত্ববিদদের মতে ভারতের উপরোক্ত মানবগোষ্ঠীদের মধ্যে অধিকাংশই ভারতের বাহির হইতে আসিয়াছিল। পুরাপ্রস্তর যুগে নিগ্রিটো জাতি ভারতে বাস করিত। বর্ত্তমানে তাহাদের বংশধরগণ আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরের পার্ব্বত্য অঞ্চলে এবং আসামের নাগা অঞ্চলে বাস করে। নিগ্রিটো জাতির বংশধরগণ খর্ব্বকায়, কুঞ্চিত কেশ, কৃষ্ণকায় তাহাদের নাক চ্যাপ্টা।

(১) নিগ্রিটো

প্রটো-অষ্ট্রেলয়েড জাতি বহিরাগত। ইহাদের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সাদৃশ্য আছে বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহারা কৃষ্ণকায়, স্থূলনাসিক ও প্রশস্ত

প্রটো-অষ্ট্রেলয়েড নরনারী

ললাটবিশিষ্ট। বর্ত্তমান ভারতীয় আদিবাসী ও নিম্নজাতির সঙ্গে ইহারা মিলিয়া গিয়াছে। সিংহল, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে এই জাতির মানুষকে দেখা যায়। মধ্যভারতের হো, মুণ্ডা, কোল, ভীল, সাঁওতাল, শবর প্রভৃতি উপজাতির লোকেরা ইহাদের বংশধর।

(২) প্রটো-অষ্ট্রলয়েড

মোঙ্গলয়েড বা মোঙ্গলীয় জাতি হিমালয়ের উত্তর ও পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে আসিয়া

মোঙ্গলীয় নরনারী

ব্রহ্ম, আসাম, চট্টগ্রাম, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, সিকিম, ভুটান, গাড়োয়াল, লাডক প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করিয়াছে। ইহারা গৌরবর্ণ, গোলমস্তক বিশিষ্ট, স্থূলনাসিক, বিরলশ্মশ্রু, খর্ব্বকায়। উপরন্তু ইহাদের গণ্ডাস্থি চওড়া।

(৩) মোঙ্গলয়েড

ভারত ইতিহাসের তাম্রযুগে ভারতে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কোন কোন মানবজাতির সহিত সাদৃশ্যবিশিষ্ট এক জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই জাতি কৃষ্ণকায়, প্রশস্তললাট, খর্ব্বনাসিক ও মধ্যমাকৃতি। ইহাদের বংশধরগণকে সিন্ধু, পাঞ্জাব, রাজপুতানা, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

(৪) মেডিটারোনয়ান

আলপাইন জাতি মধ্য এশিয়ার পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে আগত। ইহারা গুজরাট হইতে আরম্ভ করিয়া বিহারের প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই মিশিয়া গেছে। এই জাতির লোকেরা বাংলা, উড়িষ্যা, বিহার, উত্তরপ্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চল, কানাড়া, তামিলও কাথিয়াবাড়ে বাস করে।

(৫) আল্‌পাইন জাতি

লৌহযুগে ভারতে এক মানবগোষ্ঠীকে বাস করিতে দেখা যায়। আকৃতি-প্রকৃতি, রীতি-নীতি সমস্ত দিক দিয়া তাহারা ভারতে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠী হইতে স্বতন্ত্র ছিল। তাহারা দীর্ঘকায়, গৌরকান্তি এবং দীর্ঘনাসিকবিশিষ্ট। এই জাতি নর্ডিক বা বৈদিক আর্য্য নামে পরিচিত। মহারাষ্ট্র অঞ্চলের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ, মধ্য ও উত্তর প্রদেশের কনৌজ ব্রাহ্মণ এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অপরাপর উচ্চবর্ণের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আর্য্যরক্ত রহিয়াছে। ইহারা যে ভাষায় কথা বলিতেন তাহা হইতে পরবর্ত্তীকালে, সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং হিন্দী, বাংলা, আসামী, উড়িয়া প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। আর্য্যদের ভাষার সহিত গ্রীক, জার্মান, ল্যাটিন, ফরাসী, ইতালীয় প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষার সাদৃশ্য রহিয়াছে। প্রাচীন পারসিকদের ধর্ম্মগ্রন্থ জেন্দ-আবেস্তার

আর্য্য পুরুষ

(৬) নর্ডিক

বৈদিক আর্য্যদের ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এই কারণে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, আর্য্যরা মধ্য এশিয়ার কোনও অঞ্চল হইতে পশ্চিমে, পূর্ব্বে এবং দক্ষিণে ছড়াইয়া পড়েন। এই আর্য্যদের একটি শাখা পারস্যে এবং পারস্য হইতে ভারতে আসিয়া বসতি করেন।

ভারতের ভাষা সমূহঃ—বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে যেমন ভারতে বহু জাতির সৃষ্টি হইয়াছে অনুরূপভাবে ভারতে বহু ভাষা ও উপভাষারও সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতের সংবিধানে অবশ্য চৌদ্দটি ভাষাকে প্রধান ভাষা হিসাবে স্বীকার করা হইয়াছে কিন্তু বাস্তবপক্ষে ভারতে দুই শতের বেশী উপভাষা রহিয়াছে।

আর্য্যগণ ভারতে আসায় আর্য্যজাতির বৈদিক ভাষা—বেদাদি যে ভাষায় রচিত সেই ভাষা উত্তর ভারতে প্রাধান্য লাভ করে। বৈদিক আর্য্যভাষাই কালক্রমে পরিবর্ত্তিত আকারে সংস্কৃত ভাষায় রূপ পরিগ্রহ করে। সংস্কৃত ভাষাই একটু বিকৃত হইয়া প্রাকৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয়। সংস্কৃতভাষা ছিল সমাজের উচ্চকোটির শিক্ষিত মুষ্টিমেয়ের ভাষা—আর প্রাকৃত ছিল জনসাধারণের ভাষা। প্রাকৃত ভাষাই কালান্তরে অপভ্রংশ বা অবহট্‌ট রূপের মধ্যে দিয়া উত্তর ভারতের পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, গুজরাটি, হিন্দী, মারাঠা, বাংলা, উড়িয়া, আসামী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে।

সংস্কৃত ভাষা

মুসলমান আক্রমণের ফলে ভারতে আরবী ও ফার্সী ভাষা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। আরবী ভাষা সেমিটিক জাতিগোষ্ঠীর এবং ফার্সী মূলতঃ আর্য্য জাতিগোষ্ঠীর ভাষা। ভারতীয় আর্যভাষা হইতে আধুনিক হিন্দী ভাষা আরবী ও ফার্সী-ভাষার সংমিশ্রণে উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। উর্দ্দু বা শিবিরবাসী মুসলমান সৈনিকেরা হিন্দী, আরবী ও ফার্সী ভাষার সংমিশ্রণে জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য উর্দ্দু ভাষার প্রচলন করিয়াছিল। উর্দ্দুর হরফ আরবী, ব্যাকরণ হিন্দীভাষাশ্রয়ী এবং শব্দের অধিকাংশ ফার্সী, আরবী ও হিন্দীর মিশ্রণে উদ্ভূত।

আরবী, ফার্সী ও উর্দ্দু

আর্য্যদের আগমনের পূর্ব্বে যাহারা ভারতে বাস করিতেন তাহাদেরও স্বতন্ত্র ভাষা ও উপভাষা ছিল। আদি অষ্ট্রোলয়েড গোষ্ঠীর ভাষার নিদর্শন অদ্যাপি সাঁওতালী, মুণ্ডা, খাসিয়া, আন্দামানীদের ভাষার মধ্যে পাওয়া যায়। দ্রাবিড়গণ যে সকল ভাষা ও উপভাষা ব্যবহার করিতেন সেইগুলির নিদর্শন দাক্ষিণাত্যের তামিল, তেলেগু, মালয়ালম্‌, কানাড়ী প্রভৃতি ভাষার মধ্যে রহিয়াছে।

অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা

ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা পারস্পরিক শব্দ ও ভাব বিনিময়ের দ্বারা কালক্রমে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইযাছে। কোন ভাষারই বিশুদ্ধ আদিরূপ আজ বর্ত্তমান থাকে নাই। এতদ্ব্যতীত পরবর্ত্তীকালে তুর্কী, মুঙ্গল, পর্টুগীজ, ফরাসী, ইংরেজী, ডাচ প্রভৃতি বিদেশী ভাষার শব্দসম্ভার ভারতীয় ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিযা সব ভাষাকে সমৃদ্ধ করিযা তোলে। দাক্ষিণাত্যের তামিল, তেলেগু প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষাগুলি যেমন আর্য্য সংস্কৃত ভাষার শব্দ ও ভাবসম্ভারে সমৃদ্ধ হইযাছে অনুরূপভাবে আর্য্যগোষ্ঠীর ভাষা সমূহও আর্য্যেতর ভাষা হইতে শব্দ ও ভাব গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করে নাই।

বিভিন্ন ভাষার মধ্যে গ্রহণ ও বিনিময়

ভারতের ধর্ম্ম ঃ—ভারতে যেমন বিভিন্ন ভাষা আছে, তদ্রূপ ভারত অসংখ্য ধর্ম্ম ও ধর্ম্মমতের দেশ। ভারত প্রধানতঃ হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ ও জরথুষ্ট্র প্রবর্ত্তিত পারসিকদের ও ইহাদের শাখা ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের বাসভূমি। ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যাই সর্ব্বাধিক—তৎপরে সংখ্যার দিক দিয়া মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। গুরু নানক প্রবর্ত্তিত শিখধর্ম্ম উত্তর পশ্চিম ভারতের অন্যতম প্রধান ধর্ম্ম। গুজরাট ও রাজপুতানায় জৈনধর্ম্ম প্রচলিত। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের চট্টগ্রামে, কাশ্মীরের লাডকে এবং হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সংখ্যক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করে। ভারতবর্ষের পার্শী সম্প্রদায় জরথুষ্ট্র প্রবর্ত্তিত অগ্নি উপাসক। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এখনও উদ্ভিদ, জীবজন্তু, ভূতপ্রেত উপাসনা বর্ত্তমান আছে। ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে এবং অন্যত্র রোমান কাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী বহু খৃষ্টান বাস করে।

বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের বাসস্থান

ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদারতার জন্য ভারতবর্ষ চিরকাল খ্যাত। ভারতবর্ষ কোন ধর্ম্মকে প্রত্যাখ্যান করে নাই, সকলকে তাহার কোলে স্থান দিয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে যীশুখৃষ্টের অন্যতম শিষ্য ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করেন। ইরাণে ইসলামধর্ম্ম প্রচারিত হইলে তথাকার অগ্নি উপাসক পার্শীগণ ভারতবর্ষে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইসলাম বিজয়ের পরে ভারতে ইসলামধর্ম্ম বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয়। ইসলামধর্ম্মের সন্তগণ ভারতীয় অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত সমন্বয় সাধন করিয়া সুফী ধর্ম্মমত গড়িয়া তুলিয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম পাশাপাশি দীর্ঘকাল অবস্থান করায় ভারতে

ধর্ম্মে উদারতা

ধর্মের সহাবস্থানের নীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইউরোপের ন্যায় ভারতে ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া কোন যুদ্ধবিগ্রহ বা অত্যাচার ঘটে না। তরবারির পরিবর্তে প্রেম ও প্রীতির দ্বারা দেশজয় করা ভারতবর্ষের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য।

ভারতীয় রীতি-নীতি :—ভাষা ও ধর্মের ন্যায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের খাদ্য, বেশভূষা, সামাজিক সংস্কার, রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। আঞ্চলিক জলবায়ুবিশিষ্ট পরিবেশ ও বহিরাগতদের প্রভাব যে এই সমস্ত রীতি-নীতি বৈষম্যের কারণ তাহা বলা বাহুল্য। পোষাক পরিচ্ছদ, খাদ্য, বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি প্রধানতঃ এই চারিটি ব্যাপারে এই পার্থক্য লক্ষণীয়।

রীতি-নীতিতে বৈষম্য

উত্তর ভারতের অধিবাসীরা মস্তকাবরণ ব্যবহার করে কিন্তু পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে এই প্রথা নাই। মৎস্য পূর্ব ভারতের অতি প্রিয় আহার্য কিন্তু উত্তর ও পশ্চিম ভারতে এবং দাক্ষিণাত্যের বহু অঞ্চলে মৎস্য ভক্ষণ নিন্দনীয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈবাহিক অনুষ্ঠানেও বিভিন্ন রীতি বর্তমান। শব সৎকারের ব্যাপারেও এই পার্থক্য বর্তমান। হিন্দুগণ প্রধানতঃ শবদাহ করিলেও হিন্দুদের কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে শব সমাহিত করার রীতি অনুসৃত হয়। মুসলমান ও খৃষ্টানরা শব দাহ করার পরিবর্তে সমাধিস্থ করে। অগ্নি-উপাসক পার্শী সম্প্রদায় শবকে দাহ বা সমাধিস্থ করার পরিবর্তে উহা পক্ষীদের দ্বারা ভক্ষিত হইবার জন্য একটি নির্দিষ্ট গৃহের (Tower of Silence) ছাদে রাখিয়া দেন। এইরূপ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের যথেষ্ট তারতম্য লক্ষিত হয়।

বিভিন্ন জীবনধারার মধ্যে সমন্বয় :—ভাষা, ধর্ম, আহার্য, বেশভূষা, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান সমস্ত কিছুর মধ্যে পার্থক্য ও বৈচিত্র্য বর্তমান থাকিলেও ইহারা পরস্পরকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। সহনশীলতা ভারতের বৈশিষ্ট্য—এই জন্যই এই বিভিন্নতা বিরোধে পরিণত না হইয়া বৈচিত্র্যে পরিণত হইয়াছে। এই কারণেই ভারতবর্ষের ইতিহাসের মর্মকথা শুধু বৈচিত্র্য বা বিরোধ নয়—বৈচিত্র্য ও বিরোধের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য বিধান।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য :—অপূর্ব বৈচিত্র্যময় এই ভারতবর্ষ। আয়তনের বিশালত্ব, লোকসংখ্যার বিপুলতা—জাতি, ভাষা, ধর্ম এবং প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কথা স্মরণ করিলে এই দেশকে একটি মহাদেশ বা উপমহাদেশ আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। এই বৈচিত্র্য জাতি, ভাষা, ধর্ম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ইতিতত্ত্ব ও বিভিন্ন আচার-

অনুষ্ঠানের মধ্যে পরিস্ফুট। স্মরণাতীত কাল হইতে কত বিভিন্ন জাতি এই বৃহৎ উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে আসিয়া ইহার অঙ্গীভূত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাদের মধ্যে কোন কোন জাতি আজিও তাহাদের রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে—আবার দ্রাবিড়, আর্য্য, মোঙ্গল প্রভৃতি অসংখ্য জাতির রক্ত-সংমিশ্রণে বহু সঙ্কর জাতির উদ্ভব হইয়াছে।

জাতিগত বৈচিত্র্য

ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যেরও লীলানিকেতন। একদিকে যেমন গঙ্গা-গোদাবরী-সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা সমতলভূমি অপরদিকে তেমনি রহিয়াছে রাজপুতানা-সিন্ধুদেশের তপ্ত-মরুর উষর দৃশ্য। বঙ্গদেশের সমতলের সঙ্গে বৈপরীত্য রক্ষা করিয়া রহিয়াছে ভারতবর্ষের প্রহরীর মত অত্যুন্নত নগরাজ হিমালয় ও বিন্ধ্য পূর্ব্বঘাট-পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা। ভারতবর্ষে ছয় ঋতু যে ভাবে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে পৃথিবীর অন্যত্র অনুরূপ হয় কিনা সন্দেহ।

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

ভারতবর্ষের ভাষাগুলির মধ্যেও এই বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। আর্য্যজাতির ব্যবহৃত ভাষা ছিল সংস্কৃত—অবশ্য অশিক্ষিত জনসাধারণ কথাবার্ত্তায় প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করিত। এই প্রাকৃত অপভ্রংশের মধ্য দিয়া হিন্দী, বাংলা, আসামী, উড়িয়া, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষায় পরিণত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে আবার দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ব্যবহৃত তামিল, তেলেগু, মালয়ালম ও কানাড়ী ভাষা প্রচলিত—উত্তর ভারতের সংস্কৃতোদ্ভূত ভাষাগুলির সঙ্গে ইহাদের মৌলিক কোন সম্পর্ক নাই। সরকারী মতে ভারতবর্ষে ন্যূনাধিক দুই শত পঁচিশটি ভাষা প্রচলিত।

ভাষার বৈচিত্র্য

ধর্ম্মের মধ্যেও এই বৈচিত্র্য বিদ্যমান। হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্ম ভারতবর্ষেই উদ্ভূত হইয়াছে এবং ভারতেই প্রসারলাভ করিয়াছে। এই কয়টি প্রধান ধর্ম্ম ব্যতীত আরও কত যে উপধর্ম্ম আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। পরবর্ত্তীযুগে ইসলামধর্ম্ম ভারতে স্থান লাভ করিয়াছে ও দেশের এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক এই ধর্ম্মমতে বিশ্বাসী হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত খৃষ্টান এবং পার্শীদের ধর্ম্মও এই দেশের কিয়দংশে প্রচলিত। এই দেশের জনসংখ্যা যেমন বিপুল, সেইরূপ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মমতের সংখ্যাও অগণিত।

ধর্ম্মের বৈচিত্র্য

ভারতবর্ষের এই আপাতবাহ্য বৈচিত্র্যের মধ্যেও আভ্যন্তরীণ মৌলিক ঐক্য বর্ত্তমান। ভারতের চিরাগত শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম্ম, রাষ্ট্রবিন্যাস প্রভৃতির অন্তরালে এই ঐক্যসূত্র বর্ত্তমান। প্রায় সমস্ত হিন্দুই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং বেদ, গীতা, পুরাণ ধর্ম্ম ও স্মৃতিকে পবিত্র গ্রন্থ বলিয়া মনে করে। রামায়ণ-মহাভারত সকল হিন্দুর জাতীয় মহাকাব্য। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত বিভিন্ন পুরুষ ও নারী চরিত্র আবহমানকাল হইতে ভারতবাসীর নিকট আদৃত এবং ভারতের জাতীয় চরিত্রের আদর্শসমূহ এই মহাকাব্যদ্বয়ের চরিত্রাবলী হইতে গৃহীত হইয়াছে। ভরত-লক্ষ্মণের ভ্রাতৃত্ব, সীতা-উর্ম্মিলার স্বামীনিষ্ঠা, হনুমানের সেবকরূপে নিষ্ঠা, সুগ্রীবের বন্ধুত্ব, রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি ও প্রজানুরক্তি ভারতবাসীর চিরন্তন আদর্শ। মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত যুধিষ্ঠিরের সত্যপ্রিয়তা, বিদুরের ধর্ম্মনিষ্ঠা, ভীষ্মের আত্মত্যাগ, গান্ধারীর পাতিব্রাত্য, কর্ণের দানশীলতা ভারতবাসীর চিত্ত চিরকাল উদ্বোধিত করিয়া আসিতেছে। হিন্দুর প্রধান প্রধান তীর্থভূমি ও পবিত্র নদনদী ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মহাসম্মেলন কুম্ভমেলা হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী ও নাসিক ভারতের এই চারি প্রান্তে অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দুদের পুণ্যতোয়া সপ্তসিন্ধু: গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, কাবেরী ও সিন্ধু কোন বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নাই। এই সকল পুণ্যস্থান-বিন্যাসের পশ্চাতে ভারতবর্ষের মৌলিক ঐক্যের ভাবাদর্শ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ভাষাগত ও নৈতিক ভাবাদর্শগত ঐক্য

রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রেও বিভিন্ন বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার অন্তরালে ভারতবর্ষ ভারতীয় ঐক্যের সন্ধান করিয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রধানতঃ রাজবৃত্ত বা রাজ-বংশ পরম্পরার সূত্র দ্বারা গ্রথিত। এক রাজবংশের উত্থান ও পতন, নূতন রাজবংশের আবির্ভাব,—এই রাজ-বৃত্তের ভিত্তিতেই ইহার ইতিহাস আবর্ত্তিত হইয়াছে। এই রাজবংশাবলীর মধ্যে কদাচিৎ কোন বংশাশ্রিত দুই-একজন নরপতি সমুদ্রমেখলা সমগ্র ভারতভূমির 'রাজচক্রবর্ত্তী' বা অধীশ্বর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সম্পূর্ণ আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের অধীশ্বর বলিতে গেলে হিন্দু-রাজাদের মধ্যে মাত্র চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য এবং মুসলমান রাজত্বকালে আলাউদ্দিন খিলজী, মহম্মদ তোগলক ও ঔরংজীব দাবি করিতে পারেন। বৃটিশ রাজত্বকালেও ভারত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্য ও অখণ্ডতালাভের সুযোগ লাভ করিয়াছে। যদিও ভারতের ইতিহাসে মাত্র উক্ত কয়েকজন নরপতির আমলে আসমুদ্র হিমাচলের অখণ্ডতা লাভ সম্ভবপর

রাজনৈতিক ঐক্যের আদর্শ

হইয়াছিল তথাপি অর্থশাস্ত্র বর্ণিত 'রাজচক্রবর্ত্তী'র মুকুট তাঁহাদের মস্তকে শোভা না পাইলেও অর্থশাস্ত্র বা ধর্ম্মশাস্ত্র বর্ণিত অখণ্ড ভারতের আদর্শই তাঁহারা চিরকাল অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। এই আদর্শ ক্বচিৎ বাস্তবে রূপায়িত হইলেও ভারতবর্ষের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সামন্ত নরপতিও এই মহান আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই—ক্ষুদ্র অঞ্চল বিশেষের অধিপতি হইয়াও তাঁহারা তাঁহাদের শাসনপত্রে স্বনামের পূর্ব্বে 'আসমুদ্র ক্ষিতীশানাং অধীশ্বর' এই বিশেষণ প্রয়োগ করিতে দ্বিধা করিলেন না। ভারতের জনমানসও এই একজাতীয়তাবোধের ভাবাদর্শ হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই।

সাংস্কৃতিক ঐক্য

ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ এই বিভেদের মধ্যে ঐক্যের সাধনা করিয়া আসিয়াছে। জীবে দয়া, অহিংসা, জন্মান্তরবাদ, কর্ম্মফল প্রভৃতি দার্শনিক ভাবধারা কমবেশী ভারতের সকল ধর্ম্মেরই অন্তর্গত বস্তু। ভারতবর্ষের মানস শক্তির আশ্চর্য গ্রহণশীলতা বহিরাগত সকল ধর্ম্মীয় মতবাদকে স্বাঙ্গীভূত করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে। 'শক-হুণ দল পাঠান-মোগল একদেহে হল লীন'—ইহা শুধু কবির কল্পনা-বিলাস নহে, প্রকৃতই এই আদর্শ ভারতে কার্য্যে রূপান্তরিত হইয়াছিল। এমন কি পরধর্ম্মস্পর্শকাতর ইসলামকে ভারতবর্ষ সাদরে গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করে নাই। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মবিরোধী বুদ্ধদেবকেও কালক্রমে হিন্দুরা দশাবতারের অন্যতমরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণযোগ্য—"ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্ম্মাণ করিয়া আসিয়াছে—সে কাহাকে বহিষ্কৃত করে নাই, অসঙ্গত বলিয়া সে কিছুই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে"।

প্রশ্নোত্তর

1. How geographical features determine the history of a country and the nature of the people ?

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য কিভাবে দেশের ইতিহাস ও জনসাধারণের চরিত্র নিরূপণে সাহায্য করে তাহা প্রমাণ কর।

উত্তর সূত্র: (১) **ভূমিকা:** ইতিহাসের দুইটি প্রধান উপাদান—মানুষ ও তাহার পরিবেশ, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ভৌগোলিক প্রভৃতি পরিবেশের মাধ্যমে দেশের ও দেশবাসীর মানস বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। উপরোক্ত পরিবেশগুলির মধ্যে কোনও দেশের ভৌগোলিক গঠন সংস্থান বা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

মানুষকে তাহার স্বভাব গঠনে সর্ব্বাধিক প্রভাবিত করিয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক সংস্থানই মুখ্যতঃ কোনও দেশের ইতিহাস এবং জাতীয় চরিত্র গঠনের নিয়ন্তা। [৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য]। (২) ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য কিভাবে দেশের ইতিহাস বা জাতীয় স্বভাব চরিত্র গঠনের সাহায্য করে তাহার দৃষ্টান্ত—গ্রীস, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ সম্বন্ধে আলোচনা। [৯-১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

2. Describe the geographical features of India and their influence upon the history of the country.

ভারতের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাসের উপর তাহার প্রভাব বর্ণনা কর।

উত্তর-সূত্র ঃ (১) ভূমিকা—ভৌগোলিক অবয়ব-সংস্থানই প্রধানতঃ সকল দেশের ইতিহাসের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এই মৌলিক নীতি প্রযোজ্য।

(২) ভারতের ভৌগোলিক পরিচয় ও তাহার গুরুত্ব প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারা চতুর্দ্দিক হইতে সুরক্ষিত, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য অনুযায়ী পাঁচটি পৃথক অংশে বিভক্ত কিন্তু মোটামুটি আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য এই দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। (ক) হিমালয়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব, খ) বিন্ধ্যাপর্ব্বতের গুরুত্ব—আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যে পার্থক্য। (গ) ভারত মহাসাগরের গুরুত্ব—বহির্ভারতের সঙ্গে সংযোগ-সূত্র। [পৃঃ ১০—১৬ দ্রষ্টব্য]।

3. Discuss the religion, language and various other Characteristics of the people of India.

ভারতবাসীর ধর্ম্ম, ভাষা এবং অপরাপর বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোচনা কর। [পৃঃ ২২—২৭ দ্রষ্টব্য]

4. Explain the remark—"Unity in diversity is the special feature of the history of India."

'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য—ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের তাৎপর্য্য'—এই উক্তি সপ্রমাণ কর।

উত্তর-সূত্র ঃ (১) **ভূমিকা**—বৈচিত্র্য ভারতবর্ষের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য। এই বৈচিত্র্যজাতি, ভাষা, ধর্ম্ম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, নৃতত্ত্ব ও বিভিন্ন সংস্কৃতি-সমবায়ের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট। কিন্তু, এই বৈচিত্র্যবহুলতার মধ্যে আভ্যন্তরীণ মৌলিক ঐক্য রহিয়াছে।

(২) **বৈচিত্র্য**—(ক) ভাষা বৈচিত্র্য ঃ সংস্কৃত ও সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত প্রাদেশিক

ভাষাসমূহ—দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষা—আরবী, ফার্সী ও উর্দু—পাশ্চাত্য ভাষাসমূহের শব্দ সম্ভার ; কমবেশী দুইশত পঁচিশটি ভাষা প্রচলিত।

(খ) ধর্ম্মবৈচিত্র্য : হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, জরথুস্ত্র-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম।

(গ) প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য : (ঘ) রীতি-নীতির বৈচিত্র্য :

(৩) **আভ্যন্তরীণ মৌলিক ঐক্য**—(ক) মূলতঃ আর্যাবর্ত্তের সকল ভাষাই সংস্কৃতভাষাশ্রয়ী (খ) ধর্ম্মের ক্ষেত্রে ঐক্য—সকল হিন্দু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী—বেদ, পুরাণ, স্মৃতি-পবিত্র গ্রন্থ—রামায়ণ ও মহাভারতের চরিত্রাবলী নৈতিক আদর্শরূপে অনুসৃত—ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্র ও পুণ্যতোয়া নদীসমূহ ভারতের সর্ব্বত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—।

(গ) রাজনৈতিক ঐক্যের ভাবাদর্শ—অর্থশাস্ত্র বা ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের আদর্শ চিরকালই অখণ্ড ভারতের আদর্শ ছিল—এই আদর্শ কচিৎ বাস্তবে রূপায়িত হইলেও ভারতবর্ষের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নরপতিও এই মহান আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই—স্বনামের পূর্ব্বে 'আসমুদ্রক্ষিতীশানাং অধীশ্বর' এই বিশেষণ প্রয়োগ করিতে বিরত হন নাই।

(ঘ) রীতি-নীতির এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য—জীবে দয়া, অহিংসা, জন্মান্তরবাদ, কর্ম্মফল প্রভৃতি দার্শনিক মতবাদ কম বেশী ভারতের সকল ধর্ম্মের মূল কথা—বহিরাগত সকল ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি ভারত স্বাঙ্গীভূত করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছে।

(৪) **উপসংহার**—রবীন্দ্রনাথের উক্তি—"ঐক্যমূলক যে সভ্যতা……স্বীকার করিয়াছে (পৃঃ ২৭)।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপাদান

পাঠসূচী ঃ ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপাদানসমূহ।

(ক) প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান—মহেঞ্জোদড়ো, নালন্দা, সাঁচি প্রভৃতি স্থানে খননকার্য্যের ফলে চিত্তাকর্ষক আবিষ্কার।

(খ) বিস্মৃত লিপিসমূহের পাঠোদ্ধার—মনীষি প্রিন্সেপ কর্তৃক অশোকের শিলালিপির পাঠোদ্ধার।

(গ) ইতিহাসের অন্যতম উপাদান মুদ্রার গুরুত্ব—ভারতীয় ইতিহাসের বিবিধ দৃষ্টান্ত।

(ঘ) প্রশস্তিসমূহ—ভারতীয় ইতিহাসের উপাদানরূপে ইহার গুরুত্ব।

(ঙ) লিখিত উপাদানের গুরুত্ব—প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের ভারতীয় ইতিহাসে লিখিত উপাদানের গুরুত্ব।

সাধারণ বিশ্লেষণ ঃ—ভারতবর্ষের ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জী সঠিকভাবে নির্ণয় ও লিপিবদ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধা রহিয়াছে। হিন্দুযুগের ইতিহাস রচনায় এই অসুবিধা সর্ব্বাধিক। এই যুগের ইতিহাসের লিপিবদ্ধ উপাদানের অভাব প্রতি পদে উপলব্ধি করা যায়। ইহার যথেষ্ট কারণ আছে। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত রীতিতে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার মনোবৃত্তি হিন্দুদের ছিল না। প্রাচীন যুগের হিন্দুগণ যে সমকালীন ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা সম্বন্ধে খুব উদাসীন ছিলেন তাহা নহে, বরঞ্চ প্রকৃত ঘটনা তাহার বিপরীত। হিন্দু নরপতিগণের অধিকাংশই বিদ্বান সভাকবিকে আশ্রয় ও উৎসাহ দিতেন। এই সকল রাজানুগ্রহ-পুষ্ট সভাকবি তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক রাজাদের কীর্তিকাহিনী রচনা করিতেন। এই সকল কীর্তি-রচনা প্রশস্তি নামে পরিচিত। কিন্তু অসুবিধার কথা—এই সকল প্রশস্তি কালের প্রকোপে অধিকাংশই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে যাহাও পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে উপমা ও অলঙ্কারের আতিশয্য এত বেশী যে তাহা হইতে ইতিহাসের উপাদান উদ্ধার করা অতি দুরূহ ব্যাপার। সভাকবিদের বর্ণনা ইতিহাসের পরিবর্তে কাব্য হইয়া দাঁড়াইত এবং অতিরঞ্জন দোষে পরিপূর্ণ থাকিত। অতি ক্ষুদ্র সামন্ত নরপতিও সভাকবির কবিত্বশক্তির বলে 'আসমুদ্রক্ষিতীশ' হইয়া দাঁড়াইত। ইতিবৃত্ত বর্ণনের উদ্দেশ্যসমূহ লইয়াই পুরাণ রচিত

হইয়াছে এবং এই পুরাণ সমূহের কয়েকটি হিন্দুযুগের ইতিহাস নির্ণয়ে অত্যাবশ্যক। কিন্তু পুরাণ সমূহের মধ্যে কাব্যদোষ প্রবেশ করিয়া ইতিহাসের উপাদানের অপরিহার্য্যতা হ্রাস করিয়াছে। উপরন্তু এই সকল পুরাণবর্ণিত কাহিনী রচিত হইবার বহু পূর্ব্বেই বাস্তবে সংঘটিত হইয়াছে। ফলে লোকমুখে শতাব্দী পরম্পরায় আগত হওয়ার ফলে বহু অবান্তর ঘটনা ও প্রমাদ এই সমস্ত রচনার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হওয়ার সুযোগ ঘটিয়াছে। হিন্দুযুগের বহু কবি ও সাহিত্যিক ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনী অবলম্বন করিয়া সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। এই সব জীবনী হইতে ঐতিহাসিক সত্য নির্দ্ধারণ করিতে হয়। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' বিহ্লন-রচিত চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের 'বিক্রমাঙ্ক চরিত' ও সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' যথাক্রমে হর্ষবর্দ্ধন, চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য এবং পালরাজ রামপাল ও পালবংশের ইতিহাস সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করে। এতদ্ব্যতীত ঐতিহাসিকগুণসম্পন্ন গ্রন্থরূপে বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস', বাক্‌পতিরাজের 'গৌড়বহো' বা কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিণী', ইতিহাস রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করে। বলা বাহুল্য এই সব গ্রন্থ ইতিহাস নহে—কাব্যরসাশ্রয়ী জীবনচরিত মাত্র এবং সব গ্রন্থই কমবেশী অতিরঞ্জনদুষ্ট। ইহাদের মধ্যে ঐতিহাসিক গুণসমৃদ্ধ গ্রন্থ বলিতে গেলে একমাত্র কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিণী'কেই বলা যাইতে পারে। কাশ্মীরের ইতিহাস রচনা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প কহ্লন লেখনী ধারণপূর্ব্বক আধুনিক ঐতিহাসিকদের ন্যায় যথাসম্ভব সাক্ষ্যপ্রমাণাদি সংগ্রহ ও বিচার করিয়া প্রকৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দুযুগের ইতিহাসের এই সকল উপাদান ব্যতীত ঐতিহাসিকগণকে সমকালে রচিত কাব্য, দর্শন, নাটক, জ্যোতিষ এমন কি ব্যাকরণ ও অভিধান হইতেও প্রয়োজনীয় উপাদান তিল তিল করিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।

গ্রীক, রোমক, চৈনিক, তিব্বতীয় ও মুসলিম লেখক ও পর্য্যটকদের রচনাও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অন্যতম উপকরণ হিসাবে অপরিহার্য্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের কাহিনী ও সঠিক সময় ইহাদের সাক্ষ্যপ্রমাণ হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের তারিখ অবগত হওয়ার ফলে হিন্দুযুগের বিভিন্ন তারিখ নির্দ্ধারণের সুবিধা হইয়াছে।

ইতিহাসের উপাদানের পক্ষে লিখিত প্রমাণই পর্য্যাপ্ত নহে। অনেক ক্ষেত্রে উপাদানের জন্য 'ট্রাডিশান' বা জনশ্রুতি ও লোকাচারের আশ্রয় গ্রহণ পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত হিন্দুযুগের বিভিন্ন নরপতিদের দ্বারা লিপিবদ্ধ পর্ব্বতলিপি, স্তম্ভলিপি, তাম্র-পট্টোলী, মুদ্রা এই যুগের ইতিহাসের অন্যতম নির্ভরযোগ্য উপাদান। উক্ত লিপি

বা অনুশাসনের সংশ্লিষ্ট সমসাময়িক রাজবৃত্ত ব্যতীত এই রাজন্যদের সংক্ষিপ্ত বংশপরিচয়ও থাকিত। এই জন্য বহু রাজবংশের সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহে সুবিধা হইয়াছে। এই সকল শাসনলিপিতে প্রাসঙ্গিক ভাবে সমকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক বা ধর্মনৈতিক অবস্থার কথা থাকিত। হিন্দুযুগের সমাজ, ধর্ম্ম বা অর্থনীতি জানিবার পক্ষে ইহারা কম সহায়ক নহে।

উপরোক্ত উপাদান সমূহ বর্ত্তমান থাকিলেও ইহাদের সাহায্যে ইতিহাস রচনা সহজসাধ্য নহে। তাহার কারণ—প্রথমতঃ, প্রাচীন লেখকগণ অনেক সময় জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিতেন বলিয়া তাঁহাদের রচনায় ভুল তথ্য থাকিবার অবকাশ ছিল। দ্বিতীয়তঃ, বহু লেখকগণ রচনার মধ্যে নিরপেক্ষ মনোভাবের পরিচয় দিতে পারিতেন না। তাঁহারা স্ব স্ব সমাজ, ধর্ম্ম ও পৃষ্ঠপোষকদের সমর্থনে এমন সমস্ত মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিতেন যাহা কোন মতেই ইতিহাসগ্রাহ্য বলা চলে না। তৃতীয়তঃ, বৈদেশিক পর্যটকগণের অনেকেই এদেশের ভাষা, ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন না করিয়াই নিজেদের অজ্ঞাতসারেই বহু প্রমাদ-মূলক তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। চতুর্থতঃ, বর্ত্তমান কালের মত কোন একটা বিশেষ অব্দ ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত না থাকায় হিন্দু রাজবংশ সমূহের পারম্পর্য্য, সন বা তারিখ নির্দ্দেশ করায় যথেষ্ট অসুবিধা রহিয়াছে। গুপ্তাব্দ, শকাব্দ, বিক্রমাব্দ প্রভৃতি বহু অব্দ প্রচলিত থাকিলেও শিলালিপিতে বা তাম্রশাসনে, ইহাদের উল্লেখ থাকিত না। 'নরপতি ··রাজত্বের অষ্টম বর্ষে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন'—এই জাতীয় লেখাই লিপিতে থাকিত। সংশ্লিষ্ট নরপতি কোন তারিখে সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন তাহার খবর না থাকায় তাঁহার রাজত্বকাল বা রাজত্বের সন-তারিখ নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। অগত্যা পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অতি সন্তর্পণে হিন্দুযুগের রাজবংশ পরম্পরা বা রাজত্বকালের প্রধান প্রধান ঘটনার সময় নির্দ্দিষ্ট করিতে হইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রাচীন যুগের যথেষ্ট উপাদান থাকিলেও ইতিহাস রচয়িতাকে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে হইবে। উপাদান সমূহের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা পরিহার করিয়া বিশ্লেষণাত্মক বুদ্ধির সাহায্যে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করিতে হইবে। এখন পর্য্যন্ত উপস্থিত ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রমাণাদি পর্য্যাপ্ত নহে। অতএব বর্ত্তমানে যে সমস্ত ইতিহাস রচিত হইয়াছে তাহা নির্ভুল বা সঠিক হওয়া সম্ভবপর নহে। ভবিষ্যতে নূতন কোন প্রমাণ আবিষ্কৃত হইলে বর্ত্তমানে নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইতে হইবে। এই ত্রুটির জন্যই অধিকাংশ তারিখ বা অব্দ আনুমানিক বলিয়া ঐতিহাসিকগণ ধরিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক মোটামুটি এই তিনটি যুগে বিভক্ত। প্রত্যেক যুগের জন্যই বিভিন্ন রকমের ঐতিহাসিক উপাদান আছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও উপাদানের কাহিনীঃ—লিখিত বিবরণী ব্যতীত প্রাচীন মন্দির, মঠ, বিহার, স্তূপ, দুর্গ, নগর প্রভৃতির স্থাপত্য নিদর্শন এবং প্রাচীন স্থান
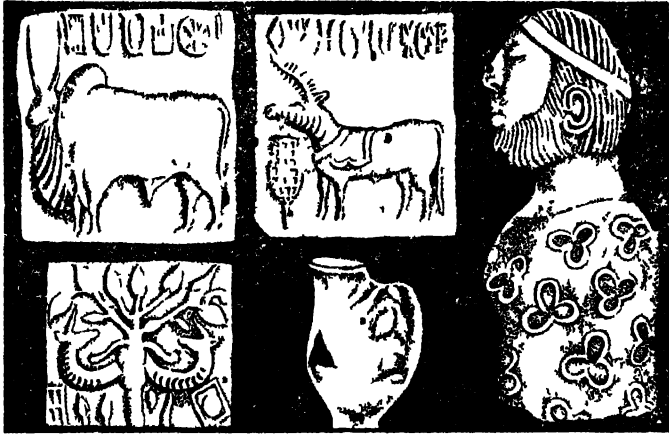
সিন্ধু সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান

ও তাহাদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ইতিহাসের বহু অলিখিত বা অর্দ্ধলিখিত অমূল্য উপাদান রহিয়াছে।

ভারতবর্ষের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ইতিহাস কৌতুকপ্রদ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে যে সকল বৃটিশ রাজপুরুষ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই ভারতের ভাষা, ধর্ম্ম, সংস্কৃতি বা প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে কোন আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। সৌভাগ্যবশতঃ স্যার উইলিয়ম জোন্স্ নামক একজন কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ভারতবর্ষের ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং এই সুধী ভারতপ্রেমিকের উদ্যোগে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করার জন্য ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। স্যার উইলিয়ম জোন্স্ স্বয়ং কালিদাসের 'শকুন্তলা' ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য ভাণ্ডারের প্রতি পাশ্চাত্য দেশের

পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারের সূচনা

দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ক্রমশঃ অসংখ্য অনুসন্ধিৎসু ইংরেজ রাজপুরুষের আগ্রহে ও উদ্যোগে নূতন নূতন আবিষ্কারের সূত্রপাত হয়। ডাঃ হ্যামিল্টন বুকানন নামে জনৈক ইংরেজ কর্মচারী মহীশূর, বিহার, উত্তরবঙ্গ, ও আসাম ইত্যাদি স্থান পরিদর্শন করিয়া এই সব স্থানের বহু প্রাচীন কালের নিদর্শন সম্বলিত বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। ক্রমে পশ্চিম ভারতের শিল্পপীঠ অজন্তা, ইলোরা, এলিফেন্টা প্রভৃতি স্থান আবিষ্কৃত হয়।

ব্রাহ্মী অক্ষরে রচিত প্রাচীন শিলালিপির পাঠোদ্ধারের কাহিনীও কৌতূহলোদ্দীপক। এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী জেমস্ প্রিন্সেপ সাহেবের নিরলস সাধনায়
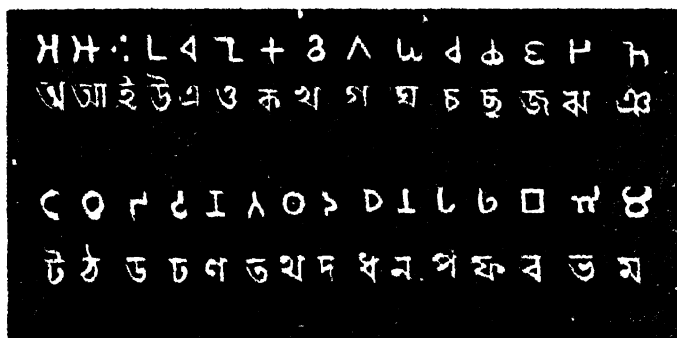
জেমস্ প্রিন্সেপ-পঠিত অশোকের সময়ের ব্রাহ্মী-লিপির নমুনা

ফলে ব্রাহ্মী বর্ণমালার পাঠ সম্ভব হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সাঁচি স্তূপের অন্তর্ভুক্ত একই প্রকারের কয়েকটি অক্ষর লক্ষ্য করিতে করিতে প্রিন্সেপ সাহেব প্রথমে দ ও ন এই দুইটি অক্ষর আবিষ্কার করেন। এই দুইটি অক্ষরকে মূলধন করিয়া বহু চেষ্টার পর প্রিন্সেপ অশোকের কয়েকটি শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হন। এই সমস্ত লিপির ভাষা ছিল সংস্কৃত, অক্ষর ছিল ব্রাহ্মী। ইহার কয়েক বৎসর পরে খরোষ্ঠী অক্ষরে রচিত লিপি সমূহেরও পাঠোদ্ধার সম্ভবপর হয়। অতঃপর প্রাচীন লিপিমালার পাঠোদ্ধার কার্যে ব্রতী বহু প্রত্নতাত্ত্বিকের চেষ্টার ফলে ভারতীয় ইতিহাসের অসংখ্য অজ্ঞাত অধ্যায়ের আবরণ উন্মোচিত হয়।

ব্রাহ্মী অক্ষরের পাঠোদ্ধার

অতঃপর জেনারেল ক্যানিংহাম ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সরকারী প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল নির্বাচিত হন। ক্যানিংহামের চেষ্টায় বুদ্ধগয়া, বারহুত, তক্ষশিলা,

সারনাথ, সাঁচি প্রভৃতি প্রাচীন স্থান ও নগর খোদিত ও আবিষ্কৃত হয়। এই সকল স্থান আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন ভারতের বহু অজ্ঞাত ইতিহাসের লুপ্তোদ্ধার হইল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের লর্ড কার্জন পুরাতাত্ত্বিক স্থান ও দ্রব্যাদির অনুসন্ধান ও সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় পুরাতাত্ত্বিক বিভাগের প্রবর্তন করেন। এই নূতন বিভাগের প্রধান পরিচালক স্যার জন মার্শালের উদ্যোগে প্রাচীন ভারতের খ্যাতনামা অধুনাবিলুপ্ত সারনাথ, কুশীনগর, শ্রাবস্তী, পুষ্কলাবতী, বৈশালী, রাজগীর, নালন্দা, পাটলীপুত্র প্রভৃতি নগরের খননকার্য্য ও আবিষ্কারাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই সকল খননকার্য্যের ফলে নূতন নূতন ঐতিহাসিক তথ্যভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মগধের রাজধানী রাজগীরের (রাজগৃহ) খননকার্য্য আরম্ভ হয়। এই স্থানের আবিষ্কৃত শিল্প ও স্থাপত্য নিদর্শনসমূহ বৌদ্ধযুগের উপর এক নূতন আলোকপাত করিয়াছে।

নালন্দার আবিষ্কার

১৯২২ খৃষ্টাব্দে স্যার জন মার্শালের অধিনায়কত্বে বাঙ্গালী প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধুদেশে মহেঞ্জোদড়ো ও পাঞ্জাবের হরপ্পা নামক স্থানে কয়েকটি পুরাতন নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। এই দুইটি স্থান আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে ভারতের সভ্যতা যে পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন তাহা প্রমাণিত হইয়াছে এবং এই যুগের সভ্যতা যে প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন ও চীন দেশের সমকক্ষ ছিল এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই স্থানে বিকশিত সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতা নামে পরিচিত। এখানে প্রাপ্ত শীলমোহরে খোদিত লিপির পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়া যে সকল মনস্বী ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন তন্মধ্যে জেনারেল ক্যানিংহাম, স্যার জন মার্শাল, জেমস প্রিন্সেস, স্যার অরেল ষ্টেইন, মার্টিমার হুইলার প্রভৃতি বিদেশী এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দয়ারাম সাহনী, ননীগোপাল মজুমদার, কে. এন. দীক্ষিত প্রভৃতি ভারতীয়গণের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা

প্রাচীন যুগের ইতিহাসের উপাদানসমূহ

১। সাহিত্যগত উপাদান—এই শ্রেণীর গ্রন্থ-নিবদ্ধ উপাদান সমূহকে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

(ক) **হিন্দুধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট** :—এই সব উপাদানের মধ্যে ঋগ্বেদ ও অপর তিন বেদ,

রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণগ্রন্থাবলী, পাতঞ্জল মহাভাষ্য, গার্গী-সংহিতা, ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তা', বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নাটক ও দাক্ষিণাত্যের তামিল কাব্যসমূহের নাম উল্লেখযোগ্য।

উপরোক্ত উপাদানের সাহায্যে প্রাচীন যুগের সঠিক রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা অবগত হওয়া সম্ভবপর না হইলেও, ইহারা সমসাময়িক সামাজিক ও শাসনসংক্রান্ত বিষয়ের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। মৎস্য, বিষ্ণু ও বায়ুপুরাণে হিন্দুযুগের বিভিন্ন রাজবংশের তালিকা, বিভিন্ন নরপতির সময়কাল ও প্রধান ঘটনাসমূহের উল্লেখ রহিয়াছে। পুরাণগ্রন্থসমূহ সমকালীন রচনা নহে—লোকস্মৃতি হইতে আহৃত উপাদানের দ্বারা গ্রন্থাকারে রচিত কাহিনী মাত্র। তথাপি প্রাচীন যুগের বিভিন্ন ঘটনা বা সময় নির্ণয়ে ইহাদের উপাদান-মূল্য যথেষ্ট। পুরাণগ্রন্থসমূহের প্রধান ত্রুটি—অতিরঞ্জন, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ও অলৌকিক ঘটনার প্রাবল্য। অপরাপর প্রমাণাদির সাহায্যে ইহাদের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে।

(খ) **বৌদ্ধধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট :**—বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ 'ত্রিপিটক' (বিনয়, অভিধর্ম্ম ও সূত্র) ও নিকায় সমূহ, জাতক গ্রন্থাবলী, সিংহলী ইতিবৃত্তদ্বয় মহাবংশ ও দীপবংশ, আর্য্যমঞ্জুশ্রী-মূলকল্প প্রভৃতি।

বৌদ্ধগ্রন্থসমূহের বর্ণনার সঙ্গে পুরাণাদিতে বর্ণিত ঘটনার বিরোধিতা রহিয়াছে এবং বহু ঐতিহাসিক পুরাণের সাক্ষ্যকে বেশী নির্ভরযোগ্য মনে করেন। আবার অনেকে পুরাণ অপেক্ষা সিংহলী ইতিবৃত্তদ্বয়কে অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করেন।

(গ) **জৈনধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট :**—গুজরাটের জৈন ইতিবৃত্ত, জৈন-সূত্র, হেমচন্দ্র রচিত 'পরিশিষ্ট পর্ব্ব' ইত্যাদি গ্রন্থ। পরবর্ত্তী কালে রচিত হইলেও হিন্দুযুগের ইতিহাসের বহু স্থলে জটিল গ্রন্থিমোচনে ইহাদের সাহায্য অপরিহার্য্য।

(ঘ) **ইতিহাস গ্রন্থ :**—কাশ্মীরী ঐতিহাসিক কহ্লন রচিত কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত 'রাজতরঙ্গিণী', হর্ষবর্দ্ধনের সভাকবি বাণভট্ট রচিত 'হর্ষ-চরিত', বিহ্লন রচিত 'বিক্রমাঙ্ক চরিত', সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রাম-চরিত', রাজস্থানের চারণগাথা প্রভৃতি অবলম্বনে টড রচিত 'রাজস্থানের ইতিকথা'।

এই সকল গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট রহিয়াছে। তবে এই সকল রচনার ত্রুটিমূলক একটা দিক আছে। সাধারণতঃ রাজপ্রসাদপুষ্ট সভাকবিদের দ্বারা রচিত বলিয়া এই সকল রচনায় ইহাদের পৃষ্ঠপোষক নরপতিদের যুদ্ধে পরাজয়ের বার্ত্তা বা গ্লানিকর ঘটনা বর্ণিত হইতে পারে নাই। এই একদেশদর্শিতা হইতে কোন গ্রন্থই মুক্ত নহে।

(ঙ) **বিদেশীয়দের দ্বারা বর্ণিত বৃত্তান্ত সমূহ :**—এই সকল বৃত্তান্ত প্রথমতঃ যাঁহারা স্বয়ং ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন—যথা, আলেকজাণ্ডারের সহযাত্রী সেনানীমণ্ডলী, মেগাস্থিনিস. 'পেরিপ্লাস অফ্ দি ইরিথ্রিয়ান সী' পুস্তকের অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার, টলেমী, ফাহিয়েন, ইৎসিং, হিউয়েনসাং ইত্যাদি।

মুসলমানগণ কর্তৃক ভারত-জয়ের কাহিনী মুসলমানদের রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ-সমূহে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। আলবেরুণী প্রমুখ মুসলিম পর্যটকগণ হিন্দুযুগের অবসান কালের ভারতবর্ষের ইতিহাস তথা হিন্দুদের সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু মূল্যবান জ্ঞাতব্য বিষয়ের সঙ্কলনে সাহায্য করিয়াছেন। মুসলিম ঐতিহাসিকগণের মধ্যে আলবেরুণী, সুলেমান, অলমাসুদি, হাসান নিজামী এবং ইবন-উল্-অথিরের নাম উল্লেখযোগ্য।

২। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান—

(ক) **খননের ফলে আবিষ্কৃত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ :—**

খননাদির দ্বারা আবিষ্কৃত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের পর্য্যবেক্ষণের ফলে বহু ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করার সুবিধা হইয়াছে। এই নবাবিষ্কৃত স্থানসমূহ যেমন বহু রাজবংশের অবস্থান বা পৌর্বাপর্য্য স্থির করার ব্যাপারে সহায়ক, তদ্রূপ এই সকল স্থানের স্থাপত্য, শিল্পকলা ইত্যাদির নমুনা প্রাপ্ত হওয়াতে সভ্যতার স্তর নির্ণয় করার কাজ সহজসাধ্য হইয়াছে। সিন্ধুদেশে ও পাঞ্জাবে খনন করার ফলে ভারতের প্রাক্-বৈদিক যুগের এক সমৃদ্ধ ইতিহাস আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। সাঁচি, সারনাথ, রাজগীর, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, গৌড় ইত্যাদি স্থান খনিত হওয়ার ফলে বহু ঐতিহাসিক জটিলতা সরল হইতে পারিয়াছে।

(খ) **লিপিমালা বা অনুশাসন সমূহ :**—লিপিমালা হিন্দুযুগের ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য মূল্যবান উপাদান। এই লিপি সাধারণতঃ পর্ব্বতগাত্রে, স্তম্ভগাত্রে অথবা তাম্রফলকে উৎকীর্ণ করা হইত। পর্ব্বতগাত্রে বা স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ লিপিসমূহে সাধারণতঃ স্মরণীয় বিষয় বা ঘটনা এবং তাম্রফলকে সাধারণতঃ কোন দান বা উৎসর্গ বিষয়ক ঘটনা লিপিবদ্ধ হইত। এই সমস্ত লিপিতে কাব্যশক্তি প্রকাশের যথেষ্ট আয়োজন থাকিলেও ঘটনাবিশেষকে উপলক্ষ্য করিয়া রচিত হওয়ায় তারিখাদি নির্ণয়ে ইহারা অপরিহার্য্য উপাদান। যথেষ্ট অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিলে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম্মীয় এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধেও অনেক প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ঐ সূত্র হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। শিলালিপিতে ব্যবহৃত

ভাষার মধ্যে সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম ইত্যাদি। বাম হইতে দক্ষিণে লেখা ব্রাহ্মী অক্ষরই সচরাচর শিলালিপিতে ব্যবহৃত হইত,—তবে দক্ষিণ হইতে বামে লেখা খরোষ্ঠীলিপির ব্যবহার বিরল ছিল না। সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপিগুলির মধ্যে গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের কীর্ত্তিমূলক এলাহাবাদের স্তম্ভগাত্রে খোদিত হরিষেন প্রশস্তি বা শকনরপতি রুদ্রদামনের জুনাগড় পর্ব্বতে উৎকীর্ণ লিপির সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের বাহিরে প্রাপ্ত কয়েকটি অনুশাসনে ভারতের ইতিহাসের উল্লেখ রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এশিয়া মাইনরে প্রাপ্ত 'বোঘাজ-কুই' শিলালিপির কথা উল্লেখ করা যায়। এই শিলালিপি বৈদিক আর্য্যগণের ইতিহাস সঙ্কলনে পরোক্ষতঃ আলোকপাত করে। পারস্যরাজ দরায়ুসের বাহিস্তান লিপি (খ্রীঃ পূঃ ৫.৯), পারস্যের অন্যতম রাজধানী পার্সিপোলিস-এর প্রাসাদে উৎকীর্ণ লিপি, নক্স্-ই-রুস্তম লিপি ও হামাদান লিপি প্রাচীন ভারত ও পারস্যের মধ্যে সংযোগের মূল্যবান সংবাদ প্রদান করে।

(গ) **মুদ্রাসমূহ**:—প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অন্য একটি মূল্যবান উপাদান সেকালের রাজাদের প্রচারিত মুদ্রা। এই সকল মুদ্রা পার্থিয়ান, বাহ্লীক, গ্রীক, শকক্ষত্রপ ও গুপ্ত রাজাদের ইতিহাস সম্বন্ধে অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান। মুদ্রায় উৎকীর্ণ লিপির দ্বারা রাজাদের নাম, সময় নির্ণীত হয়, মুদ্রাপ্রাপ্তির স্থান সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট রাজার অধিকারভুক্ত অঞ্চল বলিয়া গৃহীত হয় এবং মুদ্রার ওজন বা উৎকর্ষাপকর্ষ সেই মুদ্রাধিপতি নরপতির প্রকৃত-শক্তিসামর্থ্য নির্ণয়ে সাহায্য করে। মুদ্রার সাহায্যে সমসাময়িক যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা, সৌন্দর্য্যবোধ, ধাতুশিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তথ্যপূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মুদ্রার সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন দেশের বা রাজ্যের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তাহা অনুমান করা যায়। কুষাণ রাজাদের মুদ্রার সহিত রোমক মুদ্রার সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া অনুমান করা যায় যে ভারতীয় কুষাণ নরপতিদের সহিত রোমান সাম্রাজ্যের সংযোগ বর্ত্তমান ছিল। বাহ্লীক-গ্রীক রাজাদের সম্বন্ধে যে জ্ঞান হইয়াছে তাহা মাত্র মুদ্রার সাহায্যেই হইয়াছে। সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রায় তাঁহার বীণাবাদনরত মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকায় সমুদ্রগুপ্তের যে সঙ্গীতে অনুরাগ ছিল, স্কন্দগুপ্তের মুদ্রাসমূহ পূর্ব্ববর্ত্তী রাজত্বকাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট হওয়ায় অনুমান করা যায় যে তাঁহার রাজত্বকালে দেশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে হূণ আক্রমণের ফলেই স্কন্দগুপ্তের সময়ে দেশের দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। মোটকথা প্রাচীনকালের ইতিহাস রচনায় মুদ্রাগুলি যে অসামান্য সাহায্য করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদানঃ ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান লইয়া হিন্দুযুগের মত অত সমস্যা নাই। উপাদান অসংখ্য এবং তাহাদের জটিলতাও অপেক্ষাকৃত কম। মধ্যযুগের উপাদানের মধ্যে সরকারী দলিলপত্র, সমকালীন ঐতিহাসিকদের গ্রন্থ, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ এবং মুদ্রা ও স্থাপত্যনিদর্শন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(১) **সরকারী দলিলপত্রঃ**—সরকারী 'ফরমান বা নির্দেশ, রাজকর্মচারী-নিয়োগপত্র, চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, রাজস্বসংক্রান্ত দলিলপত্র, মধ্যযুগের ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান। এই সকল উপাদানের অধিকাংশই কালের প্রকোপে বিনষ্ট হইয়াছে এবং ইহাদের কিছু সংখ্যক এখনও প্রাক্তন দেশীয় নরপতিদের দরবারে বর্তমান আছে।

(২) **সমকালীন ঐতিহাসিকদের গ্রন্থঃ**—মধ্যযুগে বহু মুসলমান লেখক তাঁহাদের রচনার মধ্যে এই যুগের যথেষ্ট ঐতিহাসিক উপাদান রাখিয়া গিয়াছেন। তুর্কি আফগান যুগের উল্লেখযোগ্য উপাদান মিনহাজউদ্দীন সিরাজের 'তাবাকাৎ-ই-নাসিরী'। জিয়াউদ্দীন বারণী-র 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী', মির্জা হায়দার রচিত 'তারিখ-ই-রসিদী' গ্রন্থে বাবরের ইতিবৃত্ত, শেরওয়ানী প্রণীত 'তারিখ-ই-শেরশাহী' গ্রন্থে শের শাহের বৃত্তান্ত, আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবরনামা' গ্রন্থদ্বয়ে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের বিবরণ পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বদায়ুনীর 'মুনতাখাব উৎ-তাওয়ারিখ', মুতামিদ খানের 'ইকবাল-নামা-ই জাহাঙ্গিরী', ফেরিস্তার 'তারিখ-ই-হিন্দুস্তান', আবদুল হামিদ লাহোরীর 'পাতশাহনামা', কাফি খাঁ-র 'মুনতাখাব-উল-লবাব' আওরঙ্গজেবের ইতিহাস সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য উপাদান।

সরকারী ও বেসরকারী গ্রন্থ

এতদ্ব্যতীত কয়েকটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে মধ্যযুগের উপাদান যথেষ্ট পাওয়া যায়। তৈমুর, বাবর, জাহাঙ্গীর ও হুমায়ুনের আত্মজীবনী, ভগ্নী গুলবদনের হুমায়ুননামা সমসাময়িক ইতিহাসের উপাদান-রূপে অমূল্য।

জীবনী গ্রন্থ

মধ্যযুগের বহু হিন্দুধর্মবেত্তা তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে সমকালীন ইতিহাসের উপাদান রাখিয়া গিয়াছেন। শিখগুরু নানকের 'জপজী' শিখদের ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব', কবীরের 'দোঁহা', মীরাবাঈ-র 'ভজনগীতি', তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস', চৈতন্যদেবের জীবনীসংক্রান্ত গ্রন্থাবলী, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতির সাহায্যে আমরা

সমসাময়িক ধর্মগ্রন্থ

সমসাময়িক সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের সংবাদ অবগত হইতে পারি।

(৩) **বিদেশী পর্য্যটকদের বিবরণী ঃ**—তুর্ক-আফগান ও মুঘল শাসনকালে বহু বিদেশী পর্য্যটক ও ধর্ম্মযাজক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইহাদের রচনা মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসের অন্যতম উপাদান। আফ্রিকার মরক্কো দেশের ইবন-বতুতা, র‍্যাল্‌ফ ফিচ, টেরী, স্যার টমাস রো, টেভার্নিয়ার, বার্নিয়ার, মানুচি প্রমুখ পর্য্যটকগণ এই যুগের জনসাধারণ, ব্যবসা বাণিজ্য, শাসনব্যবস্থা, দরবার ও শিবির জীবনের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক ও প্রচারক মনসারেট ও জেভিয়ারের বিবরণীতে মুঘল সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের ধর্ম্মবিশ্বাস, হিন্দুদের ধর্ম্মীয় ও সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বহু বিবরণ আছে। দক্ষিণ-ভারত সম্বন্ধে নিকোলাই কণ্টি, আবদুর্ রেজ্জাক, আথানাসিয়াস নিকিতিন পর্ত্তুগীজ ভ্রমণকারী পাএস ও নুনীজ প্রভৃতির রচনায় বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

৪) **মুদ্রা ও স্থাপত্য নিদর্শন ঃ**—মধ্যযুগের মুদ্রা, চিত্র, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য নিদর্শন হইতে সমকালীন শিল্পরীতি, ধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য, ধাতুশিল্প সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। দিল্লীর কুতুব মিনার, তোঘলকাবাদের প্রাসাদ, সাসারামে শেরশাহের সমাধি, আলাই দরওয়াজা, তাজমহল, আগ্রা ও দিল্লীর কেল্লা, ফতেপুর সিক্রিতে আকবরের সমাধি, লাহোরের ও কাশ্মীরের উদ্যানাবলী প্রভৃতি মধ্যযুগের শিল্পকর্ম্মের সাক্ষ্য প্রদান করে।

আধুনিক যুগের উপাদান ঃ—আধুনিক যুগের ইতিহাসের উপাদান অজস্র রহিয়াছে এবং এই যুগের ইতিহাসও সবিস্তারে লিখিত হইয়াছে। সরকারী দলিলপত্রে, ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্য-কুঠির দলিলপত্রে ও দেশী ও বিদেশীয়দের বিবরণী গ্রন্থে এই যুগের ইতিহাসের উপাদান নিহিত আছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসে, দিল্লীতে 'ভারতের জাতীয় মহাফেজ খানায়' ও ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজ্যদপ্তরে রক্ষিত আছে। আন্তর্জ্জাতিক সন্ধিপত্র, দলিলপত্রের প্রতিলিপির মধ্যে অসংখ্য ঐতিহাসিক তথ্য রহিয়াছে। ভারতে আগত ইংরেজ, ফরাসী, পর্ত্তুগীজ, ডাচ, দিনেমার প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যকুঠিতে যে সকল চিঠিপত্র ও দলিল দস্তাবেজ পাওয়া গিয়াছে সেগুলির সাহায্যেও বর্ত্তমান কালের ইতিহাস রচনার উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। এতদ্ব্যতীত সমসাময়িক কালের রাজনীতিজ্ঞ, পর্য্যটক, ধর্ম্মপ্রচারক, সেনাপতি, গভর্ণর জেনারেল প্রভৃতির চিঠিপত্র, ডাইরী, আত্মজীবনী, সংবাদপত্র, পার্লামেন্ট মহাসভার আলোচনা গ্রন্থ ও বৃটিশ ও বিচার বিভাগের নথিপত্রের মধ্যে, ফার্সীতে রচিত সিয়ার অল মুতাক্ষরিণ, ডুপ্লে,

জন ষ্টুয়ার্ট মিল, বোল্টস্ প্রভৃতি বিদেশী লেখকদের গ্রন্থের মধ্যে আধুনিক যুগের ইতিহাসের অজস্র উপকরণ রহিয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. What are the different sources of the Ancient Indian history ?

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদান কি কি ?

উত্তর-সূত্র : (১) ভূমিকা—প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের পর্য্যাপ্ত উপাদানের যথেষ্ট অভাব আছে। প্রাচীন যুগের হিন্দুগণ যে সমকালীন ইতিহাস রচনায় উদাসীন ছিলেন তাহা নহে ; প্রকৃত ঘটনা ইহার বিপরীত। কিন্তু নানা কারণে হিন্দু যুগের লিখিত উপকরণ দুর্লভ হইয়াছে। লিখিত' উপাদান ব্যতীত আরও বিভিন্ন প্রকার উপাদানের সাহায্যে প্রাচীন হিন্দু যুগের ইতিহাস রচিত হইয়াছে।

(২) বিভিন্ন প্রকারের উপাদান—

(ক) সাহিত্যগত উপাদান :—হিন্দুধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট, বৌদ্ধধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট, জৈনধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট, ইতিহাস-গ্রন্থ, বিদেশীয়দের দ্বারা বর্ণিত লিপিবদ্ধ বৃত্তান্ত ;

(খ) প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান :—খননের দ্বারা আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক স্থানসমূহ ; লিপিমালা বা অনুশাসনসমূহ ; প্রাচীন মুদ্রা ;

(গ) ট্যাডিশান বা জনস্মৃতি ও লোকাচার :—

(৩) উপসংহার—এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত উপাদানসমূহ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। যথেষ্ট উপকরণের অভাবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস মোটেই সম্পূর্ণ নহে। বহুস্থলে ধারাবাহিকতা বা কার্য্যকারণ নির্ণয় করা দুরূহ। এই জন্যই এই সময়ের ইতিহাসের বহু তথ্য অনুমান নির্ভর এবং নূতন নূতন তথ্যের আবিষ্কারের সঙ্গে পরিবর্ত্তন সাপেক্ষ। তথ্যের অভাবে প্রাক্-মৌর্য্য, মৌর্য্যোত্তর, প্রাক-গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগ এবং আরও বহু সময়ের ইতিহাস অসম্পূর্ণ।

2. Write an essay on the different sources of the Indian history ?

ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদান সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

উত্তর-সূত্র : [৩৫—৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

3. What are the sources of the medieval and modern period of history of India

ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় মধ্যযুগের ও আধুনিক যুগের উপাদানগুলির বিবরণ দাও।

উত্তর সূত্র : (১) ভূমিকা :—ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্য ও আধুনিক যুগের ইতিহাসের উপাদান সম্বন্ধে হিন্দুযুগের মত সমস্যা নাই। এই দুই যুগের উপাদান অজস্র এবং জটিলতা কণ্টকিত নহে।

(২) মধ্যযুগের উপাদান :—

(ক) সরকারী দলিলপত্র :—(খ) সমকালীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ : সরকারী ও বে-সরকারী গ্রন্থ : জীবনীগ্রন্থ : সমসাময়িক ধর্মগ্রন্থ। (গ) বিদেশী পর্য্যটকদের বিবরণী। (ঘ) মুদ্রা ও স্থাপত্য-নিদর্শন।

(৩) আধুনিক যুগের উপাদান :—সরকারী দলিল পত্র : ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্য কুঠির দলিলপত্র : দেশী-বিদেশীয়দের বিবরণী গ্রন্থ। [৩৯—৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

চতুর্থ অধ্যায়

সিন্ধু-সভ্যতা

Syllabus : Indus Valley Civilization (with some reference to other contemporaneous civilizations.)

পাঠ্যসূচী :—সিন্ধুবিধৌত অঞ্চলের সভ্যতা (সমসাময়িক কয়েকটি সভ্যতার উল্লেখ করিতে হইবে)।

সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার আবিষ্কার ও তাৎপর্য্য :—বহুদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে এই ধারণা ছিল যে আর্য্যজাতির আগমনের পরে ভারতে প্রথম সভ্যতার উন্মেষ হইয়াছিল। খৃষ্টের জন্মের তিন-চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিশরের নীলনদের উপত্যকায় এবং মেসোপটেমিয়ার ইউফ্রেটিশ ও তাইগ্রীস নদীবিধৌত অঞ্চলে এশিরিয় ও ব্যাবিলনীয় নামে উন্নত সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভারতের আর্য্যসভ্যতা ইহাদের পরবর্ত্তী সময়কালীন। কিন্তু ইহাদেরই সমকালে ভারতবর্ষে সিন্ধু নদের তীরবর্ত্তী অঞ্চলেও যে অনুরূপ সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা কিছুকাল পূর্ব্বেও অজ্ঞাত ছিল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালী প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ত্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত সিন্ধু প্রদেশের মহেঞ্জোদড়ো (মৃতের স্তূপ), নামক স্থানে একটি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। পশ্চিম পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলায় হরপ্পা নামক স্থানেও খননকার্য্যের ফলে অনুরূপ প্রাচীন ঐতিহাসিক বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সমস্ত খননকার্য্যের ফলে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির সাহায্যে পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে আর্য্যজাতির আগমনের বহু পূর্ব্বেই ভারতীয় সভ্যতার সূত্রপাত হইয়াছিল এবং সিন্ধুনদের অববাহিকা অঞ্চলেই এই সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ বলিয়া এই সভ্যতা সিন্ধু-সভ্যতা নামে পরিচিত হয়। এই সিন্ধু-সভ্যতা প্রাচীনত্বে বা উৎকর্ষতার দিক দিয়া সমসাময়িক মিশর, এশিরিয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা অপেক্ষা কোন অংশই হীন ছিল না। এই নবাবিষ্কৃত সিন্ধু-সভ্যতা একেবারে বিচ্ছিন্ন সভ্যতা ছিল না—এই সকল স্থানে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির সাহায্যে অনুমান করা যায় যে পশ্চিম এশিয়ার সুমেরীয় সভ্যতার সহিত এই সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ

সমসাময়িক কয়েকটি সভ্যতা

ছিল। যখন পৃথিবীর অপরাপর সমস্ত অঞ্চল অজ্ঞানতার তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল তখন
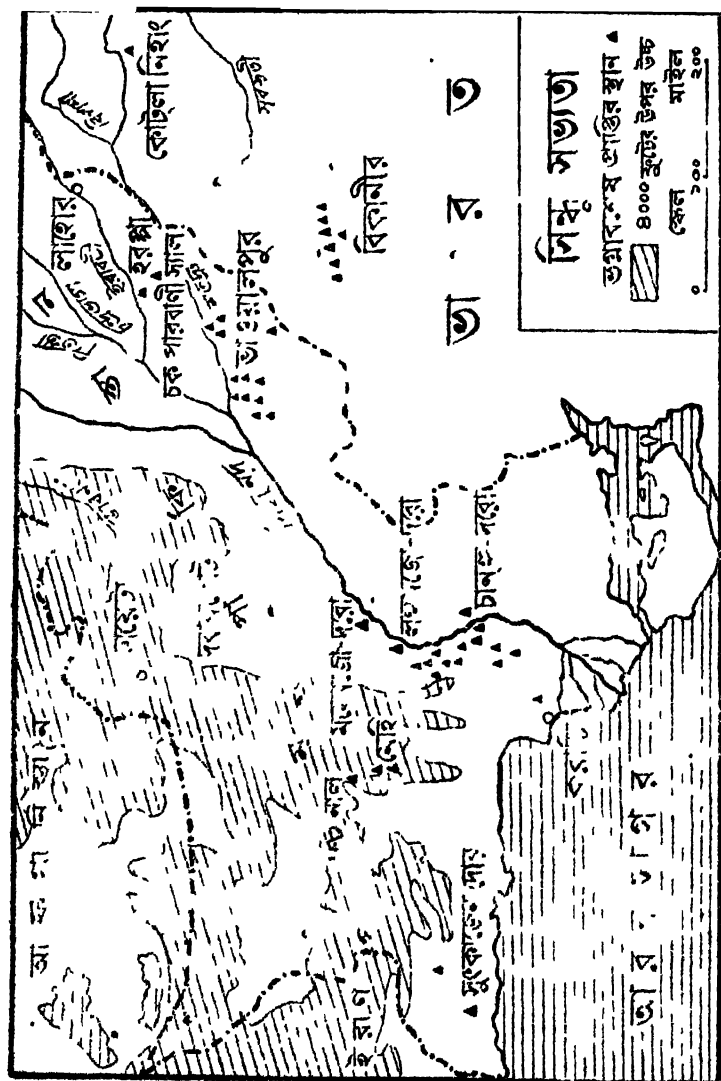
ভারতে যে এমন একটি সুসংস্কৃত সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা ভারতের পক্ষে সত্যই

গৌরবজনক। দুর্ভাগ্যক্রমে মহেঞ্জোদড়োতে আবিষ্কৃত শীলমোহরের লিপির পাঠোদ্ধার অদ্যাপি সম্ভবপর হয় নাই—সুতরাং এই সভ্যতা সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধান্ত আজিও হইতে পারে নাই। বিভিন্ন নিদর্শন সমূহের সাহায্যে এই যুগের সভ্যতা সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা করা হইয়াছে মাত্র।

সিন্ধু-সভ্যতার বিবরণ :—সিন্ধুনদের অববাহিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপিয়া সিন্ধু-সভ্যতা যে বিকশিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে সভ্যতার উৎকর্ষের নিদর্শন মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা এই দুইটি স্থানেই বেশী পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। এই দুইটি প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ হইতে প্রমাণিত হয় যে এই দুইটি নগরই পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল। অধিকাংশ বাসগৃহই রৌদ্রে পোড়ানো বা অগ্নিদগ্ধ ইষ্টকের সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার বাসগৃহ, স্নানাগার প্রভৃতির যে ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা স্থাপত্যশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

পোড়া ইটের সাহায্যে নির্ম্মিত গৃহাদি

মহেঞ্জোদড়ো নগর যেখানে অবস্থিত তাহা খনন করিয়া পর পর কয়েকটি স্তরে বহু ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহার কারণ সম্ভবতঃ সিন্ধুনদের বন্যায় এক একটি নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে তাহা দীর্ঘকালের জন্য পরিত্যক্ত হইত এবং পরে নূতন করিয়া পুনরায় নগর গঠন করা হইত। এই জন্যই একই স্থানে বহু নগরের ভিত্তিভূমির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন নগরের চিহ্ন

মহেঞ্জোদড়ো নগরটি বিশাল আয়তনবিশিষ্ট ছিল। নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত বহু সোজা ও চওড়া রাজপথ ছিল। রাজপথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহশ্রেণী ছিল। আবাসস্থলগুলি সাধারণতঃ একতল বা দ্বিতল ছিল, তবে বহুতলবিশিষ্ট আবাস যে ছিল তাহারও প্রমাণ আছে। আবাসস্থলের আয়তন দেখিয়া বোঝা যায় যে নগরে ধনীদের পাশাপাশি বহু দরিদ্রও ছিল। প্রত্যেকটি আবাসে কূপ, স্নানাগার, পয়ঃপ্রণালী এবং উপযুক্ত প্রাঙ্গণ ছিল। নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি সুবৃহৎ সরকারী স্নানাগারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—এই স্নানাগারের দৈর্ঘ্য ১৮০ ফুট। সন্নিহিত কূপ হইতে পয়ঃপ্রণালীর সাহায্যে ইহার অভ্যন্তরে জল আনিবার বন্দোবস্ত ছিল। মহেঞ্জোদড়োতে চতুষ্কোণ স্তম্ভবিশিষ্ট

নগরের পূর্ত্তকার্য্যাদি

একটি বিরাট হলঘর আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই কক্ষটি পৌর সভাগৃহ অথবা শস্যভাণ্ডার রূপে ব্যবহৃত হইত।

মহেঞ্জোদড়ো নগরে আধুনিক নগরের ন্যায় পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবস্ত ছিল। রাজপথের পার্শ্বে জলনিকাশের জন্য নর্দ্দমা ছিল। দ্বিতল বা ত্রিতল গৃহাদি হইতে রাজপথের নর্দ্দমায় জলনিষ্কাশনের বা মলমূত্রাদি নির্গমনের সুব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। তৎকালে পৃথিবীর অন্য কোন জাতি নগরনির্ম্মাণে এবং নাগরিক জীবনকে

বর্ত্তমান কালের ন্যায় : পয়ঃপ্রণালী
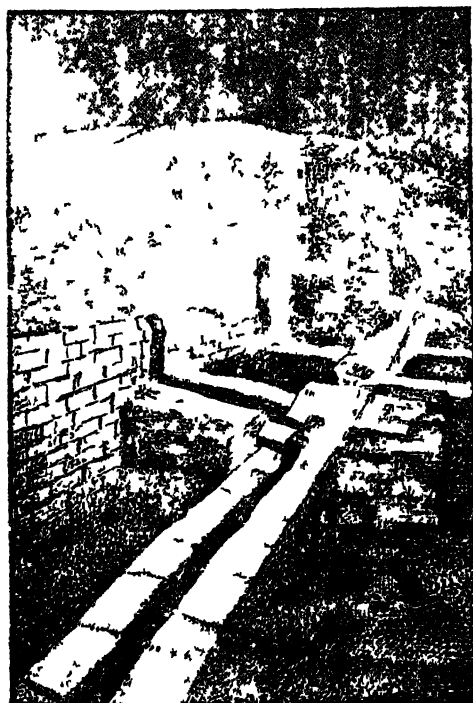
মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত পয়ঃপ্রণালী

সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য এতখানি কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হইয়াছিল কিনা সন্দেহ।

সিন্ধু-সভ্যতার নাগরিক জীবন ছিল বিলাসময় ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ। নাগরিকদের জীবনযাত্রা-প্রণালী হইতে অনুমিত হয় যে তাদের সভ্যতা অত্যন্ত উন্নত স্তরের ছিল। তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল গোধূম, যব, খর্জ্জুর, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি। তাহারা রন্ধনের জন্য ধাতু ও মৃৎপাত্র ব্যবহার করিত।

আহার্য্য
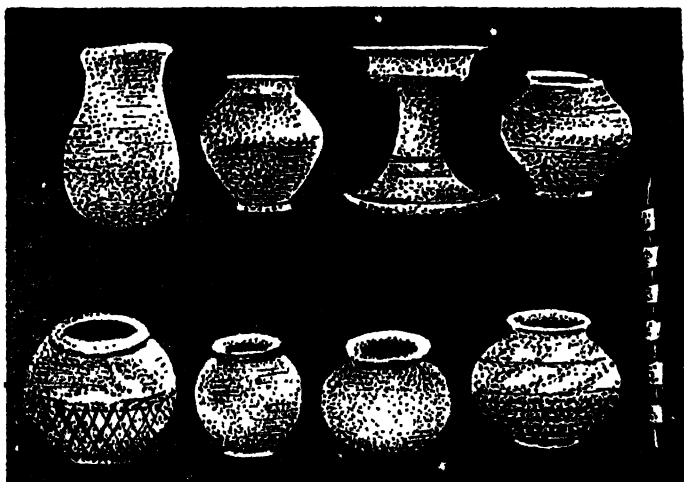
মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত পাত্র

গৃহস্থের তৈজসপত্রের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বহু জিনিষের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। চীনামৃত্তিকার পাত্র, ব্রোঞ্জের পাত্র, তাম্র ও রৌপ্যপাত্র, দগ্ধ মৃৎপাত্র, মহিষের শৃঙ্গ, পশুর অস্থি, গজদন্তনির্ম্মিতা চিরুণী, সূচ, বড়শী, কুঠার, বর্শা, থালা, বাটি, জগ, ক্ষুর, কাস্তে, আয়না, পাশার ঘুঁটি, চেয়ার প্রভৃতি দৈনন্দিন ব্যবহারের কোন দ্রব্যের অভাবই তাহাদের ছিল না বলিয়া মনে হয়। লৌহনির্ম্মিত কোন দ্রব্য পাওয়া যায় নাই। শিশুদের খেলনা-দ্রব্যেরও অভাব ছিল না বলিয়া মনে হয়। মাটির তৈয়ারী পাখী, ফাঁপা, ঝুমঝুমি, ক্ষুদ্রাকৃতি চেয়ার, ঠেলাগাড়ী, খাট ইত্যাদি দেখিয়া মনে হয় শিশুদের খেলার জন্যই এই সমস্ত দ্রব্য ব্যবহৃত হইত।

তৈজসপত্র

খেলনা

জনসাধারণ সাধারণতঃ কার্পাসবস্ত্র ব্যবহার করিত। কিন্তু শীত নিবারণের জন্য পশমী বস্ত্রের প্রচলন ছিল। প্রাপ্ত মূর্তিসমূহের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া অনুমিত হয় যে লোকে দেহের ঊর্দ্ধাংশের জন্য একখণ্ড ও নিম্নাংশের জন্য আর এক খণ্ড, এই দুই প্রস্থ বস্ত্র ব্যবহার করিত। পুরুষ ও নারী উভয়েই অলঙ্কারপ্রিয় ছিল। পুরুষ ও নারী উভয়েই হার, বাজু, অঙ্গুরীয় ও বালা ব্যবহার করিত। নারীদের ভূষণ ছিল নোলক, কুণ্ডল, মল,

বেশভূষা ও অলঙ্কারাদি

মহেঞ্জোদড়োর স্নানাগার
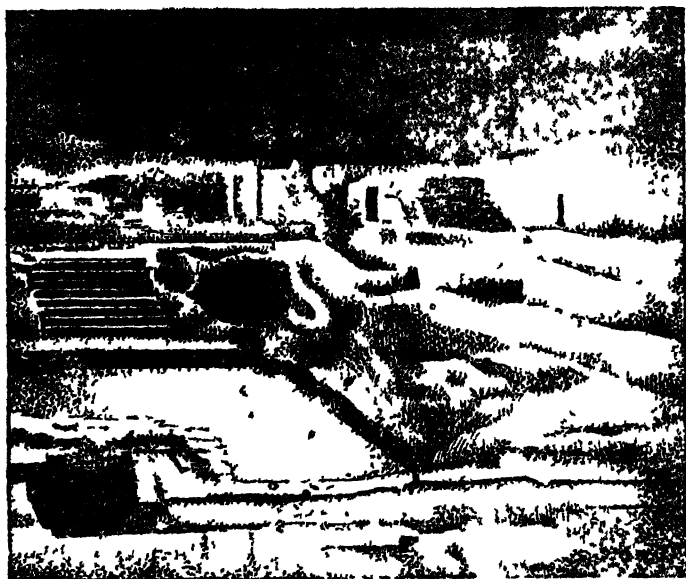
নূপুর ও কটিদেশে মেখলা। অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণের জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, ব্রোঞ্জ, গজদন্ত ও মূল্যবান প্রস্তরাদি ব্যবহৃত হইত। এই সমস্ত অলঙ্কারের বিচিত্র কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য সৈন্ধব নাগরিকদের সৌন্দর্য্যবোধের আশ্চর্য্য পরিচায়ক। নারীরা বিচিত্র ধরণের কবরী বন্ধনেও যে পারদর্শিনী ছিলেন তাহাও বোঝা যায়। প্রসাধন দ্রব্যাদিরও যে অভাব ছিল না তাহারও প্রমাণ রহিয়াছে।

কৃষিকার্য্য ও শিল্পই ছিল সিন্ধুসভ্যতার নাগরিকদের অর্থ-নৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি। প্রাপ্ত বিভিন্ন জীব জন্তুর কঙ্কাল হইতে অনুমিত হয় যে কুকুদবিশিষ্ট ষাঁড়, মহিষ, ভেড়া, উট, হাতী, কুকুর, হরিণ প্রভৃতি প্রাণী গৃহপালিত ছিল। অশ্বের প্রচলন ছিল কি না এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। কৃষিপ্রধান উপজীবিকা থাকিলেও কুম্ভকার, সূত্রধর, লৌহকার, স্বর্ণকার, মণিকার, গজদন্ত-শিল্পী, স্থপতি প্রভৃতি অপরাপর বৃত্তিজীবি বহু লোকও ছিল।

অর্থ-নৈতিক জীবন
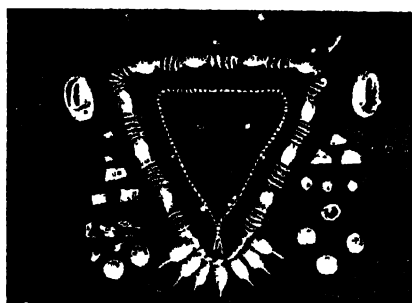
মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত অলঙ্কার

ব্যবসা-বাণিজ্যাদির ক্ষেত্রেও তাহারা পশ্চাৎপদ ছিল না। ভারতের অপরাপর অঞ্চল ও বিদেশের সহিত তাহাদের স্থল ও জলপথে যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। জলপথে বেলুচিস্থান, গাঙ্গেয় উপত্যকায়, দক্ষিণে মহীশূর পর্য্যন্ত তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। মেসোপটেমিয়ার সুমেরীয় সভ্যতা সমৃদ্ধ অঞ্চলের সহিতও সিন্ধুবাসীদের বাণিজ্য চলিত তাহারও প্রমাণ আছে। দুইটি শীলমোহরে অঙ্কিত নৌকার চিত্র দেখিয়া মনে হয় নৌচালনাতেও তাহারা অনভ্যস্ত ছিল না।

ব্যবসা-বাণিজ্য

নগরাদি প্রাচীরবেষ্টিত বলিয়া অনুমিত হয় যে সিন্ধুদেশের অধিবাসীরা নগরকে দুর্গরূপে ব্যবহার করিত। তাহারা যে খুব যুদ্ধপ্রিয় ছিল তাহা মনে হয় না—বর্শা, কুঠার, তীরধনুক, ছুরি, গদা ইত্যাদি অস্ত্র-শস্ত্র সম্ভবতঃ যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হইত।

অস্ত্র-শস্ত্র

ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্পেও তাহাদের অসামান্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিভিন্ন প্রাণীপরিবৃত পশুপতি-মূর্ত্তি—মহেঞ্জোদড়ো

শিল্পকলা

মহেঞ্জোদড়ো-তে প্রাপ্ত শীলমোহরের উপর অঙ্কিত বৃষ প্রভৃতি প্রাণীর আলেখ্য এত সুচিত্রিত ও স্বাভাবিক যে তাহা খুব উন্নত চিত্রপ্রতিভার পরিচয় প্রদান করে। এখানে প্রাপ্ত বহু মনুষ্যমূর্ত্তিতেও অসাধারণ শিল্পদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। পালিশ করা চীনামাটির বাসনের উপর পাতা, ফুল, পশু, পক্ষী প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত করা হইত।

ধর্ম

মহেঞ্জোদড়ো-তে প্রচলিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে অদ্যাপি কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। তবে নানাবিধ নিদর্শন দৃষ্টে ইহাই অনুমিত হয় যে সেইস্থানে মাতৃকা পূজার প্রচলন ছিল। পুরুষ-দেবতা অপেক্ষা নারী-দেবতার পূজাই লোকে অধিক পছন্দ করিত। পুরুষ-দেবতার মধ্যে শিব বা শিবের অনুরূপ দেবতা পূজিত হইত। বিভিন্ন প্রাণী পরিবৃত ত্রিশৃঙ্গ বিশিষ্ট এবং যোগাসনে উপবিষ্ট কয়েকটি মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালের হিন্দু দেবতা শিব মহাযোগী পশুপতি এবং ত্রিশিখ বলিয়া পরিচিত। এই শিবের সঙ্গে মহেঞ্জোদড়োর উপরোক্ত মূর্ত্তিগুলির সাদৃশ্য রহিয়াছে। শিব ও নারীদেবতা ব্যতীত

ইতর জীবজন্তু বৃক্ষ প্রস্তরাদির উপাসনাও হইত। মৃতদেহকে দাহ বা কবরস্থ করা উভয় প্রথাই প্রচলিত ছিল। তবে এখানে কোন উপাসনা গৃহ বা দেবালয় আবিষ্কৃত হয় নাই।

মহেঞ্জোদড়ো-তে পাঁচশতাধিক শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের উপর বিভিন্ন প্রাণীর চিত্র ও দুর্ব্বোধ্য চিত্রলেখ রহিয়াছে। এই চিত্রলেখ পঠিত হইলে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

সমকালীন বিভিন্ন সভ্যতার সহিত যোগাযোগ :—সিন্ধু-সভ্যতার সহিত তৎকালীন বিভিন্ন সভ্যতার যে যোগাযোগ ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মহেঞ্জো-দড়োর কয়েকটি শীলমোহর মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে এবং তথাকার কয়েকটি শীলমোহরও মহেঞ্জোদড়ো-তে পাওয়া গিয়াছে। সুমেরীয় অঞ্চলের একটি শ্বেতপ্রস্তরের শীলমোহর ও একটি খোদাইকরা পাথরের পাত্র সিন্ধু-উপত্যকায় পাওয়া গিয়াছে। মিশরীয় সভ্যতার সহিত সিন্ধু সভ্যতার যোগাযোগের পরিচয়ও পাওয়া গিয়াছে। ভারতের সিন্ধু-সভ্যতার সমসাময়িক সভ্যতা হিসাবে মেসোপটেমীয় অর্থাৎ আশিরীয়, ব্যাবিলনীয় ও চীনদেশীয় সভ্যতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। চীনের সভ্যতার সহিত সিন্ধুর সভ্যতার সংযোগের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই বটে তবে মিশরের ও মেসোপটেমীয় সভ্যতার সহিত সিন্ধু-সভ্যতার যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর ইহাও নিশ্চিত যে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা সমকালীন অপরাপর সভ্যতা অপেক্ষা বহুগুণে উন্নততর ছিল।

সিন্ধু-সভ্যতার স্বরূপ নির্ণয় :—সিন্ধু-সভ্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে বহু মতামত আছে। অনেক ঐতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতাকে আর্য্যপূর্ব্ব ভারতের অধিবাসী দ্রাবিড়গণের সভ্যতা বলিয়া অনুমান করেন। আর্য্যদের ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বেই দ্রাবিড়গণ সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়া ভারতে আগমন করে এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বসবাস করার সময়ে দ্রাবিড়গণই সিন্ধু-সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল।

সিন্ধু সভ্যতা
দ্রাবিড়দের সৃষ্টি

পরবর্ত্তীকালে আর্য্যদের চাপে দ্রাবিড়গণ দক্ষিণ-ভারতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। বেলুচিস্থানের 'ব্রাহুই' নামক ভাষার সহিত দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য থাকায় ইহা অনুমান করা হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, সিন্ধু-সভ্যতা বৈদিক আর্য্য-সভ্যতার পূর্ব্বে না পরবর্ত্তীকালীন এ সম্বন্ধেও মতামতের অবকাশ আছে। সিন্ধু-সভ্যতা ছিল নগর কেন্দ্রিক আর বৈদিক আর্য্য-

সভ্যতা ছিল সম্পূর্ণ গ্রামীন। নগরকেন্দ্রিকতা বহু পরবর্তী কালে আর্য্য-সভ্যতার মধ্যে প্রবেশ করে। যদি সিন্ধু-সভ্যতা পূর্ব্বকালীন হয় তাহা হইলে এই উন্নত সভ্যতার কোন প্রভাব বা সূত্র পরবর্তী বৈদিক সভ্যতার মধ্যে পাওয়া যায় না কেন?

সিন্ধু-সভ্যতা বৈদিক আর্য্য-সভ্যতার পূর্ব্বে না পরে

তৃতীয়তঃ, সিন্ধু-সভ্যতা ভারতের নিজস্ব না ইহা বহির্ভারতীয় কোন সভ্যতারই শাখাবিশেষ তাহা লইয়াও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিন্ধু-সভ্যতার প্রাচীনত্ব অস্বীকার করিতে না পারিলেও ইহার ভারতীয়তা ও মৌলিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত শীলমোহরের অনুরূপ দুইটি শীলমোহর এলাম ও মেসোপটেমিয়াতে আবিষ্কৃত হওয়াতে এই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইয়াছে এবং এই প্রশ্ন উঠিয়াছে যে সিন্ধু-সভ্যতা পশ্চিম হইতে ভারতে আসিয়াছে না এই সভ্যতাই মেসোপটেমীয় অঞ্চলে বিস্তৃত হইয়াছে? না উভয়েই পরস্পর বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র সভ্যতা।

সিন্ধু-সভ্যতা ভারতীয় না বহিরাগত

অবশ্য নানাপ্রকার আলাপ-আলোচনায় এখন পর্য্যন্ত এই সকল মতবাদ বা বিতর্কের কোন স্থির বা সুনির্দ্দিষ্ট উত্তর পাওয়া যায় নাই। তবে নানাপ্রকার সাক্ষ্য প্রমাণে এই কথা অধিকতর সম্ভবপর বলিয়া মনে হইতেছে যে সিন্ধু-সভ্যতা বৈদিক আর্য্য-সভ্যতার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের এবং উভয় সভ্যতার মধ্যে যথেষ্ট মৌলিক পার্থক্য থাকায় উভয় সভ্যতাকে স্বতন্ত্র ও পরস্পরের সম্বন্ধরহিত বলা যাইতে পারে। সিন্ধু-সভ্যতা ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে স্থানীয় ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত অন্য কোন প্রভাব পরবর্ত্তী সভ্যতার জন্য রাখিয়া যাইতে পারে নাই। দুইটি সভ্যতার লীলাস্থলই ভারতবর্ষ—সিন্ধু সভ্যতার কোন প্রভাব ভারতবাসীর সংস্কৃতিতে না থাকিলেও আর্য্য-সভ্যতার প্রভাব ভারতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে বিদ্যমান।

সিন্ধু-সভ্যতা বৈদিক যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী ও স্বতন্ত্র মৌলিকতা বিশিষ্ট

বৈদিক-আর্য্য ও সিন্ধু-সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য :—বৈদিক আর্য-সভ্যতা ছিল গ্রামকেন্দ্রিক আর সিন্ধু-সভ্যতা ছিল নগর-কেন্দ্রিক। অশ্ব বৈদিক সভ্যতার অঙ্গ ছিল—সিন্ধু-সভ্যতার যুগে অশ্বের প্রচলন ছিল না। বৈদিক আর্য্যগণ গোমাতার পূজা করিত—সিন্ধুবাসিগণ ষণ্ডের পূজা করিত। মাতৃকা পূজা, লিঙ্গ পূজা, শিবার্চ্চনা ও মূর্ত্তিপূজা সিন্ধু-সভ্যতার অঙ্গ ছিল। বৈদিক যুগে এই সমস্ত পূজার প্রচলন ছিল না। বৈদিকগণ অয়স বা লৌহের ব্যবহার জানিত। সিন্ধু-সভ্যতার সময়ে লৌহ আবিষ্কৃত হয় নাই। বৈদিক-সভ্যতায় অশ্ব ও লৌহের ব্যবহারে মনে হয় ইহা পরবর্ত্তী কালের।

প্রশ্নোত্তর

1. Give in brief the history of the discovery of the Indus Valley Civilization.

সিন্ধুসভ্যতার আবিষ্কারের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

[উত্তর-সূত্র :—৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

2. Write briefly an account of the Indus Valley Civilization.

সিন্ধু সভ্যতার এক নাতিদীর্ঘ বিবরণ দাও।

উত্তর-সূত্র :—(১) ভূমিকা—খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য-জাতির আগমনের পূর্ব্বে সিন্ধু উপত্যকায় এক সুসভ্য জাতি যে নূতন সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা সিন্ধু-সভ্যতা নামে পরিচিত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য্যের ফলে সিন্ধু-প্রদেশের মহেঞ্জোদড়ো এবং পাঞ্জাবের হরপ্পা নামক স্থানে এই সভ্যতার বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই সভ্যতা প্রাচীনত্বে এবং গৌরবে সমকালীন মিশরীয়, আসিরীয় সভ্যতা অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিল না দুর্ভাগ্যক্রমে এই স্থানে প্রাপ্ত শীলমোহরে উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার অদ্যাপি হয় নাই, সুতরাং এই সভ্যতা সম্বন্ধে সম্যক সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতের অপেক্ষায় রহিয়াছে। মাত্র খননকার্য্যের প্রাপ্ত নিদর্শনাদি হইতে এই যুগের সভ্যতা সম্বন্ধে সাধারণ একটা ধারণা করা হইয়াছে।

(২) সিন্ধু-সভ্যতা নাগরিক সভ্যতা ছিল। (ক) নগরের বিবরণ দগ্ধ ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহাবলী-প্রশস্ত রাজপথ—পয়ঃ প্রণালী—স্নানাগার। (খ) শিল্পকলা: ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, চিত্রকলায় কৃতিত্ব। (গ) বেশভূষা ও অলঙ্কারাদি। (ঘ) জীবজন্তু—অশ্বের প্রচলন সম্ভবতঃ ছিল না। (ঙ) ব্যবসাবাণিজ্যাদি, (চ) ধর্ম্ম।

(৩) সমসাময়িক বিভিন্ন সভ্যতার সহিত যোগসূত্র :—মিশরীয় ও মেসোপটেমীয় সভ্যতার সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগের প্রমাণ রহিয়াছে।

(৪) সিন্ধু-সভ্যতার স্বরূপ নির্ণয় :—সিন্ধু-সভ্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত রহিয়াছে। প্রথমতঃ ইহা দ্রাবিড়কৃত কিনা,—দ্বিতীয়তঃ ইহা সম্পূর্ণ ভারতীয় না বহিরাগত,—তৃতীয়তঃ ইহা বৈদিক সভ্যতার পূর্ব্বে না পরে। এই সকল প্রশ্নের সুনির্দ্দিষ্ট উত্তর না পাওয়া গেলেও আপাততঃ বিভিন্ন সাক্ষ্যপ্রমাণে উপরোক্ত প্রশ্ন তিনটির মোটামুটি উত্তর নিম্নরূপ পাওয়া গিয়াছে। ইহা দ্রাবিড়-সভ্যতা, ইহা সম্পূর্ণ ভারতীয় এবং ইহা বৈদিক সভ্যতার পূর্ব্ববর্ত্তী।

3. Discuss the different views regarding the time and originality of the Indus Valley Civilization.

সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল এবং মৌলিকত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত আলোচনা কর।

উত্তর-সূত্র ঃ (১) **সময়কাল ঃ**—সিন্ধুসভ্যতা কোন সময়ে বিকশিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। ভারতে বৈদিক আর্যাগণের আগমনের পূর্ব্বে কি পরে এই সভ্যতা বিকশিত হয় সে সম্বন্ধে কোন পক্ষেরই সঠিক প্রমাণ নাই। যাঁহারা সিন্ধুসভ্যতাকে-বৈদিক আর্য্যদের পরবর্ত্তী সভ্যতা বলেন তাহাদের যুক্তি এই যে বৈদিক আর্য্য সভ্যতা গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতা ছিল—অথচ নিঃসন্দেহরূপে জানা যায় যে সিন্ধুসভ্যতা নগর প্রধান ছিল। বৈদিক আর্য্যদের গ্রাম-কেন্দ্রিক সভ্যতাই সময়ান্তের বিবর্ত্তনে মধ্য দিয়া নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতায় পরিণত হইয়াছে। এক কথায় সিন্ধুসভ্যতা বৈদিক আর্য্য সভ্যতার পরবর্ত্তী শাখা বিশেষ। তাহাদের অন্যতম যুক্তি এই যদি নগর-কেন্দ্রিক সিন্ধু সভ্যতা বৈদিক-আর্য্যসভ্যতার পূর্ব্ববর্ত্তী হয় তাহা হইলে ইহার প্রভাব বা চিহ্ন পরবর্ত্তী বৈদিক আর্য্য সভ্যতার মধ্যে পাওয়া যায় না কেন ? উপরোক্ত মতের বিরোধীদের বক্তব্য এই—সিন্ধুসভ্যতা আর্য্য-পূর্ব্ব ভারতের অধিবাসী দ্রাবিড়গণের দ্বারা সৃষ্ট। ভারতে আর্য্যদের আগমনের পূর্ব্বে দ্রাবিড়গণ সম্ভবতঃ উত্তর পশ্চিম দিক হইতে ভারতে প্রবেশ করে—বেলুচিস্থানের 'ব্রাহুই'-র সহিত দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য থাকাতে ইহা অনুমান করা হইতেছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বসবাসকালীন দ্রাবিড়গণ সম্ভবতঃ সিন্ধুসভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল। কোন দৈব-দুর্ব্বিপাকে এই সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং এই উচ্চাঙ্গের সভ্যতার কোন প্রভাব বা সূত্র পরবর্ত্তীকালে পাওয়া যায় না। সিন্ধু-সভ্যতা যে আর্য্য সভ্যতার পরবর্ত্তিকালীন সে সম্বন্ধে আরও প্রমাণ রহিয়াছে। সিন্ধু-সভ্যতায় লৌহের ও অশ্বের ব্যবহার ছিল না, মাতৃকাপূজা, শিশ্নপূজা, মূর্ত্তিপূজা, ষণ্ডপূজা বর্ত্তমান ছিল। পক্ষান্তরে বৈদিক যুগের লোকে লৌহ ও অশ্বের ব্যবহার জানিত; মাতৃ দেবতার পূজা মোটেই জানিত না ; শিশ্নপূজা ও মূর্ত্তিপূজা তাহাদের নিকট ঘৃণার্হ ছিল। বৈদিক সভ্যতায় অশ্বের ও লৌহের ব্যবহারে অনুমান হয় ইহা পরবর্ত্তীকালের। সুতরাং সিন্ধু-সভ্যতা আর্য্যপূর্ব্ব হইলে খৃঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রকে বা পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইহার বিকাশ হইয়াছিল।

(২) **মৌলিকত্ব ঃ** সিন্ধু-সভ্যতা ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ নিজস্ব, না ইহা ভারতের বাহিরের কোন সভ্যতার শাখাবিশেষ তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ সিন্ধু-সভ্যতার প্রাচীনত্ব অস্বীকার করিতে না পারিলেও

ইহার ভারতীয়তা এবং মৌলিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন। মহেঞ্জোদড়ো-তে প্রাপ্ত শীল-মোহরের অনুরূপ দুইটি শীলমোহর এলাম ও মেসোপটেমিয়াতে আবিষ্কৃত হওয়ায় এই সন্দেহ এবং প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে যে সিন্ধু সভ্যতা পশ্চিম হইতে ভারতে বিস্তার লাভ করিয়াছে না সিন্ধু সভ্যতাই ইউফ্রেটিস্ ও তাইগ্রীস উপত্যকায় বিস্তৃত হইয়াছে, অথবা উভয়েই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র সভ্যতা? এই সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্ত অদ্যাপি হয় নাই।

4. Attempt a comparison between the Indus Valley Civilization and the Vedic civilization.

বৈদিক ও সিন্ধু-সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা কর।

[উত্তর :– ৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

পঞ্চম অধ্যায়

আর্যজাতির ভারতে আগমন : বৈদিক আর্য-সভ্যতা

Syllabus :—Coming of the Aryans in India—their social life and institutions—extent of non-Aryan influence.

পাঠ্যসূচী—আর্যগণের ভারতে আগমন,—আর্য্যদের সামাজিক জীবন, সভ্যতা ও সংস্কৃতি—অনার্য্য প্রভাব।

আর্য্যদের পরিচয় :—সিন্ধু সভ্যতার পরবর্ত্তী যুগে ভারতবর্ষে যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা আর্য বা বৈদিক আর্য্য-সভ্যতা নামে পরিচিত। এই সভ্যতার যাহারা স্রষ্টা তাহারা আর্য্যজাতি নামে পরিচিত। 'আর্য্য' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়—জাতি ও ভাষা উভয় অর্থ ই বুঝাইতে পারে। সাধারণতঃ যাহারা আর্যদের ভাষায় কথা বলিত তাহারা আর্য্য নামে এবং আর্য্যেতর ভাষাভাষী লোকেরা অনার্য্য নামে পরিচিত ছিল। আর্য্যরা অনার্য্যদিগকে ঘৃণা করিয়া রাক্ষস, বানর, দৈত্য, অসুর, নাগ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করিত। বলা বাহুল্য আর্য্যদের দ্বারা অসভ্য ও বর্ব্বর জাতিরূপে চিত্রিত হইলেও তাহারা প্রকৃতই অসভ্য ছিল না। বরঞ্চ বহু ক্ষেত্রে তাহারা যে আর্য্যদের অপেক্ষা উন্নত ছিল তাহা রামায়ণে বর্ণিত রাক্ষসরাজ রাবণের বাসস্থান, লঙ্কার ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির কথা পড়িলেই বোঝা যায়। আর্য্যদের পূর্ব্বে ভারতে দ্রাবিড় নামে এক অনার্য্য জাতি বাস করিত। দ্রাবিড় জাতি সভ্যতার দিক দিয়া আর্য্যদের অপেক্ষা অনগ্রসর ছিল না। সিন্ধু-সভ্যতাকে অনেকে দ্রাবিড়দের সভ্যতা বলিয়া মনে করেন।

আর্য্যজাতি ও আর্য্যভাষা

অনার্য্যরা অসভ্য ছিল না

আর্য্যজাতির আদি বাসভূমি ও ভারতে আগমন কাল :—আর্য্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে ; তবে ভারতীয় আর্য্যগণ যে ভারতের বাহিরের কোন স্থান হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন তাহা নিঃসন্দেহ এবং

ভারতে আগমনের পূর্ব্বে তাহারা যে ইরাণ বা পারস্য দেশে দীর্ঘকাল বসবাস করিয়াছিলেন তাহা একেবারে স্থির। প্রাচীন ইরাণীয় ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে এবং বেদ ও পারসিক ধর্ম্মগ্রন্থ জেন্দ্-আবেস্তা আলোচনা করিলে এই সাদৃশ্য সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। এশিয়া মাইনরের 'বোঘাজ-কুই' নামক স্থানে খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীর এক লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই লিপিতে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই বৈদিক পঞ্চদেবতার উল্লেখ রহিয়াছে। পারসিকদের ধর্ম্মগ্রন্থেও বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, নাসত্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নাম পাওয়া যায়। এই সকল তথ্য হইতে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন যে আদিম আর্য্যগণ প্রথমে কাস্পিয়ান সাগরের তীরে কোনও অঞ্চলে বাস করিত। পরে সেই স্থান হইতে কোনও কারণে আর্যদের এক শাখা পারস্য ও ভারতবর্ষের দিকে এবং অন্য একটি শাখা ইউরোপের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আর্য্যদের যে শাখা পূর্ব্বদিকে আসিয়াছিল তাহাদের একাংশ ইরাণে এবং অপরাংশ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

আদি বাসভূমি কাস্পিয়ান সাগরীয় অঞ্চল

আর্য্যগণ কখন ভারতবর্ষে আগমন করেন সে সম্বন্ধেও মতভেদ রহিয়াছে। বোঘাজ-কুইর লিপির সময়কাল ধরিলে খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই যে আর্য্যগণ ভারতে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সিন্ধু-সভ্যতার পরে বৈদিক সভ্যতা উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া খৃষ্ট পূর্ব্ব ত্রি-সহস্রক-এর পূর্ব্বে নিশ্চয়ই আর্য্যগণ ভারতে আসেন নাই একথা স্বীকার করিতে হইবেই। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে আর্য্যগণ খৃষ্টপূর্ব্ব দুই সহস্র অব্দের নিকটবর্ত্তী কোনও সময়ে ভারতে বসতি স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অবশ্য আর্য্যগণ একসঙ্গে ভারতে প্রবেশ করেন নাই—বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া তাহারা বসবাস করিতে আরম্ভ করেন।

আর্য্যদের ভারতে আগমন কাল, খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় সহস্রক

আর্য্যগণের ভারতে বসতিবিস্তার :—আর্য্যগণের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ হইতে আর্য্যদের ভারতের আদি বসতি ও উপনিবেশ সমূহের নাম অবগত হওয়া যায়। সপ্তসিন্ধু-শতদ্রু, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, সরস্বতী ও দৃষদ্বতী অঞ্চলে অর্থাৎ কাবুল হইতে থানেশ্বর পর্য্যন্ত তাহাদের প্রথম আধিপত্য স্থাপিত হয়। ঋগ্বেদে গঙ্গা ও যমুনার উল্লেখ রহিয়াছে কিন্তু নর্ম্মদা ও বিন্ধ্যগিরির উল্লেখ কোথায়ও নাই। সুতরাং আর্য্যবসতির প্রথম যুগে তাহাদের অধিকার আফগানিস্থান হইতে যুক্ত প্রদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল।

সপ্তসিন্ধু অঞ্চল

ক্রমশঃ আর্য্যগণ সপ্তসিন্ধু অঞ্চল অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইলেন। 'ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত বেদের গদ্যাংশ হইতে জানা যায় ক্রমশঃ কুরুক্ষেত্র (দিল্লী অঞ্চল), কোশল (অযোধ্যা), বিদেহ (উত্তর বিহার), মগধ (দক্ষিণ বিহার) প্রভৃতি দেশে আর্য্যদের অধিকার বিস্তৃত হইল। বৈদিক যুগের শেষ ভাগে ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে অবস্থিত জনপদ সমূহে আর্য্য সংস্কৃতি বিস্তৃত হইল।

মধ্যদেশে অধিকার বিস্তৃত

বৈদিক যুগে দীর্ঘকাল যাবৎ যমুনা নদীই আর্য্যভারতের দক্ষিণ সীমা ছিল। বৈদিক যুগের শেষভাগে দাক্ষিণাত্যে, বঙ্গদেশে ও আসামে আর্য্যদের বসতি বিস্তৃত হয়। নানা কারণে এই সমস্ত স্থানের আর্য্যকরণ বিলম্বিত হইয়াছে।

পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারত

আর্য্যগণের এইভাবে ভারতবর্ষব্যাপী বসতি বিস্তার করিতে বহু শতাব্দী লাগিয়াছিল এবং এই আধিপত্য বিস্তার যে শান্তিপূর্ণভাবে হয় নাই তাহাও বলা যাইতে পারে। নবাগত আর্য্যজাতিকে স্থানীয় অধিবাসী অনার্যদের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছিল। পরাজিত অনার্য্যগণের মধ্যে অধিকাংশই পর্ব্বতে-অরণ্যে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করে। অবশিষ্ট সকলে আর্য্যদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া আর্য্য সমাজে নিম্নস্তরের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিল।

অনার্য্যদের সহিত সংগ্রাম

বৈদিক সাহিত্য :—বৈদিক সাহিত্যই বৈদিক যুগ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল কিছু জানিবার একমাত্র উপাদান। বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে বেদই প্রথম স্থানাধিকারী এবং ঋগ্বেদই সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ। বেদ শব্দের মৌলিক অর্থ জ্ঞান। হিন্দুদের নিকট বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী। বেদের অপর নাম শ্রুতি।

বেদের চারিটি শাখা—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব। বেদগুলির মধ্যে ঋগ্বেদই সর্ব্বপ্রথম রচিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদ মন্ত্রবাচক—ইহাতে বরুণ, মিত্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে ছন্দে রচিত সহস্রাধিক স্থক্ত বা স্তোত্র আছে। সামবেদের অধিকাংশ স্তোত্র ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত—মাত্র ৭৫টি স্তোত্র স্বাধীনভাবে রচিত। সামবেদ সঙ্গীত বাচক—ইহার স্তোত্রগুলি যজ্ঞকালে সঙ্গীতরূপে ব্যবহৃত হইত। যজুর্ব্বেদ যজ্ঞবাচক—ইহাতে যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম্মের অত্যাবশ্যক মন্ত্রগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদ গদ্যে রচিত। অথর্ব্ববেদ বেদের সম্মান লাভ করিলেও বেদগুলির মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অর্ব্বাচীন বলিয়া বিশেষ সম্মানার্হ নহে। ইহাতে বহু অপদেবতা

চতুর্ব্বেদ

বেদের বিষয়বস্তু

ও উপদেবতার উপাসনার ইঙ্গিত ও অভিচারাদি মন্ত্র পাওয়া যায়। এই সকল মন্ত্র আধি-ব্যাধি ও হিংস্র জন্তুর প্রভাব হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত।

প্রতিটি বেদ আবার চারি ভাগে বিভক্ত—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক উপনিষদ। সংহিতাগুলিতে দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত মন্ত্র বা ছন্দোবদ্ধ স্তোত্রাদি আছে। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ গদ্যে রচিত—ইহাতে যাগযজ্ঞের বিধিব্যবস্থা আছে। বৈদিক সাহিত্যের আরণ্যক ভাগ 'ব্রাহ্মণ' অংশের পরিশিষ্ট মাত্র। যাহারা বৃদ্ধ বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতেন সেই সকল অরণ্যবাসী বৃদ্ধের ধর্মজীবন যাপনের উপযোগী ধর্মবিষয়ক আলোচনায় আরণ্যক পরিপূর্ণ। আরণ্যকে যজ্ঞীয় ক্রিয়াকাণ্ডের বিস্তৃত সমালোচনা অপেক্ষা ইহাদের রূপক ব্যাখ্যা বা অতীন্দ্রিয়তার ব্যাখ্যা অধিক রহিয়াছে। উপনিষদ শব্দের ধাতুগত অর্থ 'সন্নিকটে উপবিষ্ট' অর্থাৎ এই শাস্ত্র পুত্র বা শিষ্যের নিকট প্রদত্ত হওয়ার যোগ্য। উপনিষদ সমূহ আত্মা ও ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ ও স্বরূপ প্রভৃতি গভীর দার্শনিক আলোচনায় পরিপূর্ণ। ইহারা হিন্দু জাতির দার্শনিক চিন্তার পরিণত রূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ। উপনিষদ সমূহের মধ্যে ঈশ কেন, কঠ, মাণ্ডুক্য, তৈত্তীরিয়, ঐতরেয়, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

সংহিতা

সূত্রসাহিত্য: বেদাঙ্গ ও ষড়্দর্শন:—কালক্রমে বৈদিক সাহিত্য বিপুল আকার ধারণ করিলে বেদের বিশুদ্ধ পাঠ বা অর্থগ্রহণ এবং বেদবিহিত নির্ভুল ক্রিয়া-কর্ম রক্ষার জন্য নূতন শাস্ত্র সূত্রাকারে বা সংক্ষিপ্ত আকারে রচনার প্রয়োজন হইল। এই সমস্ত সূত্রাকারে রচিত গ্রন্থ সূত্রসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। সূত্র সাহিত বেদবিদ্যার সহায়ক বলিয়া উহাদিগকে বেদের অঙ্গ বা বেদাঙ্গ বলা হয়। বেদাঙ্গ শিক্ষা (শব্দ উচ্চারণ বিধি), ছন্দ (পদবিন্যাস রীতি), ব্যাকরণ (ভাষা প্রকরণ), নিরুক্ত (শব্দার্থ-রীতি), জ্যোতিষ (যজ্ঞকাল নির্ণয় জ্ঞান), ও কল্প (জীবন যাত্রা বিধি) প্রভৃতি ছয়টি অংশে বিভক্ত। ব্যাকরণে পাণিনি ও নিরুক্তে যাস্কের নাম উল্লেখযোগ্য।

বেদাঙ্গ

আর্য্যগণ ব্রহ্ম, জগৎ, আত্মা প্রভৃতি সম্বন্ধে উপনিষদাদি গ্রন্থে যে সকল দার্শনিক আলোচনা করিয়াছিলেন তাহার উপর ভিত্তি করিয়া ভারতীয় দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই দর্শন শাস্ত্র ছয় ভাগে বিভক্ত। (১) কপিলের সাংখ্যদর্শন, (২) গৌতমের ন্যায়দর্শন, (৩) কণাদের বৈশেষিক দর্শন, (৪) পতঞ্জলির

ষড়্দর্শন

যোগদর্শন, (৫) জৈমিনীর পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শন ও (৬) ব্যাসের উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শন।

এই সকল দর্শন গ্রন্থ ব্যতীত বৈদিক আর্যগণ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, (রাষ্ট্রনীতি), সঙ্গীতশাস্ত্র, কামশাস্ত্র (ভোগনীতি), ধনুর্বিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়েও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বৈদিক সাহিত্য আয়তনে এবং বিষয়বৈচিত্র্যে বিরাট। বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বিষয় সম্বন্ধে উপনিষদে যে তালিকা আছে তাহাতে মনে হয় মানুষের জ্ঞাতব্য কোন বিষয়ই ইহা হইতে বাদ পড়ে নাই।

অন্যান্য গ্রন্থ

বৈদিক যুগের ধর্ম্ম :—বৈদিক যুগে আর্য্যগণের ধর্ম সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভবপর নহে। তবে বৈদিক সাহিত্যে তাহাদের ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মাচরণের যে চিত্র পাওয়া যায়—তাহাতে দেখা যায় যে বৈদিক ধর্ম ছিল সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। আর্য্যগণ প্রাকৃতিক শক্তির ঐশ্বর্য্যে ও ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশকে বিভিন্ন দেবতাজ্ঞানে উপাসনা করিত। বৈদিক যুগের উল্লেখযোগ্য দেবতার নাম—আকাশের (পরবর্তীকালে জলের) দেবতা বরুণ, বজ্র ও বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র, ঝড়ের দেবতা মরুৎ, বৃষ্টির দেবতা পর্জ্জন্য ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত সূর্য্য, সাবিত্রী, পুষণ, বিষ্ণু, উরুক্রম; নাসত্য, দ্যৌস, ঊষা প্রভৃতি দেবদেবী আর্য্যগণের উপাস্য ছিল। বৈদিক যুগের ধর্ম্মের প্রধান বিশেষত্ব ছিল ইহা প্রধানতঃ পুরুষ-দেবতা প্রধান। এই ধর্ম্মে মূর্ত্তিপূজারও স্থান ছিল না। যজ্ঞাদি কার্য্যবিধি ও সেই সম্পর্কে সম্যক অনুষ্ঠান বৈদিক ধর্ম্মে এক প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। আর্য্যগণ দুগ্ধ, ঘৃত, তণ্ডুল, মাংস, সোমরস যব ইত্যাদি সাধারণ খাদ্য ও পানীয় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া যজ্ঞ করিত।

প্রকৃতি ও দেবদেবী পূজা

পুরুষ-দেবতা প্রধান ও অ পৌত্তলিক

বিভিন্ন দেব-দেবীর আরাধনা করিলেও আর্য্যগণ বিশ্বাস করিত যে বিভিন্ন বিভিন্ন দেবতা একই পরমাশক্তির বিভিন্ন রূপ। আর্য্যগণের এই একেশ্বরবাদের ধারণা উপনিষদে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

একেশ্বরবাদ

আর্য্যদের সমাজ-ব্যবস্থা :—আর্য্যদের সমাজ ব্যবস্থা পরিবারকেন্দ্রিক ছিল। পরিবারের কর্ত্তা গৃহপতি বা দম্পতি নামে অভিহিত হইতেন। আর্য্যগণ সাধারণতঃ পুত্রসন্তানের সংখ্যাধিক্য কামনা করিতেন, কিন্তু সমাজে কন্যারও অনাদর ছিল না। পুত্রকন্যা সমভাবে

পরিবার কেন্দ্রিক সমাজ

শিক্ষা পাইত। বিশ্ববারা, ঘোষা ও অপালা প্রভৃতি বিদুষী নারী বৈদিক স্তোত্ররচয়িত্রী বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। নারীদের বাল্যবিবাহ হইত না —বিধবার পুনর্ব্বিবাহ সমাজসম্মত ছিল। মোট কথা নারী সমাজে সম্মানার্হা এবং স্বামীর ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে অংশভাগিনী ছিলেন।

নারীর সমাজে স্থান

আর্যদের মধ্যে প্রথম দিকে জাতিভেদ প্রথা ছিল না—মাত্র বিজেতা গৌরবর্ণ আর্য্য ও বিজিত কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্য এই দুইটি গাত্রবর্ণের ভিত্তিতে আর্য্য ও অনার্য্য এই দুইটি শ্রেণীই প্রথমে ছিল। ক্রমে সমাজে লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যগণ নিজেদের মধ্যে গুণ ও কর্ম্ম অর্থাৎ বৃত্তি ও ক্ষমতা অনুযায়ী বিভাগের সৃষ্টি করেন। যাহারা বিদ্যাচর্চ্চা, যাগযজ্ঞাদিতে পারদর্শিতার পরিচয় দিলেন তাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইলেন; যাহারা যুদ্ধবিদ্যা, মৃগয়াদি ব্যাপারে উৎসাহী তাহারা হইলেন ক্ষত্রিয় এবং কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে যাহারা নিযুক্ত হইলেন তাহাদের নাম হইল বৈশ্য। উপরোক্ত শ্রেণীর পরিচারকরূপে যাহারা নিযুক্ত রহিল তাহারা শূদ্ররূপে স্থান পাইল। সাধারণতঃ আর্য্য-সমাজভুক্ত অনার্য্যরা সর্ব্বনিম্নস্তরে শূদ্র নামে পরিচিত হইল। প্রথম দিকে এই বর্ণভেদের মধ্যে কোন প্রকার দৃঢ়নিবদ্ধ বিধিনিষেধ ছিল না—বরঞ্চ যথেষ্ট শিথিলতা ছিল। বৃত্তি অনুযায়ী চারিবর্ণে বিভক্ত থাকিলেও এক বর্ণ যে উচ্চতর বর্ণে অনায়াসে উন্নীত হইতে পারিত, অসবর্ণ বিবাহ করিতে পারিত অথবা বর্ণভুক্ত বৃত্তি ব্যতীত অন্য বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিত এ সম্বন্ধে দুষ্মন্তের ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ, ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভ, ব্রাহ্মণ দ্রোণের ক্ষত্রবৃত্তি ইত্যাদি অসংখ্য দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কিন্তু কালক্রমে অর্থ নৈতিক, ভৌগোলিক, বৃত্তিগত এবং অন্যান্য কারণে বর্ণভেদের মধ্যে কঠোরতা ও সঙ্কীর্ণতা দেখা দিল।

গুণ ও কর্ম্মের ভিত্তিতে বর্ণভেদ

ব্রাহ্মণ

ক্ষত্রিয়

বৈশ্য

শূদ্র

বর্ণভেদের কঠোরতা

আর্যদের সামাজিক ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল চতুরাশ্রম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন উচ্চবর্ণের লোকেরা তাহাদের জীবনে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারিটি আশ্রমের অনুশাসন মানিয়া চলিত। ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় প্রত্যেক ছাত্রকে গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া বেদাধ্যয়ন করিতে হইত এবং আদর্শ চরিত্রনিষ্ঠার সঙ্গে সংযমপূর্ণ জীবন যাপন করিতে হইত। গুরুগৃহে অধ্যয়ন

চতুরাশ্রম

ব্রহ্মচর্য্য

সমাপ্ত হইলে তাহাকে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করিয়া বিবাহাদির দ্বারা আদর্শ গৃহীর জীবন যাপন করিতে হইত। তৃতীয় ও চতুর্থ আশ্রমে অর্থাৎ বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস ধর্ম্মানুসরণ কার্য্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বানপ্রস্থের সময়ে সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে তপস্বীর জীবন যাপন করিতে হইত। অতঃপর সন্ন্যাস আশ্রমে সাধারণ সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্তির চিন্তায় অবশিষ্ট জীবন যাপন করিতে হইত। সন্ন্যাস আশ্রমে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ও যত্রতত্র অবস্থান হইত।

গার্হস্থ্য

বানপ্রস্থ

সন্ন্যাস

আর্য্যদের আচার ব্যবহার ঃ—আর্য্যগণ তুলা, পশম বা হরিণের চর্ম্মনির্ম্মিত পরিচ্ছদ ব্যবহার করিত। প্রত্যেকের তিন প্রস্থ পরিচ্ছদ ছিল—'নীবি' বা অধোবাস, পরিধান বা মূল পরিচ্ছদ, অধিবাস বা উত্তরীয়। পরিচ্ছদ অনেক ক্ষেত্রে স্বর্ণখচিত হইত এবং সকলেই ভূষণপ্রিয় ছিল।

বেশভূষা

'আর্য্যদের প্রধান আহার্য্য ছিল শাকসব্জী, অপূপ (পিষ্টক), দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যাদি। উৎসবাদিতে ব্যতীত মাংসাহারের প্রচলন ছিল না। গোমাংস নিষিদ্ধ ছিল না। যজ্ঞকালে বা অতিথিসংকারের জন্য গো-বধ করা হইত। গোমাংসে অতিথিকে আপ্যায়িত করা হইত বলিয়া অতিথির এক নাম ছিল গোঘ্ন। পরে গোমাংস নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। প্রাচীন আর্য্যগণের পানীয়ের মধ্যে সোম ও সুরা উল্লেখযোগ্য। সোমরস উগ্র ও উত্তেজক বলিয়া উৎসবাদি ব্যতীত সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইত না। তবে সাধারণ সময়ে সুরাপান চলিত।

আহার্য্য

পানীয়

অশ্বচালনা, মৃগয়া, রণনৃত্য প্রভৃতি ক্রীড়া আর্য্যদের খুব প্রিয় ছিল। রথচালনার প্রতিযোগিতা অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যসন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অক্ষক্রীড়া, নৃত্যগীত প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ ছিল। বাজি রাখিয়া অক্ষক্রীড়া চলিত এবং অক্ষব্যসনাক্ত জনৈক ব্যক্তির খেদোক্তি বেদে নিপুণভাবে বর্ণিত আছে।

আমোদ প্রমোদ

আর্য্যদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঃ—আর্য্যগণ গ্রামেই বাস করিত এবং তাহাদের অর্থনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। কৃষিকার্য্য খুব সম্মানজনক বৃত্তি ছিল এবং জনসাধারণ 'কৃষ্টি' এই সাধারণ সংজ্ঞায় অভিহিত হইত। গো-পালন কৃষিকার্য্যের পরে উল্লেখযোগ্য উপজীবিকা ছিল। গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে গরু ব্যতীত অশ্ব, মেষ, কুকুর প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য

আর্য্যগণ কৃষিজীবি হইলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে অজ্ঞ ছিল না। মুদ্রার ব্যবহার অপ্রচলিত ছিল—বিনিময়ের সাহায্যে ব্যবসা চলিত। বস্ত্র, চর্ম্ম প্রভৃতি প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য ছিল—বিনিময় মান ছিল গাভী অথবা নিষ্ক নামে স্বর্ণালঙ্কার। স্থলপথে পরিবহনের জন্য ছিল অশ্ব বা বলদ-বাহিত রথ। নৌকাপথে বাণিজ্যের উল্লেখও পাওয়া যায়। আর্য্যদের সময়ে শিল্পজীবীদের মধ্যে সূত্রধর, কর্ম্মকার, চর্ম্মকার, স্বর্ণকার; তন্তুবায় প্রভৃতির নাম রহিয়াছে। বিভিন্ন পেশা গ্রহণের জন্য সামাজিকভাবে কেহ পতিত বা নিন্দিত হইত না।

বিভিন্ন শ্রমজীবি

আর্য্যদের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা :—আর্য্যদের সময়ে রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম অংশ ছিল গ্রাম। কয়েকটি পরিবারের সমাহারে গ্রামের সৃষ্টি এবং গ্রামের অধিপতি গ্রামণী নামে অভিহিত হইত। কয়েকটি গ্রামের সমবায়ে বিশ বা জন-এর সৃষ্টি হইত। বিশ বা জনের অধিপতি বিশপতি নামে অভিহিত হইতেন। রাজাই সাধারণতঃ জনের গোপ বা রক্ষক ছিলেন।

গ্রাম, বিশ বা জন

আর্য্যগণ বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দলে বিভক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই সকল গোষ্ঠীর দলপতি পরবর্ত্তীকালে রাজা বা রাজন নামে পরিচিত হন। রাজতন্ত্রে রাজপদ সাধারণতঃ বংশানুক্রমিক থাকিত। রাজা পুরোহিত ও সেনানীর সাহায্যে রাজ্য পরিচালনা করিতেন। পুরোহিত বিভিন্ন মন্ত্রোচ্চারণ ও যজ্ঞকার্য্য দ্বারা রাজশক্তিকে বলীয়ান করিতেন। রাজারা তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত করার চেষ্টা করিতেন এবং একরাট, সম্রাট ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করিতেন। স্ব স্ব প্রাধান্য ঘোষণার জন্য তাঁহারা রাজসূয়, বাজপেয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন।

রাজতন্ত্র

পুরোহিত ও সেনানী

বৈদিক যুগে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে রাজতন্ত্র ব্যতীত গণতন্ত্রেরও অপ্রচলন ছিল না। রাজা সমস্ত রাজ্যের শাসন ও সমাজব্যবস্থার সর্ব্বোচ্চ পালক ও ধারক ছিলেন। আইনতঃ তাঁহার ক্ষমতা অসীম ছিল, তবে তিনি 'সভা' ও 'সমিতি' এই দুইটি পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। 'সভা' ছিল রাজ্যের জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধদের পরিষদ, আর 'সমিতি' ছিল জনসাধারণের পরিষদ। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ আহ্বান করা বা ইহাদের মতামত গ্রহণ করা রাজার ইচ্ছাধীন ছিল।

সভা ও সমিতি

রামায়ণ ও মহাভারত

মহাকাব্যদ্বয় রামায়ণ ও মহাভারত :—বৈদিক যুগের শেষভাগকে সাধারণতঃ রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ অথবা মহাকাব্যের যুগ বলা হইয়া থাকে। এই ভাবে বৈদিক ও মহাকাব্যের যুগকে পৃথক করা সঙ্গত নহে কেন না মহাকাব্যের কাল বৈদিক যুগেরই অংশবিশেষ।

বৈদিকোত্তর সাহিত্যের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারত সর্ব্বযুগের ও সর্ব্বকালের জনপ্রিয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থদ্বয়ে বৈদিকোত্তর যুগের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতি বহু বিষয়ের সংবাদ অবগত হওয়া যায়। বাল্মীকি রামায়ণের এবং ব্যাসদেব মহাভারতের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তবে এই দুইখানি গ্রন্থেরই প্রত্যেকটি কোনও একক ব্যক্তির রচনা বা কোনও এক সময়ে রচিত হয় নাই। লোকসঙ্গীত বা গাথারূপে এই গ্রন্থদ্বয়ের কাহিনী প্রথমে লোকমুখে গীত হইত। পরে এই সমস্ত গাথা গ্রন্থরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়।

কাব্যদ্বয়ের পৌর্ব্বাপর্য্য

মহাকব্যদ্বয়ের মধ্যে কোনখানা পূর্ব্ববর্ত্তী এবং কোনখানা পরবর্ত্তীকালের তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে অনেকে রামায়ণকে আর্য্যদের প্রাথমিক যুগের রচনা বলিয়া মনে করেন। রামের লঙ্কাবিজয়ের কাহিনীর মধ্যে আর্য্যগণের দক্ষিণ ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়াসের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। এতদ্ব্যতীত রামায়ণ হইতে দেখা যায় যে আর্য্যসভ্যতা মাত্র আর্য্যাবর্ত্তে অর্থাৎ উত্তর ভারতেই সীমাবদ্ধ আছে। আর মহাভারতের যুগে আর্য্য-সভ্যতা পশ্চিমে গান্ধার, পূর্ব্বে বঙ্গদেশ ও মণিপুর এবং উত্তরে হিমালয় ও নেপাল এবং দক্ষিণে গোদাবরী ও তাপ্তী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। মহাভারতে পারদ, যবন, বাহ্লীক প্রভৃতি বহির্ভারতীয় জাতির উল্লেখও রহিয়াছে।

রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা

মহাকাব্যদ্বয় হইতে সমসাময়িক যুগের বিবিধ সংবাদ জানা যায়। এই যুগের রাষ্ট্র ছিল রাজতান্ত্রিক—রাজার কর্ত্তব্য ছিল প্রজানুরঞ্জন। রাষ্ট্রে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি দৈবদুর্ব্বিপাক ঘটিলে তজ্জন্য রাজাই দায়ী হইতেন। এই যুগে জাতিভেদ অন্মায়ত ছিল—তবে জাতিভেদের কঠোরতা কখনও শিথিল করা হইত; এই যুগ ছিল ক্ষত্রিয় প্রাধান্যের। একাধিক বিবাহ ও স্বয়ম্বর প্রথা এ যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। কৃষিই জীবিকার প্রধান উপায় ছিল এবং কৃষিকার্য্য সম্মানার্হ এই যুগে অশ্বমেধ, রাজসূয় এবং অন্যান্য যাগযজ্ঞ প্রচলিত ছিল। বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, যম, বরুণ ব্যতীত শিব ও বিষ্ণু এই যুগের দেবতা ছিল।

আর্য্য-অনার্য্য সভ্যতার সমন্বয়ঃ—বহিরাগত আর্য্যগণ এখানকার অধিবাসী অনার্য্যদিগকে পরাভূত করিয়া নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল। বিজিত অনার্য্যগণ দাস বা শূদ্রের পর্য্যায়ে আর্য্যসমাজে গৃহীত হইয়াছিল। প্রথম দিকে অবশ্য উভয় শ্রেণীর বিরোধিতা তীব্র থাকায় পারস্পরিক সামাজিক মিলন সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু কালক্রমে এই বিদ্বিষ্ট মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে এবং উভয় শ্রেণীর মধ্যে সম্প্রীতি ও মিশ্রণ সংঘটিত হয়। অনার্য্য সভ্যতা আর্য্যদের অপেক্ষা একেবারে হীন ছিল না এবং অনার্য্যরা সংখ্যাগুরুও ছিল। সংঘর্ষের তীব্রতা হ্রাসের পরে আর্য্য-অনার্য্যদের মধ্যে বিবাহ ও আচার ব্যবহারের বিনিময় দেখা যায়। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলিয়া আমরা যাহার গর্ব করি তাহা উভয় সভ্যতার সমন্বয়ের উৎকৃষ্ট ফল।

ভারতীয় সংস্কৃতি উভয় সভ্যতার সমন্বয়ে উদ্ভূত

উভয় জাতির সংমিশ্রণে যে উচ্চতর সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টি হয় তাহা পারস্পরিক গ্রহণ ও বিনিময়ের দ্বারাই সম্ভবপর হইয়াছে। আর্য্যগণের সভ্যতা ছিল গ্রামীন; আর অনার্য্যদের সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক। আর্য্যগণ যখন গ্রামীন সভ্যতার স্তর অতিক্রম করিয়া নাগরিক সভ্যতার স্তরে উন্নীত হইতেছিল তখন স্বভাবতই তাহারা নাগরিক সভ্যতার অত্যাবশ্যক উপাদান সমূহ অনার্য্য সভ্যতার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিল। নগরনির্মাণ, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি বিদ্যা আর্য্যগণ অনার্য্যদের নিকট শিখিয়াছিল। ধর্মের দিক হইতেও অনার্য্যগণ আর্য্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাহাদের ধর্মের দেবদেবী, পূজাপদ্ধতি বা রীতিনীতি আর্য্যসমাজে স্থান লাভ করিয়াছিল। শ্মশানবাসী শিব, নৃমুণ্ডমালিনী কালীমাতা বা দুর্গা অনার্য্যদের দেবী বলিয়াই অনুমিত হয়। লিঙ্গ পূজাও অনার্য্য প্রভাবের ফল বলিয়া মনে হয়। অনার্য্যগণ গোজাতিকে শ্রদ্ধা করিতেন ; ইহাদের প্রভাবের ফলেই সম্ভবতঃ আর্য্যগণ গো জাতিকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিল। আর্য্যদের দৈনন্দিন আচার ব্যবহারের বহু রীতি ও উপকরণও অনার্য্যদের দান। তৈল, সিন্দুর, কার্পাস, মাছ, মাংস, শাঁখা-সিন্দুর ব্যবহার, পূজাপার্বণে পশুবলি, নারিকেল, কলা, সিন্দুর প্রভৃতির ব্যবহার অনার্য্যদের নিকট হইতেই গৃহীত হইয়াছে। ভাষার ব্যাপারেও উভয় শ্রেণীর মধ্যে আদানপ্রদান হইয়াছিল— উত্তর ভারতীয় অনার্য্যগণ আর্য্য

আর্য্যদের নাগরিক সভ্যতায় অনার্য্য প্রভাব

আর্য্যদের ধর্মের মধ্যে অনার্য্য প্রভাব

রীতিনীতি

ভাষা

ভাষা গ্রহণ করিয়াছিল আর অনার্য্যদের পৈশাচ ভাষা আর দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়দের ভাষার শব্দসম্ভার আর্য্য ভাষার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

পারলৌকিক কার্য্যে অনার্য্য প্রভাব

অন্ত্যেষ্টি সংকারের ব্যাপারেও অনার্য্য প্রভাব আর্য্যদের মধ্যে প্রবেশ করে। প্রাচীন আর্য্যগণ মৃত দেহ সমাধিস্থ করিত, পরে অনার্য্যদের অনুকরণে মৃতদেহ দাহ করিতে আরম্ভ করিল। শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান প্রভৃতি পারলৌকিক কার্য্যও সম্ভবতঃ অনার্য্য মিশ্রণের ফল।

প্রশ্নোত্তর

1. Give the history of the Aryanisation of the Northern and Southern India.

আর্য্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের আর্য্যবিজয়ের কাহিনীর বিবরণ দাও।

উত্তর সূত্র : আর্য্যগণ খৃষ্টপূর্ব দুই সহস্র অব্দের নিকটবর্তী কোনও এক সময়ে মধ্য এশিয়ার কোনও একস্থান হইতে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল দিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। অবশ্য আর্য্যগণ একই সময়ে বা একসঙ্গে ভারতে প্রবেশ করেন নাই—বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া তাঁহারা ভারতে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে তাঁহারা সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে অর্থাৎ কাবুল হইতে থানেশ্বর পর্য্যন্ত স্থানে তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমশঃ সপ্তসিন্ধু অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে মগধ অর্থাৎ দক্ষিণ বিহার পর্য্যন্ত তাহাদের আধিপত্য স্থাপন করেন। বৈদিক যুগে দীর্ঘকাল যাবৎ যমুনা নদীই আর্য্যাবর্তের দক্ষিণসীমা ছিল। বৈদিক যুগের শেষভাগে দাক্ষিণাত্যে, বঙ্গদেশে ও আসামে আর্য্যদের বসতি বিস্তৃত হয়। বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করিয়া অগস্ত্যমুনির দাক্ষিণাত্যে প্রয়াণের কাহিনীর মধ্যে এই অঞ্চলে আর্য্যাধিকারের সূত্রপাতের ইতিহাস লুক্কায়িত আছে বলিয়া মনে হয়। রামায়ণের মধ্যেও গোদাবরীর দক্ষিণে এবং সুদূর সিংহলে আর্য্যপ্রভাব বিস্তারের কাহিনী প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে।

2. Give, in brief, an account of the social and economic life of the Vedic Aryans.

বৈদিক আর্য্যদের ধর্মব্যবস্থা, সাহিত্য ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তর-সূত্র : (১) ধর্মব্যবস্থা—ঋগ্বেদ হইতে বৈদিক যুগের ধর্মব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা সাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে দেখা যায় যে এই ধর্ম ছিল সহজ, সরল

ও অনাড়ম্বর। প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশকে দেবদেবীজ্ঞানে পূজা করিত—মরুৎ, ইন্দ্র, রুদ্র, পর্জন্য, অগ্নি, ধাতৃ, বিধাতৃ, বিশ্বকর্মা, প্রজাপতি, শ্রদ্ধা, মন্যু (ক্রোধ) ইত্যাদি দেবতার উপাসনা করিত। বৈদিক ধর্মের বৈশিষ্ট্য ইহা ছিল পুরুষ দেবতা প্রধান। ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ইহাতে পৌত্তলিকতা বা মূর্তির কোন স্থান ছিল না। বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসক হইলেও আর্য্যগণ একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। যজ্ঞীয় কার্য্যবিধি ও তাহাদের অনুষ্ঠান বৈদিক ধর্মে এক প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। মৃত্যু ও পরলোক সম্বন্ধে বৈদিক আর্য্যদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না।

(২) সাহিত্য—বৈদিক সাহিত্যই বৈদিক যুগ সম্বন্ধে সকল কিছু জানিবার একমাত্র উৎস। বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে বেদই প্রথম স্থানের অধিকারী: চতুর্বেদ-ঋগ্বেদ মন্ত্রবাচক, সামবেদ সঙ্গীতবাচক, যজুর্বেদ যজ্ঞবাচক ও অথর্ববেদ বেদ সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন।

বৈদিক সাহিত্য বিপুলায়তন বিশিষ্ট—সংহিতা-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদ:, সূত্র-সাহিত্য:, বেদাঙ্গ ও ষড়দর্শন। এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত আয়ুর্বেদশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, ধনুর্বিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা সম্বন্ধেও বহু গ্রন্থ রহিয়াছে।

(৩) রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা: আর্য্যদের প্রথম যুগে গোষ্ঠীতন্ত্র ছিল—ক্রমশ: আর্য্যগণ গোষ্ঠীতন্ত্র হইতে উন্নীত হইয়া রাজতন্ত্র গ্রহণ করে। রাজতন্ত্র সাধারণতঃ বংশানুক্রমিক ছিল—রাজা পুরোহিত ও সেনানীর সাহায্যে শাসন করিতেন। রাজা রাজ্যের যাবতীয় ব্যাপারে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হইলেও তাঁহার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ ছিল না। প্রথমতঃ, রাজক্ষমতা ব্রাহ্মণ-শক্তিকে উপেক্ষা করিতে পারিত না। দ্বিতীয়তঃ, রাজাকে গ্রামবৃদ্ধ ও মন্ত্রীবর্গের মতামত গ্রহণ করিয়া চলিতে হইত। তৃতীয়তঃ, গণ-পরিষদ জাতীয় দুইটি সংস্থা, সভা ও সমিতির মতামতকে রাজা অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না। রাজা অত্যাচারী হইলে সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজা বিতাড়িত হইতেন।

3. Discuss the effects of the intermixture of the Aryan and the Non-Aryan civilizations.

আর্য্য ও অনার্য্য সভ্যতার পারস্পরিক মিশ্রণের ফল আলোচনা কর।

উত্তর-সূত্র : (১) ভূমিকা—আর্য্যগণ বাহির হইতে আসিয়া ভারতের অধিবাসী অনার্য্যদিগকে পরাজিত করিয়া নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করে। প্রথম দিকে অবশ্য উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিরোধিতা তীব্র থাকায় উভয় পক্ষের মধ্যে সামাজিক মিলন বা রীতিনীতির আদান প্রদান সম্ভবপর হয় নাই। কালক্রমে বিজেতা-বিজিত বৈরীভাব দূর হইলে উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও মিশ্রণ এবং বিবাহ ও আচার ব্যবহারের

বিনিময় দেখা যায়। ভারতীয় সভ্যতা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আর্য্য-অনার্য্য সভ্যতার সমন্বয়ের উৎকৃষ্ট ফল।

(২) অনার্য্যদের নাগরিক সভ্যতা গ্রামীন সভ্যতা বিশিষ্ট আর্য্যগণ গ্রহণ করে এবং নাগরিক সভ্যতার অপরিহার্য্য উপাদান নগরনির্মাণ, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি বিদ্যাও গ্রহণ করে।

(৩) অনার্য্যদের দেবদেবী, পূজাপদ্ধতি—শিব, কালী, দুর্গা প্রভৃতির পূজা আর্য্যগণ গ্রহণ করে।

(৪) অনার্য্যদের রীতিনীতি ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বহু উপকরণ আর্য্যগণ নিজস্ব করিয়া লয়।

(৫) ভাষার ব্যাপারেও উভয় শ্রেণীর মধ্যে আদান-প্রদান হইয়াছিল।

(৬) পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মেও আর্য্যগণ অনার্য্যরীতি গ্রহণ করিয়াছিল।

4. Write notes on (a) Varna and Ashrama (b) The Vedas (c) The Ramayana and the Mahabharata.

টীকা লিখ—(ক) বর্ণ ও আশ্রম (খ) চতুর্বেদ (গ) রামায়ণ ও মহাভারত

উত্তর সূত্র: (ক) ৫৮ পৃষ্ঠা (খ) ৫৪ পৃষ্ঠা (গ) ৬০ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নব ধর্মের অভ্যুদয় : জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম

Syllabus : Religious movements—Jainism and Buddhism; their organization, literature and art (Buddhist art in India, Ceylon, China, Indo-China and Central Asia should be referred to.)

পাঠ্যসূচী :—ধর্ম সম্পর্কিত বিবিধ আন্দোলন—জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম : উভয় ধর্মের সংগঠন ব্যবস্থা—সাহিত্য ও শিল্প (ভারত, সিংহল, চীন, ইন্দো-চীন ও মধ্য এশিয়ার উল্লেখ সহ ।

বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া : বৈদিক যুগে ভারতীয়গণের ধর্ম ও সমাজ জীবন সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর ছিল। কিন্তু এই সরলতা ক্রমশঃ বৈদিক সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল এবং কালক্রমে বৈদিক ধর্মে বিবিধ আচার অনুষ্ঠান, পশুবলি ও জটিল ক্রিয়াকাণ্ডের আধিক্য দেখা দিল। জটিল যজ্ঞবিধি ও পূজার্চনা সম্পাদনের জন্য এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞের সাহায্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল। এই ভাবে পুরোহিত নামধারী বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর সৃষ্টি হইল এবং লোকে ধর্মাচরণের জন্য পুরোহিতের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইল। এই ভাবে সমাজে পুরোহিত শ্রেণীর প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত বর্ণভেদের কঠোরতাও ক্রমশঃ বৈদিক সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। বৈদিক সমাজের আদিযুগে বৃত্তি অনুযায়ী বর্ণবিভাগ হইয়াছিল বলিয়া বৃত্তি বা কর্মের জন্য উচ্চনীচ স্তরভেদ ছিলনা—বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে পানভোজন বা বিবাহাদিও নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু ক্রমশঃ এই উদারতার পরিবর্তে বর্ণভেদের কঠোরতা সমাজের মধ্যে প্রচলিত হয়, জন্মায়ত্ত জাতিভেদের সূচনা হয় এবং সমাজের নিম্ন স্তরের লোকেরা উচ্চশ্রেণীর দ্বারা ঘৃণিত ও অবহেলিত হইতে থাকে—শূদ্র ও নারীর বেদপাঠ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বৈদিকোত্তর যুগে দেখা গেল যে ধর্মজীবনে ব্রাহ্মণ আধিপত্য স্থাপন করিতেছে এবং

আদি যুগের সরলতার স্থলে জটিলতা

আচার অনুষ্ঠানের প্রাবল্য

এই শ্রেণী আত্মপ্রাধান্য স্থায়ী করার জন্য ধর্ম ও সমাজবিধিতে বিভিন্ন বিধিনিষেধের প্রবর্তন করিতেছে। ধর্মকর্মের জটিলতা, আচারকেন্দ্রিকতা ও ব্রাহ্মণ আধিপত্যের বিরুদ্ধে ক্রমশঃ অস্ফুট প্রতিবাদ আরম্ভ হইল—সহজ, সরল ও জনসাধারণের অধিগম্য নূতন ধর্ম পন্থা উদ্ভাবনের চেতনা জাগিয়া উঠিল। ইতিপূর্বেই উপনিষদের অমূল্য বাণীর মধ্য দিয়া জনমানসের স্বাধীন চিন্তাধারার সহিত পরিচয় হইয়াছিল। এই স্বাধীন চিন্তাধারা বৈদিক ধর্মবিরোধী—নূতন নূতন ধর্মমত সৃষ্টিতে সহায়তা করিল। ফলে যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডমূলক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বহু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। নিষ্ঠুর পশুবলি ও আচারসর্বস্ব বৈদিক ধর্মের স্থলে অহিংসা ও সরল মতবাদ ক্রমশঃ লোকের মনকে আকৃষ্ট করিল। ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়গণই এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে যে কয়টি নূতন ধর্মীয় মতবাদ প্রাধান্য লাভ করিল সেইগুলির প্রতিষ্ঠাতা ক্ষত্রিয়ই ছিলেন। এই নূতন মতবাদের মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধ মতবাদই প্রাধান্য লাভ করে—পূর্ব ভারতের দুইজন ক্ষত্রিয় রাজকুমার বর্দ্ধমান মহাবীর ও সিদ্ধার্থ গৌতম এই দুই মতবাদের প্রবর্ত্তক।

বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও নূতন ধর্মমতের উদ্ভব

জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব

বলা বাহুল্য যে অনুষ্ঠানসর্বস্ব ও জটিল ক্রিয়াকাণ্ডবিশিষ্ট বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হইলেও মূলতঃ এই দুইটি মতবাদকে বৈদিক ধর্মমতের অনুবর্তী ধর্ম বলা যাইতে পারে। এই মতবাদদ্বয় মাত্র বেদের প্রাধান্যকে অস্বীকার করিত—নতুবা বৈদিক ধর্মের কর্মফল, জন্মান্তরবাদ তাহারা মানিয়া লইয়াছিল। 'অহিংসা' বৌদ্ধ বা জৈনধর্মের নিজস্ব ছিল না—হিন্দুধর্মেও অহিংসার স্থান আছে। বৈদিক ধর্মের বর্ণাশ্রম প্রথাকে ইহারা বাহ্যত অস্বীকার করিলেও বর্ণাশ্রম ধর্মের ভিত্তিমূলক সামাজিক কাঠামোকে ইহারা অস্বীকার করে নাই। জৈনধর্ম বর্ণাশ্রম প্রথাকে স্পষ্টতঃ স্বীকারই করে। মোট কথা ইহাদিগকে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত উপধর্ম বলিলে অন্যায় করা হইবে না।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম বেদবিরোধী হইলেও সম্পূর্ণ পৃথক নহে

বর্দ্ধমান মহাবীর ও জৈনধর্ম ঃ—জৈনগণের মতে চব্বিশজন তীর্থঙ্কর বা মুক্তিপথের প্রদর্শক ধর্মোপদেষ্টা জৈনধর্মের প্রবর্তক। ইহাদের মধ্যে শেষ দুইজনের নাম পার্শ্বনাথ ও বর্দ্ধমান মহাবীর। ঐতিহাসিকগণের মতে পার্শ্বনাথই জৈন ধর্মের প্রকৃত প্রবর্ত্তক। কথিত আছে পার্শ্বনাথ বারাণসীর এক ক্ষত্রিয় রাজপুত্র ছিলেন।

ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন এবং বারাণসীর সন্নিকটে সিদ্ধিলাভ করেন। অহিংসা, অনৃত (সত্যভাষণ), অস্তেয় (অ-চৌর্য্য) ও অপরিগ্রহ (ত্যাগ বা সন্ন্যাস) এই চতুর্যাম বা চারি প্রকার সংযমই ছিল তাঁহার ধর্মের মূলমন্ত্র। বর্দ্ধমান মহাবীর পার্শ্বের এই চারিটি সংযমের সঙ্গে জিতেন্দ্রিয়তার সঙ্কল্প জৈনদেব অবশ্যপাল্য বলিয়া সংযুক্ত করেন।

পূর্ব্ববর্তী তীর্থঙ্করগণঃ পার্শ্বনাথ

বর্দ্ধমান মহাবীর

বর্দ্ধমান মহাবীর :—বর্দ্ধমান মহাবীর জৈন ধর্মে স্বীকৃত চতুর্বিংশতি বা সর্বশেষ তীর্থঙ্কর। তাঁহার বাল্যপরিচয় সঠিক জানা যায় না। তিনি বৃজি প্রজাতন্ত্রের রাজধানী বৈশালীর উপকণ্ঠে কুন্দপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সিদ্ধার্থ কুন্দপুরে 'জ্ঞাতৃক' নামে এক ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীর অধিপতি ছিলেন—মাতা ত্রিশলা ছিলেন বিম্বিসারের আত্মীয়া। বর্দ্ধমান যৌবনে যশোদা নাম্নী এক নারীকে বিবাহ করেন এবং ত্রিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। দ্বাদশ বৎসর একনিষ্ঠ সাধনা ও কৃচ্ছ্র সাধনের পর তিনি 'কৈবল্য' লাভ করেন এবং দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হন। অতঃপর তিনি কেবলিন্ (সর্বজ্ঞ), জিন (জয়ী) ও মহাবীর এই নামে পরিচিত হন। তারপর তিনি

জীবনী

মগধ, অঙ্গ, কোশল প্রভৃতি দেশে তাঁহার ধর্মমত প্রচার করেন। ত্রিশ বৎসর কাল ধর্মপ্রচারের পরে পাটনা জেলার পাবা নামক স্থানে তাঁহার তিরোভাব হয়।

মহাবীরের মতবাদের অনুগামিগণের প্রথমে নাম ছিল 'নির্গ্রন্থ' অর্থাৎ অজ্ঞানের গ্রন্থি বা বন্ধন হইতে মুক্ত। পরবর্তীকালে মহাবীরের জিন উপাধি অনুসারে নির্গ্রন্থগণ জৈন নামে পরিচিত হন। কালক্রমে জৈনধর্ম দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর এই দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়। পার্শ্বের অনুগামিগণ শান্তির প্রতীক শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিত বলিয়া শ্বেতাম্বর আর মহাবীরের অনুগামিগণ নগ্নতা সর্বত্যাগের প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করায় দিগম্বর নামে পরিচিত।

নির্গ্রন্থ বা জৈন দুইশাখা :— দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর

জৈনধর্মের উপদেশ :— পার্শ্বনাথ প্রচারিত ধর্মকে পরিবর্তিত ও সংস্কৃত করিয়া মহাবীর জৈন ধর্মমতের প্রচার করেন। তিনি জিতেন্দ্রিয়তা ও চতুর্যামের চারিটি নিয়ম পালনকেই মানবজীবনের লক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করেন। জৈনগণ বেদকে অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন। তাহারা যাগযজ্ঞে অবিশ্বাস করে এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বও অস্বীকার করে। জৈনধর্ম অনুসারে জন্মান্তর ও কর্মফলের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভই মানবের প্রকৃত মুক্তি বা নির্বাণ। এই নির্বাণ লাভ করিতে হইলে সৎ জ্ঞান, সৎ-আচরণ ও সৎ-কর্ম এই 'ত্রিরত্নের' অনুশীলন করিতে হইবে। এই অনুশীলনের ফলেই মানুষ জন্মচক্র হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া মোক্ষলাভের অধিকারী হইবে। জৈনগণের মতে পার্থিববস্তু মাত্রের মধ্যেই প্রাণ রহিয়াছে—জগৎ-স্রষ্টা ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। মানবাত্মার মধ্যে যে শক্তি সুপ্ত রহিয়াছে তাহার সর্বোচ্চ বিকাশই ঈশ্বরে প্রকাশ। অহিংসা জৈনধর্মের মূলনীতি—তাহারা মৃত্তিকা প্রস্তর প্রভৃতি অজৈব পদার্থেরও প্রাণ আছে বলিয়া মনে করেন।

জৈন ধর্মের মূলমন্ত্র : অহিংসা, জীবে দয়া ও ইন্দ্রিয় জয়

খৃষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পাটলীপুত্রে এক জৈন মহাসভার অধিবেশন হয়। এই মহাসভায় মহাবীরের উপদেশাবলী ও জৈন ধর্মের নিয়মাবলী সঙ্কলিত হইয়া দ্বাদশটি খণ্ড বা উপাঙ্গে বিধিবদ্ধ করা হয়। এতদ্ব্যতীত খৃষ্টীয় পঞ্চ বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুজরাটের অন্তর্গত বলভীতে অপর একটি জৈন মহাসভার অধিবেশন হয়। এই সভাতেই জৈন ধর্ম সম্পর্কিত যাবতীয় গ্রন্থাদি নূতন করিয়া সঙ্কলিত হয়। দ্বাদশ অঙ্গ ব্যতীত উপাঙ্গ, মূলসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থও জৈনদের ধর্মশাস্ত্র বলিয়া পরিচিত।

জৈন সাহিত্য

জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্মের মত ভারতের বাহিরের প্রসার লাভ না করিলেও ইহা আজিও ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে পরিগণিত। জৈনধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের অল্পাধিক

সাদৃশ্য থাকায় জৈনধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের কোন সঙ্ঘর্ষ হয় নাই। বৌদ্ধধর্মের ন্যায় জৈনধর্ম কখনও প্রচার কার্যের জন্য উগ্র প্রচেষ্টা করেন নাই, ফলে অন্য ধর্মের আঘাত ইহাকে কম সহ্য করিতে হইয়াছে। জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্মের মত এত প্রসার লাভ করিতে না পারিলেও ইহার ইতিহাস একেবারে অগণ্য নহে। মৌর্য্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত, অশোকের পৌত্র সম্প্রাতি ও কলিঙ্গরাজ খারবেল জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন। শিল্পে ও স্থাপত্যে জৈনধর্মের দান অসামান্য—উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি গুহায় উৎকীর্ণ ভাস্কর্য্য জৈনশিল্পের কৃতিত্বের পরিচায়ক।

জৈনধর্মের ইতিহাস

গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম:—বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধার্থ নেপালের তরাই অঞ্চলের অন্তর্গত কপিলাবস্তুর অন্তর্গত লুম্বিনী (বর্তমান রুম্মিন্দেঈ) উদ্যানে বৈশাখী পূর্ণিমায় ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পিতা শুদ্ধোদন গণতন্ত্র শাসিত কপিলাবস্তুতে শাক্য-জাতির রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। পুত্রের জন্মের অল্পকাল পরেই মাতা মায়াদেবীর মৃত্যু হইলে সিদ্ধার্থ বিমাতা ও মাতৃষ্বসা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর দ্বারা লালিত পালিত হন। বাল্যকাল হইতে সিদ্ধার্থ অতি কোমল স্বভাব ছিলেন এবং অহিংসা ও জীবপ্রেমের পরিচয় দেন। ষোল বৎসর বয়সে পিতার জ্ঞাতি ভ্রাতা সুপ্রবুদ্ধের কন্যা যশোধরা (সুভদ্রকা, বিম্বা, গোপা প্রভৃতি নামেও পরিচিত) র সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। আবাল্য ভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইলেও সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তাঁহাকে তৃপ্তি প্রদান করিতে পারিল না—বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব সুখের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিল। মানুষের ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু প্রভৃতির সমস্যা তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি সংসার পরিত্যাগ করিবার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে উনত্রিশ বৎসর বয়সে সিদ্ধার্থের রাহুল নামে এক পুত্র সন্তান হয়। ইহাতে সংসারের মায়ার সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইতে যাইতেছেন বুঝিয়া তিনি একদিন রাত্রিতে রাজ্য ও সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই সংসারত্যাগের ঘটনা ইতিহাসে মহাভিনিষ্ক্রমণ নামে খ্যাত। কথিত আছে সংসারত্যাগের পূর্ব্বে সিদ্ধার্থ একজন জরাগ্রস্ত, একজন ব্যাধিগ্রস্ত ও একটি শবদেহ দেখেন এবং মনুষ্যজীবনের এই সকলই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ইহা অবগত হইয়া অত্যন্ত বিচলিত হন। অত্যল্পকাল পরে এক সৌম্যমূর্তি সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথোপকথনের পর তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন। গৃহত্যাগের পর তিনি মুক্তিজ্ঞান লাভের জন্য নানাস্থানে

বুদ্ধদেবের প্রথম জীবন

বিবাহ

সংসারে অনাসক্তি ও সংসার ত্যাগ

পরিভ্রমণ করেন এবং বিভিন্ন সাধুসন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনে দীর্ঘকাল রত থাকেন। তথাপি তিনি মুক্তির উপায় লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে উরুবিল্ব নামক স্থানে কঠোর তপস্যাচরণে ব্রতী হন। ক্রমশঃ তিনি উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে দেহনিপীড়ন বা শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা সত্যজ্ঞান বা মুক্তিপথের সন্ধান পাওয়া যায় না। তখন তিনি নৈরঞ্জনা নদীর জলে স্নান করিয়া বর্তমান বুদ্ধগয়ায় বোধি-বৃক্ষের নিম্নে গভীর আত্মচিন্তায় সমাহিত হইলেন। এই স্থানে বোধি বা পরম সত্যের আলোকে তাঁহার অন্তর উদ্ভাসিত হইল। এই বোধি বা দিব্যজ্ঞান লাভের পরে তিনি বুদ্ধ (পরমজ্ঞানী) বা তথাগত (সত্যোপলব্ধিকারী) বা শাক্যমুনি নামে পরিচিত হইলেন।

তপশ্চরণ

দিব্যজ্ঞান বা বুদ্ধত্বলাভ

বুদ্ধদেব

সিদ্ধিলাভের পরে বুদ্ধদেব কাশীর নিকট ইসিপত্তন (ঋষিপত্তন) গ্রামে মৃগদাবে পাঁচজন সন্ন্যাসীর নিকট সর্বপ্রথমে তাঁহার ধর্মমত প্রচার করেন। ৩৫ বৎসর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করেন এবং জীবনের অবশিষ্ট ৪৫ বৎসর কাল তিনি তিনি অযোধ্যা, বিহার এবং সন্নিহিত অঞ্চল সমূহে ধর্মপ্রচারে অতিবাহিত করেন। বুদ্ধদেব মগধরাজ বিম্বিসার ও কোশলরাজ প্রসেনজিতের সমসাময়িক ছিলেন। এই দুই নরপতিই বুদ্ধদেবের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। আশী বৎসর বয়সে তিনি বর্তমান উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত গোরক্ষপুর জেলায় কুশীনগরে (বর্তমান কাশিয়া) দেহরক্ষা করেন। সিংহলের লোকস্মৃতিতে অশোকের রাজ্যাভিষেকের ২১৮ বৎসর পূর্বে বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণ হয়। এই মতানুযায়ী বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের সময়কাল ৪৮৬ খৃষ্টপূর্বাব্দ।

ধর্মপ্রচার

কুশীনগরে মহাপরিনির্বাণ

বুদ্ধদেবের ধর্ম কয়েকটি বাস্তব সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধদেব বলিলেন—মানুষ আসক্তি বা কামনার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বার বার জন্মগ্রহণ করে। জন্মগ্রহণ করিলেই মানুষকে ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, আত্মীয়বিয়োগ, ঈপ্সিত বস্তুর অলাভ প্রভৃতি কয়েকটি অনিবার্য দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। এই দুঃখভোগের হাত হইতে নিষ্কৃতির উপায় জন্মগ্রহণের দায় হইতে একেবারে মুক্তিলাভ করা বা 'নির্বাণ' প্রাপ্তি। এই নির্বাণের উপায় হইল—মানুষকে আসক্তি অর্থাৎ পৃথিবীর সব কিছু বস্তু সম্বন্ধে লোভ হইতে মুক্ত হইয়া ন্যায় পথে চলিতে হইবে। এইভাবে ন্যায় পথে নিষ্কাম হইয়া জীবনযাপন করিলে মানুষের 'নির্বাণ' বা মোক্ষ আসিবে; মানুষ দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। বুদ্ধদেব এই জন্যই দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধের উপায় এই চারিটি আর্য সত্যকে (চত্বারি আর্য্যসত্যানি নূতন ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিলেন।

বৌদ্ধধর্মের মূলকথা

বৌদ্ধধর্মের মূল নির্দেশ দুঃখনিবৃত্তির উপায় নির্দ্ধারণ করা। দুঃখনিবৃত্তির জন্য তিনি অত্যধিক ভোগবিলাস বা কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন কোনটারই পক্ষপাতী ছিলেন না। হিন্দুদের যাগযজ্ঞ, বলিদান প্রভৃতি আড়ম্বরপূর্ণ-ক্রিয়াকর্মও তিনি পছন্দ করিতেন না। তাঁহার মতে 'মধ্যপন্থা' অবলম্বন করিলে অর্থাৎ সর্ববিষয়ে পরিমিত আচার পালন করিলে মানুষ দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। বৌদ্ধমতে ইহাই 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' নামে খ্যাত এবং ইহার অনুসরণে মানুষ সকল প্রকার ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া নির্বাণ লাভ করিতে

মধ্যপন্থা

পারে। সম্যক দৃষ্টি, সদ্বাক্য, সৎকর্ম, সৎসঙ্কল্প, সৎজীবন, সদ্ব্যায়াম বা চেষ্টা, সৎস্মৃতি ও সম্যকসমাধি এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ নির্বাণ লাভের উপায়রূপে গৃহীত হইয়াছে। অষ্টাঙ্গিক মার্গ ব্যতীত বুদ্ধদেব অহিংসা, সত্যবাদিতা, ব্রহ্মচর্য্য, অনাসক্তি, পরনিন্দা হইতে বিরত থাকার কথা বলিয়াছেন।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ

সঙ্ঘজীবন বৌদ্ধধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ধর্মে দীক্ষিত হইবার পূর্বে সমস্ত বৌদ্ধকে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হইতে হয়।

ত্রিরত্ন

বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র ও সঙ্গীতি :—বুদ্ধদেব জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় মৌখিক উপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি স্বয়ং ধর্মসম্বন্ধে কিছুই লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। জনসাধারণ যাহাতে তাঁহার উপদেশাবলীর মর্ম অনুধাবন করিতে পারে তজ্জন্য তিনি সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে সেকালের কথ্য ভাষা (পরে পালি নামে পরিচিত) ব্যবহার করিতেন। বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভের পরে তাঁহার শিষ্যগণ বুদ্ধদেবের বাণী সংগ্রহ ও সঙ্কলন করেন। প্রথম সঙ্কলন হয় বিহারের রাজগৃহে সপ্তপর্ণী গুহায়। ইতিহাসে ইহা প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি বা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিবেশন বলিয়া খ্যাত। প্রথম সঙ্গীতির একশত বৎসর পরে বৈশালী নগরীতে দ্বিতীয় সঙ্গীতি, অশোকের রাজত্বকালে পাটলীপুত্রে তৃতীয় সঙ্গীতি এবং কুষাণ নরপতি কনিষ্কের রাজত্বকালে সম্ভবতঃ কাশ্মীরে বা পাঞ্জাবের অন্তর্গত জলন্ধরে চতুর্থ সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল।

চারিটি বৌদ্ধ সঙ্গীতি বা মহাসভার অধিবেশন

বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থাকারে যে বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী সঙ্কলিত হইয়াছিল তাহা পালিভাষায় রচিত এবং ত্রিপিটক (তিনটি পেটিকা) নামে পরিচিত। ত্রিপিটক তিন অংশে বিভক্ত, (ক) সুত্রপিটক—ইহাতে বুদ্ধদেবের জীবনী ও বাণী আছে। (খ) বিনয়পিটক—ইহাতে বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পালনীয় নিয়মাবলী আছে। (গ) অভিধর্মপিটক—ইহাতে বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা আছে। সুত্রপিটক পাঁচভাগে বিভক্ত—প্রত্যেক ভাগকে নিকায় বলা হয়। পঞ্চম নিকায়ে জাতকের কাহিনীগুলি এবং উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ-দার্শনিক গ্রন্থ ধর্মপদ নিবদ্ধ রহিয়াছে।

ত্রিপিটক

বৌদ্ধ ও জৈন স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্প :—ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যের ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের দান স্মরণীয়। মহামতি অশোক বৌদ্ধধর্মে অনুরাগী হওয়ার পরে অসংখ্য স্তূপ, চৈত্য, স্তম্ভ ও বিহার নির্মাণ করেন। অশোকের আদেশে শিল্পিগণ পর্বত, স্তম্ভ ও গুহার গাত্রে

অশোক ও কনিষ্কের সময়ে

বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী খোদিত করেন। এই সব খোদিত লিপি ভারতীয় শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। কুষাণ নরপতি কনিষ্কের সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে বহু মূর্তি স্তূপ, চৈত্য ও বিহার নির্মিত হয়। এই সব নির্মাণ কার্য্যের শিল্পকৌশল অনবদ্য। গ্রীক ও ভারতীয় শিল্পের সমন্বয়ে এই সময়ে যে মূর্তি নির্মাণরীতি অনুসৃত হয় তাহা 'গান্ধার শিল্প' নামে খ্যাত। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতে অজন্তা ও ইলোরায় একটি শিল্পতীর্থ গড়িয়া উঠিয়াছিল—প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের প্রেরণা এই দুই স্থানের শিল্পকর্মের পিছনে ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্পে বৌদ্ধ-শিল্পরীতির যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। সাঁচি, ভারহুত, বুদ্ধগয়া, অমরাবতী, নালন্দা প্রভৃতি বহু স্থানে বৌদ্ধ-স্থাপত্যের আশ্চর্য্য নিদর্শন পাওয়া যায়। জৈনগণও স্তূপ, মঠ, বিহার প্রভৃতি নির্মাণ করিলেও বৌদ্ধদের ন্যায় ততটা কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে নাই।

অজন্তা-ইলোরা

অন্যান্য স্থানে শিল্প নিদর্শন

পাহাড় কাটিয়া গুহা, মঠ বা বিহার নির্মাণ বৌদ্ধ ও জৈন স্থাপত্যরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বরাবর ও নাগার্জুন পর্বতের বৌদ্ধ গুহা ও উড়িষ্যার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি পাহাড়ের জৈনগুহাগুলি এবিষয়ে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইলোরার জৈন মন্দির, জুনাগড়ের কয়েকটি জৈন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এবং রাজপুতানার আবুপর্বতস্থিত মন্দির জৈন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যশিল্পের সাক্ষ্য অদ্যাপি বহন করিতেছে।

পর্বত কাটিয়া গুহা, বিহার মঠ নির্মাণ

বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ভাস্কর্য্যশিল্পেরও আশ্চর্য্যজনক উন্নতি হইয়াছিল। ভাস্কর্য্য-শিল্পের নিদর্শনরূপে অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি ও জাতকে উল্লিখিত বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী, স্তম্ভ, গুহা, চৈত্য বা তোরণগাত্রে ক্ষোদিত রহিয়াছে। বৌদ্ধশিল্পের আদি যুগে বুদ্ধদেবের প্রতিকৃতি নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল—পরে মহাযান বৌদ্ধধর্মমতের উদ্ভব হইলে বুদ্ধদেবের প্রতিকৃতি নির্মাণ করা আরম্ভ হয়। স্তম্ভনির্মাণে ও বিবিধ অলঙ্করণকার্য্যে বৌদ্ধ শিল্পরীতি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। সুবৃহৎ স্তম্ভগুলির মসৃণতা, কারুকার্য প্রভৃতি শিল্পরীতির এক অপূর্ব অভিব্যক্তি। অশোক স্তম্ভের শীর্ষে ক্ষোদিত পশু মূর্তিগুলি ইহার অপূর্ব নিদর্শন।

ভাস্কর্য্য

বৌদ্ধ-শিল্পরীতি মাত্র ভারতে নহে, ভারতের বাহিরেও বহু দেশের শিল্প ও স্থাপত্য-কৌশলকেও প্রভাবিত করিয়াছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতেই সিংহল, ইন্দোচীন, চীন, মধ্য-এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও

সাংস্কৃতিক সংযোগ ছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রচারকগণ এই সকল স্থানে বৌদ্ধধর্মের প্রচার করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ শিল্প ও সাহিত্যের প্রভাব এই সকল স্থানে বিস্তার লাভ করিয়াছে। সিংহলের নরপতি, ধনী ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা দেশে অসংখ্য বৌদ্ধ চৈত্য ও সঙ্ঘারাম নির্মাণ ক সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল— তন্মধ্যে 'মহাবংশ' ও 'দীপবংশ' উল্লেখযোগ্য। প্রাচীনকালে আফগানিস্থানে ভারতীয়, বিশেষতঃ বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি, যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল। মধ্য-এশিয়ার খাসগড, ইয়ারখন্দ, নিয়া, তুরফান, কুচি প্রভৃতি স্থান যে একদা বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র ছিল তাহা প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য্যের ফলে জানা গিয়াছে। এই সকল স্থানে বহু চৈত্য ও সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর হোয়াং চোয়াং-এর বিবরণী হইতে জানা যায় যে মধ্য এশিয়ার এই সকল অঞ্চল বৌদ্ধধর্মের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। মধ্য এশিয়ার দান্দান উইলিকের প্রাচীর চিত্রে যে সকল ধ্যানীমূর্ত্তি ও বোধিসত্ত্বের রূপ দেখা যায় তাহা অজন্তা চিত্রগুহার অনুকরণ বলা যাইতে পারে। চীন সীমান্তে তুন-হোয়াং নামক স্থানে অনুপম ভাস্কর্য্য ও চিত্রে সুশোভিত পাঁচ শত গুহাগৃহ পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শিল্প-সংস্কৃতিতেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব অপরিসীম। এই বিষয়ে যবদ্বীপের বরবুদুরের স্তূপটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য—ইহা বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের অত্যাশ্চর্য্য নিদর্শন। যবদ্বীপের শৈলেন্দ্র বংশীয় নরপতিগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারা বরবুদুরের স্তূপ ব্যতীত বহু মন্দির ও চৈত্য নির্মাণ করেন। চীনদেশেও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য বৌদ্ধ মঠ ও সঙ্ঘারাম নির্মিত হয়। চীনদেশের স্থাপত্য ও মূর্তিশিল্পরীতিতে গান্ধার-শিল্পের রীতি অনুসৃত হইয়াছিল। শাক্যবুদ্ধ, বুদ্ধকীর্ত্তি ও কুমারবোধি নামে তিনজন ভারতীয় চিত্রশিল্পী যে চীনদেশে গিয়া চিত্রাঙ্কন করিয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বহু বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা, যাভা, বালি, বোর্ণিও প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধ শিল্প-রীতির অনুকরণে নির্মিত অসংখ্য মন্দির ও মূর্তি অদ্যাপি বিদ্যমান।

ভারতের বাহিরে বৌদ্ধ শিল্পরীতি ও সাহিত্য

সিংহল

মধ্য এশিয়া

চীন

৫ বৌদ্ধ ধর্মের সংগঠন :—সঙ্ঘশক্তি বা সংগঠন ব্যবস্থা ছিল বৌদ্ধধর্ম প্রসারের অন্যতম শক্তির উৎস। এই সংগঠন ব্যবস্থার দৃঢ় নিয়মশৃঙ্খলার বলেই বৌদ্ধধর্ম একদা এশিয়ার সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিস্তৃত হইতে সক্ষম হইয়াছিল।

বৌদ্ধদের ধর্ম জীবনের তিনটি প্রধান অঙ্গ ছিল—বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ। সকল বৌদ্ধকেই এই তিনটির প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিতে হইত। ইহাদের মধ্যে সঙ্ঘজীবনের স্থান অতি উচ্চে ছিল। বুদ্ধদেব স্বয়ং এই সঙ্ঘজীবনের সূচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রথম দিকে বুদ্ধভক্তগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া গৃহের পরিবর্তে অরণ্য বা গুহায় বাস করিতেন। বুদ্ধদেব মধ্যপন্থার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া শিষ্যদের এই কৃচ্ছ্রসাধন তাঁহার মনঃপূত হইত না। তিনি শিষ্যগণকে মঠে বাস করিয়া দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদ, আহার্য্য ও ঔষধপত্র গৃহস্থের নিকট হইতে দানরূপে গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। এইরূপে বৌদ্ধধর্মে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে সঙ্ঘ-জীবন যাপনের সূত্রপাত হয়।

বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ

শ্রেণী নির্বিশেষে প্রত্যেক নরনারীই সঙ্ঘের সভ্য হইতে পারিত। তবে সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার অর্জন করিতে হইলে প্রত্যেককে কিছুকাল কঠোর সংযত জীবনযাপনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইত। সঙ্ঘে প্রবেশার্থী 'ভিক্ষু'র অধিকার অর্জনেচ্ছু ব্যক্তিকে প্রথমে মস্তক মুণ্ডন পূর্বক উপযুক্ত গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইত। অতঃপর পীতবস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ পূর্বক তাহাকে কিছুকাল পরীক্ষার্থীরূপে সংযত ব্রহ্মচারী বা শ্রমণের জীবন যাপন করিতে হইত। কতিপয় উর্দ্ধতন ভিক্ষু তাহার এই পরীক্ষার্থী-জীবনের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন এবং তাহার আচরণ সন্তোষজনক বিবেচনা করিলে উর্দ্ধতম ভিক্ষুগণ তাহাকে ভিক্ষুরূপে স্থায়ীভাবে সঙ্ঘজীবন যাপনের অনুমতি দিতেন। দীক্ষিত ব্যক্তির ও ভিক্ষুদের মধ্যে বাস করা বাধ্যতামূলক ছিল। সঙ্ঘভুক্ত ভিক্ষুদের আহার্য্য বা দৈনন্দিন জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্যাদি গৃহী শিষ্যদের নিকট হইতে গ্রহণ করার নিষেধ ছিল না।

সঙ্ঘজীবন

সঙ্ঘসমূহের কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান না থাকিলেও বিভিন্ন সঙ্ঘের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ থাকিত। সঙ্ঘজীবন কঠোর নিয়ম-কানুনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সঙ্ঘের শাসনরীতি গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত হইত। ভিক্ষুগণ ভোটের দ্বারাই তাহাদের পরিচালক বা সঙ্ঘেশ্বর এবং অন্যান্য কর্মীদের নির্বাচিত করিতেন। মাসিক দুইবার মঠস্থ ভিক্ষু সন্ন্যাসীরা সভায় সমবেত হইতেন। সভায় 'ধর্ম' ও 'বিনয়' (নিয়ম শৃঙ্খলা) সম্বন্ধে আলোচনা করা হইত এবং সঙ্ঘভুক্ত কোন ভিক্ষু কোন প্রকার অপরাধ বা সঙ্ঘবিরোধী আচরণ করিলে উক্ত সভায় সে সম্বন্ধে বিচার হইত। অপরাধের গুরুত্ব বা লঘুত্ব অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া বা মার্জনা করা হইত। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে

কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা

সিদ্ধান্ত গ্রহণে সঙ্ঘভুক্ত সকল সভ্যের মতামত গ্রহণ করিতে হইত। ভিক্ষুণীরা সঙ্ঘের সভ্য হইতে পারিত এবং তাহাদের সঙ্ঘ ভিক্ষু সঙ্ঘের অধীন ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে অসংখ্য সঙ্ঘারাম বা বিহার ছিল। কথিত আছে, স্বয়ং অশোকই ৮৪,০০০ বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

সঙ্ঘের রীতিনীতি কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা ও গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত হইলেও শীঘ্রই সঙ্ঘজীবনে বিরোধ বিসম্বাদের সৃষ্টি হয় এবং বুদ্ধদেবের মৃত্যুর একশত বৎসরের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মে বিভিন্ন বিরোধী মতবাদের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির সময়ে এই বিরোধ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। স্বয়ং অশোককে পর্যন্ত অনুশাসন দ্বারা বৌদ্ধধর্মের অন্তর্বিরোধ নিবারণ করার চেষ্টা করিতে হইয়াছিল।

পশ্চাৎ অন্তর্বিরোধ

কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম হীনযান (প্রাচীনপন্থী) ও মহাযান (নবীনপন্থী) এই দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। বুদ্ধদেব কর্তৃক প্রবর্তিত আদি ও অপৌত্তলিক মতবাদ হীনযান নামে পরিচিত। মহাযান মতবাদ অনুসারে বৌদ্ধজীবনের আদর্শ হইতেছে—বুদ্ধকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা এবং ব্যক্তিগত 'নির্বাণ' লাভ অপেক্ষা সার্বজনীন মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা।

হীনযান ও মহাযান

জৈন সংগঠন:—বৌদ্ধধর্মের ন্যায় জৈনধর্মেও সংগঠনের পূর্ণ বিধিব্যবস্থা ছিল। জৈন সন্ন্যাসীদের দ্বারা গঠিত সঙ্ঘ সমূহই জৈন সংগঠনের মূল উৎস ছিল। জৈনগণ দেশে অসংখ্য জৈন বিহার বা সঙ্ঘারাম নির্মাণ করিয়াছিলেন। জৈন সন্ন্যাসীরা এই সমস্ত বিহারে বাস করিত। জৈনধর্মে ভিক্ষুদের ন্যায় ভিক্ষুণীদেরও স্থান ছিল এবং মহাবীর স্বয়ং ভিক্ষুণীদের সঙ্ঘ গড়িয়া তোলেন। দিগম্বর সম্প্রদায় ভিক্ষুণীদের অধিকার অস্বীকার করিলেও শ্বেতাম্বর জৈনরা নারীকে সঙ্ঘে পুরুষের সমান অধিকার প্রদান করেন। মঠবাসী জৈন সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীকে জৈনধর্মের অবশ্যপাল্য পাঁচটি নীতি—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অ-চৌর্য্য), ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ (বিবাহ না করা) কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই তিনভাবেই মানিয়া চলিতে হইত। এই ব্যবস্থা মহাব্রত বলিয়া পরিচিত। আর জৈন গৃহস্থগণও আংশিকভাবে এই বিধিনিষেধ অনুসরণ করিতে পারিতেন। ইহাকে অনুব্রত বলা হইত।

বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও পতনের কারণ:—বুদ্ধদেবের জীবিতাবস্থায় বৌদ্ধধর্ম বারানসী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং ক্ষুদ্র স্থানীয় ধর্মরূপে ইহা থাকিয়া যায়। প্রিয়দর্শী অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য আন্তরিক চেষ্টার ফলে

বৌদ্ধধর্ম ভারতের সর্বত্র এবং ভারতের বাহিরে প্রচারিত হয়। তাঁহারই আগ্রহের ফলে বৌদ্ধধর্ম স্থানীয় ধর্ম হইতে বিশ্বধর্মে পরিণত হইতে সমর্থ হয়। কুষাণদের নরপতি কনিষ্ক ছিলেন বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ও প্রচারক —হর্ষবর্দ্ধন কর্তৃক বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার কথা হিউয়েন সাং-এর বিবরণী হইতে জানা যায়। বাংলার পালবংশের নরপতিগণ, কাশ্মীর ও দাক্ষিণাত্যের বহু নরপতি বৌদ্ধধর্মের আনুকূল্য করিয়া ধর্ম প্রচারের কাজে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। ভারতের বাহিরেও আদর্শনিষ্ঠ ও সংযতচরিত্র প্রচারকগণের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম যথেষ্ট সমাদৃত হয়। বিদেশে প্রচারিত হওয়ার জন্য বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয় এবং বৌদ্ধধর্ম বিদেশের পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থার অনুকূল রূপ পরিগ্রহ করে। বিভিন্ন রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত বৌদ্ধধর্মের আভ্যন্তরীণ বহু গুণের জন্য এই ধর্ম সহজেই জনসাধারণের দ্বারা সমাদৃত ও গৃহীত হইয়াছিল। ক্রিয়াকাণ্ডের জটিলতার অভাব, সর্বশ্রেণীর অবাধ প্রবেশাধিকার ও সহজ সাধারণ বোধ্য ভাষায় রচিত ধর্মোপদেশ থাকায় ইহা সহজেই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

উন্নতির কারণ

কিন্তু কালক্রমে বৌদ্ধধর্মে এই সমস্ত গুণের অভাব দেখা দিল এবং বৌদ্ধধর্মের সহজ সরল রূপ পরিবর্তিত হইয়া ইহা হিন্দুধর্মের ন্যায় জটিল মন্ত্রতন্ত্রের আধার হইয়া উঠিল। অনাড়ম্বর সহজপাল্য নৈতিক নিয়মাবলী অনুসরণের পরিবর্তে বুদ্ধমূর্তির পূজা ও বুদ্ধভক্তি প্রাধান্যলাভ করিল। বৌদ্ধধর্মে হিন্দুর তান্ত্রিক মতবাদ প্রবেশ করিলে বৌদ্ধধর্মের বিশিষ্ট রূপ ক্ষুণ্ণ হয় এবং স্বয়ং বুদ্ধদেব হিন্দুর দশাবতারের অন্যতম রূপে পরিগণিত হন। গুপ্ত বংশের সময়ে এবং পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটে। কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব ও প্রচারকার্য্যের ফলে হিন্দুধর্ম পুনরুদ্দীপিত হয় এবং ইহাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বৌদ্ধধর্ম হীনদশা প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে মুসলমান বিজয়ের ও অত্যাচারের ফলে বৌদ্ধ-ধর্মের শেষ রশ্মিটুকুও ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হয়।

পতনের কারণ

হিন্দুধর্মের সহিত জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের তুলনা:—ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের বিরোধীরূপেই হিন্দু ও জৈন ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে সত্য কিন্তু নানা পার্থক্য সত্ত্বেও জৈন ও বৌদ্ধ মতবাদ হিন্দুধর্মেরই বিদ্রোহী নবরূপ। এই দুইটি ধর্ম বেদের প্রাধান্য অস্বীকার করিলেও হিন্দুধর্মের কর্মফল, জন্মান্তরবাদ ও দুঃখনিবৃত্তিবাদ গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকা উভয় ধর্মেই নিষিদ্ধ নহে। জৈনগণ হিন্দুর অনেক দেবদেবীতে বিশ্বাসী এবং ধর্মকার্য্যে হিন্দুদের ন্যায় তাহারা পুরোহিত নিযুক্ত করে। অবশ্য জৈনগণ হিন্দুর দেবদেবী অপেক্ষা তীর্থঙ্করদিগকে অধিকতর পূজ্য

বলিয়া মনে করে। জৈনধর্ম হিন্দুধর্মের বর্ণাশ্রম প্রথাকে একেবারে অস্বীকার করে না—আর বৌদ্ধধর্ম হিন্দুর জন্মায়ত্ত জাতিভেদ স্বীকার না করিলেও বর্ণাশ্রমধর্মের ভিত্তিমূলক সামাজিক কাঠামোকে ধ্বংস করে নাই। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অহিংসার আভাস হিন্দুর উপনিষদের মধ্যে নিহিত আছে। এই দুটি ধর্মে অহিংসানীতি যত কঠোরতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে স্বীকৃত হয় হিন্দুধর্মে ততটা হয় না। মাত্র একটি ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের সঙ্গে ইহাদের পার্থক্য বিশিষ্ট মাত্রায় রহিয়াছে। হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠান ও ধর্মজীবন প্রধানতঃ ব্যক্তিনিষ্ঠ, পক্ষান্তরে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম সমষ্টিনিষ্ঠ বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে পালনীয়। সন্ন্যাসীর স্থান হিন্দুধর্মেও রহিয়াছে কিন্তু এই দুই ধর্মের সঙ্ঘের মত হিন্দুধর্মের সন্ন্যাসীরা কোন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা এত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত নহে।

তিন ধর্ম পরস্পরের প্রভাবপুষ্ট হইয়া পড়িল

প্রথম দিকে এই তিনটি ধর্মের মধ্যে পরস্পর বিরোধী মনোভাব থাকিলেও কালক্রমে তিন ধর্মের মধ্যে বিরোধিতা ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল এবং তিনটি ধর্মই পরস্পরের প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িল। বৌদ্ধধর্ম মূলতঃ অপৌত্তলিক হইলেও হিন্দুধর্মের দেবদেবী পূজার প্রভাবে বুদ্ধকে দেবতা-জ্ঞান করিয়া বৌদ্ধেরা বুদ্ধমূর্তির পূজা করিতে আরম্ভ করিল। বুদ্ধদেব হিন্দুদের অন্যতম অবতাররূপে গৃহীত হইলেন। জৈনগণ হিন্দুধর্মের পূজাবিধি, ব্রাহ্মণ পুরোহিত ইত্যাদি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের ধর্মীয় ভাষা সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। জৈন তীর্থঙ্করগণও হিন্দু সমাজে সমাদৃত হইতে লাগিলেন। এই ভাবে যুগপরম্পরায় গ্রহণ-বিনিময়ের ফলে তিনটি ধর্মের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং তিন ধর্মাবলম্বী লোকের দৈনন্দিন ও গার্হস্থ্য জীবন প্রায় একই রূপ ধারণ করিল।

প্রশ্নোত্তর

1. **Write briefly the life and teachings of Buddha.**

বুদ্ধদেবের জীবনী ও ধর্মমত সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিখ

উত্তর সূত্র : (১) বুদ্ধদেবের জীবনী : (ক) ভূমিকা : বৈদিকোত্তর যুগে হিন্দুধর্মের মধ্যে যে ধর্মকর্মের জটিলতা, আচারকেন্দ্রিকতা ও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য দেখা দিল তাহার বিরুদ্ধে যে বহু ধর্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল জৈন ও বৌদ্ধধর্ম তাহাদের মধ্যে অন্যতম। অনুষ্ঠানসর্বস্ব ও জটিল ক্রিয়াকাণ্ডবিশিষ্ট হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হইলেও এই দুইটি মতবাদকে বৈদিক ধর্মমতের অনুবর্তী ধর্ম

বলা যাইতে পারে। গৌতম বুদ্ধ ছিলেন বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। (বুদ্ধদেবের জীবনী (৭৯ পৃষ্ঠা)

(২) **বৌদ্ধধর্মমত :** (৭৩ পৃষ্ঠা)

2. Give in brief the life and teachings of Mahavira.

মহাবীরের জীবনী ও ধর্মমত সম্বন্ধে বিবরণ দাও।

উত্তর-সূত্র : (১) **মহাবীরের জীবনী :** (ভূমিকা বুদ্ধদেবের জীবনীর অনুরূপ ৭১ পৃষ্ঠা)

(২) **জৈন ধর্মমত**—(৭২ পৃষ্ঠা)।

3. Discuss briefly the spread and decline of Buddhism.

বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও পতনের কারণ আলোচনা কর।

উত্তর-সূত্র : (১) **বৌদ্ধধর্মের প্রসারের কারণ :**—(ক) ধর্মের আভ্যন্তরীণ গুণ : ইহাতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জটিল ক্রিয়াকাণ্ড ছিলনা বলিয়া জনসাধারণ সহজেই ইহার মধ্যে অধ্যাত্মক্ষুধা পরিতৃপ্তির উপাদান প্রাপ্ত হইল। অধিকন্তু সমাজের সর্বশ্রেণীর পক্ষে অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল বলিয়া বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বর্ণাশ্রমের ন্যায় সামাজিক বৈষম্যের বিধান না থাকাও বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। সর্বোপরি সহজ সরল ও সাধারণবোধ্য ভাষায় বৌদ্ধধর্মের বাণী ও ধর্ম রচিত ও প্রচারিত হওয়ায় জনসাধারণ স্বভাবতঃ এই নূতন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। (খ) বিভিন্ন নরপতি ও রাজবংশের সাহায্য লাভ : অশোকের আন্তরিক চেষ্টার ফলে বৌদ্ধধর্ম ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাহিরে প্রচারিত হয়—কনিষ্ক, হর্ষবর্দ্ধন বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ও প্রচারক ছিলেন—বাংলার পালবংশ, কাশ্মীর ও দাক্ষিণাত্যের বহু নরপতি বৌদ্ধধর্মের প্রসারে সহায়তা করিয়াছিল।

(২) **বৌদ্ধ ধর্মের পতনের কারণ :** (ক) পৃষ্ঠপোষকতার অভাব (খ) অন্তর্বিরোধ : মহাযান ও হীনযান দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত—মূর্তিপূজার প্রাধান্য—পূর্বতন সরলতার পরিবর্তে জটিলতা। (গ) জনসাধারণের বোধগম্য ভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও উপদেশ। (ঘ) বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতার প্রবেশ—হিন্দুধর্মের সঙ্গে পার্থক্য ক্ষীণ হইয়া আসে। বুদ্ধদেব হিন্দুর দশাবতারের অন্যতম রূপে পরিগণিত হন। (ঙ) গুপ্তবংশের সময়ে এবং পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুত্থান—কুমারিল ভট্ট এবং শঙ্করাচার্য্যের প্রচারের ফলে হিন্দুধর্ম পুনরুদ্দীপিত। (চ) পরিশেষে মুসলমান আক্রমণের ফলে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়।

4. Compare Hinduism with Jainism and Buddhism.

হিন্দুধর্মের সহিত বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের তুলনা কর

উত্তর-সূত্র : (৮১ পৃষ্ঠা)

5. What are the influences of Jainism and Buddhism upon Indian art and literature ?

ভারতীয় শিল্পে ও সাহিত্যে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের কি কি প্রভাব আছে ?

উত্তর-সূত্র : (৭৫ পৃষ্ঠা)।

সপ্তম অধ্যায়

মগধের অভ্যুদয় ঃ পারশিক ও গ্রীক আক্রমণ ঃ মৌর্য সাম্রাজ্য ও সভ্যতা

Syllabus :—Growth of Magadha : Maurya Empire. Political conditions in the sixth century B. C.—the sixteen Mahajanapadas—monarchy and republic—growth of Magadha—the Nandas—Alexander's invasion of North Western India—the Maurya Empire—international relations—Chandragupta—Bindusara. Asoka—his Dharma—his character and place in history. Mauryan administration—Megasthenes—evidence of Kautilya. Central and Provincial governments—Maurya Art—Persian influence (with suitable illustrations)

পাঠসূচী ঃ—মগধের অভ্যুদয় ঃ মৌর্য সাম্রাজ্য।

খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা—ষোড়শ মহাজনপদ—রাজতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র—মগধের অভ্যুদয—নন্দবংশ—উত্তর পশ্চিম ভারতে আলেকজাণ্ডারের অভিযান—মৌর্য সাম্রাজ্য—আন্তর্জাতিক সম্পর্ক—চন্দ্রগুপ্ত ও বিম্বিসার। অশোক,—তাঁহার 'ধর্ম'—তাঁহার চরিত্র ও ইতিহাসে স্থান। মৌর্য শাসন ব্যবস্থা ঃ—মেগাস্থিনিস—কৌটিল্যের রচনা হইতে গৃহীত প্রমাণ—কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার—মৌর্যশিল্পে পারশিক প্রভাব।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা ঃ ষোড়শ মহাজনপদ ঃ—বৈদিক বা রামায়ণ-মহাভারতের যুগে ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে অস্বচ্ছতা বা আনুমানিকতা ছিল খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাহা দূরীভূত হইয়া ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস ক্রমশঃ স্বচ্ছতর হইতে থাকে। এই সময়ের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ হিন্দু পুরাণগ্রন্থ এবং বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য হইতে অবগত হওয়া যায়। ইহাদের সাহায্যে জানা যায় যে খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে ষোলটি রাজ্য বা মহাজন

পদ ছিল। এই ষোড়শ মহাজনপদের নাম অঙ্গ—(পূর্ব্ব বিহার), মগধ (দক্ষিণ বিহার), কাশী (বারাণসী), কোশল (অযোধ্যা), বৃজি (উত্তর বিহার), চেদী (বুন্দেলখণ্ড), মল্ল (গোরক্ষপুর), বৎস (প্রয়াগ), কুরু (দিল্লী ও মিরাট), পাঞ্চাল (যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল), শূরসেন (মথুরা), মৎস্য (জয়পুর), অশ্মক (গোদাবরী তীরবর্তী অঞ্চল); অবন্তী (মালব), গান্ধার (পেশোয়ার ও রাওয়ালপিণ্ডি) ও কম্বোজ (দক্ষিণ পশ্চিম কাশ্মীর ও কাফ্রীস্থান)। এই মহাজনপদগুলির কতকগুলিতে রাজতন্ত্র এবং কতকগুলিতে প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল।

ষোড়শ মহাজনপদ

প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র :—প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির শাসনভার জননায়কদের হস্তেই ন্যস্ত থাকিত। এই সব রাষ্ট্রের শাসনকার্য সংস্থাগার ও পরিষদ নামক জনসভার দ্বারা নিষ্পন্ন হইত। জননায়কগণ 'গণজ্যেষ্ঠ,' 'সঙ্ঘমুখ্য' প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতেন।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বৃজি, ভোজ, অন্ধক প্রভৃতি রাজ্যের নাম উল্লেখযোগ্য। বৃজি, জ্ঞাতৃক, লিচ্ছবী প্রভৃতি আটটি গোষ্ঠী মিলিত হইয়া বৈশালীতে বৃজি-রাষ্ট্র গঠন করে। কপিলাবস্তুর শাক্য গণরাজ্যটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। শাক্যদের রাজধানী ছিল কপিলাবস্তু। শাক্যদের গণরাজ্য শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং সামরিক শক্তির দিক দিয়া খুব উন্নত ছিল। এতদ্ব্যতীত সুম্সুমার পর্ব্বতের ভর্গগণ ও পিপ্পলীবনের ময়ূরগণের রাষ্ট্র ছিল গণতান্ত্রিক।

বৃজি

শাক্য

ভর্গ

ময়ূর

রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র :—ষোলটি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব ছিল এবং স্ব স্ব রাষ্ট্রে প্রসার ও প্রতিপত্তির জন্য ইহারা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে রত থাকিত। এই ষোড়শ মহাজনপদের মধ্য হইতে ক্রমশঃ চারিটি রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া উঠে—অবন্তী, বৎস, কোশল ও মগধ।

ষোলটির মধ্যে চারিটি শক্তিশালী রাষ্ট্র

অবন্তী রাজ্যের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। বুদ্ধদেবের সময়ে অবন্তীর নরপতি ছিলেন চণ্ডপ্রদ্যোত। প্রদ্যোত বৎস রাজ্য আক্রমণ করিয়া কৌশলে বৎসরাজ উদয়নকে বন্দী করেন। পরিশেষে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। প্রদ্যোত উদয়নকে মুক্ত করিয়া স্বীয় কন্যা বাসবদত্তার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন।

অবন্তী

বৎস রাজ্যের রাজধানী ছিল কৌশাম্বী (এলাহাবাদের নিকটস্থ 'কোসাম')। উদয়ন এই রাজ্যের নরপতি ছিলেন। প্রতিবেশী অবন্তী ও ভর্গদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে ইহার বিরোধ লাগিয়াই থাকিত। উদয়ন ভর্গদের রাজ্য অধিকার করেন। মগধের সহিত বৎসরাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। পরিশেষে মগধরাজ অজাতশত্রু বৎস অধিকার করিয়াছিলেন।

বৎস

কোশল রাজ্যটির প্রথম রাজধানী ছিল অযোধ্যায়; পরে সাকেতে ও শ্রাবস্তীতে ইহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। বুদ্ধদেবের সময়ে অযোধ্যার নরপতি ছিলেন প্রসেনজিৎ। এই রাষ্ট্রচতুষ্টয়ের মধ্যে কোশলই সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী ছিল। শাক্যদের রাষ্ট্র ও কাশীরাজ্য অধিকার করিয়া কোশল শক্তিশালী হয়। কিন্তু প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মগধের অভ্যুত্থানে শীঘ্রই কোশলের প্রাধান্য বিনষ্ট হয়।

কোশল

ষোলটি রাষ্ট্রের মধ্যে প্রথমে অবন্তী, পরে বৎস, তারপর কোশল এবং সর্বশেষ মগধ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া উঠে। শক্তিদ্বন্দ্বের শেষ পর্য্যায় কোশল ও মগধের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহাতে জয়ী হইয়া মগধ আর্য্যাবর্তে সাম্রাজ্যবাদের সূত্রপাত করে।

মগধ

মগধের অভ্যুদয়ঃ—বিহারের দক্ষিণাংশ হইয়া মগধ রাজ্য গঠিত ছিল। বুদ্ধদেবের সময়ে বিম্বিসার মগধের নরপতি ছিলেন—বিম্বিসারের রাজত্বকাল হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে মগধের অভ্যুত্থান হয়। বৌদ্ধগ্রন্থে বিম্বিসারকে 'হর্য্যঙ্ক' বংশীয় বলা হইয়াছে। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বিম্বিসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন (খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতকের মধ্য-ভাগে)। বিম্বিসারের সময়ে মগধের রাজধানী ছিল গিরিব্রজ—বিম্বিসার রাজগৃহে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। বিম্বিসার পার্শ্ববর্তী অঙ্গরাজ্য (ভাগলপুর) জয় করিয়া মগধের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই অঙ্গবিজয় হইতেই মগধের সাম্রাজ্যবাদী জীবনের সূত্রপাত হয়। বিবাহ সম্পর্কের দ্বারা বিম্বিসার মগধের সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেন। কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগিনী কোশল দেবীকে বিবাহ করিয়া তিনি বিবাহের যৌতুক স্বরূপ কাশীরাজ্যের কিয়দংশ লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত বৈশালীর লিচ্ছবীদের রাষ্ট্রনায়কের কন্যা, ও মদ্রদেশের রাজকন্যাকেও তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সকল বৈবাহিক সূত্রে বিম্বিসার মগধের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন।

বিম্বিসার

মগধের প্রতিপত্তির সূত্রপাত

বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা ক্ষমতা-বৃদ্ধি

জৈনধর্মের সর্বশেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধের সহিত বিম্বিসারের ঘনিষ্ঠতা ছিল।

বিম্বিসারের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু মগধের নরপতি হন। কথিত আছে বৃদ্ধ বয়সে বিম্বিসার পুত্র অজাতশত্রুর হস্তে নিহত হন। স্বামীশোকে তাহার মহিষী কোশল রাজকন্যা দেহত্যাগ করেন। ভগ্নীপতির হত্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া কোশল নরপতি প্রসেনজিৎ পিতৃহন্তা অজাতশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু কোশলরাজ যুদ্ধে পরাজিত হন এবং অজাতশত্রুর সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়া সন্ধি স্থাপন করেন। যুদ্ধের প্রারম্ভেই প্রসেনজিৎ অজাতশত্রুর নিকট হইতে পূর্বদত্ত কাশীরাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন। সন্ধির সর্তানুসারে কোশলরাজ মগধের হস্তে কাশীরাজ্য স্থায়ীভাবে অর্পণ করিলেন। মগধের হস্তে পরাজিত হওয়ার পর কোশলের প্রতিপত্তি চিরতরে খর্ব হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অজাতশত্রু বৈশালীর লিচ্ছবী (বৃজি) গণ ও কুশীনগরের মল্লদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ইহাদের রাজ্য মগধের অন্তর্ভুক্ত করেন। অজাতশত্রু এই সময়েই গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলী নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। উত্তরকালে এই সুরক্ষিত দুর্গনগর পাটলীপুত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। অজাতশত্রু প্রথমে বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন এবং কথিত আছে যে বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাৎলাভের পর তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।

অজাতশত্রু
কোশলরাজের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ

অজাতশত্রুর পরে তাঁহার পুত্র উদয়ী বা উদয়ীভদ্র মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। উদয়ী অজাতশত্রুর নির্মিত পাটলীপুত্রে বা কুসুমপুরে মগধের রাজধানী স্থাপন করেন। উদয়ীর পরবর্তী রাজাগণের অক্ষমতা এবং আত্মবিরোধের সুযোগে শিশুনাগ নামে এক ব্যক্তি মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়া শৈশুনাগ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। শিশুনাগ অবন্তী মগধের অধিকারভুক্ত করেন। শৈশুনাগ বংশের পরবর্তী রাজগণ দুর্বল ছিলেন। এই বংশের শেষ নরপতি কালাশোক বা কাকবর্ণ মহাপদ্ম নন্দ নামে এক ব্যক্তির হস্তে নিহত হন। এই মহাপদ্ম নন্দই মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নন্দবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

শৈশুনাগ বংশ
শৈশুনাগ বংশের পতন : নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠা

নন্দবংশের স্থাপয়িতা মহাপদ্ম নন্দ নীচবংশোদ্ভূত ছিলেন—এ কথা হিন্দু, জৈন,

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদি এবং রোমান লেখক কার্টিয়াসের বিবরণ হইতে জানা যায়। মহাপদ্ম নন্দ একজন শক্তিমান নরপতি ছিলেন। বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর দ্বারা গঠিত মগধ তাঁহার সময়ে বিরাট সাম্রাজ্যের আকার ধারণ করে। তিনি পশ্চিমে পাঞ্জাব এবং দক্ষিণে কলিঙ্গ পর্য্যন্ত মগধ সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। অনেকের মতে দাক্ষিণাত্যের অঞ্চল বিশেষও মগধের আধিপত্যের প্রভাব অনুভব করিয়াছিল। মহাপদ্মের পরে ক্রমান্বয়ে তাঁহার আটপুত্র মগধে রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ নরপতি ছিলেন ধননন্দ। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ে সম্ভবতঃ ধননন্দই মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ধননন্দ মাত্র এক বিশাল সাম্রাজ্য উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিলেন তাহা নহে—তাঁহার সৈন্যবাহিনীও বিরাট ছিল। সামরিক বাহিনীর মধ্যে তিন সহস্র হস্তী ছিল। ধননন্দ অত্যন্ত প্রজাপীড়ক ছিলেন। খুব সম্ভবতঃ প্রজাসাধারণের অসন্তোষের সুযোগে মৌর্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত ধননন্দকে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত করিয়া মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

নন্দ বংশ

মহাপদ্ম নন্দ

শেষ রাজা ধননন্দ

মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা

পারশিক আক্রমণঃ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধরাজ বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর রাজত্বকালে পারস্যের সম্রাটগণ অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। বিম্বিসারের সমকালে পারস্যের সম্রাট ছিলেন সাইরাস (খৃঃ পূঃ ৫৫৮—৫৩০)। সাইরাস ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলস্থ কপিশা শহর ধ্বংস করেন এবং কাবুল নদীর অঞ্চল বিশেষে পারস্যের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। সাইরাসের পৌত্র দরায়ুসও (খৃঃ পূঃ ৫২২—৪৮৬) ভারত আক্রমণ করিয়া সিন্ধুনদের পশ্চিমস্থ পাঞ্জাব এবং সিন্ধুদেশ অধিকার করেন এবং এই দুইটি স্থানকে পারস্যের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এই অংশ পারস্য সাম্রাজ্যের বিংশতিতম প্রদেশে পরিণত করা হয় এবং ইহাকে ক্ষত্রপ উপাধি-ধারী একজন শাসনকর্তার অধীনে রাখা হয়। সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব অর্থাৎ দেড় কোটি স্বর্ণমুদ্রা নাকি ভারতীয় প্রদেশগুলি হইতে সংগৃহীত হইত। দরায়ুসের পুত্র জেরাকসেসের আমল পর্য্যন্ত ভারতীয় অঞ্চলগুলি সম্ভবতঃ পারস্যের অধিকার ও শাসনভুক্ত ছিল। জেরাকসেসের গ্রীস অভিযান কালে একদল ভারতীয় সৈন্য পারশিক সেনা-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল

সাইরাস

দরায়ুস

জেরাকসেস

পারস্তের শেষ সম্রাট তৃতীয় দরায়ুস গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের হস্তে পরাজিত হইলে ভারতবর্ষে পারশিক আধিপত্য লোপ পায়।

পারস্তের প্রভাব

ভারতবর্ষে পারশিক অভিযান একেবারে নিষ্ফল হয় নাই—প্রাচীন পারস্তের 'খরোষ্ট্রি' অক্ষর ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়াছিল; অশোকের সময়ে নির্মিত শিল্পকার্য্যে ভারতীয় প্রভাব পতিত হইয়াছিল। পারস্তের শত্রপ (Satrap) হইতে ভারতীয় ক্ষত্রপ নামে প্রাদেশিক শাসনকর্তার উদ্ভব হইয়াছিল।

আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান :—আলেকজাণ্ডার ছিলেন গ্রীস দেশের ম্যাসিডনের নরপতি দ্বিতীয় ফিলিপের পুত্র। ফিলিপের মৃত্যুর পরে তরুণ পুত্র আলেকজাণ্ডার রাজা হইলেন (খৃঃ পূঃ ৩৩৬)। পিতা ফিলিপ তাঁহার রাজত্বকালে সমগ্র গ্রীসদেশের উপর ম্যাসিডনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং পারস্তদেশ জয়ের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে আলেকজাণ্ডার পিতার অসম্পূর্ণ ইচ্ছা পূরণ করার জন্য বিরাট সৈন্যবাহিনী সহ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। প্রথমে তিনি পারস্ত আক্রমণ করেন। পারস্তরাজ তৃতীয় দরায়ুস আলেকজাণ্ডারের হস্তে পর পর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হইলে সমগ্র পারস্ত সাম্রাজ্য আলেকজাণ্ডারের হস্তগত হয়। অতঃপর তিনি পারস্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় অঞ্চলের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এই সময়ে ভারতের পূর্বাঞ্চলে মহাপদ্ম নন্দের সাম্রাজ্য খুব শক্তিশালী হইলেও ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও পরস্পর বিবদমান রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সমস্ত রাজ্যের মধ্যে তক্ষশিলা, অভিসার, ক্ষুদ্রক, গান্ধার, সৌভূতি, মল্ল, প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যের নাম উল্লেখযোগ্য। এককভাবে এই সমস্ত রাজ্যের কাহারও আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ প্রতিহত করার শক্তি ছিল না অথচ সম্মিলিতভাবে তাহারা বিদেশী অভিযানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারিল না। খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৬

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ আম্ভির বশ্যতা স্বীকার

অব্দে আলেকজাণ্ডার হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন এবং নৌকার সেতুর সাহায্যে সিন্ধুনদ পার হন। তক্ষশিলার নরপতি আম্ভি আলেকজাণ্ডারকে বাধা দেওয়ার পরিবর্তে প্রচুর রৌপ্য মুদ্রা, মেষ ও বৃষ উপঢৌকন দিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু এই অঞ্চলের সমস্ত নরপতিই আম্ভির মত হীনচেতা ছিলেন না। বিদেশীর নিকট আত্মবিক্রয় না করিয়া যে সকল রাজা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আলেকজাণ্ডারের

সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ঝিলামের পূর্বতীরস্থ পুরু রাজ্যের রাজা পুরুর নাম উল্লেখযোগ্য। পুরু আলেকজাণ্ডারকে বাধা দিবার জন্য ঝিলামের তীরে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। পুরুর বীরবাহিনী ও রণহস্তীসমূহের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে জয়লাভ অনিশ্চিত মনে করিয়া আলেকজাণ্ডার ঝিলামের অপর তীরে সৈন্য সংস্থান করিয়া সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন। তারপর এক বর্ষামুখর রজনীতে সৈন্য সংস্থানের স্থান হইতে দূরে সরিয়া আলেকজাণ্ডার সসৈন্যে ঝিলাম অতিক্রম করিলেন এবং অতর্কিতে পুরুর সৈন্যদলকে আক্রমণ করিলেন। রণক্ষেত্র কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল হওয়ায় পুরুর তীরন্দাজগণ ও যুদ্ধ রথগুলি আশানুরূপভাবে যুদ্ধ করিতে পারিল না। অবশ্য পুরুর রণহস্তীগুলির আক্রমণে আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদলকে প্রথমটা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল, পরে গ্রীকসৈন্যদের নিক্ষিপ্ত তীরে আহত হস্তিযূথ উন্মত্ত হইয়া স্বপক্ষেরই যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। স্বীয় সৈন্যদলের বিপর্যয় এবং দেহের কয়টি স্থানে আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও পুরু রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন না। পুরু আলেকজাণ্ডারের হস্তে পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। বন্দী পুরুর বীরত্ব ও নির্ভীকতার পরিচয় পাইয়া আলেকজাণ্ডার তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন।

পুরুরাজ্যের নরপতি পুরুর বাধা প্রদান

আলেকজাণ্ডার

পুরুর পরাজয়

অতঃপর আলেকজাণ্ডার চিনাব ও রাভি অতিক্রম করিয়া আরও কয়েকটি অঞ্চল অধিকার করেন। আলেকজাণ্ডারের আরো পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া নন্দ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তাহার রণক্লান্ত সৈন্যদল আর অগ্রসর হইতে সম্মত হইল না। পুরুর সহিত যুদ্ধে তাহারা ভারতীয়দের সামরিক শক্তির যে পরিচয় পাইয়াছিল এবং নন্দ রাজাদের বিপুল সৈন্যবাহিনীর যে সংবাদ তাহাদের নিকট পৌঁছিয়াছিল তাহাতে সম্ভবতঃ তাহাদের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। অগত্যা

আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্তন ৩২৩ খৃঃ পূঃ

আলেকজাণ্ডার বিপাশার তীর হইতেই স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন।

আলেকজাণ্ডার সেনাবাহিনীর একটি দলকে নৌ-সেনাপতি নিয়ার্কাসের নেতৃত্বে বিদায়
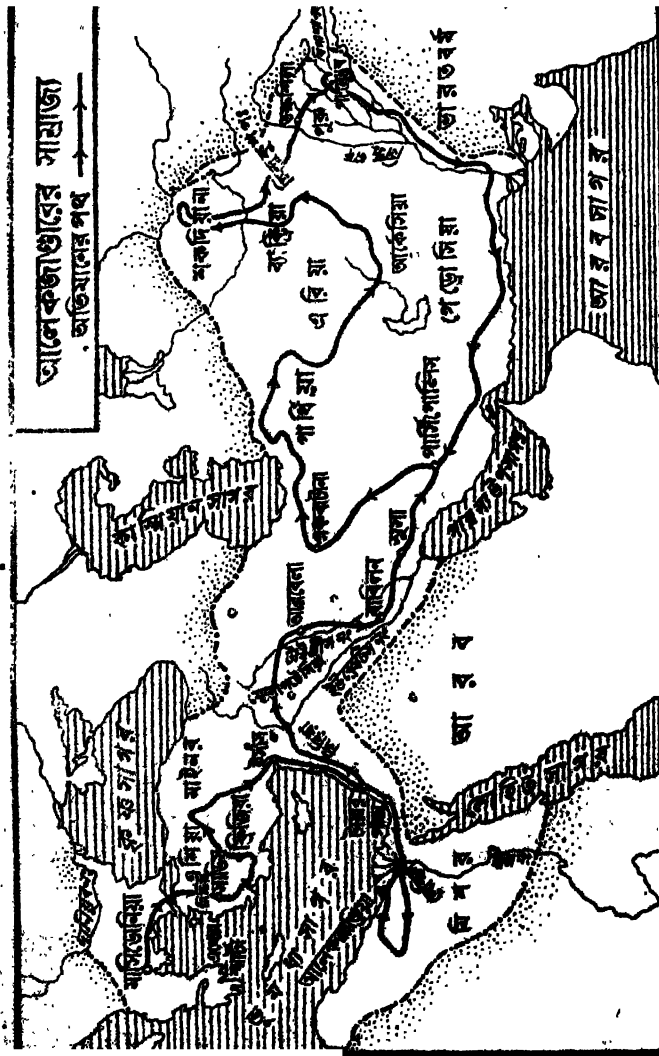
ও সিন্ধু দিয়া জলপথে প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং অবশিষ্ট সৈন্যদল লইয়া স্থলপথে ঝিলাম নদীর তীর দিয়া দক্ষিণে সাগরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে আলেকজাণ্ডার মালব, ক্ষুদ্রক, শিবি প্রভৃতি কয়েকটি প্রজাতান্ত্রিক দেশকে পরাজিত করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি বেলুচিস্থানের মরুপথ দিয়া স্বদেশাভিমুখে অগ্রসর হন এবং পথিমধ্যে নানাবিধ ক্লেশ ও বিপর্যয় সহ্য করিয়া ব্যাবিলনে উপস্থিত হন। এখানে ৩২৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দে মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ব্যাবিলনে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু, ৩২৩ খৃঃ পূঃ

আলেকজাণ্ডারের অধিকৃত অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা :—প্রত্যাবর্তনের পূর্বে আলেকজাণ্ডার বিজিত ভারতীয় অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা স্থির করিয়া যান। এই সমস্ত অঞ্চল ম্যাসিডন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ইহাদিগকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব কয়েকজন গ্রীক ও পারশিক ক্ষত্রপ বা শাসনকর্তার হস্তে ন্যস্ত করা হয়। এই সমস্ত শাসনকর্তার সহকারীরূপে কয়েকজন ভারতীয় নরপতিকেও নিযুক্ত করা হয়। এতদ্ব্যতীত পুরু ও তক্ষশিলারাজ আম্ভি ম্যাসিডনের আশ্রিত নরপতি রূপে পরিগণিত হন। শাসনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিজিত রাজ্যের বহু স্থানে নূতন নগরের সৃষ্টি হয় এবং পুষ্কলাবতী, তক্ষশিলা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উপযুক্ত সংখ্যক গ্রীকসৈন্য রক্ষিত হয়।

আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের ফলাফল :—আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ সমসাময়িক ভারতের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। এই গ্রীক অভিযান ভারতবাসীর নিকট এতই অকিঞ্চিৎকর হইয়াছিল যে সমসাময়িক বা পরবর্তী কোন ভারতীয় পুরাণ-ইতিহাস-কাব্য-নাটক বা লোকশ্রুতিতে এই আক্রমণের কোন আভাসমাত্র পরিলক্ষিত হয় না। প্রত্যক্ষ ফলাফলের কথা বলিতে গেলে প্রত্যেক আক্রমণকারীর ক্ষেত্রে যাহা স্বাভাবিক এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল—অপরিমিত রক্তপাত, ধ্বংসের নারকীয় লীলা। অসংখ্য ভারতীয়ের প্রাণ নষ্ট হইয়াছিল এবং অসংখ্য জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। এই প্রত্যক্ষ ফল ছিল সাময়িক এবং ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্যও নহে কিন্তু আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পরোক্ষ ফল ও স্থায়ী প্রভাব ভারতের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আলেকজাণ্ডার উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজন্যবর্গের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করিয়া পরোক্ষভাবে উত্তর-ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্যস্থাপনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। নতুবা মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে এই সকল রাজ্য পরাজিত করিয়া মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইত কিনা বলা

পরোক্ষ ফল

যায় না। আলেকজাণ্ডারের অভিযানের ফলে ভারতের সহিত পাশ্চাত্যদেশের যোগাযোগ সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। এই অভিযানের ফলে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কয়েকটি গ্রীক উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং অচিরেই গ্রীক ভারতীয়দের মধ্যে ভাব বিনিময় সহজ হইয়াছিল। ভারতবর্ষ ও ইউরোপের মধ্যে যাতায়াতের নূতন পথ আবিষ্কৃত হওয়ায় গ্রীস ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে উভয় দেশের মধ্যে ভাবের যথেষ্ট আদান প্রদান আরম্ভ হয়। গ্রীকগণের প্রভাবেই ভারতীয় ভাস্কর্য্য, গান্ধার শিল্পের মধ্য দিয়া অপূর্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে, মুদ্রা ও প্রতিমা নির্মাণে এবং নাট্যশাস্ত্রে গ্রীক প্রভাব পতিত হইয়াছিল। অনুরূপভাবে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করিয়াছিল। খৃষ্টধর্মও বৌদ্ধধর্মের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হইয়াছিল উভয় দেশের মধ্যে যে সংস্কৃতিমূলক ভাব-বিনিময় হইয়াছিল তাহার দৃষ্টান্তরূপে মিনাণ্ডার ও হেলিয়োডোরাসের ভারতীয় ধর্মের প্রতি আগ্রহের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পথ প্রশস্ত

উভয় দেশের মধ্যে যাতায়াতের পথ আবিষ্কৃত

পারস্পরিক ভাব বিনিময়

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য, (আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৩২২—২৯৮) ঃ—মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ এক মত নহেন। পুরাণ হইতে জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্তের মাতা মুরা শূদ্রা ছিলেন এবং তিনি নন্দরাজের দাসী ছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের মাতা বা পিতামহী মুরার নাম হইতে মৌর্য নামের উৎপত্তি হইয়াছে। গ্রীক ঐতিহাসিক-গণও চন্দ্রগুপ্তকে নীচবংশোদ্ভব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তকে ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পালি গ্রন্থ সমূহেও মৌর্য বংশ বা মোরিয়কে একটি ক্ষত্রিয় বংশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। হিমালয়ের সন্নিকটে পিপ্পলীবনে এই ময়ূর পোষক মোরিয় ক্ষত্রিয় বংশ রাজত্ব করিত। চন্দ্রগুপ্ত এই ক্ষত্রিয় বংশেরই সন্তান ছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের বংশ পরিচয়

গ্রীক লেখকদের বিবরণ হইতে জানা যায় যে আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন চন্দ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। সম্ভবতঃ অত্যাচারী নন্দ সম্রাটদের বিরুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের সাহায্য লাভ করা তাঁহার

উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু তাঁহার উদ্ধত কথাবার্তায় অসন্তুষ্ট হইয়া আলেকজাণ্ডার তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। চন্দ্রগুপ্ত কোনমতে আলেকজাণ্ডারের শিবির হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। অতঃপর চন্দ্রগুপ্ত চাণক্য নামে তক্ষশিলাবাসী এক তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ব্রাহ্মণের

আলেকজাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ
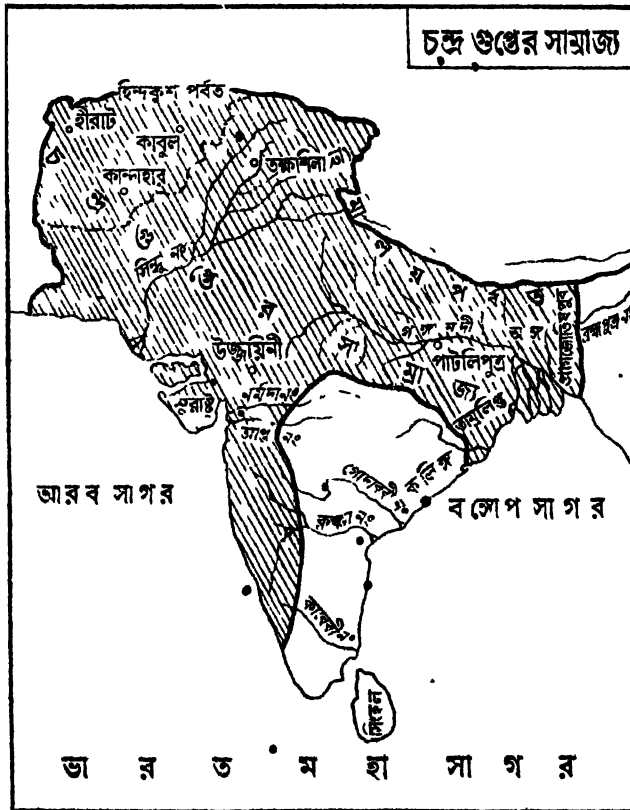
সাহায্যে একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নন্দবংশীয় শেষ নরপতি ধননন্দকে পরাজিত করেন এবং মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিমধ্যে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর সংবাদ ভারতে প্রচারিত হইলে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম গ্রীক বিজিত অঞ্চলে গোলযোগ আরম্ভ হয়। এই সুযোগে

চাণক্যের সাহায্যে মগধের সিংহাসন লাভ

চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক-অধিকৃত উত্তর-পশ্চিম ভারত অধিকার করিলেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পরে তাঁহার তিনজন সেনাপতি আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগবন্টন করিয়া লন। সিরিয়া ও ভারতবর্ষ সেনাপতি সেলুকাসের ভাগে পড়ে। চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক অধিকৃত ভারতীয় অঞ্চল পুনরুদ্ধারের জন্য সেলুকাস ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন কিন্তু সম্ভবতঃ সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই বরঞ্চ সন্ধির সর্ত দেখিয়া অনুমিত হয় সেলুকাসই পরাজিত হইয়াছিলেন। সেলুকাস বর্তমান আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানের কাবুল, কান্দাহার হিরাট ও মকরাণ এই প্রদেশ চতুষ্টয় চন্দ্রগুপ্তের হস্তে সমর্পণ করিয়া মৈত্রীস্থাপন করিলেন। এই মৈত্রী সুদৃঢ় করার জন্য দুই জনের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হইল। সম্ভবতঃ সেলুকাস কন্যা হেলেনকে চন্দ্রগুপ্তের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাঁহাকে পাঁচশত রণ-হস্তী উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করেন। সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস নামে জনৈক গ্রীকদূতকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনিস দীর্ঘকাল মগধের রাজধানী পাটলীপুত্রে অবস্থান করিয়া তদানীন্তন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি তথ্যবহুল বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন।

সেলুকাসের ভারত আক্রমণ ও পরাজয়

সেলুকাসের পরাজয় ও সন্ধি

চন্দ্রগুপ্তের সময়ে মগধ সাম্রাজ্য পূর্বে বঙ্গদেশ হইতে পশ্চিমে আফগানিস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুরাষ্ট্র বা কাথিয়াবাড় প্রদেশও তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। দক্ষিণ ভারতেও তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। কয়েকটি মহীশূর শিলালিপি হইতে জানা যায় যে উত্তর মহীশূরও তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। জৈন কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে শেষ জীবনে চন্দ্রগুপ্ত জৈনধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জৈনধর্মের প্রচলিত রীতি অনুসারে মহীশূরের অন্তর্গত শ্রবণবেলগোলায় অনশনে থাকিয়া স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেন।

চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য

চন্দ্রগুপ্ত ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। সেনানায়ক ও রাষ্ট্রশাসক-রূপে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। অতি সাধারণ ব্যক্তিরূপে তাঁহার জীবনের সূত্রপাত হয় এবং স্বীয় প্রতিভাবলে এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। অত্যাচারী নন্দবংশের উচ্ছেদ, উত্তর-পশ্চিম ভারতকে বিদেশীর অধিকার হইতে মুক্ত করা, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর আলেকজাণ্ডারের সেনাপতিকে পরাজিত করা তাঁহার সামরিক প্রতিভার নিদর্শন। ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য গড়িয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, এই বিরাট সাম্রাজ্যের

চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব

সুশাসনেরও যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনিসের বিবরণে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বর্ণিত শাসন ব্যবস্থা কল্পনাপ্রসূত ছিল না, চন্দ্রগুপ্ত উহা বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছিলেন।

বিন্দুসার অমিত্রঘাত (আঃ ৩০০—২৭৩ খৃঃ পূঃ):—আনুমানিক ৩০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের কিছু পূর্বে বা পরে চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 'অমিত্রঘাত' বা শত্রুহন্তা বলিয়া অভিহিত ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে তক্ষশিলা বিদ্রোহী হয় এবং রাজপুত্র অশোক এই বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরিত হন। বিন্দুসার বিদেশী নরপতিদের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছিলেন। সিরিয়ার নরপতি এন্টিওকাস তাঁহার দরবারে ডেইমেকস নামে গ্রীকদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। মিশরের গ্রীক নরপতি টলেমি ফিলাডেলফসও ডাইযোনিসিযোস নামক একজন দূত বিন্দুসারের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। গ্রীক বিবরণ হইতে জানা যায় যে বিন্দুসারের সঙ্গে সিরিয়ার রাজার সহিতও পত্র-বিনিময় হইত।

মহামতি অশোক, (আঃ খৃঃ পূঃ ২৭৩—২৩২):—বিন্দুসারের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি পিতার জীবদ্দশায় তক্ষশিলা ও উজ্জয়িনীর প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন। বৌদ্ধ কাহিনী হইতে জানা যায় বিন্দুসারের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে উত্তরাধিকার লইয়া অশোকের সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতৃগণের এক বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বিরোধে অশোক জয়লাভ করেন। কথিত আছে অশোক নাকি ভ্রাতৃগণকে হত্যা করিয়া সিংহাসনের অধিকার লাভ করেন। রাজ্যলাভের চারিবৎসর বাদে অশোকের রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ আছে। ভ্রাতৃবিরোধের জন্যই সম্ভবতঃ অভিষেক কার্য্য বিলম্বিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। তবে ভ্রাতৃ-হত্যার কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

সিংহাসন লাভ

সিংহাসনারোহণের পরেই অশোকের মনে সাম্রাজ্য বিস্তারের স্পৃহা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। চন্দ্রগুপ্তের উপযুক্ত উত্তরপুরুষ হিসাবে মগধ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের মনোবৃত্তি লইয়া অশোক অভিষেকের আট বৎসর পরে কলিঙ্গ বিজয়ে অগ্রসর হইলেন। এই কলিঙ্গ যুদ্ধে অশোক জয়লাভ করিলেন—কলিঙ্গ মগধসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং কলিঙ্গের শাসনব্যবস্থা তোসালী নগরস্থ প্রাদেশিক শাসনকর্তার হস্তে অর্পিত হয়, কিন্তু এই যুদ্ধে প্রায় এক লক্ষ সৈন্য নিহত ও প্রায় দেড় লক্ষ সৈন্য বন্দী হয়। যুদ্ধের ভয়াবহ শোণিতক্ষরণের দৃশ্য, আহত

কলিঙ্গ যুদ্ধ

ও মৃতের আত্মীয় স্বজনের আর্তনাদে অশোকের হৃদয় দুঃখে অনুতাপে অভিভূত হয়। কলিঙ্গ যুদ্ধের পরে অশোকের মনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে। ফলে তিনি উপগুপ্ত নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহার পর মহারাজ অশোক দিগ্বিজয় অর্থাৎ যুদ্ধ দ্বারা দেশজয়ের আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া

অশোকের মানসিক পরিবর্তন

মহারাজা অশোক

সাম্য, মৈত্রী ও অহিংসার দ্বারা মানুষের হৃদয় জয়ের আদর্শ গ্রহণ করিলেন। অশোকের পরবর্তী সমস্ত জীবন এই ধর্মবিজয়ের মহান আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হইয়াছিল।

অশোকের ধর্ম :—বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরে অশোক যে ধর্মের প্রচার তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা কোন বিশেষ ধর্মমত ছিল না। অশোকের ধর্ম সকল ধর্মের অন্তর্গত কয়েকটি সাধারণ নৈতিক আদর্শের সমষ্টি লইয়া গঠিত ছিল। অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, জীবে দয়া, গুরুজনে ভক্তি ও তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্তিতা, উপযুক্ত পাত্রে দান, আদর্শ ব্যবহার এবং পাপ হইতে নিবৃত্তি—এই সমস্তই ছিল অশোকের ধর্মের সার মর্ম। স্বয়ং বৌদ্ধধর্মানুরাগী হইলেও অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধে অশোকের উদার দৃষ্টি ছিল। তিনি সকলকে বিভিন্ন ধর্মের 'সার' গ্রহণ করিতে বলেন। বিভিন্ন ধর্মের 'সার বৃদ্ধি'ই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। অশোক স্বয়ং গয়ার নিকটে বরাবর পর্বতে আজীবক সন্ন্যাসীদের ব্যবহারের জন্য কয়েকটি গুহা দান করেন। অশোক স্বয়ং ব্যক্তিগত জীবনেও অহিংসার আদর্শ অনুসরণ করেন। তাঁহার নির্দেশে রাজকীয় রন্ধনশালায় আহার্য্যার্থ মাত্র তিনটি ছাড়া পশুপক্ষী হত্যা নিষিদ্ধ হয়।

অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচার :—বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরেই অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তাঁহার সমস্ত উদ্যম নিযুক্ত করেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্যই অশোক পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাধিক খ্যাত। তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মে পরিণত হইয়াছিল।

বিহার যাত্রার পরিবর্তে ধর্ম যাত্রা

পূর্ব মৌর্য্য নরপতিগণ আমোদ-প্রমোদের জন্য 'বিহার-যাত্রা'য় বহির্গত হইতেন। অশোক বিহার-যাত্রার পরিবর্তে ধর্ম যাত্রা অর্থাৎ বুদ্ধদেবের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত স্থান সমূহে পরিভ্রমণের ব্যবস্থা করিলেন। রাজ্যাভিষেকের দশম বৎসরে তিনি বুদ্ধগয়ায়, বিংশতিবর্ষে বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী উদ্যানে ও অপরাপর বৌদ্ধ তীর্থস্থানে গমন করিয়াছিলেন। অশোকের নির্দেশে রাজকীয় রন্ধনশালায় পশুপক্ষী হত্যা নিষিদ্ধ হইল। প্রজাদের ধর্মে অনুরাগী করাইবার জন্য তিনি যুত, রাজুক ও প্রাদেশিকগণকে পাঁচ বৎসর অন্তর রাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া প্রজাগণকে ধর্মশিক্ষা দিবার জন্য আদেশ দিলেন। এতদ্ব্যতীত ধর্মপ্রচারের জন্য ধর্মমহামাত্র নামে এক শ্রেণীর নূতন কর্মচারী নিযুক্ত হইল। মহামাত্রগণ সাম্রাজ্যের সর্বত্র এবং সীমান্তস্থিত যবন, কম্বোজ, গান্ধার ও রাষ্ট্রিকদের মধ্যে ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করিল। তিনি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ও সীমান্তবর্তী অনেক

শিলালিপি ও স্তম্ভলিপি

স্থানে পর্বতগাত্রে ও স্তম্ভগাত্রে ধর্মলিপি খোদিত করাইয়া জনসাধারণকে ধর্মাভিমুখী করার জন্য ব্যবস্থা করেন। নারীদের ধর্মশিক্ষার জন্য স্ত্রাধ্যক্ষমহামাত্র নামক কর্মচারী নিযুক্ত হইল। বুদ্ধদেবের অহিংসা ও মৈত্রীর ললিতবাণী প্রচার করাইবার জন্য অশোক সুদূর দক্ষিণ ভারতের

প্রত্যন্ত রাজ্য চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র ও কেরলপুত্র রাজ্যে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। ভারতবর্ষের বাহিরে সুদূর সিরিয়ায়, গ্রীসে, মিশরে এবং আফ্রিকায় ও সিংহলে ধর্মপ্রচারক প্রেরিত হইয়াছিল। অশোক সম্ভবতঃ সুবর্ণভূমিতে (দক্ষিণ ব্রহ্ম ও সুমাত্রা) প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। অশোক দানকে ধর্মের অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। স্বয়ং দান করিয়া তৃপ্ত হইতেন না, ধর্মমহামাত্র ও অন্যান্য কর্মচারীদিগকে

ভারতের বাহিরে ধর্ম প্রচারক প্রেরণ
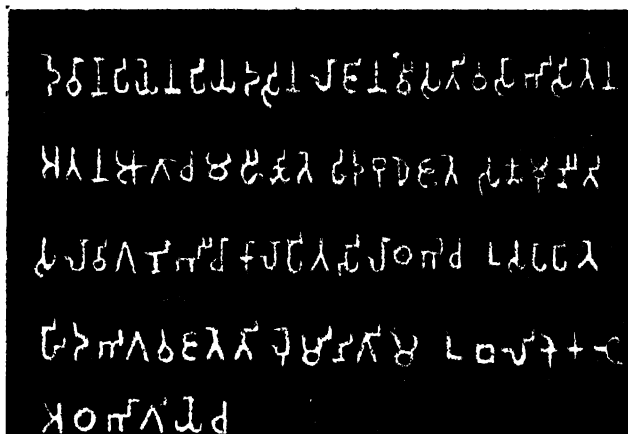
অশোকের ধর্মলিপি

দান সম্বন্ধে উৎসাহ দিতেন। রাণী কারুবাকীর দানের কথাও একটি অনুশাসনে পাওয়া যায়। মাত্র দান করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। মনুষ্য ও ইতরপ্রাণীদিগকে ছায়াদানের নিমিত্ত তিনি পথিপার্শ্বে ছায়াবহুল বৃক্ষাদি রোপণ করেন এবং কিছুদূর অন্তর কূপ খনন ও বিশ্রামশালা নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

জনহিতকর কার্য্যাবলী

অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্মে আভ্যন্তরীণ মতভেদ দেখা দেয়। এই মতভেদ নিবারণের জন্য অশোক পাটলীপুত্রে এক বৌদ্ধ মহা-সঙ্গীতির আহ্বান করেন। এই মহাসভায় বৌদ্ধধর্মের আভ্যন্তরীণ অনৈক্য দূর করার চেষ্টা করা হয়। এই ধর্মসভা তৃতীয় বৌদ্ধ-মহাসঙ্গীতি নামে প্রসিদ্ধ।

তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসভা

অশোকের ধর্মপ্রচেষ্টার ফলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র 'ভেরীঘোষ' এর পরিবর্তে ধর্মঘোষের প্রবর্তন হইয়াছিল। পরবর্তীকালের বহু নরপতিকে অশোকের আদর্শ প্রজাকল্যাণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল এবং বৌদ্ধধর্ম স্থানীয় ক্ষুদ্র ধর্ম হইতে বিশ্বব্যাপী ধর্মে পরিণত হওয়ার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ধর্মপ্রচারের ফল

ইতিহাসে অশোকের স্থান :—আদর্শ নরপতিরূপে অশোক পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠস্থানের অধিকারী। সর্ব বিষয়ে অশোকের সঙ্গে তুলনা হইতে পারে এমন নরপতি পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস সিজার, নেপোলিয়ন

প্রভৃতি বহু সাম্রাজ্যশাসক ইতিহাসে মহান বলিয়া আখ্যাত। কিন্তু তাঁহাদের মহত্ত্বের পরিমাপ প্রধানতঃ বিস্তীর্ণ রাজ্যজয়ের এবং যুদ্ধখ্যাতিতে সীমাবদ্ধ। অগণিত জনপদ বিধ্বস্ত করিয়া এবং অপরিমেয় নরশোণিতের স্রোতধারা প্রবাহিত করিয়া তাঁহারা মহত্ত্বের খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। কিন্তু অশোকের মহত্ত্ব এতদপেক্ষা স্থায়ী এবং শাশ্বত মানবকল্যাণের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। উত্তরাধিকারসূত্রে অশোক যে সামরিক শক্তিলাভ করিয়াছিলেন কলিঙ্গ যুদ্ধের ফলে তাঁহার মানসিক পরিবর্তন না ঘটিলে তিনি স্বচ্ছন্দে দিগ্বিজয়ের দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতের বাহিরের বহু রাজ্য জয় করিয়া অনায়াসেই আলেকজাণ্ডার বা সিজারের ন্যায় মহান আখ্যায় বিভূষিত হইতে পারিতেন। কিন্তু অশোক দিগ্বিজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়ে, রাজ্যজয় অপেক্ষা প্রজার হৃদয় জয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। অশোক দুর্বল ছিলেন না, কিন্তু দিগ্বিজয়ের পথ হইতে পৃথিবীর অপর কোন নরপতি স্বেচ্ছায় অশোকের মত ধর্ম বিজয়ের পথ বাছিয়া লইয়াছেন এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

বিশ্বমানবের জন্য নিষ্কাম প্রীতি

অশোক মনে করিতেন তিনি প্রজাদের নিকট ঋণী। প্রজাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করিয়া অশোক সেই ঋণ পরিশোধ করার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। 'সমস্ত প্রজা আমার সন্তান' এই বাণীর মধ্যেই অশোকের প্রজানুরঞ্জক মনোভাব মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। অশোকের নরপতিত্বের আদর্শ কোন দেশ বা পাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না—সর্বভূত-হিতই ছিল তাঁহার কাম্য। যাহাতে পৃথিবীর সকল মানব ইহলোকে সুখ ও পরলোকে স্বর্গভোগ করিতে পারে তাহাই তাঁহার আদর্শ ছিল। স্বদেশে ও বিদেশে মনুষ্য ও জাতিধর্মনির্বিশেষে বিশ্বমানবের মৈত্রী ও কল্যাণকামনার প্রচেষ্টা যদি শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হয় তাহা হইলে অশোকের মহত্ত্ব ও নরপতিত্বের আদর্শ সর্বদেশের প্রজাহিতৈষী নরপতির অনুকরণযোগ্য।

মৌর্য যুগের শাসন পদ্ধতি :—মৌর্য যুগের ভারতবর্ষের সমাজ ও সভ্যতা

মৌর্য যুগের ইতিহাসের উপকরণ

সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদ আমরা গ্রীক-দূত মেগাস্থিনিস প্রমুখ বিদেশী লেখকদের বিবরণী, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, সংস্কৃত নাটক মুদ্রারাক্ষস এবং অশোকের বিভিন্ন লিপি হইতে সংগ্রহ করিতে পারি।

মৌর্যবংশের রাজত্ব ভারতের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা করিল। চন্দ্রগুপ্তের বাহুবলে বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে। অশোকের রাজত্বকালে মৌর্য সাম্রাজ্য পশ্চিমে হিন্দুকুশ হইতে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু এই বিপুলায়তন সাম্রাজ্যের জন্য উপযুক্ত

শাসন ব্যবস্থার কোন ত্রুটি হয় নাই। সাম্রাজ্যে সুশাসনের এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য মৌর্য সম্রাটগণ উপযুক্ত রাজকর্মচারী নির্বাচন বা বিচার ব্যবস্থা সমস্ত ব্যাপারেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে এই জাতীয় সুদক্ষ শাসন দক্ষতার বা ব্যবস্থাপনার কাহিনী বাস্তবিকই বিস্ময়কর সংবাদ বলিয়া মনে হয়।

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক শাসন বা বিচার বিষয়ক সমস্ত ব্যাপারে সম্রাট ছিলেন সর্বময় কর্তা। মৌর্য সম্রাটগণ স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। প্রয়োজন হইলে 'আত্যয়িক' বা জরুরী ব্যবস্থায় 'মন্ত্রিপরিষদ' নামে এক মন্ত্রণা সভার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। উপরন্তু বিচার বা শাসনবিষয়ে নরপতি প্রচলিত প্রথা বা রীতি কখনও লঙ্ঘন করিতেন না।

নরপতি রাজ্যের সর্ববিষয়ের কর্তা

শাসন বিষয়ক কার্য্যে নরপতিগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। বিচারকার্য্য সম্পাদনে যাহাতে কোন প্রকার বিলম্ব না হয় তজ্জন্য প্রত্যেক প্রজাই নরপতির নিকট প্রত্যক্ষভাবে বিচারপ্রার্থী হইতে পারিত। মেগাস্থিনিসের বিবরণীতে জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্ত প্রয়োজন হইলে সমস্ত দিন বিচারকার্য্য পরিচালনা করিতেন। এমন কি ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজন হইলেও তিনি বিচারকার্য্য পরিত্যাগ করিতেন না।

নরপতি অক্লান্ত কর্মী ছিলেন

বিশাল সাম্রাজ্যশাসনের জন্য অসংখ্য উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ নিযুক্ত হইতেন। এই সমস্ত রাজপুরুষদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও সর্বোচ্চ বেতনভোগী ছিলেন 'মহামাত্র' বা 'মন্ত্রি'বর্গ। বিশেষ পরীক্ষার পর এই সমস্ত মন্ত্রী নিযুক্ত হইতেন। তাঁহাদের অধীনে বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ বহু বিভাগীয় অধ্যক্ষ থাকিতেন। মন্ত্রীদের নিম্নপদস্থ কর্মচারীবর্গ 'অধ্যক্ষ' নামে পরিচিত ছিলেন। ইহারা প্রত্যেকে এক একটি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। নানাবিধ 'উপধা' বা পরীক্ষার পর এই সমস্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতেন।

মন্ত্রিবর্গ বা মহামাত্রগণ

এই সমস্ত অধ্যক্ষের মধ্যে কেহ কেহ নদীর তত্ত্বাবধান করিত, ভূমির মাপজোক করিত, কেহ বা কর আদায় করিত এবং কেহ কেহ পূর্ত্ত কার্য্যের জন্য নিযুক্ত থাকিত। নগরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে 'নগরাধ্যক্ষ' এবং সমর বিভাগের প্রধান রাজপুরুষকে 'বলাধ্যক্ষ' বলা হইত। অপরাপর রাজ-কর্মচারীদের মধ্যে রাজুক, যুত, প্রাদেশিক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। রাজপুরুষদের কর্মতৎপরতা এবং দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার প্রকৃত

অধ্যক্ষ

প্রতিবেদক বা গুপ্তচর

সংবাদ অবগত হওয়ার জন্য মৌর্য্য নরপতিগণ 'প্রতিবেদক' নামে অসংখ্য গুপ্তচর নিযুক্ত করিতেন।

বিচার ব্যবস্থা

বিচার ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন নরপতি। রাজকীয় বিচার ব্যতীত নগর সমূহে এবং জনপদে বা গ্রামাঞ্চলে বিচারের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল। নগরের বিচারালয়ে ব্যবহারিক মহামাত্রগণ ও জনপদে রাজুকগণ বিচার করিতেন। বিদেশীদের জন্যও বিচারের পৃথক বন্দোবস্ত ছিল।

দণ্ডবিধির কঠোরতা

চন্দ্রগুপ্তের সময়ে দণ্ডবিধি অত্যন্ত কঠোর ছিল। কেহ অপরের অঙ্গচ্ছেদ করিলে অপরাধীরও অঙ্গচ্ছেদ করা হইত। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী জরিমানা ও প্রাণদণ্ড ছিল। অশোক দণ্ডবিধির এই কঠোরতা হ্রাস করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন।

সামরিক ব্যবস্থা

মেগাস্থিনিস প্রভৃতি লেখকগণের বিবরণ হইতে জানা যায় যে মৌর্য্যদের বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল। চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যদলে ছয়লক্ষ পদাতিক, ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী নয় হাজার হস্তী ও হস্তীর সমসংখ্যক রথ ছিল। চন্দ্রগুপ্তের একটি বিরাট নৌবহরও ছিল। সৈন্যবাহিনার সর্বময় কর্তা ছিলেন সম্রাট। সামরিক বিভাগের পরিচালনার দায়িত্ব ত্রিশ জন সভ্য দ্বারা গঠিত একটি সভার উপর ন্যস্ত ছিল। এই সভাও ছয়টি সমিতিতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক সমিতিতে পাঁচজন করিয়া সভ্য থাকিত। এই ছয়টি সমিতির উপর পদাতিক, অশ্বারোহী, রথবাহিনী, হস্তীবাহিনী, নৌবাহিনী এবং সামরিক যানবাহন ও রসদ—এই ছয়টি বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল।

পৌরশাসন ব্যবস্থা

মৌর্য্যযুগে পৌর শাসন ব্যবস্থাও সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত ছিল। মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে জানা যায় যে মৌর্যদের রাজধানী পাটলীপুত্র দৈর্ঘ্যে সাড়ে নয় মাইল এবং প্রস্থে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত ছিল। শত্রুর আক্রমণ হইতে প্রতিরক্ষার জন্য শহরটি উচ্চ প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। পাটলীপুত্রের রাজপ্রসাদ কাষ্ঠনির্মিত ছিল। পাটলীপুত্রের পৌর শাসন ব্যবস্থা ত্রিশজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি সভার উপর ন্যস্ত ছিল।

ত্রিশজন সভ্য ছয়টি সমিতি

উহা পাঁচজন সদস্য লইয়া গঠিত মোট ছয়টি সমিতিতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি সমিতি এক একটি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিল; যথা—শিল্পকার্য্যের তত্ত্বাবধান; বৈদেশিকদের তত্ত্বাবধান, জন্মমৃত্যুর হিসাব সঙ্কলন, ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে ওজন,

মাপ প্রভৃতির তত্ত্বাবধান, উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা ও বিক্রীত দ্রব্যের উপর এক দশমাংশ শুল্করূপে গ্রহণ।

'ভাগ' ও 'বলি' এই দুইটি কর মৌর্য্য সাম্রাজ্যের রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল। ভূমি হইতে উৎপন্ন ফসলের এক ষষ্ঠাংশ রাজার 'ভাগ' হিসাবে আদায় করা হইত। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ইহা এক চতুর্থাংশ ছিল। বলির পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল না। ইহা অতিরিক্ত স্বেচ্ছাতীয় কর ছিল। ইহা অঞ্চল বিশেষের উপর প্রযুক্ত হইত। অশোকের একটি লিপিতে বলির উল্লেখ আছে। তিনি ইহার পরিমাণ কমাইয়া এক-অষ্টমাংশ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত জন্ম ও মৃত্যু কর, বিক্রীত দ্রব্যের উপর কর এবং জরিমানাদি আদায় করা হইত।

রাজস্ব

চন্দ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে এবং প্রদেশ সমূহ কয়েকটি 'বিহার' বা 'বিষয়' বা জেলায় বিভক্ত ছিল। প্রদেশগুলি সাধারণতঃ রাজপুত্রের বা রাজপরিবারস্থ লোকের দ্বারা শাসিত হইত। প্রদেশগুলি ব্যতীত চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যে কয়েকটি অর্দ্ধস্বাধীন জাতি ও নগর ছিল। ইহাদের মধ্যে কম্বোজ, সুরাষ্ট্র প্রভৃতি কয়েকটি স্বায়ত্তশাসিত জাতি ও রাষ্ট্রের নাম পাওয়া যায়।

প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা

সম্রাট অশোক মৌর্য্যবংশের শাসনযন্ত্রের মূল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উহার কিছু প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্তন করিয়াছিলেন। এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল প্রজাদের মঙ্গলের জন্য শাসনকার্য্যের উন্নততর ব্যবস্থা করা। প্রজাহিতৈষণা ছিল মৌর্য্য শাসন ব্যবস্থার মূল আদর্শ। অশোক প্রজাদের সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য কয়েকজন নূতন রাজকর্মচারীর পদ সৃষ্টি করেন এবং প্রতি তিন বা পাঁচ বৎসর অন্তর রাজকর্মচারীদিগকে দেশের অভ্যন্তরে 'অনুসংযান' বা পরিভ্রমণের জন্য নির্দেশ দেন। মৌর্য্য সম্রাটগণ আইনতঃ স্বৈরাচারী ছিলেন কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারা প্রজাদের সম্বন্ধে দায়িত্বের কথা কখনও বিস্মৃত হন নাই। 'সকল প্রজা আমার পুত্র'—অশোকের এই উক্তির মধ্যে মৌর্য্য নরপতিগণের প্রজার প্রতি পিতৃসুলভ কর্তব্যের তথা স্নেহপরায়ণতার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

মৌর্য শাসনের লক্ষ্য

প্রজাহিতৈষণা

মেগাস্থিনিসের বিবরণঃ—আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি ও সিরিয়ার নরপতি সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস নামে একজন গ্রীক দূতকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনিস সুদীর্ঘকাল রাজধানী পাটলীপুত্রে অবস্থান করিয়া ইণ্ডিকা নামক একখানি গ্রন্থে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের শাসনপদ্ধতি ও তৎকালীন সামাজিক ও

অপরাপর অবস্থা সম্বন্ধে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া যান। ইণ্ডিকা গ্রন্থখানি বিলুপ্ত হইয়া গেলেও পরবর্তীকালের গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তাহাদের পুস্তকে 'ইণ্ডিকা' হইতে অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সমস্ত উদ্ধৃত অংশ একত্র সঙ্কলিত হইয়া বর্তমানে মেগাস্থিনিসের বিবরণ নামে খ্যাত হইয়াছে।

ভারতবাসীদের সামাজিক অবস্থার কথা বলিতে গিয়া মেগাস্থিনিস জনসাধারণকে সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন—দার্শনিক (ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ), কৃষক, শিকারী ও পশুপালক, বণিক ও শ্রমশিল্পী, সৈনিক, পর্য্যবেক্ষক বা গুপ্তচর এবং অমাত্য। সম্ভবতঃ মেগাস্থিনিস ভারতীয় চতুর্বর্ণের কথা জানিতেন না। তাঁহার শ্রেণীবিভাগ প্রধানতঃ বৃত্তি অনুযায়ী হইয়াছে।

সমাজব্যবস্থা

মেগাস্থিনিস ভারতবাসীদের খুব প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতীয়রা খুব সরল ও অনাড়ম্বরভাবে জীবন যাপন করিত। ভারতীয়রা মিথ্যাকথা বলিত না। মামলা-মোকদ্দমা বা চুরি-ডাকাতি তখন মোটেই ছিল না বলিলেই হয়। তাহারা যজ্ঞের সময়ে ব্যতীত মদ্যপান করিত না। কৃষকগণ পরিশ্রমী, সংযমী ও মিতব্যয়ী ছিল। ভারতবাসীরা বিলাসী ও অলঙ্কারপ্রিয় ছিল। নাগরিকগণ উত্তম সাজে সজ্জিত হইয়া রাজপথে পরিভ্রমণ করিতে ভালবাসিত। মৌর্য্যযুগে দাসত্বপ্রথা ছিল না বলিয়া মেগাস্থিনিস উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে দাসত্বপ্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল—তবে গ্রীসের মত ক্রীতদাসপ্রথা এখানে তত ব্যাপক ছিল না বলিয়া এবং ক্রীতদাসদের প্রতি সদয় ব্যবহার দেখিয়া সম্ভবতঃ তিনি এই উক্তি করিয়া গিয়াছেন।

জনসাধারণের সরল জীবনযাত্রা

মৌর্য্যযুগে কৃষিকার্য্যই জনসাধারণের প্রধান উপজীবিকা ছিল। কৃষকদের সংখ্যা ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। তাহাদিগকে সমাজের একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশরূপে গ্রহণ করা হইত। কৃষকরা সামরিক কার্য্যে যোগদান করার দায়িত্ব হইতে মুক্ত ছিল। কৃষক ব্যতীত শ্রমশিল্পী ও বণিকের সংখ্যাও কম ছিল না। খনিজ সম্পদেও ভারতবর্ষ তখন খুব উন্নত ছিল। মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষে কখনও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নাই। এই কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে।

অর্থনৈতিক জীবন

মৌর্য্য সম্রাটদের সম্বন্ধে মেগাস্থিনিস উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে তাঁহারা চারিপ্রকার কার্য্যোপলক্ষে রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইতেন—যুদ্ধের সময়ে, বিচারকার্য্য নির্বাহের জন্য, যজ্ঞসম্পাদনের উদ্দেশ্যে এবং শিকারের জন্য। বিচারকার্য্য নির্বাহের দিন নরপতি

নরপতির প্রাসাদ হইতে বহির্গমন

শেষ পর্য্যন্ত বিচারকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সমস্ত দিন বিচারালয়ে অতিবাহিত করিতেন। নারী-রক্ষী নৃপতির দেহরক্ষার জন্য নিযুক্ত থাকিত।

মেগাস্থিনিস লিখিয়া গিয়াছেন যে ভারতবাসীরা লিখিতে জানে না সুতরাং সমস্ত কার্যেই তাহাদিগকে স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করিতে হয়। মেগাস্থিনিসের এই উক্তি সঠিক নহে। কেননা, তিনি স্বয়ং অন্যত্র লেখার উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবপক্ষে মৌর্য্যযুগে যে লিখনপ্রথা প্রচলিত ছিল অশোকের শিলালিপি সমূহই তাহার প্রমাণ।

শিক্ষা ও লিপির ব্যবহার

মৌর্য্যযুগে পুরুষের বহু-বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। নারীদের সামাজিক মর্য্যাদা যথেষ্ট ছিল না। নারীগণকে অবরোধে (অন্তঃপুরে) থাকিতে হইত। নারীদের ধর্মশিক্ষার জন্য অশোক স্ত্র্যধ্যক্ষমহামাত্র নামে কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

নারীদের অবস্থা

অশোকের লিপি হইতে জানা যায় যে জনসাধারণের মধ্যে 'সমাজ' নামে উৎসব প্রচলিত ছিল। জনসাধারণ ব্যাধি, বিবাহ, সন্তান-জন্মোৎসব ইত্যাদি উপলক্ষ্যে খুব ব্যয় করিত। অশোক এই শ্রেণীর অযথা ব্যয়ের নিন্দা করিয়াছেন।

উৎসব ও আমোদপ্রমোদ

অশোকের সময়ে ভারতবর্ষে বহু ধর্মমত ছিল। ইহাদের মধ্যে হিন্দু জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাই অধিক ছিল। বৌদ্ধধর্মে তখন পর্য্যন্ত মূর্তিপূজার প্রচলন হয় নাই।

ধর্ম

মৌর্য্যযুগের শিল্প :—মৌর্য্যযুগে ভারতীয় ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য ও শিল্পকলা বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। মেগাস্থিনিস এবং গুপ্তযুগের চীন-পরিব্রাজক ফাহিয়ানের বিবরণ হইতে আমরা শিল্পকলার উন্নতির কথা জানিতে পারি। মৌর্য্যযুগে শহর অঞ্চলের গৃহাদি কাষ্ঠদ্বারা নির্মিত হইত। চন্দ্রগুপ্তের কাষ্ঠনির্মিত বিরাট প্রাসাদ দেখিয়া মেগাস্থিনিস মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অশোকের সময়ে নির্মিত মৌর্য্য রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া কয়েক শতাব্দী পরে ফাহিয়েনও বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—"ইহা মনুষ্য-নির্মিত নহে, ইহা দানবের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে"। অশোক অবশ্য পিতামহ চন্দ্রগুপ্তের কাষ্ঠনির্মিত প্রাসাদের পরিবর্তে প্রস্তরের প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। চীন দেশের পরিব্রাজকরা অশোকের নির্মিত অসংখ্য স্তূপ ও বৌদ্ধ বিহার দেখিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। অশোকের আনুকূল্যে ও উৎসাহে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর এবং নেপালের অন্তর্গত দেবপত্তন নগরী নির্মিত হইয়াছিল।

স্থাপত্যশিল্প

অশোকনির্মিত স্তম্ভগুলি মৌর্য্যযুগের শিল্পকীর্তির অত্যাশ্চর্য্য নিদর্শন। পাথরের পালিশের কাজে মৌর্য্য শিল্পীরা বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। এই স্তম্ভগুলির বিশেষত্ব এই যে সেইগুলি যেমন সুঠাম তেমনই অলঙ্কারের বাহুল্যবর্জিত। প্রত্যেকটি পশু, পক্ষী ও পুষ্প নিপুণতার সহিত নির্মিত, কোথায়ও প্রয়োজনাতিরিক্ত একটি অনাবশ্যক রেখাও নাই। তখনকার শিল্পকার্য্যের সামঞ্জস্য ও বাহুল্যহীনতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অশোক যে সমস্ত স্তূপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন সেইগুলি ইষ্টক ও প্রস্তর দ্বারা নির্মিত ছিল। সাঁচির বিখ্যাত স্তূপটি এবিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মৌর্য্যযুগে সম্রাট অশোক ও দশরথের উৎসাহে গয়ার নিকটবর্তী বরাবর পর্বতে আজীবক সন্ন্যাসীদের জন্য কয়েকটি গুহা নির্মিত হয়। এই সব গুহাগাত্রে নানাপ্রকার সুন্দর চিত্র খোদিত ছিল। এই গুহাগুলির দেওয়ালগাত্র কাচের ন্যায় মসৃণ ছিল।

তক্ষণ শিল্প
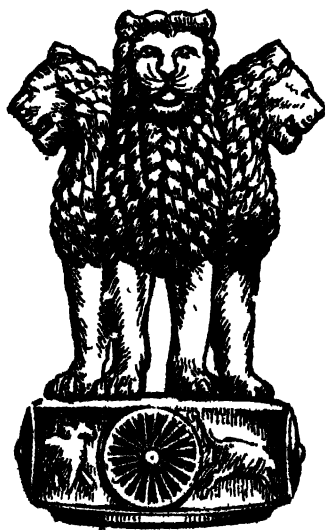
অশোকস্তম্ভের সিংহমূর্তি

মৌর্য্যযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যশিল্পে পারসিক ও গ্রীক শিল্পরীতির প্রভাব ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। তাহাদের মতে পাটলীপুত্রে অশোকের রাজপ্রাসাদ নাকি পারসিকদের পার্সিপোলিস নগরের প্রাসাদের অনুকরণে পরিকল্পিত হইয়াছিল এবং

অশোকের শিল্পিগণও প্রস্তর কারুকার্য্যের ব্যাপারে পারসিক প্রস্তরশিল্পীদের অনুসরণ করিয়াছিলেন। সারনাথ স্তম্ভশীর্ষে স্থাপিত সিংহমূর্তির নির্মাণকৌশলের মধ্যে গ্রীক প্রভাব বর্তমান বলিয়া অনেকের ধারণা। আধুনিক ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ মৌর্য্যশিল্পে বিদেশীয় প্রভাবের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে মৌর্য্য শিল্পরীতি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়—আর্য্য ও দ্রাবিড় স্থাপত্যের সংমিশ্রণ।

শিল্পরীতিতে পারশিক প্রভাব

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র:—মৌর্য্যযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে অন্যতম নির্ভরযোগ্য উপাদান কৌটিল্যপ্রণীত রাষ্ট্রবিজ্ঞানগ্রন্থ অর্থশাস্ত্র। কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ও উপদেষ্টা ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তিনি চাণক্য ও বিষ্ণুগুপ্ত এই দুই নামেও পরিচিত ছিলেন। অর্থশাস্ত্রের গ্রন্থকার কে ছিলেন এবং কোন সময়ে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও ইহাতে যে মৌর্য্য শাসনরীতিরই বর্ণনা রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কেননা অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত শাসন-রীতিসম্বন্ধীয় বিবরণ মেগাস্থিনিসের বিবরণেরই অনুরূপ। অর্থশাস্ত্রে নরপতির কর্তব্য, রাষ্ট্রের শত্রুমিত্রের ভেদাভেদ, উপদেষ্টা মন্ত্রিপরিষদ, সামরিকব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগ, বিভাগীয় অধ্যক্ষ, গুপ্তচর, দণ্ডবিধির কঠোরতা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ রহিয়াছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থ

মেগাস্থিনিসের বিবরণের অনুরূপ

প্রশ্নোত্তর

1. Give briefly the rise of Magadha as an imperial power from the earliest time of the Kalinga war.

প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া কলিঙ্গ যুদ্ধ পর্য্যন্ত মগধের সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তর-সূত্র: (১) **ভূমিকা** খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে আর্য্যাবর্ত্তের ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে প্রথমে চারিটি রাষ্ট্র পরাক্রান্ত হইয়া উঠে, এই রাষ্ট্রচতুষ্টয়ের মধ্য হইতে কোশল ও মগধ আর্য্যাবর্ত্তের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হইবার জন্য দীর্ঘস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হয়। পরিণামে মগধ জয়ী হয় এবং মগধের সাম্রাজ্যবাদী জীবনের সূচনা হয়। মগধের নরপতি বিম্বিসারের সময়কাল হইতে যে মগধের সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ-নীতির সূচনা হয় তাহা শৈশুনাগ ও নন্দবংশের সময়ে বিস্তৃতিভর হইয়া মৌর্য্য-

বংশের সময়ে চরম উন্নতি লাভ করে এবং তৃতীয় মৌর্য নরপতি অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের পর তাহা পরিত্যক্ত হয়।

(২) **মগধের সম্প্রসারণ:** (ক) বিম্বিসার কর্তৃক অঙ্গ (পূর্ব বিহার) বিজয় হইতে মগধের সাম্রাজ্যবাদের সূত্রপাত হয়। কোশল রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহের ফলে বিম্বিসার কাশী প্রাপ্ত হন এবং লিচ্ছবিবংশীয়া বৈশালী রাজকুমারীর সঙ্গে পরিণয়ের ফলে মগধরাজ্য উত্তর দিকে নেপালের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইবার সূচনা করিল। বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুর সময়ে বৈশালী ও কুশীনগর মগধের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(খ) শৈশুনাগ বংশের সময় অবন্তী মগধের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(গ) নন্দবংশের রাজত্বকালে মগধ সর্বপ্রথম বিরাট সাম্রাজ্যের আকার ধারণ করে, ইক্ষ্বাকু, পাঞ্চাল, কাশী, হৈহয়, কলিঙ্গ, অশ্মক, কুরু, শূরসেন প্রভৃতি রাজ্য ও বংশের উপর মগধের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত বোম্বাই প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে এবং দাক্ষিণাত্যের অঞ্চল বিশেষেও মগধের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় 'প্রাসিই' এবং 'গঙ্গারিডাই' নামক দুইটি রাজ্যও মগধের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(ঘ) মৌর্য সম্রাট [illegible] সাম্রাজ্য নন্দবংশের রাজত্বকাল অপেক্ষা বৃহত্তর হয়। [illegible] পূর্ব উত্তরবঙ্গ, পশ্চিম [illegible] এবং দাক্ষিণাত্যে [illegible] পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল। এতদ্ব্যতীত পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ এবং সিন্ধু তাহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(ঙ) বিন্দুসার ও অশোকের রাজত্বকালে চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক রাজ্যসীমা অক্ষুণ্ণ ছিল। বিন্দুসারের রাজত্বকালে তক্ষশিলা বিদ্রোহ করে-অশোক এই বিদ্রোহ দমন করেন। অশোকের রাজত্বকালে কলিঙ্গ রাষ্ট্র সম্ভবতঃ বিদ্রোহী হয়। অশোক এই বিদ্রোহ দমন করিয়া কলিঙ্গকে পুনরায় মগধের অন্তর্ভুক্ত করেন। কলিঙ্গ বিজয়ের সময়ে রণক্ষেত্রের নির্মম ও বীভৎস দৃশ্য দর্শনে অশোক বিচলিত হন এবং দিগ্বিজয়ের পরিবর্তে ধর্ম বিজয়ের নীতি গ্রহণ করিলেন।

(৩) **উপসংহার:**—যে মগধের সাম্রাজ্যবাদ বিম্বিসারের অঙ্গদেশ বিজয় হইতে সূচিত হইয়া সমগ্র ভারতব্যাপী হইয়াছিল কলিঙ্গ যুদ্ধের সঙ্গে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিল এবং দিগ্বিজয়ের ইতিহাসের অধ্যায় সমাপ্ত হইয়া নূতন এক অধ্যায়ের সূচনা হইল।

2. Write what you know of the Persian and the Greek invasion of India What were the effects of Alexander's invasion ?

পারসিক ও গ্রীকদের ভারত আক্রমণ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ ; আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলাফল বর্ণনা কর।

উত্তর-সূত্র : (১) খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যের সম্রাটগণ অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। বিম্বিসারের সমকালীন পারসিক সম্রাট 'সাইরাস' ভারত অভিযানে অগ্রসর হইয়া কপিশা সহর ধ্বংস করেন এবং কাবুল উপত্যকার অঞ্চল বিশেষে পারস্যের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

(২) পারস্যের তৃতীয় নরপতি দারিয়ুস ভারত আক্রমণ করিয়া সিন্ধুনদের পশ্চিমস্থ পঞ্জাব এবং সিন্ধুদেশ অধিকার [illegible] বিজিত [illegible] একজন 'শত্রপ' (শাসনকর্তা) এর অধীনে স্থাপন করেন।

(৩) দারিয়ুসের পুত্র জেরাকসেসের [illegible] ভারতীয় অঞ্চল সমূহ পারস্যের অধিকার ও শাসনভুক্ত ছিল।

(৪) পারসিক অভিযানের ফলস্বরূপ [illegible] পারস্যের [illegible] ব্যবহার [illegible] পারসিক [illegible] ([illegible]) [illegible] ভারতীয় [illegible]।

[illegible] গ্রীক [illegible] —পঞ্জাব ও সিন্ধুবিধৌত [illegible] ভারতের [illegible] আলেকজাণ্ডার কর্তৃক [illegible]।

[illegible] আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ পরোক্ষভাবে [illegible] ব্যবস্থা দিয়াছিল।

(খ) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাব সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়—ভারত ও ইউরোপের মধ্যে গমনাগমনের জন্য তিনটি জলপথ ও একটি স্থলপথ আবিষ্কৃত হয়।

(গ) গ্রীক বিজয়ের ফলে ভারতের সহিত ইউরোপের ভাব-বিনিময়—ভারতীয় মুদ্রা, শিল্প, প্রতিমা রচনা, জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর গ্রীক প্রভাব—বৌদ্ধধর্মের মহাযান মতবাদ গ্রীক প্রভাবের ফল—খৃষ্টধর্মও বৌদ্ধধর্মের দ্বারা প্রভাবিত।

(ঘ) আলেকজাণ্ডারের সহযোগী রাজপুরুষ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের দ্বারা প্রেরিত রাজদূতগণ (যথা, মেগাস্থিনিস) ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে তথ্যাবলী লিখিয়া গিয়াছেন তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসের যথেষ্ট উপাদান যোগাইয়াছে।

3. What do you know about Chandragupta Maurya as a conqueror and an administrator.

বিজেতা ও শাসকরূপে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের কাহিনী লিখ।

উত্তর-সূত্র (১) বিজেতা : (ক) মগধের নন্দবংশের উচ্ছেদ খ) গ্রীকগণকে পরাজিত করিয়া সিন্ধু উপত্যকা গ্রীক অধিকার হইতে মুক্ত করেন

(গ) সেলুকাসকে পরাজিত করিয়া আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানের চারিটি প্রদেশ সাম্রাজ্যভুক্ত।

(ঘ) দাক্ষিণাত্যে মহীশূর পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তৃত।

(ঙ) পশ্চিমে সুরাষ্ট্র পর্য্যন্ত রাজ্যসীমা প্রসারিত।

(চ) উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্থানসহ হিন্দুকুশ পর্বতমালা পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত।

(ছ) পূর্বে উত্তরবঙ্গ সম্ভবতঃ তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(২) **শাসক :** উৎকৃষ্ট সুশাসন পদ্ধতি (ক) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি :—নরপতি রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান ব্যক্তি : স্বেরাচারী অথচ প্রজাবৎসল : বিচারকার্য্য পরিচালনা, আইনপ্রণেতা, সর্বোচ্চ নির্বাহিক ক্ষমতা : উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীবৃন্দ (খ) প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা (গ) গুপ্তচর (ঘ) বিদেশীদের রক্ষণাবেক্ষণ ঙ) রাজস্ব ও আয় ব্যয় (চ) সামরিক ব্যবস্থা (ছ) পাটলীপুত্রের শাসনব্যবস্থা।

(৩) **সমালোচনা** চন্দ্রগুপ্ত স্বীয় প্রতিভাবলে এবং একক প্রচেষ্টায় একটি ক্ষুদ্র রাজ্যকে বৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত করেন—ভারতবর্ষকে গ্রীক শাসন হইতে মুক্ত করেন, —সেলুকাসের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। চন্দ্রগুপ্ত কেবলমাত্র সর্বপ্রথম সমগ্র ভারতব্যাপী বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না, বিরাটায়তন সাম্রাজ্যের সুশাসনেরও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন—আতুরাশ্রম নির্মাণ, পথঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ, সেচ-কার্য্যের বন্দোবস্ত করা ইত্যাদি জনহিতকর কার্য্য সম্বন্ধেও উদাসীন ছিলেন না।

4. Write briefly the expansion of Magadha from Chandragupta to Ashoka.

চন্দ্রগুপ্ত হইতে অশোকের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের বিবরণ দাও।

উত্তর-সূত্র : [প্রথম প্রশ্নের উত্তর-সূত্র দেখ।]

5. Sketch the career and achievements of Asoka.

অশোকের জীবনী ও কৃতিত্বের বিবরণ দাও।

উত্তর-সূত্র : (১) জীবনী : বিন্দুসারের মৃত্যুর পরে সিংহাসনারোহণ : কলিঙ্গ

যুদ্ধ ও মানসিক পরিবর্তন—দিগ্বিজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়ের আদর্শ গ্রহণ—বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচারের জন্য স্বরাজ্যে, প্রত্যন্ত রাজ্যে ও বিদেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ—জনহিতকর কার্য্যাবলীর অনুষ্ঠান—সুশাসনের বন্দোবস্ত –ধর্মসম্বন্ধে উদার দৃষ্টি।

(২) কৃতিত্ব: (ক) অশোক পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি—তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব রাজ্যজয়ের ভিত্তির উপর নহে, শাশ্বত মানব কল্যাণ প্রচেষ্টার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত-ভেরীঘোষের পরিবর্তে 'ধর্মঘোষ', দিগ্বিজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়। (খ) পরধর্মে সহিষ্ণুতা (গ) প্রজাকল্যাণ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন—প্রজাকল্যাণমূলক অজস্র কর্মের অনুষ্ঠান (ঘ) বিশ্বমানব প্রেমিকতা (ঙ) রাজনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির সামঞ্জস্য সাধন।

6. What measures did Asoka take to propagate Buddhism within and outside the empire?

অশোক তাহার সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ও বাহিরে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

উত্তর-সূত্র: (১) ভূমিকা। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্যই অশোক পৃথিবীর ইতিহাসে সমধিক খ্যাত। তিনি ভারতের অভ্যন্তরে এবং ভারতের বাহিরে শাক্যমুনির বাণী প্রচার করিবার জন্য নানাবিধ উপায় অনুসরণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মে পরিণত হইয়াছিল।

(২) সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রচার: (ক) বৌদ্ধধর্মের বাণী সম্বলিত ধর্মলিপি উৎকীর্ণ ও ধর্মপ্রচারের জন্য ধর্ম মহামাত্র—নারীদের মধ্যে প্রচারের জন্য স্ত্র্যধ্যক্ষ মহামাত্র নিযুক্ত (খ) স্বরাজ্যে কয়েকটি প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ (গ) ধর্মযাত্রা, ধর্মদান প্রভৃতি ধর্মবৃদ্ধিমূলক হিতকর কর্ম (ঘ) প্রচলিত আমোদ-প্রমোদ বন্ধ করিয়া ধর্মশিক্ষা বিবর্দ্ধক আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত (ঙ) বৌদ্ধধর্মের আভ্যন্তরীণ বিরোধ নিবারণের জন্য পাটলীপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধসভার অধিবেশন হয়।

(৩) সাম্রাজ্যের বাহিরে বৌদ্ধধর্মপ্রচার: (ক) মাত্র সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে নয় সাম্রাজ্যের বাহিরে, ভারতবর্ষের অন্তর্গত প্রত্যন্ত রাজ্যসমূহে ও ভারতবর্ষের বাহিরেও তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। (খ) প্রত্যন্ত দেশ চোল, চের, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র ও তাম্রপর্ণীতে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ (গ) সাম্রাজ্যের অপরান্ত বা পশ্চিমদিকে অবস্থিত যবন, কম্বোজ, গান্ধার, রাষ্ট্রিক ও পিত্তিনিকদের মধ্যে ধর্ম মহামাত্র প্রেরণ (ঘ) ভারতের বাহিরে সিরিয়, মিশর,

ম্যাসিডন, উত্তর আফ্রিকায় সাইরিণ-এ এবং গ্রীসের এপিরাস অথবা করিন্থ-এ প্রচারক প্রেরণ (৬) সম্ভবতঃ সুবর্ণভূমিতেও (দক্ষিণ-ব্রহ্ম ও সুমাত্রা) প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন।

কলিঙ্গ যুদ্ধের পরে অশোকের মনে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যে অনুরাগ জন্মিয়াছিল তাহা তাঁহার পরবর্তী জীবনে এমন সর্বগ্রাসী হইয়াছিল যে তাহার জীবনের সকল কার্য্য ও লক্ষ্য এই ধর্মকেই কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইয়াছিল। ধর্মমঙ্গল, ধর্মবিজয়, ধর্মদাস, ধর্মমহামাত্র, ধর্মলিপি—সকল ব্যাপারই ধর্ম সম্পৃক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্ম প্রচারের ফলে বৌদ্ধধর্ম স্থানীয় ধর্ম হইতে বিশ্বধর্মে পরিণত হয়।

7. Make an estimate of Asoke as an ideal ruler.

আদর্শ নরপতিরূপে অশোকের কৃতিত্বের পরিমাপ কর।

উত্তর সূত্র : (১) ভূমিকা :—বর্তমান যুগের রাষ্ট্রশাসন নীতির মানদণ্ড বিচার করিলে অশোকের রাজ্যশাসন পদ্ধতি 'স্বেচ্ছাচারী' ছিল। কেননা তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট শাসন কার্যের জন্য দায়িত্বশীল ছিলেন না। কিন্তু তিনি তাঁহার অনুশাসনের এবং কার্য্যাবলীর দ্বারা যে রাজ্যশাসন নীতির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা সর্বকালের এবং সর্বদেশের আদর্শ নরপতির অনুসরণযোগ্য।

(২) প্রজাগণকে সন্তান বলিয়া উল্লেখ—প্রজাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলসাধন করা কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন।

(৩) যুত, রাজুক, প্রাদেশিক, মহামাত্র, প্রভৃতি কর্মচারীর পক্ষে তিন বা পাঁচ বৎসর অন্তর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে 'অনুসংযান' বা পরিভ্রমণের নির্দেশ।

(৪) রাজুকগণের উপর 'ব্যবহারসমতা' ও 'দণ্ডসমতার'-র নির্দেশ।

(৫) মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের উপর করুণা প্রকাশ।

(৬ প্রজাগণের পার্থিব মঙ্গলকার্য্য ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যাকুলতা—মনুষ্য ও জীবজন্তুর চিকিৎসার্থ প্রয়োজনীয় ভেষজ তরুলতা রোপণ—মনুষ্য ও জীবজন্তুর জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন—রাজপথ ও পান্থশালা নির্মাণ—পথিপার্শ্বে ছায়াবহুল বৃক্ষ রোপণ ও কূপ খনন।

(৭) প্রজা-কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত অক্লান্ত প্রচেষ্টা—সরকারী কার্য্যব্যপদেশে কর্মচারিগণ অশোকের সঙ্গে যে কোন সময়ে সাক্ষাৎ করিতে পারিত।

(৮) পৃথিবীর যাবতীয় জীবের কল্যাণের জন্য তাঁহার আগ্রহ।

8. **Give an account of the social and political condition of India during the Maurya period.**

মৌর্য্যযুগে ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার একটি বিবরণ দাও।

উত্তর সূত্র : (১) সামাজিক জীবনযাত্রা (····· পৃষ্ঠা)

(২) রাজনৈতিক অবস্থা (মৌর্য্যযুগের শাসন পদ্ধতি ······ পৃষ্ঠা)

9. **Write notes on Megasthenes and his Indica.**

মেগাস্থিনিস ও 'ইণ্ডিকা' সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তর-সূত্র : (······ পৃষ্ঠা) ৬

অষ্টম অধ্যায়

মৌর্য্যোত্তর যুগে বৈদেশিক আক্রমণঃ সাংস্কৃতিক প্রভাব

Syllabus :—Foreign invasions and cultural impacts.

Fall of the Maurya Empire—the Sungas and Kanvas in the North and the Satavahanas in Central and Southern India—beginning of Puranic Hinduism.

Foreign invaders—Bactrian Greeks—the new cultural impact—Gandhara Art—Greek influence on coins. The Parthians—the Sakas—the Kushanas.

The Kushan Dynasty—Kaniska—emergence of Mahayana Buddhism—the Buddhist Council—Asvaghosa, Jivaka, Panini, Patanjali, Gunadhya, Charaka etc. Taxila University. Relations with neighbouring countries, specially China.

Missionary activities abroad—export of art forms to China and Central Asia—Social Changes—deterioration of the status of women.

Expansion of trade in the Mauryan and Post-Mauryan Periods—begining of trade with Rome—some routes and ports.

পাঠনির্দেশ :—মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতন—আর্য্যাবর্তে সুঙ্গ ও কাম্ববংশের রাজত্ব, দাক্ষিণাত্যে ও মধ্যভারতে সাতবাহন রাজত্ব। পৌরাণিক হিন্দুধর্মের সূত্রপাত।

বৈদেশিক আক্রমণকারিগণ—বাহ্লীক গ্রীকদের আক্রমণ ও আধিপত্য—সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়—গান্ধার শিল্পকলা—মুদ্রায় গ্রীক প্রভাব—পহ্লব, শক ও কুষাণদের আক্রমণ ও অধিকার।

কুষাণ রাজবংশ—কণিষ্ক—মহাযান বৌদ্ধ মতবাদের আবির্ভাব—বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি—অশ্বঘোষ, জীবক, পাণিনী, পতঞ্জলি, গুণাঢ্য, চরক, প্রভৃতি—তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়—প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ বিশেষতঃ চীনের সঙ্গে তাদের আদানপ্রদান।

বিদেশে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম বিস্তার—চীনে ও মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় শিল্পপ্রসার—ভারতের সামাজিক পরিবর্তন—সমাজে নারীর মর্য্যাদা হ্রাস।

মৌর্য্য ও মৌর্য্যোত্তর যুগে ব্যবসাবাণিজ্যের বিস্তার—রোম ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক—বিভিন্ন পথ ও বন্দর।

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতন ঃ—চন্দ্রগুপ্তের সামরিক প্রতিভা ও অক্লান্ত চেষ্টার ফলে যে বিশাল মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয় পৌত্র অশোকের সময়ে তাহা ভারতব্যাপী বিস্তৃত হয় এবং মৌর্য্য সাম্রাজ্য উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। অশোকের মৃত্যুর পরে তাঁহার দুর্বল বংশধরগণের রাজত্বকালে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সংহতি বিনষ্ট হইয়া পড়ে। অশোকের তিবর, জালুক ও কুনাল নামে তিন পুত্র ছিল বলিয়া জানা যায়। তন্মধ্যে জালুক কাশ্মীরের নরপতি হইয়াছিলেন। অশোকের পরে তাঁহার দুই পৌত্র দশরথ ও সম্প্রাতি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহাদের পরবর্তী রাজগণের মধ্যে কেহ কেহ অধার্মিক, দুর্বল ও অত্যাচারী ছিলেন। এই সুযোগে কাশ্মীর, অন্ধ্রজাতি এবং কলিঙ্গ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হয়। কাবুল ও অন্যান্য উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাষ্ট্রসমূহও মৌর্য্য সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। মগধ সাম্রাজ্যের শক্তিহীনতা দেখিয়া ব্যাকট্রিয়ার গ্রীকগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। এই প্রকার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণের সুযোগে মৌর্য্যবংশের সর্বশেষ নরপতি বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া তাহার সেনাপতি পুষ্যমিত্র সুঙ্গ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

অশোকের পরবর্তী মৌর্য্য নরপতিগণ

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের পশ্চাতে যথেষ্ট কারণ ছিল। অশোকের অহিংস ও যুদ্ধবিরোধী নীতি গ্রহণের ফলে অশোকের বংশধরগণের সময়ে চর্চার অভাবে মগধের সামরিক শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত অশোকের বংশধরগণের অযোগ্যতা ও আত্মবিরোধ, প্রদেশ সমূহের স্বাতন্ত্র্যঅর্জন প্রভৃতি ঘটনার ফলেও মৌর্য্য সাম্রাজ্য ক্রমশঃ দুর্বলতর হইয়া পড়িয়াছিল। এই দুর্বলতার সুযোগে বহিরাগত গ্রীকগণ বারংবার মৌর্য্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে অশোকের মৃত্যুর প্রায় ৪৫ বৎসরের মধ্যে পুষ্যমিত্র সুঙ্গের হস্তে মৌর্য্য বংশের অবসান ঘটে।

মৌর্য্য সাম্রাজ্য পতনের কারণ

সুঙ্গ বংশ ঃ—সুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্র সুঙ্গ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার রাজ্যসীমা সম্ভবতঃ দক্ষিণে নর্মদা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং পাটলীপুত্র, অযোধ্যা, বিদিশা এবং সম্ভবতঃ জলন্ধর ও শিয়ালকোট তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাটলীপুত্র তাঁহার রাজধানী থাকিলেও

পুষ্যমিত্র

মালবের বিদিশা নগর সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীর স্থান অধিকার করিয়াছিল। পুষ্য-মিত্রের রাজত্বকালে ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক নরপতি ডেমেট্রিয়স ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং অযোধ্যা অধিকার করিয়া পাটলীপুত্র পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। গ্রীকগণ যুবরাজ অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্রের হস্তে পরাজিত হয়। হাতিগুম্ফা শিলালিপি হইতে জানা যায় যে কলিঙ্গরাজ খারবেল পুষ্যামিত্রের রাজত্বকালে মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন। পুষ্যমিত্রের সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান হয়। তিনি দুইবার অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পতঞ্জলি পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক ছিলেন। পুষ্যমিত্রের পরে তাঁহার পুত্র অগ্নিমিত্র ও অগ্নিমিত্রের পরে তাঁহার পুত্রদ্বয় জ্যেষ্ঠমিত্র ও বসুমিত্র ক্রমান্বয়ে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরবর্ত্তী রাজগণের মধ্যে ভদ্রক ও ভাগভদ্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বংশের শেষ কয়েকজন নরপতি খুব দুর্বল ছিলেন। আনুমানিক ৭৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে শুঙ্গবংশের দশম নরপতি দেবভূতিকে হত্যা করিয়া তাহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বসুদেব মগধে কাণ্ববংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

গ্রীক আক্রমণ প্রতিরোধ

ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান

শুঙ্গ বংশের অবসান

কাণ্ববংশ ঃ—বসুদেব স্থাপিত নূতন বংশের নাম কাণ্ববংশ। এই বংশের চারিজন নরপতি ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। এই চারিজন নরপতির নাম যথাক্রমে বসুদেব, ভূমিমিত্র, নারায়ণ ও সুশর্মা। ইহারা নামমাত্র মগধের নরপতি ছিলেন। মগধের পূর্বগৌরব উদ্ধার করার মত ইহাদের ক্ষমতা ছিলনা। আনুমানিক ৩০ খৃষ্টপূর্বাব্দে দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন বংশের হস্তে কাণ্ববংশের পতন হয়।

সাতবাহন বা অন্ধ্র বংশ ঃ—দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন বা অন্ধ্রগণ মগধে কাণ্ববংশের রাজত্বের অবসান ঘটাইয়াছিল। সাতবাহনদের বাসস্থান ছিল দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। ইহাদের রাজধানীর নাম ছিল প্রতিষ্ঠান। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম সিমুক। সিমুকের পুত্র প্রথম শাতকর্ণীর রাজত্বকালে সাতবাহন রাজ্য খুব শক্তিশালী হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে সাময়িক দুর্বল হইয়া পড়ে এবং শকগণ সাতবাহন রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করে। গৌতমীপুত্র শাতকর্ণী এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁহার সময়ে সাতবাহনদের লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার হয়। তাঁহার হস্তে শকনৃপতি নহপান পরাজিত হয়। তিনি যবন (গ্রীক), ও

প্রতিষ্ঠাতা সিমুক

ভাবে সাতবাহন বংশ

গৌতমী পুত্র শাতকর্ণী

পহ্লব (পার্থিয়ান) দিগকে পরাজিত করেন। কোঙ্কন, সুরাষ্ট্র, বিদর্ভ, মালব ও মহারাষ্ট্র তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাতবাহন বংশের শেষ পরাক্রান্ত রাজার নাম যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণী। সাতবাহনগণ প্রায় চারিশত বৎসর রাজত্ব করিযাছিলেন।

পৌরাণিক হিন্দুধর্মের অভ্যুদয়ঃ বেদের কাল হইতে মহাকাব্যের যুগ পর্য্যন্ত সাধারণতঃ বৈদিক যুগ নামে পরিচিত। এই সময়ে বেদোক্ত দেবদেবীর উপাসনা, বেদবিহিত যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু মৌর্য্যোত্তর যুগে বৈদিক হিন্দুধর্মের নব রূপায়ণ ঘটিল। বৌদ্ধ, জৈন, আজীবক প্রভৃতি বেদবিরোধী বহু নূতন ধর্মমতের আবির্ভাব এবং অনার্য্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে বৈদিক হিন্দু ধর্মের মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন আসিল। এই পরিবর্তিত বৈদিক ধর্মই সাধারণতঃ হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত। হিন্দু-ধর্মকে বৈদিক ধর্ম হইতে পৃথক ধর্ম বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। এই ধর্মের মূল ভিত্তি বৈদিক ধর্ম। এই ধর্মের মধ্যে বৈদিক যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড এবং বৈদিক দেবদেবীদের অনেকে স্থান পাইয়াছেন। তবে এই পরিবর্তনের ফলে বহু অবৈদিক দেবতার আবির্ভাব হয় এবং অসংখ্য বৈদিক দেবদেবী বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই সময় হইতে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র বা সূর্য্য, অগ্নি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পরিবর্তে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বা শিব এবং কতিপয় নারী-দেবতার প্রাধান্য ঘটে। মহেশ্বর বা শিব যে অনার্য্য দেবতা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সিন্ধু সভ্যতার পশুপতি যোগী পুরুষ যে হিন্দুধর্মের শিব-পশুপতির উন্নত সংস্করণ তাহাতে কোন ভুল নাই। বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তির জন্য এই যুগেই আরম্ভ হইল। এই সমস্ত দেবদেবীর মাহাত্ম্য মন্দির দেবালয়াদি নির্মাণ কীর্ত্তন ও পূজাপদ্ধতি বর্ণনা করিয়া 'পুরাণ' নামে এক শ্রেণীর গ্রন্থ রচিত হয়। পুরাণ সংখ্যায় আঠারোটি; ইহার সঙ্গে অষ্টাদশটি উপপুরাণ রহিয়াছে। পুরাণের মধ্যে সমসাময়িক রাজা, রাজবংশ ও তাহাদের কার্য্যকলাপ বর্ণিত থাকিলেও এইগুলি প্রধানতঃ ধর্মগ্রন্থ। পুরাণোক্ত দেবদেবীর পূজা এই নূতন ধর্মের অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলিয়া ইহা পৌরাণিক হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত। বৈদিক পূজাপদ্ধতি হইতে পৌরাণিক পূজাপদ্ধতি নানা দিক দিয়া পৃথক এবং জনসাধারণের উপযোগী করিয়া এই পূজাপদ্ধতি রচিত হইয়াছিল বলিয়া বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড অপেক্ষা পৌরাণিক আচার-অনুষ্ঠান অধিকতর জনপ্রিয় হয়। বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তিপূজা ও দেবমন্দিরাদি নির্মাণ পৌরাণিক

বৈদিক ধর্মের পরিবর্তন

হিন্দুধর্মের নব রূপায়ণ

পুরাণের সৃষ্টি

হিন্দুধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইহার প্রভাব হইতে বৌদ্ধধর্মও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই—ফলে বৌদ্ধধর্মেও মূর্তিপূজক 'মহাযান' ধর্মমতের উদ্ভব হয়।

বৈদেশিক আক্রমণ :—মৌর্য্যবংশের অবনতির যুগ হইতে গুপ্তবংশের অভ্যুদয়ের প্রাকাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল বিভিন্ন বৈদেশিক জাতির অধিকারে ছিল। মৌর্য্য বংশধরগণের দুর্বলতার সুযোগে ব্যাকট্রিয়া বা বাহ্লীক দেশের গ্রীকগণ, পার্থিয়া বা পহ্লব দেশের পহ্লবগণ, সিথিয়া বা শকদ্বীপ হইতে আগত শকজাতি এবং সিরদরিয়া ও আমুদরিয়া অঞ্চল হইতে কুষাণগণ পর পর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করে। এই সমস্ত বৈদেশিকদের মধ্যে কুষাণরাই সমস্ত দিক দিয়া পরাক্রান্ত ছিল।

ব্যাকট্রিয় বা বাহ্লীক গ্রীকগণ :—আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পরে তাঁহার অন্যতম সেনাপতি সেলুকাস ব্যাকট্রিয়া বা বাহ্লীক দেশের মালিক হন। সেলুকাসের বংশধর তৃতীয় এণ্টিয়োকাসের রাজত্বকালে ব্যাকট্রিয়ার শাসনকর্তা ডিওডোটস ব্যাকট্রিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এণ্টিয়োকাস ব্যাকট্রিয়া পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যাকট্রিয়ার তৃতীয় শাসনকর্তা ইউথিডিমসের

ব্যাকট্রিয়ার স্বাধীনতা

ডেমেট্রিয়সের মুদ্রা ইউক্রেটাইডিসের মুদ্রা গণ্ডোফার্নিসের মুদ্রা

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইলেন। এণ্টিয়োকাস ব্যাকট্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং ইউথিডিমসের পুত্র ডিমেট্রিয়সের সঙ্গে স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়া সন্ধি করিলেন। অত্যল্পকাল পরে এণ্টিয়োকাস হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন এবং কাবুল উপত্যকার অনৈক ভারতীয় নরপতি সুভগসেনকে সন্ধি করিতে

এণ্টিয়োকাসের আক্রমণ

বাধ্য করিলেন। এন্টিয়োকাসের পরে তাঁহার জামাতা ব্যাকট্রিয়ার অধিপতি ডিমেট্রিয়সও ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া কাবুল, পাঞ্জাব ও পশ্চিম-ভারতের কিয়দংশ অধিকার করিলেন। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ভগ্নদশার সময়ে প্রবল গ্রীক আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে কেহই সক্ষম হইল না। ব্যাকট্রিয়া হইতে ডিমেট্রিয়সের অনুপস্থিতির সুযোগে ইউক্রেটিডিস নামে এক ব্যক্তি ব্যাকট্রিয়ার সিংহাসন অধিকার করেন এবং সিন্ধু পাঞ্জাব প্রভৃতি ভারতীয় অঞ্চল নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লন।

ডিমেট্রিয়স

ইউক্রেটিডিস

কিছুকাল পরে ব্যাকট্রিয়া পার্থিয়ান বা পহ্লব নামে এক যাযাবর জাতির দ্বারা অধিকৃত হইলে ব্যাকট্রিয়ার গ্রীকগণ কেবলমাত্র ভারতবর্ষে তাহাদের বিজিত রাজ্যাংশের উপর রাজত্ব করিতে থাকেন। অতঃপর ভারতবর্ষে গ্রীকদের দ্বারা অধিকৃত অঞ্চল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে গ্রীক রাজকুমারদের দ্বারা শাসিত হইতে থাকে। এই সময় হইতে গ্রীক নরপতিগণ সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় হইয়া যান। ব্যাকট্রিয় গ্রীক নরপতিদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিলেন মিনাণ্ডার। মিনাণ্ডার পঞ্জাবের শাকল বা শিয়ালকোটে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

পহ্লব আক্রমণ

মিনাণ্ডার উত্তর-পশ্চিম ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন। কাবুল হইতে আরম্ভ করিয়া মথুরা পর্য্যন্ত তাহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। মিনাণ্ডার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধভিক্ষু নাগসেনের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে মিনাণ্ডার ও নাগসেনের মধ্যে আলোচনা কথোপকথনের আকারে 'মিলিন্দ পঞ্‌হো' নামক গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে। বেসনগরের হেলিয়োডোরাস স্তম্ভলিপিতে এন্টিয়ালকিডাস নামে তক্ষশিলার একজন গ্রীক নরপতির নাম পাওয়া যায়।

মিনাণ্ডার

এন্টিয়ালকিডাস

শক নরপতিগণ :—শক নামে এক যাযাবর জাতি মধ্য এশিয়ায় সিরদরিয়া নদীর উত্তর অঞ্চলে বাস করিত। ইউচি নামে অপর এক পরাক্রান্ত জাতির চাপে বাধ্য হইয়া শকগণ মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে কাবুল নদীর উপত্যকায় বসবাস করিতে আরম্ভ করে। শকদের এই নূতন বাসস্থান তাহাদের নামানুসারে শকস্তান (বর্ত্তমান সিস্তান) নামে পরিচিত হয়। কালক্রমে শকজাতি ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অরাজকতার সুযোগে ভারতবর্ষের সিন্ধু উপত্যকা ও পশ্চিম-ভারতের কোন কোন অঞ্চলে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়। শকদের আক্রমণে উত্তর-পশ্চিম ভারতে অবস্থিত ব্যাকট্রিয়ার গ্রীকরাজ্যসমূহ ধ্বংস হইয়া যায়। ভারতে শাসনকারী শকনরপতিদের মধ্যে

প্রথম পরাক্রান্ত রাজা হিসাবে ময়েস বা মোগ-এর নাম পাওয়া যায়। ময়েস-এর পরে আজেস, আজিলিসেস ও দ্বিতীয় আজেস রাজত্ব করেন বলিয়া জানা যায়।

ক্রমশঃ শকগণ ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সুরাষ্ট্র, রাজপুতনা এবং পাঞ্জাব অধিকার করেন। মালবেও তাহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। শকগণ ক্ষত্রপ বা মহাক্ষত্রপ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রভুত্ব বিস্তার করে। ক্ষত্রপগণ অধিকৃত অঞ্চলভেদে উত্তর-ক্ষত্রপ ও পশ্চিম-ক্ষত্রপ এই দুইটি শাখায় বিভক্ত। উত্তর ক্ষত্রপগণ ভারতের উত্তরাংশে কপিসা অভিসার, তক্ষশিলা মথুরা ও অন্যান্য অঞ্চলে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। মথুরার ক্ষত্রপগণের মধ্যে রাজুবুল বা রাজুল-এর নাম উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম ক্ষত্রপগণ পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ভারতের দক্ষিণ ও প্রধানতঃ পশ্চিম অঞ্চলে মহারাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র, মালব, উত্তর কঙ্কণ, উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। পশ্চিম ক্ষত্রপগণ আবার ক্ষহ্‌রাট ও উজ্জয়িনীর ক্ষত্রপ—এই দুইটি শাখায় বিভক্ত ছিল। ক্ষহ্‌রাট বংশের মধ্যে ভূমক ও নহ্‌পান এই দুই নরপতির নাম উল্লেখযোগ্য। নহ্‌পান মহারাষ্ট্র, উত্তর কঙ্কণ, দক্ষিণ গুজরাট, আজমীর ও মালব শাসন করিতেন। উজ্জয়িনীর ক্ষত্রপগণের মধ্যে চষ্টান ও রুদ্রদামন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উজ্জয়িনীতে নহ্‌পানের রাজধানী ছিল। চষ্টানের পৌত্র রুদ্রদামন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। রুদ্রদামন মহাক্ষত্রপ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। রুদ্রদামন সাতবাহন নরপতি বশিষ্ঠপুত্র পুলোমায়ী অথবা তাহার ভ্রাতা শাতকর্ণীর সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। কিন্তু এই আত্মীয়তা সত্ত্বেও দুই রাজবংশের মধ্যে বিরোধের অন্ত ছিল না। সম্ভবতঃ গুজরাট, সুরাষ্ট্র, সিন্ধু, কচ্ছ ও রাজপুতনার কিয়দংশ রুদ্রদামনের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রুদ্রদামনের গির্ণার শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে গির্ণার পর্বতে অবস্থিত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য নির্মিত সুদর্শন হ্রদটি বন্যার স্রোতে ধ্বংস হইলে তিনি তাহা পুনরায় নির্মাণ করাইয়া দেন। উজ্জয়িনীর শকবংশ গুপ্তবংশের রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের হস্তে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

শকক্ষত্রপ

উত্তর ক্ষত্রপ

রুদ্রদামন

গুপ্তবংশের দ্বারা ধ্বংস

পহ্লবগণ :—পহ্লবগণ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে শকগণকে বিতাড়িত করিয়া গান্ধার অঞ্চলের কিয়দংশ অধিকার করে। ক্রমশঃ পহ্লবগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও পাঞ্জাব অঞ্চলে অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। ভারতীয় পহ্লব নরপতিগণের মধ্যে গণ্ডোফার্নিস

গণ্ডোফার্নিস

সর্বাধিক পরাক্রমশালী ছিলেন। খৃষ্টান কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, তাহার রাজত্বকালেই যিশুখৃষ্টের অন্যতম প্রধান শিষ্য সেন্ট টমাস খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে কুষাণগণের অভ্যুত্থান ও আগমনের ফলে ভারতে পহ্লব শাসনের অবসান ঘটে।

কুষাণগণ :—খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে ইউচি নামে একটি জাতি উত্তর-পশ্চিম চীনে বাস করিত। হিউং-নু নামে অপর একটি জাতির হস্তে পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া তাহারা ক্রমশঃ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া অভিজ্ঞতা লাভের পরে ইউ-চি জাতি শেষ পর্যন্ত সিরদরিয়া নদীর এবং পরে আমুরদরিয়ার অববাহিকা অঞ্চলে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে ইউচিরা পাঁচটি শাখায় বিভক্ত ছিল। ক্রমশঃ ইহাদের মধ্য হইতে কুষাণ শাখা শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং কুজুল কদফিস (১ম) কুষাণদের সর্বপ্রথম পরাক্রমশালী রাজা হন। কুজুল পারস্য দেশের প্রান্ত হইতে সিন্ধু-উপত্যকা পর্যন্ত কুষাণদের আধিপত্য বিস্তার করেন।

কুজুল কদফিস

কুজুল কদফিসের পরবর্তী নরপতি ছিলেন বিম (দ্বিতীয়) কদফিস। তিনি কুষাণ সাম্রাজ্যকে ভারতের অভ্যন্তরে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তাঁহার মুদ্রাগুলিতে বৃষবাহন শিবের মূর্তি দেখা যায়। তাহার পিতা বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী হইলেও তিনি সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ছিলেন না। তিনি রোমান সম্রাট ট্রাজানের রাজসভায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার সহিত চীনা সেনাপতি প্যান-চাওএর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ২য় কদফিস পরাজিত হইয়াছিলেন।

বিম (২য়) কদফিস

কনিষ্ক :—কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন কনিষ্ক। তাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। তাঁহার সিংহাসনারোহণের সময়কাল এবং দ্বিতীয় কদফিসের সঙ্গে তাহার কি সম্পর্ক ছিল সে সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্ত এখনও হয় নাই।

কনিষ্কের রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশোয়ার। কনিষ্ক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। পূর্বে বিহার হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত এবং পামিরের বাহিরে অবস্থিত এক সুবিশাল অঞ্চলও তাহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কাশ্মীরও তাহার রাজ্যভুক্ত ছিল বলিয়া অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। চীন সেনাপতি প্যান-চাও এর মৃত্যুর পরে কনিষ্ক চীন সম্রাটের অধীন খোটান, ইয়ারখন্দ ও কাসগড় এর শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন। এই সকল পরাজিত শাসনকর্তাদের একজন

কনিষ্কের সাম্রাজ্য

জামিন স্বরূপ কয়েক ব্যক্তিকে কনিষ্কের দরবারে রাখিতে বাধ্য হন। উজ্জয়িনীর পশ্চিম ক্ষত্রপগণ কনিষ্কের আনুগত্য স্বীকার করায় পশ্চিম ভারতেও কনিষ্কের প্রভাব বিস্তৃত

কনিষ্ক

হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতের অপর কোন বৈদেশিক শাসক রাজ্যবিস্তারে কনিষ্কের মত এতখানি কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হয় নাই।

বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা

কনিষ্ক কেবল দিগ্বিজয়ী সমরনায়ক ছিলেন না, বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শনের জন্যও কনিষ্ক ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্মরণীয়। প্রথম জীবনে তিনি জরথুষ্ট্রদেবের ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া সম্রাট অশোকের ন্যায় বৌদ্ধধর্মের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক হন। বৌদ্ধধর্মে অনুরাগী হইলেও কনিষ্ক বিভিন্ন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

চী ন
কাশগড়
বোখারা
বাহ্লীক দেশ
ইয়ারখন্দ
খোটান
পহ্লব দেশ
(পার্থিয়া)
কাস্পিয়ান সাগর
কাশ্মীর
তি ব্ব ত
পুরুষপুর
(পেশোয়ার)
পা র স্য
পাটলিপুত্র
গঙ্গা নং
বারাণসী
ম গ ধ
সি ন্ধু
শ ক রা জ্য
মালব
উজ্জয়িনী
নর্মদা নং
কলিঙ্গ
আ র ব সা গ র
সাতবাহন
চোল
কণিষ্কের সাম্রাজ্য
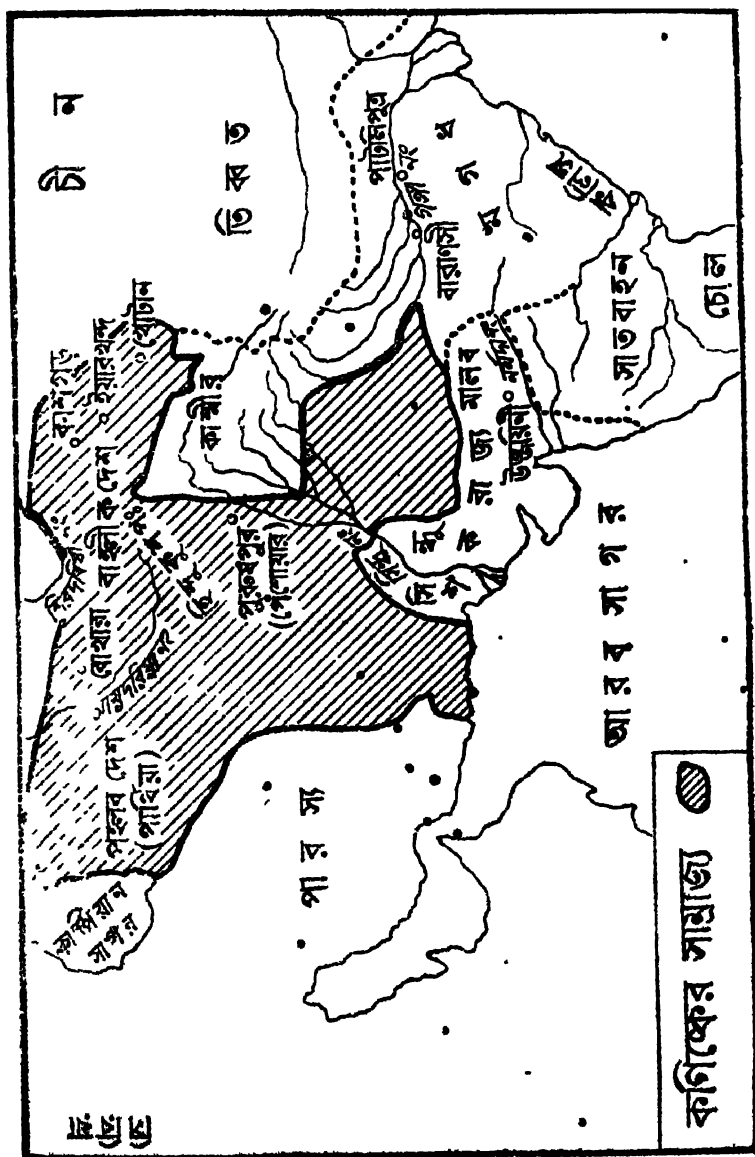
কনিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে 'হীনযান' ও 'মহাযান' এই দুইটি শাখার বিভেদ অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। এই দুই ধর্মমতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কনিষ্ক কাশ্মীরে (মতান্তরে জলন্ধরে) একটি বৌদ্ধ ধর্মসভা বা সঙ্গীতির আহ্বান করেন। ইহা ছিল চতুর্থ এবং সর্বশেষ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি। এই মহাসভায় বৌদ্ধধর্মের আভ্যন্তরীন বিবাদবিরোধের মীমাংসা হয় এবং মহাযান ধর্মমত স্বীকৃতি লাভ করে।

চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি

কনিষ্ক স্থাপত্য-শিল্পকলারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় রাজধানী পুরুষপুরে একটি বিশাল চৈত্য নির্মিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি সাম্রাজ্যের বহুস্থানে অসংখ্য স্তূপ ও বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষক

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ নরপতিদের ন্যায় কনিষ্ক সাহিত্য ও শিল্পকলার একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও কবি অশ্বঘোষ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রপ্রণেতা চরক, দার্শনিক নাগার্জুন ও বসুমিত্র কনিষ্কের রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন। অশ্বঘোষের বহুমুখী প্রতিভা ছিল। তিনি একাধারে পণ্ডিত, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ এবং ধর্মপ্রবক্তারূপে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থসমূহের মধ্যে বুদ্ধচরিত ও সূত্রালঙ্কার প্রসিদ্ধ। বসুমিত্র র চত মহাবিভাষাসূত্র বৌদ্ধদর্শনের বিশ্বকোষবিশেষ বলিয়া পরিচিত।

সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক

পরবর্তী কুষাণ রাজগণ :—কনিষ্কের পরে বাসিষ্ক, হুবিষ্ক, দ্বিতীয় কনিষ্ক, বাসুদেব প্রভৃতি রাজত্ব করেন। অনুমিত হয় শেষ উল্লেখযোগ্য নরপতি বাসুদেবের নাম হইতে কালক্রমে কুষাণগণ সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় হইয়া গিয়াছিলেন। বাসুদেবের পরবর্তী কুষাণরাজগণ সম্ভবতঃ দুর্বল ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে কুষাণ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল তাঁহাদের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে এবং ক্রমশঃ কুষাণ সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইয়া যায়।

গান্ধার শিল্পরীতি :—প্রাচীনকালে পেশোয়ার জেলা এবং ইহার সন্নিকটস্থ স্থানসমূহ গান্ধার অঞ্চল নামে পরিচিত ছিল এবং পরবর্তীকালে রাওলপিণ্ডি, হাজারা ও তক্ষশিলা ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। বহু প্রাচীন কাল হইতে এই অঞ্চল পারস্য ও গ্রীসের সংস্পর্শে আসে। রাষ্ট্রীয় যোগসূত্রে পারসিক ও গ্রীক সভ্যতা ও শিল্পের প্রভাব এই অঞ্চলের উপর পতিত হয়। পারসিক, গ্রীক ও ভারতীয় এই তিন দেশের সভ্যতার সমন্বয়ের ফলে এই অঞ্চলে যে নূতন শিল্পশৈলী গড়িয়া উঠে তাহা গান্ধারশিল্প নামে খ্যাত। হেলেনি বা গ্রীক দেবতাদের অনুকরণে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে এই

সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রধানতঃ বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিসমূহ ও প্রস্তর-গাত্রে রূপায়িত জাতককাহিনী সমূহ উক্ত শিল্পধারার নিদর্শনরূপে বর্ত্তমান আছে।

গান্ধার শিল্পের বৌদ্ধমূর্ত্তি

গান্ধার শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বহিরঙ্গের প্রতি অত্যধিক দৃষ্টিপ্রদান। ইহা অ-ভারতীয় ও গ্রীক বা হেলেনিক শিল্পশৈলীর স্পষ্ট অনুকৃতি। গান্ধার শিল্পে হেলেনিক রীতি অনুসৃত হইয়াছিল বলিয়া ইহা ইন্দো-গ্রীক বা গ্রীকো-রোমান রীতি নামেও পরিচিত। ইহা নিঃসন্দেহ যে গান্ধার-শিল্পরীতি ব্যাকটিয়া ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক রাজন্য-গণের চেষ্টার ফলেই উদ্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু তজ্জন্য এই শিল্পরীতি সম্পূর্ণ বিদেশী বলিয়া মনে করার কোন কারণ নাই।

পারসিক-গ্রীক ও বৌদ্ধ শিল্পরীতির-সংমিশ্রণ

মৌর্য্যোত্তর যুগে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ :—

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের পরে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বৈদেশিক

আক্রমণের ফলে ভারতের ইতিহাসে এক দুর্যোগময় অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছিল। ইহার ফলে একদিক দিয়া যেমন ভারতবর্ষের ক্ষতির কারণ হইয়াছে, অপরদিক দিয়া ইহা ভারতের পক্ষে বিশেষ লাভজনকও হইয়াছে। ভারতবর্ষ আক্রমণকারী গ্রীক, শক পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতির ভারত আগমন ও বসবাসের ফলে ক্রমশঃ বিভিন্ন বিদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় ঘটে। রোমান সাম্রাজ্য ও চীন সাম্রাজ্যের সহিত এই সময়ে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল পারস্পরিক সংযোগসাধনের ফলে যে এক বিরাট সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটিয়াছিল তাহার ফল সমকালীন সাহিত্যে, ধর্মে, দর্শনে এবং শিল্পকলায় পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং সমস্ত দিকেই ভারতীয় মনীষা উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছিল।

সাহিত্যের দিক দিয়া মৌর্যোত্তর যুগে ভারতীয় মনীষা অপূর্ব বিকাশের পরিচয় দিয়াছিল। এই যুগে নাগার্জুন, বসুমিত্র, অশ্বঘোষ, পতঞ্জলি, চরক, গুণাঢ্য প্রভৃতি কয়েকজন মনীষীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। অশ্বঘোষ রচিত বুদ্ধচরিত, সৌন্দরানন্দ ও সারিপুত্র-প্রকরণ, নাগার্জুন রচিত মিলিন্দপঞ্হো ও মাধ্যমিক সূত্র, বসুমিত্র রচিত মহাবিভাষা প্রভৃতি গ্রন্থ এই যুগের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। এই যুগে রচিত চরকের চরক-সংহিতা ও সুশ্রুতের সুশ্রুত-সংহিতা ভারতীয় ভেষজশাস্ত্রের আকর গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। কাত্যায়নের 'বিভাষা' ও পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রের অপূর্ব প্রতিভার নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত। 'রামায়ণ', 'মহাভারত', বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র', কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', যাজ্ঞবল্ক্যের 'যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি', মনুর 'মনু সংহিতা' প্রভৃতি গ্রন্থ এই যুগেই সঙ্কলিত হয়।

সাহিত্য

পশ্চিম পাঞ্জাবে সিন্ধুনদের তীরে অবস্থিত তক্ষশিলা ও কনিষ্কের রাজধানী পুরুষপুর বিদ্যাশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। তক্ষশিলা সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। কেবল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে নহে চীন, গ্রীক, মিশর, ইরাণ, বাহ্লীকদেশ ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু শিক্ষার্থী তক্ষশিলায় জ্ঞানার্জনের জন্য আসিত। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে প্রায় এক সহস্র বৎসর তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়ার অন্যতম প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ছিল।

শিক্ষা

তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতীয় গান্ধার শিল্পে বৈদেশিক প্রভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

গান্ধারের শিল্পিগণ গ্রীক দেবদেবী এপোলো, জিউস, ডায়না প্রভৃতি মূর্তির অনুকরণে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন। তবে স্বাধীন ও সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্পকলার
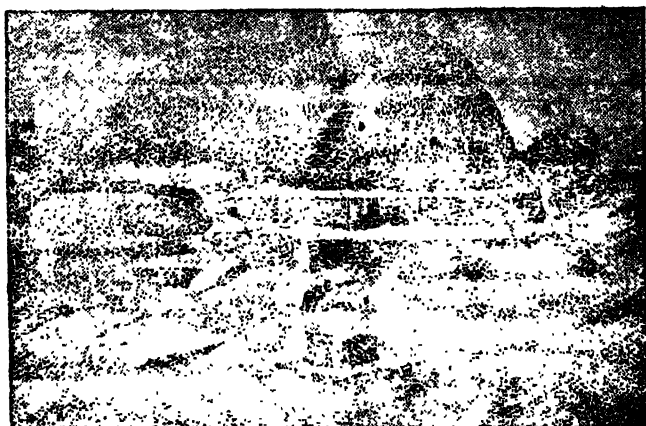
তক্ষশিলার ধ্বংশাবশেষ

পরিচয় পাওয়া যায় এই যুগের অমরাবতী ও মথুরার শিল্পরীতিতে। পেশোয়ারে কুষাণরাজ কনিষ্কের নির্মিত চৈত্য, সাঁচি স্তূপের তোরণদ্বারের অলঙ্কৃত কারুকার্য, কানহেরী, নাসিক, নানাঘাট প্রভৃতি স্থানের গুহাচৈত্য, বরহুত, ভাজা, বুদ্ধগয়ার মঠ প্রভৃতি মৌর্য্যোত্তর যুগের স্থাপত্যও ভাস্কর্য্য শিল্পের আশ্চর্য্য নিদর্শনরূপে আজিও বর্তমান রহিয়াছে।

শিল্প

মৌর্য্যযুগের পরবর্তীকালে বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ভারতের প্রশাসনিক ব্যাপারে গ্রীক বা শক প্রভাব দেখা যায়। শক শাসনকর্তা 'স্যাট্রপ' এর অনুকরণে ভারতের রাজন্যবর্গ ক্ষত্রপ, মহাক্ষত্রপ প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিদেশী প্রভাব

সামাজিক ক্ষেত্রেও বৈদেশিক জাতির আগমনের ফলে যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যায়। শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশীয়গণ ক্রমশঃ ভারতীয় ধর্ম গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের সমাজদেহের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। ইহাদের অন্তর্ভুক্তির ফলে চতুর্বর্ণের পুরাতন বিভাগের স্থলে অসংখ্য উপবিভাগের

সামাজিক পরিবর্তন

সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে জাতিভেদ প্রথার মধ্যে যথেষ্ট শৈথিল্য প্রবেশ করে।

মৌর্য্য যুগের পরবর্তীকালে বহির্জগতের সহিত ভারতের যোগাযোগ পূর্বাপেক্ষা যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়। এই সময়ে মধ্য এসিয়া, সুবর্ণভূমি, সিংহল, চীন ব্যতীত এশিয়ার

বাহিরে ইউরোপের রোম, গ্রীস প্রভৃতি দেশের সঙ্গেও ভারতের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই যোগাযোগের ফলে ক্রমশঃ ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি ভারতের বাহিরে প্রসারিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ার কাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান, তুরফান, কুচি প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্ণিও প্রভৃতি পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সেই যুগে যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহারই অনিবার্য্য পরিণতিরূপে পরবর্ত্তীকালে ঐ সমস্ত স্থানে উল্লেখযোগ্য ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল।

উপনিবেশ বিস্তার

সুদূর অতীতকাল হইতেই মিশর, মধ্য-এশিয়া, রোম, চীন প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক যোগাযোগ চলিয়া আসিতেছিল। এই বাণিজ্যিক যোগাযোগ জলপথ ও স্থলপথ উভয় পথেই পরিচালিত হইত। এই যুগে ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের অন্যতম প্রধান ক্রেতা ছিল রোমান সাম্রাজ্য। ভারতীয় বিলাসদ্রব্য, মূল্যবান প্রস্তর, মুক্তা, সূক্ষ্ম কার্পাস বা রেশম বস্ত্র, সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া ভারতীয় বণিকগণ প্রচুর অর্থ লাভ করিত। খৃষ্টীয় প্রথম

বাণিজ্যিক যোগাযোগ

শতাব্দীর শেষভাগে জনৈক অজ্ঞাতনামা মিশরবাসী গ্রীক কর্তৃক লিখিত 'পেরিপ্লাস অফ্ দি ইরিথ্রিয়ান সী' (ভারত মহাসাগরের পথের বিবরণ) নামক গ্রন্থে ভারতের সহিত পাশ্চাত্য দেশের জলপথ ও বাণিজ্যের বহু চিত্তাকর্ষক বিবরণ পাওয়া যায়। এই গ্রীক লেখক ভারতীয় বন্দর সমূহের মধ্যে ভৃগুকচ্ছ (বারিগাজা), প্রতিষ্ঠান (পৈঠান), কল্যাণ, সোপারা, মসলীপত্তম (মুজিরিস), গঙ্গারিডি (গঙ্গানদীর মোহনা) প্রভৃতি বহু বন্দরের উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয় পণ্যসামগ্রীর বিনিময়ে রোম হইতে প্রধানতঃ স্বর্ণ, রৌপ্য কাচ ও চীনামাটির বাসন প্রভৃতি ভারতবর্ষে আমদানী হইত। ভারতবর্ষ এইভাবে বাণিজ্যদ্বারা রোমান সাম্রাজ্য হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর অর্থ আনয়ন করিত। রোমান সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্য এইভাবে ভারতবর্ষের হস্তগত হইতেছে দেখিয়া রোমান ঐতিহাসিক প্লিনী ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন—'পণ্য বিনিময়ে ভারতবর্ষ প্রতিবৎসর বহু লক্ষ রোমান মুদ্রা অর্জ্জন করে; রোমান মুদ্রা একবার ভারতে প্রবেশ করিলে পুনরায় আর ভারতের বাহিরে যায় না'। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে মিশর হইতে অসংখ্য বাণিজ্যপোত ভারতবর্ষের বন্দর সমূহে আসিত বলিয়া প্রমাণ আছে।

রোমান সাম্রাজ্যের সহিত বাণিজ্য

ভারতের বিভিন্ন বন্দর

চীনদেশের সহিত ভারতবর্ষের সুদীর্ঘকাল যাবৎ বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক চলিয়া আসিতেছিল। কোন্ সময়ে চীন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয় তাহা সঠিক বলা যায় না। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতকে ধর্মরত্ন ও কাশ্যপ মাতঙ্গ নামক দুইজন বৌদ্ধ শ্রমণ চীনদেশে সর্বপ্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। অতঃপর বহু ভারতীয় শ্রমণ চীনদেশে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে গমন করেন। তাহাদের মধ্যে কালরুচি ধর্মরক্ষ, কুমারজীব প্রভৃতি বৌদ্ধ মহাজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে অসংখ্য চৈনিক শ্রমণ, ভিক্ষু ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী মূল ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এবং বুদ্ধদেবের পবিত্র জন্মভূমি পরিদর্শন মানসে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইহাদের মধ্যে ফাহিয়েন, হিউয়েনসাঙ এবং ইৎসিঙের নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসের সহিত বিশেষভাবে জড়িত।

চীনের সঙ্গে সংযোগ

চীনে বৌদ্ধ প্রচারক

ভারতে চৈনিক পরিব্রাজক

চীনদেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সংযোগের কথা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত চীনসী বা চীনাপট্ট হইতে অনুমান করা যায়। পরবর্ত্তীকালে কালিদাসও তাঁহার গ্রন্থে

চীনাংশুকের উল্লেখ করিয়াছেন। চীন হইতে রেশমী বস্ত্রাদি বাহ্লীকের পথে ভারতবর্ষে আসিত। চীনের ইউনান প্রদেশের রাজধানী ইউনান ফু শহর হইতে শানরাজ্য ও ব্রহ্মের মধ্য দিয়া একটি বাণিজ্যপথ ছিল। এই পথের সঙ্গে মগধের রাজধানী পাটলীপুত্রের যোগাযোগ ছিল। তিব্বতের মধ্য দিয়াও আর একটি বাণিজ্যপথ ছিল। জলপথে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক চলিত। সাধারণতঃ ভারতবর্ষ হইতে বস্ত্র, চামর, অভ্র, মূল্যবান প্রস্তর প্রভৃতি চীনদেশে রপ্তানী করা হইত।

চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক

প্রশ্নোত্তর

1. Give briefly the story of the foreign invasions of India after the downfall of the Maurya empire.

উত্তর-সূত্র : (১) ভূমিকা : মৌর্যবংশের চরম উন্নতির সময়ে কোনও বিদেশী জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে সাহস করে নাই। অশোকের পরবর্তী মৌর্য্য বংশধরগণের দুর্বলতার সুযোগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিদেশী জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে স্ব স্ব স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। এই সমস্ত বিদেশী আক্রমণকারীদের মধ্যে ব্যাকট্রিয়া বা বহ্লীক দেশ হইতে আগত বহ্লীক গ্রীকগণ (Bactrian Greeks), পার্থিয়া বা পহ্লব দেশের পহ্লবগণ (Parthians), সিথিয়া বা শকদ্বীপ (Scythia) হইতে আগত শকজাতি (Scythians) এবং সিরদরিয়া ও আমুরদরিয়া অঞ্চল হইতে আগত ইউচি জাতির শাখা কুষাণগণের (Kushans) নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল বৈদেশিক জাতিদের অধিকার সাধারণতঃ ভারতের উত্তর, উত্তরপশ্চিম ও পশ্চিম অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। মৌর্য্য-বংশের পতনের পর হইতে গুপ্তবংশের অভ্যুদয়ের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাজ্য না থাকায় সুদীর্ঘকাল বিদেশী শাসন বর্তমান ছিল।

(২) বহ্লীক গ্রীকনরপতিগণ :—এন্টিয়োকাস, ডিমেট্রিয়স, ইউক্রেটিডিস, মিনান্দার প্রভৃতি।

(৩) পহ্লব রাজগণ :—মিথ্রিডেটিস, মোগ, গণ্ডোফারনিস প্রভৃতি।

(৪) শক ক্ষত্রপগণ :—উত্তর ক্ষত্রপগণ ও পশ্চিম ক্ষত্রপগণ। পশ্চিম ক্ষত্রপদের মধ্যে নহপান, চষ্টান ও রুদ্রদামনের নাম উল্লেখযোগ্য।

(৫) কুষানবংশের নরপতিগণ : প্রথম কদফিস, দ্বিতীয় কদফিস, কনিষ্ক প্রভৃতি।

(৬) বিদেশী অধিকারের ফলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে বিদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বয় ঘটে। এই সমন্বয়ের ফল সমকালীন সাহিত্যে, ধর্মে, দর্শনে এবং শিল্পকলায় পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

2 What do you know about the Kushanas and their greatest king

কুষানবংশ এবং এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

উত্তর-সূত্র : (১) কুষাণগণ (১২১ পৃষ্ঠা)

(২) এই বংশের তৃতীয় এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন কনিষ্ক। তাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। তাঁহার সিংহাসনারোহণের বিভিন্ন তারিখ খৃঃ পূঃ ৫৬, ৭৮, খৃষ্টাব্দ, ২৪৮ খৃষ্টাব্দ ইত্যাদি। বর্ত্তমানে অনেকে মনে করেন ১২০ খৃষ্টাব্দে কনিষ্ক সিংহাসনারোহণ করেন। তাহার রাজধানী ছিল পুরুষপুর অথবা পেশোয়ার।

(ক) কনিষ্কের দিগ্বিজয় ও রাজ্যসীমা : কাশ্মীর জয় করেন : অনেকের মতে পাটলীপুত্র পর্য্যন্ত অভিযান করেন : বোধ হয় সাকেত পর্য্যন্ত অগ্রসর হন : উজ্জয়িনীর পশ্চিম ক্ষত্রপগণ কনিষ্কের আনুগত্য স্বীকার করেন : পার্থিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করেন : চীন সম্রাটের অধীনস্থ খোটান, ইয়ারখন্দ ও কাসগড়ের শাসনকর্ত্তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত করেন। পূর্বে বিহার হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত এবং পামিরের বাহিরে এক সুবিশাল অঞ্চলও তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(খ) কনিষ্কের ধর্ম্ম : প্রথম জীবনে জরথুস্ত্রদেবের ধর্মে বিশ্বাসী : পরে বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগী হন—পরধর্মসহিষ্ণু।

(গ) বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা-চতুর্থ বৌদ্ধসঙ্গীতি আহ্বান।

(ঘ) সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক।

3. What are the cultural effects of the foreign conquests in India during the post-Mauryan period.

মৌর্য্যোত্তর যুগে বৈদেশিক আক্রমণের সাংস্কৃতিক ফলাফল কি?

উত্তর-সূত্র : (১২৮ পৃষ্ঠা)

4. Give an account of the relations of India with Rome and China during the past-Mauryan period.

মৌর্য্যোত্তর যুগে রোম ও চীনদেশের সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগের বিবরণ দাও।

উত্তর সূত্র : (১২৯ পৃষ্ঠা)

5. Write notes on : (a) Menander (b) Gandhara Art (c) Rudradamana.

টীকা লিখ :—(ক) মিনাণ্ডার (খ) গান্ধার শিল্পরীতি (গ) রুদ্রদামন।

উত্তরসূত্র : (ক) মিনাণ্ডার—ভারতীয় বাহ্লীক-গ্রীক নরপতিদের মধ্যে মিনাণ্ডার উল্লেখযোগ্য ছিলেন। বর্তমান শিয়ালকোটে মিনাণ্ডারের রাজধানী ছিল। মিনাণ্ডার শাকল বা শিয়ালকোট হইতে বহির্গত হইয়া ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, সুরাষ্ট্রসহ সমস্ত সিন্ধু-উপত্যকা অধিকার করেন, এবং সম্ভবতঃ সাকেত, পাঞ্চাল মথুরা আক্রমণ করিয়া কুসুমপুর (পাটলীপুত্র) পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। পুষ্যমিত্র মিনান্দারের গতিরোধ করেন। গার্গী-সংহিতায় উল্লিখিত যবন-আক্রমণ ডিমেট্রিয়স অথবা মিনাণ্ডার কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মিনান্দার বিরাট অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মুদ্রা কাবুল হইতে আরম্ভ করিয়া মথুরা পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে। মিনান্দার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া লোকস্মৃতি রহিয়াছে। তিনি বৌদ্ধভিক্ষু নাগসেন কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মিলিন্দপঞহো নামক বিখ্যাত পালিগ্রন্থের সঙ্গে তাঁহার নাম বিজড়িত। উক্ত গ্রন্থে তাঁহার বৌদ্ধধর্মানুরক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

(খ) গান্ধার-শিল্পরীতি (১২০ পৃষ্ঠা)।

(গ) রুদ্রদামন (১১৭ পৃষ্ঠা)।

নবম অধ্যায়

ভারতের গৌরবময় যুগ ঃ গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে ভারত

পাঠ্যসূচী—ভারতের গৌরবময় যুগ : গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তার—সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত ও হূণগণ। বঙ্গদেশে গুপ্তরাজত্ব—ফাহিয়েনের বিবরণ। গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থা—সমাজ ও অর্থনীতি ঃ উপনিবেশিক বিস্তার—গুপ্তযুগের শিল্প ও বাণিজ্য। গুপ্তযুগের ধর্ম, সাহিত্য বিজ্ঞান ও শিল্পকলা। গুপ্তযুগের শেষে ভারতে রাজনৈতিক অধঃপতন।

পুষ্যভূতি বংশ—হর্ষবর্দ্ধন—কনৌজের জন্য দ্বন্দ্ব—বঙ্গদেশের অভ্যুত্থান, রাজা শশাঙ্ক। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর হস্তে হর্ষবর্দ্ধনের পরাজয়। উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস—খারবেল : খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির শিলালিপি। ইতিহাসে কামরূপ বা আসামের আবির্ভাব—নিধানপুর তাম্রলিপি। হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য—হিউয়েন সাঙের বিবরণ—নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়—বাণভট্ট।

গুপ্তবংশের অভ্যুদয়—মৌর্য সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পরে ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা যায় কুষাণ নরপতিদের সুশাসনে তাহা অনেকাংশে দূরীভূত হয়। কুষাণগণ আনুমানিক ২৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার পরে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল গাঙ্গেয় অঞ্চলে কোন শক্তিশালী রাজবংশ বা নরপতির শাসনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে এই সময়ে মধ্য ভারতে বাকাটকগণ ও গণতান্ত্রিক লিচ্ছবীজাতি কিছু সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাকাটক ও লিচ্ছবীদের সাহায্যে শক্তিশালী হইয়া এবং পাটলীপুত্রকে কেন্দ্র করিয়া প্রাচীন ভারত ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুপ্ত রাজবংশ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করে।

গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম শ্রীগুপ্ত। তিনি মহারাজ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীগুপ্তের পুত্র ঘটোৎকচও পিতার ন্যায় মহারাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা মগধের অর্থাৎ দক্ষিণ বিহারের কোন স্থানীয় নরপতি ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। তবে তাঁহারা স্বাধীন নরপতি কিংবা অন্য কোন সম্রাটের অধীন সামন্ত নরপতি ছিলেন কিনা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

গুপ্তবংশের আদি ইতিহাস

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (আনুমানিক ৩২০-৩৩০ খৃঃ)—গুপ্তবংশের সর্বপ্রথম শক্তিশালী রাজার নাম প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। প্রথম চন্দ্রগুপ্তই সর্বপ্রথম মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বাধীন গুপ্ত সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার শক্তিবৃদ্ধির জন্য লিচ্ছবী-বংশীয় রাজকুমারী কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহের ফলে তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার স্বর্ণমুদ্রায় রাজদম্পতির যুগল-মূর্তি দেখা যায়। উপরন্তু মৃত্যুর পূর্বে চন্দ্রগুপ্ত কুমারদেবীর পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে সম্রাট

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা

মনোনীত করিয়া যান। ইহাতে লিচ্ছবী-গুপ্ত বিবাহের গুরুত্ব অনুমান করা যায়। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যসীমা মগধ হইতে প্রয়াগ ও অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার রাজধানী ছিল পাটলীপুত্রে। তাঁহার সিংহাসনারোহণের তারিখ ৩২০ খৃষ্টাব্দ হইতে গুপ্ত সংবৎ নামে এক নূতন অব্দের সূত্রপাত হয়।

সমুদ্রগুপ্ত—(আঃ ৩৩০-৩৭৫ খৃঃ)—পিতার মৃত্যুর পরে পিতার ইচ্ছানুযায়ী সমুদ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। (সমুদ্রগুপ্ত গুপ্তবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন এবং তিনি প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া পরিগণিত। রণপাণ্ডিত্যে, শাসনদক্ষতায়, সঙ্গীতে এবং সাহিত্যপ্রীতিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার সভাকবি হরিষেণ তাঁহার রাজত্বকালের বিবরণ একটি স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত স্তম্ভলিপি এলাহাবাদে আছে। এই 'হরিষেণ প্রশস্তি' সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় ও অন্যান্য কৃতিত্ব সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য উপাদান।

(সিংহাসনে আরোহণ করার পরেই সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং 'একরাট' পদলাভ করা। এই আদর্শে প্রণোদিত হইয়া তিনি আর্যাবর্তের রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্মা,

গনপতিনাগ, নাগসেন, অচ্যুত, নন্দী, বলবর্মা প্রভৃতি রাজাকে পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি মধ্যভারতের আটবিক বা অরণ্য রাজ্যগুলি জয় করিলেন। সমগ্র উত্তরাপথ বিজিত হইলে সমুদ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্য জয় করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। দক্ষিণ কোশলের রাজা মহেন্দ্র, মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ, কৌরল দেশের অধিপতি মণ্টরাজ, কোট্টুররাজ, স্বামিদত্ত, পিষ্টপুররাজ মহেন্দ্রগিরি, এরণ্ডপল্লরাজ দমন কাঞ্চীনবপতি বিষ্ণুগোপ, পলকরাজ উগ্রসেন দেবরাষ্ট্রের অধিপতি কুবের, বেঙ্গীরাজ হস্তিবর্মা এবং কুস্থলপুররাজ ধনঞ্জয় প্রভৃতি বহু নরপতি সমুদ্রগুপ্তের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন আর্য্যাবর্ত্তের নরপতিগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া সমুদ্রগুপ্ত তাহাদের রাজ্য স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন কিন্তু দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি সম্বন্ধে তিনি অন্য নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে তাঁহাদিগকে স্ব স্ব রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। সুদূর পাটলীপুত্র হইতে দাক্ষিণাত্যে প্রত্যক্ষভাবে শাসনব্যবস্থা কার্য্যকরী করা অসুবিধাজনক মনে করিয়া সম্ভবতঃ তিনি বিজিত নরপতিগণের সম্বন্ধে এই উদারনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।)

আর্য্যাবর্ত্ত বিজয়

আটবিক রাজ্য বিজয়

দাক্ষিণাত্য অভিযান

(সমুদ্রগুপ্তের পরাক্রমে ভীত হইয়া ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সমতট (পূর্ববঙ্গের একাংশ) কামরূপ বা আসাম, ডাবক (সম্ভবতঃ ঢাকা), উত্তরে নেপাল এবং দক্ষিণে ও দক্ষিণপশ্চিমে মালব, অর্জ্জুন, যৌধেয়, কাক, মদ্রক, আভীর, প্রার্জ্জুন, সনকানিক এবং খারপারিক প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশ বা জাতিবর্গ সমুদ্রগুপ্তকে করপ্রদানে স্বীকৃত হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। এতদ্ব্যতীত উত্তর-পশ্চিমের শক, কুষাণ নরপতিগণ এবং সিংহলের রাজা বিভিন্ন উপঢৌকন প্রদানের দ্বারা সমুদ্রগুপ্তের প্রতাপ স্বীকার করিয়াছিলেন। সিংহলরাজ মেঘবর্ণ সমুদ্রগুপ্তের অনুমতি লইয়া বুদ্ধগয়ায় একটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম নির্মাণ করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন করদরাজ্য

প্রতিবেশী রাজ্যগুলির আনুগত্য

(দিগ্বিজয়ের ফলে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদী হইতে পূর্বে বঙ্গদেশ এবং উত্তরে নেপালের প্রান্ত হইতে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। দিগ্বিজয় সমাপ্ত হইলে ক্ষমতার নিদর্শন স্বরূপ সমুদ্রগুপ্ত একাধিক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং 'অশ্বমেধ-পরাক্রম' উপাধি গ্রহণ করেন। এই যজ্ঞের স্মারকরূপে তিনি সুবর্ণমুদ্রা প্রচলিত করেন। সেই সুবর্ণমুদ্রায় অশ্বমূর্তি অঙ্কিত আছে।

রাজ্যসীমা: অশ্বমেধ যজ্ঞ

সমুদ্রগুপ্তের সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল। তিনি একাধারে বীর, যোদ্ধা, সুকবি, সঙ্গীতজ্ঞ, বিদ্যোৎসাহী এবং উদার ধর্মমতাবলম্বী ছিলেন। মাত্র সামরিক অভিযান ও

সমুদ্রগুপ্তের একটি মুদ্রা (বীণাবাদনরত মূর্তি)

রাজ্যজয়ের মধ্যেই তাঁহার কর্মকৃতি সীমাবদ্ধ ছিলনা। তিনি যে একজন সুকবি ছিলেন তাঁহার 'কবিরাজ' উপাধি ইহার নিদর্শন। সমুদ্রগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রায় ক্ষোদিত তাঁহার বীণাবাদনরত মূর্তি তাঁহার সঙ্গীত-প্রীতি প্রমাণ করে। সমুদ্রগুপ্ত বিদ্যোৎসাহীও ছিলেন। খ্যাতনামা বৌদ্ধলেখক বসুবন্ধু ও সভাকবি হরিষেণের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। পরের ধর্মসম্বন্ধে তিনি যে যথেষ্ট উদার ছিলেন সিংহলরাজ মেঘবর্ণকে বুদ্ধগয়ায় বৌদ্ধবিহার নির্মাণের অনুমতিদানে তাহা প্রমাণিত হয়।

সমুদ্রগুপ্তের সর্বতোমুখী প্রতিভা

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (আঃ ৩৭৫—৪১৫ খৃঃ) - সমুদ্রগুপ্তের পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন; কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক বিতাড়িত হন বলিয়া এক লোকস্মৃতি প্রচলিত আছে। কিন্তু এই কিংবদন্তী সঠিক নহে বলিয়া অনেকে মনে করেন। তাহারা বলেন সমুদ্রগুপ্ত স্বয়ং মহিষী দত্তাদেবীর পুত্র চন্দ্রগুপ্তকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী এবং অশেষ গুণসম্পন্ন নরপতি ছিলেন। বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত স্বীয় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি কুবেরনাগা নাম্নী এক নাগবংশীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন এবং বাকাটক বংশের নরপতি দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে স্বীয় কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ দেন। শেষোক্ত বিবাহ-সম্বন্ধের দ্বারা সম্ভবতঃ তিনি পশ্চিম-ভারতের শক-ক্ষত্রপদের বিরুদ্ধে স্বীয় প্রতিপত্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বৈবাহিক সম্পর্ক

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, গুজরাট, সুরাষ্ট্র এবং উজ্জয়িনীর শকক্ষত্রপ রাজগণকে পরাজিত করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমা আরব সাগরের তীরপর্য্যন্ত প্রসারিত করেন। শকবিজয়ের দ্বারা তিনি 'শকারি' নামে পরিচিত হন। শকদের পরাজিত করার ফলে পশ্চিম-ভারতের বরোচ ও সোপারা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বন্দর সমূহ গুপ্তসাম্রাজ্যের অধীনে আনীত হয়। ইহাতে পশ্চিম উপকূলস্থ বন্দরগুলির মাধ্যমে পাশ্চাত্য দেশ সমূহের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইল। অন্যদিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যোগাযোগের দ্বারা গুপ্তযুগের মানসিক সমৃদ্ধি ঘটিল।

শকক্ষত্রপদের পরাজিত করেন

ফলাফল

চন্দ্রগুপ্ত উজ্জয়িনীতে গুপ্তসাম্রাজ্যের এক দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কালিদাস, বরাহমিহির, বররুচি, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, ধন্বন্তরী, অমরসিংহ, ক্ষপণক এবং শঙ্কু নামে নয়জন মনীষী তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। যদি কিংবদন্তীখ্যাত নবরত্ন সভার পৃষ্ঠপোষক উজ্জয়িনীর শকারি বিক্রমাদিত্য ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অভিন্ন হন তাহা হইলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যে একজন বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বিদ্যোৎসাহী

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যেমন বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন তদ্রূপ রাজ্যশাসনেও পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ফাহিয়েন নামক চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণ হইতে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে দেশের সুখ-সমৃদ্ধি, উন্নত যাতায়াতের ব্যবস্থা ও সুশাসনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

সুশাসক নরপতি

ফাহিয়েনের বিবরণ :—ফাহিয়েন নামে একজন চীন-পরিব্রাজক বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ বিনয়-পিটকের প্রামাণ্য পুস্তকের অনুসন্ধানে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ফাহিয়েন ৪০১ হইতে ৪১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অবস্থান করেন এই দশ বৎসরের মধ্যে তিনি ছয় বৎসর কালই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি তৎকালীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার সাহায্যে সমসাময়িক ভারতবর্ষের সামাজিক চিত্র, শাসনপদ্ধতি ও ধর্মব্যবস্থা সম্বন্ধে বহু তথ্য অবগত হওয়া যায়।

ফাহিয়েন গুপ্ত সম্রাটদের শাসনের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। দেশের সর্বত্র শান্তিশৃঙ্খলা বিরাজিত ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যে দস্যুতা তস্করতা প্রভৃতি এক প্রকার ছিল না বলিলেই হয়। দণ্ডবিধির কঠোরতা মোটেই ছিল না। অর্থদণ্ডই অপরাধের

সাধারণ শান্তি ছিল—বিদ্রোহ বা দস্যুতার জন্য অগ্নচ্ছেদ হইত। সকলেরই দেশের সর্বত্র অবাধ প্রবেশ ও নির্গমনের অধিকার ছিল। ধর্ম সম্বন্ধে রাজারা পরমতসহিষ্ণু ছিলেন। আতুরাশ্রম বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে রাজকোষ হইতে উদারভাবে সাহায্য করা হইত।

উদার শাসন পদ্ধতি : শান্তি ও শৃঙ্খলা

পাটলীপুত্র সমৃদ্ধশালী নগর ছিল। ফাহিয়েন অশোকের সময়ে নির্মিত পাটলীপুত্রের রাজপ্রাসাদের গঠন নৈপুণ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। পাটলীপুত্র ব্যতীত নালন্দও সমৃদ্ধশালী নগর ছিল। কিন্তু গয়া, শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, কুশীনগর প্রভৃতি বৌদ্ধতীর্থস্থান সমূহ একেবারে জনহীন অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল।

নগর সমূহ

তৎকালে ভারতবর্ষে অসংখ্য বৌদ্ধমঠ ছিল। পাটলীপুত্র ও তাম্রলিপ্ত বিদ্যাচর্চার স্থান বলিয়া খ্যাত ছিল। দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা উন্নত ছিল এবং লোকে সুখে ও শান্তিতে কাল কাটাইত। অহিংসার উপর জনসাধারণের বিশেষ আস্থা ছিল। লোকে সাধারণতঃ মাংস ও মদ্যপান পছন্দ করিত না। সমাজে জাতিভেদ প্রথা অত্যন্ত কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল। চণ্ডালেরা অপবিত্র জীবন যাপন করিত বলিয়া তাহাদিগকে নগরের বাহিরে বাস করিতে হইত

জনসাধারণের অবস্থা

ফসলের এক ষষ্ঠাংশ রাজস্বরূপে গ্রহণ করা হইত। রাজকর্মচারীদের বেতন নির্দিষ্ট ও নিয়মিত ছিল। তাহাদের কর্তব্যপরায়ণতা ও শাসনদক্ষতা দেখিয়া ফাহিয়েন অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। দেশের মধ্যে যোগাযোগের সুব্যবস্থা ছিল। দেশের বিভিন্ন অংশ রাজপথদ্বারা সংযুক্ত ছিল। রাজপথের পার্শ্বে পান্থশালা প্রভৃতিও স্থাপিত ছিল।

রাজস্ব ও যাতায়াতের ব্যবস্থা

রুগ্ন ও দুঃস্থের জন্য চিকিৎসালয় ও আতুরাশ্রমের ব্যবস্থা ছিল। রাজধানী পাটলীপুত্রে মহাযান ও হীনযান সম্প্রদানের দুইটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। দেশবিদেশ হইতে শিক্ষার্থীরা আসিয়া সেখানে সমবেত হইত।

বৌদ্ধবিহার

প্রথম কুমারগুপ্ত (৪১৫—৪৫৫ খৃঃ) :—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 'মহেন্দ্রাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। পিতামহ সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় তিনিও অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আয়তন ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁহার রাজত্বকালের

শেষভাগেই সম্ভবতঃ পুষ্যমিত্র নামে এক বর্বর জাতি গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল।

স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫—৪৬৭ খৃঃ) ঃ—কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র স্কন্দগুপ্ত রাজা হন। তিনি পুষ্যমিত্র জাতিকে পরাজিত করিয়া সাময়িক ভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেন। পুষ্যমিত্র ব্যতীত হূণ নামে এক বৈদেশিক জাতি তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। স্কন্দগুপ্ত হূণগণের আক্রমণ হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনিই গুপ্ত বংশের শেষ শক্তিশালী সম্রাট।' তাঁহার মৃত্যুর পরেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়।

পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটগণ ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঃ—স্কন্দগুপ্তই গুপ্তবংশের শেষ উল্লেখযোগ্য নরপতি। তাঁহার মৃত্যুর পরে পুরগুপ্ত, নরসিংহগুপ্ত ও দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত মাত্র দশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন।' ইহার পরে কুমারগুপ্তের পৌত্র ও পুরগুপ্তের পুত্র বুধগুপ্ত বঙ্গদেশ হইতে পূর্ব মালব পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের পরে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত গুপ্ত নামধারী বহু নরপতি বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করেন। কিন্তু গুপ্তবংশের পূর্ব প্রভাব প্রতিপত্তি বহু পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে হূণদের আক্রমণের ফলেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রথম বিপর্য্যয় দেখা দেয়। পরবর্তী কালে দুর্বল গুপ্ত নরপতিদের রাজত্বকালে হূণরা তোরামানের নেতৃত্বে পুনরায় গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে এবং গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। ক্রমে গুপ্ত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হইয়া গেলে মালব, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও উত্তর বঙ্গে বহু ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয় এবং গুপ্ত নামধারী নরপতিরা স্বাধীন ভাবে এই সকল স্থানে শাসন করিতে থাকে। ইহারা ইতিহাসের 'পরবর্তী গুপ্ত' নামে পরিচিত।

গুপ্তযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঃ—গুপ্তবংশের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের প্রতিভা নানা দিক দিয়া বিকশিত হইয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল। এই মানস-সমৃদ্ধির জন্য গুপ্তযুগকে ইতিহাসে 'সুবর্ণ যুগ' বলিয়া অভিহিত করা হয়। গুপ্তযুগকে অনেকে 'হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের' যুগ বলিয়া মনে করেন। কেননা, এই সময়ে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ সমূহ, হিন্দু শিল্প ও চিত্রকলার উন্নতির চরম বিকাশ ঘটিয়াছিল।

গুপ্তযুগের এই মানসিক উৎকর্ষের পশ্চাতে যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। 'গুপ্ত সম্রাটগণ স্বয়ং জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পকলার অনুরাগী ছিলেন বলিয়া বিদ্যাবত্তা ও শিল্পকলার যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। উপরন্তু মৌর্য্য ও মৌর্য্যোত্তর যুগে ভারতের সঙ্গে বিদেশের

যে ঘনিষ্ঠ সংযোগের সূত্রপাত হয় তাহা গুপ্ত যুগে আরও ঘনিষ্ঠতর হইতে থাকে। এই (বহির্ভারতের সহিত ভাবসংযোগ ভারতের মানসিক উৎকর্ষে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিল) (ইহার সঙ্গে গুপ্ত-শাসনের সুব্যবস্থা দেশের অভ্যন্তরে আর্থিক ও রাজনৈতিক শান্তি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে যে সাহায্য করিয়াছিল পরোক্ষতঃ তাহাও গুপ্তযুগের মানসিক উৎকর্ষের অন্যতম কারণ) এতদ্ব্যতীত কয়েকজন শক্তিশালী গুপ্ত সম্রাটের শাসনাধিকারের জন্য দেশে কোন রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে নাই এবং দেড় শতাধিক বৎসরকাল সুশাসনের ছত্রছায়াতলে প্রজাবর্গ সুখে শান্তিতে বাস করিতে সক্ষম হইয়াছিল। (রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল বলিয়াই সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই ভারতীয় মনীষার বিকাশ সম্ভবপর হইয়াছিল)

মানসিক উৎকর্ষের কারণ

বহির্ভারতের সহিত সংযোগ

(গুপ্তযুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছিল। গুপ্ত সম্রাটগণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় অমর কবি কালিদাস, মৃচ্ছকটিক রচয়িতা শূদ্রক, অর্দ্ধ-ঐতিহাসিক নাটক 'মুদ্রারাক্ষস' রচয়িতা বিশাখদত্ত, সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণ প্রভৃতি মনীষীগণের আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়াছিল) এতদ্ব্যতীত পুরাণ ও স্মৃতি-সাহিত্যও এই যুগে রচিত ও সঙ্কলিত হয়। জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ এই যুগেই বিখ্যাত আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্তের দ্বারা রচিত হয়। (গুপ্তযুগে চিকিৎসাশাস্ত্রেরও উৎকর্ষ সম্ভবপর হইয়াছিল) শল্যচিকিৎসায় গুপ্তযুগের চিকিৎসকরা যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে ভারতীয় ভেষজবিদ্যা ভারতের বাহিরে বহুদেশে প্রচারিত হইয়াছিল।

সাহিত্য

(গুপ্ত নরপতিগণ হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া হিন্দুধর্মের উন্নতিমূলক কার্য্যাবলীর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। গুপ্ত সম্রাটগণ 'পরমভাগবত' অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। গুপ্তযুগেই পুরাণসমূহ রচিত হয় এবং রামায়ণ মহাভারত ও স্মৃতিগ্রন্থসমূহ সঙ্কলিত হইয়া হিন্দুধর্মের মহিমা প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করে।) গুপ্তসম্রাটগণ হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিলেও দেশে বৌদ্ধ, জৈন ও অপরাপর সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের অভাব ছিল না। গুপ্ত সম্রাটগণ পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণু থাকিয়া ধর্মমত সম্বন্ধে তাঁহাদের উদার মনেরই পরিচয় দিয়াছেন। গুপ্তযুগে বিষ্ণু, শিব ও বুদ্ধ এই তিন দেবতারই উপাসনার প্রচলন ছিল।

ধর্ম

(গুপ্তযুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার প্রভূত উন্নতি ঘটিয়াছিল। মূর্ত্তি ও গৃহ-মন্দিরাদি নির্মাণে, চিত্র প্রভৃতি সুকুমার শিল্পের উৎকর্ষে গুপ্তযুগ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়) মাত্র ভাবাদর্শের দিক হইতে নহে কারুকার্য্য, অলঙ্করণ ও নির্মাণ-কৌশলের দিক দিয়াও গুপ্তযুগ ভবিষ্যতের শিল্পকলার পথ-প্রদর্শক হইয়া আছে। (এই যুগের প্রস্তর ও ব্রোঞ্জ নির্মিত বহু হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি মূর্ত্তিশিল্পের অত্যাশ্চর্য্য নিদর্শন)
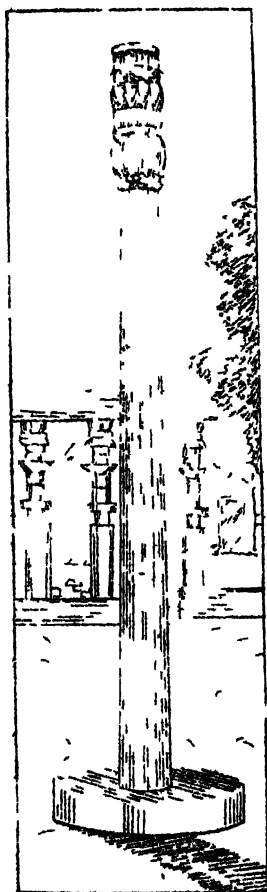
স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, ধাতুশিল্প ও চিত্রকলা

দিল্লীর লৌহ স্তম্ভ

(ধাতুঢালাই শিল্পেরও অত্যাশ্চর্য্য উন্নতি গুপ্তযুগে হইয়াছিল। এই সময়ে নির্মিত দিল্লীর লৌহস্তম্ভ ধাতুশিল্পের চরম নিদর্শন।) চিত্রশিল্পও গুপ্তযুগে বিকাশের চরম শিখরে উন্নীত হইয়াছিল। অজন্তাগুহার প্রাচীর চিত্রাবলী অদ্যাপি সভ্য জগতের বিস্ময় উৎপাদন করে। রঙে, রেখায়, সুসামঞ্জস্যে ও ভাব সুষমায় এই সকল চিত্র অনবদ্য। গুপ্তযুগের স্থাপত্যশিল্প অপরাপর শিল্পকলার তুলনায় হীনপ্রভ হইলেও গঠনরীতির দিক দিয়া উন্নত ধরণের ছিল। ভিটারগাওতে গুপ্ত-যুগের ইষ্টকনির্মিত যে মন্দির রহিয়াছে তাহাতে এই নির্মাণ কৌশল দৃষ্ট হয়। (গুপ্তযুগের সুবর্ণমুদ্রা সমূহ এই যুগের শিল্প প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে।

অজন্তার ভাব-সুষমাময় মাতৃমূর্ত্তি

গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থা :—গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থার অনেক তথ্য গুপ্তরাজগণের দ্বারা উৎকীর্ণ বিভিন্ন শিলালিপি, ফাহিয়েনের বিবরণ প্রভৃতির সাহায্যে জানা যায়।

গুপ্তযুগের সম্রাটগণ দৈবসম্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইতেন। শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ-ক্ষমতাধারী ছিলেন স্বয়ং নরপতি। মৌর্য্যরাজাদের ন্যায় গুপ্তরাজগণও স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করিতেন এবং নিজেরাই বিচারকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। সিংহাসনের উত্তরাধিকার বংশানুক্রমিক ছিল।

রাজা

শাসনব্যবস্থায় নরপতিকে সাহায্য করার জন্য অসংখ্য রাজকর্মচারী ছিল। ইহাদের মধ্যে 'মন্ত্রী', 'সন্ধিবিগ্রাহিক' ও 'অক্ষপটলাধিকৃতে'র পদ উল্লেখযোগ্য। সামরিক কার্য্য নির্বাহের জন্য 'মহাবলাধিকৃত' ও 'মহাদণ্ডনায়ক' নামে উচ্চপদস্থ কর্মচারী থাকিতেন।

উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ

(শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য সাম্রাজ্য 'দেশ' বা 'ভুক্তি' নামধেয় কয়েকটি প্রদেশে এবং প্রদেশ 'বিষয়' নামধেয় কয়েকটি জিলায় বিভক্ত ছিল। দেশ 'গোপ্তৃ' নামধেয় এবং ভুক্তি সমূহ সাধারণতঃ 'উপরিক' বা 'উপরিক-মহারাজ' নামে কর্মচারীর দ্বারা শাসিত হইত। বিষয়ের শাসনকর্তার উপাধি ছিল বিষয়পতি। বিষয়পতিগণ সাধারণতঃ রাজকুমার বা রাজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত থাকিতেন।)

প্রদেশ :—
'দেশ' ও 'ভুক্তি'

গোপ্তৃ এবং উপরিকগণ দাণ্ডিক, চৌরোদ্ধরণিক, দণ্ডপাশিক, নগরশ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, প্রথমকুলিক, প্রথম-কায়স্থ ও পুস্তপালি প্রভৃতি কর্মচারীদের দ্বারা শাসিত হইত।

অন্যান্য
রাজপুরুষ

(জমি হইতে উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ, শুল্ক, খেয়া, সম্রাটদের খাস জমি, খনি এবং সামন্তরাজগণের দেয় কর হইতে রাজকোষে প্রচুর অর্থাগম হইত।)

সরকারী আয়

(স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অস্তিত্ব গুপ্তযুগে বর্তমান ছিল। গুপ্তযুগের 'নিগম-সভা' মেগাস্থিনিস-বর্ণিত পাটলীপুত্রের পৌরপ্রতিষ্ঠানের সমশ্রেণীয় ছিল। নিগম অর্থে নগরকে বুঝাইত বলিয়া মনে হয়। এই নিগম-সভা শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, কুলিক, পুস্তপাল প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হইত। গ্রামের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্তৃত্ব করিতেন। ইহারা গ্রামভুজ, গ্রামমহোত্তর বা গ্রামপুট নামে পরিচিত ছিলেন।)

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন

(গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থার দক্ষতার মূলে ছিল গুপ্ত নরপতিগণের প্রজাদের মঙ্গলসাধনের কামনা। তাঁহাদের এই কামনা সফল করার জন্য রাজপুরুষগণও আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিতেন। প্রজাপীড়ন এই যুগে মোটেই ছিল না। রাজদণ্ডের কঠোরতা উঠিয়া গিয়াছিল এবং প্রাণদণ্ড মোটেই হইত না।)

উন্নত শাসনব্যবস্থা

মৌর্য্যযুগের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে গুপ্তযুগের শাসনপদ্ধতির যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। (গুপ্তযুগের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণ 'অন্বয়প্রাপ্তসাচিব্য' অর্থাৎ উত্তরাধিকারস্বত্বে নিযুক্ত হইতেন) কিন্তু মৌর্য্যযুগের এই সমস্ত পদ ব্যক্তিগত ছিল। ইহা ছাড়া আরও একটু পার্থক্য ছিল। মৌর্য্যযুগের মত গুপ্তযুগেও রাজকুমারগণ বিভিন্ন প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইতেন। (তবে মৌর্য্যযুগে তাঁহারা গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ শাসন করিত, পক্ষান্তরে গুপ্তযুগে অপ্রধান প্রদেশসমূহের শাসনভার তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত হইত।

মৌর্য্যযুগের সঙ্গে পার্থক্য

বঙ্গদেশে গুপ্তশাসন:—গুপ্তসম্রাটদের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের একটা বৃহৎ অঞ্চল গুপ্তশাসনাধীনে ছিল বলিয়া যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। গুপ্তদের শাসনলিপিতে সমতট (দক্ষিণপূর্ববঙ্গ), পুণ্ড্রবর্দ্ধন (উত্তরবঙ্গ বা বরেন্দ্রী), বর্দ্ধমানভুক্তি ইত্যাদি বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়। সমগ্র বঙ্গদেশের একটিমাত্র নাম তখন পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই। দামোদর তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে ৫৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দেও গুপ্তবংশীয় রাজগণ উত্তরবঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে উত্তরবঙ্গ ভানুগুপ্ত নামে এক গুপ্তবংশীয় রাজার শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহাসেনগুপ্ত নামে অপর এক গুপ্তবংশীয় নরপতি ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তরবঙ্গকে স্বীয় শাসনাধীনে রাখিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইনি কামরূপের রাজা সুস্থিতবর্ম্মণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশের কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্কের নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ শশাঙ্কের অপর এক নাম ছিল নরেন্দ্রগুপ্ত। পরবর্ত্তী গুপ্তবংশের সঙ্গে শশাঙ্কের কোন সম্পর্ক ছিল কিনা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। অনেকে অনুমান করেন শশাঙ্ক প্রথম জীবনে মহাসেনগুপ্তের অধীনে রাজকর্মচারী ছিলেন।

গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পরে উত্তর ভারতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা:—

পরবর্ত্তী গুপ্তসম্রাটদের দুর্বলতা এবং পুষ্যমিত্র ও হূণজাতির আক্রমণের ফলে গুপ্তসাম্রাজ্য দ্রুত অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইল। গুপ্তসাম্রাজ্যের এই দুরবস্থার সুযোগে বঙ্গদেশ, কনৌজ, মালব, সুরাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলের সামন্ত নরপতিগণ স্বাধীনতা

ঘোষণা করিল। গুপ্তবংশীয় নরপতিগণ অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে রাজত্ব করিলেও গুপ্তবংশের পূর্ব গৌরবময় যুগ আর ফিরিয়া আসিল না। উত্তর ভারতের এই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যেও ভারতীয় নরপতিবর্গ হূণদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনের জন্য তাঁহাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতারও অভাব ছিল না। রাজনৈতিক প্রাধান্যকামী নরপতিদের মধ্যে মান্দাসোরের যশোবর্মণ, গৌড়রাজ শশাঙ্ক, কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণ, কনৌজের মৌখরীবংশের নরপতিগণ, থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশীয় রাজগণ, গুজরাটে বলভীর মৈত্রেকগণ এবং কলিঙ্গের চেতবংশীয়গণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমকালে দাক্ষিণাত্যের চালুক্যবংশ এবং সুদূর দক্ষিণে পল্লবগণ রাজত্ব করিতেছিলেন।

উপনিবেশ স্থাপন :—মৌর্যোত্তর যুগে ভারতবর্ষ হইতে দুঃসাহসিক অভিযাত্রী দল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভূখণ্ডের বহুস্থানে বিভিন্ন সময়ে বিস্তৃত উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সুবর্ণভূমির সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সংযোগের কাহিনী জাতক বা কথা-সরিৎসাগর প্রভৃতি আখ্যায়িকা হইতে জানা যায়। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত মালয় উপদ্বীপ, কম্বোডিয়া, আনাম, সুমাত্রা, জাভা, বলি, বোর্ণিও প্রভৃতি পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় উপনিবেশিকগণ এই সকল স্থানে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করে এবং এই সকল অঞ্চলের সর্বাংশে ভারতীয়করণ ক্রমশঃ সম্পূর্ণ হয়। প্রায় সহস্র বৎসরকাল ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এই অঞ্চলের জাতিমানসের একমাত্র অবলম্বন ছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় উপনিবেশ সমূহের মধ্যে সমধিক খ্যাতিসম্পন্ন ছিল কম্বোজ। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ভারতীয় ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। জনশ্রুতি এই যে কৌণ্ডিন্য নামে একজন ভারতীয় রাজকুমার কম্বোজের রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে। চীনাভাষায় কম্বোজের নাম ছিল কু-নান। ক্রমশঃ কম্বোজরাষ্ট্র অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠে এবং ইহার অধীনে কোচিন-চীন, লাওস, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ এবং মালয় উপদ্বীপের অংশবিশেষকে আনয়ন করে। কেবল সাম্রাজ্যের আয়তনের দিক দিয়া নহে, স্থাপত্যশিল্পের অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টিকার্য্যের জন্যও কম্বোজরাষ্ট্র ইতিহাসে বিখ্যাত।

কম্বোজ

কম্বোজ রাজ্যের রাজধানী অঙ্কোরথাম একটি সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্য্যশালী নগর ছিল। অঙ্কোরথামের সন্নিকটে কম্বোজের নরপতি দ্বিতীয় সূর্য্যবর্ম্মণ অঙ্কোরভট-এর সুবৃহৎ মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দির ভারতবর্ষের বাহিরে হিন্দুশিল্পের এক অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি। রাজধানী অঙ্কোরথামের কেন্দ্রস্থলে

অঙ্কোরভট

অবস্থিত বায়ন-মন্দিরটিও শিল্প ও স্থাপত্যের অপূর্ব কীর্তি ছিল। এই মন্দিরটি পিরামিডাকৃতি ছিল। তিনটি স্তর অতিক্রম করিয়া মূল মন্দিরে পৌঁছিতে হইত।

বায়ন মন্দির

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অপর একটি উল্লেখযোগ্য ভারতীয় উপনিবেশ ছিল 'চম্পা'। অনেকে অনুমান করেন, মগধের চম্পা (বর্তমান ভাগলপুর) নগর হইতে অভিযাত্রীদল যাইয়া চম্পা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। চম্পার হিন্দু নরপতিগণ বিশেষ পরাক্রান্ত ছিলেন। প্রায় সহস্র বৎসরের অধিককাল চম্পারাজ্য স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। চম্পারাজ্য ভারতের বাহিরে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির এক শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল।

চম্পা

বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া নামে পরিচিত সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলি, বোর্ণিও প্রভৃতি যে দ্বীপ সমূহের সমষ্টি রহিয়াছে সেই সমস্ত স্থানই ভারতীয় উপনিবেশ ও হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত ও ভারতীয় শৈলেন্দ্রবংশ শাসিত এই অঞ্চল যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। শৈলেন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের উপাধি ছিল মহারাজ। শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের শক্তিশালী নৌ-বাহিনী ছিল। এই নৌ-শক্তির সাহায্যে শৈলেন্দ্র নৃপতিগণ চম্পা ও কম্বোজরাষ্ট্রে অভিযান করিতেন। ইহাদের ঐশ্বর্য্যের কাহিনী প্রবাদবাক্যের মত প্রচলিত আছে। কথিত আছে শৈলেন্দ্র নরপতিদের দৈনিক রাজস্ব ছিল দুই শত মণ স্বর্ণ। শৈলেন্দ্র নরপতিদের সঙ্গে ভারত ও চীনদেশের মৈত্রীসম্পর্ক বর্তমান ছিল। ইহাদের রাজত্বকালে যবদ্বীপের বিখ্যাত বরবদুরের চৈত্য ও প্রাম্বানামের তিনটি বিরাট মন্দির নির্মিত হয়।

শৈলেন্দ্র রাজা

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরবর্তীকালের বিভিন্ন রাজ্য :—গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পরে আর্য্যাবর্তের ইতিহাসে কোন প্রবল কেন্দ্রীয় শক্তি গড়িয়া উঠে নাই। হর্ষবর্দ্ধনের অভ্যুদয়ের পূর্বে প্রায় এক শতাব্দীকাল উত্তর ভারতে অরাজকতা বিরাজ করিয়াছিল। এই অরাজকতার মূলে ছিল হূণদের উপদ্রব। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর ইতিহাস প্রধানতঃ হূণ আক্রমণকারীদের সহিত ভারতীয় রাজগণের সংঘর্ষের ইতিহাস। বাস্তবপক্ষে এই শতাব্দীর শেষভাগে যাহারা ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রাধান্য অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহারা হূণশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াই খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কনৌজের মৌখরী বংশ ও থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশই উল্লেখযোগ্য। এই দুইটি বংশ ব্যতীত বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা কাশ্মীর, কামরূপ, বলভী, প্রভৃতি দেশ এবং মান্দাসোরের

যশোধর্মণ এবং মধ্যভারতের বাকাটক বংশ গুপ্তোত্তর যুগে উত্তর ভারতে নানা দিক দিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল।

বঙ্গদেশ :—গুপ্তবংশের পতনের পরে ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগে বঙ্গদেশের অংশ বিশেষ লইয়া গৌড় নামে একটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। গুপ্তযুগে বঙ্গ, সমতট পুণ্ড্রবর্দ্ধন,ভুক্তি, ইত্যাদি বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নাম পাওয়া যায় কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশের মাত্র একটি নাম কোন সময়েই পাওয়া যায় না। ষষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের ইতিহাসে গোপচন্দ্র ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব (৫২৫—৫৭৫ খৃঃ) নামক তিনজন স্বাধীন নরপতির নাম পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের কি সম্পর্ক ছিল তাহা অদ্যাপি জানা যায় নাই।

সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক নামে একজন স্বাধীন নরপতি গৌড়ে রাজত্ব করিতেন। শশাঙ্ক প্রথমে গুপ্তবংশের নরপতি মহাসেনগুপ্তের অধীনে একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। ৬০৬ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণের স্বাধীন নরপতিরূপে শশাঙ্কের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শশাঙ্ক

শশাঙ্ক পুষ্যভূতি বংশীয় সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের অন্যতম শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি গৌড়কে একটি বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত করার কল্পনা করিয়াছিলেন। কনৌজের মৌখরী বংশ তাঁহার লক্ষ্যসাধনের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়াতে তিনি মালবের নরপতি দেবগুপ্তকে স্বীয় পক্ষভুক্ত করেন। দেবগুপ্ত শশাঙ্কের সাহায্যে মৌখরীরাজ গ্রহবর্মণকে পরাজিত ও নিহত করিয়া গ্রহবর্মণের মহিষী রাজ্যশ্রীকে কনৌজে বন্দী করেন। রাজ্যশ্রীর ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন দেবগুপ্তকে পরাজিত করেন কিন্তু রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করার পূর্বেই শশাঙ্কের কূট চক্রান্তে তিনি নিহত হন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যাকারী শশাঙ্ককে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে হর্ষবর্দ্ধন কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। ভাস্করবর্মণ কিছুকালের জন্য শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অধিকার করিলেও তিনি শশাঙ্ককে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। ভাস্করবর্মণ ও হর্ষবর্দ্ধনের সম্মিলিত শত্রুতা সত্ত্বেও মৃত্যুর পূর্ব অর্থাৎ ৬৩৭—৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শশাঙ্ক সমগ্র গৌড়, মগধ, বুদ্ধগয়া অঞ্চল এবং উৎকলের অধিপতি ছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। শশাঙ্ক ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী ছিলেন। হিউয়েন সাঙ্ বলেন, শশাঙ্ক বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ কাটিয়া ফেলেন এবং বুদ্ধমূর্তি স্থানান্তরিত করেন। শশাঙ্ক কীর্তিমান পুরুষ ছিলেন। সামন্ত নরপতিরূপে কর্মজীবনের সূচনা করিয়া স্বীয় ক্ষমতাবলে স্বাধীন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন এবং সম্মিলিত থানেশ্বর মৌখরী ও কামরূপের মত দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর বিরুদ্ধে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হন। শশাঙ্ক সর্বপ্রথমে বঙ্গদেশকে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উপস্থাপিত করেন।

উড়িষ্যা :—উড়িষ্যার প্রাচীন নাম কলিঙ্গ। মৌর্য্য সম্রাট অশোক কলিঙ্গ জয় করিয়া মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে খারবেল নামক এক কলিঙ্গ নরপতির নাম হাতিগুম্ফা শিলালিপিতে পাওয়া যায়। তিনি দিগ্বিজয়ী নরপতি ছিলেন। সিংহাসনারোহণের পরে দ্বাদশ বর্ষকাল তিনি দিগ্বিজয় করিয়া রাজগৃহ, কৃষ্ণানদীর তট অঞ্চল, বেরার অঞ্চলের রাষ্ট্রীক ও ভোজন জাতি, অঙ্গদেশ, মগধ প্রভৃতিকে পরাভূত করেন বলিয়া শিলালিপিতে উল্লেখ আছে। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের যুগে উড়িষ্যার উত্তরাংশে মানবংশ এবং দাক্ষিণাংশে শৈলোদ্ভবগণ রাজত্ব করিতেন বলিয়া জানা যায়। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাবে গৌড়রাজ শশাঙ্ক উড়িষ্যা জয় করেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে উড়িষ্যা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। অতঃপর হর্ষবর্দ্ধন উড়িষ্যা জয় করেন।

খারবেল

শশাঙ্ক

কাশ্মীর :—কহ্লন রচিত 'রাজতরঙ্গিনী' নামক গ্রন্থ হইতে কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত অবগত হওয়া যায়। অশোকের রাজত্বকালে কাশ্মীর মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কুষাণ সম্রাট কনিষ্ক ও হুবিষ্ক কাশ্মীরে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। হুণনেতা মিহিরকুল বলপূর্বক কাশ্মীর অধিকার করিয়া কিছুকাল স্বেচ্ছাচারিতার সহিত কাশ্মীর শাসন করেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কর্কোট বংশ কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। এই বংশের দুইজন নরপতি চন্দ্রাপীড় ও ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় দিগ্বিজয়ী নরপতি ছিলেন। ললিতাদিত্যের পরে তাঁহার পৌত্র বিনয়াদিত্য জয়াপীড় (৭৭৯—৮১০ খৃঃ) পিতামহের মত দিগ্বিজয়ী ছিলেন। তিনি কনৌজ, বঙ্গদেশ ও নেপালের রাজাকে পরাজিত করেন।

কামরূপ :—কামরূপ বা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বর্তমান আসাম প্রদেশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কামরূপে বর্মণ উপাধিধারী দ্বাদশজন নরপতি চতুর্থ হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কামরূপ সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে কর প্রদান করিতে স্বীকৃত হয়; গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে ষষ্ঠ শতাব্দীতে কামরূপ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভাস্করবর্মণ কামরূপের নরপতি ছিলেন। ভাস্করবর্মণ গৌড়রাজ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্দ্ধনের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া ভারতের রাজনীতিতে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বলভীর রাজবংশ :—গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভগ্নদশার সময়ে পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে সুরাষ্ট্রের বলভী নামক স্থানে ভট্টারক নামে মৈত্রকবংশীয় জনৈক ব্যক্তি একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। হুণশক্তির রাজত্বকালে মৈত্রকবংশীয়গণ হুণদের সামন্ত রাজা ছিলেন।

হুণদের পতনের পরে বলভী রাজ্য স্বাধীন ও শক্তিশালী হইয়া উঠে। বলভীরাজ শিলাদিত্য দিগ্বিজয়ী নরপতি ছিলেন এবং মোলাপো বা পশ্চিম-মালব জয় করেন। তাঁহার বৌদ্ধধর্মে প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। শীলাদিত্যের ভ্রাতুষ্পুত্র ধ্রুবভট হর্ষবর্দ্ধনের নিকট পরাজিত হন এবং হর্ষবর্দ্ধন ধ্রুবভটের সঙ্গে স্বীয় কন্যার বিবাহ প্রদান করেন।

যশোধর্মণ :—গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে যশোধর্মণ নামে এক সমরকুশল নরপতি মালবে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল মান্দাসোর বা দশপুরে। ৫৩২—৩৩ খৃষ্টাব্দের উৎকীর্ণ মান্দাসোর লিপিতে তাঁহার বিজয় কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। হিমালয় হইতে মহেন্দ্রগিরি পর্য্যন্ত লৌহিত, বা ব্রহ্মপুত্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। অপরাজিত হুণদের নেতা মিহিরকুল যশোধর্মণের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক যশোধর্মণকে নবরত্নের পৃষ্ঠপোষক উজ্জয়িনীর অধিপতি 'শকারি' বিক্রমাদিত্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু যশোধর্মণ শকারি ছিলেন না, তিনি হুণ বিজয়ী ছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল মান্দাসোরে, উজ্জয়িনীতে নহে। যশোধর্মণের কোন বংশধরের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

বাকাটক বংশ :—মধ্যভারতে ও দাক্ষিণাত্যে বাকাটকগণ প্রায় দুই শতাব্দী কাল রাজত্ব করেন। তাঁহাদের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে বাকাটকগণের অধিকার অজয়গড় (মধ্যভারত), মধ্যপ্রদেশ, পুণা ও দাক্ষিণাত্যের উত্তরাঞ্চল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বংশের নরপতি প্রথম প্রবরসেন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। এই বংশের অন্যতম রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ হয়। গুপ্ত-বাকাটক মৈত্রীর ফলে বাকাটকগণের মর্য্যাদাবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভগ্নাবস্থার সময়ে বাকাটকগণকে প্রতিদ্বন্দ্বী কুন্তল, মালব, কলিঙ্গ, গুজরাট, কেবল এমন কি অন্ধ্রদের সঙ্গেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে।

কনৌজের মৌখরী বংশ :—কনৌজের মৌখরীবংশ প্রথমে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে সামন্ত নরপতি ছিল। পরিশেষে গুপ্তবংশের অধঃপতনের সুযোগে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ক্রমশঃ মৌখরীগণের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং অধিকারের ক্ষেত্র লইয়া পরবর্তী গুপ্তরাজাদের সঙ্গে সংগ্রাম আরম্ভ হয়। এই বংশ গুপ্তদের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া সম্ভবতঃ মগধের কিয়দংশ অধিকার করিয়া লয়। মৌখরী বংশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নরপতি ছিলেন ঈশানবর্মণ। ঈশানবর্মণ হুণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া মৌখরীবংশের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। এই বংশের শেষ নরপতি গ্রহবর্মণ-এর সঙ্গে পুষ্যভূতিরাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়। প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে

মালবরাজ দেবগুপ্ত গৌড়রাজ শশাঙ্কের সহিত মৈত্রীবদ্ধ হইয়া কনৌজ আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে গ্রহবর্মণের মৃত্যু হয় এবং রাজ্যশ্রী বন্দিনী হন।

থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ :—সম্ভবতঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে পাঞ্জাবের পূর্বভাগে পুষ্যভূতি বংশের অভ্যুদয় হয়। ইহাদের রাজধানী ছিল থানেশ্বরে। এই বংশ হূণ আক্রমণের বিরুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। পুষ্যভূতি বংশের সঙ্গে গুপ্তবংশের সৌহার্দ্য ছিল বলিয়া জানা যায়। এই বংশের নরপতি আদিত্যবর্দ্ধন গুপ্তরাজ মহাসেন-গুপ্তের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আদিত্যবর্দ্ধনের পুত্র প্রভাকর-বর্দ্ধন হূণ, গুর্জর প্রভৃতি বৈদেশিক আক্রমণকারীকে পরাজিত করিয়া থানেশ্বরের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি কনৌজের অধিপতি মৌখরীরাজ গ্রহবর্মণের সঙ্গে স্বীয় কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দেন। ৬০৬ খৃষ্টাব্দে প্রভাকরবর্দ্ধন পুত্রদ্বয় রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধনকে হূণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। রাজ্যবর্দ্ধন হূণদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃতকার্য্য হন। পুত্রদ্বয়ের অনুপস্থিতিকালে প্রভাকরবর্দ্ধন পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। পিতার মৃত্যুর পরে রাজ্যবর্দ্ধন স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিমধ্যে রাজ্যবর্দ্ধনের ভগ্নীপতি গ্রহবর্মণ মালবরাজ দেবগুপ্তের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন এবং তাঁহার ভগ্নী রাজ্যশ্রী বন্দিনী হন। রাজ্যবর্দ্ধন সসৈন্যে দেবগুপ্তের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং দেবগুপ্তকে পরাজিত করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দেবগুপ্তের মিত্র গৌড়রাজ শশাঙ্কের প্ররোচনায় অথবা তাঁহার দ্বারা রাজ্যবর্দ্ধন নিহত হইলেন। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধন থানেশ্বরের নরপতি হইলেন (৬০৬ খৃষ্টাব্দ)।

হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য (৬০৬-৬৪৭ খৃষ্টাব্দ):—সিংহাসনে আরোহণের পরেই হর্ষবর্দ্ধন ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করা এবং ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত কনৌজের দিকে অগ্রসর হইলেন। পথে তিনি খবর পাইলেন যে রাজ্যশ্রী বন্দীদশা হইতে মুক্ত হইয়া বিন্ধ্যারণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অনেক অনুসন্ধানের পর তিনি রাজ্যশ্রীর খোঁজ পাইলেন। রাজ্যশ্রী নিরাশ হইয়া বনমধ্যে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; এমন সময়ে হর্ষবর্দ্ধন তথায় উপস্থিত হইয়া ভগ্নীকে আত্মহত্যা হইতে নিবৃত্ত করেন এবং তাঁহাকে লইয়া কনৌজে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইতিপূর্ব্বেই গ্রহবর্ম্মণের মৃত্যুতে কনৌজের সিংহাসন শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং ভগ্নী রাজ্যশ্রী এবং কনৌজের অমাত্যগণের অনুরোধে তিনি কনৌজের পরিচালনাভারও গ্রহণ করেন

রাজ্যশ্রীর উদ্ধার

এবং থানেশ্বর হইতে কনৌজে নিজ রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই বৎসর (৬০৬ খৃঃ) হইতে হর্ষাব্দ গণনা করা হয়। ভগিনী রাজ্যশ্রীর সহিত হর্ষবর্দ্ধন যুগ্মভাবে কনৌজের শাসনভার পরিচালনা করিতেন বলিয়া জানা যায়। অতঃপর কনৌজ উত্তর ভারতের প্রধান নগররূপে পরিগণিত হইতে থাকে। গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই পাটলীপুত্রের মর্য্যাদা চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

শশাঙ্কের বিরুদ্ধে ভাস্করবর্ম্মণের সহিত মৈত্রী

ভ্রাতৃহন্তা শশাঙ্ককে যথোচিত শাস্তিদানের জন্য হর্ষবর্দ্ধন কামরূপের রাজা ভাস্করবর্ম্মণের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিলেন। কিন্তু তিনি এই কার্য্যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। হর্ষবর্দ্ধন ও ভাস্করবর্ম্মণের সংযুক্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শশাঙ্ক যে সগৌরবে রাজত্ব করিয়াছেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

দিগ্বিজয়

অতঃপর হর্ষবর্দ্ধন সুদীর্ঘকাল দিগ্বিজয়ের দ্বারা রাজ্যের পরিসর বৃদ্ধি করেন এবং প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের অধিপতি হন। ৬০৬—৬১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশের কিয়দংশ ব্যতীত উত্তর-পশ্চিম ভারতের সমগ্র স্থান স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ৬২০ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে বিজয় অভিযানে অগ্রসর হইলে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁহাকে বাধা প্রদান করেন এবং পুলকেশীর নিকট পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। ৬৩৩ খৃষ্টাব্দের পর হর্ষবর্দ্ধন সুরাষ্ট্রের বলভীর ধ্রুবভট্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেন। ধ্রুবভট্ট হর্ষবর্দ্ধনের নিকট পরাভূত হইয়া কনৌজের অধীনতা স্বীকার করেন। হর্ষবর্দ্ধন স্বীয় কন্যার সহিত ধ্রুবভট্টের বিবাহ দেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে ৬৪১ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধন মগধ পর্য্যন্ত জয় করেন এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে গঞ্জাম জেলার কোঙ্গদ অধিকার করেন। হর্ষবর্দ্ধন 'তুষার-শৈল' অর্থাৎ তিব্বত আক্রমণ করিয়া কর আদায় করেন। কাশ্মীর রাজ্য হইতে বুদ্ধদেবের দন্ত আনয়ন করেন এবং সিন্ধুদেশের একজন রাজাকে রাজ্যচ্যুত করেন। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধন মগধরাজ উপাধি ধারণ করেন এবং চীনদেশের সহিত দূত বিনিময় করেন। নেপাল ও কামরূপ তাঁহার আজ্ঞাবহ ছিল।

সাম্রাজ্যের সীমা

হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যসীমা কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে তিনি যে তাঁহার সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর ছিলেন, তাহা তাঁহার শত্রু পুলকেশী পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। উত্তরে তুষারাবৃত পর্বত হইতে দক্ষিণে নর্মদানদী এবং পশ্চিমে কাথিয়াবাড় (বলভী) হইতে পূর্বে গঞ্জাম পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। হর্ষবর্দ্ধন

সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর না হইলেও কাশ্মীর, সিন্ধু, বলভী ও কামরূপ যে তাঁহাকে মান্য করিয়া চলিত তাহা নিঃসন্দেহ।
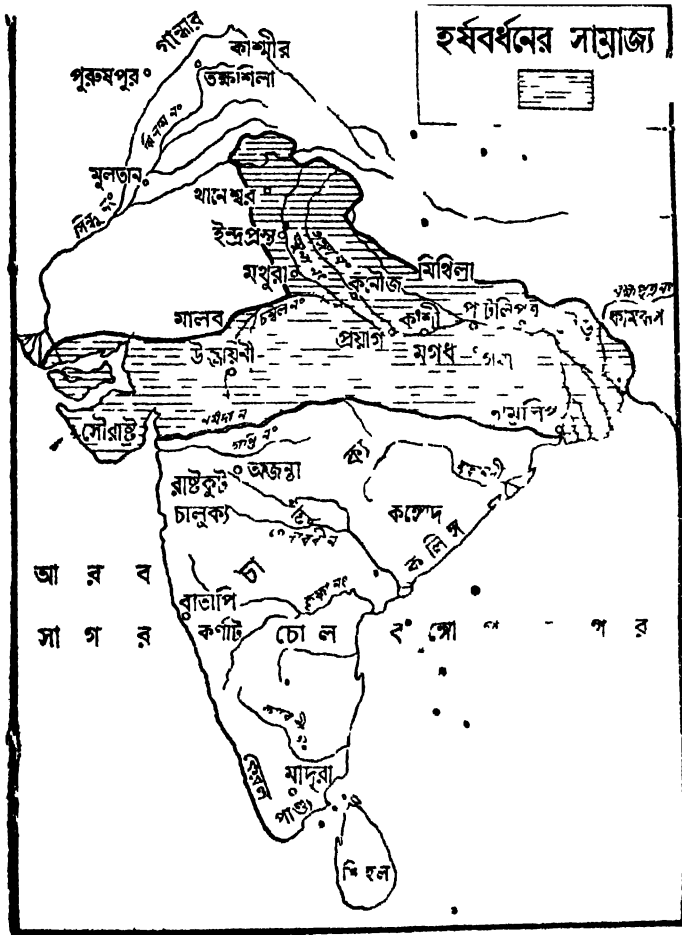
হর্ষবর্দ্ধনের খ্যাতি মাত্র দিগ্বিজয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রাচীন ভারতের অন্যতম সুশাসকরূপেও তিনি ভারতের ইতিহাসে খ্যাত। হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ হইতে হর্ষবর্দ্ধনের শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে সবিশেষ জানা যায়। ভূমি-রাজস্ব রাজার আয়ের

প্রধান উৎস ছিল এবং প্রজাগণকে উৎপন্ন দ্রব্যের এক-ষষ্ঠাংশ কররূপে রাজকোষে প্রদান করিতে হইত। রাজকর্মচারীবর্গ বেতনের পরিবর্তে ভূসম্পত্তি পাইত। বিভিন্ন করের পরিমাণ অত্যন্ত লঘু ছিল। ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানে প্রচুর সরকারী সাহায্য দেওয়া হইত। পথঘাট গুপ্তযুগ অপেক্ষা কম নিরাপদ ছিল। দণ্ডবিধির কঠোরতা যথেষ্ট ছিল। সাধারণ শাস্তি ছিল জরিমানা বা কারাদণ্ড কিন্তু গুরু অপরাধে অঙ্গচ্ছেদ করার বিধি ছিল। হর্ষবর্দ্ধন স্বয়ং রাজ্যমধ্যে ছদ্মবেশে পরিভ্রমণ করিয়া সুশাসন হইতেছে কিনা লক্ষ্য রাখিতেন। প্রজাদের সুবিধার জন্য তিনি রাস্তাঘাট নির্মাণ করিয়া পথিপার্শ্বে সরাইখানা, বিশ্রামাগার প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

শাসন ব্যবস্থা

ধর্ম সম্বন্ধেও হর্ষবর্দ্ধন উদার মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি স্বয়ং বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেও অপর ধর্মের উপর তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বুদ্ধ-মূর্তির সঙ্গে শিব ও সূর্য্যের উপাসনা করিতেন। হর্ষবর্দ্ধনের পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্মের অবনতি এই সময়ে সুস্পষ্ট দেখা দিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখা এই সময়ে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ-এর সম্মানার্থে হর্ষবর্দ্ধন কনৌজে এক ধর্মসভার আয়োজন করেন।

ধর্ম নৈতিক অবস্থা

হর্ষবর্দ্ধন যেমন স্বয়ং বিদ্বান ছিলেন তদ্রূপ বিদ্যোৎসাহিতা প্রদর্শনের জন্য অমর হইয়া রহিয়াছেন। তিনি স্বয়ং রত্নাবলী, নাগানন্দ ও প্রিয়দর্শিকা নামে তিনখানা নাটকের রচয়িতা। কাদম্বরী ও হর্ষচরিত রচয়িতা বাণভট্ট, সূর্য্যশতক রচয়িতা ময়ূরভট্ট এবং হরিদত্ত ও জয়সেন নামে দুইজন সুধী তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছেন। চীন-পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনও হর্ষবর্দ্ধনের গুণগ্রাহিতার পরিচায়ক।

বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী

কনৌজের ধর্মসভা ব্যতীত হর্ষবর্দ্ধন প্রতি পাঁচ বৎসরে প্রয়াগে গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থলে একটি মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন। একবার হিউয়েন সাঙ এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। উৎসব উপলক্ষ্যে হর্ষবর্দ্ধন বুদ্ধ সূর্য্য ও শিবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতেন এবং বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য ধর্মমতের লোককে প্রার্থিত দ্রব্য দান করিতেন। সন্ন্যাসী, দরিদ্র, অনাথ ও আতুরদিগকে পর্য্যাপ্তরূপে দান করার পরে সম্রাট একখানি সাধারণ বস্ত্র পরিধান করিয়া বুদ্ধের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেন।

প্রয়াগের পঞ্চবার্ষিক মেলা

হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে নালন্দা ও মোলাপো নামে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পাটলীপুত্রের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। হিউয়েন সাঙ এই স্থানে কয়েক

বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে নালন্দা সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। এই স্থান প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের প্রধান কেন্দ্র ছিল। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্রেরও অধ্যয়নের ব্যবস্থা সেখানে ছিল। দশ হাজার ছাত্র সেখানে থাকিয়া ব্যাকরণ, শিল্পবিদ্যা ভেষজবিদ্যা, ন্যায়, দর্শন, বেদ এবং অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। হিউয়েন সাঙের সময়ে বাঙ্গালী পণ্ডিত শীলভদ্র নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহার্থ একশতখানি গ্রামের উপস্বত্ব দান করেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

হিউয়েন সাঙ :—হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্ব কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের ভারত পরিভ্রমণ। হিউয়েন সাঙ সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর কাল (৬৩০—৬৪৪ খৃঃ) ভারতবর্ষে অবস্থান করেন। তিনি ২৮ বা ২৯ বৎসর বয়সে চীনদেশ হইতে রওনা হইয়া গোবি মরুভূমির পথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। তাঁহার ভারতে আগমনের উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধতীর্থ দর্শন এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ করা। সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষে অবস্থান কালে তিনি বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থস্থান সমূহ ব্যতীত কনৌজ, কামরূপ, কাঞ্চী, চালুক্য রাজধানী বাতাপী, মগধ প্রভৃতি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু স্থানে পর্যটন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকাল তথা প্রাচীন ভারতের বহু সংবাদ অবগত হওয়া যায়।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ

হিউয়েন সাঙ হর্ষবর্দ্ধনের বীরত্ব, ধর্মপ্রবণতা, দানশীলতা ও সুনিপুণ শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে হর্ষবর্দ্ধনের রাজধানী কনৌজ এই সময়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল এবং পাটলীপুত্র তখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। হিউয়েন সাঙ বলিয়াছেন যে একদা যে সমস্ত নগর ও জনপদ জনবহুল ও বিখ্যাত ছিল সেই সমস্ত স্থান তাঁহার পরিভ্রমণের সময় পরিত্যক্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তবে তাঁহার ভ্রমণের সময়ে ভারতবর্ষে জনাকীর্ণ নগর ও জনপদের অভাব ছিল না। কনৌজ শহরের দৈর্ঘ্য

ছিল পাঁচ মাইল। বহু মঠ ও মন্দির এই শহরের শোভা বর্দ্ধন করিত। এই সময়ে ভারতবর্ষের শহরগুলি চতুষ্কোণ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিত। পথগুলি সঙ্কীর্ণ ও অসরল ছিল।

নগর ও গৃহশিল্প

ভারতীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রার রীতি-নীতি সহজ-সরল ও আড়ম্বর বর্জিত ছিল। কিন্তু রাজা মহারাজা প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর লোকেরা পোষাক-পরিচ্ছদে আড়ম্বর পছন্দ করিত ও মূল্যবান অলঙ্কার পরিধান করিত। হিউয়েন সাঙের আমলে জনসাধারণের জীবনযাত্রা পদ্ধতি বৌদ্ধধর্মের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত ছিল না। আর্য্যাবর্ত্তে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পূর্বের অনুরূপ ছিল না। দক্ষিণ ভারতেও বৌদ্ধধর্মের পরিবর্ত্তে হিন্দু ও জৈনধর্মের প্রাধান্য দেখা দিয়াছিল। একমাত্র পূর্ব ভারতেই বৌদ্ধধর্মের আধিপত্য কতকটা বর্তমান ছিল। বৌদ্ধগণ আঠারোটি শাখায় বিভক্ত ছিল। বিভিন্ন শাখার মধ্যে মতবিরোধ প্রায়ই লাগিয়া থাকিত।

জনসাধারণের জীবনযাত্রা প্রণালী

ভারতবাসীর চরিত্র সম্বন্ধে হিউয়েন সাঙ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতবাসীরা সাধারণতঃ মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক ছিল না—প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য তাহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিত। তবে গুপ্তযুগের মত দেশের পথ-ঘাট নিরাপদ ছিল না—দস্যুতস্করের উপদ্রব যথেষ্ট ছিল। হিউয়েন সাঙ স্বয়ং একাধিকবার দস্যুহস্তে পতিত হইয়াছিলেন।

ভারতীয়দের চরিত্র

এই সময়ে ভারতের বহুস্থানে স্বর্ণ ও রৌপ্য পাওয়া যাইত। বঙ্গদেশের তাম্রলিপ্ত, উড়িষ্যার চিত্রতোলা, পাণ্ড্যদেশ, সুরাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট মূল্যবান মণি-মুক্তা সুলভ ছিল। বিদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্ক ব্যাপক ছিল। সিন্ধুপ্রদেশে প্রস্তুত লবণের বিদেশে যথেষ্ট চাহিদা ছিল। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, কড়ি, ক্ষুদ্র মুক্তাসমূহ বাণিজ্যের বিনিময় মান ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য

হর্ষবর্দ্ধনের পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্মের অবনতি এই সময়ে স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্মমতের মহাযান শাখা এই সময়ে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এই মহাযান শাখার সঙ্গে হিন্দুধর্মের যথেষ্ট মিল ছিল। হিন্দুধর্মের অন্তর্গত শিব ও সূর্য্যের উপাসনা অধিক প্রচলিত ছিল। শৈবমতের পাশুপত শাখার উল্লেখ তাহার বিবরণে পাওয়া যায়। গঙ্গাভক্তি লোকের মনে দৃঢ়মূল হইয়াছিল এবং গঙ্গাস্নানের ফলে পাপ দূর হয় ইহা লোকে বিশ্বাস করিত। বারাণসী ও প্রয়াগ উল্লেখযোগ্য হিন্দু-তীর্থস্থান ছিল। জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্মের তুলনায় অনেক উন্নত ছিল। বঙ্গদেশ, কলিঙ্গ, দ্রাবিড়দেশ

ধর্মনৈতিক অবস্থা

ও পাণ্ড্যরাজ্যে জৈনধর্ম প্রসারিত হইয়াছিল। জৈনধর্মের দিগম্বর শাখা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

হিউয়েন সাঙ তাঁহার বিবরণে কনৌজের ধর্মসভা ও প্রয়াগের ধর্মমেলার বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। কনৌজের ধর্মসভায় হর্ষবর্দ্ধনের করদ ও মিত্র রাজগণ উপস্থিত ছিলেন। এই সভার অনুষ্ঠানকালে হর্ষবর্দ্ধনের অত্যধিক বৌদ্ধধর্মের অনুরাগ দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাহারা হর্ষবর্দ্ধনের প্রাণনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। প্রয়াগের মেলায় বা দানক্ষেত্রে হর্ষবর্দ্ধন কি ভাবে প্রার্থিগণকে দান করিতেন তাহার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে আছে।

কনৌজের ধর্মসভা

হর্ষবর্দ্ধনের কৃতিত্ব:—হর্ষবর্দ্ধন হিন্দুযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে আর্য্যাবর্তে বিদেশী আক্রমণকারীর উপদ্রব ও পরস্পর বিবদমান ভারতীয় ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে যখন অনৈক্য বিরাজিত সেই সময়ে হর্ষবর্দ্ধন দুইটি রাজ্যের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সুনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থার দ্বারা যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। গুপ্ত বংশের দৌহিত্র সন্তানরূপে হর্ষবর্দ্ধন কামনা করিয়াছিলেন যে তিনিও গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় দিগ্বিজয় ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় সুশাসনপ্রণালী প্রবর্তনের দ্বারা সমগ্র ভারতব্যাপী এক সাম্রাজ্য সৃষ্টি ও তাহার স্থায়িত্ব বিধান করিয়া যাইবেন। কিন্তু কামনার অনুরূপ তাঁহার শক্তি ছিল না বলিয়া তাঁহাকে মাত্র আর্য্যাবর্তের অধীশ্বর হইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে এবং দক্ষিণে নর্মদার তীর হইতেই বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বের অধিকাংশ কালই তাঁহাকে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছে, এই জন্যই তিনি তাঁহার শাসনপ্রণালীকে স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। ফাহিয়েনের বিবরণে গুপ্তশাসনের কালে দেশে যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হর্ষবর্দ্ধনের অধিকার সময়ে দুর্লভ ছিল। কিন্তু হর্ষবর্দ্ধনের শাসনের কৃতিত্ববলেই কনৌজ পরবর্তী যুগের ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং সুদীর্ঘকাল কনৌজ 'মহোদয়' বা 'মহোদয়শ্রী'র গৌরব অর্জন ভারতবর্ষের পরবর্তী সকল দিগ্বিজয়ী সম্রাটের কাম্য হইয়াছিল। সামরিক খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে শান্তিমূলক কার্যেও হর্ষবর্দ্ধন অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এই দিক দিয়া তাঁহার সর্বতোমুখিতা সমুদ্রগুপ্তের প্রায় সমতুল্য। উত্তর জীবনে তিনি বৌদ্ধধর্মানুরাগী হইয়া অশোকের আদর্শ অনুসরণ করার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ধর্মসহিষ্ণুতা, জাতি-

ধর্মনির্বিশেষে দানশীলতা, প্রজাকল্যাণকর কার্য্যাবলী প্রিয়দর্শীর কথাই মনে করাইয়া দেয়। জনৈক ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের মতে হর্ষবর্দ্ধন ছিলেন হিন্দুযুগের আকবর। কিন্তু সুশাসন, প্রজাকল্যাণের জন্য আগ্রহ, অপরিমেয় দানশীলতা, পাণ্ডিত্য ও ধর্মের উদারতা প্রভৃতির কথা বিবেচনা করিলে তাহাকে আকবর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার অসাধারণ গুণগ্রাহিতার জন্যই বাণভট্ট, ময়ূর, দিবাকর, হিউয়েন সাঙ, প্রভৃতি সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ ধীমানগণ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। এক দিক দিয়া হর্ষবর্দ্ধন সমুদ্রগুপ্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সমুদ্রগুপ্তের 'কবি'খ্যাতি হরিষেণের প্রশস্তিতেই পর্য্যবসিত অথচ হর্ষবর্দ্ধনের কবিমহিমা তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্য দিয়া প্রমাণীকৃত।

হর্ষবর্দ্ধনকে অনেকে হিন্দুযুগের শেষ সম্রাট বলিয়া বিবেচনা করেন। সাম্রাজ্যের আয়তন দিয়া বিচার করিতে গেলে হর্ষবর্দ্ধনের পরে আরও দুইজন সম্রাটের পরিচয় পাওয়া যায়—একজন প্রতিহার বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি মিহির ভোজ, অপরজন বাংলার অধিপতি ধর্মপাল। সুতরাং হর্ষবর্দ্ধন সম্বন্ধে উক্ত মত যুক্তিগ্রাহ্য নহে।

প্রশ্নোত্তর

1. Make an estimate of Samudragupta as a conqueror and as a man.

দিগ্বিজয়ী ও ব্যক্তিরূপে সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্বের পরিমাপ কর।

উত্তর-সূত্র : (১) দিগ্বিজয়ী : গুপ্তবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের পশ্চাতে উদ্দেশ্য ছিল ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং একরাট পদবী অর্জন করা। (ক) আর্য্যাবর্তের নয়জন নরপতিকে পরাজিত করেন (খ) অতঃপর তিনি মধ্যভারতের আটবিক বা অরণ্য রাজ্যগুলি জয় করেন। (গ) উত্তরাপথ বিজয়ের পর সমুদ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্য জয় করার জন্য অগ্রসর হইলেন। তাঁহার বিজয়-বাহিনী দক্ষিণে কাঞ্চি পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় এবং বহু নরপতি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করে। দাক্ষিণাত্যের বিজিত রাজ্যগুলি তিনি স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন নাই—তিনি তাহাদের আনুগত্যের পরিবর্তে তাঁহাদিগকে স্ব স্ব রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। (ঘ) করদরাজ্যসমূহ (ঙ) উত্তর ও উত্তরপশ্চিম ভারতে অবস্থিত প্রতিবেশী বিদেশী রাজ্যসমূহ এবং সিংহল উপঢৌকন প্রেরণের দ্বারা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করে।

দিগ্বিজয়ের ফলে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদী হইতে পূর্বে বঙ্গদেশ এবং উত্তরে নেপাল হইতে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

(২) **ব্যক্তিরূপে তাঁহার কৃতিত্ব :** তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল। সমর-নায়ক ব্যতীত তিনি সুকবি, বিদ্বান ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি বিদ্বানের পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হইলেও তিনি অন্যধর্ম সম্বন্ধে উদার ছিলেন।

2. Give an account of the reign of Chandragupta II Vikramaditya.

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালের একটি বিবরণ দাও।

উত্তর-সূত্র : (১) সিংহাসনারোহণ (২) বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা স্বীয় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি—নাগবংশীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন এবং বাকাটক বংশের রাজপুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেন (৩) উজ্জয়িনীর শকক্ষত্রপগণকে পরাজিত করিয়া পশ্চিমে সমুদ্র পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার—পাশ্চাত্য দেশ সমূহের সঙ্গে সংযোগের ফলে অর্থনৈতিক ও মানসিক সমৃদ্ধি (৪) ব্যক্তিগত চরিত্র ও কৃতিত্ব—কিংবদন্তীখ্যাত নবরত্ন সভার পৃষ্ঠপোষক শকারি বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে অভিন্নতা—বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর—রাজত্বকালের সুখ সমৃদ্ধি—সুশাসনের ব্যবস্থা—বিদ্যোৎসাহী নবরত্নের পৃষ্ঠ-পোষক—ফাহিয়েনের বিবরণ হইতে তৎকালীন দেশের অবস্থা

3. Summarise Fahien's account of India.

ফাহিয়েনের ভারত বিবরণীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর-সূত্র : (১) ফাহিয়েন নামে চীন পরিব্রাজক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থের অনুসন্ধানে ভারতে আসিয়া ৪০১—৪১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে অবস্থান করেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যে ছয় বৎসরকাল অতিবাহিত করেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিত ফাহিয়েনের বিবরণ হইতে তৎকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক চিত্র, শাসনপদ্ধতি দেশের অবস্থা ও ধর্ম সম্বন্ধে তথ্য অবগত হওয়া যায়।

(২) (ক) দেশের অবস্থা : পাটলীপুত্র সমৃদ্ধশালী নগর ছিল—মালব ও তাম্রলিপ্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন—গয়া, শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, কুশীনগর প্রভৃতি প্রাচীন নগর শ্রীহীন।

(খ) উদার শাসনপদ্ধতি ও শান্তিশৃঙ্খলা।

(গ) জনসাধারণের উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা—সুখ ও শান্তিময় জীবনযাত্রা—অবাধ যাতায়াত—দাতব্য-প্রতিষ্ঠান, পান্থনিবাস, আতুরালয় প্রভৃতি—যোগাযোগের সুব্যবস্থা—রাজপথ দ্বারা সংযুক্ত।

(ঘ) ফসলের এক ষষ্ঠাংশ রাজস্ব - রাজকর্মচারীদের বেতন নির্দিষ্ট পরিমাণ ছিল—রাজকোষ হইতে দাতব্য প্রতিষ্ঠান, সঙ্ঘারাম, আতুরালয় প্রভৃতি সাহায্য প্রাপ্ত।

(ঙ) হিন্দুধর্মের উন্নতি—বৌদ্ধধর্মের অবনতি—পাটলীপুত্রে মহাযান ও হীনযানের দুইটি বিহার ছিল—শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করিত।

4 Sketch briefly the career and conquests of Harshabardhana.

হর্ষবর্দ্ধনের জীবনী ও দিগ্বিজয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাও।

উত্তর সূত্র: (১) জীবনী—হর্ষবর্দ্ধন থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের নরপতি—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পরে সিংহাসনারোহণ—ভগ্নী রাজ্যশ্রীর উদ্ধার ও ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ—কনৌজে রাজধানী স্থানান্তরিতকরণ—দিগ্বিজয় ও সাম্রাজ্য সীমা—আর্য্যাবর্ত্তের অধিপতি চালুক্যরাজ পুলকেশীর হস্তে পরাজয়—সাম্রাজ্যের সীমা—হিউয়েন সাঙের বিবরণী হইতে হর্ষবর্দ্ধনের শাসনপ্রণালীর বিবরণ—ব্যক্তিগত চরিত্র—বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী—স্বয়ং বৌদ্ধধর্মে অনুরাগী হইলেও ধর্মসহিষ্ণুতা—নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়।

হিন্দুযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি 'সমগ্র উত্তরাপথনাথ'।

(২) **দিগ্বিজয়:** (ক) কামরূপরাজ ভাস্করবর্মনের সহিত মৈত্রী ও মালব এবং গৌড়ের বিরুদ্ধে অভিযান—মালবের আনুগত্য স্বীকার—গৌড়ের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অধিকৃত (খ) চালুক্যরাজ পুলকেশীর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া পরাজিত (গ) বলভিরাজ ধ্রুবভট্টের বিরুদ্ধে অভিযান—বলভীরাজ হর্ষবর্দ্ধনের অধীন সামন্তরাজরূপে পরিগণিত (ঘ) ৬৪৩ খৃঃ-এ গঞ্জাম অভিযান (ঙ) সম্ভবতঃ তিব্বত অভিযান করিয়া কর আদায় করেন (চ) কাশ্মীর হইতে বুদ্ধদেবের দন্ত আনয়ন করেন।

তাঁহার সাম্রাজ্য: থানেশ্বর, কনৌজ, রোহিলখণ্ড, শ্রাবস্তী, প্রয়াগ ৬৪১ খৃষ্টাব্দের পর মগধ এবং উড়িষ্যা—পূর্বমালবের মাধবগুপ্ত ও কামরূপের ভাস্করবর্মণ এবং কাশ্মীর, সিন্ধু ও বলভী তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল।

5. What do you mean by the Gupta Golden Age? Write a short note on the administration of the Guptas and the condition of the country during the Gupta rule.

গুপ্ত সুবর্ণযুগ কাহাকে বলে? গুপ্তযুগের শাসনপ্রণালী এবং তৎকালীন দেশের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

উত্তর-সূত্র : (১) গুপ্ত সুবর্ণযুগ : 'গুপ্তযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি' দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা)। (২) গুপ্তযুগের শাসনপ্রণালী (পৃষ্ঠা)।

6. What do you know about the accounts of the foreign traveller who visited India during the reign of Harshabardhana.

হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে ভারতে আগত বৈদেশিক পর্য্যটকের বিবরণী দাও।

উত্তর-সূত্র : হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণী (পৃষ্ঠা)।

দশম অধ্যায়

হর্ষবর্দ্ধনের পরবর্ত্তীকালে উত্তর ও দক্ষিণ ভারত ঃ উড়িষ্যার ইতিহাস

Syllabus :—The Chalukyas, the Pallavas; the Cholas, and the Pandyas. The Chalukya-Pallava contest for the mastery of Southern India—Pallava art—Chalukya art. Rastrakutas—Pratihara-Pala contest for Kanauj Art of Ellora. The Chola conquest and expansion to the Malaya Peninsula—Sri Vijaya and Ceylon. Chola administration. Rajarajeswara temple at Tanjore.

Different dynasties of Orissa. The Ganga revival—The great temples of Puri, Bhubaneswara and Konataka.

পাঠসূচী :—দক্ষিণের চালুক্য, পল্লব, চোল ও পাণ্ড্যগণ। দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য চালুক্য ও পল্লবদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা—পল্লবশিল্প—চালুক্যশিল্প। কনৌজের জন্য রাষ্ট্রকূট, প্রতিহার ও পালদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইলোরার শিল্প। চোলনরপতিগণের দিগ্বিজয়—মালয় উপদ্বীপে সাম্রাজ্যবিস্তার—শ্রীবিজয় ও সিংহল। চোল শাসনব্যবস্থা—তাঞ্জোরে রাজরাজেশ্বরের মন্দির।

উড়িষ্যার বিভিন্ন রাজবংশ। গঙ্গদের অভ্যুদয়—পুরী, ভুবনেশ্বর ও কোনারকের বিখ্যাত মন্দির সমূহ।

উত্তর ভারত :—

কনৌজ :—হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর হইতে মুসলমান বিজয়ের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত উত্তর ভারতের ইতিহাস প্রধানতঃ কনৌজের আধিপত্য লইয়া যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনী। অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত কনৌজের আধিপত্য লইয়া উত্তর-ভারতে তুমুল সংঘর্ষ চলিয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তের তিনটি শক্তিশালী রাজবংশ—পাল, গুর্জ্জর প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট এই সংঘর্ষে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে কনৌজের গৌরব-রবি অস্তমিত হইতে আরম্ভ করিল। হর্ষের মৃত্যুর পরবর্ত্তী ৭৫ বৎসর কাল কনৌজের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যশোবর্মণ নামে এক পরাক্রান্ত নৃপতির অধীনে কনৌজ কয়েক বৎসরের জন্য পূর্ব গৌরব প্রতিষ্ঠা করে। যশোবর্মণের কার্য্যাবলীর বিবরণ তাঁহার সভাকবি বাকপতিরাজের 'গৌড়বহো' নামে প্রাকৃত ভাষায় রচিত এক ঐতিহাসিক কাব্য হইতে জানা যায়। যশোবর্মণের পরাক্রম প্রায় হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে তুলনীয়। তিনি গৌড়রাজের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া তাঁহাকে রণক্ষেত্রে নিহত করেন। অতঃপর তিনি পূর্ব এবং মধ্য বঙ্গদেশের বঙ্গজনকে পরাস্ত করিয়া সসৈন্যে নর্মদার তীরে উপস্থিত হন। নর্মদার তীরবর্ত্তী অঞ্চলে কিয়ৎকাল অবস্থানের পর যশোবর্মণ রাজপুতানার মরুভূমি ও থানেশ্বরের মধ্য দিয়া কনৌজে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। হর্ষবর্দ্ধনের ন্যায় তিনিও চীন সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন (৭৩১খৃষ্টাব্দ)। উত্তররামচরিত প্রণেতা প্রসিদ্ধনামা ভবভূতি ও বাক্‌পতিরাজ যশোবর্মণের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। যশোবর্মণের রাজত্বের শেষভাগে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন।

যশোবর্মণ

গুর্জর-প্রতিহার বংশ:—খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুর্জরজাতি হূণদের সঙ্গে মধ্য এশিয়া হইতে ভারতবর্ষে আগমন করে এবং ইহাদের একটি শাখা বরোচে ও অপর একটি দক্ষিণ রাজপুতানার ভিনমালে মোট এই দুইটি গুর্জর-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্ত্তীকালে গুর্জররা মালবে ও উজ্জয়িনীতেও রাজত্ব করিতে থাকে।

গুর্জর-প্রতিহার বংশের প্রথম নরপতি ছিলেন হরিশ্চন্দ্র। ইনিই ভিনমালে গুর্জরদের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। গুর্জররা ঐতিহাসিকদের মতে শক হূণ-কুষানদের ন্যায় বৈদেশিক জাতি। কিন্তু তাহারা নিজেদের ভারতীয় সূর্য্যবংশোদ্ভূত ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবি করিত। কালক্রমে তাহারা অপরাপর বিদেশীদের ন্যায় ভারতীয় সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া যায়।

গুর্জর-নরপতিদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রথম নাগভট উজ্জয়িনী শাখার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি কচ্ছ, কাথিয়াবাড়, উত্তর-গুজরাট, মালব ও দক্ষিণ রাজপুতানায় অভিযান করেন। পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য নরপতি বৎসরাজ ভিনমাল শাখার গুর্জরদের আধিপত্য বিলুপ্ত করিয়া সমগ্র গুর্জর রাষ্ট্রের উপর উজ্জয়িনীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। বৎসরাজ সম্ভবতঃ বঙ্গদেশের পালবংশীয় নরপতি ধর্মপালকে যুদ্ধে পরাজিত করেন কিন্তু তিনি রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব কর্তৃক পরাজিত

প্রথম নাগভট

বৎসরাজ

হইয়া রাজপুতানার মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভটও পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি কনৌজের অধিপতি চক্রায়ুধ ও বঙ্গদেশের রাজা ধর্মপালকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। তাঁহার পরে সাময়িক ভাবে কিছুকালের জন্য গুর্জর-প্রতিহারদের প্রতিপত্তি ক্ষীণ হইয়া যায় এবং নরপতি মিহির ভোজের সময়ে এই বংশের গৌরব পুনরুজ্জীবিত হয়। তিনি কনৌজ সহ উত্তর-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। পূর্বদিকে গৌড়রাজ তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। মিহির ভোজের পুত্র মহেন্দ্রপালের সময়েই গুর্জর প্রতিহার শক্তি গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। মহেন্দ্রপাল পালবংশের নরপতি নারায়ণপালকে পরাজিত করিয়া মগধ ও উত্তর-বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রপালের পরে মহীপালের রাজত্বকালে গুর্জর-প্রতিহার শক্তির পতনের সূত্রপাত হয়। রাষ্ট্রকূটদের প্রবল আক্রমণ কাটাইয়া গুর্জর প্রতিহারগণ আর পূর্বগৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিল না। বিশাল গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল চন্দেল্ল, চেদী, পরমার, চালুক্য, চৌহান প্রভৃতি রাজপুতবংশ অধিকার করিয়া লইল।

দ্বিতীয় নাগভট

মিহির ভোজ

মহেন্দ্র পাল

গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্যের পতন

নানা কারণে ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুর্জর প্রতিহার বংশের রাজত্বকাল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রথমতঃ, গুর্জর প্রতিহার বংশই হিন্দুযুগে উত্তর ভারতের শেষ হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, গুর্জর-প্রতিহারগণের প্রতিরোধের জন্যই আরবজাতি কর্তৃক ভারতবর্ষ জয় বিলম্বিত হইয়াছিল। গুর্জর-প্রতিহারদের শক্তিশালী সৈন্যদল বিশেষতঃ উষ্ট্র-বাহিনীর ভয়েই আরবগণ এশিয়ার অন্যান্য অংশে অধিকার স্থাপন করিলেও ভারতবর্ষে অধিকার স্থাপন করিতে সাহসী হয় নাই।

গুর্জর প্রতিহারদের কৃতিত্ব

(ক) শেষ হিন্দু সাম্রাজ্য

(খ) আরব আক্রমণ প্রতিরোধ

দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস :—রামেশ্বর সেতুবন্ধ হইতে নর্মদা ও বিন্ধ্য-চিত্রকূট পর্য্যন্ত (সেতুর্নমদয়োর্মধ্য) বিস্তৃত ভূখণ্ডই দক্ষিণাপথ, কিন্তু সাধারণতঃ নর্মদা ও কৃষ্ণানদীর মধ্যবর্তী স্থান দক্ষিণাপথ নামে পরিচিত। অবশিষ্ট অঞ্চল সুদূর দক্ষিণ বা তামিল দেশ বলিয়া পরিগণিত হয়।

দক্ষিণাপথ অনার্য্য-অধ্যুষিত ছিল বলিয়া প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থে ইহার কোন বিবরণ পাওয়া

যায় না। রামায়ণেই প্রথম গোদাবরীর দক্ষিণস্থ অঞ্চলের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রামচন্দ্রের লঙ্কাজয়ের মধ্যে সুদূর দক্ষিণাপথে আর্য্যাধিকার বিস্তারের পরোক্ষ আভাস রহিয়াছে বলিয়া অনেক মনে করেন। অশোকের সময়ে দক্ষিণাপথ মৌর্য্যসাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এবং সুদূর দক্ষিণের চোল, চের, পাণ্ড্য সত্যপুত্র ও কেরলপুত্র ইত্যাদি অঞ্চল অশোকের সাম্রাজ্যের সীমান্তিক স্থান ছিল। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণে অন্ধ্র, রাষ্ট্রিক, পাত্যানিক, ভোজ প্রভৃতি স্বতন্ত্র জাতি বাস করিত। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের পরে দক্ষিণে কলিঙ্গের চেতরাজ্য ও সাতবাহন রাজ্য প্রবল হইয়া উঠে। খারবেলের নেতৃত্বে কলিঙ্গ স্বল্পকালের জন্য উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু স্থান পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করে। চেতবংশের পরে সাতবাহন বা অন্ধ্র বংশ দাক্ষিণাপথের অধীশ্বর হয়। অন্ধ্রদের পতনের পরে দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘকাল কোন শক্তিশালী রাজবংশের অভ্যুদয়ের সংবাদ পাওয়া যায় না। গুপ্ত নরপতি সমুদ্রগুপ্ত দাক্ষিণাপথের কয়েকজন নরপতিকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করাইয়াছিলেন। গুপ্তবংশের পতনের পরে দাক্ষিণাত্যে পরাক্রান্ত চালুক্য বংশের অভ্যুদয় হয়।

চালুক্য বংশঃ—চালুক্যগণ জাতিতে রাজপুত এবং হূণ-গুর্জর প্রভৃতি বৈদেশিক জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। চালুক্য বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার নাম প্রথম পুলকেশী। ৫৫০ খৃষ্টাব্দে পুলকেশী বিজাপুর জেলার বাতাপি বা বাদামী নগরে চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। অতঃপর পুলকেশীর পুত্রদ্বয় কীর্ত্তিবর্মণ ও মঙ্গলেশ রাজত্ব করেন। উভয়েই পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন এবং ইহারা প্রতিবেশী নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া চালুক্য সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। ইহাদের হস্তে কোঙ্কণের মৌর্য্যগণ, বৈজয়ন্তীর কদম্বগণ এবং মহারাষ্ট্র ও মালবের কলচুরিগণ পরাজিত হয়।

প্রথম পুলকেশী

কীর্ত্তিবর্মণ ও মঙ্গলেশ

চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশী। পুলকেশীর সাম্রাজ্য উত্তর-পশ্চিমে মহারাষ্ট্র এবং দক্ষিণে নর্মদার তীর হইতে আরম্ভ করিয়া কাবেরী নদীর পরপার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কোঙ্কণের মৌর্য্যগণ তাঁহার হস্তে পরাজিত হয়, লাট (দক্ষিণ গুজরাট), গুর্জর (উত্তর গুজরাট ও রাজপুতানা) ও মালব তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। পুলকেশী গোদাবরী অঞ্চলের পিষ্টপুর বা পৈঠান অধিকার করিয়া তথায় তাঁহার ভ্রাতা কুব্জ বিষ্ণুবর্দ্ধনকে প্রতিষ্ঠিত করেন। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণ পুলকেশীর হস্তে পরাজিত হন। দক্ষিণের চোল, পাণ্ড্য এবং কেরল রাজ্য তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করে। পুলকেশীর

দ্বিতীয় পুলকেশী

সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর হর্ষবর্দ্ধনকে পরাজিত করা। পুলকেশী পারস্যরাজের সভায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ পুলকেশীর রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পুলকেশীর পরিণাম সুখকর হয় নাই। তিনি কাঞ্চীর পল্লবরাজ নরসিংহবর্মণের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন।

দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য পল্লবরাজ নরসিংহবর্মণকে পরাজিত করিয়া পিতৃপরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে চালুক্য বংশের নষ্ট প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদার যৎকিঞ্চিৎ পুনরুদ্ধার হয়। চালুক্য বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য নরপতি ছিলেন দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য।

প্রথম বিক্রমাদিত্য

তিনি পল্লবরাজ নন্দীবর্মণকে পরাজিত করিয়া কাঞ্চী অধিকার করেন। এই বংশের শেষ নরপতি দ্বিতীয় কীর্ত্তিবর্মণের সময়ে রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গ ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে সমগ্র চালুক্যরাজ্য অধিকার করেন।

দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য

কল্যাণের চালুক্যবংশ :—বাতাপির চালুক্য নরপতি দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের বংশধর দ্বিতীয় তৈল ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে কল্যাণের চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মালবরাজ মুঞ্জকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। পরবর্তী কয়েকজন নরপতির শাসনকালের প্রধান ঘটনা ছিল মালবের পরমার বংশ ও চোল রাজাদের সঙ্গে চালুক্য বংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। চালুক্য নরপতি সোমেশ্বর মালব ও চোলরাজকে পরাজিত করেন, কাঞ্চী আক্রমণ করেন এবং চেদিরাজ কর্ণকে পরাজিত করেন। সোমেশ্বরের পুত্র ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি রাজেন্দ্র চোলকে পরাজিত করেন এবং পালবংশের হীনাবস্থার সময়ে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য স্বয়ং বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বিক্রমাঙ্কচরিত্রচয়িতা বিহ্লন ও হিন্দু আইন মিতাক্ষরারচয়িতা বিজ্ঞানেশ্বর ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে যাদবগণ, দ্বারসমুদ্রের হোয়সালগণ ও বরঙ্গলের কাকতীয়গণ প্রবল হইয়া উঠিলে কল্যাণের চালুক্যবংশের প্রতিপত্তি লুপ্ত হইয়া যায়।

চালুক্য বংশের বৈশিষ্ট্য :—চালুক্য নরপতিগণ ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে দাক্ষিণাত্যে বহু হিন্দু মন্দির নির্মিত হয়। এই সকল মন্দিরের মধ্যে আইহলিতে এবং পত্তকদলে লোকেশ্বর শিবের মন্দির স্থাপত্য শিল্পের সুন্দর নিদর্শনরূপে বিখ্যাত। অজন্তা ও এলিফান্টার অবস্থিত বহু গুহাচিত্র এই সময়ে চিত্রিত হয়। চালুক্য বংশের সময়ে দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে জৈনধর্মের প্রসার হয়। পারসিকগণের সঙ্গে চালুক্য রাজাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

রাষ্ট্রকূট বংশ :—রাষ্ট্রকূটগণের আদি পরিচয় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। তাঁহারা মহাভারতের যাদব বংশীয় সাত্যকির বংশধর বলিয়া দাবি করিত। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূট কোন সরকারী পদবী হইতে পারে। প্রথমে ইহাদের মধ্যে কেহ রাষ্ট্রকূট বা শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পরে সরকারী পদবী কৌলিক পদবীতে পরিণত হয়। ইহাদের রাজধানী ছিল হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত মান্যখেট বা মালখেড়ে।

রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম দন্তিদুর্গ। ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে দন্তিদুর্গ চালুক্য সাম্রাজ্যের বিনাশ সাধন করিয়া রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার ভ্রাতা প্রথম কৃষ্ণের রাজত্বকালে ইলোরার পর্বত-খোদিত কৈলাসনাথের মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। পরবর্তী উল্লেখ-যোগ্য নরপতি ধ্রুব গুর্জর-প্রতিহার নরপতি বৎসরাজ এবং গৌড় নৃপতি ধর্মপালকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তৃতীয় গোবিন্দ রাষ্ট্রকূট বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। উত্তরে বিন্ধ্য হইতে দক্ষিণে কাঞ্চীনগর পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। তৃতীয় গোবিন্দ কনৌজের আধিপত্য লইয়া উত্তর ভারতে যে দ্বন্দ্ব হয় তাহাতে যোগদান করেন এবং গুর্জর প্রতিহার রাজ দ্বিতীয় নাগভট এবং গৌড়াধিপ ধর্মপালকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। কাঞ্চীর পল্লবনৃপতি দন্তিবর্মণ তাঁহার প্রতাপ স্বীকার করিয়া তাঁহাকে কর প্রদান করিতে বাধ্য হন। পরবর্তী নৃপতি অমোঘবর্ষের রাজত্বকালে রাষ্ট্রকূটদের প্রতাপ আরও বর্দ্ধিত হয়। সমসাময়িক আরব পর্যটক সুলেইমান্ অমোঘবর্ষকে তৎকালীন পৃথিবীর চারিজন শ্রেষ্ঠ নরপতির অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সামরিক কৃতিত্ব অপেক্ষা ধর্ম ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে অমোঘবর্ষ সমধিক খ্যাত ছিলেন। তিনি দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। স্বয়ং রত্নমালিকা নামে একখানা ধর্মগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং নিজে পার্শ্বাভ্যুদয় নামে গ্রন্থের রচয়িতা জিনসেনের শিষ্য ছিলেন। অমোঘবর্ষের পরে কয়েকজন দুর্বল নরপতি রাষ্ট্রকূট সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ নরপতি দ্বিতীয় কর্কের সময়ে বাদামীর চলুক্যরাজ্যের বংশধর দ্বিতীয় তৈল রাষ্ট্রকূট বংশের বিনাশ সাধন করেন।

দন্তিদুর্গ
প্রথম কৃষ্ণ
ধ্রুব
তৃতীয় গোবিন্দ
অমোঘবর্ষ
রাষ্ট্রকূট শক্তির পতন

পল্লব বংশ :— দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্র বা সাতবাহন বংশের পতনের পরে কাঞ্চী নগরের পল্লবগণ পরাক্রান্ত হয় এবং খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের প্রথমাংশে সুদূর দক্ষিণে আধিপত্য বিস্তার করে। কাঞ্চীর পল্লবগণের সঠিক পরিচয় জানা সম্ভবপর হয় নাই। খৃষ্টীয়

চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিষ্ণুগোপ নামে জনৈক কাঞ্চীর রাজা সমুদ্রগুপ্তের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহবর্মণ নামে অপর এক কাঞ্চী নরপতির সন্ধান পাওয়া যায়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে সিংহবিষ্ণু নামে এক নরপতি চের, চোল, পাণ্ড্য, এবং একজন সিংহল নৃপতিকে পরাস্ত করিয়া তামিল রাজ্যে পল্লবাধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। বাতাপির চালুক্যবংশের সহিত দাক্ষিণাত্যের প্রাধান্য লইয়া পল্লবরাজগণের অবিরত দ্বন্দ্ব চলিত। পল্লব বংশের প্রথম পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন মহেন্দ্রবর্মণ।

মহেন্দ্রবর্মণ

ইনি সমসাময়িককালে ভারতের শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের অন্যতম ছিলেন। মহেন্দ্রবর্মণ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর হস্তে পরাজিত হন। পরবর্তী পল্লবরাজ নরসিংহবর্মণ এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তিনি স্বল্পকালের জন্য দাক্ষিণাত্যের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত করিয়া 'বাতাপীকোণ্ড' উপাধি গ্রহণ

নরসিংহবর্মণ

করেন। তাঁহার রাজত্বকালে হিউয়েন সাঙ দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় মামল্লপুরমের বিখ্যাত সপ্ত 'প্যাগোডা' বা রথসমূহ নির্মিত হয়। পরবর্তীকালে পল্লববংশের পূর্ব প্রতিপত্তি হ্রাস পাইতে থাকে। চালুক্যদের ক্রমাগত আক্রমণের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য পল্লবগণ রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে মৈত্রীযুক্ত হয়। পরিশেষে চোল নৃপতিদের অভ্যুদয়ে পল্লবগণ আর আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। চোল নৃপতি আদিত্য নবম শতাব্দীর শেষভাগে শেষ পল্লবরাজ অপরাজিতকে পরাজিত করিয়া পল্লব শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করেন।

পল্লব শিল্প :—স্থাপত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে পল্লবগণ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছিল। পল্লব শিল্পরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য—ইহা বৈদেশিক শিল্প-রীতির প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া একটি 'নিজস্ব ভারতীয় শিল্প রীতির প্রবর্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। পল্লবদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-রীতি পরবর্তীকালে দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্য-রীতির আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে। পল্লব রাজধানী কাঞ্চীর কৈলাসনাথের মন্দির এবং মামল্লপুরমের 'সপ্ত প্যাগোডা' পল্লবযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যকে ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে চিরন্তন করিয়া রাখিয়াছে। শুধু দাক্ষিণাত্যে নহে বহির্ভারতে যবদ্বীপ, কম্বোজ, আসাম প্রভৃতি স্থানেও পল্লব-শিল্পরীতির অনুকরণে বহু মন্দির ও মূর্তি নির্মিত হইয়াছিল। পল্লব-স্থাপত্যরীতি পরবর্তী যুগে চালুক্যগণ কর্তৃক অনুসৃত হয় ও চোলগণ ইহার সম্পূর্ণতা সাধন করে।

চোল সাম্রাজ্য :—চোলগণ অতি প্রাচীন জাতি। কাত্যায়নের গ্রন্থে ইহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। অশোকের রাজত্বকালে চোলরাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রত্যন্তসীমায়

অবস্থিত ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে চোলগণের বাণিজ্যতরণী বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া সুদূর দেশে যাতায়াত করিত বলিয়া জানা যায়। এই সময়ে কারিকাল নামে এক রাজার নাম জানা যায়। ইনি চের ও পাণ্ড্যদের বিরুদ্ধে সমরাভিযান করেন। সিংহল পর্যন্ত তাঁহার অভিযান বিস্তৃত হয়। খৃষ্টীয় তৃতীয় হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত চোলরাজ্য

কারিকাল
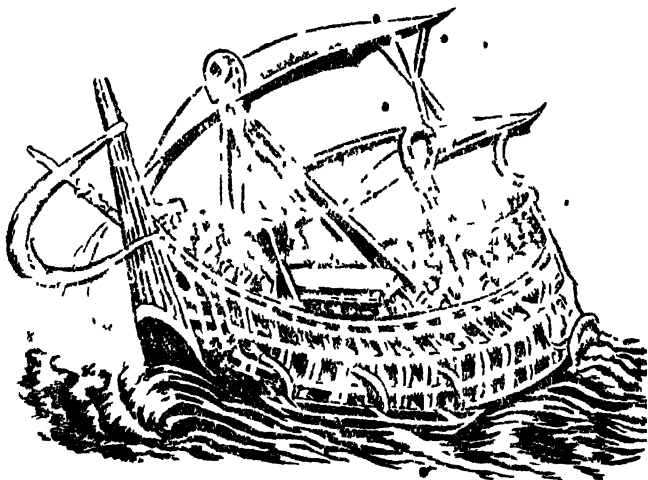
প্রাচীন বাণিজ্য তরী

শাসনাধীনে ছিল। ৭৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে পল্লবগণ হীনবল হইতে আরম্ভ করিলে চোলগণ দাক্ষিণাত্যে পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। নবম শতাব্দীর শেষভাগে চোলরাজ বিজয়ালয় পল্লবগণকে পরাজিত করিয়া তাঞ্জোর অধিকার করেন এবং তাঁহার পুত্র আদিত্য শেষ পল্লব নরপতি অপরাজিতকে পরাস্ত করিয়া পল্লবশক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট করেন। দশম শতাব্দীতে চোলনৃপতি পরান্তক পাণ্ড্যরাজকে পরাস্ত করিয়া পাণ্ড্য রাজধানী মাদুরা অধিকার করেন এবং চোল-শক্তিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিজয়ালয়

চোলদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন মহান রাজরাজ। তিনি একজন দিগ্বিজয়ী নরপতি ছিলেন। তিনি কেরল নৌ বাহিনীকে পরাস্ত করেন এবং বেঙ্গী, কুর্গ, কুইলন, কলিঙ্গ এবং সিংহল স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। বর্তমান মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সী, মহীশূর এবং সিংহলের উত্তরাংশ

রাজরাজ

তাঁহার অধিকারে ছিল। রাজরাজ তাঞ্জোরের বিখ্যাত রাজরাজেশ্বরের মন্দির নির্মাণ করেন। রাজরাজের পুত্র রাজেন্দ্রচোলদেবের সময়ে চোল সাম্রাজ্যের গৌরব সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল।

রাজেন্দ্রচোলদেব

তিনি বিশাল চোল নৌ-বাহিনীর সাহায্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশের পেগু ও কয়েকটি বন্দর অধিকার করেন। তিনি শ্রীবিজয় ও যবদ্বীপের নৃপতি শৈলেন্দ্র-বংশীয় চূড়ামণিবর্মণের পুত্র সংগ্রাম বিজয়োত্তুঙ্গকে পরাজিত করেন। রাজেন্দ্রচোলদেব মহীশূরের গঙ্গবংশ ধ্বংস করেন এবং বঙ্গাধিপ মহীপালকে পরাজিত করিয়া 'গঙ্গৈকোণ্ড' (গঙ্গাবিজয়ী) উপাধি ধারণ করেন। রাজেন্দ্রচোলের পুত্র রাজাধিরাজও বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। তাঁহার পরে কয়েকজন দুর্বল নরপতি চোলরাজ্য শাসন করেন। চোলদের পরবর্তী রাজাদের মধ্যে রাজেন্দ্র কুলোত্তুঙ্গ সর্বোপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নরপতি ছিলেন। রাজেন্দ্র কুলোত্তুঙ্গের পরে বংশের ছয়জন নরপতি শাসন করেন। উত্তরে হোয়সল ও দক্ষিণে পাণ্ড্যগণের আক্রমণে চোলরাজ্য ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়ে। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের আবির্ভাবে চোল-রাজ্য বিলুপ্ত হয়।

রাজাধিরাজ

রাজেন্দ্র কুলোত্তুঙ্গ

চোলদের শাসনব্যবস্থা :—দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহের মধ্যে চোলদের শাসন-পদ্ধতি সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। চোলশাসনের নিম্নতম সমষ্টির নাম ছিল কুর্রম। এই কুররম কয়েকটি গ্রামের সমবায়ে গঠিত হইত। কয়েকটি কুর্রমের সমবায়ে একটি নাড়ু বা জিলা, কয়েকটি নাড়ুর সমবায়ে একটি কোট্টম বা বিভাগ, এবং কয়েকটি কোট্টমের সমবায়ে একটি মণ্ডলম্ বা প্রদেশ গঠিত ছিল। চোলসাম্রাজ্যে ছয়টি মণ্ডলম্ বা প্রদেশ ছিল এবং সাধারণতঃ রাজবংশ হইতে নির্বাচিত রাজপ্রতিনিধি দ্বারা এই সকল প্রদেশ শাসিত হইত। সুশাসনের প্রতি চোলনৃপতিগণের প্রখর দৃষ্টি ছিল।

চোলমণ্ডলম্

চোল শাসনপদ্ধতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনবিধির। নির্বাচন বা লটারির দ্বারা গৃহীত এক প্রতিনিধি সভার হস্তে স্থানীয় শাসন ন্যস্ত থাকিত। প্রত্যেক কুর্রমের একটি করিয়া 'মহাসভা' নামে প্রতিনিধি পরিষদ ছিল। কুর্রমের অন্তর্গত সমস্ত গ্রামের প্রতিনিধি দ্বারা এই মহাসভা গঠিত। এই মহাসভার হস্তে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকিত। বহুস্থলে উক্ত মহাসভা শাসনের সুবিধার জন্য কয়েকটি কমিটিতে বিভক্ত হইত। এই সকল কমিটির তত্ত্বাবধানে স্থানীয় রাজস্ব সংগ্রহ, জলাশয় ইত্যাদির সংরক্ষণ, বিচারকার্য্যের বন্দোবস্ত প্রভৃতি হইত।

গ্রাম্য মহাসভা

প্রাণদণ্ড বিধানের অধিকারও ইহাদের হস্তে ছিল। এই মহাসভার কার্য্য "অধিকারিণ" নামে সহকারী কর্মচারী দ্বারা পর্য্যবেক্ষিত হইত। অধিকারিগণ মহাসভার হিসাবাদি পরীক্ষা করিতেন এবং রাজকোষ হইতে প্রয়োজনানুরূপ অর্থ মঞ্জুর করিতেন। কর্তব্যচ্যুতির অপরাধে মহাসভার জন্য অর্থদণ্ডের বিধি ছিল। মহাসভা অনেক সময় ব্যাঙ্কের মত অর্থ জমা করিত, সৎকার্য্যাবলীর জন্য প্রদত্ত অর্থ ও সম্পত্তির ন্যাসরক্ষকের কাজ করিত।

ইহার কার্য্যসূচী

চোল শিল্প :—দক্ষিণ ভারতের শিল্পোৎকর্ষে চোলদের দান বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যে চোল শিল্পিগণ আশ্চর্য্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঞ্জোরে রাজরাজ বা শিবমন্দির চোল স্থাপত্যের উৎকৃষ্টতম নিদর্শন। এই মন্দিরের চূড়ায় চৌদ্দটি স্তর আছে এবং মন্দির শীর্ষের গম্বুজটি বিশাল প্রস্তরখণ্ড ক্ষোদিত করিয়া সর্বোচ্চ তলের উপরিভাগে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। এই সুবিশাল প্রস্তরখণ্ড কি উপায়ে মন্দির শীর্ষোপরি উত্তোলিত হইয়াছিল তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়। চোল স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত মন্দির সমূহের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ইহাদের গোপুরম বা প্রবেশদ্বার সমূহ। চোল শিল্পিগণ ধাতুদ্বারা নির্মিত মূর্ত্তিশিল্পেও পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। চোলযুগে নির্মিত ব্রোঞ্জের নটরাজের মূর্তির ভাব ও গঠনকৌশল প্রশংসনীয়। চোল নরপতি রাজেন্দ্র চোল রাজধানী গঙ্গৈকোণ্ডচোলপুরমে সপ্তক্রোশ ব্যাপী দীর্ঘ বিশাল নগর স্থাপন করেন। সূক্ষ্ম কারুকার্য্যশোভিত প্রাসাদ, বিশাল সরোবর এবং প্রস্তর বেদী ছিল এই নগরের বৈশিষ্ট্য।

পাণ্ড্যরাজ্য :—দক্ষিণ ভারতের তামিল রাজ্যগুলির মধ্যে পাণ্ড্যরাজ্য প্রাচীনতম। মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে অনুমিত হয় আর্য্যাবর্তের মথুরা হইতে লোকজন যাইয়া পাণ্ড্য রাজ্য স্থাপন করে। খৃঃ পূঃ ২০ অব্দে জনৈক পাণ্ড্যরাজ রোমক সম্রাট অগাষ্টাস সিজারের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। পেরিপ্লাসের গ্রন্থে ও টলেমীর বিবরণেও পাণ্ড্য রাজ্যের বন্দর সমূহের উল্লেখ আছে। প্রথমে পাণ্ড্যদের রাজধানী ছিল কোরকাই বন্দরে, পরে কয়ালে স্থানান্তরিত হয়। ঐতিহাসিক কালে মাদুরা পাণ্ড্যদের রাজধানী হয় এবং মাদুরায় সঙ্গম বা সাহিত্য পরিষদ সমূহ উচ্চকোটির সাহিত্য সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়। তিরুবল্লভের প্রসিদ্ধ 'কুরাল' এই সঙ্গমের দ্বারা সৃষ্ট হয়।

হিউয়েন সাঙের সময়ে পাণ্ড্যরাজগণ কাঞ্চীর পল্লবগণের অধীন ছিল। তিনি পাণ্ড্যরাজ্যের নাম 'মলয়কেতু' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হিউয়েন সাঙ পাণ্ড্যরাজ্যে বহু হিন্দু মন্দির দেখিয়াছেন এবং পাণ্ড্যরাজ্যের মুক্তা ব্যবসায়ের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।
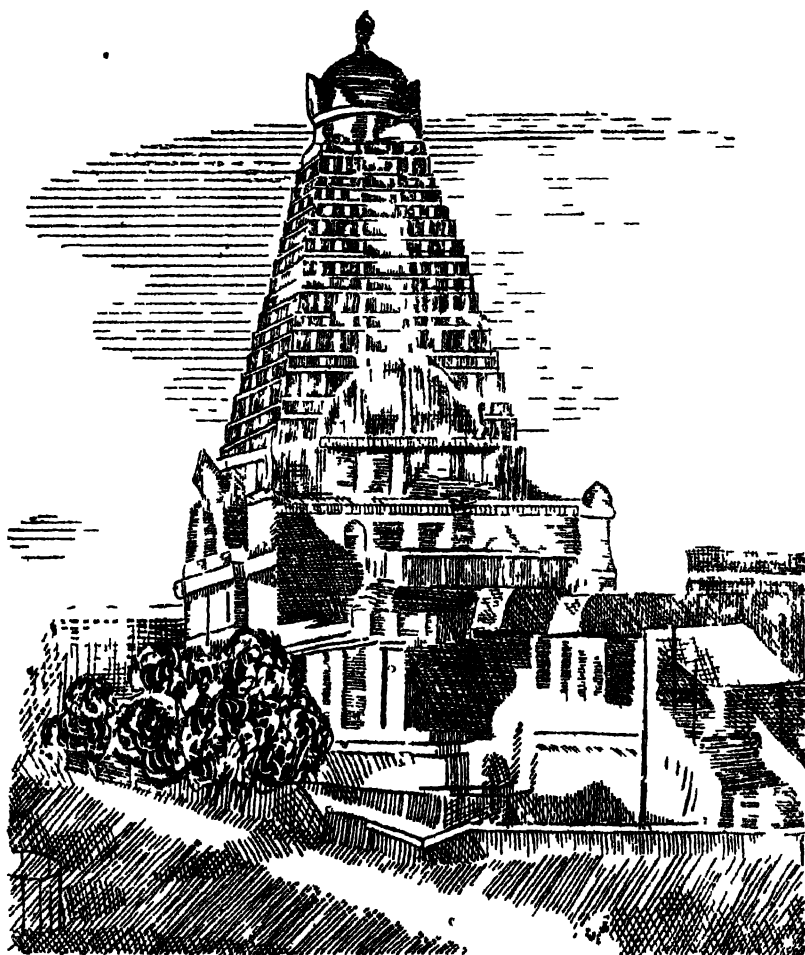
তাঞ্জোরের রাজরাজেশ্বর মন্দির

অষ্টম হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত পাণ্ড্যরাজ্য চোলরাজ্যের প্রভাবাধীন থাকায় ইহার নরপতিগণ নামে মাত্র রাজা ছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর এক পাণ্ড্য নৃপতি অরিকেশরী একজন পল্লবরাজকে পরাস্ত করেন। নবম শতাব্দীতে যড়গুণবর্মণ পল্লব নৃপতি অপরাজিতের হস্তে পরাভূত হয়। দশম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পাণ্ড্যগণকে ক্রমবর্দ্ধমান চোলরাজ্য এবং সিংহলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে। সিংহলরাজ পরাক্রমবাহু ১১১৬ খৃষ্টাব্দে পাণ্ড্যরাজ্য আক্রমণ করেন। চোলবংশ হীনবল হইয়া পড়িলে পাণ্ড্যরাজ্যের পুনরুত্থান ঘটে। ১১০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৬৭ খৃঃ পর্য্যন্ত পাণ্ড্যরাজ্য সতেরো জন নৃপতির দ্বারা শাসিত হয়। ইহাদের মধ্যে জটাবর্মণ সুন্দর (১২৫১—১২৭১ খৃঃ) চোলরাজ্য বিধ্বস্ত করেন এবং কেরলরাজ্য ও সিংহল অধিকার করিয়া পাণ্ড্যদের প্রাধান্য বিস্তার করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইটালীর পর্য্যটক মার্কোপোলো পাণ্ড্যরাজ্য পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার বিবরণে পাণ্ড্যরাজ্যের সমৃদ্ধির কথা পাওয়া যায়। এই সময়ে পাণ্ড্য বন্দরসমূহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশের বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পাণ্ড্যরাজ্য আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর কর্তৃক অধিকৃত হয়।

অরিকেশরী
যড়গুণবর্মণ

উড়িষ্যা :—প্রাচীনকালে উড়িষ্যা কলিঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। গুপ্তযুগের শেষভাগে কলিঙ্গদেশে গঙ্গবংশের রাজগণ রাজত্ব করিত। গঙ্গবংশের একটি শাখা মহীশূর অঞ্চলে এবং অন্য একটি শাখা কলিঙ্গে রাজত্ব করিত। মহীশূরের কলিঙ্গ বংশ পশ্চিম গঙ্গবংশ এবং কলিঙ্গের রাজগণ প্রাচ্যগঙ্গ নামে পরিচিত ছিলেন।

ইন্দ্রবর্মণ প্রাচ্য গঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ প্রায় চারি শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে পূর্ব-চালুক্য ও চোলরাজগণ কর্তৃক কলিঙ্গ রাজ্য বারংবার আক্রান্ত হইয়াছিল। প্রাচ্য গঙ্গবংশের একটি শাখা ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে অনন্তবর্মণ নামক একজন নায়কের অধীনে কলিঙ্গে অধিকার স্থাপন করিয়াছিল। তাঁহার পৌত্র অনন্তবর্মণ চোডগঙ্গ এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। অনন্তবর্মণ দিগ্বিজয়ী নরপতি ছিলেন। তিনি দক্ষিণের চোল নরপতি এবং বঙ্গদেশের পাল বংশের রাজাকে পরাজিত করিয়া গোদাবরী নদীর তীর হইতে গাঙ্গেয় অঞ্চল পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। অনন্তবর্মন সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে সংস্কৃত ও তেলেগু ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির অনন্তবর্মণের রাজত্বকালে নির্মিত হয়। অনন্তবর্মণের

ইন্দ্রবর্মণ
অনন্ত বর্মণ

প্রথম নরসিংহ

কপিলেন্দ্র

পুত্র প্রথম নরসিংহ শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে কোনারকের স্বর্ণমন্দির নির্মিত হয়। নরসিংহবর্মণের পরে চোড়গঙ্গ বংশের দুর্বলতার সুযোগে কপিলেন্দ্র নামে একজন শক্তিশালী ব্যক্তি সিংহাসন অধিকার করেন। কপিলেন্দ্র দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। বিজয়নগরের অন্তর্ভুক্ত উদয়গিরি তিনি স্বরাজ্যভুক্ত করেন। পরবর্তী রাজা পুরুষোত্তম গজপতির রাজত্বকালে উড়িষ্যা রাজ্যের দক্ষিণাংশ তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। পুরুষোত্তম গজপতির পুত্র প্রতাপরুদ্রও শক্তিশালী নরপতি ছিলেন। তিনি মেদিনীপুর হইতে মাদ্রাজের গুন্টুর জেলা পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব প্রতাপরুদ্রের সমসাময়িক ছিলেন। নবপ্রচারিত অহিংস বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে উড়িষ্যা ক্রমশঃ সামরিক শক্তিচর্চায় উদাসীন হইয়া পড়ে। প্রতাপরুদ্রের মন্ত্রী গোবিন্দ এই সুযোগে প্রতাপরুদ্রকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করেন। অত্যল্পকাল পরে বঙ্গদেশের অধিপতি সুলেমান কররাণী উড়িষ্যারাজ্য মুসলমান রাজ্যভুক্ত করেন।

পুরুষোত্তম গজপতি

প্রতাপরুদ্র

মুসলমানদের দ্বারা অধিকৃত

উড়িষ্যা স্থাপত্যশিল্প:—উড়িষ্যার বিভিন্ন রাজবংশ বিভিন্ন শিল্পকলা বিশেষতঃ স্থাপত্য শিল্পের অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত উড়িষ্যায় অজস্র মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। উড়িষ্যার মন্দির-সমূহের মধ্যে ভুবনেশ্বর, পুরী, এবং কোনারকের মন্দিরই স্থাপত্য শিল্পের অত্যাশ্চর্য নিদর্শনরূপে পরিচিত। কেশরীবংশীয় রাজারা ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত লিঙ্গরাজ মন্দির ও মুক্তেশ্বর-মন্দির নির্মাণ করেন। এই দুইটি ব্যতীত ভুবনেশ্বরে আরও অসংখ্য মনোরম মন্দির রহিয়াছে। তন্মধ্যে পরমেশ্বর মন্দির, মুক্তেশ্বর মন্দির ও ব্রাহ্মেশ্বরের মন্দির বিখ্যাত। রাজারাণী মন্দিরের স্থাপত্য রীতি ভুবনেশ্বরের অন্যান্য মন্দির হইতে পৃথক।

ভুবনেশ্বর

ভুবনেশ্বরের বিভিন্ন মন্দির ব্যতীত পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির স্থাপত্যকলার দিক দিয়া বিশেষ দর্শনীয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। বহু ঐতিহাসিকের মতে এই মন্দির প্রথমে বৌদ্ধ মন্দির ছিল—পরবর্তীকালে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া

পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির

উহাকে হিন্দু মন্দিরে পরিণত করা হয়। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজের মন্দিরের মতনই পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের চারিদিকে চারিটি তোরণ।

উড়িষ্যার ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য শিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন কোনারকের সূর্য্যমন্দির। নরপতি নরসিংহবর্মণ এই মন্দিরের পরিকল্পনা করেন। এই মন্দিরের নাটমণ্ডপ আয়তনে বিশাল ও বিচিত্র কারুকার্য্যময়। উপরিতলের সোপানশ্রেণীর দুই পার্শ্বে দুই সিংহ মূর্তি। সবশেষে মন্দিরের পার্শ্বদেশে রহিয়াছে সপ্তাশ্ববাহিত সূর্য্যরথের পরিকল্পনা।

কোনারক

দক্ষিণ ভারতের ধর্ম :—দক্ষিণ-ভারতে আর্য্যধর্ম ও আর্য্য সংস্কৃতি বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র পদ্ধতিতে বিস্তৃত হয়। প্রাক্-মৌর্য্যযুগে দাক্ষিণাত্যের আর্য্যীকরণ অগস্ত্য ঋষি ও রামচন্দ্রের দাক্ষিণাত্য অভিযানের কাহিনীর মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মৌর্য্যযুগে বৌদ্ধ ও জৈন উভয় ধর্মই দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত হয়। কিন্তু খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দী হইতে দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং জৈন ও হিন্দুধর্ম তৎস্থলে প্রাধান্য লাভ করে। ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে শৈব ও বৈষ্ণব মতবাদ জৈন ও বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করে। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা ও হিন্দু প্রচারকগণের আবির্ভাবের ফলে দাক্ষিণাত্যে হিন্দুধর্মের নবজাগরণের উন্মেষ হয়।

দক্ষিণভারতের শৈব প্রচারকগণের মধ্যে তেষট্টিজন বিখ্যাত। তাহারা নাইনার নামে খ্যাত। তাঁহাদের মধ্যে অপ্পর, তিরুজ্ঞানসম্বন্দর, সুন্দর মূর্তি ও মানিক্ক ভাসগর বিখ্যাত। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব ধর্মসাধকগণ সাধারণতঃ আলভার নামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যে কর্ম কুলশেখর এবং শ্রীমতী গোদা (অন্দল) বিখ্যাত। এই সময়ে কয়েকজন দক্ষিণ-ভারতীয় ধর্মপ্রচারক কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য, রামানুজ, এবং বসব সর্বভারতীয় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম

কুমারিলভট্ট সপ্তম শতকে দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে বৈদিক ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন। শঙ্করাচার্য্য অষ্টম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের মালাবার প্রদেশে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি গীতা ও উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহার মতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই। শঙ্করাচার্য্যের এই মতবাদ অদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। তিনি ধর্ম-প্রচারের জন্য ভারতবর্ষের অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন এবং ধর্মপ্রচারের জন্য ভারতের দক্ষিণ মহীশূরে শৃঙ্গেরী মঠ, উত্তরে বদরিকাশ্রমের যোশীমঠ, পূর্বে পুরীতে গোবর্দ্ধন মঠ

কুমারিল ভট্ট

শঙ্করাচার্য্য

এবং পশ্চিমে দ্বারকায় সারদামঠ প্রতিষ্ঠা করেন। মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে শঙ্করাচার্য্য দেহত্যাগ করেন। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় রামানুজ বৈষ্ণবধর্মের একনিষ্ঠ প্রচারক ছিলেন। তিনি একাদশ শতাব্দীতে মাদ্রাজের শ্রীপেরুম্বুদুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় তিনিও উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেন। কিন্তু রামানুজ অদ্বৈতবাদী ছিলেন না। তাঁহার মতে ব্রহ্ম এবং জগৎ উভয়ই সত্য, জগৎ ব্রহ্মের অংশমাত্র। তাঁহার মতবাদ বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ নামে খ্যাত। তাঁহার মতবাদ অনুসারে ভক্তি ও জীবে দয়া মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। পরবর্তীকালের শৈব প্রচারকদের মধ্যে বসব সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি বিজাপুরের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শিষ্যগণ বীরশৈব বা লিঙ্গায়েৎ নামে খ্যাত। শিবলিঙ্গের উপাসনাই লিঙ্গায়েৎ ধর্মের প্রধান অঙ্গ। বীরশৈবগণ বেদের প্রাধান্য, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং কঠোর জাতিভেদ প্রথা স্বীকার করেন না।

রামানুজ

বসব

প্রশ্নোত্তর

1. **Write a short history of the Chalukyas of Badami.**

বাদামীর চালুক্যবংশের ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

উত্তর সূত্র: (১) চালুক্যগণ জাতিতে রাজপুত এবং সম্ভবতঃ হুণ-গুর্জর প্রভৃতি বৈদেশিক জাতি হইতে উদ্ভূত। প্রতিষ্ঠাতা প্রথম পুলকেশী ৫৫০ খৃষ্টাব্দে বাতাপি নগরে চালুক্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

(২) কীর্তিবর্মণ ও মঙ্গলেশ চালুক্য সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন।

(৩) দ্বিতীয় পুলকেশী (৬০৯—৬৪২ খৃঃ) বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি—সাম্রাজ্যসীমা উত্তর-পশ্চিমে মহারাষ্ট্র এবং দক্ষিণে নর্মদা হইতে কাবেরী পর্য্যন্ত - তাঁহার দিগ্বিজয়—হর্ষবর্দ্ধন পরাজিত—পারস্যরাজের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন—হিউয়েন সাঙ এর বিবরণী হইতে তাঁহার কার্য্যাবলীর কথা—কাঞ্চীরাজ পল্লবরাজ নরসিংহ বর্মণের দ্বারা পরাজিত ও নিহত।

(৪) পরবর্তী নৃপতিগণ: প্রথম বিক্রমাদিত্য পল্লবরাজ নরসিংহবর্মণকে পরাজিত করেন। অতঃপর বিনয়াদিত্য ও বিজয়াদিত্য ও দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য নরপতি। এই বংশের শেষ নরপতি দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণের সময়ে রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গ ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে চালুক্যরাজ্য অধিকার করেন।

(৫) চালুক্য বংশের বৈশিষ্ট্য:—ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক—দাক্ষিণাত্যে বহু সুন্দর সুন্দর হিন্দুমন্দির নির্মিত হয় - মহারাষ্ট্রে জৈনধর্মের প্রসার।

2. Give a brief account of the rise and fall of the Chola Kingdom.

চোলরাজ্যের উত্থান ও পতনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তর সূত্র : (১৫১—১৫৩ পৃষ্ঠা) ।

3. Write a note on the Pallava art and the Chola administration

পল্লব শিল্প ও চোল শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে বিবরণ দাও।

উত্তর সূত্র : (১) পল্লব শিল্প (১৫০ পৃষ্ঠা)

(২) চোল-শাসনপদ্ধতি (১৫৯ পৃষ্ঠা)

4. Write an account of the religions and religious preachers of the South.

দাক্ষিণাত্যের ধর্ম ও ধর্মপ্রচারকদের সম্বন্ধে বিবরণ দাও।

উত্তর সূত্র : (১৫৬ পৃষ্ঠা)

5. Write what you know about the Kingdom of Orissa till its conquest by the Muslims.

মুসলিম অধিকারের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত উড়িষ্যা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

উত্তর সূত্র : (১৫৪—১৫৫)

6. Write notes on : (1) Pulakeshi II, (2) Mahendravarman (3) Sankaracharya (4) Govinda III.

সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :—(১) দ্বিতীয় পুলকেশী (২) মহেন্দ্রবর্মণ (৩) শঙ্করাচার্য্য (৪) তৃতীয় গোবিন্দ।

উত্তর সূত্র : (১) দ্বিতীয় পুলকেশী (১৪৭ পৃষ্ঠা)

(২) মহেন্দ্রবর্মণ (খৃঃ ৬০০—৬২৫) : কাঞ্চীর পল্লববংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি এবং সমগ্র ভারতের শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের অন্যতম। সর্বতোমুখী প্রতিভার জন্য দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রগুপ্ত বলিয়া পরিচিত। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষণ বিচিত্রচিত্ত অপ্রযুক্ত হয় নাই—এই দিক দিয়া সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে তুলনীয়। মত্তবিলাস নামক প্রহসনের রচয়িতা—সঙ্গীত শাস্ত্রেও তাঁহার অধিকার ছিল। স্থাপত্য ও পূর্ত্তকার্য্যে তাঁহার আগ্রহ ছিল—(৩) শঙ্করাচার্য্য (১৫৮ পৃঃ) (৪) তৃতীয় গোবিন্দ (১৪৯ পৃঃ)

একাদশ অধ্যায়

পাল ও সেন বংশের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ

Beng.l under the Palas and the Senas :—Growth of the Pala Powers.—Monghyr Grant—Nalanda Copper Plate—Gwalior Inscriptions of Bhoja. Local dynasties emerge during Mahipala II's rule. Rajendra Chola's Invasion : Kalachuri invasion. Rise of indegenous Chieftains—Kaivarta rebellion—Rampala Buddhist revival—Uddandapura and Vikramasila—mission of Dipankara, Chakrapani and Sandhyakara, Dhiman and Bitapala—Buddhist Tantric religion and practices—tolerance in religion of Pala Kings—terracota figures at Paharpur.

The Senas—Brahmanical revival—glory of Bikramapur. Ballal Sena and Kulinism. Lakshmana Sena reduces Kamarupa, Jayadeva and Dhoyi. Moslem conquest of West and North Bengal.

পাল ও সেনবংশের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ : পালশক্তির অভ্যুত্থান—মুঙ্গের ও নালন্দার তাম্রশাসন। গোয়ালিয়রে প্রাপ্ত রাজভোজের লিপি। মহীপালের সমসাময়িক স্থানীয় রাজবংশ। রাজেন্দ্র চোলের বঙ্গাভিযান। স্থানীয় সামন্তদের অভ্যুত্থান—কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ—রামপাল।

বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থান—উদ্দণ্ডপুর ও বিক্রমশিলা—দীপঙ্করের ধর্মপ্রচার। চক্রপাণি, সন্ধ্যাকর নন্দী, ধীমান ও বিটপাল—বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা, ধর্ম ও আচার। পালবংশের ধর্মে উদারতা—পাহাড়পুরের মৃৎশিল্প।

সেনবংশ—ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থান—বিক্রমপুরের ঐতিহ্য। বল্লালসেন ও কৌলিন্য। লক্ষ্মণসেনের কামরূপ বিজয়। জয়দেব ও ধোয়ী। মুসলমানের হস্তে পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ বিজয়।

পালবংশের অভ্যুদয়ের প্রাক্কাল পর্যন্ত বঙ্গদেশের ইতিহাস :—গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে বঙ্গদেশে ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেব নামে তিনজন

স্থানীয় নরপতির নাম জানা যায়। ৫৫৪ খৃষ্টাব্দের কিছুকাল পূর্বে গৌড়ের সঙ্গে মৌখরীরাজ ঈশানবর্মণের তীব্র সংঘর্ষ হয় এবং ঈশানবর্মণ গৌড়জনকে সমুদ্রাশ্রয়ী করিতে বাধ্য করেন। সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্ক প্রবল পরাক্রমে বঙ্গদেশ শাসন করেন। শশাঙ্ক মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। মহাসামন্তরূপে জীবন আরম্ভ করিয়া শশাঙ্ক গৌড়ের স্বাধীন নরপতিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। উত্তর ভারতের আধিপত্য লইয়া পালরাজ ধর্মপাল ও দেবপালের আমলে গৌড়-কনৌজের যে সুদীর্ঘ সংগ্রাম পরবর্তীকালের বাংলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত করিয়াছিল শশাঙ্ক তাহারই সূচনা করেন। শশাঙ্ক কনৌজ-থানেশ্বর কামরূপ মৈত্রীর বিরুদ্ধে সার্থক সংগ্রামে লিপ্ত হন এবং উত্তরাপথের অধীশ্বর হর্ষবর্ধনের ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মার মিলিত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শশাঙ্ক যে সগৌরবে ৬১৭ খৃঃ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য সমাচারদেব

শশাঙ্ক

সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে সম্ভবতঃ মগধের 'পরবর্তী গুপ্তগণ'ও খড়্গ বংশ বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজত্ব করিত। অষ্টম শতাব্দীতে কনৌজ-রাজ যশোবর্মণ মগধ গৌড় বঙ্গ জয় করিয়া গৌড়রাজকে নিহত করেন। যশোবর্মণ কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য মুক্তা-পীড়ের হস্তে পরাজিত হইলে গৌড় সম্ভবতঃ কিছুদিনের জন্য কাশ্মীরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। এই সময়ে বঙ্গদেশ সম্ভবতঃ চন্দ্রবংশের করায়ত্ত ছিল। এই বংশের শেষ দুইজন নরপতি গোবিন্দচন্দ্র ও ললিতচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়।

পরবর্তী গুপ্তবংশ
খড়্গ বংশ
যশোবর্মণ
ললিতাদিত্য
চন্দ্রবংশ

'মাৎস্যন্যায়' ও পালবংশের অভ্যুদয় :— অষ্টম শতাব্দীতে বারংবার বিদেশীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় গৌড়বাসিগণ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বাংলাদেশের এই ব্যাপক অরাজকতা ও অব্যবস্থাকে 'মাৎস্য ন্যায়' বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। জলের মধ্যে বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে খাইয়া ফেলে অনুরূপ দেশে কোন দৃঢ় শাসনব্যবস্থা না থাকিলে শক্তিশালী দুর্বলের উপরে অত্যাচার করে। প্রায় এক-শতাব্দীকাল এইরূপ অরাজকতা চলিবার পর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে বাংলার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। গোপাল সম্ভবতঃ রণনীতি-কুশল ছিলেন এবং সুশাসনের দ্বারা বঙ্গদেশে শান্তি ও রাজনৈতিক ঐক্য আনিতে সমর্থ

গোপাল

হইয়াছিলেন। পালরাজগণ বিভিন্ন শাসনলিপিতে বঙ্গপতি ও গৌড়েশ্বর নামে অভিহিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা উভয়বঙ্গের অধীশ্বর ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গোপালের সিংহাসনারোহণের সময় সঠিক জানা না গেলেও ৭৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার মোটামুটি প্রমাণ রহিয়াছে। মুঙ্গেরে দেবপালের ও নালন্দায় ধর্মপাল ও দেবপালের কয়েকটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে; সেইগুলি হইতে পালবংশ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। গোয়ালিয়রে প্রাপ্ত গুর্জর প্রতিহার নরপতি ভোজের তাম্রলিপিটিও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খৃঃ) :—গোপালের পুত্র ধর্মপাল পালবংশের অন্যতম নরপতি ছিলেন। ধর্মপালের রাজত্বকালে গুর্জরপ্রতিহার-রাষ্ট্রকূট-পালবংশে বংশ-পরম্পরাবলম্বিত এক তুমুল 'ত্রিকোণ' সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল। এই যুগে উত্তর ভারতের আধিপত্যের প্রতীক ছিল কনৌজ-রাজলক্ষ্মী বা মহোদয়শ্রীর অধিকার। প্রথমে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল গুর্জর-প্রতিহাররাজ বৎসরাজের সহিত ধর্মপালের। ধর্মপাল পরাজিত হইলেন কিন্তু সম্পূর্ণ পর্য্যুদস্ত হওয়ার পূর্বেই দক্ষিণ হইতে রাষ্ট্র-কূটরাজ ধ্রুব একেবারে ঝড়ের বেগে আসিয়া প্রথমে বৎসরাজ এবং পরে ধর্মপাল উভয়কে পরাজিত করিলেন। গুর্জররাজ বৎসরাজ রাজপুতনার মরুভূমিতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ধ্রুব বিজয়-অভিযান সমাপ্ত করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করিলে ধর্মপালের সাম্রাজ্যবিস্তারে আর কোন অসুবিধা রহিল না; ধর্মপাল অবাধ রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। খালিমপুর তাম্রশাসন হইতে জানা যায় ধর্মপাল কনৌজ আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করেন এবং কনৌজের সিংহাসন হইতে ইন্দ্রায়ুধকে বিতাড়িত করিয়া স্বীয় মনোনীত চক্রায়ুধকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ধর্মপাল ভোজ (বেরার), মৎস্য (রাজপুতনার অংশবিশেষ), মদ্র (মধ্য পাঞ্জাব), কুরু (পূর্ব পাঞ্জাব), যদু (সম্ভবতঃ পাঞ্জাবের যদুপুর), যবন (সীমান্তের কোন আরব রাষ্ট্র), অবন্তী (মালব), গান্ধার (পশ্চিম পাঞ্জাব), ও কীর (পাঞ্জাবের কাংড়া জেলা) রাজ্য জয় করেন। উত্তর ভারতের সত্তর জন (মতান্তরে একশত) সামন্ত নরপতি কনৌজে উপস্থিত হইয়া ধর্মপালকে সম্রাটরূপে স্বীকার করেন। তিনি 'পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর' এবং 'বিক্রমশীল' উপাধি গ্রহণ করেন। নালন্দায় প্রাপ্ত দেবপালের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে ধর্মপালের সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া উল্লিখিত তাম্র-শাসনে দাবি করা হইয়াছে। নেপালের কোন কোন রাজা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার

ধর্মপালের দিগ্বিজয় ও রাজ্যসীমা

করিয়াছিল। ধর্মপালের উত্তর ভারতের এই একাধিপত্যের গৌরব দীর্ঘকাল থাকে নাই। গুর্জর-প্রতিহাররাজ বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধের জন্য অগ্রসর হইলেন। দ্বিতীয় নাগভট কনৌজের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ধর্মপালের আশ্রিত চক্রায়ুধকে বিতাড়িত করিলেন। দ্বিতীয় নাগভট চক্রায়ুধ ও ধর্ম-পালকে মুঙ্গেরের নিকট যুদ্ধে পরাজিত করিলেন কিন্তু এবারেও দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ আসিয়া দ্বিতীয় নাগভটকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করিয়া দিলেন। দ্বিতীয় নাগভটের পরাজয়ের ফলে ধর্মপালের সাম্রাজ্যের সম্ভবতঃ কোন ক্ষতি হয় নাই। মৃত্যুর পূর্ব পর্য্যন্ত উত্তর ভারতে ধর্মপালের একাধিপত্য যে অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বর্তমান ভাগলপুর জেলায় বিক্রমশিলা বৌদ্ধবিহার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিক্রমশিলায় ছয়টি মহাবিদ্যালয়ে মোট ১১৪ জন অধ্যাপক অধ্যাপনা করিতেন। রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত সোমপুর বিহারও ধর্মপালের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইহাও অনেকের ধারণা। তিনি বিহারের উদ্দণ্ডপুরেও (ওদন্তপুর) একটি বিশাল বৌদ্ধবিহার স্থাপন করিয়াছিলেন: ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মে অনুরাগী হইলেও অন্য ধর্মমতের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন না। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী গর্গ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বিক্রমশিলা

সোমপুর

দেবপাল (৮১০—৮৫২ খৃঃ)—ধর্মপালের পরে পুত্র দেবপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। দেবপাল পিতার ন্যায় পাল সাম্রাজ্যের বিস্তার সাধন করিয়াছিলেন। লিপিমালার সাক্ষ্যে জানা যায় হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্য্যন্ত এবং পূর্ব হইতে পশ্চিম সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত দেবপালের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল; হূণ-উৎকল-দ্রাবিড়-গুর্জরনাথদের দর্প খর্ব করিয়া তিনি সমুদ্রমেখলা রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ের জন্য তিনি উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজ এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। লিপিমালার উক্তিতে আতিশয্য থাকিলেও ইহা নিঃসন্দেহ যে দেবপালের সময়েই পাল সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। নালন্দার তাম্রপাত হইতে জানা যায় তাঁহার রাজত্বকালে সুবর্ণদ্বীপ বা সুমাত্রার অধিপতি শৈলেন্দ্রবংশীয় বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং দেবপাল উহার ব্যয় নির্বাহার্থে পাঁচটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। দেবপালের রাজত্বকালীন মুঙ্গেরের দানপত্রও উল্লেখযোগ্য। এই দানপত্রের মধ্যে উল্লেখ আছে যে,

নালন্দার তাম্রপাত

দেবপাল শ্রীনগরভুক্তি (বর্ত্তমানে পাটনার অন্তর্ভুক্ত) ক্রিমিল বিষয়ে (জেলা) মেষিক নামক গ্রাম ভট্টপ্রবর মিশ্রকে তাঁহার তেত্রিশ বৎসর রাজত্বকালে দান করিয়াছিলেন।

মুঙ্গেরের তাম্রপাত

গুর্জর প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্টের পৌত্র ভোজদেব গোয়ালিয়র শিলা-লিপিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি শক্তিশালী বঙ্গবাসীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। অবশ্য এই বিজয় স্বল্পস্থায়ী ছিল। সম্ভবতঃ মুঙ্গের দেবপালের রাজধানী ছিল।

পালবংশের অবনতি :—দেবপালের মৃত্যুর পরে পালবংশের অবনতি দেখা যায়। দেবপালের মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিগ্রহপাল এবং বিগ্রহপালের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র নারায়ণপাল রাজা হন। এই সময়ে গুর্জর প্রতিহারগণ মিহির ভোজ এবং তৎপুত্র মহেন্দ্রপালের রাজত্বকালে প্রবল হইয়া উঠে। নারায়ণপাল মিহির ভোজ ও মহেন্দ্রপালের নিকট পরাজিত হন এবং সম্ভবতঃ তিনি রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম আমোঘবর্ষের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন। মগধ ও উত্তরবঙ্গ নারায়ণপালের হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিল ইহা নিঃসন্দেহ। উড়িষ্যার শুল্কিরাজ রণস্তম্ভ, কলচুরিরাজ ও গুহিলোটরাজ সকলেই পালবংশের দুর্বলতার সুযোগে পালসাম্রাজ্যের অংশবিশেষ অধিকার করেন। অধিকন্তু উত্তর পশ্চিম সীমান্ত বা তিব্বত হইতে কম্বোজ নামে একটি জাতি আসিয়া কিছুকালের জন্য পালরাজ্যের কিয়দংশ করায়ত্ত করিয়া গৌড়পতি উপাধি ধারণ করে।

প্রথম মহীপাল (৯৮৮—১০৩৮ খৃঃ) :—দশম শতাব্দীর শেষভাগে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপালের সময়ে বাংলার পূর্ব গৌরবের পুনরুদ্ধার হয়। মহীপাল উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গের একাংশ, পশ্চিমবঙ্গের একাংশ এবং উত্তর ও দক্ষিণ বিহারে পাল আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ১০২১—২৩ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের পরাক্রান্ত রাজেন্দ্র চোল দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের রণশূর নামক এক রাজা এবং গোবিন্দচন্দ্র নামক পূর্ববঙ্গের জনৈক নরপতির বিরুদ্ধে অভিযান করেন। কিন্তু চোলরাজের এই বিজয় স্থায়ী হয় নাই। চোল আক্রমণে বাংলার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়া মনে হয়, কিন্তু গৌড়ের কেন্দ্রস্থ রাজশক্তি তেমন প্রবল রহিল না। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট, চালুক্য এবং মধ্যভারতের কলচুরিগণের সহিতও সম্ভবতঃ মহীপালের সংঘর্ষ হইয়াছিল।

কেন্দ্রশক্তির দুর্বলতা ও ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব

ইতিমধ্যে বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কতকগুলি স্বাধীন বা অর্দ্ধ-স্বাধীন রাজ্যের

উদ্ভব হয়। ইহাদের মধ্যে শূরবংশ এবং চন্দ্রবংশ উল্লেখযোগ্য। শূরবংশের রাজা আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ বঙ্গদেশে আনয়ন করেন বলিয়া যে জনশ্রুতি আছে, তাহা সমসাময়িক কোন লিখিত প্রমাণের অভাবে ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করা চলে না।

আদিশূরের জনশ্রুতি

পরবর্তী পালরাজগণ :—প্রথম মহীপালের পরে তাহার পুত্র জয়পাল এবং পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল বাংলার অধিপতি হন। ইহাদের রাজত্বকালে চেদিরাজ কর্ণ পালসাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধের সময়ে বিখ্যাত বৌদ্ধ অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান দুই বিবদমান রাজ্যের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করেন বলিয়া এক কিংবদন্তী তিব্বতে প্রচলিত আছে। দুই রাজ্যের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইলে রাজা তৃতীয় বিগ্রহপাল চেদী রাজকন্যা যৌবনশ্রীর পাণিগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রকূট বংশীয়া এক রাজকুমারী তৃতীয় বিগ্রহপালের অন্যতমা মহিষী ছিলেন। তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন পুত্র ছিল - দ্বিতীয় মহীপাল, সুরপাল ও রামপাল।

তৃতীয় বিগ্রহপাল

দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে (১০৭০—৭৫ খৃঃ) কৈবর্ত্ত জাতীয় দিব্য বা দিব্বোকের নেতৃত্বে বঙ্গের উত্তর-অঞ্চলের প্রজাগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধে দ্বিতীয় মহীপাল পরাজিত ও নিহত হইলে দিব্বোক উত্তরবঙ্গের শাসনভার গ্রহণ করেন। দিব্বোকের পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম উত্তরবঙ্গের নরপতি হন। মহীপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপাল ভীমকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বঙ্গেন্দ্রীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যে এই ঐতিহাসিক বিপ্লব ও রামপালের জীবনী বিবৃত আছে।

কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ : দিব্য বা দিব্বোক

রামপাল

রামপালের পরে পুত্র কুমারপাল, পৌত্র তৃতীয় গোপাল ও অন্য এক পুত্র মদনপাল ক্রমান্বয়ে বঙ্গের অধিপতি হন। কিন্তু ইহাদের দুর্বলতার জন্য পালবংশের দুর্দিন উপস্থিত হয়। দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট হইতে আগত সেন পরিবারের বিজয়সেনের হস্তে পালবংশের বিলুপ্তি ঘটে। বাংলায় সেন বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

পালবংশের অবসান

পালবংশের কৃতিত্ব :—পালবংশের পৌণে চার শতাব্দীর রাজত্বকাল ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক গৌরবময় যুগ। পালরাজগণ বঙ্গদেশকে মাৎস্যন্যায়ের প্লাবন হইতে উদ্ধার করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বঙ্গদেশকে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের পদে স্থাপিত করিয়া সুদীর্ঘকাল পরিচালিত করেন। হর্ষবর্দ্ধনের পরে পালবংশই আর্য্যাবর্ত্তে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী শেষ রাজবংশ। মৌর্য্য ও

গুপ্তবংশের মত পালবংশ পাটলীপুত্র নগর হইতে রাজকীয় শাসন ঘোষণা করিতেন এবং মৌর্য্য ও গুপ্তদের ন্যায় বহির্ভারতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। পাল নরপতি দেবপালের বিজয়বাহিনী উত্তরে কম্বোজ, তিব্বত ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। সুবর্ণদ্বীপ বা সুমাত্রার অধিপতি শ্রীবালপুত্রদেবের সঙ্গেও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল।

বাংলার সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি

পালবংশের সময় বঙ্গদেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি ছিল। লোকের অভাব অভিযোগ কম ছিল। রাজদরবারে জ্ঞানী ও গুণীর যথেষ্ট সমাদর ছিল—বিদেশেও বাঙ্গালী সর্বত্র সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিতেন। দেশের এই সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধির পরিচয় সমসাময়িক বাঙ্গালীর ধর্মে, কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে ও স্থাপত্যের মধ্যে রহিয়াছে।

চক্রপাণি ঃ—পালবংশের রাজত্বকালে চক্রপাণি দত্ত নামে একজন ভেষজবিশারদ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক চরক রচিত চরকসংহিতার ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন।

ধীমান ও বীতপাল ঃ দেবপালের রাজত্বকালে বাংলায় ধীমান ও বীতপাল নামে দুইজন তক্ষণ শিল্পীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহারা প্রস্তরের মূর্তিনির্মাণে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের নির্মিত প্রস্তরের প্রতিমূর্তিসমূহ যেন জীবন্ত বলিয়া দর্শকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিত। ধীমান ছিলেন পিতা এবং বীতপাল ছিলেন পুত্র। ইহাদের অনুসৃত শিল্পরীতি চীন, জাপান, নেপাল ও তিব্বতের প্রস্তর তক্ষণ-রীতিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছিল।

বাংলায় সেনরাজবংশের আধিপত্য ঃ—পালবংশ হীনবল হইয়া পড়িলে বাংলায় সেনবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেন রাজারা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী ছিলেন। সেনগণ দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট হইতে আগত ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন, রাজ্যলাভের পরে তাঁহারা ক্ষত্রিয়রূপে পরিচিত হন। একাদশ শতাব্দীতে **সামন্তসেন** ও তাঁহার পুত্র **হেমন্তসেন** বাংলায় সেনবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু এই বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হেমন্তসেনের পুত্র **বিজয়সেন** (১০৯৫-১১৫৮ খৃঃ)। বিজয়সেন শূররাজবংশের কন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহ করিয়া সেনবংশের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। দেওপাড়া লিপিতে জানা যায় বিজয়সেন গৌড়, কামরূপ এবং কলিঙ্গরাজ এবং বীর, নান্য, রাঘব এবং বর্দ্ধন নামে কয়েকজন সামন্ত নরপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। বিজয়সেন

সামন্তসেন

হেমন্তসেন

বিজয়সেন

বর্মণবংশীয় নরপতিদের হস্ত হইতে (পূর্ব) বঙ্গও কাড়িয়া লইয়াছিলেন। যে গৌড়পতিকে বিজয়সেন পরাজিত করিয়াছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ পালনৃপতি মদনপাল ছিলেন। বিজয়সেনের রাজত্বকালের শান্তি ও সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় সমসাময়িক কবি উমাপতিধরের রচনায়।

বিজয়সেনের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র **বল্লালসেন** (১১৫৮-১১৭৯ খৃঃ) রাজা হন। বল্লালসেন হিন্দুসমাজের কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তকরূপে বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসে স্মরণীয়। বাংলায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে তিনি কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

বল্লালসেন

বল্লালসেন মগধ ও মিথিলার বিরুদ্ধে বিজয় অভিযান করিয়াছিলেন বলিয়া বল্লাল-চরিত গ্রন্থে ইঙ্গিত রহিয়াছে। ইহা সত্য হইলে বল্লালসেনের সময়ে বঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্রী এবং মিথিলা সেনরাজ্যভুক্ত ছিল; আর ছিল বাগড়ী বা সুন্দরবন মেদিনীপুর অঞ্চল। বল্লালসেন দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর নামক দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বল্লালসেনের পুত্র **লক্ষ্মণসেন** (১১৭৯-১২০৫) বাংলার শেষ পরাক্রান্ত স্বাধীন নরপতি। তিনি কনৌজের গাহড়বাল বংশীয় রাজাকে পরাজিত করিয়া পশ্চিমে প্রয়াগ পর্য্যন্ত সেনরাজ্য বিস্তৃত করেন। তাঁহার পুত্রদের লিপিতে বলা হইয়াছে যে, লক্ষ্মণসেন পুরী, বারানসী ও প্রয়াগে বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করেন। লক্ষ্মণসেন নিজেও সুকবি ছিলেন এবং গীতগোবিন্দ রচয়িতা জয়দেব, ধোয়ী, হলায়ুধ, উমাপতিধর, শ্রীধরদাস প্রভৃতি সাহিত্যিক ও মনীষী তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণসেন

লক্ষ্মণসেনের শেষ জীবন অতি শোচনীয় হইয়াছিল। তিনি বৃদ্ধবয়সে নুদীয়া বা নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে বসবাসের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; অনেক ঐতিহাসিকের মতে নবদ্বীপ তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে মুসলমানগণ উত্তর ভারত জয় করিয়া মগধে আসিয়া উপস্থিত হয়। তুর্কজাতীয় যুদ্ধ-ব্যবসায়ী মুহম্মদ বখ্‌ত ইয়ার খিলজী মগধ অধিকার করিয়া নুদীয়া আক্রমণ ও হস্তগত করেন। লক্ষ্মণসেন বিনা প্রতিরোধে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে প্রস্থান করেন। মুসলমান লেখক মিন্‌হাজউদ্দিনের রচনায় যে অষ্টাদশ মুসলমান অশ্বারোহীর দ্বারা বঙ্গদেশ বিজয়ের কাহিনী আছে তাহা আংশিকভাবে সত্য। তুর্কী-আক্রমণের বিরুদ্ধে লক্ষ্মণসেন পূর্ব হইতে প্রতিরক্ষার কোন বন্দোবস্ত করেন নাই এবং নবদ্বীপে মুসলমানের অতর্কিত আক্রমণের হাত হইতে আত্মরক্ষার উপায়ান্তর

নবদ্বীপের পতন

ছিল না বলিয়া বৃদ্ধ নরপতি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করেন ইহা সম্ভব হইতে পারে। তবে তুর্কীসৈন্যের সংখ্যাটি অবিশ্বাস্যরূপে কম বলিয়া মনে হয় এবং নবদ্বীপ অধিকারের দ্বারাই যে বঙ্গদেশ বিজিত হইয়াছিল তাহা সত্য নহে। নবদ্বীপের পতনের পরেও লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ দীর্ঘকাল পূর্ববঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। লক্ষ্মণসেনের পুত্রদ্বয় বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন সগৌরবে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন বলিয়া জানা যায়।

বিশ্বরূপসেন
কেশবসেন

পাল ও সেনবংশের সময়ের বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতি সামাজিক অবস্থা:—বাংলার আদিম অধিবাসিগণ আর্য্যবংশসম্ভূত ছিল না—তাহারা আর্য্যেতর জাতি ছিল। প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থকারগণ বঙ্গদেশকে পতিত দেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তীর্থযাত্রা ব্যতীত বঙ্গদেশে গমনের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধানও দিয়াছেন। আর্য্যসভ্যতা অপেক্ষাকৃত বিলম্বে বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। তবে ইহাও সত্য যে বঙ্গদেশের সম্পূর্ণ আর্য্যীকরণ কখনও হয় নাই। ফলে বঙ্গদেশ নানাভাবে আর্য্যসভ্যতা দ্বারা পুষ্ট ও প্রভাবিত হইলেও এই দেশের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য একেবারে লুপ্ত হয় নাই। সমাজব্যবস্থা, আহার্য, পোশাকপরিচ্ছদ প্রভৃতিতে এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

বঙ্গদেশের বৈশিষ্ট্য
ও স্বাতন্ত্র্য

আর্য্যসমাজের রীতিসম্মত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণের ভিত্তিতে জনসাধারণ সাধারণতঃ বিভক্ত ছিল। এই চারিটি প্রাচীন শ্রেণী ব্যতীত বঙ্গদেশে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে আরও বহু সঙ্কর বর্ণ ও উপবর্ণের সৃষ্টি হয়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে অনার্য্য অধ্যুষিত বঙ্গদেশে বর্ণ-সঙ্করের সংখ্যা অত্যধিক। বৃহদ্ধর্মপুরাণের মতে বঙ্গদেশের সঙ্করবর্ণ উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন পর্যায়ে বিভক্ত এবং ইহারা সংখ্যায় ছত্রিশটি। বঙ্গদেশের সমাজে ব্রাহ্মণের পরেই কায়স্থ ও বৈদ্যগণের প্রাধান্য পাল সেনবংশের সময়েই আরম্ভ হয়। বল্লালসেনের সময়ে সমাজের বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর মধ্যে কৌলীন্যপ্রথা ও উচ্চনীচ পর্য্যায়ের সূত্রপাত হয়।

জাতিভেদ

সঙ্করবর্ণ

কৌলীন্য

বর্তমানকালের ন্যায়ই প্রাচীন বাঙ্গালীরা ভাত, মাছ, মাংস, শাকসব্জি, ফলমূল, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত আহার্য্য ও পানীয় গ্রহণ করিত। মদ্যপানাদি সামাজিকভাবে নিন্দনীয় হইলেও একেবারে অপ্রচলিত ছিল না। কেননা প্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্যাদিতে

শৌণ্ডিকালয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। সেই যুগে পুরুষরা মালকোচা দিয়া খাটো ধুতি পরিতেন—তাহা সাধারণতঃ হাঁটুর নীচে নামিত না। স্ত্রীলোকেরা শাড়ি পরিতেন। পুরুষরা উত্তরীয় এবং স্ত্রীলোকরা ওড়না ব্যবহার করিতেন। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই অলঙ্কারপ্রিয় ছিল। কেশ-প্রসাধনের ব্যাপারে নারীপুরুষ উভয়েই অনুরাগী ছিল। পুরুষরা বাবরী চুল রাখিত এবং তাহা ঘাড়ের উপর ঝুলিয়া থাকিত।

আহার্য্য ও বেশভূষা

বর্তমান যুগের ন্যায় বাঙ্গালী হিন্দুর প্রধান পর্ব ছিল দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজা ব্যতীত দোল, কোজাগরী পূর্ণিমায় জনসাধারণ আনন্দ উৎসব করিত। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জন্মাষ্টমী, দশহরা, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি অনুষ্ঠানও সেই সময়ে যথেষ্ট প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকার ব্রত এবং লৌকিক দেবদেবী পূজার অনুষ্ঠান করিত। সকলপ্রকার পূজাপার্বণ উপলক্ষে আমোদ প্রমোদেরও ব্যবস্থা ছিল।

পূজাপার্বণ

পাশা ও দাবাখেলা পুরুষদের অবসর বিনোদনের প্রধান উপায় ছিল। শিকার, মল্লযুদ্ধ, লাঠিখেলা প্রভৃতি ক্রীড়াকৌতুকও যথেষ্ট অনুসৃত হইত। নৃত্যগীত বা বীণা, বংশী, মৃদঙ্গ, ঢাক, ঢোল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র-বাদন আমোদ উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল।

আমোদ-প্রমোদ

হিউয়েন সাঙ তাঁহার বিবরণীতে তৎকালীন বঙ্গবাসীদের চরিত্র সম্বন্ধে সপ্রশংস উক্তি করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—সমতটের অধিবাসীরা স্বভাবতই শ্রমসহিষ্ণু ও কর্ণসুবর্ণের লোকেরা সাধু ও অমায়িক। তিনি পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট ও কর্ণসুবর্ণের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষালাভের আগ্রহ ও চেষ্টার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালীর চরিত্র

বাঙ্গালার অর্থ-নৈতিক জীবনের প্রধান ভিত্তি ছিল কৃষিকার্য্য। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল ধান্য, ইক্ষু ও তুলা প্রভৃতি। রাজাই জমির মালিক ছিলেন। বাংলার ইক্ষু বা কার্পাসজাত বস্ত্রাদি বহু দূরদেশে প্রেরিত হইত। বাংলার লাক্ষা শিল্পও সমৃদ্ধ ছিল। কাষ্ঠ ও হস্তিদন্তের সূক্ষ্ম কাজের জন্য বাংলার শিল্পীগণ সর্বত্র সমাদৃত হইত। গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় প্রায় যাবতীয় দ্রব্য গ্রামেই প্রস্তুত হইত। সাধারণতঃ লোকজন গ্রামেই বাস করিত। অবশ্য জনপূর্ণ হর্ম্যসুশোভিত শহরের অভাবও তখন ছিল না। শিল্প, বাণিজ্য, সামরিক ও বিচার সম্পর্কিত কাজকর্মের দ্বারা শহরের লোক জীবিকা নির্বাহ করিত। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে' রামপালের রাজধানী রামাবতীর সুন্দর

অর্থ-নৈতিক অবস্থা

বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রশস্ত রাজপথের উভয় পার্শ্বে উচ্চ প্রাসাদশ্রেণী শোভা পাইত। হিউয়েন সাঙের বিবরণে পুণ্ড বর্ধন শহরেরও উল্লেখ রহিয়াছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে বাংলাদেশ বিভিন্ন ধর্মের মিলনস্থল হইয়া আসিতেছে।

ধর্মনৈতিক অবস্থা

আর্যপূর্ব সময়ে বঙ্গদেশে পশু, পক্ষী ও প্রেত পূজার প্রচলন ছিল। মৌর্যযুগে ও পরবর্তীকালে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের সঙ্গে এখানে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। পাল রাজগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। ধর্মপালের রাজত্বকালে তিব্বতের

বৌদ্ধধর্ম :
অতীশ দীপঙ্কর

রাজার অনুরোধে বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ বা দীপঙ্কর বিক্রমশিলা মহাবিহারের অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের সংস্কার সাধনের জন্য তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন। পালরাজগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইলেও হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে বৈদিক যজ্ঞাদির যথেষ্ট অনুশীলনের সংবাদ পাওয়া যায়। কথিত আছে—শূর ও সেন বংশের সময়ে বেদবিদ ব্রাহ্মণ কনৌজ হইতে আনীত হয়। এই সময়ে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম দ্রুত প্রসার লাভ করে। বিষ্ণু, শিব, পার্বতী, কার্তিকেয়, পার্বতী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা প্রচলিত হয়। বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তিত সহজযান বা সহজিয়া ধর্ম বাংলাদেশে বিশেষভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। সেনরাজগণ হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাহাদের সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হইয়া গেলেও বিভিন্ন প্রকার লৌকিক ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান ছিল।

পাল ও সেনযুগে বাংলাদেশ শিক্ষা ও সাহিত্যের দিক হইতেও যথেষ্ট কৃতিত্বের

শিক্ষা ও সাহিত্য

পরিচয় দিয়াছিল। বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ এই সময়ে না হইলেও তৎকালীন লৌকিক ভাষায় ধর্মকথা লিখিত হইয়াছিল। এই সমস্ত ধর্মকথা চর্যাপদ নামে পরিচিত। এই চর্যাপদই বাংলা ভাষার প্রাচীনতম রূপ। এই সময়ে বঙ্গদেশে ব্যাপকভাবে সংস্কৃতের চর্চা হইত। পালযুগে সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিত' চরক-সুশ্রুতের টীকাকার চক্রপানি প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থ, ভবদেব প্রণীত দশমিক পদ্ধতি ও প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ প্রভৃতি সংস্কৃত রচনা বাঙ্গালীর কীর্তি। পালবংশের সময়েই শীলভদ্র, শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর, দায়ভাগ প্রণেতা জীমূতবাহন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেনবংশের রাজত্বকালে জয়দেব, ধোয়ী, শরণ, গোবর্ধন, উমাপতিধর প্রভৃতি কবির সমাবেশ হইয়াছিল।

পালযুগে বাংলাদেশ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে অত্যাশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত প্রাচীন মন্দির ও নগরের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে ঐ যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য কিরূপ উন্নত ছিল তাহা অনুমান করা যায়। এই সকল ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাহাড়পুরে সোমপুর বিহারের ধ্বংসাবশেষ, মহাস্থানগড়ে পৌণ্ড্র নগরীর ধ্বংসাবশেষ, বাণগড়ে কোটিবর্ষের ধ্বংসাবশেষ ও চব্বিশ-পরগণার বেড়াচাঁপায় চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসাবশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিল্পকলা: ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য

প্রাচীন বঙ্গদেশের মন্দিরাদির অধিকাংশই কাঠ অথবা ইট দিয়া নির্মিত হইত। প্রস্তর নির্মিত কয়েকটি মন্দিরের সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যায়। এতদ্ব্যতীত পোড়ামাটির শিল্পে সমসাময়িক কালে বঙ্গদেশ অত্যাশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বিখ্যাত বৌদ্ধ লামা তারানাথ তাঁহার বৌদ্ধধর্মের বিবরণে বাংলার দুইজন তক্ষণশিল্পী ধীমান ও বীতপালের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালার পটুয়া পটচিত্রে আশ্চর্য্য বর্ণসমাবেশ ও রেখাঙ্কন কৌশলের পরিচয় দিয়াছে।

পালযুগের ভাস্কর্য্য নিদর্শন

বিদেশের সঙ্গে প্রাচীন বাংলার সংযোগ:—ভারতবাসীরা পূর্ব-এশিয়ায় ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যে বিপুল বাণিজ্য-ব্যবসায়, বহু সংখ্যক রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন এবং ভারতীয় সভ্যতার বহুল প্রচার করিয়াছিল তাহার মধ্যে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব কম ছিল না। স্থলপথে বা জলপথে ঐ সমস্ত দেশে যাতায়াত বাংলাদেশের মধ্য দিয়া হইত। এই সমস্ত কারণে এবং এই সব অঞ্চল বঙ্গদেশের সন্নিকটবর্তী থাকায় বঙ্গদেশের সঙ্গেই এই অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ সংযোগ সম্ভবপর হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন

শিল্প ও স্থাপত্য যে প্রধানতঃ বাঙ্গালীর সৃষ্টি পণ্ডিতগণ তাহা স্বীকার করেন। যবদ্বীপের শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণের গুরু ছিলেন একজন বাঙ্গালী এবং যবদ্বীপে ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দ্বীপে বৌদ্ধধর্মের প্রচারে ও প্রসারে বাংলার যথেষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতে যে ভারতীয় ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল তাঁহার পশ্চাতে বাঙ্গালী ধর্মপ্রচারকদের দান যথেষ্ট রহিয়াছে। অষ্টম শতাব্দীতে বাঙ্গালী বৌদ্ধ আচার্য্য শান্তিরক্ষিত ও পদ্মসম্ভব তিব্বতে যাইয়া বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করেন। দশম শতাব্দীতে বাঙ্গালী বৌদ্ধ আচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে যাইয়া বিশুদ্ধ মহাযান ধর্মপ্রচার এবং তথাকার বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার করেন।

বল্লাল সেনের রাজত্বকালে নেপাল, ভূটান, আরাকান ও ব্রহ্মদেশে হিন্দুধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। মালয়ে প্রাপ্ত এক শিলালিপি হইতে জানা যায় যে জনৈক মহানাবিক বুধগুপ্ত বাণিজ্যার্থ মালয় উপদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। হিউয়েন সাঙের বিবরণে মালয়ের সহিত বঙ্গদেশের তাম্রলিপ্ত বন্দরের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল বলিয়া জানা যায়।

প্রশ্নোত্তর

1. Write briefly the history of the Palas with special reference to the reigns of Dharmapala and Devapala.

ধর্মপাল ও দেবপালের শাসন সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ পূর্বক বঙ্গদেশের পাল বংশের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর-সূত্র: (১) অষ্টম শতাব্দীতে বাংলাদেশে 'মাৎস্যন্যায়' বা অরাজকতা—প্রকৃতি পুঞ্জ গোপাল নামে এক ব্যক্তিকে বাংলার নরপতি নির্বাচিত করিলেন। গোপাল পাল বংশের প্রথম নরপতি।

(২) ধর্মপাল (খৃঃ ৭৭০-৮১০) পালবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি (১৮০ পৃষ্ঠা।)

(৩) দেবপাল (খৃঃ ৮১০-৮৫২): পালবংশের তৃতীয় ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি (১৮১ পৃষ্ঠা)

(৪) পালবংশের অবনতি:—দেবপালের মৃত্যুর পরে অযোগ্য নরপতিদের হস্তে পালবংশের অবনতি—উড়িষ্যার গুজিরাজ, কলচুরিরাজ ও গুহিলোটরাজ পাল সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ অধিকার করেন—কম্বোজ নামে এক জাতি কিছুকালের জন্য পালবংশের কিয়দংশ অধিকার করে—বঙ্গদেশের কিয়দংশে শূরবংশ ও চন্দ্রবংশের অধীনে অর্দ্ধস্বাধীন। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দিব্বোকের নেতৃত্বে কৈবর্ত বিদ্রোহ—দিব্বোক ও তাঁহার

ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম কিছুকাল উত্তরবঙ্গ শাসন করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে সেনরাজ বিজয়-সেনের হস্তে পালবংশের অবসান হয়।

(৫) পালবংশের কৃতিত্ব (পৃষ্ঠা)।

2 Write the history of the rule of the Senas of Bengal.

উত্তর-সূত্র : (১) একাদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট হইতে আগত সামন্ত সেন ও তাঁহার পুত্র হেমন্ত সেন বাংলায় সেনবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিজয়সেন—তাঁহার দিগ্বিজয়।

(২) বল্লালসেন—তাঁহার রাজ্যসীমা—কৌলিন্য প্রথা—বিদ্বান ও গ্রন্থকার।

(৩ লক্ষ্মণসেন—তাঁহার রাজ্যসীমা—নবদ্বীপে রাজধানী—অষ্টাদশ অশ্বারোহীর আক্রমণ আংশিক সত্য।

(৪) লক্ষ্মণসেনের পুত্রদ্বয় বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন পূর্ববঙ্গে পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন।

(৫) সেনবংশের কৃতিত্ব : (১৮৩ পৃষ্ঠা)

3. Give a short account of the condition of Bengal during the rule of the Pala and Sena dynasties.

পাল ও সেনবংশের রাজত্বকালে বাংলার অবস্থা সম্বন্ধে একটি বিবরণ দাও।

উত্তর-সূত্র : (১৮৬ পৃষ্ঠা)

4. Write a short note on the art and architecture of ancient Bengal.

প্রাচীন বাংলার শিল্প ও স্থাপত্যকলার বিবরণ দাও।

উত্তর-সূত্র : (১৮৯ পৃষ্ঠ)

5. Write notes on : (a) Sasanka (b) Dipankar (c) Jaydeva (d) Lakshmansena.

উত্তর-সূত্র : (ক) শশাঙ্ক (১৭৯ পৃষ্ঠা) (খ) দীপঙ্কর (১৮৮ পৃষ্ঠা) (গ) জয়দেব (১৮৮ পৃষ্ঠা) (ঘ) লক্ষ্মণসেন (১৮৫ পৃষ্ঠা)

দ্বাদশ অধ্যায়

ভারতে মুসলিম অধিকার ঃ রাজপুত জাতির অভ্যুদয় ও বীরত্ব

Syllabus :—Rise of Islam in Arabia—Arab invasion of Sind—Spread of Islam in central Asia and India—the Gaznavide—, Albiruni and his accounts. Resistance of the Gurjara-Pratiharas and the Rastrakutas in the West and the Sahiyas in the North West Rise of Rajput principalities—discussion of origin. The Gurjara—Pratihara empire. Pratihara—Rastrakuta—Pala contest. Bhoja Mahendra Pala I and Mahipala—Internal dissensions invite foreign aggression. Muhammad of Ghore's invasion—establishment of the Delhi Sultanate by Kutubuddin—North and West Bengal brought under Turkish rule.

আরবদেশে ইসলামের অভ্যুদয়—আরবদের সিন্ধু অভিযান—মধ্য এশিয়া ও ভারতে ইসলামের প্রসার—গজনীর সুলতানগণ—আলবেরুণী ও তাঁহার বিবরণী—ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমে গুর্জর-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের এবং উত্তর পশ্চিমে শাহীগণের বাধা-প্রদান। রাজপুত রাষ্ট্রবর্গের অভ্যুদয়—রাজপুতদের উদ্ভব আলোচনা। গুর্জর প্রতিহার সাম্রাজ্য—প্রতিহার রাষ্ট্রকূট পাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ভোজ প্রথম মহেন্দ্র পাল ও মহীপাল। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে বৈদেশিক আক্রমণ। মহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান—কুতুবুদ্দিন কর্তৃক দিল্লী সুলতানির প্রতিষ্ঠা। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে তুর্কী শাসনের সূত্রপাত।

আরবদেশে ইসলামের অভ্যুদয় :—ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ ৫৭০ খৃষ্টাব্দে আরব দেশের মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৩২ খৃষ্টাব্দে পরলোক-গমন করেন। মহম্মদ আরবদের মধ্যে আল্লাহ বা ঈশ্বর এক, এবং মহম্মদ আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ এই ধর্মমত প্রচার করেন। মহম্মদ প্রবর্তিত ধর্মের নাম ইসলাম এবং তাঁহার শিষ্যদের নাম মুস্‌লিম। মহম্মদের নেতৃত্বে বিচ্ছিন্ন ও বিবদমান আরবজাতি একই

ধর্মের ভিত্তিতে এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়। নবধর্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া আরবজাতি মহম্মদের মৃত্যুর কুড়ি বৎসরের মধ্যেই সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, ইজিপ্ট ও পারস্যদেশ অধিকার করে। অতঃপর আরবগণ আফ্রিকার উত্তরাংশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিমে স্পেনে প্রবেশ করে। ৭২০ খৃষ্টাব্দে স্পেন ইস্‌লাম শক্তির কবলিত হয়। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর একশত বৎসরের মধ্যে আরবগণ পশ্চিমে স্পেনে এবং পূর্বে কাবুল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জয় করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম প্রচার করিয়াছিল। এইরূপে প্রায় এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশে ইস্‌লাম ধর্ম ও আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইস্‌লামের ধর্ম্মগুরু খলিফা বিশাল আরব সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন।

আরবদের সিন্ধু অভিযান ঃ—অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে 'ওমাইয়াদ' বংশীয় খলিফাগণের শাসনকালে আরবগণ সর্ব প্রথম ভারত অভিযান করে। এই সময়ে খলিফার অধীনে ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন হেজ্জাজ। তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। সিংহল ছিল মানবের আদি পিতা আদমের পদস্পর্শপূত মুসলমানের তীর্থক্ষেত্র। ৭০৮ খৃষ্টাব্দে একটি জাহাজে কয়েকজন মুসলমান তীর্থযাত্রিণী সিংহল হইতে প্রত্যাবর্তন করার পথে সিন্ধুরাজ্যের অদূরে দেবল বন্দরের নিকট জলদস্যুর হস্তে পতিত হয়। সেই জাহাজে হেজ্জাজের উদ্দেশ্যে প্রেরিত কিছু উপঢৌকনও ছিল। এই ব্যাপারে হেজ্জাজ ক্রুদ্ধ হইয়া খলিফার বিশেষ অনুমতি গ্রহণ করিয়া সিন্ধুদেশের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় অভিযান নিষ্ফল হয় এবং সিন্ধীদের সঙ্গে যুদ্ধে আরবগণ পরাজিত হয়। তৃতীয় অভিযানের নেতৃত্ব করেন খলিফার নিকট আত্মীয় মহম্মদ বিন কাশিম। অসংখ্য সৈন্য ও বিরাট উষ্ট্রবাহিনী লইয়া মহম্মদ বিন কাশিম সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন। সিন্ধুর ব্রাহ্মণ নরপতি দাহিরের হস্তে নির্য্যাতিত জাঠ, বৌদ্ধ ও শূদ্রগণ স্বদেশের বিপক্ষে মুসলমানদের সঙ্গে যোগদান করে। মহম্মদ বিন্ কাশিম প্রথমে দেবল বন্দর অধিকার করেন এবং সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন। দাহির রাওয়ার নামক স্থানে বীর বিক্রমে মুসলমানের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন কিন্তু রণক্ষেত্রে তাঁহার সৈন্যদল পরাজিত হয়। দাহিরের স্ত্রী অবশিষ্ট সৈন্য সহ মুসলমান সৈন্যদলকে বাধা প্রদান করেন। কিন্তু বিপুল প্রতিপক্ষ বাহিনীর সম্মুখে জয়লাভ করা অসম্ভব দেখিয়া তিনি অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করিয়া স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষা করেন। এইভাবে সিন্ধুদেশ মুসলমানদের করায়ত্ত হয়। অতঃপর মহম্মদ মুলতান

আরবগণ কর্তৃক দাহিরের রাজ্য আক্রমণ

সিন্ধু বিজয় ৭১২ খৃঃ

আক্রমণ করেন। মহম্মদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অক্ষম হইয়া মুলতান মহম্মদের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

আরবদের অগ্রগতি প্রতিহত

আরবগণ অতঃপর সিন্ধু উপত্যকা হইতে অগ্রসর হইয়া কনৌজ ও কাশ্মীর আক্রমণের চেষ্টা করিলে শক্তিশালী গুর্জর-প্রতিহার, চালুক্য, কাশ্মীরের কর্কোট রাজগণ নাভসরীর যুদ্ধে আরবদের অগ্রগতি প্রতিহত করিলেন। মাত্র সিন্ধুদেশেই আরবদের অধিকার সীমাবদ্ধ রহিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গজনীপতি মহম্মদ ঘুরীর হস্তে সিন্ধু উপত্যকার আরব অধিকারের শেষ চিহ্নটুকু লুপ্ত হইয়াছিল।

সিন্ধুদেশে আরবশাসনের ফলাফল :—সিন্ধুদেশে আরব শাসন বিশেষ স্থায়ী ও ফলপ্রদ হয় নাই। প্রথমতঃ, আরবশাসনকর্তৃগণ শাসনব্যাপারে নিতান্ত

আরবদের সিন্ধুদেশ অভিযান আপাততঃ নিষ্ফল

অপটু ছিল; দ্বিতীয়তঃ সিয়া-সুন্নী ধর্মদ্বন্দ্বে সিন্ধুদেশের আরবগণ নিজেদের অত্যন্ত দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। ক্রমশঃ খলিফাগণ দুর্বল হইয়া পড়িলে সিন্ধুর আরব অধিকৃত অঞ্চলের আরবগণ আরব সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং সুদূরস্থিত সিন্ধুদেশ কেন্দ্রীয় রাজশক্তির সাহায্য ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইতে থাকে। এই সকল কারণে আরবগণের সিন্ধুবিজয়কে ইস্‌লামের ও ভারতের ইতিহাসের অন্যতম বন্ধ্যা বিজয়কাহিনী বলা যাইতে পারে। বাস্তবপক্ষে রাজনৈতিক দিক হইতে সিন্ধুদেশে আরবদের রাজ্যবিস্তার বিশেষ লাভজনক হয় নাই। কিন্তু সাংস্কৃতিক দিক হইতে

পরোক্ষে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আরবগণ গ্রহণ করিয়াছিল

আরবগণ যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন। আরবগণ ভারতবর্ষের সংস্পর্শে আসিয়া স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিল যে সভ্যতার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ আরব অপেক্ষা বহুগুণে উন্নত। আরবগণ ভারতীয় দর্শন, সঙ্গীত, চিত্র, স্থাপত্য, শাসননীতি সমস্তই গ্রহণ করিয়া নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া লইল। দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

গজনীরাজ্যের অভ্যুত্থান ও ভারত আক্রমণ :—দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে আফগানিস্তানের অন্তর্গত গজনী নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের পত্তন হয়।

আলপ্তিগীন

আলপ্তিগীন নামে এক তুর্কী ভাগ্যান্বেষী মুসলমান এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ৯৬৩ খৃষ্টাব্দে আলপ্তিগীনের মৃত্যু [illegible] তাঁহার ক্রীতদাস ও জামাতা সবুক্তিগীন গজনীর নরপতি হন। এই সময়ে

লামঘান হইতে কাঙড়া পর্যন্ত অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন উদ্‌ভাণ্ডপুরের হিন্দুশাহী বংশের প্রসিদ্ধ নরপতি জয়পাল। সবুক্তিগীন পূর্বদিকে হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে রাজ্যবিস্তারের উদ্যোগ করিলে শাহী নরপতি জয়পালের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। জয়পাল সবুক্তিগীনকে ভারতে প্রবেশের সুযোগ না দিয়া স্বয়ং গজনীর বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। অকস্মাৎ প্রাকৃতিক বিপর্যায়ের ফলে জয়পালের সৈন্যবাহিনী বিপর্যস্ত হইল এবং তিনি সবুক্তিগীনের সঙ্গে অত্যন্ত অপমানজনক সর্ত্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জয়পাল এই সন্ধির সর্ত্ত মানিতে অস্বীকৃত হইলেন। ফলে সবুক্তিগীন জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করিয়া লামঘান লুণ্ঠন করিলেন এবং বহু অর্থ ও অসংখ্য লোককে বন্দীরূপে ধরিয়া লইয়া গেলেন। লুণ্ঠনের প্রতিশোধ গ্রহণের অভিলাষে জয়পাল বহু ভারতীয় নরপতির সহযোগে গজনীর বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন; কিন্তু জয়পাল পরাজিত হইলেন। ফলে লামঘান হইতে পেশোয়ার পর্যান্ত ভূখণ্ড জয়পালের হস্তচ্যুত হইল।

সবুক্তিগীন

জয়পালের পরাজয়

সুলতান মামুদের ভারত অভিযান: ৯৯৭ খৃষ্টাব্দে সবুক্তিগীনের মৃত্যুর পরে তাঁহার সাতাশ বৎসর বয়স্ক পুত্র সুলতান মামুদ গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। খলিফা মামুদকে সুলতান বা স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লন। মামুদ ধর্মান্ধ ও ধনলিপ্সু নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের অধিকাংশ সময়ই ভারত আক্রমণে অতিবাহিত হইয়াছিল। একত্রিশ বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে তিনি সপ্তদশ বার ভারত আক্রমণ করিয়া নরহত্যা ও লুণ্ঠনের তাণ্ডবলীলা চালাইয়াছিলেন। মামুদের ভারত-আক্রমণের পশ্চাতে সামরিক যশোলাভ ও ইসলামের বিজয় ঘোষণার আকাঙ্ক্ষা অন্যতম কারণ থাকিলেও ভারতের অপরিমিত ধনরত্নলাভের বাসনাও যে তাহাকে অত্যন্ত প্রলুব্ধ করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের কারণ

১০০০ খৃষ্টাব্দে সুলতান মামুদ সর্বপ্রথম ভারত অভিযান করেন। এই অভিযানের ফলে ভারতের সীমান্তবর্ত্তী কয়েকটি দুর্গ তাঁহার হস্তগত হয়। এই অভিযানের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া তিনি পরবৎসর দশ সহস্র সৈন্যসহ পিতৃশত্রু শাহীবংশের নরপতি জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে জয়পাল পরাজিত ও বহু আত্মীয়সহ বন্দী হইলেন। মামুদ জয়পালের রাজধানী উদভাণ্ডপুর ধ্বংস করিলেন। জয়পাল বিজয়ী শত্রুকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া ও পৌত্র সুখপালকে শর্ত্ত পালনের প্রতিভূ-স্বরূপ গজনীর

জয়পাল পরাজিত ও বন্দী

সুলতানের শিবিরে গচ্ছিত রাখিতে স্বীকৃত হইয়া স্বাধীনতা ক্রয় করিলেন। এই অপমানের গ্লানি জুড়াইবার জন্ত জয়পাল স্বয়ং জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন করিলেন। তাঁহার পুত্র আনন্দপাল সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

জয়পালের আত্মহত্যা

১০০৪-১০০৫ খৃষ্টাব্দে ঝিলাম নদীর উত্তরতীরস্থ ভীরা নগরের বিরুদ্ধে সুলতান মামুদ তাঁহার তৃতীয় অভিযানের সময়ে উক্ত নগর গজনীর অন্তর্ভুক্ত করেন। জয়পালের পুত্র আনন্দপাল পেশোয়ারের নিকটে মামুদের হস্তে পরাজিত হন। এই সংবাদে ভীত হইয়া মুলতানের শাসনকর্তা আবুল ফতে দাউদ মামুদকে বাৎসরিক করপ্রদানে স্বীকৃত হইয়া সন্ধি ক্রয় করেন। মামুদ সেবকপাল নামে স্বধর্মত্যাগী একজন হিন্দুর হস্তে ভারতীয় অধিকৃত অঞ্চলের ভার অর্পণ করিয়া গজনীতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে সেবকপাল ইসলামধর্ম পরিত্যাগ করিয়া গজনীর আনুগত্য অস্বীকার করেন। মামুদ পুনরায় তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া তাহাকে পরাজিত করেন।

মুলতানের আনুগত্য

জয়পালের পুত্র আনন্দপাল মুলতানের শাসনকর্তা দাউদকে তাহার বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া মামুদ আনন্দপালের বিরুদ্ধে ১০০৮-'৯ খৃষ্টাব্দে অভিযান করেন। মামুদের আক্রমণের বিরুদ্ধে আনন্দপাল উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর, কনৌজ, দিল্লী এবং আজমীরের নরপতিকে সম্মিলিত করেন। উন্দের নিকট উভয়পক্ষের এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে হিন্দু-সৈন্যগণ অশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া মামুদের প্রায় নিশ্চিত পরাজয় সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ আনন্দপালের হস্তী ভয় পাইয়া তাঁহাকে রণক্ষেত্র হইতে লইয়া প্রস্থান করে। ইহাতে হিন্দু সৈন্যগণ ভীত হইয়া ছত্রভঙ্গ হয় এবং মামুদের সৈন্যগণ দুইদিন ধরিয়া পলায়নপর হিন্দু সৈন্যগণের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং অসংখ্য হিন্দু নিহত করে। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মামুদ প্রচুর ধনরত্ন লাভ করেন এবং সিন্ধুনদ হইতে নগরকোট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁহার হস্তগত হয়। কাঙড়ার পার্বত্যপ্রদেশে অবস্থিত নগরকোটের দুর্গ অধিকারের ফলে তিনি অগণিত ধনৈশ্বর্য প্রাপ্ত হন এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সহ গজনীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

আনন্দপালের পরাজয় ও নগরকোট লুণ্ঠন

উপরি-উক্ত অভিযানের ফলে মামুদের ধনলোভের নিবৃত্তি না হইয়া বরং তাহা বাড়িয়া চলিল। উত্তর ভারতের তৎকালীন হিন্দু নরপতিদের অনৈক্যের সুযোগে তিনি বারংবার ভারতীয় রাজাদের বিরুদ্ধে সার্থক অভিযান করিতে সক্ষম হইলেন।

[illegible] খৃষ্টাব্দে মামুদ পুনরায় মুলতান আক্রমণ করিয়া বিদ্রোহী দাউদকে শাস্তি

প্রদান করিলেন।(তিন বৎসর পরে তিনি আনন্দপালের পৌত্র ভীমপালকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন।) ভীমপাল কাশ্মীরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। মামুদ কাশ্মীর অভিযান করিয়া কাশ্মীর লুণ্ঠন করেন এবং তথাকার বহু হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া গজনীতে প্রত্যাবর্তন করেন।(১০২৬ খৃষ্টাব্দে শাহীরাজ ভীমপালের মৃত্যু হইলে শাহী রাজবংশ বিলুপ্ত হয়।) এই রাজ্য ইতিপূর্বেই মামুদের রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। শাহীরাজ জয়পাল ও তাঁহার বংশধর আনন্দপাল, ত্রিলোচনপাল ও ভীমপাল মুসলমানের হস্ত হইতে ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিয়া ইতিহাসে খ্যাতনামা হইয়াছেন।

কাশ্মীর লুণ্ঠন

(১০১৪ খৃষ্টাব্দে মামুদ বিখ্যাত হিন্দু-তীর্থ থানেশ্বর লুণ্ঠন করেন। হিন্দুগণ অমিত-বিক্রমে শত্রুবাহিনীকে বাধা প্রদান করিয়াও পরাজিত হন। অসংখ্য দ্রব্যাদি সহ থানেশ্বর দুর্গ মামুদের হস্তগত হয়।)

থানেশ্বর অধিকার

এই সকল অভিযানে কৃতকার্য্য হইয়া মামুদ প্রাচ্যদেশের ইতিহাস প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় সাম্রাজ্যের প্রধান নগর কনৌজ আক্রমণে উৎসাহী হন। (১০১৮ খৃষ্টাব্দে অসংখ্য সৈন্যসহ তিনি গজনী হইতে বহির্গত হইলেন এবং পথিমধ্যে অবস্থিত সমস্ত দুর্গ অধিকার করিলেন।) বুলন্দসরের নরপতি তাঁহার আনুগত্য স্বীকারপূর্বক দশসহস্র লোকসহ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলেন। যমুনা-তীরস্থিত মহাবন-এর অধিপতি মামুদকে বাধা দিতে যাইয়া পরাজিত হন এবং উক্ত অপমানের গ্লানি হইতে অব্যাহতির জন্য আত্মহত্যা করেন।

বুলন্দসর অভিযান

(অতঃপর মামুদ অগণিত দেবমন্দির ও ধনরত্নপূর্ণ হিন্দুতীর্থ মথুরা আক্রমণ করিলেন; কোন বাধাই তাঁহার আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারিল না।) (তাঁহার নির্দ্দেশে সুবিখ্যাত দেবালয়সমূহ ধূলিসাৎ করিয়া দেওয়া হইল। পরিশেষে মামুদ ১০১৯ খৃষ্টাব্দে কনৌজের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন।) কনৌজের প্রতিহার-নরপতি রাজ্যপাল মামুদকে প্রতিহত করার জন্য কোন প্রচেষ্টা না করিয়া বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিলেন।) (মামুদের আদেশে কনৌজ নগর লুণ্ঠিত হইল এবং দেবালয় সমূহ লুণ্ঠিত ও বিনষ্ট করা হইল) বুলন্দশহরের মধ্য দিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিসহ মামুদ গজনীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

মথুরা আক্রমণ

কনৌজ লুণ্ঠন

রাজ্যপালের অপমানকর আত্মসমর্পণে ক্রুদ্ধ হইয়া কালিঞ্জরের চন্দেল্ল নরপতি বিদ্যাধর রাজ্যপালকে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন। অনুগত নরপতির এই শোচনীয় পরিণামের সংবাদ শ্রবণে (মামুদ চন্দেল্লরাজকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে ১০১৯ খৃষ্টাব্দে গজনী হইতে বহির্গত হন) প্রথমবারের

কালিঞ্জর ও গোয়ালিয়র অভিযান

যুদ্ধে চন্দেল্লরাজ ভীতিগ্রস্ত হইয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন। ১০২১-'২২ খৃষ্টাব্দে মামুদ চন্দেল্লরাজের অধীনস্থ গোয়ালিয়রের অধিপতিকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন এবং পুনরায় কালিঞ্জর আক্রমণ করেন। এইবার চন্দেল্ল নরপতি মামুদকে বহু ধনরত্ন প্রদানে তুষ্ট করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন।

মামুদের ভারত অভিযান সমূহের মধ্যে ১০২৫-'২৬ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন বিশেষ স্মরণীয়। সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন মামুদের ষোড়শতম ভারত অভিযানের সময়ে ঘটিয়াছিল। সোমনাথের মন্দিরের বিপুল ঐশ্বর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া তিনি বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ গুজরাটে উপস্থিত হইলেন। গুজরাটের চালুক্যরাজ ভীমদেব ভীত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। সোমনাথের মন্দিরের সম্মুখে মামুদ উপস্থিত হইলে মন্দির রক্ষার জন্য মন্দিররক্ষী ও পুরোহিতগণ তীব্র বাধা প্রদান করে। প্রায় পাঁচ হাজার হিন্দু নিহত করিয়া মামুদ মন্দিরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন এবং স্বহস্তে দেবমূর্ত্তি ভঙ্গ করার গৌরব অর্জন করেন। কথিত আছে মন্দিরের পুরোহিতগণ মূর্ত্তিরক্ষার বিনিময়ে মামুদকে প্রচুর ধনরত্ন দিবার প্রস্তাব করিলে মামুদ উত্তর দিলেন—'দেবমূর্ত্তির বিক্রেতা অপেক্ষা দেবমূর্ত্তি ভঙ্গকারীরূপেই আমি পৃথিবীতে খ্যাতনামা হওয়া অধিক কাম্য মনে করি"।

সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন

সোমনাথ অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে গুজরাটের অধিপতি ভীমদেবের আক্রমণে সুলতান মামুদ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং তাঁহার সৈন্যদল কচ্ছোপসাগরের সন্নিকটে অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হয়। পরিশেষে সিন্ধু দেশের মধ্য দিয়া মামুদ গজনীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

মামুদের সর্বশেষ অভিযান হয় জাঠদের বিরুদ্ধে। ইহারা সোমনাথ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে মামুদকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল বলিয়া তিনি ইহাদিগকে পরাজিত করিয়া বহুলোককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন।

জাঠদের বিরুদ্ধে শেষ অভিযান

মামুদের অভিযানের ফলাফল ও মামুদের সাফল্যের কারণ:—ভারতবর্ষের অদৃষ্টে সুলতান মামুদ কুগ্রহের মতই উদিত হইয়াছিলেন। পূর্বযুগের শোণিততৃষ্ণ বর্বর হূণজাতির সঙ্গে সুলতান মামুদের কোন পার্থক্য ছিল না। অসংখ্য নগর, অগণিত হিন্দু মন্দির ও দেবমূর্তি বিনষ্ট করিয়া তিনি হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসকেই আঘাত করিয়াছেন। ভারত আক্রমণে তাঁহার ভূমিকা ছিল প্রধানতঃ অর্থগৃধ্নু লুণ্ঠনকারীর। তিনি বিজিত রাজ্যসমূহের শাসন ব্যবস্থার কোন বন্দোবস্ত করেন নাই। ফলে অনতিকাল পরেই

তাঁহার সুদূরবিস্তৃত সাম্রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। উপরন্তু তিনি বারংবার অভিযানের দ্বারা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দেশগুলির ধনরত্ন এমন ভাবে লুন্ঠন করিয়াছিলেন যে পরবর্তী কালে সেই সমস্ত অঞ্চলে চরম অর্থনৈতিক দুরবস্থা দেখা দেয়। ফলে সুলতান মামুদের অভিযানগুলি একদিকে যেমন পরবর্তী মুসলমান আক্রমণের পথনির্দেশক হইয়া থাকে অপরদিকে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতার সৃষ্টি করিয়া উত্তরকালীন আক্রমণ-কারীদের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়।*

প্রত্যক্ষ ধ্বংস ও লুণ্ঠনের ফল অর্থ-নৈতিক দুরবস্থা

পরবর্তী আক্রমণের সুবিধা

সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের সাফল্যের পশ্চাতে যথেষ্ট কারণ ছিল। মামুদ স্বয়ং বিচক্ষণ যোদ্ধা ও নিপুণ সৈন্যপরিচালক ছিলেন। তাঁহার সৈন্যদল মধ্য এশিয়া, পারস্য প্রভৃতি বহুদেশের অভিজ্ঞ সমরব্যবসায়ী লইয়া গঠিত ছিল। ইহাদের মনে ভারত হইতে লুণ্ঠিত ধনরত্নের অংশ পাওয়ার প্রত্যাশা তো ছিলই—উপরন্তু মামুদ যুদ্ধের ব্যাপারে স্বধর্মীদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য তাহাদের মধ্যে উৎকট ধর্মোন্মাদনা জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। সুতরাং ধর্মান্ধ, ধনলোভী মুসলমান সৈন্যদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার মত ক্ষমতা ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ছিল না। পরিশেষে ভারতীয় হিন্দু নরপতিদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ও ঐক্যের অভাবও মামুদকে ভারত অভিযানে পরোক্ষতঃ সহায়তা করিয়াছিল।

সুলতান মামুদের চরিত্র ও কৃতিত্ব:—সুলতান মামুদ স্বীয় কৃতিত্ববলে ক্ষুদ্র গজনীরাজ্যকে এক বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। স্থায়ীভাবে কোন স্থান স্বীয় অধিকারে রাখা অপেক্ষা লুণ্ঠনের প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি অধিকতর নিবদ্ধ ছিল এবং বিভিন্ন অভিযানে ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াই তিনি নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। মামুদ সম্ভবতঃ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে স্থায়ীভাবে হিন্দুস্থান শাসনাধীনে আনয়ন করা তাঁহার পক্ষে দুরূহ। তজ্জন্য লুণ্ঠন অভিযান সমাপ্ত হইলেই তিনি গজনীতে প্রত্যাবর্তন করিতেন। কিন্তু স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে শাসন প্রতিভার প্রয়োজন হয় তাঁহার মধ্যে সেই গুণের অভাব থাকিলেও ইহা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য্য যে তিনি বিভিন্ন অভিযানের দ্বারা যে দুঃসাহসিক পরিকল্পনা, তেজোদৃপ্ত মানসশক্তি ও আসন্ন বিপদের সম্মুখে যে নির্ভীক সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই অনন্যসাধারণ। মামুদ ছিলেন আজন্ম সৈনিক, সুতরাং যুদ্ধে কোন সময়ে তাঁহার ক্লান্তি আসিত না—জন্মভূমির গৌরববর্দ্ধনের জন্য যুদ্ধ করিতেছেন বলিয়া তিনি সকল সময়ে মনে

করিতেন। সেকালে সমগ্র এশিয়ায় তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ সেনাপতি অন্য কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ।

সুলতান মামুদ যে কেবল মাত্র দিগ্বিজয়ী বীররূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতা ও শিক্ষানুরাগও স্মরণীয়। স্বয়ং অশিক্ষিত হইয়াও তিনি

বিদ্যোৎসাহিতা

বিদ্বানের যথাযোগ্য সমাদর করিতে জানিতেন। শাহনামা রচয়িতা ফারদোসী—একাধারে দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ ও অঙ্কশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত আলবেরুণী, ঐতিহাসিক উট্‌বী, দার্শনিক ফারাবী, কবি আনসারী প্রভৃতি তৎকালীন প্রসিদ্ধনাম পণ্ডিতগণ গজনীর রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছেন। আলবেরুণী সুলতান মামুদের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসেন এবং কিছুকাল ভারতে থাকিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। আলবেরুণী ভারতবর্ষের দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিত আলবেরুণীর 'তহকক্ ই-হিন্দ' সমকালীন ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম প্রামাণ্য উপাদান।

মুসলমান আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা :— মুসলমান আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর ভারতে কোন শক্তিশালী রাজ্য ছিল না। এই অঞ্চল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। রাজপুতানায়, মধ্যভারতে ও পশ্চিম ভারতে গুজরাটের চৌলুক্য ও গুর্জর প্রতিহার বংশ, জেজাকভুক্তির চন্দেল্ল বংশ, মালবের পরমার বংশ, আজমীরের চৌহান বংশ, কনৌজের গাহড়বাল বংশ এবং চেদী রাজ্যের কলচুরি বংশ বিখ্যাত ছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতে শাহীবংশের রাজা জয়পাল উন্দ্ বা উদ্ভাণ্ডপুরে রাজত্ব করিতেন। এতদ্ব্যতীত কাশ্মীর রাজ্যে কর্কোট বংশ ও বাংলায় সেনবংশ রাজত্ব করিতেছিলেন। এই সকল রাজ্যের মধ্যে একতা দূরে থাকুক মনোমালিন্য বা ঈর্ষাবিবাদ লাগিয়াই ছিল। নিজেদের মধ্যে বিরোধের জন্যই ভারতীয় বিভিন্ন রাজবংশ সমবেতভাবে বৈদেশিক আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। ইহাদের আত্মকলহের রন্ধ্র দিয়াই মুসলমানগণ ভারতে অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

রাজপুতদের পরিচয় :—খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজপুত জাতি শৌর্য্যে বীর্য্যে এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। রাজপুতদের মূল

ইহাদের মূল পরিচয় সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা

পরিচয় সম্বন্ধে পণ্ডিত সমাজে মতভেদ রহিয়াছে। বিভিন্ন রাজপুত বংশ ভারতের প্রাচীন চন্দ্রবংশীয়, সূর্য্য বংশীয় বা ভারতের কোন বিখ্যাত রাজা বা মহাপুরুষের বংশধর বলিয়া দাবি করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের এই দাবির পশ্চাতে যথেষ্ট ইতিহাসসম্মত

কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোন প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থে বা বিবরণীতে রাজপুতদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। অকস্মাৎ অষ্টম শতাব্দী হইতে দেখা যায় যে প্রধানতঃ পশ্চিম ভারতে রাজপুত নামে এক বিশিষ্ট ও সমরপ্রিয় জাতি ভারতের ইতিহাসে অন্যতম প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। রাজপুতদের এই আকস্মিক অভ্যুদয় দেখিয়া ঐতিহাসিকগণ ইহাদের ভারতীয়ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান। তাঁহারা মনে করেন যে গুপ্তপূর্ব বা গুপ্তোত্তর যুগে কুষাণ, শক, হূণ, গুর্জর প্রভৃতি যে সমস্ত বৈদেশিক জাতি ভারতে রাজ্য স্থাপন করিয়া ভারতীয়দের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন এবং ভারতীয়দের আচার, ধর্ম, জাতিভেদ প্রথা গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা এবং তাহাদের বংশধরগণ বৃহত্তর হিন্দু সমাজে গৃহীত হইয়া রাজপুত নামে সম্মানিত হইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে পরবর্তী কালের চারিটি প্রধান রাজপুত গোষ্ঠী পারমার, প্রতিহার, চৌহান ও সোলাঙ্কী এবং রাঠোর, চন্দেল্ল, গাহড়ওয়ার, বুন্দেলা প্রভৃতি অপরাপর রাজপুত বংশের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিদেশী বা বিদেশী ভারতীয় মিলন উদ্ভূত

রাজপুতদের বিভিন্ন গোষ্ঠির নাম

ঘুর বংশ ও শিহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘুরী :—সুলতান মামুদের দুর্বল বংশধরগণ গজনী ও ভারতে অবস্থিত বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। ইতিমধ্যে আফগানিস্থানের পার্বত্য অঞ্চলের ঘুর নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য শক্তিশালী হইয়া উঠে। ঘুর রাজ্য প্রথমে গজনীর অধীন ছিল, কিন্তু গজনীর দুরবস্থার যুগে ক্রমশঃ বল সঞ্চয় করিয়া ঘুর গজনীর সমকক্ষ ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আরম্ভ করে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণামে ঘুরগণ জয় লাভ করে এবং ঘুর রাজ্যের গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ ১১৭৩ খৃষ্টাব্দে গজনী অধিকার করে। গিয়াসুদ্দীন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহম্মদ ঘুরীকে (শিহাবুদ্দীন বা মুইজুদ্দীন বিন্ সাম) গজনীর ভার অর্পণ করেন। দুই ভ্রাতার মধ্যে সম্প্রীতি ছিল এবং মহম্মদ ঘুরী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অধীন সেনাপতি হিসাবেই ভারত অভিযান করিয়াছিলেন।

গিয়াসুদ্দীন ঘুরী

শিহাবুদ্দীন মহম্মদ ঘুরী

মহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান :—মহম্মদ ঘুরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া সর্ব প্রথম মুলতানের ইসমাইলী সম্প্রদায়ভুক্ত বিধর্মী মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন (১১৭৫ খৃঃ) এবং সুকৌশলে উচ্ দুর্গ অধিকার করেন। ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী গুজরাট আক্রমণ করিয়া গুজরাটের নরপতির হস্তে পরাজিত হন। এই পরাজয়েও তিনি অনুৎসাহিত হইলেন

মুলতান জয়

না। পর বৎসর তিনি পেশোয়ার অধিকার করেন এবং ১১৮১ অব্দে শিয়ালকোটে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। গজনীর সুলতান মামুদের শেষ বংশধর খুসরত মালিক রাজ্যচ্যুত হইয়া সাম্রাজ্যের একমাত্র অবশিষ্ট অঞ্চল লাহোরে রাজত্ব করিতেছিলেন। মহম্মদ ঘুরী জম্মুর রাজা বিজয়দেবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়া খুসরত মালিককে আক্রমণপূর্বক ১১৮৬ খৃষ্টাব্দে গজনীর শেষ সুলতানকে বন্দী করিয়া লাহোর অধিকার করেন।

পেশোয়ার অধিকার

লাহোর জয়

মহম্মদ ঘুরীর আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর ভারতের বহু প্রদেশেই স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। তৎকালে বিহারের কিয়দংশে পালরাজাদের আধিপত্য থাকিলেও বঙ্গদেশে সেনবংশীয়গণ রাজত্ব করিতেন। বুন্দেলখণ্ড চন্দেল্লদের অধিকারে ছিল এবং কনৌজে প্রতিহারদের স্থলে গাহড়বালগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। গাহড়বাল-বংশীয় জয়চন্দ্র বা জয়চাঁদ এই সময়ে উত্তর ভারতের রাজাদের মধ্যে অন্যতম পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন, কিন্তু তিনি আজমীঢ় ও দিল্লীর চৌহান-বংশীয় নরপতি পৃথ্বীরাজের প্রতিপত্তিতে অত্যন্ত ঈর্ষ্যা করিতেন। এই উভয় নরপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা মহম্মদ ঘুরীর বিজয়লাভে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। কথিত আছে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ স্বয়ংবর সভা হইতে জয়চাঁদের কন্যা সংযুক্তাকে জয়চাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হরণ করিয়া লইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া পৃথ্বীরাজের সহিত জয়চাঁদের শত্রুতা হয়। উত্তর ভারতের হিন্দু-রাজগণ সম্মিলিত হইয়া একযোগে মহম্মদ ঘুরীকে বাধা দিলে সম্ভবতঃ তিনি পাঞ্জাবের বাহিরে রাজ্যবিস্তার করিতে পারিতেন না। কিন্তু দেশের এই চরম সঙ্কটে উত্তরাপথের হিন্দুরাজগণ তাহাদের ব্যক্তিগত বিরোধ বিস্মৃত হইয়া ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন নাই।

উত্তরাপথের রাজনৈতিক অনৈক্য

১১৯০-৯১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী পাঞ্জাব অতিক্রম করিয়া পৃথ্বীরাজ চৌহানকে আক্রমণ করিলেন। অসংখ্য রাজপুত নরপতি পৃথ্বীরাজকে ঘুরীর বিরুদ্ধে সাহায্য করিলেন এবং একমাত্র জয়চাঁদ নিরপেক্ষ রহিলেন। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে তরাইনের প্রান্তরে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। মহম্মদ ঘুরী রণক্ষেত্রে আহত হইলেন এবং পরাজিত হইয়া গজনীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। প্রথমবারের পরাজয়ে নিরুৎসাহিত না হইয়া মহম্মদ ঘুরী ১১৯২ খৃষ্টাব্দে পুনরায় তরাইনের প্রান্তরে দ্বিতীয়বার ভাগ্যপরীক্ষার জন্য পৃথ্বীরাজের সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হইলেন। দক্ষতর সৈন্য পরিচালনার গুণে এইবার ভাগ্যলক্ষ্মী ঘুরীর

তরাইনের প্রথম যুদ্ধ ১১৯১ খৃষ্টাব্দ

প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন। এই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত হইয়া শত্রুহস্তে বন্দী ও নিহত হইলেন। অতঃপর মহম্মদ ঘুরীর উপযুক্ত সহকারীদ্বয় কুতুবউদ্দীন ও ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন বক্তিয়ার খিলজীর প্রচেষ্টায় আর্যাবর্তের অন্যান্য অঞ্চলও মুসলমানের অধিকারে আনীত হইল। এইভাবে উত্তর ভারতে মুসলমানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। মহম্মদ ঘুরী তরাইনের যুদ্ধে জয়লাভের পরেই ভারতের নববিজিত রাজ্যগুলির ভার কুতুবউদ্দীনের উপর অর্পণ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ১১৯২ খৃষ্টাব্দ

কুতুবউদ্দীন মহম্মদ ঘুরীর অধিকৃত ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিবার পর স্বয়ং হানসি, মীরাট, দিল্লী, রণথম্বোর ও কয়েল অধিকার করেন। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে কুতুবউদ্দীন কাশী ও কনৌজ অধিকার করেন এবং ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে গুজরাট আক্রমণ করিয়া ইহার রাজধানী লুণ্ঠন করেন। ১২০২ খৃষ্টাব্দে তিনি কালিঞ্জরের দুর্গ আক্রমণ করিয়া প্রভূত ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। অতঃপর মহোবা ও বদায়ুন অধিকৃত হয়। কুতুবউদ্দীনের অনুচর বক্তিয়ার খিলজীর পুত্র ইখতিয়ার উদ্দীন মহম্মদের সাহসিকতার ফলে বিহার, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ স্থান মুসলমানদের রাজ্যভুক্ত হয়।

কুতুবউদ্দীন

বিহার ও বঙ্গদেশ জয়

মহম্মদ ঘুরী নিঃসন্তান ছিলেন। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার সাম্রাজ্য কয়েকটি অংশে বিভক্ত হইয়া গেল। তাজউদ্দিন নামে তাঁহার এক ক্রীতদাস গজনীতে আধিপত্য স্থাপন করেন, সিন্ধুদেশ নাসিরুদ্দিন নামক এক ক্রীতদাসের অধিকারে আসিল; কিন্তু তাঁহার সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ক্রীতদাস কুতুবুদ্দীন দিল্লীতে প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন। অতঃপর দিল্লী মুসলমান প্রভুত্বের কেন্দ্র হইল।

মহম্মদ ঘুরীর সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ

মহম্মদ ঘুরীর কৃতিত্ব:—সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতারূপে এশিয়ার ইতিহাসে মহম্মদ ঘুরীর স্থান অতি উচ্চে। ক্ষুদ্র ঘুররাজ্যের অধিপতিরূপে জীবন আরম্ভ করিয়া অদম্য সাহস ও দৃঢ়তার বলে তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। পরাজয় বা প্রতিবন্ধকতা তাঁহাকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। উত্তরভারতের অন্তঃসারশূন্য রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ আঘাতে তিনি হিন্দু রাজাসমূহের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ধূলিসাৎ করেন এবং তৎস্থলে মুসলমানের স্থায়ী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

সুলতান মামুদের অভিযানের সঙ্গে মহম্মদ ঘুরীর অভিযানের পার্থক্য:—সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মনৈতিক ও অর্থনৈতিক।

ধনলিপ্সা ও ইসলামের বিস্তার এই দুইটিই তাঁহার অভিযানের মূল প্রেরণা ছিল। প্রথম হইতেই মহম্মদ ঘুরী ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থায়ীভাবে স্থাপনের সঙ্কল্প লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষে ইসলামের প্রভুত্বের সূচনা হয় এবং কালক্রমে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রাচ্য মহাদেশের অন্যতম বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।

সুলতান মামুদের উদ্দেশ্য, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক

মহম্মদ ঘুরীর উদ্দেশ্য রাজনৈতিক

প্রশ্নোত্তর

1. Write what you know about the attempt of the Arabs for the expansion of their power in India.

ভারতে আরবদের আধিপত্য স্থাপনের প্রয়াসের কাহিনী লিখ।

উত্তর সূত্র:— (১৯৩ পৃষ্ঠা)।

2. Write briefly the Indian expeditions of Sultan Mahmud.

সুলতান মামুদের ভারত অভিযানসমূহ সংক্ষেপে বিবৃত কর।

উত্তর সূত্র:—(১) ১০০০-১০২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গজনীর সুলতান মামুদ সপ্তদশ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। সুলতান মামুদের আক্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক। সামরিক যশোলিপ্সা, ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন করা ও ভারতবর্ষে ইসলামের বিস্তার এই তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই তিনি ভারতবর্ষ অভিযানে আসিয়াছিলেন। মামুদের বারংবার আক্রমণের ফলে উত্তর ভারতের রাজবংশসমূহ সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া হীনবল হইয়া পড়ে, এবং তাঁহার অভিযানের দেড়শত বৎসর পরে মহম্মদ ঘুরীর আক্রমণের ফলে উত্তর ভারত সম্পূর্ণরূপে মুসলমানের করায়ত্ত হয়।

(২) বিভিন্ন আক্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১৯৫ পৃষ্ঠা)

(৩) সুলতান মামুদের সাফল্যের কারণ:—(ক) মামুদের সুদক্ষ সমর পরিচালনা। (খ) সৈন্যদের লুণ্ঠনের অংশভাগী হওয়ার প্রত্যাশা (গ) ইসলামের বিস্তার সম্বন্ধে উৎকট [illegible] (ঘ) ভারতীয় হিন্দু নরপতিদের মধ্যে [illegible] [illegible]

3. Give a brief account of the imperial expansion of the Ghor and Gaznavids in Northern India.

উত্তর ভারতে গজনী ও ঘুর রাজগণের সাম্রাজ্য বিস্তারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তর-সূত্র : (১) একাদশ শতাব্দীতে গজনীর সুলতান মামুদ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে গজনীর ঘুরবংশীয় শিহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘুরী উত্তর ভারতে অভিযান করেন। সুলতান মামুদ সপ্তদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের বহু অঞ্চলের নরপতিকে পরাজিত করিয়া গজনীর আধিপত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। সুলতান মামুদের হস্তে পরাজিত স্থানসমূহের মধ্যে উদ্‌ভাণ্ডপুর, কাশ্মীর, থানেশ্বর, মথুরা, কনৌজ, কালিঞ্জর, গোয়ালিয়র, গুজরাট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সুলতান মামুদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধনরত্ন লুণ্ঠন ও ইসলামের প্রসার—সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল না। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পরে দুর্বল বংশধরগণের সময়ে তাঁহার বিজিত ভারতীয় সাম্রাজ্য পুনরায় স্বাধীন হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে আফগানিস্থানের ঘুররাজ্য শক্তিশালী হইয়া গজনী অধিকার করে। ঘুরবংশীয় সুলতানের ভ্রাতা শিহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘুরী অসংখ্যবার ভারত অভিযান করেন।

(২) **মহম্মদ ঘুরীর অভিযান :** (ক) মুলতান অভিযান ও উচ্‌ দুর্গ অধিকার (১১৭৫ খৃঃ) (খ) গুজরাট আক্রমণ ও পরাজয় (১১৭৮) (গ) গজনীর ভূতপূর্ব সুলতান খুসরত মালিককে বন্দী করিয়া লাহোর অধিকার (১১৮৬) (ঘ) আজমীর ও দিল্লীর নরপতি পৃথ্বীরাজ চৌহানকে আক্রমণ—তরাইনের প্রথম যুদ্ধে মহম্মদঘুরীর পরাজয় (১১৯১) (ঙ) দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে (১১৯২) পৃথ্বীরাজের পরাজয়ও দিল্লী হস্তগত (চ) প্রতিনিধি কুতুবউদ্দিন কর্তৃক হান্‌সি, মীরাট, দিল্লী, রণথম্বোর ও কয়েল অধিকার (ছ) ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিহার ও বঙ্গদেশ জয় করেন।

(৩) সুলতান মামুদ ও মহম্মদঘুরী উভয়েই উত্তর ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে ভারতবর্ষ অভিযান করিয়াছিলেন। স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপার অপেক্ষা ধনলিপ্সা ও ইসলামের বিস্তার সম্বন্ধেই সুলতান মামুদের আগ্রহ বেশী ছিল। তবে সুলতান মামুদের অভিযানগুলি উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতার সৃষ্টি করিয়া উত্তরকালে মহম্মদ ঘুরীর উত্তর ভারতে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়া দেয়।

4. What do you know about the origin of the Rajputs and their different branches.

রাজপুতদের উৎপত্তি এবং তাহাদের বিভিন্ন গোষ্ঠী সম্বন্ধে লিখ।

উত্তর-সূত্র :—(২০০ পৃষ্ঠা)

5. Write notes on : (a) Alberuni (b) Causes of the defeat of the Hindu kings in the hands of the Muslims (c) Comparison between the Indian expeditions of Sultan Mahmud and Muhammad of Ghor.

টীকা লিখ (ক) আলবেরুণী (খ) মুসলমানদের হস্তে হিন্দুরাজ্য সমূহের পরাজয়ের কারণ (গ) মহম্মদঘুরী ও সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের তুলনা।

উত্তর-সূত্র :—(ক) আলবেরুণী (২০০ পৃষ্ঠা) (খ) মুসলমানদের হস্তে হিন্দুরাজ্য সমূহের পরাজয়ের কারণ (১৯৮ পৃষ্ঠা) (গ) মহম্মদঘুরী ও সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের তুলনা (২০৩ পৃষ্ঠা)।

বংশ পরিচয়

হর্য্যঙ্ক বা বিম্বিসারের বংশ :—
১। বিম্বিসার
২। অজাতশত্রু
৩। উদয়
৪—৫। অনিরুদ্ধ ও মুণ্ড
৬। নাগদশক

শৈশুনাগ বংশ :—
১। শিশুনাগ
২। কাকবর্ণ বা কালাশোক
৩। নন্দীবর্দ্ধন

নন্দ বংশ :—
১। মহাপদ্ম নন্দ
২। উগ্রসেন
৩। ধননন্দ

মৌর্য্য বংশ :—(খৃঃ পূঃ ৩২২—১৮৫)
১। চন্দ্রগুপ্ত প্রিয়দর্শন (খৃঃ পূঃ ৩২২—২৯৮)
২। বিন্দুসার অমিত্রঘাত (খৃঃ পূঃ ২৯৮—২৭৩)
৩। অশোক প্রিয়দর্শী (খৃঃ পূঃ ২৭২—২৩২)
বৃহদ্রথ (শেষ নরপতি খৃঃ পূঃ ১৮৫ পর্য্যন্ত)

শুঙ্গ বংশ :—(খৃঃ পূঃ ১৮৫—৭৩)
১। পুষ্যমিত্র
২। অগ্নিমিত্র
৩। জ্যেষ্ঠমিত্র ও সুমিত্র
৪। ভাগভদ্র
৫। দেবভূতি

কাণ্ব বংশ (খৃঃ পূঃ ৭৩—২৮)
১। বাসুদেব
২। ভূমিমিত্র
৩। নারায়ণ
৪। সুশর্মন্

সাতবাহন (অন্ধ্র) বংশ :—

১। সিমুক
২। কৃষ্ণ
৩। শ্রীশাতকর্নি
* * * *
২৩। গৌতমীপুত্র শাতকর্নি
২৪। বাশিষ্ঠীপুত্র শাতকর্নি
* * * *
২৭। গৌতমীপুত্র যজ্ঞশ্রী

কুষাণ বংশ :-

১। কুজ্জলা কদফিস্ (প্রথম কদফিস)
২। বিম কদফিস (দ্বিতীয় কদফিস)
৩। কনিষ্ক
৪। বাসিষ্ক
৫। হুবিষ্ক
৬। দ্বিতীয় কনিষ্ক
৭। বাসুদেব

গুপ্ত বংশ (খৃঃ ৩২০—৪৩০)

মহারাজ শ্রীগুপ্ত
|
মহারাজ ঘটোৎকচ
|
মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত (১ম)=কুমার দেবী (লিচ্ছবী কন্যা)
|
সমুদ্রগুপ্ত পরাক্রমাঙ্ক
|
চন্দ্রগুপ্ত (২য়) বিক্রমাদিত্য
|
কুমারগুপ্ত
|
স্কন্দগুপ্ত

গুর্জ্জর প্রতিহার বংশ (খৃঃ ৮০৭ — ১০৯০)

নাগভট

বৎসরাজ

১। দ্বিতীয় নাগভট
২। রামভদ্র
৩। মিহির ভোজ
৪। মহেন্দ্রপাল
৫। ভোজ (২য়)
৬। মহীপাল
৭। দেবপাল
৮। বিজয়পাল
৯। রাজ্যপাল
১০। ত্রিলোচনপাল

বাংলার পাল বংশ

১। গোপাল
২। ধর্মপাল
৩। দেবপাল
৪। বিগ্রহপাল
৫। নারায়ণপাল
৬। রাজ্যপাল
৭। গোপাল (২য়)
৮। বিগ্রহপাল (২য়)
৯। মহীপাল (১ম)
১০। নয়পাল
১১। তৃতীয় বিগ্রহপাল
১২। দ্বিতীয় মহীপাল

দিব্বোক ও ভীম

১৩। রামপাল
১৪। মদনপাল
১৫। গোপাল (৩য়)

বাংলার সেনবংশ
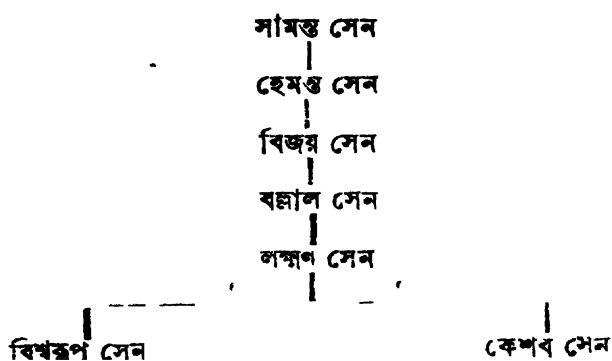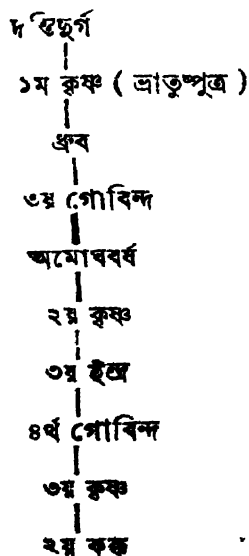
সামন্ত সেন
|
হেমন্ত সেন
|
বিজয় সেন
|
বল্লাল সেন
|
লক্ষ্মণ সেন
|
বিশ্বরূপ সেন — কেশব সেন

রাষ্ট্রকূট বংশ (খৃঃ ৭৪৪—৯৭৩)

দন্তিদুর্গ
|
১ম কৃষ্ণ (ভ্রাতুষ্পুত্র)
|
ধ্রুব
|
৩য় গোবিন্দ
|
অমোঘবর্ষ
|
২য় কৃষ্ণ
|
৩য় ইন্দ্র
|
৪র্থ গোবিন্দ
|
৩য় কৃষ্ণ
|
২য় কর্ক

পুষ্যভূতি বংশ (স্থানেশ্বর)

মধ্যযুগ

ভারতবর্ষের ইতিহাস

মধ্যযুগ

মুসলিম শাসনকালের মৌলিক তাৎপর্য্য

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের অভ্যুদয় ও ইহার আকস্মিক বিস্তার পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম বিস্ময়কর ঘটনা। ইসলামের প্রবর্তক হজরৎ মহম্মদ ৫৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৩২ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার তিরোধানের প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র আরব, তুরস্ক, পারস্য, ইজিপ্ট, আফ্রিকার উত্তরাঞ্চল ও স্পেনের দক্ষিণাংশ এক কথায় এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশেই ইসলামের অধিকার বিস্তৃত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই ভারতবর্ষ ইসলামের মূলকেন্দ্র আরবের সন্নিহিততম প্রতিবেশী হইলেও ভারত বিজয়ের জন্য ইসলামকে চারি শতাব্দীর ঊর্দ্ধকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘকাল সিন্ধু, মূলতান ও উত্তর পশ্চিম ভারতের স্বল্প অঞ্চল ব্যতীত বিস্তীর্ণ ভারতভূমি ইসলামের অনায়ত্ত ছিল। সামরিক শক্তি ও ধর্মীয় সাম্যবাদ এই দুই বৈশিষ্ট্যের জন্য নবাভ্যুদিত ইসলামের পক্ষে সর্বত্র বিজয়লাভ সহজসাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু ইসলামের বিজয়গৌরবের প্রথম দিকে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই দুইটি কারণ বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই। প্রথমতঃ ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের শক্তিশালী গুর্জ্জর প্রতিহারদের দুর্ভেদ্য সামরিক বেষ্টনী অতিক্রম করা ইসলামের পক্ষে দুরূহ হয় এবং দ্বিতীয়তঃ ইসলামের সাম্যনীতি হিন্দু ভারতের গণমানসকে তাদৃশ প্রভাবিত করিতে সক্ষম হয় নাই। সুতরাং ভারতে ইসলামের রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট বিলম্বিত হয়। খৃষ্টীয় ৭১২ অব্দে মহম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয় হইতেই ইসলামের ভারতে পদার্পণের সূত্রপাত হয়। অতঃপর গজনীর সুলতান মামুদ অসংখ্যবার ভারতবর্ষ অভিযান করেন, কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে মহম্মদ ঘুরীর সার্থক রণাভিযানকেই ভারতবর্ষে ইসলামের পাদপীঠিকারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। দাস বংশের শাসনাধিকার হইতে ভারতের ইতিহাসে প্রকৃত মুসলমান যুগের সূত্রপাত হয়।

ভারতবর্ষের মুসলমান শাসনাধিকারকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা চলে—তুর্ক-আফঘান বা দিল্লী সুলতানির যুগ এবং মোঙ্গল বা তৈমুর বংশীয়দের যুগ। তুর্ক-আফঘান বা দিল্লী সুলতানির রাজত্বকাল ছিল তিনশত কুড়ি বৎসর—১২০৬ হইতে

১৫২৬ খৃষ্টাব্দ। দিল্লী সুলতানি দাস, খলজী, তুঘলক, সৈয়দ, লোদী ও সুর এই ছয়টি বিভিন্ন বংশে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত চারটি জাতিতে তুর্কী ও শেষোক্ত লোদী ও সুর বংশের রাজগণ জাতিতে আফঘান বা পাঠান ছিলেন। সমষ্টিগতভাবে ইহারা তুর্ক আফঘান নামে পরিচিত। মোঙ্গল রাজত্ব অবশ্য তৈমুরের বংশধরগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং বাবর হইতে এই বংশের সূচনা হইলেও আকবরকে মোঙ্গল বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়।

ভারতবর্ষের মুসলমান অধিকারের ইতিহাস পৃথিবীর সর্বত্র অনুষ্ঠিত বিজেতা ও বিজিতের সম্পর্কের অনুরূপ। একমাত্র ক্ষাত্রশক্তির দাবিতেই মুসলমানগণ দিল্লীর মসনদে আরূঢ় হইয়াছিলেন এবং তরবারির সাহায্যে তাহা রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতবাসীর জাতীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা অর্জন করিবার জন্য শাসক-জাতি কখনও চেষ্টা করেন নাই, বরঞ্চ শ্রেণীবিবেষ, নিপীড়ন ও বাহুবলের দ্বারা শাসন-শক্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য তাহারা প্রয়াস পাইয়াছেন। সুতরাং বিদেশী ও বিধর্মী শাসকজাতির স্বপক্ষে দেশবাসীর মনে কখনও রাজভক্তি ও দেশাত্মবোধের সঞ্চার হইতে পারে নাই। রাষ্ট্রীয় আধিপত্য ও স্বধর্মীদের সংখ্যাবৃদ্ধি ইসলাম শাসনের অপরিহার্য্য অঙ্গ। মুসলমান শাসকগণের অধিকাংশই পরধর্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত অনুদার ছিলেন। জিজিয়া কর, তীর্থযাত্রী কর, মাথা পিছু কর (Poll-Tax), বলা বা প্রলোভনের দ্বারা ধর্মান্তরিতকরণ ইত্যাদি কার্য্যের দ্বারা তাঁহারা ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে আঘাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দুগণকে শাসনকার্য্যে উপযুক্ত অংশ প্রদান করিয়া তাঁহাদের সমর্থন লাভের চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই। মুসলমান শাসনের অস্তিত্ব নির্ভর করিত বাহুবলের উপর, তরবারির সাহায্যে লব্ধ সাম্রাজ্য তাঁহারা তরবারির সাহায্যেই রক্ষা করিতেন। সুতরাং রণকুশল ও সাহসী সম্রাটের সময়ে নিপীড়িত ও ক্ষুব্ধ জনসাধারণ কোন প্রকারে শাসক জাতির অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকিত এবং সুযোগ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু নৃপতিগণ শাসক জাতির বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ আরম্ভ করিত। রাজপুতানায় বা দাক্ষিণাত্যে মুসলমান অধিকার কোনদিনই সম্পূর্ণ স্থায়ী রূপ ধারণ করে নাই। মুসলমান নরপতিগণের মধ্যে অধিকাংশেরই সংগঠনী প্রতিভা, রাষ্ট্রীয় দূরদর্শিতা ও শ্রম-ক্ষমতার অভাব ছিল। ইলতুৎমিস, বলবন, আলাউদ্দীন খিলজী, মহম্মদ তুঘলক, শেরশাহ, আকবর প্রভৃতি বহু সম্রাটই সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন এবং ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সৃজনী ও সংগঠনী প্রতিভাও ছিল, কিন্তু তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতাকে সাম্রাজ্যের পরিধির বৃদ্ধির প্রতিই নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। ব্যাপকভাবে প্রজাকল্যাণ বা জাতীয়

উন্নয়নমূলক কোন কার্য্যের দ্বারা তাঁহারা প্রজাদের রাজভক্তি অর্জনের চেষ্টা করেন নাই, ফলে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার প্রয়োজন তাহা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইয়াছেন। মোটকথা বিজেতা-বিজিত বোধের মনোভাব দূরীকরণে রাজশক্তি বা শাসকশক্তি কোনদিনই অগ্রসর হয় নাই। কাজেই হিন্দুগণের সমর্থন চিরকালই মুসলমান রাজশক্তির অনায়ত্ত রহিয়া গিয়াছে।

ইউরোপের মধ্যযুগের মত সামন্তগণের দ্বারাই মুসলমান সম্রাটগণ শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিতেন। নর্মানযুগের ইংলণ্ডীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের মতনই এই সকল আমীর ওমরাহগণ উত্তম শাসন-ব্যবস্থার প্রতি উদাসীন থাকিয়া ব্যক্তিগত বা দলগত প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির প্রতি অত্যধিক যত্নশীল হইতেন। এই সকল ওমরাহগণের মধ্যে আরব, আফগানিস্থান, আবিসিনিয়া, মিশর, তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের লোক ছিল। উহারা সকলে এক ধর্মাবলম্বী হইলেও স্বার্থের ক্ষেত্রে, সকলেই স্ব স্ব পন্থী ছিল এবং সাম্রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন দল ও উপদলের সৃষ্টি করিয়া পারস্পরিক চক্রান্তে লিপ্ত থাকিত। ঈর্ষ্যা, বিভেদ ও দলীয় ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল সম্রাটগণের অসহায় অবস্থা। ব্যক্তিগতভাবে মুসলমান সম্রাটদের অধিকাংশই অপদার্থ ছিলেন। ইহারা স্বয়ং শ্রমবিমুখ থাকিয়া ভোগব্যসনে ও অপরিমিত ইন্দ্রিয়বিলাসে কালাতিপাত করিতেন। বিরোধীপক্ষের অতর্কিত আঘাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাহাদিগকে অভিজাত ওমরাহশ্রেণীর কর্মকুশলতার উপর সর্বদা নির্ভর করিতে হইত। স্বার্থান্বেষী ও ভাগ্যসন্ধানী ওমরাহগণ যথেচ্ছাচার করিলেও তাহা নিবারণের কোন উপায় ছিল না। দিল্লী হইতে ঘোষিত সম্রাটের অনুজ্ঞালিপি যে সুদূর প্রান্তের শাসনকর্তারা উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতেন মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল যুগেও ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ইত্যবস্থায় যাঁহারা সমরকুশলী ছিলেন, তাঁহারা বাহুবলের সাহায্যে সাম্রাজ্যবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন বা শত্রুর চক্রান্ত বিনষ্ট করার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু দেশাধিকারের সঙ্গে সাম্রাজ্য স্থায়ী করার জন্য যে সুদক্ষ ও প্রজাবর্গের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণমূলক শাসনবিধি প্রবর্তনের প্রয়োজন, তাহা উপলব্ধি করার মত দূরদর্শিতা বা ইচ্ছা খুব কমসংখ্যক মুসলমান নরপতিরই ছিল। কেবল শেরশাহ বা আকবরের এ বিষয়ে সদিচ্ছা ছিল, কিন্তু অবশিষ্ট অধিকাংশেরই ইচ্ছা থাকিলেও তাহাদের সামর্থ্য ছিল না বা সামর্থ্য থাকিলেও ইচ্ছার একান্ত অভাব ছিল। প্রজাপুঞ্জের শুভাশুভ চিন্তায় উদাসীন সম্রাটবর্গ ও তাহাদের অভিজাতকেন্দ্রিক শাসনযন্ত্রের জন্য বিক্ষুব্ধ ও অত্যাচারিত জনসাধারণের নিকট হইতে চিরকালই 'দিল্লী দূর অস্ত' রহিল—তখ্‌ত-ই-তাউসের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রজাদের কোন আগ্রহ রহিল না। যখনই

দুর্বল সাম্রাজ্যের উপর বিদেশী আক্রমণের দুর্নিবার আঘাত আসিয়াছে, তখন জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধভাবে সিংহাসনের পাশে দণ্ডায়মান না হইয়া হয় নিরপেক্ষ দর্শকের মত উদাসীন রহিয়াছে নতুবা বিদেশী আক্রমণকারীকে স্বাগত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছে। জনসাধারণের মনে দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ সঞ্চার করার অক্ষমতাই মুসলমান শাসনকালের মৌলিক ত্রুটি। বিজেতা, বিদেশী ও বিধর্মী এই ত্র্যহস্পর্শের সঙ্গে ভারতের চিরাচরিত শাসনরীতির পরিপন্থী সামরিক ও সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যুক্ত হওয়ার জন্যই মুসলমান রাজত্ব জনসাধারণের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিল।

মুঘল বা তৈমুর বংশীয়দের রাজত্বকালে বরঞ্চ দেশের মৃত্তিকার সঙ্গে শাসনব্যবস্থার কিঞ্চিৎ সংযোগ ঘটিয়াছিল এবং উহা পূর্বাপেক্ষা সুদক্ষ ও সক্রিয় ছিল। অবশ্য প্রজাকল্যাণের জন্যই যে এই সংযোগের প্রচেষ্টা হইয়াছিল তাহা নহে। দূরদর্শিতার বলে আকবর উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্যই শাসক ও শাসিতের ব্যবধান দূর করা প্রয়োজন। সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করার জন্যই তিনি হিন্দুদের অসম্মানজনক বিধিসমূহ বন্ধ করিয়া দেন এবং তাহাদিগের শাসনকার্য্যের অংশীদার করেন। জাহাঙ্গীরও নিরপেক্ষ ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া প্রজানুরক্তি লাভের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। মুঘল বংশ তুর্ক-আফগানদের অপেক্ষা সুদৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারিয়াছিল অন্য কারণে। প্রজাবর্গের সমর্থন ও সহযোগিতার অভাব এই সময়েও ছিল—কিন্তু মুঘলদের শাসনের স্থায়িত্ব ঘটিয়াছিল নিম্নোক্ত কারণে। প্রথমতঃ, সিংহাসনের উত্তরাধিকারের ব্যাপারে মুঘলরা সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠপুত্রের অধিকার স্বীকার করিতেন বলিয়া উত্তরাধিকারিত্বের বিরোধ কম হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, মুঘল সম্রাটগণ শাসনব্যাপারে স্বেচ্ছাচারী হইলেও সাধারণ মাত্রাজ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহাদের অনেকেই অক্লান্তকর্মা ছিলেন। রাজস্ববিধির সুব্যবস্থা ও সুসংহত কেন্দ্রীয় শাসনপদ্ধতির জন্যই মুঘল শাসন অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হইয়াছিল। নতুবা পূর্ব যুগের মত ওমরাহগণের শাসনকর্তৃত্বের আধিপত্য লইয়া বিবাদ, ঔদ্ধত্য-জনক ব্যবহার, শাসক-শাসিতের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বৈষম্যমূলক রীতির প্রবর্তন, প্রাদেশিক নায়কদের স্বেচ্ছাচারিতা সকলই বর্তমান ছিল। একজন শেরশাহ বা একজন আকবরের পক্ষে চিরাচরিত শাসনরূপের আমূল পরিবর্তন করা অসম্ভব। সুদীর্ঘকাল শাসনকার্য্যের অভিজ্ঞতার পরে অনিবার্য্য পতনের মুখেও মুসলমান সম্রাটগণ পুরাতনকে বিস্মৃত হয় নাই ও নূতন কিছু শিখেন নাই।

সার্দ্ধ পঞ্চশতাব্দীকাল ভারতবর্ষ মুসলমানের অধিকারে ছিল এবং তাহাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার কালক্রমে আসমুদ্রহিমাচল পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইতিপূর্বে গ্রীক, শক ও

হুণ প্রভৃতি যে সকল বিদেশী জাতি ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় অধিকার স্থাপন করিয়াছিল তাহাদের সহিত বিজেতা মুসলমানদের অনেক পার্থক্য ছিল। মুসলমানদের পূর্বেকার বহিরাগত জাতিসমূহ ভারতবর্ষে আসিয়া আচার-ব্যবহার, ভাষায় ও ধর্মে নিজেদের পৃথক সত্তা হারাইয়া সম্পূর্ণভাবে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়া তাহাদের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু একমাত্র মুসলমানদের বেলায় সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা ঘটিয়াছিল। ইসলামের ধর্ম ও সামাজিক আচার ব্যবস্থা হিন্দুধর্ম ও রীতিনীতির সম্পূর্ণ বিপরীতপন্থী। উপরন্তু এই ধর্মে পরধর্ম সহিষ্ণুতার অবকাশ কম ছিল। ইত্যবস্থায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঐক্যাশ্রয়ী কোন সাধারণ পন্থা না থাকায় উভয় ধর্ম ও সভ্যতার মধ্যে সম্পূর্ণ মিলন সম্ভবপর হয় নাই। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণের মধ্যে যাঁহারা উচ্চকোটির তাঁহারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য লইয়া পৃথকভাবে অবস্থান করিয়াছেন। কিন্তু সুদীর্ঘকাল পাশাপাশি একত্র বাস করার ফলে অনিবার্যরূপে উভয়ের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অজ্ঞাতসারে পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়াছিল। ইহা হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম ও সমাজের পক্ষে শুভ ও অশুভ দুই প্রকার ফলই প্রসব করিয়াছিল। ইসলামের সংস্পর্শ হইতে আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুসমাজ অধিকতর রক্ষণশীল হইল এবং হিন্দুশাস্ত্র নিবন্ধকারগণ সামাজিক অনুশাসন কঠোরতর করিয়া ফেলিলেন। অপরপক্ষে ইসলামের সাম্যনীতির প্রলোভনের হস্ত হইতে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার জন্য হিন্দুসমাজে বহু ধর্মাচার্যের উদ্ভব হইয়াছিল। এই সকল ধর্মাচার্য ধর্মীয় সূক্ষ্ম আচার অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করিয়া ধর্মসমন্বয়ের মূলনীতি সম্বন্ধে আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিলেন। মানুষের জাতি বা ধর্ম যে ভগবানের অনুগ্রহ লাভের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, ইহাই তাঁহাদের প্রতিপাদ্য ও বক্তব্য বিষয় ছিল। ইসলাম ধর্মের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বজায় থাকিলেও বহিরঙ্গে হিন্দুধর্মের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে ইহার মধ্যে বহু পরিবর্তন আসিয়া গিয়াছিল। ইহার মধ্যেও হিন্দুধর্মের বর্ণাশ্রম প্রথার অনুকরণে উচ্চ-নীচ শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। অ-মুসলমানকে নিজধর্মে দীক্ষিত করা ইসলামের অন্যতম অঙ্গ। সুতরাং মুসলমান শাসনাধিকারে অনেকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন এবং বহু মুসলমান নরপতি বা সেনানায়ক হিন্দু নারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল নূতন দীক্ষিত মুসলমানগণ হিন্দুধর্মের পূর্বসংস্কার সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। ফলে অনিবার্যভাবে ইসলামের সামাজিক আচারে ও ধর্মমতের মধ্যে হিন্দুধর্মের সুস্পষ্ট প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল। মূল ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের কোনও মিলন-সূত্র না পাওয়া গেলেও ভাষা, সাহিত্য, স্থাপত্য ও শিল্পরীতিতে এবং উভয় সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত উদারনীতিক

ধর্মাচার্য্যগণের মতবাদের মধ্যে দুই বিপরীত সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফল সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল। উত্তরকালে তৃতীয় পক্ষ ইংরাজদের উপস্থিতি না ঘটিলে পরবর্তীকালের ভারতের ইতিহাস সম্ভবতঃ অন্যরূপ ধারণ করিতে পারিত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দিল্লী-সুলতানির প্রতিষ্ঠা—দাসবংশের রাজত্ব

(১২০৬—১২৯০)

Syllabus—Establishment of Sultanate at Delhi—Kutubuddin Iltutmish—his contribution to the development of the Sultanate—recognition by Khalifa. Mongal invasion (1221)—Nobility versus the state—Raziyya.

Balban's measures against the Turkish nobility—tackling of the internal troubles and the Mongol menace. Tugril's rebellion in Bengal—Bughra Khan's Governorship of Bengal. Balban's contribution to the Sultanate.

পাঠসূচী :—দিল্লী সুলতানির পত্তন—কুতুবুদ্দিন, ইলতুৎমিস—দিল্লী সুলতানির উন্নতিতে ইলতুৎমিসের দান—খিলাফতির কল্পনা—মোঙ্গল আক্রমণ (১২২১)—অভিজাততন্ত্র ও দাস রাজগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা—রাজিয়া। নাসিরুদ্দিন মামুদ। গিয়াসউদ্দিন বলবন কর্তৃক তুর্কী আমীরদের শক্তিহ্রাসের চেষ্টা। আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিধান। ক্রমাগত মোঙ্গল আক্রমণ ভীতি। 'বঙ্গদেশে তুঘ্রিল বেগের বিদ্রোহ ও তাহার দমন, বাংলাদেশে বলবনী বংশ প্রতিষ্ঠা। বাংলায় বুঘরা খানের শাসন, দিল্লীতে সুলতানী শাসন প্রবর্তনে বলবনের কৃতিত্বের পরিমাপ।

দিল্লীর দাস সুলতানির পত্তন :—মহম্মদ ঘুরী অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। মহম্মদ ঘুরীর জীবিতাবস্থায় কুতুবুদ্দিন আইবক ভারতবর্ষে মহম্মদ ঘুরীর অধিকৃত অঞ্চল সমূহের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রভুর মৃত্যুর পরে কুতুবুদ্দিন দিল্লীতে স্থায়িত্বভাবে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। কুতুবুদ্দিন ছিলেন মহম্মদ ঘুরীর ক্রীতদাস এবং কুতুবুদ্দিনের পরে এই বংশের আরও দুইজন নরপতি ইলতুৎমিস ও বলবন ক্রীতদাস ছিলেন! এই জন্য দিল্লী সুলতানির রাজবংশ 'দাসবংশ' নামে পরিচিত। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা প্রথম জীবনে ক্রীতদাস থাকিলেও পরবর্তী কালে ক্রীতদাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সকলেই

দাসবংশ

সুলতানের জামাতা হইয়াছিলেন এবং স্বীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া দিল্লীর সুলতানপদে

উন্নীত হইয়াছিলেন। এই দাস রাজবংশ ১২০৬ হইতে ১২৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চুরাশি বৎসর রাজত্ব করেন।

কুতুবুদ্দিন আইবক (১২০৬—১২১০) :—কুতুবুদ্দিন তুর্কীস্থানের অধিবাসী ছিলেন। শৈশবে অপহৃত হইয়া ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হন এবং একজন সহৃদয় কাজি তাঁহাকে ক্রয় করিয়া তাঁহার শিক্ষাশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কাজির মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্রগণ কুতুবুদ্দিনকে দ্বিতীয়বার বিক্রয় করে এবং মহম্মদ ঘুরী তাঁহাকে ক্রয় করেন। মহম্মদ ঘুরী কুতুবুদ্দিনের প্রতিভা ও কার্য্যক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভারত অভিযানের সময়ে একটি সৈন্যদলের নায়ক নিযুক্ত করেন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে ১১৯২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী কুতুবুদ্দিনকে বিজিত ভারতীয় অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অতঃপর ১১৯২ খৃষ্টাব্দেই দিল্লী অধিকার করিয়া কুতুবুদ্দিন দিল্লীতে তাঁহার প্রধান শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। কুতুবুদ্দিন প্রতিষ্ঠিত ভারতে প্রথম মুসলমান রাজধানী দিল্লী মুসলমান রাজত্বের শেষ দিন পর্য্যন্ত মুসলমান রাজত্বের কেন্দ্রস্থল ছিল।

কুতুবুদ্দিন স্বীয় সামরিক শক্তির বলে ক্রমশঃ আর্য্যাবর্ত্তের বিভিন্ন স্থান অধিকার করেন। ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে কনৌজ, ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে আলিগড়, ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে আনহিলবারা, ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে বদায়ুন, ১১৯৯—১২০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অনুচর ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বাংলাদেশ, ১২০২ খৃষ্টাব্দে কালিঞ্জর অধিকার করিয়া মহম্মদ ঘুরীর প্রতিনিধিরূপে উত্তর ভারত বিজয় সম্পূর্ণ করেন।

মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পরে (১২০৬) কুতুবুদ্দিন দিল্লীর স্বাধীন সুলতান হইলেন। কিছুকালের জন্য কুতুবুদ্দিন শ্বশুর তাজউদ্দিনকে পরাজিত করিয়া গজনীর অধিপতিও হন; কিন্তু পরে গজনী পুনরায় তাজউদ্দিনের হস্তগত হয়। স্বাধীন সুলতান রূপে কুতুবুদ্দিন মাত্র চারিবৎসর রাজত্ব করেন। ১২১০ খৃষ্টাব্দে চৌগান বা পোলো খেলিবার সময়ে আকস্মিকভাবে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গিয়া আহত হন এবং এই আঘাতের ফলেই তাঁহার মৃত্যু হয় (১২১০ খৃঃ)।

চরিত্র

কুতুবুদ্দিন একজন উন্নতমনা ও দানশীল নরপতি ছিলেন। প্রজানুরঞ্জনতা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার সময়ে রাজপথ দস্যুতস্করের উপদ্রব হইতে নিরাপদ ছিল। তাঁহার দানশীলতার জন্য তিনি লাখবকস্ বা লক্ষদাতা বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। স্বীয় ধর্মের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। কুতুবুদ্দিন নির্মিত দিল্লী ও আজমীরের মসজিদগুলি তাঁহার এই অনুরাগের সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

আরাম শাহ (১২১০—১২১১) :—কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা ও পোষ্যপুত্র) আরাম শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। অনভিজ্ঞ ও অকর্মণ্য আরাম শাহের রাজ্যশাসনের যোগ্যতা ছিল না। তাঁহার

কুতব মিনার

রাজ্যলাভের সংবাদে উচ্চের শাসনকর্তা নাসিরুদ্দিন কাবাচা সিন্ধুদেশে এবং আলি মর্দান খলজী বাংলাদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। রণথম্বর, আজমীঢ়, দোয়াব এবং গোয়ালিয়রের হিন্দু রাজগণও স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিল। এই দুঃসময়ে নবপ্রতিষ্ঠিত দিল্লীর সুলতানী রক্ষার জন্য দিল্লীর আমীরগণ কুতুবুদ্দিনের জামাতা বদায়ুনের শাসনকর্তা ইলতুৎমিসকে রাজ্যভার গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। ইলতুৎমিস সসৈন্যে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন এবং আরাম শাহকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া স্বয়ং দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

ইলতুৎমিস (১২১১—১২৩৬) :—কুতুবুদ্দিনের ন্যায় ইলতুৎমিসও প্রথম জীবনে একজন তুর্কী ক্রীতদাস ছিলেন। শৈশবে তাহার ভ্রাতারা তাহাকে জামালুদ্দিন নামক এক দাস ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করেন। জামালুদ্দিন তাহাকে দিল্লীতে দাসবাজারে কুতুবুদ্দিনের নিকট বিক্রয় করেন। কুতুবুদ্দিন তাহার বংশ পরিচয় এবং রূপগুণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বীয় কন্যার সহিত বিবাহ দেন এবং বদায়ুনের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করেন। ১২১১ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লীর সুলতান পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

প্রথম জীবন

দিল্লীর সুলতান

দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়ার পর ইলতুৎমিসকে বহু সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। অসামান্য কর্মশক্তি ও বীরত্বের অধিকারী ছিলেন বলিয়া ইলতুৎমিস এই দারুণ সঙ্কটে অবিচলিত থাকিয়া সিংহাসন ও সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; সিন্ধু ও বাংলা ইতিপূর্বেই স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। গজনীর তাজউদ্দীন পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করার চেষ্টা করিতেছিলেন। অধিকন্তু দরবারের আমীরগণও তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। সর্বপ্রথমে তিনি বিদ্রোহী আমীরগণকে পরাস্ত করিলেন। ১২১৬ খৃষ্টাব্দে ইলতুৎমিস তাজউদ্দিনকে পরাজিত ও বন্দী করেন, পরে তাজউদ্দীন নিহত হন। সিন্ধুর শাসনকর্তা নাসিরুদ্দিন কাবাচাও পরাজিত হইয়া ইলতুৎমিসের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ১২২৮ খৃষ্টাব্দে নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পরে সিন্ধু দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১২২৯ অব্দে বাগদাদের খলিফা তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া সম্মানসূচক পরিচ্ছদাদি সহ তাঁহার নিকট এক দূত প্রেরণ করেন। মুসলিম জগতের সার্বভৌম অধিপতি কর্তৃক এই অনুমোদনের ফলে ইলতুৎমিসের প্রতিপত্তি যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইল।

বিদ্রোহ দমন

তাজউদ্দিন ও নাসিরুদ্দিন পরাজিত

খলিফার দ্বারা সম্মানিত

ইতিমধ্যে দুর্দ্ধর্ষ মোঙ্গল জাতির নায়ক চিঙ্গিস খাঁ পশ্চিম এশিয়ার 'খিবা' নামক রাজ্যের পলায়মান অধিপতি জালালুদ্দিন মঙ্গবর্ণীর অনুসরণে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। খিবার অধিপতি পাঞ্জাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নাসিরুদ্দিনের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইলতুৎমিসের নিকট হইতেও সাহায্যের প্রত্যাশী ছিলেন। কিন্তু সুচতুর ইলতুৎমিস তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়া চিঙ্গিস

মোঙ্গলনেতা চিঙ্গিস খাঁর আক্রমণ

খাঁর বিরাগভাজন হইতে সম্মত হইলেন না। খিবারাজ অগত্যা সিন্ধুদেশ ও উত্তর গুজরাট লুণ্ঠন করিয়া পারস্যে প্রস্থান করিলেন। এই সংবাদে চিঙ্গিস খাঁ আর অগ্রসর না হইয়া সদলবলে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন। ইলতুৎমিসের বুদ্ধি-কৌশলে তাঁহার সাম্রাজ্য এক মহাসঙ্কটের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল।

নিষ্কৃতি লাভ

অতঃপর ইলতুৎমিস বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হইলেন। তিনি ১২২৬ খৃষ্টাব্দে রণথম্ভোর অধিকার করিলেন। খিলজী মালিকগণের নেতৃত্বে বঙ্গদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। ইলতুৎমিসের পুত্র নাসিরুদ্দিন বাংলার অধিপতি গিয়াসুদ্দিন খিলজীকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বাংলায় দিল্লীর প্রভুত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১২৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি গোয়ালিয়র এবং ১২৩৪ খৃষ্টাব্দে মালব আক্রমণ করিয়া ভিলসার দুর্গ অধিকার করেন। অতঃপর ইলতুৎমিস উজ্জয়িনী আক্রমণ করিয়া উজ্জয়িনী অধিকার ও লুণ্ঠন করেন। এইরূপে দিল্লীর সুলতানিকে বিস্তৃত ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইলতুৎমিস ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য বিস্তার

দিল্লী-সুলতানির ভিত্তি স্থাপন করেন কুতুবুদ্দিন। কিন্তু ইহাকে সুদৃঢ় করার ব্যাপারে ইলতুৎমিসের দান যে অসামান্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কুতুবুদ্দিন প্রতিষ্ঠিত নাবালক দিল্লী সুলতানি তাঁহারই প্রতিভা ও কর্মকুশলতার ফলে দারুণ সঙ্কটের হস্ত হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হয় এবং সামান্য কয়েকটি স্থান ব্যতীত দিল্লীর সুলতানির আধিপত্য সমগ্র আর্যাবর্তে বিস্তৃত হয়। যোদ্ধা হিসাবেও তিনি কৌশলী ও নির্ভীক ছিলেন। তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতা ও শিল্পানুরাগ যথেষ্ট ছিল। তিনি বহু বিদ্বান ও গুণী ব্যক্তিকে দিল্লীতে আশ্রয় প্রদান করিয়া দিল্লীকে ইসলাম সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত করেন। তাঁহারই উদ্যোগে ১২৩১—'৩২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর কুতুব মিনারের নির্মাণকার্য্য সমাপ্ত হয়। খাজা কুতুবুদ্দিন নামে বাগদাদের উস নগরের এক সাধুর নামানুসারে ইহার নামকরণ হয়। তিনি আজমীঢ়ে একটি সুবৃহৎ মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬—১২৪০)ঃ—ইলতুৎমিসের জ্যেষ্ঠপুত্র নাসিরুদ্দিন পিতার জীবিতাবস্থাতেই মারা যান। অন্যান্য পুত্রগণ অপদার্থ ছিলেন বলিয়া তিনি কন্যা রাজিয়াকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে দিল্লীর আমীর ও

রুকনউদ্দিন ও রাজিয়া

ওমরাহগণ সম্ভবতঃ স্ত্রীলোকের শাসনাধীন হওয়া অপমানজনক মনে করিয়া রাজিয়ার পরিবর্তে ইলতুৎমিসের অপর এক পুত্র রুকনউদ্দিনকে সিংহাসনে বসাইলেন। রুকনউদ্দিন বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন; রাজ্যশাসনের কোন যোগ্যতা তাঁহার ছিল না। তাঁহার অপদার্থতা ও নিষ্ঠুর আচরণে বিরক্ত হইয়া ওমরাহগণ রুকনউদ্দিনকে সিংহাসন হইতে সরাইয়া রাজিয়াকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। নারীর শাসনে থাকা অপছন্দ হওয়ায় রাজ্যের কয়েকজন আমীর ও কয়েকটি প্রাদেশিক শাসনকর্তা প্রথম দিকে রাজিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। কিন্তু নসরৎউদ্দিন তৈয়রসি নামে অযোধ্যার এক সামন্তের সাহায্যে এবং স্বীয় বুদ্ধি ও কূটকৌশলের বলে রাজিয়া সমস্ত বিপক্ষতা কাটাইয়া সর্বত্র স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিলেন।

সুলতানা রাজিয়া

কিন্তু অশেষ গুণাবলীর অধিকারিণী হইলেও মাত্র একটি ত্রুটির জন্যই রাজিয়ার সমস্ত সদ্‌গুণ নিষ্ফল হইয়া গেল। জামালুদ্দিন ইয়াকুৎ নামে একজন হাবসী অশ্বপালের প্রতি অতিরিক্ত ও অশোভন অনুগ্রহ প্রদর্শন করাতে তুর্কী আমীরগণ রাজিয়ার উপর বিরক্ত হইলেন। আলতুনিয়া নামে সরহিন্দের শাসনকর্তা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করিলেন। রাজিয়া এই বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া বিদ্রোহীদের হস্তে পরাজিত ও বন্দিনী হন। এদিকে আমীর ওমরাহগণ রাজিয়ার এক ভ্রাতা মুইজুদ্দিন বাহরামকে সিংহাসনে স্থাপন করে। রাজিয়া বিদ্রোহীদের নেতা আলতুনিয়াকে বিবাহ করিয়া স্বীয় শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করিলেন এবং সিংহাসন অধিকার করার জন্য দিল্লী-অভিমুখে অগ্রসর হইলে বাহরামের হস্তে পরাজিত ও নিহত হইলেন (১২৪০ খৃষ্টাব্দ)।

আলতুনিয়ার বিদ্রোহ

রাজিয়ার পরাজয় ও মৃত্যু

মাত্র সাড়ে তিন বৎসরকাল রাজিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন; রাজিয়া

ব্যতীত অন্য কোন নারী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। দিল্লীশ্বরী হইয়া তিনি অসাধারণ কর্মশক্তির এবং সকল কাজেই পুরুষোচিত গুণাবলীর পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু নারী ছিলেন বলিয়া তাঁহার বিবিধ সদ্‌গুণ ব্যর্থ হইয়া গেল। সমসাময়িক তুর্কী আমীরগণ নারীর প্রভুত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইল না বলিয়া রাজিয়ার জীবনের বিয়োগান্ত পরিণতি ঘটিল।

রিজিয়ার চরিত্র

নাসিরুদ্দিন মামুদ (১২৪৬ —১২৬৬) :—রাজিয়ার পরে আমীরগণ ক্রমান্বয়ে ইলতুৎমিসের দুই পুত্র বাহরাম ও আলাউদ্দিন মামুদকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। উহারা অপদার্থ ছিল বলিয়া ছয় বৎসরকাল রাজ্যময় বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ চলিয়াছিল। ১২৪১ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গলগণ ভারতবর্ষে অভিযান করে। এই সমস্ত সঙ্কটের হাত হইতে নিষ্কৃতির জন্য আমীরগণ ইলতুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দিন মামুদকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন (১২৪৬ খৃঃ)।

নাসিরুদ্দিন শান্তশিষ্ট ও ধর্মানুরাগী নরপতি ছিলেন। তিনি রাজ্যের প্রকৃত শাসনভার উলুঘ খাঁ নামে একজন কর্মদক্ষ ও গুণবান মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং বিদ্যাচর্চা ও ধর্মালোচনায় ব্যস্ত থাকিতেন। উলুঘ খাঁর প্রচেষ্টায় রাজ্যের ভিতরের ও বাহিরের সমস্ত বিদ্রোহ ও অশান্তি দূরীভূত হইয়াছিল। কুড়ি বৎসর রাজত্ব করার পর নিঃসন্তান অবস্থায় নাসিরুদ্দিন পরলোক গমন করিলে মন্ত্রী উলুঘ খাঁ গিয়াসউদ্দিন নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬—১২৮৭) :—তুর্কীস্থানের এক সম্ভ্রান্ত বংশে গিয়াসউদ্দিনের জন্ম হয়। বাল্যকালে তিনি মোঙ্গলগণের হস্তে বন্দী হইয়া বাগদাদে নীত হন। তথায় বসরার জামালুদ্দিন নামে এক ব্যক্তি তাঁহাকে মোঙ্গলগণের নিকট হইতে ক্রয় করেন। জামালুদ্দিন অপরাপর ক্রীতদাস সহ তাহাকে দিল্লীতে আনয়ন করেন। পরে ইলতুৎমিস বলবন সহ সকল ক্রীতদাসকে ক্রয় করেন। বীরত্ব ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়া বলবন ক্রমশঃ উচ্চপদে উন্নীত হন এবং ইলতুৎমিসের 'চল্লিশজন' তুর্কী ক্রীতদাসের অন্যতমরূপে পরিগণিত হন। প্রথমে তিনি ইলতুৎমিসের 'খাসদার' বা ব্যক্তিগত পরিচারক নিযুক্ত হইয়াছিলেন স্বীয় কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া কালক্রমে বলবন উচ্চপদে আরূঢ় হইলেন এবং নাসিরুদ্দিনের সঙ্গে তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়া তাঁহার রাজত্বকালেই প্রধান শাসক হইলেন নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পরে মৃত সুলতানের পূর্ব নির্দেশ অনুসারেই বলবন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

প্রথম জীবন

ক্রীতদাস হইতে সিংহাসন

গিয়াসউদ্দিন বলবনের বাইশ বৎসর রাজত্বকাল দিল্লী-সুলতানির রাজত্বের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। রাজকোষের অর্থাভাব ও ওমরাহগণের ষড়যন্ত্র ও স্বার্থান্বেষিতার জন্য রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা মোটেই ছিল না। উপরন্তু মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। বলবন প্রথমে সেনা-বিভাগের পুনর্ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগী হইলেন। তিনি নাসিরুদ্দিনের আমলে দীর্ঘকাল শাসনের অভি-জ্ঞতার বলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে রাজ-শক্তিকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সুগঠিত সৈন্যবাহিনী অত্যাবশ্যক। তিনি পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীকে

গিয়াসউদ্দিন বলবন

নূতন করিয়া বিন্যাস করিয়া উহাদিগকে বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ মালিকদের অধীনে স্থাপন করিলেন। উচ্চাভিলাষী ওমরাহদের ষড়যন্ত্র ও ক্ষমতা বিনষ্ট করার জন্য তিনি ঐ সকল জায়গীরভোগী ওমরাহদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে তদন্ত করার আদেশ দেন। এই আদেশে ভীত হইয়া ওমরাহগণ স্বীয় কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয় ও ইহাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বহুলাংশে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ওমরাহদের কার্য্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য তিনি গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

(ওমরাহগণের ক্ষমতা খর্ব করা)

মেওয়াট বা আলোয়ার অঞ্চলের রাজপুত দস্যুগণ দিল্লীর সন্নিহিত অঞ্চলে লুটতরাজ করিয়া সন্ত্রাসরাজত্বের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই মেওয়াট দস্যুদের দমন করার জন্য সুলতান পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া দস্যুদলকে নির্মূল করেন।

(মেওয়াটী দস্যুদমন)

অতঃপর বলবন মোঙ্গল আক্রমণের বিভীষিকা হইতে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য উদ্যোগী হইলেন। ইলতুৎমিসের সময় হইতে মোঙ্গলগণ বারংবার ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হানা দিতেছিল। নাসিরুদ্দিনের সময়ে বলবন স্বয়ং মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। বলবনের সময়ে মোঙ্গলগণ পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশের দিকে অগ্রসর হইল। মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সুলতান স্বয়ং লাহোরে যাইয়া উক্ত অঞ্চলস্থিত দুর্গের পুনর্নির্মাণের আদেশ দেন। সুলতানের জনৈক আত্মীয় শের খাঁ সাঙ্কর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া সুদীর্ঘকাল দক্ষতার সহিত সীমান্ত রক্ষা করিতেছিলেন। এই সময়ে শের খাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঐতিহাসিক বারুণীর মতে সুলতান শের খাঁর ক্ষমতাবৃদ্ধিতে ভীত হইয়া বিষ প্রয়োগে তাহাকে হত্যা করেন। শের খাঁর মৃত্যুতে মোঙ্গলগণ অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। অগত্যা মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সুলতান দুই পুত্র মহম্মদ ও বঘ্রা খাঁকে দুইটি স্থানে নিযুক্ত করিলেন। ইহাদের যুগ্ম আক্রমণে মোঙ্গলদের অভিযান সাময়িকভাবে প্রতিহত হইল (১২৭৯ খৃঃ)।

(মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ)

মোঙ্গল আক্রমণের সুযোগে বাংলাদেশের শাসনকর্তা তুঘ্রিল খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। তুঘ্রিলের বিরুদ্ধে প্রথম আমির খাঁ প্রেরিত হইল, কিন্তু আমির খাঁ পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। দ্বিতীয়বার প্রেরিত অপর এক সেনাপতির অভিযানও ব্যর্থ হইলে সুলতান স্বয়ং তুঘ্রিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তুঘ্রিল পূর্বাহ্নেই রাজধানী 'লখনৌটি' পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে ধৃত হইয়া অসংখ্য অনুচরসহ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। বলবন পুত্র বঘরা খাঁ-কে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

(বঙ্গদেশে তুঘ্রিল খাঁর বিদ্রোহ)

১২৮৫ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গলগণ পাঞ্জাব আক্রমণ করিলে সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করিতে যাইয়া নিহত হইলেন। পুত্রশোকের আঘাতে অশীতিপর সুলতান ১২৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

গিয়াসউদ্দিন বলবনের চরিত্র ও কৃতিত্বঃ—বলবন দিল্লী দাস রাজগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি। কঠোর ও নির্মম হইলেও তিনি ন্যায়পরায়ণ আদর্শ নরপতি ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের কঠোরতা তৎকালীন প্রয়োজন হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। সুলতানের পক্ষে কঠোর নীতি ব্যতীত উচ্চাশী আমীরশ্রেণী, বিদ্রোহী প্রদেশ বা মোঙ্গল আক্রমণের বিভীষিকা হইতে সাম্রাজ্য রক্ষা করা দুরূহ হইত।

আদর্শ শাসক

নরপতির কর্তব্য সম্বন্ধে বলবনের ধারণা সুস্পষ্ট ছিল এবং তিনি এই আদর্শ অনুযায়ী চলিতে চেষ্টা করিতেন। শরিয়তের বিধান অনুযায়ী ধর্মবিধি যাহাতে রক্ষিত হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা, অন্যায় ও অপরাধমূলক কার্য্য নিবারণ করা, সৎকর্মচারী নিয়োগ এবং সুবিচারের প্রবর্তন করা—মোটামুটি ইহাই বলবনের প্রজাশাসনের আদর্শ ছিল রাজ্যের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য বলবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হওয়ায় তিনি রাজ্যের পরিসর বৃদ্ধির জন্য কোন যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত অথবা সর্বাত্মক শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য উদ্যোগী হন নাই। এতৎ সত্ত্বেও ইহা নিঃসন্দেহ যে মধ্যযুগীয় মুসলমান নরপতিদের মধ্যে বলবনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদি অশান্তিময় ব্যাপারে লিপ্ত থাকিলেও বলবন বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী সুলতান ছিলেন। মোঙ্গলদের আক্রমণে রাজ্যচ্যুত অনধিক পঞ্চদশজন এশিয়ার নরপতি তাঁহার দরবারে আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিখ্যাত কবি আমীর খস্রু বলবনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার কর্তব্যকুশলতা ও সুদক্ষ শাসনব্যবস্থার ফলে দিল্লী-সুলতানির দৃঢ়তা ও মর্য্যাদা দুই-ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

দিল্লীর সুলতানির মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি

দাস রাজবংশের তালিকা
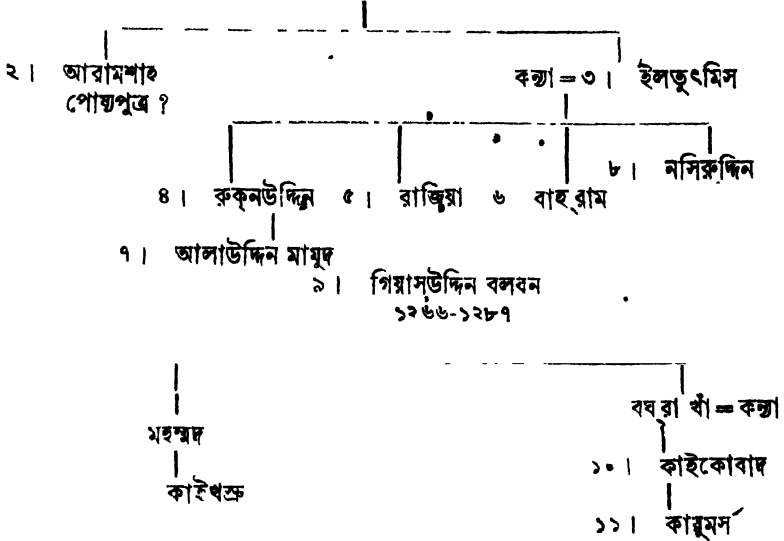
প্রশ্নোত্তর

1. Write what you know about the greatest Sultan of the slave dynasty.

দাসবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

উত্তর-সূত্র : (১) গিয়াসউদ্দিন বলবন দাসবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তাঁহার সিংহাসনারোহণের প্রাকালে দিল্লী সুলতানির দুর্বলতা ও নানাবিধ সমস্যা : রাজিয়ার পরবর্তী সুলতানগণ অপদার্থ ছিলেন সুতরাং রাজকোষের অর্থাভাব, ওমরাহগণের ষড়যন্ত্র, শান্তিশৃঙ্খলার অভাব, সমর বিভাগের দুর্বলতা, প্রাদেশিক বিদ্রোহ এবং সর্বোপরি মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কা বর্তমান ছিল। গিয়াসউদ্দিনের বাইশ বৎসর রাজত্বকালীন কৃতিত্বের ফলে উপরোক্ত সমস্যাসমূহ দূরীভূত হইয়া দাসবংশ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হইয়াছিল।

(২) ওমরাহগণের ক্ষমতা খর্বীকরণ (৩ মেওয়াটি দস্যুদমন (৪) মোঙ্গল আক্রমণ নিবারণ ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা (৫) তুঘ্রিল খাঁর বিদ্রোহ দমন (৬) সুশাসনের ব্যবস্থা (৭) বিদ্যোৎসাহিতা ও বিপন্নের আশ্রয় (৮) চরিত্র ও কৃতিত্ব।

2. What were the contributions of Iltutmish and Balban for the consolidation of the Delhi Sultanate.

দিল্লী-সুলতানি সুদৃঢ়করণের ব্যাপারে ইলতুৎমিস ও বলবনের দান কতটুকু ছিল ?

উত্তর সূত্র : (১) **ভূমিকা :**—কুতুবুদ্দিন দিল্লী সুলতানির ভিত্তি স্থাপন করেন কিন্তু ইহাকে সুদৃঢ় ও বিস্তৃত করার ব্যাপারে পরবর্তী দুইজন সুলতান ইলতুৎমিস ও গিয়াসউদ্দিন বলবনের কৃতিত্ব অসামান্য। এই দুইজন সুলতানের প্রতিভা ও কর্মকুশলতার ফলে নাবালক দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজ্য আভ্যন্তরীণ ও বাহিরের অসংখ্য সঙ্কট হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হয় এবং ইহাদের রাজনৈতিক বুদ্ধি ও বাহুবলে কুতুবুদ্দিনের শাসিত সাম্রাজ্য বিস্তৃততর হইয়া সামান্য কয়েকটি স্থান ব্যতীত সমগ্র হিন্দুস্থানে পরিব্যাপ্ত হয়।

(২) **ইলতুৎমিস :** সিংহাসনারোহণের পরে বিভিন্ন সমস্যা (ক) সিন্ধু ও বাংলার স্বাতন্ত্র্য (খ গজনীর তাজউদ্দিন কর্তৃক পাঞ্জাব আক্রমণ (গ) উত্তর ভারতের মুসলমান জায়গীরদারগণ কর্তৃক দিল্লীর প্রভুত্ব অস্বীকার (ঘ) গোয়ালিয়র, রণথম্ভোর প্রভৃতির হিন্দুনরপতিগণ কর্তৃক দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার (ঙ) খিবার অধিপতির আশ্রয় প্রার্থনা ও চিঙ্গিস খাঁর আক্রমণ আশঙ্কা।

ইলতুৎমিস সার্থকভাবে উপরোক্ত সমস্যাসমূহের সমাধান করেন (মূল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) এবং নবগঠিত দিল্লী সুলতানির কেন্দ্রীয় শক্তিকে শক্তিশালী করিয়া তোলেন। বাগদাদের খলিফা কর্তৃক তিনি অভিনন্দিত হন।

(৩) ইলতুতমিসের পরবর্তীকালে রাজিয়া ও তাঁহার অযোগ্য ভ্রাতৃদ্বয়ের শাসন সময়ে দিল্লী সুলতানির পুনরায় সঙ্কট দেখা দেয়। নাসিরুদ্দিন দুর্বলচরিত্র ছিলেন বলিয়া তাঁহার কুড়ি বৎসর রাজত্বকালে সঙ্কটসমূহ আরও অধিক হয়। গিয়াসউদ্দিন বলবন বাইশ বৎসর শাসনকালের মধ্যে উপস্থিত সঙ্কটাবলীর হস্ত হইতে দিল্লী সুলতানিকে পরিত্রাণ করেন। দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন, মোঙ্গল-আক্রমণের আশঙ্কা হইতে সীমান্ত রক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করা এবং রাজ্যবিস্তার অপেক্ষা ওমরাহগণের ক্ষমতা খর্ব করিয়া সাম্রাজ্য ও সুলতানিকে সুসংহত করার প্রতি তাঁহার অধিক লক্ষ্য ছিল। ("All things oonsidered, Balban was a most remarkable ruler who saved the infant Muslim state

in India from the Mongal peril and by establishing social order paved the way for the military and administrative reforms of Alauddin Khilji".)

3. Make an estimate of the reign and character of Raziyya.

রাজিয়ার শাসনকাল এবং চরিত্র সম্বন্ধে বিবরণী লিখ।

উত্তর-সূত্র : (২০২ পৃষ্ঠা)।

4. Write briefly what you know about the reign of Giyashuddin Balban

গিয়াসউদ্দিন বলবন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

উত্তর-সূত্র : (২০৩ পৃষ্ঠা)।

চতুর্দশ অধ্যায়

খল্‌জি ও তুঘলক বংশের রাজত্ব

Syllabus :—Balban's weak successors up to Jalaluddin Firuz Khalji. Early career of Alauddin. The problems of State—Turks, Rajputs, Mongols, nobles. The Deccan campaigns of Malik Kafur. Alauddin's economic measures—revenue policy· The conception of secular sovereignty in a theological age. Nature of Khalji Imperialism. Historian Barni, poet Amir Khasru and saint Nizamuddin Aulia.

The Tugluq dynasty comes in on the crest of reaction of nobility. Muhammad Bin Tugluq—his intellectual attainments, a bundle of contradictions. Logical Measures but impatient and incompetent executions. Rebellion. Ibn Batuta. Firuz Shah—conflict with Bengal—Sind fiasco—theological reaction—revival of Jaigir—beneficent measunes. Iuvasion of Timur (1398 A. D.).

পাঠসূচী :—জালালুদ্দিন ফিরোজ' খল্‌জি পর্য্যন্ত দুর্বল উত্তরাধিকারিগণ—আলাউদ্দিনের প্রথম জীবন—রাজ্যশাসন সংক্রান্ত সমস্যা—তুর্কী, রাজপুত, মোঙ্গল ও আমীর ওমরাহগণ। মালিক কাফুরের দাক্ষিণাত্য অভিযান। আলাউদ্দিনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা—রাজস্বনীতি। ধর্মতান্ত্রিক যুগে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা। খলজি সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ। ঐতিহাসিক বারণি—কবি আমির খস্রু, সন্ত নিজামুদ্দিন আউলিয়া।

আমীর ওমরাহদের কার্য্যকলাপের প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ তুঘলক বংশের অভ্যুত্থান। মহম্মদ বিন তুঘলক—তাহার বিদ্যাবত্তা ও চারিত্রিক উৎকর্ষতা—স্বতঃ-বিরোধিতার সমষ্টি। যুক্তিসঙ্গত কার্য্যাবলী কিন্তু তাহাদের অধীর ও অক্ষম প্রয়োগ—বিদ্রোহ—ইবন বতুতা। ফিরোজ শাহ—বাংলার সহিত সংঘর্ষ -সিন্ধুদেশে বিপর্য্যয়—ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া,—জায়গীরদারির পুনঃ প্রবর্ত্তন—জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা,—তৈমুরের অভিযান (১৩৯৮ খৃষ্টাব্দ)।

দাসবংশের পতন :—বলবনের মৃত্যুর পরে তাঁহার পৌত্র ও বাংলার শাসনকর্তা বঘরা খাঁর পুত্র কায়কোবাদ দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। অল্প বয়সে বিশাল রাজ্য ও ধনসম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া কায়কোবাদ অতিমাত্রায় অসংযমী ও অমিতাচারী হইয়া পড়িলেন। রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য ওমরাহদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। ওমরাহগণের চক্রান্তে এবং পরামর্শে কায়কোবাদ বলবনের নির্বাচিত সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কাই খস্রুকে হত্যার আদেশ প্রদান করিলেন। কাই খস্রু মুলতান হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে নিহত হইলেন। অতঃপর কায়কোবাদ স্বয়ং একজন খল্‌জি ওমরাহের হস্তে স্বীয় প্রাসাদে নিহত হইলেন। জালালুদ্দিন খল্‌জি কায়কোবাদের নাবালক পুত্র কায়ুমার্সকে হত্যা করিয়া জালালুদ্দিন ফিরুজ শাহ নাম ধারণ পূর্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১২৯০ খৃঃ)।

কায়কোবাদ (১২৮৭—৯০)

জালালুদ্দিন ফিরুজ খল্‌জি (১২৯০—৯৬) :—জালালুদ্দিন খল্‌জি সত্তর বৎসর বয়সে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। খল্‌জিগণ প্রকৃত প্রস্তাবে জাতিতে তুর্কী ছিলেন কিন্তু সুদীর্ঘকাল আফগানিস্তানে বসবাসের ফলে ইহারা আফঘান ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। বিজাতীয় আচার-ব্যবহারের জন্য দিল্লীর তুর্কী ওমরাহগণ খল্‌জিগণকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। জালালুদ্দিন কায়কোবাদকে হত্যা করিয়া সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি দুর্বল চরিত্র ছিলেন। অথচ এই সময়ে রাজ্যের বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য বলবনের ন্যায় কঠোর শাসকের প্রয়োজন ছিল। ক্ষমাপরায়ণ চরিত্রের লোক বলিয়া তিনি বিদ্রোহী বা দস্যু-তস্করের প্রতি সমুচিত দণ্ডবিধান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। তাঁহার রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র অন্যান্য ওমরাহদের সহযোগিতায় সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, কিন্তু সুলতান অনুচিত দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করেন। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন তাঁহার বিনা অনুমতিতে দেবগিরিরাজ রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযান করেন (১২৯৪ খৃঃ)। এই আচরণ রাজনীতিবিরুদ্ধ, তথাপি জালালুদ্দিন ভ্রাতুষ্পুত্রকে শাস্তি না দিয়া অযোধ্যার শাসনভার দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মোঙ্গলগণ হলাগু খাঁয়ের পৌত্রের নেতৃত্বে হিন্দুস্থান আক্রমণ করে। কিন্তু তাহারা পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। মোঙ্গলদের মধ্যে অধিকাংশই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে; অবশিষ্ট বহু মোঙ্গল সুলতানের অনুমতিক্রমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সন্নিকটে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। ইহারা অতঃপর নব মুসলমান নামে পরিচিত হইল। মোঙ্গলদের

ক্ষমাপরায়ণ দুর্বল চরিত্রের লোক

প্রতি সুলতানের এই কারুণ্য প্রদর্শন পরবর্তীকালে দিল্লীর সুলতানির পক্ষে যথেষ্ট অশান্তির কারণ হইয়াছিল। দেশে কোন প্রকার অশান্তি না থাকিলে জালালুদ্দিন হয়তো একজন সুশাসকরূপে খ্যাতি লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু তৎকালীন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে শান্তনীতির কোন স্থান ছিল না। মাত্র ছয় বৎসর রাজত্ব করিবার পর ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে জালালুদ্দিন ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন কর্তৃক নিহত হন।

জালালুদ্দিন নিহত হন (১২৯৬ খৃঃ)

আলাউদ্দিন খল্জি (১২৯৬—১৩১৬) :—আলাউদ্দিন খল্জি জালালুদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রকে জালালুদ্দিন অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি স্বীয় কন্যার সঙ্গে আলাউদ্দিনের বিবাহ দিয়া তাঁহাকে কারা ও অযোধ্যার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আলাউদ্দিন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কর্মঠ ও রণদক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। প্রথমে তিনি সুলতানের অনুমতি লইয়া সসৈন্যে মালব জয় করেন এবং ভিলসা লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর ধনরত্ন অর্জন করেন। অতঃপর আলাউদ্দিন পিতৃব্যের বিনানুমতিতেই দাক্ষিণাত্যে অভিযান করিয়া দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রকে পরাজিত করেন। রামচন্দ্র প্রচুর ধনরত্ন ও ইলিচপুর (বেরার) তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। দাক্ষিণাত্য বিজয়ী ভ্রাতুষ্পুত্রকে অবাধ্যতার জন্য শাস্তির পরিবর্তে জালালুদ্দিন তাঁহাকে কারাতে অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত হইলেন। কারায় উপস্থিত হইলে আলাউদ্দিনের ইঙ্গিতে জালালুদ্দিন নিহত হইলেন। দেবগিরি হইতে প্রাপ্ত প্রচুর ধনরত্নের সাহায্যে আলাউদ্দিন জালালুদ্দিনের অনুরক্ত ওমরাহগণ ও জনসাধারণকে স্বীয় পক্ষভুক্ত করিয়া নির্বিঘ্নে দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। জালালুদ্দিনের পুত্রদ্বয়কে অন্ধ করিয়া অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখা হইল, সিংহাসনের সম্ভাব্য অপর উত্তরাধিকারিগণকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইল এবং জালালুদ্দিনের বিধবা মালিকা জাহান নজরবন্দী অবস্থায় রহিলেন। এইরূপে নিষ্কণ্টক হইয়া আলাউদ্দিন রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন।

আলাউদ্দিনের সুলতানী-পূর্ব জীবন

আলাউদ্দিন

মালব জয়

দেবগিরি অভিযান

জালালুদ্দিনের হত্যা

সিংহাসনে আরোহণের পরে আলাউদ্দিনকে বহু আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক বিঘ্ন-বিপক্ষতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তুর্কী ওমরাহগণের আনুগত্য সম্বন্ধে সন্দেহ, সিংহাসন লোভী আত্মীয়গণের ষড়যন্ত্র, মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কা এবং সর্বোপরি দিল্লীর অদূরে অবস্থিত নব-মুসলমানগণ কর্তৃক সুলতানের জীবননাশের চক্রান্ত প্রভৃতি সমস্যার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু নির্ভীক ও উদ্যমী সুলতান ধৈর্য্য সহকারে প্রতিটি বিপদের সম্মুখীন হন এবং সমস্ত বিঘ্ন কাটাইয়া উঠেন। আলাউদ্দিন কল্পনাবিলাসী ছিলেন না। বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট ছিল। বিদ্রোহ দমনে, বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার কাজে, সামরিক শক্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুন্ন রাখায়, ভারতের অভ্যন্তরে দিগ্বিজয় পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার ব্যাপারে এবং বিদ্রোহপ্রবণ ওমরাহগণকে সংযত রাখার জন্য কঠোর শাসননীতি প্রবর্তনে আলাউদ্দিন এই বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন।

প্রাথমিক বিঘ্ন ও তাহা অতিক্রম

আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে মোঙ্গলগণ পাঁচবার ভারত আক্রমণ করিয়া তাহাকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু আলাউদ্দিনের সতর্ক তৎপরতার ফলে তাহারা প্রত্যেকবারই পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৩০৭-১৩০৮ খৃষ্টাব্দে সর্বশেষ মোঙ্গল অভিযান হয়। মোঙ্গলদের নেতা গাজী তুঘলক পরাজিত ও নিহত হন এবং বহু সহস্র পরাজিত ও বন্দী মোঙ্গলকে হস্তী পদতলে পিষ্ট করিয়া নিহত করা হয়। সুলতানের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে মোঙ্গলগণ সুলতানের রাজত্বের অবশিষ্টকাল আর ভারত অভিযান করিতে সাহসী হয় নাই। মোঙ্গল আক্রমণ হইতে সাম্রাজ্য নিরাপদ করার জন্য আলাউদ্দিন সীমান্ত দুর্গ সমূহের যথোচিত সংস্কারে মনোনিবেশ করেন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার ভার একজন সুদক্ষ সেনাপতির উপর অর্পিত হয়। এই দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে অনধিক পঁচিশ বৎসরের অধিককাল ভারতবর্ষ মোঙ্গল আক্রমণ হইতে নিরাপদ ছিল।

মোঙ্গল আক্রমণ

মোঙ্গলগণ পরাজিত

দিল্লীর সন্নিকটে অবস্থিত ইসলাম ধর্মাবলম্বী নব-মুসলমান নামে পরিচিত মোঙ্গলগণের প্রতিও আলাউদ্দিন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। আশানুরূপ সরকারী উচ্চপদ বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়া মোঙ্গলগণ আলাউদ্দিনের প্রাণনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ অবগত হইয়া তিনি বিদ্রোহীদের প্রতি নির্মম শাস্তি বিধান

বিদ্রোহী নব-মুসলমানদের শাস্তিদান

করেন। সুলতানের আদেশে একদিনের মধ্যে বিশ হইতে ত্রিশ হাজার নব-মুসলমানকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়।

আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্যবিস্তার :—আলাউদ্দিন খল্‌জির রাজত্বকালে ভারতবর্ষে মুসলিম সাম্রাজ্যের যথেষ্ট বিস্তার হয়। তাঁহার সময়ে কেবল আর্য্যাবর্ত্তে নহে, বিন্ধ্য পর্ব্বত ও নর্মদার দক্ষিণ পর্য্যন্ত মুসলিম আধিপত্য বিস্তৃত হয় এবং আধিপত্য সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। আলেকজাণ্ডারের ন্যায় আলাউদ্দিন পৃথিবী বিজয়ের অভিলাষী হইয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রায় তাহার 'সিকান্দার গাজি' বা দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার উপাধি ব্যবহৃত হইয়াছিল। সসাগরা পৃথ্বীবিজয়ের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত না হইলেও তাঁহার সময়ে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে যে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাজ্যবিস্তারে উদ্যোগী হইয়া তিনি প্রথমে ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে গুজরাট বিজয়ের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। গুজরাটের রাজপুত নরপতি দ্বিতীয় রায় কর্ণদেব পরাজিত হইয়া কন্যা দেবলাদেবী সহ দেবগিরিরাজ রামচন্দ্রদেবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর গুজরাট অধিকার করিয়া গুজরাটের রাণী কমলাদেবীকে দিল্লীতে লইয়া যান। আলাউদ্দিন কমলা দেবীকে বিবাহ করিয়া প্রধানা মহিষী করেন। কিছুকাল পরে দেবগিরি আক্রমণকালে গুজরাটের নরপতির পলাতকা কন্যা দেবলাদেবী ধৃত হন। দেবলাদেবীর সঙ্গে আলাউদ্দিনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র খিজির খাঁ-র বিবাহ হয়। গুজরাট পরবর্ত্তী এক শতাব্দীর অধিককাল দিল্লীর অধিকারভুক্ত থাকে।

গুজরাট জয় ১২৯৭ খৃঃ

গুজরাট অধিকারের পর আলাউদ্দিন রাজপুতনার রণথম্ভোর আক্রমণ করেন এবং একবৎসর অবরোধের পরে উহা চৌহান বংশীয় রাজপুত নায়ক হামিরদেবের হস্ত হইতে অধিকার করিতে সমর্থ হন।

রণথম্ভোর বিজয়, ১৩০১ খৃঃ

অতঃপর আলাউদ্দিন মেবারের রাজধানী চিতোর দুর্গ অধিকার করিতে অগ্রসর হন। কয়েকমাস যুদ্ধের পরে চিতোর দুর্গ অধিকৃত হয়। আলাউদ্দিনের চিতোর বিজয়ের সঙ্গে একটি কাহিনী প্রচলিত যে তিনি মেবারের রাণা ভীমসিংহের (রতন সিংহ) মহিষী পদ্মিনীর অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে লাভ করার জন্য চিতোর অভিযান করেন। কিন্তু পদ্মিনী তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করার পরিবর্ত্তে বহু রাজপুত মহিলা সহ 'জহর ব্রত' করিয়া জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন করেন। বর্ত্তমান কালের বহু ঐতিহাসিক এই কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান। আলাউদ্দিনের চিতোর অধিকারের কয়েক বৎসর পরে রাজপুতগণ

চিতোর অধিকার

মেবারের রাণাবংশীয় হামির অথবা তাহার পুত্রের নেতৃত্বে মুসলমানের হস্ত হইতে চিতোর পুনরুদ্ধার করেন।

চিতোর বিজয়ের পরে আলাউদ্দিন ১৩০৫ খৃষ্টাব্দে মালব এবং অতঃপর উজ্জয়িনী, পাণ্ডু, ধার এবং চন্দেরী প্রভৃতি স্থান অধিকার করেন। ১৩০৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কাশ্মীর, নেপাল ও আসাম ব্যতীত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

মালব, উজ্জয়িনী, পাণ্ডু, ধার ও চন্দেরী বিজয়

অতঃপর আলাউদ্দিন দাক্ষিণাত্য অভিযানে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার দাক্ষিণাত্য অভিযানের পশ্চাতে সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য ব্যতীত অর্থনৈতিক স্বার্থও বর্ত্তমান ছিল। সেই সময়ে দাক্ষিণাত্য দেবগিরির যাদব রাজ্য, কাকতীয়বংশ শাসিত বরঙ্গল রাজ্য, দ্বার সমুদ্রের হোয়সলরাজ্য এবং সুদূর দক্ষিণের পাণ্ড্যরাজ্য প্রধানতঃ এই চারিটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর চারিবার দাক্ষিণাত্য অভিযান করিয়া কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারত মুসলমানের অধিকারভুক্ত করেন। দেবগিরির নরপতি রামচন্দ্রদেব ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিনকে যে বার্ষিক করপ্রদানে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তিনি তাহা গত তিন বৎসর যাবৎ বন্ধ করিয়া দেন। এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শাস্তিস্বরূপ আলাউদ্দিন মালিক কাফুরকে দেবগিরি অভিযানে প্রেরণ করেন। রামচন্দ্রদেব ভীত হইয়া আলাউদ্দিনের আনুগত্য স্বীকার করেন। রামচন্দ্রদেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র শঙ্কর আলাউদ্দিনের আনুগত্য অস্বীকার করিয়া করপ্রদান বন্ধ করিলে আলাউদ্দিন পুনরায় মালিক কাফুরকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিলেন। শঙ্কর পরাজিত ও নিহত হন। কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর অন্তর্বর্তী অঞ্চল মুসলমানের অধিকারে আসিল। অতঃপর আলাউদ্দিন মালিক কাফুরকে বরঙ্গল জয়ের জন্য প্রেরণ করিলেন। বরঙ্গলের কাকতীয়রাজ প্রতাপরুদ্রদেব যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রচুর ধনরত্ন দিলেন ও বার্ষিক করপ্রদানে সম্মত হইলেন। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে মালিক কাফুর দ্বারসমুদ্রের হোয়সল-নরপতি তৃতীয় বীরবল্লালকে পরাজিত করিয়া রাজধানী দ্বারসমুদ্রের মন্দির সমূহ হইতে লুণ্ঠিত বিপুল ধনসম্ভার দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। হোয়সলরাজ্য দিল্লীর করদরাজ্যে পরিণত হইল। পরবৎসর সেনাপতি মালিক কাফুর পাণ্ড্যরাজ্য আক্রমণ করিয়া উহার রাজধানী মাদুরায় উপস্থিত হন। পাণ্ড্যরাজ বীরপাণ্ড্য রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন।

দাক্ষিণাত্য বিজয়

(ক) দেবগিরি

(খ) বরঙ্গল ১৩০৮ খৃঃ

(গ) দ্বারসমুদ্র, ১৩১০ খৃঃ

(ঘ) পাণ্ড্যরাজ্য, ১৩১১ খৃঃ

মুসলমান সৈন্যগণ মাদুরা লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর ধনরত্ন লাভ করে। মালিক কাফুর সেতুবন্ধ-রামেশ্বর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া রামেশ্বরে একটি মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।)

আলাউদ্দিনের শাসনব্যবস্থা :—মাত্র দিগ্বিজয়ের দ্বারা সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া আলাউদ্দিন সন্তুষ্ট ছিলেন না। সুলতানের ক্ষমতা যাহাতে অবাধ ও শক্তিশালী হয়, তজ্জন্য তিনি পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথম দিকে ও মধ্যভাগে তাঁহাকে, বহুবার আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের দ্বারা বিব্রত হইতে হইয়াছিল। এই সকল বিদ্রোহ দমনের পর তিনি বিদ্রোহের মূল কারণ ও কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা অনুসন্ধান করিয়া চারিটি কারণে বিদ্রোহ হয় বলিয়া ধারণা করিলেন। প্রথমতঃ সাম্রাজ্যের সকল সংবাদ যথাসময়ে সুলতানের কর্ণগোচর হয় না, দ্বিতীয়তঃ, সুরাপানের ফলে লোকের সাময়িক মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটাতে তাহাদের উচ্চাভিলাষ বৃদ্ধি হয়; তৃতীয়তঃ, দরবারের আমীরগণ পরস্পরের সহিত বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়া ক্ষমতাপন্ন হয় ও সুলতানকে অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হয়। চতুর্থতঃ, লোকের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হইলে স্বভাবতঃ তাহারা সুলতানের প্রতি আনুগত্যে শৈথিল্য প্রকাশ করে। বিদ্রোহ ও সুলতানের ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করার মূল কারণসমূহ অবগত হইয়া সুলতান ভবিষ্যতে বিদ্রোহের সম্ভাবনা বিনষ্ট করার জন্য কঠোর নীতি অবলম্বন করেন। রাজ্যের সূক্ষ্মতম সংবাদ অবগত হইবার জন্য তিনি অসংখ্য গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন। তাহারা রাজ্যের তুচ্ছাতিতুচ্ছ সংবাদও সুলতানের কর্ণগোচরে আনিতে লাগিল। গুপ্তচরদের ভয়ে আমীর ওমরাহগণ কোন প্রকাশ্যস্থানে আলাপ-আলোচনা করিতে ভয় পাইত ও কথার পরিবর্ত্তে ইশারায় কাজ সারিত। সুরাপান নিষিদ্ধ হইল। স্বয়ং সুলতান সুরাপান পরিত্যাগ করিয়া দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন। ওমরাহগণের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা বা উৎসবাদিতে সামাজিকভাবে সম্মিলিত হওয়া সুলতানের অনুমতি-সাপেক্ষ হইল। প্রজাবর্গকে নিঃস্ব করিবার জন্য তিনি নানা উপায়ে প্রজাবর্গের ধন ও সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করিতে লাগিলেন। এই অর্থদোহনের ফলে সাম্রাজ্যের মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত কাহারও হস্তে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রাখাও কষ্টকর হইয়া পড়িল।

সৈন্য বিভাগের সংগঠন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করা এবং আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের হস্ত হইতে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য আলাউদ্দিনকে বিশাল সৈন্যবাহিনী পোষণ করিতে হইত, কিন্তু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বাজার মূল্য হ্রাস না করিলে বিশাল বাহিনীর ব্যয় নির্বাহ করা আলাউদ্দিনের পক্ষে অসম্ভব ছিল। সামরিক বিভাগের ব্যয়লাঘবের জন্য তিনি বাজারে বিক্রীত বিভিন্ন

পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার আদেশ দিয়াছিলেন। সামরিক বিভাগের জন্য নির্ধারিত মূল্যে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য দ্রব্য সরকার হইতে ক্রীত হইত এবং নিয়ন্ত্রিত মূল্যবিধি লঙ্ঘনকারী বিক্রেতাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইত। নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য আলাউদ্দিন দেওয়ান-ই-রিয়াসৎ ও শাহান-ই-মণ্ডী উপাধিধারী দুইজন কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ফলাফল

আলাউদ্দিনের এই জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে রাজকোষ পূর্ণ হইলেও প্রজাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। প্রজাদের সৌখীন বস্ত্র পরিধান, অশ্বারোহণ কিম্বা অস্ত্রধারণের ক্ষমতা রহিল না। এই প্রকার কঠোর ব্যবস্থায় সুলতানের উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল—সৈন্য বিভাগের ব্যয়সঙ্কোচ হইয়াছিল। শৃঙ্খলা ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা দ্বারা আলাউদ্দিন অভীষ্ট ফল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

খলিফার আনুগত্যে অনাস্থা

আলাউদ্দিনের ধর্মমত :—আলাউদ্দিন সুন্নীসম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান ছিলেন। আলাউদ্দিনের সময়ে মুসলিম জগতের ধর্মগুরু খলিফার প্রতিপত্তি মোটেই ছিল না। মোঙ্গলগণ বাগদাদ ধ্বংস করিয়া আব্বাসীয় খিলাফতের অবসান ঘটাইয়াছিল। অবশ্য খিলাফতের আদর্শ মুসলিম জগত হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। দাস বংশীয় সুলতান ইলতুৎমিস, বলবন প্রভৃতি খলিফার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু আলাউদ্দিন ইহাদের অপেক্ষা স্বতন্ত্র ছিলেন। তিনি খলিফার নিকট হইতে কোন স্বীকৃতিপত্র গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই বরঞ্চ স্বয়ং ইযামিন-উল-খিলাফত (খলিফার ডান হাত) এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উলেমাদের উপদেশ অগ্রাহ্য করা

পূর্ববর্তী সুলতানগণ 'উলেমা'দের দ্বারা উপদিষ্ট শরিয়তের বিধান অনুযায়ী রাজ্য শাসন করিতেন, কিন্তু আলাউদ্দিন রাষ্ট্রশাসনের ব্যাপারে উলেমাগণের হস্তক্ষেপ ও উপদেশ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া চলিতেন। প্রজাকল্যাণ বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য যাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইত তাহা শরিয়তী বিধানের বিরুদ্ধ হইলেও তিনি কার্যে পরিণত করিতেন। ইসলামের ধর্মনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করা তিনি পছন্দ করিতেন না। কিন্তু শরিয়তী শাসন অনুযায়ী রাজ্যপরিচালনা না করিলেও ইসলাম ধর্মে আলাউদ্দিনের প্রগাঢ় আস্থা ছিল। ভারতের বাহিরে আলাউদ্দিন ইসলামের রক্ষক বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

হিন্দুনীতি

তিনি ইসলামের বিধান অনুযায়ী বিধর্মীদের প্রতি আচরণ করিতেন। হিন্দুগণকে জিজিয়া ও অন্যান্য নানাবিধ কর প্রদান করিতে হইত। আলাউদ্দিনের

করনীতি হিন্দুদের বিরুদ্ধে এমন কঠোরভাবে প্রতিপালিত হইল যে হিন্দু জমিদারবংশের মহিলাগণ পর্যন্ত উদরান্নের জন্য মুসলমানের গৃহে পরিচারিকা বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

আলাউদ্দিনের শাসনরীতি প্রধানতঃ সামরিক শক্তি ও অতি কঠোরতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকায় তাঁহার প্রথম জীবনে লাভজনক হইলেও পরিণামে বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যক্ষ এই নীতি সফল হইলে পরোক্ষে ইহা খলজি সাম্রাজ্যের ক্ষতিকারক হইয়াছিল। প্রকাশ্যে ক্ষমা করিলেও গোপনে আমীর ওমরাহ ও হিন্দুগণ তাঁহার সর্বনাশ কামনা করিত। শেষ জীবনে আলাউদ্দিন অত্যন্ত খামখেয়ালী ও কোমল স্বভাবাপন্ন হইয়াছিলেন।

শেষ জীবন

অতিরিক্ত পরিশ্রম, অপরিমিত মদ্যপান এবং শরীরের উপর অস্বাভাবিক অত্যাচারের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। তিনি মালিক কাফুর প্রভৃতি কয়েকজন প্রিয়পাত্রের হস্ত-ক্রীড়নক হইয়া সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে দলাদলি ও ষড়যন্ত্র সৃষ্টির সুযোগ করিয়া দেন। মালিক কাফুরের ষড়যন্ত্রে আলাউদ্দিনের স্ত্রী ও পুত্র তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই সকল অশান্তি ও ষড়যন্ত্রের মাঝখানে উদরী রোগে আলাউদ্দিনের জীবনাবসান হয় (১৩১৬ খৃঃ)। অনেক সন্দেহ করেন কাফুর বিষপ্রয়োগে তাঁহার প্রাণ সংহার করেন।

আলাউদ্দিনের চরিত্র ও কৃতিত্ব:—মধ্যযুগীয় এক-নায়ক শাসকের মত আলাউদ্দিনের চরিত্রে দোষগুণ উভয়ের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। দিল্লী-সুলতানিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি কোন প্রকার ন্যায়নীতি বা স্নেহমমতা প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিকে প্রশ্রয় দেন নাই।

দোষগুণের সমাবেশ

ইসলামের শরিয়তী বিধানের সঙ্গে তাঁহার নীতির অনৈক্য ঘটিয়াছিল বলিয়া তিনি উলেমাদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ধর্মানুবর্তিতার যুগে আলাউদ্দিনের ধর্মাতিরিক্ত রাজ্যশাসন তাঁহার স্বাধীন চিন্তাশক্তির প্রমাণ করে। মোট কথা কেন্দ্রীয় শক্তিবৃদ্ধির জন্য তিনি যাহা উপযুক্ত মনে করিয়াছেন তাহাই কার্যে পরিণত করিয়াছেন।

আলাউদ্দিন স্বয়ং নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু সাহিত্য ও শিল্পের সমাদর করিয়া স্বীয় চরিত্রের কোমলতার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। কবি আমির খসরু ও হাসান তাঁহার সভাসদ ছিলেন। তাঁহার আদেশে বহু দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে আলাই-দুর্গ উল্লেখযোগ্য। কুতুবমিনারের আলাই দরওয়াজা তাঁহার কীর্তি। তিনি সিরি নামে এক নূতন শহর নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

শিল্প ও সাহিত্যের সমাদর করিতেন

অসীম উচ্চাভিলাষের অধিকারী হওয়ার জন্য তিনি আলেকজাণ্ডারের মত পৃথিবী জয়ের আশা পোষণ করিতেন বা হজরত মহম্মদের মত নূতন ধর্ম প্রচার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তব বুদ্ধির অধিকারী হওয়ার জন্যই তিনি এই সমস্ত উচ্চাভিলাষকে কার্যে পরিণত করার জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই, সমগ্র হিন্দুস্থান জয় করিয়াই তিনি পরিতৃপ্ত ছিলেন। বীরত্ব শাসনদক্ষতা, সাম্রাজ্য বিস্তার বা সাহিত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার দিক দিয়া বিবেচনা করিলে আলাউদ্দিন যে ভারতীয় তুর্কী সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ।

খল্‌জি সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ ঃ—আলাউদ্দিন সমগ্র ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া এই বিরাট সাম্রাজ্য শাসনের জন্য যে নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করেন তাহা মূলতঃ মুসলিম শাসকদের জন্য বিহিত শাসনরীতির বাহির্ভূত ছিল না। মুসলিম জগতের সকল মুসলিম শাসকের আটটি অবশ্য প্রতিপাল্য কর্তব্য ছিল। যথা, রাজ্যজয়, রাজ্যরক্ষা, ইসলামের প্রচার, ইসলামের বিধি অনুযায়ী প্রজাদের বিবাদের মীমাংসা, মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ, উলেমাদের পৃষ্ঠ-পোষকতা, মুসলমান প্রজার মঙ্গলবিধান, অ-মুসলমানদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন ও আশ্রিত অ-মুসলমান প্রজা বা জিম্মিকে রক্ষা করা। আলাউদ্দিন মুসলিম শাসকরূপে ইসলামের উপরিউক্ত আটটি নির্দেশ যথা-সম্ভব পালন করিয়াছেন। মুসলিম ধর্মের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি বিধর্মী হিন্দুর উপর জিজিয়া কর স্থাপন করেন। এই সমস্ত নীতি অনুসরণ করিয়া ইসলাম-প্রীতির পরিচয় দিলেও তিনি রাজ্যশাসন ও সংরক্ষণ ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশগুলি লঙ্ঘন করিতেন। এই প্রসঙ্গে কাজি মুঘিসউদ্দিনের নিকট আলাউদ্দিনের উক্তি উল্লেখযোগ্য—"ন্যায় অন্যায় আমি বুঝি না ; রাজ্যের কল্যাণের জন্য বা জরুরী অবস্থায় যাহা উপযোগী তাহাই আমি করিব"। প্রজার উপর করভার বৃদ্ধি, প্রজার সম্পত্তি বা অর্থ অপহরণের ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে তিনি তারতম্য করিতেন না। রাজ্য রক্ষার জন্য তিনি 'নব-মুসলিম', মুসলিম ও হিন্দু বিদ্রোহীর মধ্যে শাস্তি বিধানে কোন পৃথক নীতির অনুসরণ করেন নাই। মোট কথা খল্‌জি সাম্রাজ্য প্রধানতঃ মুসলিম আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও খল্‌জি সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য আলাউদ্দিন নিঃসঙ্কোচে ইসলামের নির্দেশ লঙ্ঘন করিতেন। ইহাই খল্‌জি সাম্রাজ্যের স্বরূপ ছিল।

আলাউদ্দিনের পরবর্তী খল্‌জি সুলতানগণ ঃ—আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর মালিক কাফুরের চক্রান্তে আলাউদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির খাঁর পরিবর্তে আলাউদ্দিনের

এক নাবালক পুত্র শিহাবুদ্দিন ওমর দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইল। উচ্চাকাঙ্ক্ষী মালিক কাফুর স্বয়ং সিংহাসন অধিকারের প্রত্যাশায় আলা-উদ্দিনের পুত্রদ্বয় খিজির খাঁকে ও সানি খাঁ-কে অন্ধ করিয়া রাখিলেন। ইতিমধ্যে মালিক কাফুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া আলাউদ্দিনের ক্রীতদাসগণ তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয় এবং কাফুর ইহাদের হস্তে নিহত হয়। অতঃপর আলাউদ্দিনের তৃতীয় পুত্র মোবারক সিংহাসনে উপবিষ্ট কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসনচ্যুত ও অন্ধ করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মোবারক মাত্র চারিবৎসর (১৩১৬—১৩২০ খৃঃ) রাজত্ব করেন।

শিহাবুদ্দিন

মোবারক

মোবারক তাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগে আলাউদ্দিনের কৃত অত্যধিক কর তুলিয়া দিয়া রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া এবং বাজেয়াপ্ত জায়গীরসমূহ প্রত্যর্পণ করিয়া সকলের সহানুভূতি অর্জন করেন। তাঁহার সময়ে দেবগিরি ও গুজরাট দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। মোবারকের প্রিয়পাত্র খস্রু দেবগিরির বিদ্রোহ দমন করিয়া দেবগিরি অধিকার করেন। দেবগিরির শাসনভার একজন মুসলমানের হস্তে ন্যস্ত হয়। এই সাফল্যের ফলে মোবারকের মতিভ্রম দেখা দিল। তিনি শাসনকার্য্যে অবহেলা করিয়া বিলাসব্যসনে মত্ত হইলেন এবং সাম্রাজ্যের হিতৈষী ওমরাহগণের উপর উদ্ধত ও অসম্মানজনক আচরণ করিতে লাগিলেন। মোবারকের প্রিয়পাত্র খুস্রু একদা নিশীথে মোবারককে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিল (১৩২০ খৃঃ)। খস্রু মাত্র চারিমাস রাজত্ব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। খস্রুর দুর্ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া ওমরাহগণ পাঞ্জাবের দীপালপুরের সীমান্তশাসক গাজি মালিককে সিংহাসন অধিকার করিতে আহ্বান করেন। গাজি মালিক ওমরাহগণের সাহায্যে দিল্লীর যুদ্ধে খস্রুকে পরাজিত করেন (১৩২০ খৃঃ)। খস্রুর শিরশ্ছেদ হইল এবং তাঁহার সমর্থকগণ নিহত হইলেন, আলাউদ্দিনের বংশে কেহ জীবিত না থাকায় ওমরাহগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া গাজি মালিক গিয়াসউদ্দিন তুঘলক নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৩২০ খৃঃ)। এইভাবে দিল্লীতে তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠা হইল।

খস্রু

তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠা

তুঘলক বংশ : গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (১৩২০—২৫) :—গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বৃদ্ধ বয়সে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পরে দিল্লী-সাম্রাজ্যে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়, গিয়াসউদ্দিনের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের

ফলে পাঁচ বৎসরের মধ্যে সমস্ত বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হইয়া দেশে শান্তি সংস্থাপিত হয়। সুলতানের অনুগ্রহে জনসাধারণের করভার লাঘব হইল, কৃষির উন্নতি হইল, জল সেচের জন্য অসংখ্য খাল খনিত হইল এবং দস্যুদলের হস্ত হইতে কৃষক সম্প্রদায়কে রক্ষা ও আশ্রয় প্রদানের জন্য স্থানে স্থানে কেল্লা নির্মিত হইল। বিচার ও শান্তিরক্ষার ব্যাপারে বিভিন্ন সংস্কারের প্রবর্তন করিয়া তিনি শাসন ব্যবস্থার উন্নতি করেন। কবি আমির খস্রুর জন্য মাসিক এক সহস্র তঙ্কার বন্দোবস্ত করিয়া তিনি গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন।

শান্তি, শৃঙ্খলা ও বিভিন্ন সংস্কার

সাম্রাজ্য রক্ষা ও বৃদ্ধির ব্যাপারেও গিয়াসউদ্দিন কৃতিত্বের পরিচয় দেন। বরঙ্গলের কাকতীয় প্রতাপ দিল্লীর প্রভুত্ব অস্বীকার করিলে গিয়াসউদ্দিনের পুত্র জোনা খাঁ (পরবর্তীকালে মহম্মদ তুঘলক) বরঙ্গল আক্রমণ করিয়া দিল্লীর অধীনে আনয়ন করেন। বঙ্গদেশের অধিকার লইয়া বলবনের পুত্র বঘরা খাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। সুলতান স্বয়ং বঙ্গদেশে আসিয়া এই বিবাদের মীমাংসা করেন এবং নাসিরুদ্দিনকে বঙ্গের সিংহাসনে স্থাপন করেন। বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে সুলতান ত্রিহুত অধিকার করিয়া ত্রিহুতকে দিল্লীর অধীনে আনয়ন করেন।

বরঙ্গল অধিকার

বঙ্গদেশের বিরোধ দূর করেন

বঙ্গদেশের বিরোধ মিটাইয়া গিয়াসউদ্দিন দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলে পুত্র জোনা খাঁ গিয়াসউদ্দিন নির্মিত তুঘলকাবাদে পিতাকে অভ্যর্থনা করার জন্য একটি কাষ্ঠমণ্ডপ নির্মাণ করেন। মণ্ডপে প্রবেশ কালে অকস্মাৎ মণ্ডপের তোরণটি ভাঙ্গিয়া পড়ায় গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যু হয় (১৩২৫ খৃঃ)। ইবন বতুতার মতে কোন আকস্মিকতার জন্য মণ্ডপটি ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই—জোনা খাঁর পূর্ব পরিকল্পিত বন্দোবস্তের ফলেই কাষ্ঠ মণ্ডপটি ভাঙ্গিয়া পড়ে। জোনা খাঁ পিতার মৃত্যুর পরে মহম্মদ বিন্ তুঘলক নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যু ১৩২৫ খৃঃ

মহম্মদ বিন্ তুঘলক (১৩২৫—৫১)—মধ্য যুগের নরপতিদের মধ্যে মহম্মদ বিন্ তুঘলক যে সর্বাপেক্ষা বিচিত্র ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই পাণ্ডিত্যের দিক দিয়া তিনি মুসলমান বিজয়ের পরবর্তী ভারতীয় মুসলমান সুলতানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার মধ্যে সর্বতোমুখী প্রতিভার সমাবেশ হইয়াছিল। তর্কবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ও অঙ্কশাস্ত্র, দর্শন ও বিজ্ঞানে তাঁহার জ্ঞান ছিল যথেষ্ট। বিখ্যাত পারসী কবিতাসমূহ তাঁহার

চরিত্রের গুণাবলী

কণ্ঠস্থ ছিল এবং স্বয়ং এই ভাষায় উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। এতদ্ব্যতীত দয়াদাক্ষিণ্যের জন্যও তিনি খ্যাত ছিলেন। তিনি ধর্মপ্রাণ ছিলেন এবং কোরানের নির্দেশ নিখুঁতভাবে পালন করিতেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে পূর্ববর্তী সুলতানদের ন্যায় ধর্মান্ধতা ছিল না। হিন্দুদের প্রতি তিনি সদয় ব্যবহার করিতেন এবং হিন্দুদের 'সতী' প্রথা বন্ধ করার দুঃসাহস দেখাইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন এবং ব্যাভিচার, সুরাপান প্রভৃতি তৎকালীন সুলতানদের নৈতিক কলুষতা হইতে মুক্ত ছিলেন। বিনয় ও দানশীলতা তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, দান ও উপহার প্রদানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। সেনাপতি হিসাবেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতির পরিচয় দিয়াছিলেন।

মহম্মদ বিন্ তুঘলক

কিন্তু এত বিভিন্ন গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মহম্মদ তুঘলকের ছাব্বিশ বৎসর রাজত্বকাল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। এই শোচনীয় ব্যর্থতার প্রধান কারণ মহম্মদের চরিত্রে বাস্তব বুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞানের অভাব। এতদ্ব্যতীত ক্রোধ ও হঠকারিতা তাঁহার চরিত্রের অন্যতম ত্রুটি ছিল। স্বীয় ইচ্ছার বিরোধিতা মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না। বহু ঐতিহাসিক মহম্মদ তুঘলককে স্বভাব-নিষ্ঠুর ও নরশোণিতপিপাসু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাকে অস্থির মস্তিষ্ক বা উন্মাদ বলিয়াছেন, কেহ কেহ তাঁহার মধ্যে বিরোধী-স্বভাবের সমাবেশ ঘটিয়াছে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মোট কথা, মানব চরিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও বাস্তববিমুখিতাই তাঁহার শাসনকালের ব্যর্থতার মূলে রহিয়াছে।

স্ববিরোধী চরিত্র বলিয়া ব্যর্থ

রাজত্বকালের প্রথম দিকেই তিনি গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলের রাজস্ব অত্যধিক বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। এই করবৃদ্ধির ফলে প্রজাদের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। প্রজাগণ অতিরিক্ত করপ্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া বিদ্রোহী হইল বা জমি-জমা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিল।

দোয়াবে কর বৃদ্ধি

প্রজাদিগের ফিরাইয়া আনিবার জন্য মহম্মদ তুঘলক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সৈন্যগণ কৃষকদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিল। এই রাজস্বের হার বৃদ্ধির সময়ে দোয়াবে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষের ফলে অসংখ্য লোক মারা গেল। সমস্ত সংবাদ অবগত হইবার পর অবশ্য সুলতান দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজাদের জন্য কৃষি ঋণ, কূপ খনন ইত্যাদি দুর্ভিক্ষ-লাঘবের উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন কিন্তু এই সমস্ত বিধিব্যবস্থা বিলম্বে হওয়ায় কোন ফলোদয় হয় নাই।

দুর্ভিক্ষ ও প্রজাদের কষ্ট

অতঃপর মহম্মদ তুঘলক দিল্লী হইতে দেবগিরিতে রাজধানী পরিবর্তন করার মনস্থ করিলেন। দেবগিরির নূতন নামকরণ হইল দৌলতাবাদ। জনসাধারণ দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া সাতশত মাইল দূরবর্তী স্থানে গমন করিতে আপত্তি করিলে সুলতান ক্রুদ্ধ হইয়া দিল্লীর সমস্ত নাগরিককে বাধ্যতামূলকভাবে নূতন রাজধানীতে যাইতে নির্দেশ দিলেন। সুলতানের নির্দেশ কঠোরভাবে প্রতিপালিত হইল। পথক্লেশে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটিল। আট বৎসর পরে সুলতান স্বীয় ভ্রম উপলব্ধি করিয়া দেবগিরি হইতে সকলকে দিল্লী ফিরিয়া আসিতে আদেশ দিলেন। এইবারেও পথপর্যটনের ক্লেশে অনেক লোকের প্রাণহানি হইল। দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা একেবারে অযৌক্তিক ছিল না। মহম্মদ তুঘলকের সাম্রাজ্য প্রায় সমগ্র ভারতব্যাপী ছিল। ইত্যবস্থায় দিল্লী অপেক্ষা দেবগিরি রাজধানী হইলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র দৃষ্টি প্রদান করা সুবিধাজনক হইত। কিন্তু দিল্লীর সমগ্র নাগরিককে আবশ্যিকভাবে দেবগিরি গমনের আদেশ দিয়া মহম্মদ তুঘলক ভুল করিয়াছিলেন। অবশ্য আর এক দিক্ দিয়া সাম্রাজ্যের অসুবিধাও ঘটিত। সুদূর দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত দেবগিরি হইতে সম্ভাবিত মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে আসা সুলতানের পক্ষে দুরূহ হইত এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার কার্যেও বিঘ্ন ঘটিত।

দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিতকরণ

দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপনের অনতিকাল পরেই ট্রান্স-অক্সিয়ার চাঘতাই অধিপতি মোঙ্গল নেতা তারমাসিরিণ খাঁ সসৈন্যে পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়া দিল্লীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। মহম্মদ তুঘলক মোঙ্গলদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া বিতাড়িত করেন। আবার কোন ঐতিহাসিক বলেন তিনি যুদ্ধের পরিবর্তে প্রচুর অর্থ দিয়া মোঙ্গলগণকে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় করেন।

মোঙ্গল আক্রমণ

মহম্মদ তুঘলক মুদ্রানীতির সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়া রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে

তাম্রমুদ্রার প্রবর্তন করিলেন। অর্থনীতির দিক্ দিয়া এই সংস্কার আপত্তিজনক ছিল না, বরঞ্চ ইহাতে সাফল্য লাভ করিলে শূন্য রাজকোষ অর্থপূর্ণ হইতে পারিত। কিন্তু জাল মুদ্রার বিরুদ্ধে কোন সরকারী প্রতিবিধানের ব্যবস্থা না থাকায় জাল নোটে বাজার ছাইয়া গেল। জাল নোটের প্রচলনের ফলে সরকারী নোটের মূল্য একেবারে কমিয়া গেল। বিদেশী বণিকগণ তাম্র মুদ্রার নোট গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল - ব্যবসা বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। মহম্মদ তুঘলক নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া চারি বৎসর পরে তাঁহার নোট প্রত্যাহার করিলেন এবং রাজকোষ হইতে প্রতিটি তামার নোটের প্রকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্য মূল্য প্রদান করিলেন। ইহাতে রাজকোষ সম্পূর্ণ অর্থশূন্য হইয়া কেবলমাত্র তামার নোটে পূর্ণ হইয়া রহিল। এই অবস্থায় সরকারী তহবিলের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

তামার নোটের প্রচলন

আলাউদ্দিনের ন্যায় মহম্মদ তুঘলক দিগ্বিজয়ের উচ্চাশা পোষণ করিতেন কিন্তু আলাউদ্দিনের ন্যায় বাস্তববুদ্ধি ছিল না বলিয়া তাঁহার দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন কার্যে পরিণত হইল না। খোরাসান ও ইরাক জয় করার জন্য মহম্মদ প্রায় চারি লক্ষ সৈন্যকে এক বৎসর যাবৎ বেতন দিয়া পোষণ করিলেন। হিন্দুকুশ বা হিমালয়ের দুর্গম গিরিবর্ত্ম দিয়া সুদূর মধ্য এশিয়ায় অভিযান করার দুরূহতা উপলব্ধি করিয়া তিনি শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এ সম্বন্ধে বারণী লিখিয়াছেন—"ঈপ্সিত দেশগুলি জয় করাও হইল না, এদিকে রাজনৈতিক শক্তির উৎস ধনভাণ্ডারও শূন্য হইয়া গেল।"

খোরাসান ও ইরাক জয়ের পরিকল্পনা

অনেকে বলেন মহম্মদ তুঘলক চীন অভিযানের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। ইহা সত্য নহে। তিনি চীনে কোন অভিযান প্রেরণ করেন নাই। চীন ও ভারতের সীমান্তবর্তী কারাজল বা কুর্মাচলের গাড়োয়ালী দুর্দ্ধর্ষ পার্বত্য জাতিকে দমন করিবার জন্য অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ দুর্জয় শীতে এবং বৃষ্টিপাতে বিনষ্ট হয়। এই অভিযান একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। হিমালয়স্থ পার্বত্য জাতি দিল্লীর আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল।

হিমালয় অঞ্চলে অভিযান

তাঁহার অব্যবস্থিতচিত্ততা ও বিভিন্ন পরিকল্পনার ব্যর্থতার ফলে একদিকে যেমন রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িল অপরদিকে সাম্রাজ্যের সর্বত্র অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দিল। দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র, বঙ্গদেশ, কারা, অযোধ্যা, লাহোর, মুলতান, গুজরাট, দৌলতাবাদ, সিন্ধু অঞ্চল দিল্লীর

বিদ্রোহ

অধীনতা অস্বীকার করিল। ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে হরিহর ও বুক্কা রায় কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে বিজয়নগর এবং ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে হাসান গঙ্গু কৃষ্ণানদীর উত্তরে বাহমনী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। মহম্মদ এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে অনবরত অভিযান করিতে লাগিলেন। এইভাবে বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া সিন্ধুদেশের থাট্টা নামক স্থানে জরাক্রান্ত হইয়া মহম্মদ তুঘলক মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৩৫১ খৃঃ)।

বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্য প্রতিষ্ঠা

ইবন বতুতা:—মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায় আফ্রিকার মরক্কোর অধিবাসী মূর পর্যটক ইবন বতুতার বিবরণে। মাত্র একুশ বৎসর বয়সে তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হন এবং আফ্রিকা ও এশিয়া ভ্রমণপূর্বক ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। মহম্মদ তুঘলক তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দিল্লীর কাজির পদ প্রদান করেন। মাত্র আট বৎসর কাল এই উচ্চপদে সমাসীন থাকার সময়ে তিনি সম্রাটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ লাভ করেন। মহম্মদ তুঘলক তাঁহাকে দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করিয়া চীনদেশে প্রেরণ করেন কিন্তু কোনও প্রতিবন্ধকতার জন্য তিনি এই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই। ১৩৪৯ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ইবন বতুতা শফরনামা নামে ভ্রমণ বিবরণ রচনা করেন। ১৩৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ফিরুজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮):—মহম্মদ তুঘলকের কোন পুত্রসন্তান ছিল না—তজ্জন্য তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার খুল্লতাত পুত্র ফিরুজ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফিরুজ দুর্বল চরিত্রের লোক ছিলেন। ক্ষীয়মান দিল্লী-সুলতানির গৌরব পুনরুদ্ধার করিবার মত শক্তি তাঁহার ছিল না। সামরিক ব্যাপারেও তাঁহার মোটেই দক্ষতা ছিল না। তাঁহার ব্যক্তিত্বের একান্ত অভাব ছিল বলিয়া তিনি মুফতী ও মৌলভীদের পরামর্শ অনুসারে রাজ্যশাসন করিতেন।

তাঁহার রাজত্বকালে বঙ্গদেশ সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ও তাঁহার পুত্র সিকান্দার শাহ যথাক্রমে দুইবার বিদ্রোহ করে। সুলতান দুইবারই বঙ্গদেশের বিদ্রোহ দমনের জন্য অভিযান করিয়া ব্যর্থ হন। বঙ্গদেশ হইতে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পথে ফিরুজ শাহ উড়িষ্যার আনুগত্য আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৩৬১ খৃষ্টাব্দে ফিরুজ তুঘলক পাঞ্জাবের নগরকোট আক্রমণ করেন। দীর্ঘ ছয় মাস অবরোধের পরে নগরকোট দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে। ফিরুজ শাহ সিন্ধুদেশ অধিকার করার জন্য সিন্ধুদেশে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। কয়েক লক্ষ টাকা বাৎসরিক কর প্রদানের

বিভিন্ন স্থানে অভিযান
বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, নগরকোট, সিন্ধু

প্রতিশ্রুতি দিয়া সিন্ধুর অধিপতি জাম বাবনিয়া সম্রাটের সহিত সন্ধি করেন। দাক্ষিণাত্যের হস্তচ্যুত অঞ্চলসমূহ পুনরুদ্ধার করার জন্য ফিরুজ তুঘলক কোন চেষ্টা করেন নাই।

সমরক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে না পারিলেও ফিরুজ তুঘলক শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ব প্রবর্ত্তিত বহু কর তুলিয়া দেন এবং অত্যাচারী রাজকর্মচারীদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা করেন। কৃষিকার্য্যে জলসেচনের জন্য চারিটি বড় খাল খনিত হয় এবং বহু পতিত জমির সংস্কার করা হয়। বিচার ব্যবস্থারও তিনি যথেষ্ট সংস্কার করেন এবং দণ্ডবিধির কঠোরতা হ্রাস করেন। অনাথ ও বিধবাদের সাহায্যের জন্য তিনি দেওয়ান-ই-খয়রাত নামে দাতব্য প্রতিষ্ঠা ও দার উল-শফা নামে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রজাকল্যাণমূলক কার্যাবলী

সৌধনির্মাণ কার্য্যেও ফিরুজের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি ফিরুজাবাদ, ফতেহাবাদ, হিসার, জৌনপুর প্রভৃতি কয়েকটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আলাউদ্দিনের নির্মিত ত্রিশটি উদ্যান পুনর্নির্মাণ এবং দিল্লীর উপকণ্ঠে ১২০০টি নূতন উদ্যান নির্মাণ করেন। স্বয়ং পণ্ডিত না হইলেও ফিরুজ তুঘলক বিদ্যানুরাগী ছিলেন। বহু বিদ্বান ও কবি সুলতান প্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করিত। তাঁহার রাজত্বকালেই বারুণী ও সামস-ই-সিরাজ ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার নির্দেশে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ পার্সী ভাষায় অনূদিত হয়।

শিল্প ও সাহিত্যে অনুরাগ

ফিরুজ তুঘলক হিন্দু রমণীর সন্তান হইয়াও ধর্মের ব্যাপারে উদারতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তিনি স্বয়ং সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি চলিতেন। সমস্ত রাজকার্য্য ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী চলিত। সাধারণতঃ হিন্দুদের প্রতি দয়ালু হইলেও তিনি প্রকাশ্যে প্রতিমা পূজা নিষিদ্ধ করেন এবং ব্রাহ্মণদের উপরেও জিজিয়া কর স্থাপন করেন। একমাত্র সুন্নী সম্প্রদায় ব্যতীত অপরাপর সকল সম্প্রদায়ের উপর তিনি নানাপ্রকার নির্য্যাতন করিতে দ্বিধা করেন নাই। ভিন্নধর্মাবলম্বী প্রজাদিগকে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণের জন্য তিনি উৎসাহিত করিতেন।

ধর্মনীতি

হিন্দুবিদ্বেষ

ফিরুজ তুঘলকের শেষ জীবন মোটেই সুখের হয় নাই। ফিরুজ তুঘলকের জীবিতাবস্থায়ই সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া তাঁহার পুত্রপৌত্রাদির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। মৃত্যুর পূর্বে ফিরুজ তাঁহার অন্যতম পৌত্র তুঘলক খাঁকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া যান। ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে ফিরুজ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শেষ জীবন

ফিরুজ তুঘলকের মৃত্যুর পরে মাত্র বার বৎসরের মধ্যে দিল্লীর সিংহাসনে ছয়জন নরপতি আরোহণ করেন। সিংহাসন লাভের জন্য দ্বন্দ্ব, ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ ও হত্যাকাণ্ড তুঘলক বংশের প্রাত্যহিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। তুঘলক বংশের দুইটি সন্তান একই সময়ে একজন দিল্লীতে ও অপরজন ফিরুজাবাদে রাজত্ব করিতে লাগিল। এই আভ্যন্তরীণ গোলযোগের মধ্যে জৌনপুর, গুজরাট, মালব, খান্দেশ ও গোয়ালিয়র স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তুঘলক বংশের শেষ নরপতি নাসিরুদ্দিন মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে সমরখন্দের দিগ্বিজয়ী ও লুণ্ঠনকারী তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। (১৩৯৮ খৃঃ)।

ফিরুজ তুঘলকের মৃত্যুর পরে অরাজকতা

তৈমুরের আক্রমণঃ—তুর্কী জাতির চাঘতাই শাখার নায়ক তৈমুরলঙ্গ ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে এশিয়ার সমরখন্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৬৯ খৃষ্টাব্দে তৈমুর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অচিরকাল মধ্যে পারস্য, মেসোপটেমিয়া ও আফগানিস্থান জয় করেন। ভারতবর্ষের ধনৈশ্বর্যের খ্যাতি তাঁহাকে ভারতবর্ষ অভিযানে প্রলুব্ধ করে ও তুঘলক বংশের পরবর্তী সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ইসলামের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য তিনি বিধর্মীর দেশ জয় করিতে যাইতেছেন এই সংবাদে নবদীক্ষিত তুর্কীজাতি উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার অনুগামী হইল। কার্য্যতঃ তৈমুরের ভারত আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠন—স্থায়িভাবে ভারতে রাজ্য স্থাপনের কোন বাসনা তাঁহার ছিল না।

তৈমুর

ভারতবর্ষ অভিযানে প্রবৃত্ত হইয়া তৈমুর অসংখ্য সৈন্যসহ সমরখন্দ হইতে যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে বহু নগর লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিয়া বিনা বাধায় দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হন। তদানীন্তন তুঘলক বংশীয় সুলতান নাসিরুদ্দিন মহম্মদ ভীত হইয়া গুজরাটে পলায়ন করেন। তৈমুর দিল্লী প্রবেশ করিয়া নির্বিচারে লুণ্ঠনের ও অধিবাসীদিগকে হত্যার আদেশ দেন। দিল্লীর অধিকাংশ অধিবাসী হয় নিহত না হয় ক্রীতদাসে পরিণত হইল। তিন মাসকাল অবাধ লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিয়া তৈমুর অসংখ্য বন্দী ও প্রচুর লুণ্ঠিত ধনরত্নসহ স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রস্থানের পরে দিল্লীর ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিল। তৈমুরের প্রস্থানের তিন মাস পরে সুলতান নাসিরুদ্দিন

মহম্মদ পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে আসিয়া বসিলেন। ১৪১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তুঘলক বংশের অবসান ঘটিল।

প্রশ্নোত্তর

1. Describe the conquests of Alauddin Khalji and give an account of the extent of his empire.

আলাউদ্দিন খল্‌জির রাজ্যবিস্তার ও সাম্রাজ্যের পরিধির বিবরণ দাও।

উত্তর-সূত্র :—(১) ভূমিকা : দাস বংশের ইলতুৎমিস ও বলবনের রাজত্বকালেই ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ সুগম হয়। উপরোক্ত সুলতানদ্বয় কঠোর হস্তে সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া দেশে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপন করেন এবং দৃঢ়হস্তে বিদেশী মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করিয়া নবগঠিত মুসলিম সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করেন। আলাউদ্দিন পূর্ববর্তী ইলতুৎমিস ও বলবনের অবলম্বিত সূত্র অনুসরণ করিয়া অধিকতর সাফল্যের সহিত সাম্রাজ্য বিস্তার, আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন শান্তিশৃঙ্খলা বিধান এবং মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেন। আলাউদ্দিন দিগ্বিজয়ী নরপতি ছিলেন এবং তাঁহার সময়ে কেবল আর্য্যাবর্ত নহে, বিন্ধ্য পর্বত ও নর্মদার দক্ষিণে কন্যা কুমারী পর্য্যন্ত মুসলিম আধিপত্য বিস্তৃত হয় এবং দিল্লীর এই আধিপত্য পরবর্তী প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে।

(২) দিগ্বিজয়—আলেকজাণ্ডারের ন্যায় পৃথিবী জয়ের অভিলাষ—(ক) গুজরাট বিজয়—(খ) রাজপুতনা—রণথম্ভোর ও চিতোর—(গ) মালব—(ঘ) দাক্ষিণাত্য—দেবগিরি, বরঙ্গল দ্বারসমুদ্র, পাণ্ড্যরাজ্য।

2. What were the problems before Alauddin Khalji when he ascended the throne. Give a short account of the administrative policy of Alauddin Khalji.

সিংহাসন আরোহণের পর আলাউদ্দিন খলজীর প্রারম্ভিক অসুবিধা সমূহ বিবৃত কর। আলাউদ্দিন খল্‌জির শাসননীতির একটি বিবরণ দাও।

(১) প্রারম্ভিক অসুবিধা সমূহ (পৃষ্ঠা)

উত্তর-সূত্র :—(২) আলাউদ্দিনের শাসন ব্যবস্থা : (পৃষ্ঠা)

3. **Would you consider Alauddin as the best of the Delhi Sultanate ? Give reasons for your answer.**

উত্তর-সূত্র :— আলাউদ্দিন খলজিকে নিম্নোক্ত কারণ সমূহের জন্য ভারতীয় তুর্কী সুলতানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি বলা যাইতে পারে।

(১) সামরিক দক্ষতা ও আর্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যসহ পূর্ণ হিন্দুস্থানে সাম্রাজ্য বিস্তার (২) শাসনদক্ষতা ও শাসন ব্যবস্থায় মৌলিকত্ব—প্রজাকল্যাণ বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য যাহা প্রয়োজনীয় মনে হইত তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না — শরিয়তের বিধান অনুযায়ী শাসন করার জন্য 'উলেমা'গণের উপদেশ তিনি অগ্রাহ্য করিতেন। ইসলামের ধর্মনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করা তিনি অপছন্দ করিতেন।

(৩) উচ্চাভিলাষী অথচ বাস্তববাদী ছিলেন—আলেকজাণ্ডারের মত পৃথ্বীজয়ের আশা পোষণ করিলেও বা মহম্মদের মত নূতন ধর্ম প্রচার করার ইচ্ছা থাকিলেও বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ার জন্যই তিনি উচ্চাভিলাষকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য উদ্যমশীল হন নাই।

(৪) সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—কবি আমির খস্রু ও হাসান তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন—তাঁহার আদেশে বহু দুর্গ নির্মিত—কুতুব মসজিদের সম্প্রসারণ।

4. **Make an estimate of the character of Muhammadbin Tughluq Account for his failure.**

মুহম্মদ তুঘলকের চরিত্র বর্ণনা কর এবং ব্যর্থতার কারণ লিখ।

উত্তর-সূত্র : (১) ভূমিকা : মহম্মদ তুঘলক একজন বিচিত্র চরিত্রবিশিষ্ট নরপতি ছিলেন বলিয়া ইতিহাসে তাঁহার সম্যক স্থান নির্ণয় করা দুরূহ। তাঁহার সম্বন্ধে বহু পরস্পর বিরোধী মতবাদ আছে তিনি যে কি ছিলেন—অলোক সামান্য প্রতিভাশালী অথবা উন্মাদ, আদর্শবাদী অথবা কল্পনাবিলাসী, রক্তপিপাসু স্বৈরাচারী অথবা প্রজাহিতৈষী, ধর্মপ্রাণ অথবা বিধর্মী—ইহা লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে বাদানুবাদের অন্ত নাই।

(২) চরিত্রের গুণাবলী :—সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন—তর্কবিদ্যা, জ্যোতিষ শাস্ত্র অঙ্ক শাস্ত্র দর্শন ও বিজ্ঞানে পারদর্শিতা ছিল, বিখ্যাত পারসিক কবিতা সমূহ তাঁহার মুখস্থ ছিল—স্বয়ং পারসী-তে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। ধর্মের গোড়ামি মোটেই ছিল না—'সতী' প্রথা বন্ধ করার চেষ্টা করিয়াছিলেন— দানশীলতা ও উদারতা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য দুর্ভিক্ষ বিরোধী

বহু ব্যবস্থা করেন। তাঁহার পরিকল্পনা সমূহের মধ্যে সৃষ্টিকুশলী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

(৩) ব্যর্থতার কারণ (১) বাস্তববুদ্ধি ও লোকচরিত্র জ্ঞানের অভাব: (ক) দিল্লী হইতে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে সমগ্র ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যের সর্বত্র দৃষ্টি রাখা সহজ হইত। কিন্তু দিল্লীর নাগরিকগণকে আকস্মিকভাবে দেবগিরি গমনের আদেশ দিয়া বিরোধিতা অর্জন করিয়াছিলেন (খ) তাম্র মুদ্রার পরিকল্পনা অর্থনৈতিক দিক দিয়া নির্দোষ ও লাভজনক ছিল কিন্তু জালমুদ্রার প্রচলন প্রতিরোধের ব্যবস্থা না থাকায় তাহা ব্যর্থ হয়। (২) ক্রোধ ও হঠকারিতা: স্বীয় ইচ্ছার বিরোধীদের তিনি মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার আদেশের যাহারাই বিরোধী হইয়াছে সুলতানের আদেশে তাহারা কঠোরভাবে দণ্ডিত হইয়াছে—দণ্ডিত ব্যক্তির উচ্চপদাধিকার তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই। ইহার ফল সর্বত্র অসন্তোষ ও বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দেয়। (৩) তাহার পরিকল্পনা সমূহের মধ্যে সৃষ্টিকুশলতা থাকিলেও যুগোচিত ছিলনা বলিয়া তিনি ব্যর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সাম্রাজ্যের রাজপুরুষগণ তাহার সঙ্গে সহযোগিতা করিতে দ্বিধা করিয়াছে, ধর্মান্ধ উলেমা সম্প্রদায় বিশেষাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া সুলতানের বিরুদ্ধতা করিয়াছে এবং জনসাধারণ তাঁহার রাজত্বের দ্রুত অবসান কামনা করিয়াছে।

5. **Give an account of the reign of Muhammadbin Tughlauq. How far was he responsible for the downfall of the Delhi Sultanate.**

মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের বিবরণ দাও। দিল্লী সুলতানীর পতনের জন্য তাহার কতখানি দায়িত্ব ছিল।

উত্তর-সূত্র:—(১) মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকাল (পৃষ্ঠা)।

(২) দিল্লী-সুলতানি সাম্রাজ্য পতনের জন্য মুহম্মদ তুঘলকের দায়িত্ব:- দিল্লী সুলতানির রাজত্বকাল মোটামুটি তিন শত বৎসরের অধিককাল স্থায়ী ছিল। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর লোদীবংশীয় ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়া দিল্লী-সুলতানির অবসান করেন। দিল্লী সুলতানির পতনের পশ্চাতে বহু কারণ বিদ্যমান। সুলতানদের মধ্যে অধিকাংশই দুর্বল চরিত্র ছিলেন। বিভিন্ন সুলতান নিজস্ব পদ্ধতিতে শাসন করিতেন—কোন সুনির্দিষ্ট বা স্থায়ী শাসনপ্রণালী অব্যাহত রাখিতে পারেন নাই—সাম্রাজ্যকে স্থায়ী রাখার উপযুক্ত শাসনপদ্ধতি স্থাপনের জন্য

কোন চেষ্টা করেন নাই। অধিকন্তু সুলতানগণ হিন্দুগরিষ্ঠ ভারতবর্ষে হিন্দুবিরোধী নীতি অনুসরণ করিয়া হিন্দু প্রজার আনুগত্য অর্জন করিতে পারেন নাই। তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ বিভিন্ন স্থানে দিল্লীনিরপেক্ষ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল। চতুর্থতঃ, তৈমুরের আক্রমণের ফলে দিল্লী সুলতানির অধিকার নামাবশেষ পর্যায়ে উপনীত হইয়াছিল। পঞ্চমতঃ সামরিক দুর্বলতাও দিল্লী-সুলতানি পতনের অন্যতম কারণ।

উপরোক্ত কারণগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে দিল্লী-সুলতানির পতনের জন্য মুহম্মদ তুঘলক সম্পূর্ণ দায়ী ছিলেন না। তাঁহার পূর্ববর্তী সুলতানগণ সাম্রাজ্য স্থায়ী করার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট এবং স্থায়ী নীতি বা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই—অধিকাংশ সুলতানই শরিয়তের বিধান অনুযায়ী হিন্দুবিরোধী শাসননীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে মুহম্মদ তুঘলক পূর্ববর্তী সুলতানগণ অপেক্ষা কম ধর্মান্ধ ছিলেন এবং হিন্দুদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। উপরন্তু তিনি দুর্ভিক্ষ নিবারণ মূলক প্রচেষ্টায়ও হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার অব্যবস্থিত চিত্ততা ও বিভিন্ন অবাস্তব পরিকল্পনা যে দিল্লী সুলতানিকে পতনের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সকল পরিকল্পনার ব্যর্থতার ফলে একদিকে যেমন রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িল অপর দিকে সাম্রাজ্যের সর্বত্র অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দিল এবং দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র, বঙ্গদেশ, কারা, অযোধ্যা, লাহোর, মুলতান, গুজরাট, দৌলতাবাদ, সিন্ধু স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিল। দক্ষিণে বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এই ক্ষীয়মান দিল্লী-সুলতানির পূর্বগৌরব মুহম্মদ তুঘলক বা তাঁহার পরবর্তী সুলতানগণের কেহই উদ্ধার করিতে পারেন নাই। এই দুর্বল সাম্রাজ্যকে আঘাত হানিয়া তৈমুর দুর্বলতর করিল এবং বাবর পানিপথের যুদ্ধে শেষ দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়া দিল্লী-সুলতানির পূর্ণ অবসান ঘটাইল। সুতরাং মুহম্মদ তুঘলককে দিল্লী-সুলতানির পতনের জন্য আংশিকভাবে দায়ী করা যাইতে পারে।

6 Briefly describe the administrative policy and the attitude towards the Hindus of Firuz Tughluq.

ফিরুজ তুঘলকের শাসননীতি ও হিন্দুনীতি সম্বন্ধে বিবরণ দাও।

উত্তর-সূত্র :— (১) শাসননীতি :- সমরক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে না পারিলেও ফিরুজ তুঘলক রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। প্রজাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও আর্থিক উন্নতির জন্য তিনি অনেক চেষ্টা

করিয়াছেন। তিনি ওমরাহ্‌দের মনস্তুষ্টির জন্য জায়গীর প্রথার পুনঃ প্রবর্তন করিয়া কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে দুর্বল করেন। কেবলমাত্র এই ব্যাপারে ত্রুটি দেখা গেলেও মোটামুটি তাহার ৩৭ বৎসর রাজত্বকালে প্রজাদের সুখসমৃদ্ধি অব্যাহত ছিল।

(ক) তিনি পূর্বপ্রবর্তিত বহু কর রহিত করিয়া মাত্র চারি প্রকারের কর নির্দ্ধারণ করেন (খ) আভ্যন্তরীণ অবাধ বাণিজ্যের জন্য বাণিজ্য দ্রব্যের উপর হইতে 'চুঙ্গী' রহিত হইল (গ) অত্যাচারী রাজকর্মচারীদের শাস্তির বিধান করেন। (ঘ) কৃষি-কার্যে জলসেচনের জন্য চারিটি বড় খাল খনিত হয় এবং তত্ত্বাবধানের জন্য উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হয় (ঙ) বহু পতিত জমির সংস্কার হয় (চ) বিচার-ব্যবস্থার যথেষ্ট সংস্কার করেন এবং দণ্ডবিধির কঠোরতা যথেষ্ট হ্রাস করেন (ছ) বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য চাকুরী-নিয়োগ দপ্তর খুলিয়া গুণানুযায়ী বেকারদের চাকুরী দিবার বন্দোবস্ত করেন। (জ) দরিদ্র মুসলমান কন্যাদের বিবাহের ব্যয় নির্বাহার্থ বা অনাথ ও বিধবাদের সাহায্যের জন্য তিনি দেওয়ান-ই-খয়রাত নামে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করেন এবং দার-উস-সফা নামে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

(২) হিন্দুনীতি (পৃষ্ঠা)।

6. **Write notes on :—(a) Ibn Batuta (b) Timur.**

টীকা লিখ :—(ক) ইবন বতুতা (খ) তৈমুর।

উত্তর-সূত্র: ইবন বতুতা (পৃষ্ঠা) (খ) তৈমুর (পৃষ্ঠা)।

পঞ্চদশ অধ্যায়

দিল্লী-সুলতানির অবসান : সৈয়দ ও লোদী বংশ : বাংলা ও বাহমনী রাজ্য

Syllabus : Disintegration of the Delhi Sultanate—Sayyids and Lodies. Bengal under Illias Saha—Raja Ganesh and Hussain Saha. Bahmoni Kingdom. The rise of the five Sultanates of the Deccan.

পাঠসূচী :—দিল্লী সুলতানির ভগ্নদশা—সৈয়দ ও লোদীগণ—ইলিয়াস শাহের আমলে বাংলা—রাজা গণেশ ও হুসেন শাহ্। বাহ্মনী রাজ্য—দাক্ষিণাত্যে পাঁচটি সুলতানির অভ্যুত্থান।

দিল্লী-সুলতানির দুরবস্থা :—মহম্মদ বিন্ তুঘলকের রাজত্বকালের শেষ সময়েই দিল্লী-সুলতানির দুর্বলতা দেখা দেয়। এই দুর্বলতার হস্ত হইতে পরবর্তী ফিরুজ তুঘলক বা তাঁহার বংশধরগণ দিল্লী-সুলতানির সাম্রাজ্যকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইল না। তৈমুরলঙের আক্রমণের ফলে প্রকৃত প্রস্তাবে সুলতানি সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বঙ্গদেশ বহুকাল পূর্বেই সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ও তাঁহার পুত্র সেকেন্দার শাহের নেতৃত্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। খাজা জাহান কনৌজ, অযোধ্যা, বিহার, জৌনপুর, কারা প্রভৃতি লইয়া গঠিত এক বিস্তীর্ণ ভূভাগে স্বতন্ত্রভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। গুজরাটে মুজফ্ফর শাহ্, মালবে দিলওয়ার খাঁ, সামানায় গালিব খাঁ, বয়ানা-য় সামস খাঁ, আউলাদি ও মহোবা-য় মুহম্মদ খাঁ, কাল্পী দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া স্বাধীন হইল। তৈমুরের প্রতিনিধিরূপে খিজির খাঁ পাঞ্জাব এবং পশ্চিম সিন্ধুদেশে শাসন করিতে লাগিল। সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল দিল্লীর হস্তচ্যুত হইয়া গেল। উপরন্তু দিল্লীর ওমরাহবৃন্দ ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া দিল্লী-সুলতানির ভিত্তি দুর্বলতর করিয়া ফেলিল। দক্ষিণ ভারতে বাহমনী ও বিজয়নগর এবং মধ্যভারতে রাজপুতানা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল।

সৈয়দ বংশ (১৪১৪-১৪৫১) :—১৪১৩ খৃষ্টাব্দে মামুদ শাহ তুঘলকের মৃত্যু হইলে তুঘলক বংশের অবসান হয় এবং দৌলত খাঁ লোদী নামে মামুদের এক অমাত্য কয়েক মাসের জন্য দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকে। ইতিমধ্যে তৈমুরের প্রতিনিধি ও মুলতানের শাসনকর্তা খিজির খাঁ

দৌলত খাঁ লোদী

দৌলত খাঁকে সিংহাসন হইতে অপসৃত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন। খিজিরের প্রতিষ্ঠিত বংশ সৈয়দ বংশ নামে প্রসিদ্ধ। খিজির খাঁ নাকি হজরত মহম্মদের বংশধর ছিলেন; এইজন্য তৎ-প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম সৈয়দ বংশ হইয়াছে।

খিজির খাঁ

খিজির খাঁ সুলতান উপাধি গ্রহণ না করিয়া তৈমুরবংশীয়দের প্রতিনিধিরূপে সাত বৎসর রাজত্ব করেন। খিজির খাঁর মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র মোবারক শাহ স্বাধীন সুলতানরূপে প্রায় চতুর্দশ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের অধিকাংশ সময়ই বিদ্রোহ নিবারণে ব্যয়িত হয়। অতঃপর সৈয়দ বংশের শেষ নরপতিদ্বয় মহম্মদ শাহ ও আলাউদ্দিন আলম শাহ ১৪৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। শেষ সুলতান আলম শাহ লাহোর ও সরহিন্দের শাসনকর্তা বহলুল লোদীর হস্তে দিল্লীর সিংহাসন সমর্পণ করিয়া স্বয়ং বদায়ুনে আমোদ প্রমোদে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। এইভাবে সৈয়দ বংশের অবসান হয়। এই বংশে চারিজন সুলতান ৩৭ বৎসরকাল রাজত্ব করেন।

মুবারক শাহ

লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬) :—সৈয়দ বংশীয় নরপতি আলাউদ্দিন আলম শাহের সিংহাসন ত্যাগের পরে লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা বহলুল লোদী সিংহাসনে আরোহণ করেন। শাসন ও সমরদক্ষতায় বহলুল লোদী পূর্ববর্ত্তী সুলতানগণ অপেক্ষা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি জৌনপুরের স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট করিয়া স্বীয় পুত্রকে জৌনপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁহার প্রতাপে বিভিন্ন অঞ্চলের স্বাধীন সর্দারগণ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

বহলুল লোদী (১৪৫১-৮৯)

বহলুল লোদীর পরে তাঁহার পুত্র নিজাম খাঁ সিকান্দার শাহ নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। লোদীবংশের তিনজন নরপতির মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি দিল্লীর আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বারবক শাহের বিদ্রোহ দমন করিয়া জৌনপুরে স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করেন এবং ত্রিহুত ও বিহারের উপর দিল্লীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। সিকান্দার শাহের সুশাসনের ফলে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করে। সুবিচার প্রবর্তনের জন্য তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং স্বয়ং পার্সী ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন। ধর্ম সম্বন্ধে তিনি অনুদার ছিলেন। তিনি উৎকট হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন এবং মথুরার দেবমন্দির সমূহ ধ্বংস করিয়া তৎস্থলে সরাইখানা ও মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিয়াছিলেন।

সিকান্দার লোদী (১৪৮৯-১৫১৭)

সিকান্দার লোদীর পরে তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর সুলতান হন। তিনি মাত্র নয় বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি রণদক্ষ ছিলেন, কিন্তু ঔদ্ধত্য ও ক্ষমতাপ্রিয়তার জন্য আফগান ওমরাহগণের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। স্বীয় আধিপত্য বিস্তারের জন্য তিনি রাজ্যের পরাক্রান্ত ওমরাহশ্রেণীর উপর অসদাচরণ করিতে লাগিলেন। সম্রাটের অসদাচরণে বিরক্ত হইয়া ইহারা সর্বতোভাবে সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। বিহার দরিয়া খাঁ লোদীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। লাহোরের অর্দ্ধস্বাধীন শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদীর পুত্র দিলওয়ার খানের প্রতি সম্রাটের আপত্তিজনক আচরণের ফলে সম্রাটের প্রতি ওমরাহগণের বিরুদ্ধতা চরমে উঠিল। অচিরে দৌলত খাঁ লোদী এবং সম্রাটের নিকট আত্মীয় আলম খাঁ সম্মিলিত হইয়া কাবুলের অধিপতি তৈমুর বংশীয় বাবরকে দিল্লী আক্রমণ করিতে আহ্বান করিলেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সুলতানি শাসনের অবসান করিলেন। ভারতবর্ষে মুঘল শাসনের সূত্রপাত হইল।

ইব্রাহিম লোদী (১৫১৫-২৬)

দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের কারণঃ—১২০৬ হইতে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনশত কুড়ি বৎসরকাল দাস, খল্‌জি, তুঘলক, সৈয়দ ও লোদী এই পাঁচটি রাজবংশ দিল্লীতে রাজত্ব করিয়াছিল। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়া দিল্লী সুলতানির ধ্বংস সাধন করেন। দিল্লী-সুলতানির পতনের পশ্চাতে বহু কারণ বিদ্যমান।

প্রথমতঃ, দিল্লীতে রাজত্বকারী বিভিন্ন সম্রাটের মধ্যে মহম্মদ তুঘলক ও ফিরুজ তুঘলক ব্যতীত দুইজন শক্তিশালী সম্রাট ক্রমান্বয়ে কখনও রাজত্ব করেন নাই। বিভিন্ন সম্রাট নিজস্ব পদ্ধতিতে শাসন করিয়া গিয়াছেন, কোন সুনির্দিষ্ট শাসনপ্রণালী বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারেন নাই বা কোনও একটি শাসনরীতি কোন একটি রাজবংশের আয়ত্তে আদ্যোপান্ত অব্যাহত রাখতে পারেন নাই। তুর্ক আফগান শাসকগণ রাজ্যবিস্তার করিয়াছে, বিদ্রোহদমন করিয়াছে কিন্তু সাম্রাজ্যকে স্থায়ী করিয়া রাখার উপযুক্ত শাসনপদ্ধতি স্থাপনের জন্য কোন চেষ্টা করে নাই।

(১) অধিকাংশ সম্রাটই দুর্বলচরিত্র ছিলেন

দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুগরিষ্ঠ ভারতবর্ষে হিন্দুবিরোধী নীতি অনুসরণ করিয়া দিল্লীর সুলতানগণ হিন্দু প্রজার আনুগত্য অর্জন করিতে পারেন নাই। আলাউদ্দিন ও মুহম্মদ তুঘলক ব্যতীত কোন তুর্ক-আফগান সুলতান সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিতে পারেন নাই। সামরিক বলের নিকট সাময়িকভাবে অবনত হইলেও হিন্দুরা সুযোগমত দিল্লীর

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা যুদ্ধ করিয়াছে এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে। হিন্দুমন্দির ধ্বংস করা, বিধর্মীকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা, হিন্দুর উপর জিজিয়া কর স্থাপন, বিগ্রহ অপবিত্র করা মুসলমানদের ধর্মের অঙ্গ ছিল। এই সমস্ত হিন্দুবিরোধী আচরণে হিন্দু প্রজা বিক্ষুব্ধ হইয়াছে এবং মুসলমান শাসনের অবসান কামনা করিয়াছে। একদিকে মুসলমানদের মধ্যে সিংহাসন লাভের জন্য অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং প্রকাশ্য বিদ্রোহ - অপরপক্ষে হিন্দুপ্রজার বিদ্বিষ্ট মনোভাব— এই দুইয়ের সমবায়ে দিল্লী সুলতানি দুর্বলতর হইয়া পড়িয়াছিল।

(২) হিন্দুবিরোধী নীতি

তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে স্বার্থান্বেষী ও উচ্চাশী আমীরওমরাহ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ যত্র-তত্র দিল্লীনিরপেক্ষ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে দ্বিধা করিল না। দাক্ষিণাত্যের বাহমনী রাজ্য, বঙ্গদেশ, রাজপুতানা সকলেই দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীন হইল।

(৩) প্রাদেশিক শাসকদের বিদ্রোহ

চতুর্থতঃ, বহিরাগত মোঙ্গলদের বারংবার আক্রমণের ফলে দিল্লীর রাজশক্তি ক্ষীণবল হইয়া পড়িয়াছিল। গিয়াসউদ্দিন বলবন মোঙ্গলদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছেন, গিয়াসউদ্দিন তুঘলক তাঁহাদিগকে দিল্লীর উপকণ্ঠে বসবাসের অনুমতি দিয়াছেন, আলাউদ্দিন খলজী 'নব মুসলমান' নামে পরিচিত মোঙ্গলদিগকে হত্যা করিয়াছেন, মহম্মদ তুঘলক উৎকোচদানে ইহাদের হস্ত হইতে সাময়িক অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন, ফিরুজ তুঘলক মোঙ্গলদিগকে পরাজিত করার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। মোট কথা ইহাদের আক্রমণের ফলে অধিকাংশ সুলতানকেই সন্ত্রস্ত ও আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকিতে হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত তৈমুরের আক্রমণের ফলে দিল্লী-সুলতানির অধিকার নামাবশেষ পর্যায়ে উপনীত হয়। তৈমুরের আঘাত দিল্লী-সুলতানি পতনের অন্যতম কারণ।

(৪) মোঙ্গল ও তৈমুরের আক্রমণ

পঞ্চমতঃ, মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষার মূল উৎস ছিল সামরিক শক্তি, প্রজাগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের দ্বারা প্রজানুগত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মত দূরদৃষ্টি তৎকালে খুব কম তুর্ক-আফগান সম্রাটের ছিল। সুলতানি-শাসনের প্রথমদিকে কুতুবুদ্দিন, ইলতুৎমিস, বলবন এবং পরবর্তী সময়ে আলাউদ্দিন ও মহম্মদ তুঘলক ব্যতীত কেহই সামরিক ব্যাপারে তেমন দক্ষ ছিলেন না। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরের এবং বাহিরের অসংখ্য বিরোধ মিটাইবার মত সামরিক বল অধিকাংশ সুলতানের ছিল না। দুর্বল সৈয়দ ও লোদী বংশের সময়ে এই সামরিক দুর্বলতা প্রকট হইয়া পড়ে।

(৫) সামরিক শক্তিহীনতা

বঙ্গদেশ ঃ—সেনবংশের পতনের পরে বঙ্গদেশে মুসলমানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। দিল্লীর অধীন হইলেও রাজধানী হইতে দূরে অবস্থিত থাকায় বঙ্গদেশ প্রায়ই দিল্লীর প্রাধান্য অস্বীকার করার চেষ্টা করিত। সাম্রাজ্যের এক প্রান্তসীমায় অবস্থিত থাকায় দিল্লীর সম্রাটগণের পক্ষে বঙ্গদেশের বিদ্রোহ দমন করা সাধারণতঃ সহজসাধ্য হইত না। কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুর পরে বাংলার শাসনকর্তা আলি মর্দান খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইলতুৎমিস সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বাংলাকে দিল্লীর অধীনে আনয়ন করেন। ইলতুৎমিসের পরে বঙ্গদেশ পুনরায় স্বাধীন হইয়া উঠে এবং বলবনের রাজত্বকালে মোঙ্গল আক্রমণের সুযোগে বাংলার শাসনকর্তা তুঘ্রিল খাঁ বিদ্রোহী হন। বলবন একাধিকবার সামরিক অভিযান প্রেরণ করিয়া বাংলা দেশকে পুনরায় দিল্লীর অধীনে আনয়ন করেন এবং পুত্র বঘ্রা খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। বলবনের মৃত্যুর পরে বঘ্রা খাঁ-র পুত্র দিল্লীর সম্রাট হইলেন অথচ বঘ্রা খাঁ বাংলাদেশের শাসনকর্তাই রহিয়া গেলেন। বঘ্রা খাঁর মৃত্যুর পরে বাংলাদেশে অরাজকতা দেখা দিলে তুঘলক বংশীয় সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক নাসিরুদ্দিনকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন এবং বাংলাকে প্রকৃত প্রস্তাবে দিল্লীর অধীনে আনয়ন করিলেন। গিয়াসউদ্দিনের পুত্র মহম্মদ তুঘলক বঙ্গদেশের সম্ভাব্য বিদ্রোহ দমন করার জন্য বঙ্গদেশকে তিনটি স্বাধীন অঞ্চলে বিভক্ত করেন। এই তিনটি অঞ্চলের তিনটি রাজধানী লখনৌটি (লক্ষ্মণাবতী), সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) এবং সোনারগাঁয়ে স্থাপিত হইল। মুহম্মদ তুঘলক কাদির খাঁকে লখনৌটি, ইজ্জদিন আজম-উল-মুলুককে সাতগাঁ এবং গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহকে সোনারগাঁয়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুর পরে মুহম্মদ তুঘলকের বৈমাত্র ভ্রাতা বহ্রাম খাঁ সোনারগাঁ-এর অধিপতি হইলেন ও বহ্রাম খাঁর মৃত্যুর পরে তাঁহার অনুচর ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ সোনারগাঁ-র স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। অচিরে আলাউদ্দিন আলি শাহ (১৩৩৯-৪৫) পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া লখনৌটি হইতে পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। পরিশেষে আলাউদ্দিনের বৈমাত্র ভ্রাতা হাজি ইলিয়াস সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ নামে বঙ্গদেশের অধিপতি হন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বংশ ইলিয়াস শাহী বংশ নামে পরিচিত। এই বংশ সত্তর বৎসরের অধিককাল বঙ্গদেশ শাসন করেন। ইলিয়াস শাহ অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন। ১৩৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি সোনারগাঁ অধিকার করেন এবং উড়িষ্যা

দিল্লী সুলতানির সময়ে বঙ্গদেশের স্বাধীনতার স্পৃহা

সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪৫-৭৭)

ও ত্রিহুতের নরপতির নিকট হইতে কর আদায় করেন। ফিরুজ তুঘলক ইলিয়াস শাহকে পরাজিত করার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। তাঁহার শাসনকালে বাংলাদেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি বর্তমান ছিল।

ইলিয়াস শাহের পরে তাঁহার পুত্র সিকান্দার শাহ বাংলার অধিপতি হন। তাঁহার সময়েও দিল্লীর সম্রাট বঙ্গদেশ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হন। তাঁহার সময়ে পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মিত হয়। প্রায় ছত্রিশ বৎসর রাজত্বের পরে ১৩৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার পুত্রের হস্তে নিহত হন। অতঃপর তাঁহার পুত্র গিয়া-

সিকান্দার শাহ
(১৩৫৭-৯৩)
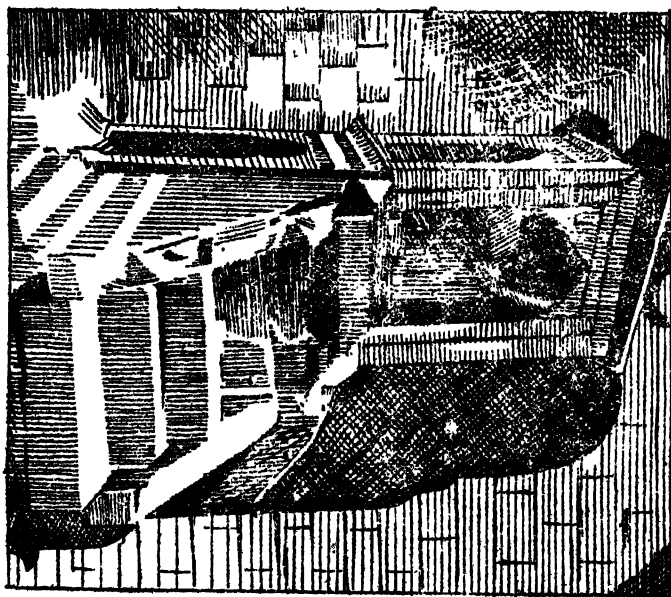
আদিনা মসজিদ

উদ্দিন আজম বাংলা দেশ শাসন করেন। তিনিও পিতার ন্যায় উপযুক্ত ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ পারসিক কবি হাফিজের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে চীন সম্রাটের প্রতিদ্বন্দ্বী য়ুং-লো-র দূত বিনিময় হইয়াছিল। গিয়াসউদ্দিন আজমের পরে ইলিয়াস শাহী বংশের কয়েকজন অযোগ্য

গিয়াসউদ্দিন আজম

নরপতি কিছুদিন রাজত্ব করেন। ইহাদের দুর্বলতার সুযোগে দিনাজপুর ও ভাতুড়িয়ার জমিদার গণেশ বাংলার সিংহাসন অধিকার করিয়া স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন। অনেকের মতে রাজা গণেশই বিখ্যাত দনুজমর্দনদেব। গণেশের পরে তাহার পুত্র যদু বাংলার সুলতান হন। যদু ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইয়া জালালুদ্দিন নাম ধারণ করেন। জালালুদ্দিন ভীষণ হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি দক্ষতার সহিত সাত বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে গৌড়ে বহু জলাশয় খনিত হয়, এবং বহু সরাইখানা ও পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত একলাখী মসজিদ নির্মিত হয়।

রাজা গণেশ
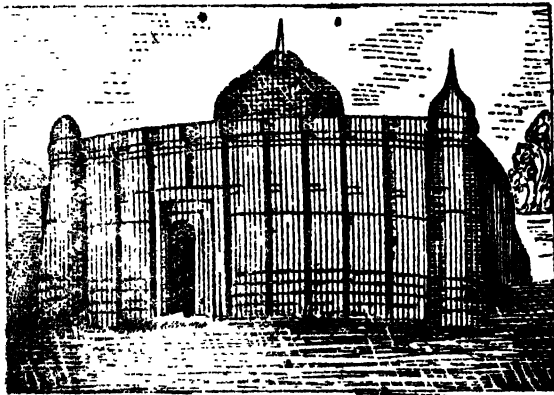
জালালুদ্দিন

একলাখী মসজিদ

জালালুদ্দিনের পরে তাঁহার পুত্র সামসুদ্দিন আহম্মদ রাজত্ব করেন। ইহার রাজত্বকালে পুনরায় বঙ্গদেশে গৃহবিবাদ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং মুসলমান সামন্তগণ হাজি সামসুদ্দিন ইলিয়াসের পৌত্র নাসিরুদ্দিনকে বঙ্গদেশের সিংহাসনে স্থাপন করেন এইরূপে ইলিয়াসশাহী বংশ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। নাসিরুদ্দিনের রাজত্বকালে প্রাসাদরক্ষী হাবসী ক্রীতদাসের প্রবর্তন হয় এবং এই সকল ক্রীতদাস প্রবল হইয়া পরবর্তী কুড়ি বৎসরকাল বঙ্গদেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করে। নাসিরুদ্দিনের পরে কয়েকজন সুলতান সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু হাবসী ক্রীতদাসের চক্রান্তে ইহাদের অধিকাংশকেই সিংহাসন ত্যাগ করিতে অথবা প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছে। পরিশেষে

সামসুদ্দিন

নাসিরুদ্দিন

গোলযোগ ও আলাউদ্দিন হোসেন শাহ

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ নামে জনৈক আরব এই সকল চক্রান্তজাল ছিন্ন করিয়া ওমরাহগণের সাহায্যে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন (১৪৯৩ খৃঃ)।

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ:—(১৪৯৩-১৫১৪) আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সময় হইতে বঙ্গদেশের ইতিহাসে এক নূতন বংশের রাজত্বের সূচনা হয় এবং এই বংশ অর্ধশতাব্দী কাল অত্যন্ত দক্ষতার সহিত বাংলাদেশ শাসন করেন। বাংলার স্বাধীন সুলতানগণের মধ্যে হোসেন শাহই সর্বাধিক খ্যাতিমান ছিলেন।

রাজ্যসীমা ও যুদ্ধবিগ্রহ

হোসেন শাহ রাজ্যের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রাসাদরক্ষী হাবসী সেনাদলের ক্ষমতা খর্ব করিয়া ক্রমে তাহাদিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। ১৪৯৪ খৃঃ-এ তিনি জৌনপুরের পলাতক সুলতানকে আশ্রয় প্রদান করেন। হোসেন শাহ আসামের অহোম রাজ্য আক্রমণ করেন এবং কোচ'বহারের অন্তর্গত কামতাপুর অধিকার করেন। তাঁহার রাজ্য উড়িষ্যা'র প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

প্রজাহিতৈষণা উদার চরিত্র

হোসেন শাহ প্রজানুরঞ্জক নরপতি ছিলেন তিনি রাজ্যের মধ্যে বহু মসজিদ ও দাতব্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্ম সম্বন্ধেও তিনি উদার ছিলেন। তিনি বহু হিন্দুকে উচ্চপদে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহারই রাজত্বকালে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৫—১৫৩৩ খৃঃ) নবদ্বীপে আবির্ভূত হন। চৈতন্যদেবের পার্ষদ সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী হোসেন শাহের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন।

দেশীয় ভাষার পৃষ্ঠপোষক

হোসেন শাহ স্বয়ং আরবী ও ফার্সীতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং দেশীয় ভাষার আনুকূল্য করিতেন। তাঁহার শাসনকালে মালাধর বসুর ভাগবতের অনুবাদ, বিপ্রদাস ও বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল রচিত হয়। হোসেন শাহের কর্মচারী চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁর উৎসাহে পরমেশ্বর মহাভারতের অনুবাদ করেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে হোসেন শাহের দেশী ভাষার প্রতি অনুরাগ ও পৃষ্ঠপোষকতা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

চৈতন্যদেব

হোসেন শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র নসরৎ শাহ বাংলার সুলতান হন। তিনি ত্রিহুত আক্রমণ করিয়া স্বীয় অধিকারভুক্ত করেন। তাঁহার কূটনৈতিক দক্ষতাও প্রশংসনীয় ছিল। বাবরের হস্তে পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ের পরে বিহারের আফঘান বংশীয় লোহানীদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে নসরৎ শাহ ভারতের পূর্বাঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা করেন। পরিশেষে তিনি বাবরের সঙ্গে সন্ধি করেন। তাঁহাকে শাস্তি প্রদান করার জন্য বাবরের পুত্র হুমায়ুনের উদ্যোগ দেখিয়া নসরৎ শাহ গুজরাটের বাহাদুর শাহের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। ইহাতে অভীষ্ট ফললাভ হইল। হুমায়ুন আপাততঃ বঙ্গদেশ অভিযান স্থগিত রাখিলেন। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে নসরৎ শাহ স্বীয় এক ক্রীতদাসের হস্তে নিহত হইলেন।

নসরৎ শাহ
১৫১৯—৩৩ খ্রীঃ

নসরৎ শাহের পুত্র গিয়াসউদ্দিন মামুদ শাহ (১৫৩৩—৩৮ খৃঃ) অপদার্থ নরপতি ছিলেন। তাঁহার অযোগ্যতার জন্য বঙ্গদেশের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হয় এবং শেরশাহ গৌড় অধিকার করেন (১৫৩৮ খৃঃ)।

গিয়াসউদ্দিন মামুদ শাহ

শেরশাহের বংশ লুপ্ত হইলে কররাণী বংশ বাংলাদেশ অধিকার করিয়া রাজত্ব করেন। সুলেমান খাঁ কররাণী মুঘল সম্রাট আকবরের আনুগত্য স্বীকার করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। সুলেমানের বিখ্যাত সেনাপতি কালাপাহাড় উড়িষ্যা ও আসাম আক্রমণ করিয়া বহু মন্দির ধ্বংস করেন। সুলেমানের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র দায়ুদ খাঁ ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে আকবর কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। অতঃপর বঙ্গদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কররাণী বংশ

দাক্ষিণাত্যের বাহমনী রাজ্য:—মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বের শেষভাগে তাঁহার অন্যায় আচরণের ফলে যে সকল স্বতন্ত্র রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল দাক্ষিণাত্যের বাহমনী রাজ্য তাহাদের অন্যতম। মহম্মদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া দাক্ষিণাত্যের সর্দারগণ হাসান জাফর খাঁর নেতৃত্বে এক স্বাধীন রাজ্যের পত্তন করেন। হাসান আবুল মুজাফ্ফর আলাউদ্দিন বাহ্মান শাহ নাম ধারণ করিয়া ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে বাহমনী রাজ্যের অধিপতি হইলেন। ঐতিহাসিক ফিরিস্তার বিবরণ হইতে জানা যায় হাসান প্রথম জীবনে গঙ্গু নামক একজন ব্রাহ্মণের ভৃত্য ছিলেন বলিয়া ভূতপূর্ব প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃ স্ব-প্রতিষ্ঠিত বংশকে বাহ্মনী আখ্যা দিয়াছিলেন। এই সকল কথা পরবর্তী মুসলমান ঐতিহাসিকগণ সমর্থন করেন না। কথিত আছে হাসান স্বয়ং নিজেকে পারস্যের প্রসিদ্ধ

বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

বংশের নামের ইতিহাস

বীর ইস্‌ফান-দিয়ারের পুত্র বাহ্‌মনের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। সুতরাং হাসানের প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম বাহমনী হইয়াছে।

হাসান সিংহাসনে আরোহণ করিয়া গুলবর্গায় বাহমনী রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং ক্ষিপ্রগতিতে চতুর্দ্দিকে নিজের অধিকার বিস্তৃত করিতে আরম্ভ করেন।

হাসানের রাজ্য বিস্তার

হাসানের সেনাপতি বিদর এবং মালখেট জয় করেন; গোয়া, দাভোল, কোলাপুর এবং তেলিঙ্গনাও তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে হাসানের মৃত্যুকালে দেখা যায়, বাহমনী রাজ্য উত্তরে বরঙ্গল হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে দৌলতাবাদ হইতে পূর্ব্বে ভোনগীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

হাসানের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র মহম্মদ শাহ বাহমনী রাজ্যের অধিপতি হইলেন। তাঁহার রাজত্বকালে প্রতিবেশী স্বাধীন হিন্দুরাজ্যদ্বয় বিজয়নগর ও তেলিঙ্গনার সহিত

প্রথম মহম্মদ শাহ

বাহমনী রাজ্যের দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের সূত্রপাত হয়। মহম্মদ শাহ বিজয়নগর ও তেলিঙ্গনা উভয় রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং পরাজিত রাজ্যদ্বয় অত্যন্ত অপমানজনক শর্ত্তে বাহমনী রাজ্যের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারেও মহম্মদ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

মহম্মদ শাহের পুত্র মুজাহিদ শাহের সময়েও বিজয়নগরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ হয়।

মুজাহিদ শাহ, ১৩৭৬-৭৭

মুজাহিদ দুইবার বিজয়নগরের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া পরাজিত হন। অতঃপর হাসানের এক পৌত্র মহম্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় মহম্মদ শাহের রাজত্বকাল নানাদিক দিয়া স্মরণীয়। তাঁহার রাজত্বকালে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান ছিল। দ্বিতীয় মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার দুই পুত্র গিয়াসউদ্দিন ও সামসুদ্দিন দায়ুদ কয়েক মাসের জন্য রাজত্ব করেন। অতঃপর ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে হাসানের পৌত্র গুলবর্গার সিংহাসন অধিকার করিয়া তাজউদ্দিন ফিরোজ শাহ উপাধি ধারণ করেন।

ফিরোজ শাহ বিজয়নগরের বিরুদ্ধে দুইবার অভিযান করিয়া কৃতকার্য্য হন। বিজয়

আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ

নগরের রাজা তাঁহার হস্তে এক কন্যা সম্প্রদান করিতে বাধ্য হন। ১৪২০ খৃষ্টাব্দে তৃতীয়বার অভিযান করিয়া তিনি বিজয়নগরের হস্তে পরাজিত হন এবং বিজয়নগরের হস্তে বাহমনীরাজ্যের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

ফিরোজ শাহের উত্তরাধিকারী আহম্মদ শাহ বিজয়নগরের নিকট পূর্ব্ব পরাজয়ের

প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিজয়নগর আক্রমণ করেন। বিজয়নগরের অধিপতি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রচুর ধনরত্ন ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে বাধ্য হন। আহম্মদ শাহ বরঙ্গলের কিয়দংশ অধিকার করেন এবং গুজরাট ও তেলিঙ্গনার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। আহম্মদ শাহ বিদর নামক স্থানে এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন।

আহম্মদ শাহ

আহম্মদ শাহের পরবর্ত্তী সুলতানগণ দুর্বল ও অকর্মণ্য ছিলেন। তাঁহাদের দুর্বলতার সুযোগে রাজ্যের ওমরাহগণ স্বার্থান্বেষী দুইটি বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়া রাজ্যের অবস্থা আরও শোচনীয় করিয়া তুলিল। এই দুইটি দলের মধ্যে একটি দলের নেতা ছিলেন খাজা মামুদ গাওয়ান। মামুদ গাওয়ান প্রধান মন্ত্রীরূপে তিনজন বাহমনী সুলতানের অধীনে কার্য্য করেন। তিনি শাসনকার্য্যে এবং সমরক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। তাহার প্রচেষ্টায় বাহমনী সাম্রাজ্যের পরিসর বৃদ্ধি হয়। রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া মামুদ সর্ববিষয়ে সুশৃঙ্খলা আনয়ন করেন। তিনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং তাঁহার নিজস্ব পুস্তকালয়ে তিন সহস্রাধিক গ্রন্থ ছিল। মামুদ গাওয়ানের বিরোধী পক্ষ তাঁহার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের প্ররোচনায় বিজয়নগরের সহিত ষড়যন্ত্রের মিথ্যা অভিযোগে সুলতান তৃতীয় মহম্মদ শাহ মামুদ গাওয়ানকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। মামুদ গাওয়ানের পরেই বাহমনী রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ বাহমনী রাজ্য ভাঙ্গিয়া গিয়া বেরার, বিজাপুর, আহম্মদনগর, গোলকুণ্ডা ও বিদর এই পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়।

আভ্যন্তরীণ কলহ

খাজা মামুদ গাওয়ান

পঞ্চরাজ্যে বিভক্ত

বাহমনীর পঞ্চ রাজ্যের ইতিহাস ও পরিণতি :—১৪৯০ খৃষ্টাব্দে ফতেউল্লা ইমাদ শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া বেরারে ইমাদশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইমাদশাহী বংশ ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বেরারে রাজত্ব করে। উক্ত বৎসরই বেরার আহম্মদ নগরের সহিত যুক্ত হয়।

বেরার

বিজাপুরের শাসনকর্ত্তা ইউসুফ আদিল শাহ ১৪৮৯–৯০ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া আদিলশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইউসুফ আদিল শাহ দাক্ষিণাত্যের অন্যতম সুশাসক ছিলেন। তিনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তিনি সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং হিন্দুগণকে রাজপদে নিযুক্ত করিতেন। আদিল শাহের পরবর্ত্তী চারিজন সুলতানের শাসনকাল

বিজাপুর

যুদ্ধবিগ্রহ ও ষড়যন্ত্রে পরিপূর্ণ। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান আদিল শাহের শাসনকাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আদিলশাহী বংশ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মুঘল সম্রাটগণের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করে। পরিশেষে ঔরংজেবের রাজত্বকালে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আহম্মদনগর

মালিক আহম্মদ ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে আহম্মদ নগরে নিজামশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দৌলতাবাদ অধিকার করিয়া আহম্মদনগরের শক্তি বৃদ্ধি করেন। তাঁহার পুত্র বুরহান নিজামশাহ সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি বিজাপুরের বিরুদ্ধে বিজয়নগরের সংঙ্গে সন্ধি করেন। তাঁহার পরবর্তী সুলতান নিজামশাহ বিজয়নগর রাজ্য ধ্বংসের জন্য সম্মিলিত মুসলমান রাজ্যে সঙ্গে তালিকোটার যুদ্ধে যোগদান করেন (১৫৬৫ খৃঃ)। এই বংশের বিবি চাঁদ সুলতানা ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে আকবরের পুত্র মুরাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আহম্মদনগর রক্ষা করেন। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে আহম্মদনগরের সুলতান আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। পরবর্তীকালে আহম্মদনগরের আবিসিনীয় মন্ত্রী মালিক অম্বর শাসনকার্যে ও সামরিক দক্ষতায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। মালিক অম্বরের শিক্ষিত সৈন্যদলকে পরাজিত করার জন্য জাহাঙ্গীরের মুঘল সেনাপতিকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে আহম্মদনগর মুঘল সৈন্যের দ্বারা বিধ্বস্ত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে শাহজাহানের রাজত্বকালে ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে ইহা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

গোলকুণ্ডা

কুলীশাহ নামে বাহমনী রাজ্যের এক কর্মচারী ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নব্বই বৎসর পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া পরিশেষে পুত্র জামসিদ কর্তৃক নিহত হন। জামসিদ সাত বৎসর রাজত্ব করে। জামসিদের ভ্রাতা ও পরবর্তী সুলতান ইব্রাহিম বিজয়নগরের বিরুদ্ধে তালিকোটার যুদ্ধ যোগদান করিয়াছিলেন। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পরে গোলকুণ্ডায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পরিশেষে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব গোলকুণ্ডাকে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

বিদর

বাহমনী রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে একমাত্র বিদরে বাহমনী বংশের সুলতানের আধিপত্য বজায় থাকে। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে কাশিম বারিদের পুত্র আমির বারিদ নিজেকে সুলতান ঘোষণা করিয়া বারিদশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করিলে শেষ বাহমনী সুলতান কলিমুল্লা বিজাপুরে পলায়ন করেন। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বারিদশাহী বংশ বিদরে রাজত্ব করেন। উক্ত বৎসর বিদর বিজাপুরের আদিলশাহী বংশের হস্তগত হয়।

বাহমনী রাজ্যের পঞ্চশাখার মধ্যে কোন সদ্ভাব ছিল না—পারস্পরিক বিবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ ইহাদিগকে ক্রমশঃ দুর্বল করিয়া ফেলে। ইহাদের বিপদের সুযোগে দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের উন্নতির সুবিধা হয় এবং দাক্ষিণাত্যে ইসলামের অগ্রগতি অব্যাহত হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. Give a short history of Bengal under the rule of the independent Sultans.

স্বাধীন সুলতানদের আমলে বঙ্গদেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তর-সূত্র: (১) সেনবংশের সময়ে বাংলাদেশে মুসলমানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী দেড় শতাব্দী কাল বঙ্গদেশ নামতঃ দিল্লীর শাসনাধীনে ছিল কিন্তু কার্যতঃ বঙ্গদেশের মুসলমান শাসকগণ প্রায়ই দিল্লীর প্রাধান্য অস্বীকার করার চেষ্টা করিতেন। সাম্রাজ্যের এক প্রান্তসীমায় অবস্থিত থাকায় দিল্লীর সুলতানগণের পক্ষে বঙ্গদেশকে সম্পূর্ণ দিল্লীর শাসনাধীনে আনার সুযোগ হইত না। দাস বংশের সুলতান ইলতুৎমিস ও বলবনের সময়ে বঙ্গদেশ বিদ্রোহী হইলে বিদ্রোহ দমন করিয়া বঙ্গদেশকে সাময়িকভাবে দিল্লীর শাসনাধীনে আনা হয়। কিন্তু পুনরায় বঙ্গদেশ বিদ্রোহ করে এবং চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া বঙ্গদেশে ইলিয়াসশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

(২) ইলিয়াস শাহী বংশ সত্তর বৎসর বঙ্গদেশ শাসন করে। ইহাদের শাসনকালে বঙ্গদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বংশে সামসুদ্দিন ইলিয়াস, সিকান্দার শাহ ও গিয়াউদ্দিন আজম উল্লেখযোগ্য সুলতান ছিলেন।

(৩) হোসেনশাহী বংশ অর্দ্ধশতাব্দীকাল রাজত্ব করে। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা হোসেন শাহ খ্যাতিমান নরপতি ছিলেন। নানা দিক দিয়া তাহার শাসনকাল উল্লেখযোগ্য। তাহার রাজ্য আসামের প্রান্ত হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি প্রজানুরঞ্জক, ধর্ম সম্বন্ধে উদার এবং দেশীয় ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাহার পুত্র নসরৎ শাহও সুদক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি কূটনীতিক দক্ষতার পরিচয় দিয়া বাবর ও হুমায়ুনের আক্রমণ হইতে বঙ্গদেশকে রক্ষা করেন।

(৪) গিয়াসউদ্দিন মামুদ শাহের সময়ে শেরশাহ সাময়িকভাবে বঙ্গদেশ অধিকার করেন। শের শাহের মৃত্যু হইলে আফগান জাতির কররাণী বংশের হস্তে বাংলাদেশের

আধিপত্য আসে। কররাণী বংশের দ্বিতীয় নরপতি দায়ুদ খাঁর শাসনকালে ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবরের হস্তে বঙ্গদেশের স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়।

2. Describe the reign of the Illias Sahi Sultans of Bengal.

বাংলায় ইলিয়াস শাহী সুলতানদের রাজত্বকাল বর্ণনা কর।

উত্তর-সূত্র:— (২৬১ পৃষ্ঠা)

3. Give a brief history of the Bahmani Sultanate with its five off-shoots.

পঞ্চশাখা সহ বাহমনী রাজ্যের ইতিবৃত্ত বর্ণনা কর।

উত্তর-সূত্র:—মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের সময়ে দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন বাহমনী রাজ্যের উদ্ভব হয়। হাসান আবুল মুজাফ্ফর আলাউদ্দিন বাহমন শাহ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। হাসানের কৃতিত্বের ফলে তাঁহার সময়েই বাহমনী রাজ্য উত্তরে বরঙ্গল হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণা এবং পশ্চিমে দৌলতাবাদ হইতে পূর্বে ভোনগীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

(২) বাহমনী রাজ্যের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য সুলতান প্রথম মহম্মদ শাহ, মুজাহিদ শাহ, দ্বিতীয় মহম্মদ শাহ; তাজউদ্দিন ফিরুজ শাহ, আহম্মদ শাহ, নিজাম শাহ ও তৃতীয় মামুদের নাম উল্লেখযোগ্য। বাহমনী রাজ্যের অস্তিত্বকালের প্রধান ঘটনা— প্রতিবেশী হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ এবং দ্বিতীয়তঃ, রাজ্যের অভিজাত ওমরাহগণের মধ্যে স্বার্থান্বেষী বিরোধ।

(৩) মামুদ গাওয়ান নামে একজন সুদক্ষ ব্যক্তি পরবর্তীকালের তিনজন সুলতানের অধীনে প্রধানমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন। মামুদ গাওয়ানের কৃতিত্বের ফলে বাহমনী রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়। আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের ফলে মামুদ গাওয়ান প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

(৪) মামুদ গাওয়ানের মৃত্যুর পরে বাহমনী রাজ্য বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহম্মদনগর, বেরার ও বিদর এই পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। কালক্রমে এই পাঁচটি রাজ্যই মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। বেরারের ইমাদশাহী বংশ ১৫৭৪ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে—উক্ত বৎসর বেরার আহম্মদনগরের সঙ্গে যুক্ত হইয়া যায়। বিজাপুরে আদিলশাহী বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়—বিজাপুর ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ঔরংজেবের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আহম্মদ নগরে নিজামশাহী বংশ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিলে ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে শাহজাহানের রাজত্বকালে ইহার স্বাধীন অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে গোলকুণ্ডায় কুতুবশাহীবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়—১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে বিদর বিজাপুরের আদিলশাহী বংশের হস্তগত হয়।

6. **Write short notes on (a) Ganesh (b) Hussain Saha (c) Mahmud Gawan.**

টীকা লিখ (ক) গণেশ (খ) হুসেন শাহ (গ, মামুদ গাওয়ান।

উত্তর-সূত্র: (ক) গণেশ (২৬৩ পৃষ্ঠা) (খ) হুসেন শাহ (২৬৪ পৃষ্ঠা) (গ) মামুদ গাওয়ান (২৬১ পৃষ্ঠা)।

5. **Describe the fall of the Delhi Sultanate with special reference to the causes of its decline.**

দিল্লীসুলতানির পতন ও ইহার কারণ সমূহ বর্ণনা কর।

উত্তর-সূত্র:— (২৫৭ পৃষ্ঠা)।

ষোড়শ অধ্যায়

বিজয়নগর ঃ উড়িষ্যা ঃ আসাম

Syllabus :—The Vijayanagar Empire—political history up to Talikota (1565 A.D). Administrative system and economic conditions—art and culture.

Kingdom of Orissa. The Chola-Ganga—Puri and Konark. Pratap Rudradeva and Vaisnavism—Decline.

The warring principalities of Assam—the appearance of Ahoms (early 13th century). Struggle with Sultans. Biswa Singh founds Cocch Behar—Internal feuds.

পাঠ্যসূচী ঃ বিজয়নগর সাম্রাজ্য—তালিকোটা (খৃঃ ১৫৬৫) পর্য্যন্ত রাজনৈতিক ইতিহাস। শাসনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থা—শিল্প-সংস্কৃতি। উড়িষ্যা রাজ্য। চোড় গঙ্গ বংশ—পুরী ও কোনারক। প্রতাপরুদ্রদেব ও বৈষ্ণব ধর্ম—ক্রমাবনতি।

আসামে আত্মকলহে লিপ্ত ক্ষুদ্র রাজ্যাবলী—অহোমগণের আগমন (খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে)—সুলতানগণের সহিত সংঘর্ষ। বিশ্ব সিংহ কর্তৃক কোচবিহারের প্রতিষ্ঠা—আত্মকলহ।

বিজয়নগর :—বিজয়নগর রাজ্যের উৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। তবে একটি বিবরণ সর্বস্বীকৃত যে সঙ্গম নামে এক ব্যক্তির হরিহর, বুক্ক প্রভৃতি পাঁচ পুত্র তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণতীরে বিজয়নগর শহর ও রাজ্যের পত্তন করেন।

সঙ্গমবংশ ঃ—বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠাতা হরিহর ও বুক্কের পিতার নামানুসারে প্রথম রাজবংশ সঙ্গমবংশ নামে পরিচিত। প্রথম নরপতি হরিহরের মৃত্যুর পরে ভ্রাতা

বুক্ক

বুক্ক বিজয়নগরের অধিপতি হন। বুক্ক সুদক্ষ নরপতি ছিলেন। তিনি চীন সম্রাটের দরবারে দূত প্রেরণ করেন এবং বাহমনী রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেন। বুক্কের পরবর্তী নরপতি দ্বিতীয়

দ্বিতীয় হরিহর

হরিহর 'মহারাজাধিরাজ' 'রাজপরমেশ্বর' প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন। তাঁহার সময়ে কাঞ্চী, ত্রিচিনপল্লী প্রভৃতি নগর বিজয়নগরের অধিকৃত হয়। তাঁহার রাজত্বকালে প্রতিবেশী বাহমনী রাজ্যের সহিত বিজয়নগরের যুদ্ধবিগ্রহ হয়। দ্বিতীয় হরিহরের পুত্র প্রথম দেবরায়ের রাজত্বকালের

বাহমনী রাজ্যের সহিত যুদ্ধ হয়। দেবরায় বাহমনী রাজ্যের সুলতান ফিরুজ শাহের নিকট শোচনীয়রূপে পরাজিত হইয়া তাহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বাহমনী রাজ্যের সহিত বিজয়নগরের বিরোধ পরবর্তী রাজাদের আমলেও চলিয়াছিল। দ্বিতীয় দেবরায়ের সময়েও বিজয়নগর বাহমনীর সৈন্যদলের হস্তে পরাজিত হয় এবং দেবরায় বাহমনী রাজকে কর দিতে স্বীকৃত হন। তাঁহার রাজত্বকালে ইটালীয় বণিক নিকোলাই কণ্টি ও পারসিক দূত আবদুর রজ্জাক বিজয়নগর রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। ইহারা উভয়েই বিজয়নগর রাজ্যের আয়তন, বিজয়নগরের ঐশ্বর্য্য ও অন্যান্য ঘটনা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় দেবরায় সঙ্গম বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট উদারতা ছিল। তাঁহার সেনাবাহিনীতে বহু মুসলমানও চাকরী করিত।

দ্বিতীয় দেবরায়

দেবরায়ের মৃত্যুর পরে ক্রমান্বয়ে তাঁহার দুই পুত্র রাজত্ব করেন, ইহারা বিশাল বিজয়নগর রাজ্য শাসন করার মত উপযুক্ত ছিলেন না। পরিশেষে ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগিরির শাসনকর্তা নরসিংহ শালুব অপদার্থ নরপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা শালুব বংশ নামে পরিচিত।

শালুব বংশ

নরসিংহ শালুব আইনতঃ অনধিকারী হইলেও বিবিধ গুণের জন্য প্রজাগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইতিপূর্বে বিজয়নগর রাজ্যের যে সকল অঞ্চল বিদ্রোহী হইয়াছিল নরসিংহের চেষ্টায় ঐ সকল স্থান পুনরধিকৃত হয়।

নরসিংহ শালুব

নরসিংহ শালুব মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার পুত্রদ্বয়কে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া রাজ্যশাসনের দায়িত্ব সেনাপতি নরসনায়কের হস্তে ন্যস্ত করিয়া যান। নরসনায়ক বিশ্বস্ততার সহিত ক্রমান্বয়ে প্রভুর দুই পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজত্ব করেন। নরসনায়কের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র বীর নরসিংহ শালুব বংশের নরপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তুলুব বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। বীর নরসিংহের মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণদেব রায় বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তুলুব বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বিজয়নগর রাজ্য গৌরব ও সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হইয়াছিল।

তুলুব বংশ
নরসনায়ক

কৃষ্ণদেব রায় বীর ও নির্ভীক যোদ্ধা ছিলেন। তিনি দক্ষিণ মহীশূরের বিদ্রোহী অধিপতিকে পরাস্ত করেন। তিনি বিজাপুরের নিকট হইতে রায়চুর হস্তগত করেন এবং উড়িষ্যারাজ গজপতি প্রতাপ-রুদ্রকে আক্রমণ করিয়া উদয়গিরির দুর্গ অধিকার করেন। তাঁহার অভিযানের ফলে বিজয়নগরের সাম্রাজ্যের পরিধি পশ্চিমে দক্ষিণ কঙ্কণ, পূর্বে বিশাখাপত্তন এবং দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

কৃষ্ণদেব রায়

সাম্রাজ্য বিস্তার

বহুমুখী প্রতিভা ও অন্যান্য সদ্‌গুণের জন্য কৃষ্ণদেব রায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। স্বয়ং বৈষ্ণব হইলেও প্রজাগণ স্বেচ্ছানুরূপ ধর্মমত পালন করিতে পারিত। এই সময়ে পর্তুগীজগণ গোয়া অধিকার করিয়া প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কৃষ্ণদেব রায় পর্তুগীজদের নেতা আলবুকার্কের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। পর্তুগীজ পর্যটক পায়েজ এই সময়ে বিজয়নগর পরিদর্শন করেন। তিনি কৃষ্ণদেব রায়ের শক্তি, শাসনক্ষমতা, ন্যায়পরায়ণতা, বিদেশীদের সহিত সদয় ব্যবহার প্রভৃতি গুণ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। পায়েজ বিজয়নগরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হন। কৃষ্ণদেব রায়ের ব্যক্তিগত কৃতিত্বের ফলেই বিজয়নগর রাজ্য এই সময়ে গৌরব ও সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হইতে সক্ষম হইয়াছিল।

চরিত্র

কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতা অচ্যুৎ রায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একেবারে অনুপযুক্ত ছিলেন না। তিনি দুইজন বিদ্রোহী প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে দমন করিয়া রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধি করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র প্রথম বেঙ্কট সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি এবং তাঁহার পরবর্তী নরপতি সদাশিব রায় অকর্মণ্য শাসক ছিলেন। সদাশিব রায় নামে মাত্র নরপতি ছিলেন, প্রকৃত ক্ষমতা তাঁহার মন্ত্রী রাম রায়ের হস্তে ন্যস্ত ছিল। রাম রায় কার্য্যদক্ষ মন্ত্রী ছিলেন এবং বিজয়নগরের নষ্ট গৌরব উদ্ধারের জন্য পরস্পর বিবদমান বাহমনী রাজ্যের শাখারাজ্যগুলির বিবাদে কখনও এক পক্ষ কখনও বা অপর পক্ষ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। রামরায়ের অন্যায় আচরণে অতিষ্ঠ হইয়া বেরার ব্যতীত বাহমনী রাজ্যের অপর চারিটি শাখা সাময়িকভাবে আত্মকলহ বিস্মৃত হইল এবং সম্মিলিতভাবে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগর সম্মিলিত রাজ্য চতুষ্টয়ের নিকট চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে রাম রায় পরাজিত ও নিহত হন।

রাম রায়

তালিকোটার যুদ্ধ
১৫৬৫ খৃঃ

বিজয়ী মুসলমান সৈন্যদল বিজয়নগর লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে। ইহার পরে রামরায়ের ভ্রাতা তিরুমল পুনরায় বিজয়নগরে প্রত্যাবর্তন করিয়া নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন এবং সদাশিবকে পরাজিত করিয়া অরবিড়ু বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই বিজয়নগরের চতুর্থ রাজবংশ। এই বংশ কিছুকাল রাজত্ব করেন। পরিশেষে দুর্বল নরপতিগণের শাসনকালে বিজয়নগরের পতন হয় এবং বিজয়নগর রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে শ্রীরঙ্গপত্তন, তাঞ্জোর, মাদুরা প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়।

অরবিড়ু বংশ

বিদেশী পর্য্যটকগণের বিবরণ:—পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বিদেশী পর্য্যটকগণ ভারতে আসিয়া বিজয়নগরের ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধি সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। নিকোলাই কণ্টি নামে জনৈক ইটালীয় পর্য্যটক ও আবদুর রজ্জাক নামে একজন পারসিক রাজদূত বিজয়নগরে আসিয়াছিলেন। ইহারা তাঁহাদের বিবরণে তদানীন্তন বিজয়নগরের ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তির কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পর্টুগীজ পর্য্যটক পায়েজ ও নুনিজের বিবরণ হইতেও বিজয় নগরের সমৃদ্ধি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

নিকোলাই কণ্টির বিবরণ হইতে জানা যায়—একটি পর্বতের পাদদেশে নির্মিত বিজয়নগরের পরিধি ষাট মাইল দীর্ঘ ছিল এবং পর্বতমালার পাদদেশ পর্য্যন্ত ইহা প্রাকার বেষ্টিত ছিল। শহরে অস্ত্রধারণক্ষম নব্বই হাজার লোক ছিল। ভারতের অন্য কোন নরপতি অপেক্ষা বিজয়নগরের রাজা অধিক শক্তিশালী ছিলেন।

নিকোলাই কণ্টি

ডোমিংগস পায়েজ নামে জনৈক পর্টুগীজ ভ্রমণকারী বিজয়নগর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—বিজয়নগরের রাজার অগণিত ধনরত্ন, সৈন্য এবং হস্তী আছে। এই স্থানে বিভিন্ন দেশ, ত এবং ধর্মের লোক সমূহ বাস করে। এই রাজ্যে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের অভাব নাই। রাজপথসমূহ ভারবাহী গো-শকটে সর্বদাই পরিপূর্ণ। পায়েজ কৃষ্ণদেব রায়ের শাসনকালে বিজয়নগর পর্য্যটন করেন।

পায়েজ

পারসিক পর্য্যটক আবদুর রজ্জাক ১৪৪২—৪৩ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরে আগমন করেন। তিনি বলেন—বিজয়নগরের উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকল অধিবাসী মূল্যবান রত্নখচিত অলঙ্কার পরিধান করিত।

আবদুর রজ্জাক

অচ্যুত রায়ের রাজত্বকালে নুনিজ নামে অপর একজন পর্তুগীজ পর্যটক বিজয়নগর পরিদর্শন করেন। তাঁহার বিবরণেও বিজয়নগরের সম্পদ ও সমৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া

যায়। অবশ্য সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য অভিজাত বংশীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিজয়নগরের সাধারণ অধিবাসী ছিল দরিদ্র।

বিজয়নগরের শাসন ব্যবস্থাঃ—বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শাসনপদ্ধতি সুদৃঢ় ও সুশৃঙ্খল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। নরপতিই রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতার উৎস ছিলেন, কিন্তু প্রজাসাধারণের মঙ্গলামঙ্গলের উপর লক্ষ্য রাখিয়া রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পরিচালিত হইত। ইহা নরপতিকেন্দ্রিক হইলেও স্বেচ্ছাচারী ছিল না।

ক্ষমতার উৎস নরপতি

রাজা মনোনীত মন্ত্রি-পরিষদের সাহায্যে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণগণ উচ্চপদের অধিকারী ছিলেন। মন্ত্রীর পদ বংশানুক্রমিক ছিল। মন্ত্রিবর্গ ব্যতীত বিভিন্ন বিভাগের জন্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিল। রাজধানী শহরে ব্যয়বহুল রাজসভা থাকিত; অভিজাত সম্প্রদায়, বণিকশ্রেণী, পণ্ডিত, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতি রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন।

মন্ত্রিবর্গ ও রাজ কর্মচারী

শাসনের সুব্যবস্থার জন্য সমগ্র রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে (রাজ্য, মণ্ডল) এবং উপপ্রদেশে। (নাড়ু, সীমা) বিভক্ত ছিল। বিজয়নগর সাম্রাজ্য ছয়টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল বলিয়া জানা যায়। প্রত্যেক প্রদেশ অভিজাত বংশীয় বা রাজ বংশোদ্ভূত 'নায়ক' উপাধিকারী শাসনকর্তার হস্তে ন্যস্ত থাকিত। প্রাদেশিক 'নায়ক'গণ স্থানীয় সামরিক, অ-সামরিক বা বিচার ব্যবস্থার চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে কেন্দ্রীয় দরবারে আয়ব্যয়ের হিসাব দাখিল করিতে এবং প্রয়োজনে সামরিক সাহায্য প্রদান করিতে হইত। অযোগ্যতা বা রাজদ্রোহের অভিযোগ থাকিলে তাহারা পদচ্যুত হইতেন বা তাহাদের জায়গীর বাজেয়াপ্ত হইত।

প্রদেশ ও তাহাদের শাসন ব্যবস্থা

আর্য্যাবর্তের পঞ্চায়েৎ প্রথার মত বিজয়নগর সাম্রাজ্যে গ্রাম্য শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। গ্রাম্য প্রধানগণ স্থানীয় নির্বাহিক বিচার ও শান্তি রক্ষার কার্য্য পরিচালনা করিতেন। এই কার্য্যের বিনিময়ে রাজদত্ত ভূমি ভোগ করিতেন। মহানায়কাচার্য্য নামে সরকারী কর্মচারী গ্রাম্য পরিষদের উপর সাধারণ তত্ত্বাবধান করিতেন।

বিজয়নগরের শিল্প ও সাহিত্যঃ—সাহিত্য ও শিল্পের উৎকর্ষের জন্য বিজয়নগর সাম্রাজ্য যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বিজয়নগরের নরপতিগণ সংস্কৃত, তেলেগু, তামিল ও কন্নাড় ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ইহাদের আনুকূল্যে এই সকল ভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। বেদের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য ও তাঁহার ভ্রাতা

মাধব বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার আদিকালে বর্তমান ছিলেন। কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকালে বিজয়নগরে শিল্প ও সাহিত্য যথেষ্ট বিকাশ প্রাপ্ত হয়। তাঁহার রাজত্বকালে শিল্পকলার ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করে। কৃষ্ণদেব রায় স্বয়ং বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং বিদ্বান্ ও গুণী ব্যক্তিকে অর্থ ও ভূমিদান করিয়া যথেষ্ট উৎসাহিত করিতেন। তিনি স্বয়ং তেলেগু ভাষায় একখানা ও সংস্কৃত ভাষায় পাঁচখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কৃষ্ণদেব রায়ের রাজসভায় বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের ন্যায় 'অষ্টদিগ্‌গজ' বা আটজন পণ্ডিত অবস্থান করিতেন। ইহারা তেলেগু ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতেন। অরবিডু বংশীয় রাজগণও বিদ্বানের সমাদর করিতেন।

বিজয়নগরের রাজধানী শহরের ধ্বংসাবশেষ হইতে অনুমিত হয় যে, ইহা স্থাপত্য কলারও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল এবং তথায় একটি স্থাপত্যরীতির উদ্ভব হইয়াছিল। কৃষ্ণ রায়ের সময়ে নির্মিত হাজারা মন্দিব এবং বিঠ্ঠল স্বামীর মন্দির স্থাপত্য শিল্পের আশ্চর্য্য নিদর্শন। বিজয়নগর সাম্রাজ্যে চিত্রকলায়ও বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল।

উড়িষ্যা:—মহাবীর অনন্ত বর্মণ চোড়গঙ্গ (১০৭৬—১১৪৮ খৃঃ) একাদশ
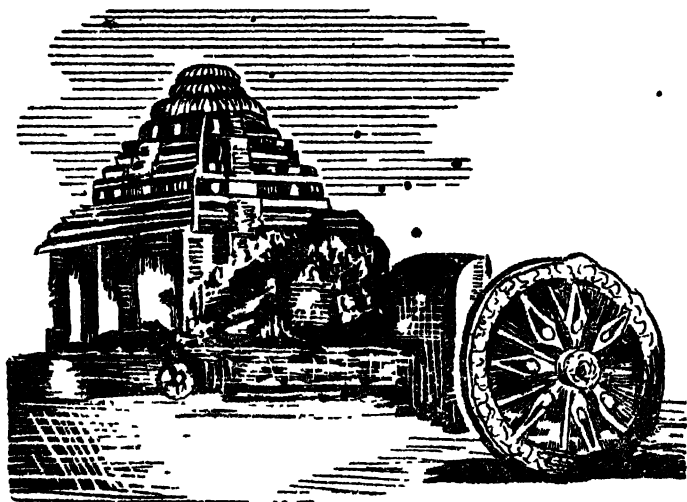
সূর্য্য মন্দির (কোনারক)

শতাব্দীর শেষভাগে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া উড়িষ্যাকে একটি শক্তিশালী রাজ্যে

পরিণত করেন। উড়িষ্যা রাজ্য গঙ্গা হইতে আরম্ভ করিয়া গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। চোডগঙ্গের সময়ে উড়িষ্যার জগন্নাথদেবের মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। চোডগঙ্গের বংশধরগণের মধ্যে নরসিংহ (১২৩৮—৬৪) উল্লেখযোগ্য নরপতি ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের মুসলমানদের আক্রমণ হইতে উড়িষ্যা রক্ষা করেন। তাঁহার সময়ে কোণারকের প্রসিদ্ধ সূর্য্যদেবতার মন্দির নির্মিত হয়।

অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ

নরসিংহ

আনুমানিক ১৪৩৪—৩৫ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার শাসনদণ্ড গজপতি নামে এক নূতন

কোনারকের মন্দিরের অশ্ব

এক বংশের হস্তগত হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কপিলেন্দ্রের সময়ে উড়িষ্যার গৌরব বৰ্দ্ধিত হয়। তিনি বিজয়নগরকে পরাজিত করিয়া কাবেরী পর্য্যন্ত উড়িষ্যার রাজ্যসীমানা বৰ্দ্ধিত করেন। উদয়গিরি নামে বিজয়নগর রাজ্যের অন্যতম প্রদেশ ও কাঞ্চী তাহার অধিকারে আনীত হয়।

গজপতি বংশ—কপিলেন্দ্র

পরবর্তী নরপতি পুরুষোত্তমদেবের সময়ে উড়িষ্যার ক্ষমতা খর্ব হইয়া যায়। বিজয়নগরের নরসিংহ শালুব এবং বাহমনীর রাজা উড়িষ্যা রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করিয়া লন। তাঁহার পুত্র প্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বকালে উড়িষ্যার রাজ্য মেদিনীপুর হইতে মাদ্রাজের

পুরুষোত্তমদেব

ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির
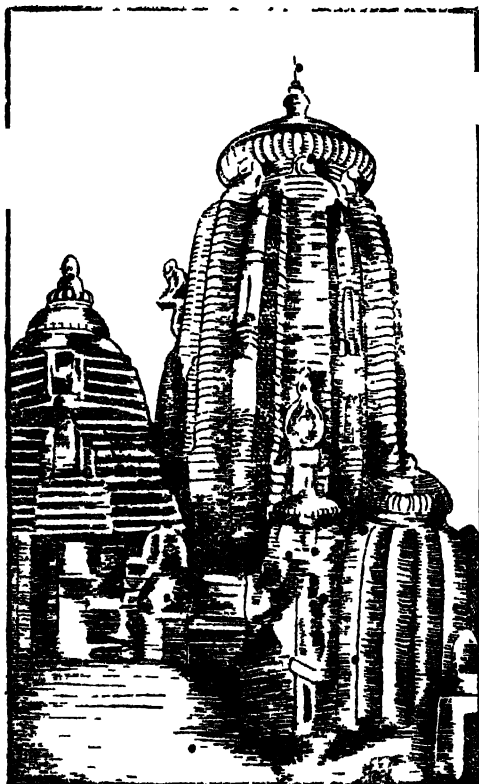
গুন্টুর জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু গোলকুণ্ডা ও বিজয়নগরের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে প্রতাপরুদ্রকে উড়িষ্যার অংশবিশেষ ইহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া সন্ধি করিতে হয়। প্রতাপরুদ্রদেব চৈতন্যদেবের শিষ্য ছিলেন।

প্রতাপরুদ্রদেব

১৫৪১—৪২ খৃষ্টাব্দে কপিলেন্দ্র বংশের পতন হয় এবং ভোই নামে এক নবীন রাজবংশের উদ্ভব হয়। এই বংশ অষ্টাদশ বৎসর রাজত্ব করে। এই বংশ ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দ হরিচন্দন কর্তৃক বিতাড়িত হয়। মুকুন্দ উড়িষ্যাকে মুসলমানের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য চেষ্টা করেন। মুঘল সম্রাট আকবর বঙ্গদেশ হইতে আফঘান শক্তি নির্মূল করার জন্য মুকুন্দ হরিচন্দনের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১৫৬৭—৬৮ খৃষ্টাব্দে বাংলার আফঘান সুলতান সুলেমান কররাণী উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে মুকুন্দদেব পরাজিত হইলেন—উড়িষ্যা কররাণী বংশের হস্তগত হইল। কররাণীর সেনাপতি কালাপাহাড় একদল সৈন্য লইয়া পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির আক্রমণ করেন এবং বহু মূর্তি ধ্বংস করেন। অতঃপর উড়িষ্যার আধিপত্য লইয়া মোঘল-আফঘান বিরোধ আরম্ভ হয়।

মুকুন্দ হরিচন্দন

বাংলা দেশের অধিকার কররাণী সুলতান কর্তৃক হস্তগত

আসাম: ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানদের আগমনের প্রাক্কালে আসাম কতগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বোদো-সান উপজাতীয় চুটিয়া রাজ্য, কাছাড়ী রাজ্য, ভুঁইয়া রাজ্য এবং কামরূপ বা কামতাপুর রাজ্য। কামরূপ রাজ্য আসামের সর্ব পশ্চিমে এবং ব্রহ্মদেশের পূর্বে অবস্থিত ছিল এবং এই রাজ্যটি আসামের রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী ছিল। কামরূপের পশ্চিম সীমা করতোয়া নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কামরূপ রাজ্য যখন শক্তিশালী হইয়া বিস্তার লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছিল, তখন ইহা বাধাপ্রাপ্ত হয়—পূর্বে অহোম নামে এক উপজাতি এবং পশ্চিমে বাংলার মুসলমান সুলতানদের দ্বারা। সান-উপজাতির উপজাতির একাংশ উত্তর ব্রহ্ম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী অঞ্চলে নিজদিগকে শক্তিশালী করিয়া তোলে। অহোমগণ কালক্রমে ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়া ভারত অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে খেনবংশ কোচবিহারের কয়েক মাইল দক্ষিণে কামতাপুরে রাজধানী স্থাপন করে। খেনবংশ পঁচাত্তর বৎসর কামতা-রাজ্য শাসন করার পরে বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন খেন বংশের শেষ রাজা নীলাম্বরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কামতা অধিকার করেন (১৪৯৮ খৃঃ)। ইতিমধ্যে কোচ উপজাতি শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং কোচনায়ক বিশ্বসিংহ ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে কোচবিহারকে কেন্দ্র করিয়া একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের পত্তন করে। কোচরা অহোমদের ন্যায় মঙ্গোলীয়

অহোমগণ

খেনবংশ

কোচরাজগণ:—
বিশ্বসিংহ

উপজাতিরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোচনরপতিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণ। তাঁহার অধীনে কামতারাজ্য শক্তি ও সমৃদ্ধির চরম শিখরে আরোহণ করে। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে রাজ্য লইয়া পারিবারিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে নরনারায়ণ ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেবকে সঙ্কোশ নদীর পূর্ববর্তী সমগ্র অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। ফলে কোচরাজ্য কোচবিহার ও কোচহাজো নামক দুইটি পৃথক রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। অতঃপর এই দুই বিভাগের মধ্যে বিবাদবিসম্বাদের সুযোগে পূর্ব হইতে অহোমগণ এবং পশ্চিম হইতে মুসলমানগণ কামতারাজ্যের উপর আক্রমণ করিতে থাকে এবং ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে পূর্বাংশ অহোমগণের এবং পশ্চিমাংশ মুসলমানদের হস্তগত হয়।

নরনারায়ণ

কোচবিহার ও কোচরাজ্য

অতঃপর অহোমগণই পূর্বদিকে মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তারের প্রবল প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল এবং বঙ্গদেশের পূর্বসীমান্তে অহোমদের সহিত বাংলার সুলতানদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। অহোম নরপতি সুহেন্‌ফা বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সমসাময়িক ছিলেন। হুসেন শাহ সুহেন্‌ফা-র বিরুদ্ধে অভিযান করেন। প্রথমদিকে সাফল্য লাভ করিলেও এই অভিযান শেষ পর্যন্ত সার্থক হয় নাই। পরবর্তীকালেও বাংলার সুলতানগণ অহোম রাজ্যে অভিযান করেন ; কিন্তু অহোমগণ মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করেন (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ)। পরবর্তী সময়ে মুঘলদের আমলে মুঘলদের সহিতও অহোমদের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলিয়াছিল।

অহোম-মুসলিম সঙ্ঘর্ষ

অহোমদের স্বাধীনতা সংগ্রাম

প্রশ্নোত্তর

1. Give a short account of the Vijaynagar Empire up to the battle of Talikota.

তালিকোটের যুদ্ধ পর্যন্ত বিজয়নগর সাম্রাজ্যের একটি বিবরণ দাও।

উত্তর-সূত্র : (১) দাক্ষিণাত্যের অন্যতম স্বাধীন হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর দিল্লীর সুলতানদের পতনের প্রাক্কালে সংস্থাপিত হইয়া প্রায় তিন শতাব্দীকাল দাক্ষিণাত্যকে ইসলামের সর্বগ্রাসী প্রভাবের হস্ত হইতে রক্ষা করে। পরোক্ষতঃ বিজয়নগর বাহমনী রাজ্যের গ্রাস হইতে উত্তর ভারতকেও রক্ষা করে। দুর্বল দিল্লী-সুলতানদের রাজত্বকালে দক্ষিণের পরাক্রান্ত বাহমনী রাজ্য অনায়াসে উত্তর ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে

সক্ষম হইত কিন্তু সন্নিকটে শক্তিমান বিজয়নগরের সহিত বিরোধে ব্যাপৃত থাকায় বাহমনী রাজ্য দক্ষিণাঞ্চল পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয় নাই।

(২) বিজয়নগরের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ—সঙ্গম নামে এক ব্যক্তির পাঁচ পুত্র হরিহর ও বুক্ক প্রভৃতি বিজয়নগরের পত্তন করেন। প্রথম রাজবংশ সঙ্গম বংশ—হরিহর, বুক্ক, দ্বিতীয় হরিহর, প্রথম দেবরায়, দ্বিতীয় দেবরায় প্রভৃতি রাজত্ব করেন। নিকোলাই কন্টি ও আবদুল রজ্জাক-এর পরিভ্রমণ।

(৩) শালুব বংশ—নরসিংহ শালুব।

(৪) তুলুব বংশ—শ্রেষ্ঠ নৃপতি কৃষ্ণদেব রায়—বিজয়নগর গৌরবের চরম সীমায় আরোহণ করে—যুদ্ধবিগ্রহ—সাম্রাজ্যসীমা—বিদেশী পর্যটক পাএস।

(৫) আভ্যন্তরীণ বিরোধ—বেরার ব্যতীত বাহমনী রাজ্যের চারিটি শাখা সম্মিলিত ভাবে বিজয়নগর আক্রমণ করিল—তালিকোটার যুদ্ধে (১৫৬৫ খৃঃ) পরাজয়।

(৬) বিজয়নগরের ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধি সম্বন্ধে বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী।

2. What do you know of the administrative, social and cultural progress of the Vijoynagar Empire.

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

উত্তর-সূত্র: (২৭৬—২৭৮ পৃষ্ঠা)।

3. Give an account of the history of Orissa up to its conquest by the Muslims.

মুসলিম অধিকারের পূর্ব পর্য্যন্ত উড়িষ্যার ইতিহাস বর্ণনা কর।

উত্তর-সূত্র: (২৭৭—২৮০ পৃষ্ঠা)।

4 Give an account of the history of Assam from the 12th to the 16th century.

ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত আসামের ইতিহাস লিখ।

উত্তর-সূত্র: (২৮০—২৮১ পৃষ্ঠা)।

5. Write notes on (a) Krishna Deva Roy (b) Battle of Talikota.

টীকা লিখ:—(ক) কৃষ্ণদেব রায় (খ) তালিকোটার যুদ্ধ

উত্তর-সূত্র: (ক) কৃষ্ণদেব রায় (২৭৪ পৃষ্ঠা) (খ) তালিকোটার যুদ্ধ (২৭৩ পৃষ্ঠা)।

সপ্তদশ অধ্যায়

সুলতানী আমলে ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি

Syllabus:—Impact of Islam on India—Orthodox reaction-Raghunandan of Bengal. The way of Synthesis Hussain Saha and Zainul Abedin

The Bhakti Cult and Sufism. Ramananda, Kabir, Chaitanya, Mirabai, Namdev and Nanak. Influence of vernacular literature. Development of Indo-Saracenic style of art.

পাঠসূচী:—হিন্দুভারতের সহিত ইসলামের সংঘাত—প্রাচীনপন্থীদের উপর প্রতিক্রিয়া: বঙ্গদেশে রঘুনন্দন—সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী—হুসেন শাহ ও জয়নুল আবেদিন। ভক্তিধর্ম ও সুফীবাদ; রামানন্দ, কবীর, চৈতন্য, মীরাবাই, নামদেব ও নানক। দেশীয় ভাষাগুলির উপর প্রভাব: ইন্দো-সারাসেনীয় শিল্পরীতির বিকাশ।

ভারতীয় ও ইসলাম সভ্যতার মধ্যে সংঘাত:—ভারতবর্ষ সুপ্রাচীনকাল হইতে পারসিক, গ্রীক, শক, হুন, গুর্জর প্রভৃতি বিদেশী জাতির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে এবং এই সকল জাতি ভারতীয় হিন্দুগণকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজ্যস্থাপন করিয়াছে। কিন্তু হিন্দু-সমাজ ব্যবস্থার আশ্চর্য্য গ্রহিষ্ণু ক্ষমতার ফলে এই সকল বিদেশী জাতি বিশাল হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটে নাই। ইহার প্রধান কারণ ইসলামের বিধিব্যবস্থা, ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি হিন্দুধর্ম হইতে এত স্বতন্ত্র ছিল যে ইহার পৃথক সত্তা বিলুপ্ত করিয়া ইহাকে হিন্দুধর্ম ও সমাজবিধির অন্তর্গত করার কোন উপায় ছিল না। বরঞ্চ বহু হিন্দু নানা কারণে হিন্দুধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ইসলামের কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য রক্ষণশীল হিন্দু সমাজেও নানা প্রকার কঠোর নীতি অবলম্বন করার প্রচেষ্টা দেখা দিল। হিন্দুর পক্ষে

ইসলামের সহিত হিন্দুসমাজের সংঘাত

ধ ও সমাজবিধির কোন প্রকার স্খলন ক্ষমার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। বিজয়নগরের মাধবাচার্য্য পরাশর স্মৃতির টীকা নূতন করিয়া রচনা করিতে লাগিলেন, বাঙ্গালী কুল্লুক ভট্ট ও স্মার্ত্ত রঘুনন্দন মনুসংহিতাকে যুগোপযোগী সংশোধন করিয়া হিন্দু সমাজ-বিধির নির্দেশ করিয়া দিলেন। আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুধর্ম্ম অনুদার ও সঙ্কীর্ণমনা হইতে বাধ্য হইল। ইহার ফল আপাততঃ লাভজনক হইলেও পরিণামে ক্ষতিকর হইয়াছিল।

হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রতিক্রিয়া: রক্ষণশীলতা

মুসলমান অধিকারের প্রথম যুগে হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক বিরোধের অঙ্গস্বরূপ ধর্ম্মসংক্রান্ত বিরোধও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।' কিন্তু কালক্রমে উভয় ধর্মমতের অধিবাসিবৃন্দ সুদীর্ঘকাল একত্র বসবাস করার ফলে পরস্পরের ধর্মমত ও আচারব্যবহার সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত সহিষ্ণু হইয়া আসিল এবং নিজেদের অজ্ঞাতসারে পরস্পরের আচারব্যবহার অনুকরণ করিতে লাগিল। হিন্দুধর্মের দ্বারা প্রভাবিত সুফীবাদ মুসলমান ধর্ম্মের অঙ্গ হইল—হিন্দুগণও মুসলমান পীর ফকিরকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। হিন্দু ও মুসলমানের দ্বারা পূজিত সত্যপীরের উদ্ভব উভয় ধর্মের সমন্বয়ের ফলেই হইয়াছিল। হিন্দুধর্মের প্রতি অনুরাগের ফলস্বরূপ হিন্দুধর্মের বহু সংস্কৃত গ্রন্থ মুসলমান কর্তৃক পঠিত ও অনূদিত হইতে লাগিল। উর্দু ভাষা সমসাময়িক হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ফলেই উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার লিপি, শব্দ ও ভাব প্রধানতঃ আরবী ও পার্সী ভাষা হইতে গৃহীত কিন্তু ইহার ব্যাকরণ সংস্কৃতমূলক। আমির খস্রু হিন্দী গ্রন্থ রচনা করেন। অনুরূপ হিন্দু লেখকগণ ফার্সী ও উর্দু ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ধর্মের ক্ষেত্রেও উভয় ধর্মের সমন্বয়ের ফলস্বরূপ হিন্দুধর্মে বহু উদারমতাবলম্বী ধর্মাচার্য্যের অভ্যুদয় হইল এবং ইসলামের ন্যায় হিন্দুধর্ম সামাজিক জীবনে অধিকতর উদারতা ও সাম্যনীতির পরিচয় দিতে লাগিল। নানক, কবীর, চৈতন্য, নামদেব তাঁহাদের প্রচারিত ধর্মে এই উদারনীতি অনুসরণ করিলেন। ধর্মমতের বিভিন্নতা ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে অন্তরায় হইতে পারে না—অন্তরের পবিত্রতা ও ঐকান্তিকী ভক্তিই প্রকৃত ধর্মলাভের একমাত্র সোপান এই মহা সত্যই ইহারা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বর্ণাশ্রমের প্রাধান্যও ইহারা অস্বীকার করিলেন। ধর্মাচার্য্যগণের এই বাণী হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সাগ্রহে গ্রহণ করিল, ফলে ধর্মের বিশাল ক্ষেত্রে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সমন্বয় ঘটিল।

সংস্কৃতি সমন্বয়

ধর্মের ক্ষেত্রে সমন্বয়

বাংলাদেশের সুলতানগণ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য স্থাপনের

জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহাদের আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু ধর্মগ্রন্থাদির বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও স্বাধীন রচনার সূত্রপাত হয়। সুলতান হুসেন শাহের উৎসাহে মালাধর বসু ভাগবতের অনুবাদ করেন, তাঁহার পুত্র সুলতান নসরৎ শাহের প্রচেষ্টায় মহাভারত বাংলায় অনূদিত হয়। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ-র উদ্যোগে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত অনুবাদ করেন। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁ-র উৎসাহে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব বাংলায় অনুবাদ করেন। বাংলা রামায়ণ রচয়িতা কৃত্তিবাস গ্রন্থ রচনায় গৌড়রাজের আনুকূল্য প্রাপ্ত হন। 'মনসা মঙ্গল' রচয়িতা বিজয়গুপ্ত স্বীয় কাব্যে হুসেন শাহের সুশাসন ও প্রজারঞ্জনের উল্লেখ করেন।

হুসেন শাহ ও অন্যান্য সুলতানদের হিন্দুপ্রীতির দৃষ্টান্ত

বাংলাদেশের সুলতানদের ন্যায় কাশ্মীরের নরপতি জৈনুল আবিদিন উদারমনা নরপতি ছিলেন। হিন্দুদের প্রতি তিনি উদার নীতি প্রদর্শন করেন। তাঁহার হিন্দুবিদ্বেষী পিতা সিকান্দরের সময়ে যে সকল ব্রাহ্মণ দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনেন ও হিন্দু পণ্ডিতগণকে সমাদর করেন। তিনি জিজিয়া কর তুলিয়া দেন এবং প্রজাগণকে ধর্মাচরণের অবাধ স্বাধীনতা দেন। তাঁহার উদ্যোগে মহাভারত ও রাজতরঙ্গিণী সংস্কৃত হইতে ফার্সীতে অনূদিত হয়। তাঁহার উদারতা ও প্রজাকল্যাণের জন্য তাঁহাকে 'কাশ্মীরের আকবর' বলা যায়।

কাশ্মীরের জৈনুল আবিদিন

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব ও মিলনের ফল অন্য একটি দিক দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। উভয় ধর্মের শ্রেষ্ঠ সাধকগণ অবশেষে এই সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইলেন যে, সকল ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হইল ভগবানের সহিত মানুষের মিলন এবং ভগবানের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। এই জন্যই এই যুগের ধর্মাচার্য্যগণ ভগবানের উপাসনা ও সকল মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখার নীতিকেই ধর্মসাধনার আদর্শরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে হিন্দু ভক্তিবাদ ও ইসলাম সুফীবাদ সর্বাধিক অগ্রণী ছিল। হিন্দুধর্মে ভাগবত ধর্ম ও ভক্তিবাদ বহু প্রাচীনকাল হইতেই একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইসলামের সুফীবাদেও ভক্তিবাদের মত ভগবানের উপাসনা, ভগবানের সহিত মানুষের একাত্মবোধ এবং জাতিধর্ম-নির্ব্বিশেষে মানুষের সাম্য আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে। খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে সুফীবাদের উদ্ভব হইলেও হাফিজ, সাদী, রুমি, ওমর খৈয়াম প্রভৃতি মানবপ্রেমিকদের চেষ্টায় উহা পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

ভক্তিবাদ ও সুফীবাদ

জরথুষ্ট্রের ধর্মমত বৌদ্ধধর্ম, বেদান্তবাদ, ভক্তিধর্ম সকল কিছুকেই উহারা ভগবৎসাধনার অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুফীবাদীদের মধ্যে নিজামুদ্দিন আউলিয়া, মৈনুদ্দিন চিস্তি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিজামুদ্দিন আউলিয়া মাতৃভূমি আফগানিস্থান পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে বসবাস করেন। তিনি উভয় ধর্মের লোকের সম্মানের পাত্র ছিলেন। আলাউদ্দিন খলজী তাঁহার দরগায় মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। মৈনুদ্দিন চিস্তি আজমীঢ়ে বাস করিতেন। ভালবাসার মধ্য দিয়া ভগবৎপ্রাপ্তির পথ উভয়েই দেখাইয়াছিলেন। তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকের শ্রদ্ধা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রামানন্দ

রামানন্দ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এলাহাবাদের এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাম-সীতার উপাসনার মধ্য দিয়া ভগবৎপ্রাপ্তির কথা প্রচার করেন। তিনি ভক্তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং জাতিধর্ম-নির্ব্বিশেষে শিষ্য গ্রহণ করিতেন। তাঁহার দ্বাদশজন শিষ্যের মধ্যে একজন ক্ষৌরকার, একজন, চর্ম্মকার ও একজন মুসলমান তন্তুবায় ছিল। বিখ্যাত মুসলমান সাধক কবীর তাঁহার অন্যতম শিষ্য ছিলেন।

নামদেব

নামদেব মহারাষ্ট্রদেশে ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে জীবিত ছিলেন। নামদেব মূর্ত্তিপূজা বা ধর্মের বাহিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতেন এবং শুচিতা, ভক্তি ও আন্তরিকতা ধর্মলাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সোপান বলিয়া উপদেশ দিতেন। নামদেব নীচজাতীয় ছিলেন।

কবীর

কবীর

কবীর রামানন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য ছিলেন। তাঁহার জন্মপরিচয় সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন তিনি মুসলমান জোলার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। কবীর হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করিতেন না। ভক্তিমার্গই তাঁহার মূল কথা ছিল, হিন্দু বা মুসলমান কোন ধর্মের বাহিক আচার অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। জাতিভেদ প্রথা, মূর্ত্তিপূজা, ধর্মলাভের জন্য তীর্থযাত্রা প্রভৃতিকে তিনি নিন্দা করিতেন। মানসিক

পবিত্রতার উপর তিনি জোর দিতেন। ভগবান এক, তাঁহাকে পাইবার উপায় সকল ধর্মেই আছে, হিন্দু-মুসলমান সকলেই এক লক্ষ্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছে,—ইহাই তিনি বলিতেন। কবীরের শিষ্যগণ কবীরপন্থী নামে পরিচিত। কবীর হিন্দী ভাষায় বহু 'দোহা' রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের আধ্যাত্মিক ও সাহিত্যিক মূল্য যথেষ্ট।

নানক

শিখধর্মের প্রবর্তক নানক হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরের তালবন্দী গ্রামে নানকের জন্ম হয়। তিনি অল্প বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া ভারতের নানাস্থান পর্যটন করেন। কথিত আছে, তিনি মক্কা ও বাগদাদ পর্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। নানক উপনিষদুক্ত একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। তাঁহার মতে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান ধর্মজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ নহে। নানক তাঁহার শিষ্যগণকে মিথ্যা ভাষণ, কপটতা ও আত্মসুখ পরিহার করার উপদেশ দিতেন। নানকের ভক্ত শিষ্যগণের মধ্যে বহু মুসলমান ছিল।

নানক

চৈতন্যদেব

নানকের সমকালেই শ্রীচৈতন্যদেব বঙ্গদেশের নবদ্বীপে ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং অবশিষ্ট জীবন ধর্মপ্রচারে অতিবাহিত করেন। তিনি বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, দক্ষিণ ভারত, বৃন্দাবন পর্যটন করিয়া তাঁহার উদার ধর্মমত প্রচার করেন। তিনি প্রধানতঃ প্রেম এবং বৈরাগ্যের মহিমা কীর্তন করেন। চৈতন্যদেব জাতিভেদ বা সমাজ বন্ধন মানিতেন না এবং জাতিধর্ম-নির্বিশেষে শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিদাস নামে একজন যবন তাঁহার শিষ্য ছিল। মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে তিনি পুরীতে দেহরক্ষা করেন।

সাহিত্য ও শিল্প :—সুলতানী আমলে হিন্দু মুসলমানের মিলনের ক্ষেত্র কেবলমাত্র ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেও উভয়ের ভাবধারা মিলিত হইয়াছিল। এই সময়ে আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল।

বিভিন্ন ধর্মাচার্যাগণ তাঁহাদের কথা সাধারণবোধ্য করার জন্য জনসাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য ভাষাতেই তাঁহাদের গ্রন্থ রচনা করিতেন। ইহার ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

রামানন্দ ও কবীর হিন্দীভাষায় ধর্মপ্রচার করিয়া হিন্দী ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। কবীরের দোহাবলী শব্দপ্রাচুর্যে ও ভাবসম্পদে হিন্দী ভাষাকে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছে। নামদেব ও একনাথ মারাঠা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। মীরাবাঈ ও অপরাপর রাধা কৃষ্ণ উপাসকগণ ব্রজভাষার আশ্রয়ে তাঁহাদের বাণী প্রচার করিয়া ব্রজভাষাকে উন্নত করিয়াছেন। নানক ও তাঁহার শিষ্যবর্গ গুরুমুখী লিপি ও পাঞ্জাবী ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। বৈষ্ণব লেখকগণের সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় বাংলাভাষায় নব-জীবন সঞ্চারিত হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ঠাকুরের গীতিকাব্যসমূহ বাংলা দেশের গণমানসকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। চৈতন্যদেবের পরে তাঁহার অনুগামীবৃন্দ চৈতন্য-দেবের জীবনী ও বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য বাংলা ভাষাকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। বাংলায় রচিত মৌলিক গ্রন্থ ব্যতীত সংস্কৃত হইতে বহু গ্রন্থ অনূদিত হইয়া বাংলাভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। এ সম্বন্ধে তৎকালীন হিন্দু নরপতি ও মুসলমান সুলতানদের আনুকূল্য বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। বাংলার সুলতান হুসেন শাহ ও নসরৎ শাহের নাম এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

হিন্দী
মারাঠী
পাঞ্জাবী
বাংলা

ফার্সী ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন গিয়াসউদ্দিনের আনুকূল্য পুষ্ট আমির খস্রু। এই সময়ে ফার্সীভাষার বহু ইতিহাসগ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। ফার্সী ভাষার ঐতিহাসিকদের মধ্যে মিনহাজউদ্দিন, জিয়াউদ্দিন বারুণী, সাম্‌স্‌-ই সিরাজ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ফার্সী ভাষা

কাশ্মীরের সুলতান জৈনুল আবিদিনের পৃষ্ঠপোষকতায় কাশ্মীরের আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল।

কাশ্মীরের আঞ্চলিক ভাষা

তুর্ক-আফঘান যুগে ভারতীয় স্থাপত্যশিল্প ধর্ম ও সাহিত্যের ন্যায় দুই সভ্যতার সমন্বয়ের ফল। মুসলমানগণ প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণের জন্য ভারতীয় স্থাপতি ও শিল্পী নিযুক্ত করিতেন এবং মসজিদ নির্মাণে বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরের উপাদান ব্যবহার করিতেন অথবা কখনও হিন্দু মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করিতেন। এই সকল ব্যবস্থার

স্থাপত্যশিল্পে হিন্দু ও মুসলমান রীতির সমন্বয়

ফলে স্থাপত্য রীতিতে স্বভাবতই হিন্দু স্থাপত্য রীতির প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছিল।
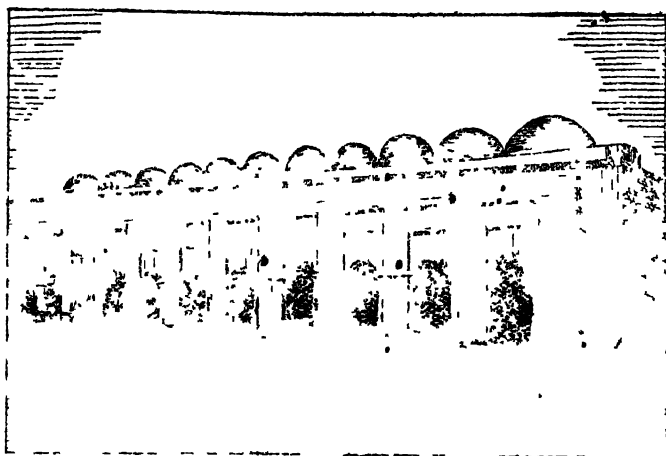
বড় সোনা মসজিদ (গৌড়)

বহিরাগত মুসলমানী রীতির সঙ্গে প্রচলিত হিন্দু স্থাপত্য রীতি মিশ্রিত হইয়া এক নূতন

কদম রসুল মসজিদ (গৌড়)
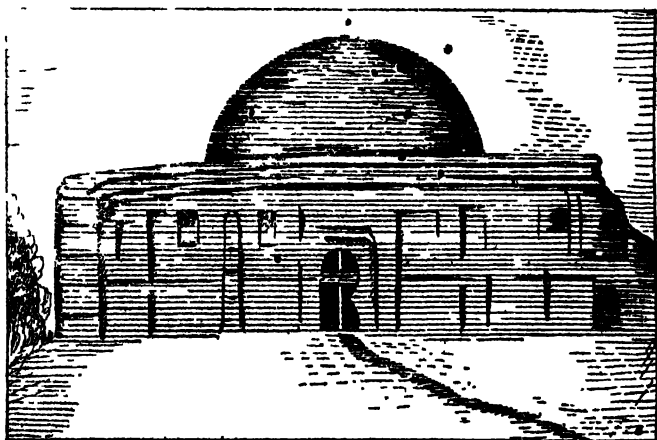
ভারতীয় রীতির উদ্ভব হইয়াছিল। দিল্লীর সুলতানী আমলে নির্মিত সৌধাবলীর মধ্যে

নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগা সংলগ্ন জমায়েত-খানা মসজিদ এবং কুতুব মিনারের আলাই দরওয়াজা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দিল্লী ব্যতীত জৌনপুর, গুজরাট, বাংলাদেশ প্রভৃতি অঞ্চলেও ভারতীয় রীতি সমন্বিত স্থাপত্য কর্মের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। জৌনপুরী স্থাপত্য রীতিতে এই বৈশিষ্ট্য সমাধিক দৃষ্ট হয়। অতালা-দেবী-মসজিদ জৌনপুরী রীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বঙ্গদেশের পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, বড়সোনা ও কদম রসুল বঙ্গদেশের নিজস্ব রীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গুজরাটী স্থাপত্য রীতিতেও এক নূতন ধারার ছাপ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন রীতি

মালবের রাজধানী ধারএ কিংবা কাশ্মীরে যে সকল মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল তাহাদের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই স্থানীয় রীতি ও মুসলমানী বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা: দিল্লী সুলতানী যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিবরণ সংবাদ জিয়াউদ্দিন বারণি, মিনহাজউদ্দিন, আমির খস্রু প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের রচনা হইতে এবং ইবন বতুতা, নিকোলাই কন্টি, নিকিতিন, পায়েজ, নুনিজ প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ হইতে জানা যায়।

জনসাধারণের অবস্থা

সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে ছিলেন আমীর ওমরাহগণ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলিলে বুঝাইত সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও ব্যবসায়ী বণিকগণ। আর সমাজের সর্বনিম্নস্তরে থাকিত কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়। যাবতীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা ভোগ করিত। ইহাদের অবস্থা ভাল থাকিলেও জনসাধারণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। দেশের জনসাধারণের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। তাহাদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। তাহাদিগকে জিজিয়া কর দিতে হইত এবং তাহাদের রাজস্বের পরিমাণও বেশী ছিল। সমাজে স্ত্রীলোকের অধিকার খুবই সঙ্কুচিত হইয়াছিল। পর্দা বা অবরোধ প্রথাও প্রচলিত হইয়াছিল। হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথারও প্রচলন ছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর মধ্যে নানাবিধ কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল।

এই যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রাচীন কাহিনী এবং সমসাময়িক লেখক, পর্যটক প্রভৃতির বিবরণ হইতে যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির জন্য ভারতবর্ষ এই সময়ে বিশ্ববিখ্যাত ছিল। সুলতান মামুদ বহুবার লুণ্ঠন করিয়া ভারতবর্ষ হইতে অপরিমিত ধনরত্ন লইয়া যান। তৈমুরলঙও লুণ্ঠন করিয়া অগণিত ধনসম্পদ স্বদেশে লইয়া যান। মোট কথা অর্থের অভাব ভারতবর্ষের কোন দিনই ছিল না, কিন্তু তুর্ক-আফঘান সুলতানগণ ব্যাপকভাবে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি বা সম্পদকে

সমাজের বিভিন্ন স্তরে সমভাবে বণ্টনের জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। খলজি ও তুঘলক-বংশীয় সুলতানগণ প্রকৃত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পরীক্ষামূলকভাবে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন।

দেশের সম্পদবৃদ্ধির জন্য সরকারী আগ্রহ না থাকিলেও শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতির জন্য দেশবাসীর আগ্রহের অভাব ছিল না। অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য উভয় ব্যাপারেই ভারতবাসী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। বিভিন্ন শিল্পদ্রব্যের জন্যও ভারতবর্ষ খ্যাত ছিল। বঙ্গদেশ ও গুজরাট তুলাজাত দ্রব্যের জন্য বিশেষ খ্যাত ছিল। স্থলপথে মধ্য এশিয়া, আফঘানিস্থান, পারস্য, তিব্বত ও ভুটানের সহিত এবং জলপথে মালয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন ও ইউরোপের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্য চলিত। গুজরাট ও বঙ্গদেশের বন্দর সমূহ রপ্তানী বাণিজ্যের জন্য প্রধানতঃ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

ব্যবসায়-বাণিজ্য

দেশের খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য বস্তু অত্যন্ত সুলভমূল্যে বিক্রীত হইত। এই অবস্থায় দেশবাসী সাধারণ সময়ে মোটা ভাত কাপড়ের কোন অভাব অনুভব করিত না। কিন্তু অনাবৃষ্টি অথবা শস্যের অপ্রাচুর্যের ফলে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিত, তখন লোকের দুরবস্থা চরমে উঠিত। অনাহারে বহুলোককে প্রাণত্যাগ করিতে হইত। দেশের ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে দুস্তর আর্থিক ব্যবধানে থাকিলেও প্রত্যেক গ্রাম উৎপন্ন দ্রব্যের দিক দিয়া আত্মনির্ভরশীল ছিল এবং বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত দেশবাসীকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইত না।

প্রশ্নোত্তর

1. What was the influence of Islam upon the religion, literature and art of India?

ভারতবর্ষের ধর্মে, সাহিত্যে ও শিল্পে ইসলামের প্রভাব বর্ণনা কর।

উত্তর-সূত্র: (১) ভূমিকা :—ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল হইতে পারসিক, গ্রীক, হুন, শক, গুর্জর প্রভৃতি বিদেশী জাতির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। এই সকল বিদেশী জাতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছে এবং ইহারা হিন্দুর ভাষা, ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি গ্রহণ করিয়া বিশাল হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হইয়াছে। কিন্তু তুর্ক-আফঘান-বংশীয় মুসলমানগণ পৃথক ধর্ম ও সামাজিক আচারব্যবহার লইয়া ভারতবর্ষে আগমন করে। ইসলামের বিধিব্যবস্থা ও সামাজিক রীতিনীতি হিন্দুধর্ম হইতে এত স্বতন্ত্র ছিল যে ইহার পৃথক সত্তা বিলুপ্ত করিয়া ইহাকে হিন্দুধর্ম ও সমাজবিধির অঙ্গীভূত করার

কোন উপায় ছিল না। ইসলাম বিজয়ের প্রথম দিকে বিজেতা বিজিত উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ ও বিদ্বেষ প্রবল ছিল। কিন্তু কালক্রমে উভয় ধর্মের অধিবাসীবৃন্দ পরস্পরের ধর্মমত, সাহিত্য, শিল্পরীতি, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে পারস্পরিক গ্রহিষ্ণুমনোভাবাপন্ন হইয়া পড়িল এবং এই সকল ব্যাপারে পূর্বতন ব্যবধানও বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইল।

(২) হিন্দুধর্মের উপর ইসলামের প্রভাব : (ক) মুসলমান ধর্মের সংস্পর্শে আসার ফলে হিন্দুধর্মের মধ্যে আত্মরক্ষার জন্য কঠোর বিধিনিষেধ প্রবর্তিত হইতে লাগিল। মাধবাচার্য, পরাশর, কুল্লুক ভট্ট, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত যুগোপযোগী সংশোধিত হিন্দু-সমাজবিধি রচনা করিলেন। ইহার পরিণাম 'ক্ষতিকর হইয়াছিল। (খ) হিন্দু সমাজে একদিকে রক্ষণশীলতা প্রকাশ পাইলেও অপরদিকে উদারমতাবলম্বী ধর্মাচার্য্যগণ সর্বধর্মসমন্বয়বাদ, প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে ধর্মের ক্ষেত্রে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিল। এই সকল ধর্মাচার্যের মধ্যে রামানন্দ, বল্লভাচার্য, চৈতন্যদেব, একনাথ, নামদেব, কবীর নানক প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৩) সাহিত্যে ও শিল্পে ইসলামের প্রভাব : সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেও উভয় ধর্মের সংস্রবের ফলে প্রাদেশিক ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ইসলামের সম্প্রসারণের হস্ত হইতে হিন্দু ধর্মকে রক্ষার জন্য ধর্মাচার্যগণ জনসাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় তাঁহাদের উপদেশমূলক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ভারতের বিভিন্ন ভাষা ও প্রাদেশিক সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। এই যুগের স্থাপত্য-রীতিও ভারতীয়-মুসলমানী রীতির সম্মিলনে উদ্ভূত হইয়াছিল। এই সংমিশ্রিত রীতির বৈশিষ্ট্য জৌনপুরী, বিজাপুরী, গুজরাটি প্রভৃতি স্থাপত্য রীতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

2. Give an account of the social and economic condition in India under the Delhi Sultanate.

দিল্লী-সুলতানির আমলে ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর।

উত্তর-সূত্র : (২৯০ পৃষ্ঠা)।

3. What were the contributions of the religious preachers towards the growth of unity in different religions.

বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে একত্ববোধের জন্য ধর্মাচার্যগণের দান কি ?

উত্তর-সূত্র : (১) ধর্মাচার্যগণের অভ্যুদয়ের কারণ (২) তাহাদের দান (ক) ধর্মীয় মতবাদের পার্থক্য ধর্মাচরণে অন্তরায় হইতে পারে না (খ) সর্বধর্মসমন্বয়বাদ—ভক্তিবাদ ও সুফীবাদ (গ) উদারতা ও সাম্যনীতির সমর্থক (ঘ) সামাজিক, সাহিত্যিক ও শিল্পস্থাপত্য ক্ষেত্রে ইহার সুফল।

4. Write notes on : (a) Sri Chaitanya (b) Namdev (c) Kabir (d) Ramananda (e) Sufism.

টীকা লিখ : (ক) শ্রীচৈতন্য (খ) নামদেব (গ) কবীর (ঘ) রামানন্দ (ঙ) সুফীবাদ।

অষ্টাদশ অধ্যায়

আধুনিক যুগ-লক্ষণ ও মুঘল অধিকারের স্বরূপ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধকে নব-জাগরণের যুগ বলা যাইতে পারে। ইউরোপের ন্যায় ভারতের ইতিহাসেও ষোড়শ শতাব্দী কালান্তরের নির্দেশক। এই সময়ে ভারতের ইতিহাস মধ্যযুগীয় তমিস্রা অতিক্রম করিয়া বর্তমান যুগের প্রারম্ভ সীমায় পদার্পণ করিল। ইউরোপের ইতিহাসের অনুরূপ আধা-সামরিক আধা-ধর্মীয় তুর্ক-আফঘান সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেল এবং অতঃপর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদেশী বন্ধনপাশমুক্ত জাতীয়তার ভিত্তির উপর নব নব রাষ্ট্রের সূচনা হইল। বিজয়নগর, বাহমনী, বঙ্গদেশ, মেবার, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্বাধীন রাষ্ট্র স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। কেবলমাত্র রাষ্ট্রক্ষেত্রে নহে ধর্মে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে সর্বত্র এই যুগ-চেতনার আভাস দৃষ্ট হইতে লাগিল। ওয়াইক্লিফ, লুথার, ক্যালভিন, জিঙ্গলী যেমন 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য' ও পোপের আধিপত্য অস্বীকার করিয়া ইউরোপের জীবনে জাতীয়তা ও সংস্কৃত-ধর্মনীতির স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন সেইরূপ মাধব, সায়ণাচার্য্য, নানক, চৈতন্য, তুকারাম, রামদাস, কবীর, একনাথ প্রভৃতি ধর্মাচার্যগণ ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম ও সমাজব্যবস্থায় যুগোপযোগী পরিবর্তন আনয়ন করিয়া সর্বগ্রাসী ইসলামের অগ্রগতিকে প্রতিহত করিয়াছিলেন। এই পরিবর্তনের ধারাস্রোতে অবগাহন করার ফলেই মারাঠা ও শিখ জাতীয়তাবাদের জন্ম হয় ও এই দুই জাতি ভারতের ইতিহাসে নব-অধ্যায়ের যোজনা করে।

পঞ্চদশ, ষোড়শ শতাব্দীতে মধ্যযুগ হইতে আধুনিক যুগে ভারতবর্ষের উন্নীত হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। প্রথমতঃ, দীর্ঘকাল ভারতের মৃত্তিকা সংস্পৃষ্ট হওয়ার জন্য ইসলাম ধর্মের মধ্যে একটু পরিবর্তনের সঞ্চার হয়। ইসলামের প্রথম যুগের উগ্র ও জঙ্গী মতবাদের পরিবর্তে ইহার মধ্যে কিঞ্চিৎ কোমলতা স্বতই আসিয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন হিন্দু ধর্মাচার্যগণ ইসলামের মূলনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া একেশ্বরবাদ, মানবের ভ্রাতৃত্ব, জাতিভেদ-বিরোধিতা, জন্মকৌলিন্য অপেক্ষা কর্মস্বত্বের শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি তত্ত্ব নূতন নূতন ধর্মমতের মাধ্যমে প্রচার করিতেছিলেন। ইহার

অনিবার্য্য ফলস্বরূপ অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মসঙ্কীর্ণতার স্থলে নূতন ও বলিষ্ঠ ধ্যানধারণা হিন্দু-সমাজে আদৃত হইতে লাগিল। হিন্দু ধর্মমত ও ইসলামের মধ্যপন্থী সরল ও সহজ ধর্মীয় মতবাদ সমূহ প্রচারিত হওয়াতে উভয় ধর্মের ব্যবধান ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইতে লাগিল। ইহার প্রভাব কেবলমাত্র ধর্মক্ষেত্রে নহে সামাজিক রীতি নীতি ও সাহিত্যের উদার ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হইল; উভয় ধর্মের মধ্যে সহনশীলতা আসিয়া পড়িল; হিন্দুগণ মুসলমান পীর বা মহাপুরুষকে স্বীকার করিল, মুসলমানগণও হিন্দুর সামাজিক আচার-ব্যবহারকে নিজস্ব করিয়া লইল। দীর্ঘকাল একত্র বাসের ফলে দুই সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি জন্মিয়াছিল এবং তাহারা উপলব্ধি করিয়াছিল যে পরস্পরের স্বার্থ অভিন্ন।

এই সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্য যে ভাবে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল, তাহাও আধুনিক যুগ-চেতনার ফলস্বরূপ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিভিন্ন ধর্মাচার্য্যগণ ও তাহাদের পরিচরবৃন্দ ধর্মমত প্রচারের জন্য সংস্কৃতের পরিবর্তে সাধারণ-বোধ্য 'ভাষা' ব্যবহার করিতেন এবং সেই 'ভাষা'তেই তাদের ধর্মগ্রন্থ সমূহ রচিত হইয়াছিল। রামানন্দ ও কবীর হিন্দী সাহিত্যের, একনাথ মারাঠীর, গুরু নানক ও তাঁহার শিষ্যবর্গ পাঞ্জাবী ভাষা ও গুরুমুখী লিপির এবং চৈতন্যদেব ও তাঁহার শিষ্যপরিচরবৃন্দ বাংলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সকল আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্য রচনার পশ্চাতে তুর্ক-আফঘান নরপতিদেরও প্রশ্রয়ানুকূল্য ছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর ভৌগোলিক আবিষ্কারের পরে ইউরোপীয় জাতি পর্টুগীজগণ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিল। পর্টুগীজদের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগপ্রাপ্ত হওয়াতে ভারতের মধ্যযুগীয় সঙ্কীর্ণতা (আলবেরুণী যাহার কঠোর নিন্দা করিয়াছিলেন) ঘুচিল এবং বিরাট বিশ্বের সম্মুখীন হইয়া ভারত আধুনিক যুগের আলোক প্রত্যক্ষ করিল। সুদীর্ঘকাল ভারতসমুদ্রে আরবদের আধিপত্য ছিল। আরব বণিকদের মাধ্যমে ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্পর্ক চলিয়াছিল, কিন্তু তুর্ক-আফঘান রাজত্বে ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য আরবদের হস্তচ্যুত হইয়া যায়। দক্ষিণের স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্রসমূহের ক্রমবিলুপ্তির পরে ভারতের বহির্বাণিজ্য একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। তুর্ক-আফঘান সুলতানগণ এই বিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিলেন বলিয়া বাণিজ্যাদি মারফৎ বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে সংযোগটুকু ছিল, তাহা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। কিন্তু পর্টুগীজদের মাধ্যমে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটিল। পর্টুগীজগণ সাম্রাজ্য-লিপ্সু ছিল এবং তদানীন্তন গোলযোগের সুযোগে ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টাও করিয়াছিল। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্য দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইউরোপীয় কোন জাতির

সঙ্গে ভারতের ভাগ্য একসূত্রে গ্রথিত হওয়ার পরিকল্পনা আপাততঃ দুই শতাব্দীর জন্য বিলম্বিত হইয়া রহিল।

ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রেও আধুনিক যুগের সূচনা দেখা যায়। দিল্লীর তুর্ক-আফঘান রাজত্বের প্রায়াবসানকালে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি করিয়া বহু রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় শক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন রাজ্যসমূহের সৃষ্টি করে। বিজয়নগর, মেবার, উড়িষ্যা প্রভৃতি হিন্দুরাজ্য এবং গুজরাট, বাহমনীরাজ্যের বিভিন্ন শাখা প্রভৃতি মুসলিমরাজ্য কেন্দ্রীয় শাসন অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করে। কেন্দ্রশক্তির বিরুদ্ধে আত্মনিয়ন্ত্রণের উক্ত প্রচেষ্টাকেও আধুনিক জাতীয়তাবাদের জনক বলা যায়। তুর্ক-আফঘান শক্তির পতনোন্মুখ অবস্থা ও মুঘল-অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্তর্বর্তী অর্দ্ধশতাব্দী-কাল ছিল ভারতের রেনেসাঁ বা নবজাগরণের যুগ। এই সুযোগে ভারতবর্ষের অভ্যন্তর হইতে উত্থিত কোন হিন্দু বা মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতবর্ষ এই নব-জাগরণের ফল ভোগ করিতে পারিত। কিন্তু দূরদর্শী বা সংগঠনী প্রতিভাবিশিষ্ট কোন নায়কের অভাবেই ইহা সম্ভবপর হইল না। ভারতের বাহির হইতে ভাগ্যসন্ধানী মুঘলরা আসিয়া দিল্লীর পরিত্যক্তপ্রায় রাজতক্ত অধিকার করিল। এক ধর্মাবলম্বী হইলেও তুর্ক-আফঘানগণ নবাগত শক্তিকে সহজে স্বীকার করে নাই। তাহাদিগকে পদানত করিতে মুঘলদের দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল।

ভারতের মুঘল অধিকারকে 'ইসলাম' ও পৃথিবীর ইতিহাসের এক নূতন ঘটনা বলা যাইতে পারে। সমকালে ইসলামের প্রভাব ও প্রতাপ অন্যত্রও বিস্তৃত হইয়াছিল। সুলেইমান দি ম্যাগনিফিসেণ্ট কনষ্টাণ্টিনোপল অধিকার করিয়া পূর্ব-ইউরোপে তুর্কী-সাম্রাজ্য এবং ইস্‌মাইল সাফাভি পারস্যে সাফাভিবংশের পত্তন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে মুঘলশক্তির আবির্ভাব ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করে। পূর্ববর্তী বিজেতা, বিধর্মী ও বিদেশী জাতির উচ্চমন্যতা ও ধর্মান্ধতার উত্তাপ যখন কালের প্রকোপে শীতল হইয়া আসিতেছিল এবং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমস্বার্থ ও সৌহার্দ্দ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছিল সেই সময়ে পুনরায় মুঘল আধিপত্যের ফলে ইসলামের কর্মকৃতি নূতন জীবনীশক্তি লাভ করিল। এই ঘটনা ভারতের আধুনিকতাকে দুই শতাব্দীর জন্য বিলম্বিত করিল। মুঘল বিজয় ভারতের ইতিহাসের সংগঠনে কোন সৃজনী উপাদান যোগায় নাই বরঞ্চ ইহার অগ্রগতিকে সাময়িকভাবে নিরস্ত করিয়াছে। মহামতি আকবরের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত আধুনিকতার বিকাশধারা অব্যাহত ছিল, কিন্তু আকবরের তিরোধানের পরে মধ্যযুগীয় অন্ধকারের সকল লক্ষণই পুনরায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ধর্মীয় উদারতাই ছিল আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। আকবরের পরবর্তী

সময়ে ধর্মের সঙ্কীর্ণতা, পরধর্মদ্বেষিতা, ধর্মান্তরিতকরণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। সাম্রাজ্যসংহতির জন্য আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যকামিতা নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। উত্তর-মুঘলদের শাসনকালে ইহার প্রতিক্রিয়াসঞ্জাত বিরোধী শক্তিসমূহ মুঘলশক্তিকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছিল।

পরের ইতিহাসটুকু সংক্ষিপ্ত, তুর্ক-আফঘান শক্তির অধঃপতনের পরবর্তী অবস্থার পুনরাভিনয় মাত্র। মারাঠা জাতীয়তাবাদ শিবাজীর দ্বারা উদ্বোধিত হইয়া পেশোয়াদের সময়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং মুঘলোত্তর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মারাঠারা ভারতের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপোষক কার্যক্রম অনুসরণ না করাতে সাম্রাজ্যবিস্তার ও লুণ্ঠনবৃত্তি অনুসরণ করাতে স্থানীয় হিন্দু-শক্তিবর্গের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিল। রাজপুতগণ বিবদমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত হইয়া অতীত শৌর্যবীর্যের ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়াছিল. নবজাগ্রত শিখগণ তখনও এত গুরুদায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত হয় নাই। ইত্যবসরে—

"নিঃশব্দ চরণ—
আনিল বণিকলক্ষ্মী সুরঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন।
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে,
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী,
রাজদণ্ডরূপে।"

ঊনবিংশ অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্যের সূত্রপাত : মুঘল-আফগান দ্বন্দ্ব

Syllabus :—The Mughals—their early history. Occasion of their invasion of India. Panipat (1556). War with Rajputs, Khanua (1527). Babur's character, His memoirs. Humayun's failure to consolidate military occupation. Sher Shaha—his revenue and administrative measures. Restoration of the Mughals.

পাঠ্যসূচী :—মুঘলগণ—তাহাদের পূর্ব ইতিহাস। মুঘলদের ভারত অভিযানের উপলক্ষ্য-বৃত্তান্ত (১৫২৬)। রাজপুতদের সহিত খানুয়ার যুদ্ধ (১৫২৭)। বাবরের চরিত্র। তাঁহার আত্মজীবনী। বিজিত রাজ্য সংগঠনে হুমায়ুনের অক্ষমতা। শেরশাহ—তাঁহার রাজস্ব ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা। মুঘলগণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

মুঘল জাতির পরিচয় :—মোঙ্গল জাতির আদি বাসস্থান ছিল মধ্য এশিয়ার মঙ্গোলিয়ায়। এ মোঙ্গল শব্দ হইতেই 'মুঘল' বা মোগল শব্দ আসিয়াছে। মোঙ্গলরা প্রধানতঃ পশুজীবি ও মৃগয়াজীবি ছিল এবং ইহারা অসংখ্য উপজাতিতে বিভক্ত ছিল।

মুঘল ও মঙ্গোল

একটি উপজাতির নেতা ইয়েসুকাই অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন।' তাঁহার পুত্র তেমুচিন বীরত্ব, বুদ্ধি ও সংগঠন প্রতিভার বলে প্রতিবেশী তাতার জাতিকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং বিভিন্ন মোঙ্গল উপজাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া স্বয়ং তাহাদের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করেন। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মোঙ্গল জাতির সর্বোচ্চ নায়ক বা 'খাঁ' উপাধিতে ভূষিত হন। অতঃপর তেমুচিনের নূতন নাম হয় চেঙ্গিস খাঁ। চেঙ্গিস শব্দের অর্থ অত্যন্ত পরাক্রমশালী। চেঙ্গিস খাঁ-র নেতৃত্বে মোঙ্গলগণ অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। উত্তরে সাইবেরিয়া হইতে দক্ষিণে জর্জিয়া এবং পূর্বে চীন হইতে পশ্চিমে রাশিয়া পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল

চেঙ্গিস খাঁ

চেঙ্গিস খাঁ-র অধিকারভুক্ত হয়। চেঙ্গিস খাঁ খিবা-র অধিপতির পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে ভারতের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হন। বুদ্ধিমান ইলতুৎমিস খিবা-র অধিপতিকে

আশ্রয়দানে অস্বীকার করিয়া তাঁহার রাজ্যকে সঙ্কটজনক পরিস্থিতি হইতে উদ্ধার করেন। চেঙ্গিস খাঁ-র মৃত্যুর পরেও দিল্লীর সুলতানদের আমলে বিভিন্ন সময়ে মোঙ্গলগণ বারংবার ভারতবর্ষে হানা দেয়। দিল্লীর সুলতানগণ তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া সাম্রাজ্য রক্ষা করে।

চেঙ্গিসের মৃত্যুর পরে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য কতকগুলি 'উলুস' বা ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র চাঘতাই-র বংশধরেরা মধ্য-এশিয়ায় রাজত্ব করিতে থাকে এবং এই অঞ্চল 'চাঘতাই উলুস' নামে পরিচিত হইতে থাকে। কালক্রমে চাঘতাই-উলুসও দুইভাগে বিভক্ত হয়—পশ্চিম ভাগে তাতার জাতির সংখ্যাধিক্য থাকায় তাতারদের সহিত মোঙ্গলদের সংমিশ্রণ ঘটে। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তৈমুরলঙ্গ নামে একজন মোঙ্গল-তাতার অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠেন। মধ্য এশিয়া হইতে পারস্য পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁহার পদানত হয়। তুঘলক বংশের শেষ সুলতান মামুদ শাহের রাজত্ব কালে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দিল্লী বিধ্বস্ত করেন (১৩৯৮ খৃঃ) এবং উত্তর পশ্চিম ভারত তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। লোদী বংশের সুলতান খিজির খাঁ তৈমুরলঙ্গের প্রতিনিধিরূপে দিল্লী শাসন করিতেন। তৈমুরলঙ্গ ভারতে মোঙ্গল শাসনের সূচনা করিয়াছিলেন ইহা বলা চলে। তবে ইহা স্থায়ী হয় নাই। তৈমুরলঙ্গের বংশধর বাবর প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

চাঘতাই-মোঙ্গল

তৈমুরলঙ্গ

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম পাণিপথের যুদ্ধে বাবরের জয়লাভে মুঘল অধিকারের সূত্রপাত হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধে আকবরের বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত মুঘলদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত অবস্থায় ছিল। ১৫২৬ হইতে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল-আফঘানশক্তির সংঘর্ষের যুগ বলা যাইতে পারে। ইহার পর্ব তিনটি—প্রথম পর্ব ১৫২৬—৩০ খৃষ্টাব্দ। এই সময়ে বাবরকে আফঘানশক্তি ও রাণা সঙ্গের অধীন রাজপুতশক্তি দমনে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। দ্বিতীয় পর্ব ১৫৩০—১৫৪০ খৃষ্টাব্দ। এই সময়ে মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া হুমায়ুন মালব, গুজরাট ও বঙ্গদেশের সহিত পরাজিত হইয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন। শেরশাহের নেতৃত্বে আফঘানশক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়। শেরশাহ অনধিকারী ছিলেন না, মুঘল-বংশের হস্ত হইতে বিনষ্টপ্রায় তুর্ক-আফঘান সাম্রাজ্য কাড়িয়া লইয়া তিনি উহাকে সাময়িকভাবে সঞ্জীবিত করেন। শেরশাহের স্বল্পপরমায়ু শাসনকালে আধুনিক যুগের সকল লক্ষণই দৃষ্ট হয়। শাসনকর্তৃত্বের দিক দিয়া স্বৈরাচারী হইলেও সেই একশাসনের পশ্চাতে প্রজাহিতৈষণা বর্তমান ছিল। ইউরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর সদাশয়

স্বৈরাচারীদের সঙ্গে শেরশাহ সমমর্য্যাদা দাবি করিতে পারেন। রাজস্ব ব্যবস্থা, মুদ্রানীতি, যাতায়াতের সুব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সর্বোপরি ধর্ম সম্বন্ধে অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিয়া শেরশাহ আধুনিক যুগের পরিচয় দেন। উত্তরকালে মহামতি আকবর শেরশাহ প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া যশস্বী হইতে পারিয়াছিলেন। তৃতীয় পর্বে ১৫৪৫—'৫৬ খৃষ্টাব্দে শেরশাহের মৃত্যুর পরে হুমায়ুন কর্তৃক দিল্লীর সিংহাসন পুনরধিকৃত হয় এবং আকবর দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধের পর মুঘল অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

শেরশাহ

আকবর জাহাঙ্গীর-শাহজাহান-ঔরংজীবের শাসনকালের সুদীর্ঘ দেড়শত বৎসর (১৫৫৬--১৭০৭) ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় বলিয়া পরিগণিত হয়। হিন্দুকুশ হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত এই বিরাট উপমহাদেশ ক্রমশঃ মুঘল শাসনের ছায়াতলে আসে। মুঘলশক্তির দুর্দ্দণ্ড প্রতাপের নিকট ভারতের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল নরপতিকেই অবনত হইতে হয়। ফতেপুর সিক্রী, আগ্রা ও দিল্লী এই তিন নগরী রাজধানীর মর্য্যাদায় ভূষিত হইতে থাকে—এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে জ্ঞানী-গুণী, বাণিজ্যজীবি ও ভাগ্যান্বেষী এই সকল স্থানে আসিয়া গ্রেট মুঘলদের দরবারকে এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণকেন্দ্রে পরিণত করে। বিদেশী পর্য্যটকগণ মুঘলদের ঐশ্বর্য্য, প্রতাপ ও আভিজাত্য, হারেমের অগণিত লাস্যময়ী অন্তঃপুরিকাদের বিচিত্র কাহিনী, সম্রাট ও অভিজাতশ্রেণীর অকুণ্ঠ বিলাস ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, অগণিত অর্থব্যয়ে নির্মিত মর্মর-খচিত স্বপ্ন-সৌধ প্রভৃতি দর্শনে বিস্ময়াভিভূত হইয়া মুঘল রাজত্বের ও সম্রাটগণের প্রশস্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু এই আড়ম্বর-বর্তিকার 'পিলসুজ' যাহারা সেই জনসাধারণের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ ছিল না। রাজধানীতে অর্থের প্রাচুর্য্য থাকিলেও দেশে বহুবার অন্নের অভাব হইয়াছে, বারংবার দুর্ভিক্ষ আসিয়া মুঘল রাজত্বের ঐশ্বর্য্য সমারোহের দীপ্তিকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। সুশাসক আকবরের রাজত্বে পর্য্যন্ত তিনবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় বদায়ুণী লিখিয়া গিয়াছেন এই সময়ে লোকে ক্ষুধার তাড়নায় নরমাংস পর্য্যন্ত ভক্ষণ

করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও ঔরংজেবের রাজত্বকালেও দেশ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। সাম্রাজ্যবিস্তার, পরিপূর্ণ রাজকোষের ব্যবস্থা ও ইসলামের প্রসার প্রধানতঃ এই তিনটি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করিয়াই মুঘল শাসন-চক্র আবর্তিত হইয়াছে। বিদ্যোৎসাহিতা বা বিস্ময়োৎপাদনকারী সৌধনির্মাণ কার্য্যের দ্বারা সম্রাটদের মধ্যে কেহ কেহ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন। আকবর ব্যতীত কেহই নূতন যুগের উপযোগী শাসনপদ্ধতি অবলম্বনের চেষ্টা করেন নাই। ধর্ম সম্বন্ধেও আকবরের উদার নীতির পশ্চাতে মূলতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই ছিল। ব্যাপকভাবে সাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা বা অন্য কোন মঙ্গলজনক কার্য্যের প্রচেষ্টা কোন সম্রাটই করেন নাই। পরধর্ম সম্বন্ধে অসহিষ্ণু আচরণের পরিচয় আকবর ব্যতীত পরবর্তী মুঘল সম্রাটগণ সকলেই দিয়াছেন। ঔরংজেবের সময়ে তাহা চরমে উঠে এবং প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাকে ইহার প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হইতে হয়। সাম্রাজ্যের অঙ্গে ক্লান্তির আভাস শাহজাহানের রাজত্বকালেই দৃষ্ট হয়। ঔরংজেবের সময়ে তাহা স্পষ্ট ও পরিস্ফুট হয়। ঔরংজেবের হিন্দুবিদ্বেষী আচরণের ফলেই শিখ ও মারাঠা জাতীয়তাবাদ উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ইহাদের সঙ্গে রাজপুতগণ যুক্ত হইয়া সম্মিলিত বিরোধিতায় মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলকে কম্পিত করিয়া দেয়। এই আঘাতকে প্রতিরোধ করার মত মুঘল সাম্রাজ্যের কোন মৌলিক শক্তি ছিল না বলিয়াই ঔরংজেবের মৃত্যুর অত্যল্পকাল পরেই মুঘল সাম্রাজ্য খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। পরবর্তী কালে—

> "তারপরে শূন্য হল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে
> দিল্লী রাজশালা,
> একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিশিতে
> দীপালোকমালা।
> শবলুব্ধ গৃধ্রদের ঊর্দ্ধস্বর বীভৎস চীৎকারে
> মোগল মহিমা,
> রচিল শ্মশান-শয্যা,—মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে
> হল তার সীমা।"

বাবর ও মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা :—ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের পুরা নাম ছিল জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর। তাঁহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়ই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। পিতৃকুলের দিক দিয়া বাবর বিখ্যাত তৈমুরের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ—পিতার নাম ছিল ওমর শেখ মির্জ্জা। তাঁহার মাতামহ ছিলেন চেঙ্গিস খাঁর বংশধর এবং চেঙ্গিস খাঁর অধস্তন

বংশ পরিচয়

ত্রয়োদশ পুরুষ। পিতা ও মাতা উভয় দিক হইতে যথাক্রমে তৈমুর ও চেঙ্গিসের বংশধর হওয়ায় বাবর মোঙ্গল বা মুঘল বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং ভারতে বাবরের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ মুঘল বংশ নামে পরিচিত হইয়াছে।

বাবর

বাবরের পিতা ওমর সেখ মির্জা মধ্য এশিয়ার ফরঘানা নামক রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। ১৪৮৩ খৃঃ-এ বাবর জন্মগ্রহণ করেন। ১৪৯৪ খৃঃ-এ একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বাবরের পিতার মৃত্যু হইলে তিনি সিংহাসনের অধিকারী হন। বাল্যকালেই তাঁহার উত্তমরূপে শিক্ষা লাভ হইয়াছিল—তিনি তুর্কী ও পারস্য ভাষায় পারদর্শী হন এবং এই দুই ভাষায় বলিবার ও লিখিবার শক্তি অর্জন করেন। তৈমুরের রাজধানী সমরখন্দের অধিকার লইয়া তৈমুরের বংশধরগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে বাবর মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সেই সমরখন্দ অধিকার করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পৈত্রিক রাজ্য ফরঘানা তাঁহার আত্মীয়দের দ্বারা অধিকৃত হয় এবং বাবর অশেষ বীরত্বের সহিত পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। কিন্তু বাবর সমরখন্দ পরিত্যাগ করিয়া ফরঘানা পুনরধিকার করিতে গেলে উজবেক সর্দার সাইবানি খাঁ সমরখন্দ দখল করিয়া লইলেন। উপরন্তু এদিকেও তিনি পিতৃরাজ্য ফরঘানা হইতে দ্বিতীয়বার বিতাড়িত হইলেন এবং আশ্রয় ও সম্বলহীন অবস্থায় নানাস্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাজ্যচ্যুত ও নিরাশ্রয় হইয়াও বাবর আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস হারাইলেন না। উজবেক জাতিদের মধ্যে অন্তর্বিরোধের সংবাদ অবগত হইয়া তিনি ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে কাবুল অধিকার করিলেন এবং কাবুলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি হিন্দুস্থান জয়ের কল্পনা করিতে লাগিলেন।

সমরখন্দ জয়

সমরখন্দ ও পিতৃরাজ্য হইতে বিতাড়িত

এদিকে দিল্লীতে আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদী রাজত্ব করিতেছিলেন। ইব্রাহিম লোদীর স্বেচ্ছাচারিতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের ফলে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা

দৌলত খাঁ লোদী ও সুলতানের আত্মীয় আলম খাঁ সুলতানের উপর প্রতিশোধপরায়ণ হন এবং কাবুলের অধিপতি বাবরকে হিন্দুস্থান অভিযানের জন্য আমন্ত্রণ করেন। বাবর ইহাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইয়া ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে সসৈন্যে ভারতে প্রবেশ করিয়া লাহোর অধিকার করিলেন। দৌলত খাঁ ও আলম খাঁ ভাবিয়াছিলেন বাবর তৈমুরলঙ্গের মত লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যাইবেন কিন্তু যখন দেখিলেন বাবর স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপনের আশা পোষণ করিতেছেন, তখন তাঁহারা বাবরের সহিত প্রতিকূল আচরণ করিতে লাগিলেন। অগত্যা বাবরকে এই যাত্রায় কাবুলে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল। পর বৎসর, পুনরায় সসৈন্যে কাবুল হইতে বহির্গত হইয়া বাবর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। দৌলত খাঁ লোদী বাবরকে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়া পরাজিত হইলেন। সহজেই পাঞ্জাব বাবরের হস্তগত হইল। অতঃপর বাবর দিল্লী ও আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দিল্লীর পঞ্চাশ মাইল উত্তরে পাণিপথে ইব্রাহিম লোদী সসৈন্যে বাবরকে বাধা দিলেন। বাবরের সঙ্গে মাত্র দ্বাদশ সহস্র সৈন্য ছিল পক্ষান্তরে ইব্রাহিম লোদীর সৈন্য সংখ্যা ছিল এক লক্ষ। তথাপি সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য ও উন্নততর সৈন্যসমাবেশের ফলে এবং সর্বোপরি কামান ব্যবহারের জোরে বাবর পাণিপথের যুদ্ধে (২১, এপ্রিল, ১৫২৬) ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন। পাণিপথের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

ভারত অভিযান

পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ, ১৫২৬

বাবরের আত্মজীবনী হইতে জানা যায় বাবর যখন দিল্লী অভিযান করেন, তখন হিন্দুস্থানে পাঁচটি মুসলমান রাজ্য ও দুইটি হিন্দু রাজ্য ছিল। পাঁচটি মুসলমান রাজ্য হইল—বাংলা-বিহারের আফঘান রাজ্য, মালব, গুজরাট, বাহমনী ও দিল্লীর সুলতানের অধীন রাজ্য আর হিন্দুরাজ্য দুইটি হইল বিজয়নগর ও মেবার। প্রথম পাণিপথের যুদ্ধে বাবর দিল্লীর সুলতানির অবসান করিলেন, কিন্তু মেবারের রাজপুত রাজ্য ও বাংলা-বিহারের আফঘান রাজ্য বাবরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে তখনও বর্তমান ছিল। বাবর জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুনকে আফঘানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। পাণিপথের যুদ্ধের আট মাসের মধ্যেই পশ্চিমে আটক হইতে পূর্বে বিহার পর্য্যন্ত সমগ্র অঞ্চল বাবরের অধিকারভুক্ত হইল। অতঃপর বাবর তাঁহার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী রাজপুত বীর মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের (রাণা সঙ্গ) বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। দিল্লী-সুলতানির পতনের পরে রাণা সংগ্রাম সিংহ ভারতে রাজপুত আধিপত্য স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

বাবরের প্রতিদ্বন্দ্বীবর্গ

পূর্বদিকে অভিযান

সমগ্র রাজপুতানায়, গুজরাট ও মধ্যভারতে তাঁহার প্রতিপত্তি ইতিপূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সংগ্রাম সিংহ ইতিপূর্বেই বহু যুদ্ধক্ষেত্রে অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি বাবরকে দিল্লী হইতে বিতাড়িত করার জন্য অগ্রসর হইলেন। খানুয়ার যুদ্ধে উভয় পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন (১৫২৭ খৃঃ)। এই যুদ্ধে লোদী বংশের সমর্থক কয়েকজন মুসলমান ও হাসান খাঁ মেওয়াটি রাণা সংগ্রাম সিংহের সহিত বাবরের বিরুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। খানুয়ার যুদ্ধে বাবর পাণিপথের অনুরূপ সৈন্যস্থাপনের ব্যবস্থা করেন। এই যুদ্ধে রাজপুতগণ অশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও জয়লাভ করিতে পারিল না। রাণা সংগ্রাম সিংহ কোনমতে রক্ষা পাইয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বাবর দিল্লী-সুলতানির অবসান সময়ে প্রকৃত শক্তির অধিকারী রাজপুত সংহতি বিনষ্ট করিলেন। ইহার ফলে তুর্ক-আফঘানদের রাজত্বের পরে রাজপুতদের নেতৃত্বে যে হিন্দু-আধিপত্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, তাহা আর অগ্রসর হইতে পারিল না। ইহার পর বাবর চন্দেরী দুর্গ মেদিনী রাওয়ের অধিকার হইতে জয় করিয়া নবার্জ্জিত সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করিলেন।

খানুয়ার যুদ্ধ ১৫২৭,

ফলাফল

রাজপুত শক্তি বিনষ্ট করিয়া বাবর আফঘান শক্তি দমন করার জন্য অগ্রসর হইলেন। ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মামুদ লোদী খানুয়ার যুদ্ধের পর বিহারে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া বাবরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে বাবর গঙ্গা ও ঘর্ঘরার সঙ্গমস্থলে মামুদ লোদীকে পরাজিত করিলেন। ইহাতে বিহারে মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। বাবর মাত্র চারি বৎসরকাল রাজত্ব করিয়া ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে ৪৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বিহার অধিকার

মৃত্যু ১৫৩০ খৃঃ

বাবর এশিয়ার ইতিহাসের অন্যতম হৃদয়গ্রাহী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ। দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা হইলেও তাঁহার মধ্যে জিঘাংসাপ্রবণতা কম ছিল। তাঁহার চরিত্রে অসামান্য কর্মশক্তি, অপরিসীম ধৈর্য্য, আত্মনির্ভরতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার সমাবেশ হইয়াছিল। পরাজয়ে অথবা আকস্মিক বিপর্য্যয়ে তিনি ধৈর্য্যহারা না হইয়া স্থির মস্তিষ্কে এবং অসীম সাহসে বিপন্মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করিতেন। তাঁহার অপত্যস্নেহ, বন্ধুপ্রীতি ও ভৃত্যবৎসলতা আদর্শস্থানীয় ছিল। বাবরের চরিত্রে তাতার জাতির দুর্দ্দমনীয় সাহস ও বিপদকে অগ্রাহ্য করার প্রবণতা এবং পারসিক জাতির সংস্কৃতি ও সাহিত্যরসিকতা—একাধারে কঠোর ও কোমল উভয় গুণের সমাবেশ হইয়াছিল। তিনি পিতৃকুল হইতে প্রথম এবং মাতৃকুল হইতে দ্বিতীয়

চরিত্র

বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিনি প্রধানতঃ মুঘল সাম্রাজ্যের ভাগ্য-প্রতিষ্ঠাতারূপে সমধিক খ্যাত। কিন্তু সাহিত্যিক প্রতিভাও তাঁহার কম ছিল না। তুর্কী ও ফার্সী ভাষায় তিনি বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ফার্সি ভাষায় রচিত তাঁহার আত্মকাহিনী একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তিনি যদিও দিগ্বিজয়ী বীর নাও হইতেন, তথাপিও সাহিত্যিক রূপে তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিতে পারিত। সঙ্গীত ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি আশ্চর্য্য অনুরাগ তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

হুমায়ুন :—১৫৩০ খৃঃ-এ বাবরের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাবরের অপর তিন পুত্রের মধ্যে কামরাণ কাবুল, কান্দাহার ও পাঞ্জাব অধিকার করিলেন এবং হিন্দাল ও আসকারী পাঞ্জাবের অন্তর্গত দুইটি জেলা লাভ করিলেন।

বাবর মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা দৃঢ় করিবার মত অবকাশ তিনি পান নাই। সুতরাং নানাবিধ বিপদ কাটাইয়া এই কার্য্য সম্পাদনের গুরু দায়িত্ব হুমায়ুনের উপর পড়িল। কিন্তু এই গুরুদায়িত্ব সম্পাদনের মত ব্যক্তিত্ব, দূরদর্শিতা ও চরিত্রবল হুমায়ুনের ছিল না। প্রথমতঃ তখন পর্য্যন্ত আফঘান ও রাজপুত শক্তি নির্মূল হয় নাই। বাবর সামরিক বলের সাহায্যে শত্রুগণকে দমন করিয়াছিলেন কিন্তু, তাহাদের ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মামুদ লোদীর নেতৃত্বে আফঘানগণ পুনরায় শক্তি সঞ্চয়ের জন্য চেষ্টা করিতেছিল, শের খাঁ বাংলা ও বিহারে আফঘানদের ঘাটি দৃঢ় করিয়া তুলিতেছিল। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ গুজরাটের বাহাদুর শাহের জন্য মুঘলদের আধিপত্য পরিস্ফুট হইতে পারিতেছিল না। দ্বিতীয়তঃ, কনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্রয় সিংহাসনের উপর দাবি পরিত্যাগ না করিয়া সিংহাসনের জন্য লুব্ধ হইয়া রহিল। ভ্রাতাদের মধ্যে কামরাণই হুমায়ুনের প্রতি সর্বাধিক বিরুদ্ধ আচরণ প্রদর্শন করিতে লাগিল। মধ্য এশিয়া ও আফঘানিস্থান হইতেই বাবর সৈন্য সংগ্রহ করিতেন, কিন্তু কাবুল, কান্দাহার ও পাঞ্জাব কামরাণের শাসনাধীনে থাকায় হুমায়ুনের পক্ষে সৈন্য সংগ্রহ করা দুরূহ হইয়া পড়িল। ফলে সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই হুমায়ুনকে নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইল

হুমায়ুনের প্রাথমিক অবস্থা

হুমায়ুন

সিংহাসনে আরোহণের পরে পাঁচ ছয় মাসের মধ্যেই হুমায়ুন আফঘান শক্তির বিরুদ্ধে পূর্বদিকে অগ্রসর হইলেন এবং মামুদ লোদীকে জৌনপুর হইতে বিতাড়িত করিলেন। অতঃপর তিনি বিহারের অন্যতম আফঘান নায়ক শের খাঁ-র চুণার দুর্গ অবরোধ করিলেন। কিন্তু শের খাঁ নামমাত্র বশ্যতা স্বীকার করাতেই তাঁহার ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট না করিয়াই গুজরাটের বাহাদুর শাহকে দমন করার জন্য চলিয়া আসিলেন। শের খাঁ ইতিমধ্যে শক্তি সঞ্চয় করার অবকাশ প্রাপ্ত হইল। বাহাদুর শাহ ইতিমধ্যে প্রসিদ্ধ চিতোর দুর্গ আক্রমণ করিলে চিতোরের রাণী কর্ণবতী হুমায়ুনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু হুমায়ুন নিষ্ক্রিয় থাকাতে বাহাদুর শাহ চিতোর দুর্গ অধিকার ও বিধ্বস্ত করিলেন। চিতোর অধিকারের সংবাদে হুমায়ুন বাহাদুর শাহকে আক্রমণ করিয়া মান্দাসোরের নিকট পরাজিত করিলেন। হুমায়ুন ভ্রাতা আসকারীকে গুজরাটের শাসনভার দিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন, কিন্তু বিজিত রাজ্য রক্ষার জন্য কোন স্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন না। বাহাদুর শাহ পর্তুগীজদের সহায়তায় গুজরাট পুনরধিকার করিলেন। বাহাদুর শাহকে দমন করিবার চিন্তা করার পূর্বেই হুমায়ুনকে বিহারের শেরশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে হইল। ইত্যবসরে বাহাদুর শাহও পুনরায় মালব অধিকার করিলেন।

যুদ্ধবিগ্রহ

শের শাহ (১৫৩৯-'৪০)—শের শাহের আসল নাম ছিল ফরিদ খাঁ। তাঁহার পিতামহ শূরবংশীয় আফঘান ইব্রাহিম পেশোয়ারের সন্নিকটে বাস করিতেন শের শাহের পিতার নাম ছিল হাসান। বহলুল লোদীর রাজত্বকালে ইব্রাহিম পুত্রসহ ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৫০২ খৃষ্টাব্দে ফরিদ পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেন হাসান বিহারের সাসারামে এক জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। বিমাতার অসদ্ব্যবহারে উৎপীড়িত হইয়া ফরিদ খাঁ বাইশ বৎসর বয়সে সাসারাম ত্যাগ করেন এবং জৌনপুরে পিতার পৃষ্ঠপোষক জামাল খাঁনের নিকট উপস্থিত হইয়া বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ করেন। অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি গুলিস্তাঁ, বোস্তাঁ, সিকান্দারনামা প্রভৃতি গ্রন্থ স্মৃতিশক্তির সাহায্যে আবৃত্তি করিতে সক্ষম হইলেন। জৌনপুরের শাসনকর্তা ফরিদের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হন। তাঁহার মধ্যস্থতায় পিতাপুত্রের পুনর্মিলন হয় এবং ফরিদকে স্বগৃহে ফিরাইয়া লইয়া সাসারাম ও খাওয়াসপুর পরগণাদ্বয়ের শাসনভার অর্পণ করেন। ফরিদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে তাঁহার বিমাতা পুনরায় তাঁহার প্রতি বিদ্বিষ্ট হন এবং দ্বিতীয়বার সাসারাম পরিত্যাগ করিয়া ভাগ্যান্বেষণে আগ্রায় উপস্থিত হইলেন।

বাল্যকাল

পিতৃগৃহ ত্যাগ

বিদ্যাশিক্ষা

পিতার মৃত্যুর পরে ফরিদ দিল্লীর বাদশাহের ফরমানের বলে সাসারামে পৈত্রিক জায়গিরের অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৫২২ খৃষ্টাব্দে তিনি বিহারের স্বাধীন নৃপতি বাহার খাঁ লোহানীর অধীনে কর্মে নিযুক্ত হন। বাহার খাঁ তাঁহার কর্মকুশলতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পুত্র জালাল খাঁর শিক্ষক নিযুক্ত করেন। একদা একাকী স্বহস্তে একটি ব্যাঘ্র হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া বাহার খাঁ তাঁহাকে শের খাঁ উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু অচিরেই ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার উপর বিরূপ হইলেন। শত্রুপক্ষের প্ররোচনায় তিনি প্রভু বাহার খাঁর বিরাগ ভাজন হইয়া পৈত্রিক জায়গির হইতে বঞ্চিত হইলেন। অতঃপর তিনি বাবরের সৈন্যদলে যোগদান করিয়া দেড় মাসকাল মুঘলের অধীনে কার্য্য করিলেন। পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধকালীন তিনি বাবরকে যথেষ্ট সাহায্য করেন এবং বাবরের সাহায্যে শের খাঁ পুনরায় সাসারামের জায়গির প্রাপ্ত হন। শের খাঁ মুঘলের চাকরি পরিত্যাগ করিয়া বিহারে পলায়ন করেন এবং বাহার খাঁ লোহানীর মৃত্যু হইলে পুরাতন ছাত্র ও নাবালক রাজা জালাল খাঁর অভিভাবক নিযুক্ত হন। বিহারের শাসন ক্ষমতা হাতে পাইয়া শের খাঁ প্রকৃত পক্ষে সর্বেসর্বা হইয়া উঠেন। ইতিমধ্যে চুনার দুর্গের অধিপতি তাজ খাঁর মৃত্যু হইলে শের খাঁ তাঁহার বিধবা পত্নী লাডমালিকাকে বিবাহ করিয়া চুনার দুর্গ হস্তগত করেন। শের খাঁর ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন চুনার দুর্গ আক্রমণ করেন, কিন্তু শের খাঁ হুমায়ুনের আনুগত্য স্বীকার করিয়া এই যাত্রা আত্মরক্ষা করেন।

চুনার দুর্গ অধিকার

শের খাঁর শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে জালাল খাঁ ও লোহানী সর্দারগণ তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য বাংলার সুলতান মামুদ শাহের সহযোগে তাঁহাকে দমন করার জন্য ষড়যন্ত্র করিলেন। শের খাঁ তাঁহার শত্রুপক্ষের সম্মিলিত সৈন্যদলকে সুরজগড়ের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বিহারের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া বসিলেন (১৫৩৪)।

বিহারে আধিপত্য

হুমায়ুনের সহিত শেরশাহের বিরোধ :—হুমায়ুন যখন বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত, তখন শের খাঁ অকস্মাৎ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন। বাংলার দুর্বলচিত্ত সুলতান মামুদশাহ শেরশাহের সঙ্গে বিনা যুদ্ধে সন্ধি করিয়া তাঁহাকে তেরোলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা এবং কিউল হইতে সকরিগলি পর্যন্ত নব্বই মাইল দীর্ঘ অঞ্চল অর্পণ করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া শের খাঁ অল্পদিন পরেই পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন এবং রাজধানী গৌড় অবরোধ করিলেন। শের খাঁ কর্তৃক বঙ্গদেশ আক্রমণের সংবাদে হুমায়ুন তাঁহাকে দমনের জন্য পূর্বদিকে অগ্রসর হইলেন হুমায়ুন

যদি পথে কোথায়ও অপেক্ষা না করিয়া সোজা বঙ্গদেশের নবাবের সঙ্গে মিলিত হইতেন, তাহা হইলে সম্মিলিতভাবে উভয়ের পক্ষে শের খাঁকে পরাস্ত করা সহজ হইত। কিন্তু হুমায়ুন ইহার পরিবর্তে প্রথমে বিহারে আসিয়া চুনার দুর্গ অবরোধ করিলেন। ছয়মাস অবরোধের পর চুনার দুর্গ অধিকৃত হইল। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে শের খাঁ বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড় অধিকার করার সুযোগ পাইলেন। তারপর হুমায়ুন যখন গৌড়ে উপস্থিত হইলেন, তখন শের খাঁ তাঁহার সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত না হইয়া গৌড় পরিত্যাগ পূর্বক পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইলেন এবং বারাণসী অধিকার করিয়া কনৌজ হইতে জৌনপুর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। বিনা যুদ্ধে গৌড় অধিকৃত হওয়ায় হুমায়ুন অত্যন্ত উল্লসিত হন এবং ইহার ফলে আফঘান শক্তি বিনষ্ট হইল মনে করিয়া বিজয়োৎসব অনুষ্ঠানের আদেশ দেন। উপরন্তু বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর গুণে আকৃষ্ট হইয়া সসৈন্যে বাংলাদেশে তিন মাস কাটাইলেন। এই সুযোগে শের খাঁ চুনার দুর্গ পুনরুদ্ধার করিলেন এবং জৌনপুর, বারাণসী প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া কনৌজ পর্যান্ত অগ্রসর হইলেন। ইত্যবস্থায় হুমায়ুন আর আলস্যবিলাসে সময় অতিবাহিত না করিয়া দ্রুত আগ্রার দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু শের খাঁ পথিমধ্যে তাঁহার গতিরোধ করেন এবং বক্সারের নিকটবর্তী চৌসাতে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে হুমায়ুন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং কোনক্রমে প্রাণ বাঁচাইয়া আগ্রায় ফিরিয়া আসিলেন। এই যুদ্ধে জয়লাভের পর শের খাঁ 'শেরশাহ' উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন (১৫৩৯)। পর বৎসর হুমায়ুন চৌসার যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধের জন্য পুনরায় বিলগ্রাম নামক স্থানে শের শাহের সম্মুখীন হন। কিন্তু বিলগ্রামের যুদ্ধেও (১৫৪০) হুমায়ুন পরাজিত হন। অতঃপর হুমায়ুন পাঞ্জাবে, সিন্ধুদেশে, রাজপুতানায় এবং আফঘানিস্থানে আশ্রয়লাভের জন্য নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া সিন্ধুদেশের পথে পারস্যে প্রস্থান করেন। এইরূপে বাবরের অর্জিত হিন্দুস্থানের রাজ্য হস্তচ্যুত হইয়া পুনরায় আফঘানদের করতলগত হয়।

চৌসার যুদ্ধ ১৫৩৯

অতঃপর শেরশাহ, পাঞ্জাব, মালব, সিন্ধু ও মুলতান অধিকার করেন। এই সময়ে বাংলাদেশের শাসনকর্তা বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে শেরশাহ বাংলাদেশের শাসনকর্তাকে পদচ্যুত করিলেন। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে শেরশাহ মধ্য ভারতের পূরণমল শাসিত রাইসিন দুর্গ অবরোধ করিয়া অধিকার করিলেন। ইহার পর তিনি রাঠোররাজ মালদেবের মাড়বার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে তাঁহার বহু সৈন্য নিহত হয়। কঠোর সংগ্রামের পর শেরশাহ জয়ী হন। ইহার পর তিনি আজমীঢ় হইতে আবু পর্য্যন্ত সমস্ত অঞ্চলের

শের শাহের সাম্রাজ্য বিস্তার

অধিপতি হন। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে শেরশাহ কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করিলেন। এই অবরোধের সময়ে বারুদাগার বিস্ফোরণের ফলে অগ্নিদগ্ধ হইয়া শের শাহ মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৫৪৫ খৃঃ)।

মৃত্যু, ১৫৪৫ খৃঃ

শেরশাহের শাসন পদ্ধতিঃ—শেরশাহ মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যে তিনি যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়াও নবস্থাপিত সাম্রাজ্যের সুশাসন ও শান্তি রক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য শেরশাহ তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য ৪৭টি সরকার ও প্রত্যেকটি সরকার কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত করেন। প্রত্যেকটি পরগণায় একজন করিয়া আমিন, সিকদার, কোষাধ্যক্ষ এবং হিন্দীতে ও ফার্সীতে হিসাব রক্ষার জন্য দুইজন কেরাণী থাকিত। সিকদার শান্তিরক্ষার এবং আমিন রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের কার্য্য করিতেন। কোন পদে দীর্ঘকাল অবস্থান করার জন্য কর্মচারীদের অসঙ্গত ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রতিকারকল্পে শেরশাহ দুই বা তিন বৎসর অন্তর কর্মচারীকে স্থানান্তরে বদলীর ব্যবস্থা করেন। শাসন ব্যবস্থার প্রত্যেকটি বিভাগ শের শাহ স্বয়ং তদন্ত করিতেন।

সরকার

পরগণা

সরকারী কর্মচারীদের বদলীর ব্যবস্থা

রাজস্ব ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় অথচ ন্যায়সঙ্গত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা শের শাহের অন্যতম কৃতিত্বপূর্ণ কার্য্য। শেরশাহ সাম্রাজ্যের সমস্ত জমি জরিপ করাইয়া প্রত্যেক প্রজার জমির সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেন। অতঃপর প্রতি খণ্ড জমির উর্বরতা ও সীমা অনুপাতে তাহার রাজস্ব নির্ধারিত হয়। প্রজাগণ উৎপন্ন শস্যের এক তৃতীয়াংশ অথবা উহার উপযুক্ত মূল্য রাজস্বরূপে দিতে পারিত। সরকার ও প্রজার পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশক দুইটি দলিল প্রচলনের ব্যবস্থা হইল। প্রজার স্বত্ব ও রাজস্ব স্থির করিয়া সরকারের পক্ষ হইতে 'পাট্টা' এবং রাজকোষে প্রদেয় রাজকর স্বীকার করিয়া প্রজার স্বীকৃতিপত্র 'কবুলিয়ত' প্রবর্তিত হইল। রাজস্ব নিয়মিত ভাবে আদায়ের জন্য শেরশাহ আমিন, মখাদেম, সিকদার, কানুনগো, পাটোয়ারী প্রভৃতি কর্মচারীর সাহায্য গ্রহণ করিতেন। রাজস্ব নির্ধারণের সময়ে বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করা হইত না, প্রজার স্বার্থের প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা হইত। কিন্তু রাজস্ব আদায়ের সময়ে মোটেই দয়ার প্রশ্রয় দেওয়া হইত না। অজন্মা বা দুর্ভিক্ষের বৎসরে খাজনা মকুফ করা হইত এবং কৃষকের দুরবস্থার উন্নতির জন্য কৃষিঋণ প্রদত্ত হইত।

ভূমি রাজস্ব ও প্রজার স্বার্থরক্ষা

ন্যায় বিচার প্রবর্তনের প্রতিও শের শাহের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এই বিষয়ে তাঁহার

আশ্চর্য্য সমদর্শিতা ছিল—উচ্চনীচ ভেদাভেদ ছিল না। এমন কি সম্রাটের কোন নিকট আত্মীয়ও পক্ষপাতিত্বের প্রশ্রয় ভোগ করিতে পারিত না। ফৌজদারী দণ্ডবিধি অত্যন্ত কঠোর ছিল। সিকদার ফৌজদারী বিভাগের বিচারক থাকিতেন; প্রধান মুন্সী রাজস্ববিষয়ক বিচার করিতেন; অন্যান্য দেওয়ানী বিচারের ভার কাজি ও মীর-ই-আদলের হস্তে ছিল। সাম্রাজ্যের রাজধানী শহরে বিচার ব্যবস্থার ভার প্রধান কাজি ও সদর-এর উপর ন্যস্ত ছিল সম্রাট সর্বক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত ছিলেন। উপযুক্ত শাসনব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না—শান্তি-শৃঙ্খলারও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তিনি শান্তিরক্ষার ভার স্থানীয় লোকের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। দস্যু তস্করের উপদ্রব হইতে রাস্তাঘাট নিরাপদ হইয়াছিল।

বিচার ব্যবস্থা

শেরশাহ মুদ্রানীতি ও শুল্কবিধিরও সংস্কার করেন। এতদ্ব্যতীত বহু উৎকৃষ্ট রাস্তাঘাট নির্মাণ করিয়া তিনি যাতায়াতের ও বাণিজ্যাদির সুবিধা করিয়া দেন। এই সকল রাজপথের মধ্যে পূর্ববঙ্গের সোনার গাঁ হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে দেড় সহস্র ক্রোশব্যাপী রাস্তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্য রাজপথ সমূহের মধ্যে আগ্রা হইতে বুরহানপুর, আগ্রা হইতে যোধপুর এবং লাহোর হইতে মুলতান এই তিনটি রাস্তার নাম করা যাইতে পারে। পথিক ও বণিকদের সুবিধার জন্য রাস্তার নানাস্থানে পান্থনিবাস নির্মাণ করিয়া দেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সংবাদ আদানপ্রদানের জন্য তিনি ঘোড়ার পিঠে করিয়া ডাক প্রেরণের বন্দোবস্ত করেন।

বিবিধ উন্নতিমূলক ব্যবস্থা

রাজপথ

ঘোড়ার ডাক

শেরশাহ সামরিক বিভাগেরও যথেষ্ট পরিবর্তন করেন। তিনি মনসবদারী প্রথা রহিত করিয়া সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সৈন্যসংগ্রহ ও বেতনের প্রবর্তন করেন। সামরিক বিভাগের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার প্রতি তাঁহার প্রখর দৃষ্টি থাকিত। সেনা-বাহিনীর যাতায়াতের ফলে যাহাতে কৃষকদের শস্যহানি না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা হইত। সৈন্যদের দ্বারা শস্যহানি হইলে কৃষকগণ সরকার হইতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইত।

শেরশাহ মধ্যযুগীয় নরপতিদের ন্যায় স্বৈরাচারী হইলেও প্রজার কল্যাণের জন্য তাঁহার চেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি রাজ্যশাসনের ক্ষুদ্রতম ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন এবং প্রজার মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। ধর্মনির্বিশেষে সমগ্র প্রজার কল্যাণই রাজা ও রাজ্যের কল্যাণ ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। উলেমাদের অনুশাসন অগ্রাহ্য

শেরশাহের শাসনের আদর্শ ও কর্মধারা

করিয়া তিনি হিন্দুদের প্রতি আচরণে সমদর্শিতার পরিচয় প্রদান করেন। এ সম্বন্ধে ভারতের মুসলমান শাসকদের মধ্যে শেরশাহই প্রথম পথপ্রদর্শক। ব্রহ্মজিৎ গৌড় নামে জনৈক হিন্দু তাহার অন্যতম সেনানায়ক ছিলেন। হিন্দু প্রজাদের শিক্ষাবিধানের জন্য তিনি বহু ওয়াকফ (সংস্কৃতে উৎসৃষ্ট জায়গির) এর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই উদার ও সমদর্শী নীতির জন্য তিনি সর্ব্বশ্রেণীর প্রজার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।)

শেরশাহের বংশধরগণ: মুঘল রাজত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠাঃ—শেরশাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র জালাল খাঁ ইসলাম শাহ নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইসলাম খাঁ দুর্বল ও অনভিজ্ঞ ছিলেন। ফলে শূর বংশীয় অভিজাতশ্রেণী ও অন্যান্য আফগান শাসনকর্ত্তাগণ ইসলাম খাঁর আধিপত্য অস্বীকার করিতে আরম্ভ করিলেন। নয় বৎসর রাজত্বের পরে ইসলাম খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র ফিরুজ খাঁ সিংহাসনে বসিলেন। কিন্তু অচিরেই তিনি খুল্লতাত মাতুল মুবারিজ খাঁ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলেন। মুবারিজ মহম্মদ আদিল শাহ নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সম্রাট হইলেন। আদিল শাহ অপদার্থ ও দুশ্চরিত্র হইলেও তাঁহার হিন্দু মন্ত্রী হেমু দক্ষতার সহিত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু চারিদিকের বিশৃঙ্খলা হইতে সাম্রাজ্য রক্ষা করার মত শক্তি কাহারও ছিল না। আদিলশাহের জ্ঞাতি ভ্রাতা ইব্রাহিম খাঁ বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী আগ্রা অধিকার করিয়া বসিলেন, কিন্তু অচিরেই তিনিও অন্যতম ভ্রাতা সেকেন্দার শূরের হস্তে পরাজিত হইলেন। বঙ্গদেশ ও মালব ইতিপূর্ব্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। হুমায়ুন দীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসরকাল এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে পারস্য-রাজের সহায়তায় ভ্রাতা কামরানকে পরাজিত করিয়া কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করিয়াছিলেন। শেরশাহের বংশধরগণের দুর্ব্বলতা ও বিবাদের সুযোগে হুমায়ুন একদল সৈন্যসহ পাঞ্জাবে প্রবেশ করিলেন। পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রা হুমায়ুনের হস্তগত হইল (১৫৫৫), কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ তিনি দীর্ঘদিন রাজ্যসুখ উপভোগ করিতে পারিলেন না। মাত্র ছয় মাস রাজত্বের পরে একদা পাঠাগারের সোপান হইতে পদস্খলিত হইয়া তিনি গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। ইহার ফলে তাঁহার মৃত্যু হয় (জানুয়ারী ১৫৫৬)। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব পুত্র আকবরের উপর পড়িল।

ইসলাম শাহ (১৫৪৫-'৫৪)

ফিরুজ শাহ

আদিল শাহ

হুমায়ুন কর্ত্তৃক মুঘল সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা

হুমায়ুনের চরিত্রঃ—হুমায়ুন স্নেহশীল এবং হৃদয়বান নরপতি ছিলেন। বিশেষতঃ

ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের প্রতি তাঁহার উদারতার এত মাত্রাধিক্য ঘটিয়াছিল যে ইহার ফলে বহুক্ষেত্রে নিজেকেও বিপদাপন্ন হইতে হইয়াছে। স্বীয় বিপদের সম্ভাবনা জানিয়াও তিনি চরিত্রের কোমলতাকে বিসর্জন দিতে পারেন নাই। দৈহিকসামর্থ্যেরও তাঁহার অভাব ছিল না। পিতার সহযোগী হিসাবে তিনি বহুযুদ্ধে শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। সাহিত্য-প্রীতি ও কবি-প্রতিভা তাঁহার চরিত্রের অন্যতম গুণ ছিল। হুমায়ূনের চরিত্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গুণ হইল তাঁহার খোস-মেজাজ। ভাগ্যবিপর্যয় বা অজস্র দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে থাকিয়াও তিনি চিত্তের সরসতা বা সহৃদয়তা হারান নাই—সকলের প্রতি সব সময়েই তিনি প্রীতিস্নিগ্ধ আচরণ করিয়াছেন।

হুমায়ূনের চরিত্রের সর্বপ্রধান ত্রুটি ছিল কার্যশৈথিল্য এবং দীর্ঘসূত্রতা। যে সময়ে যাহা করা উচিত তাহা না করিয়াই তিনি প্রারম্ভে বিলম্ব করিতেন; এবং আরব্ধ কর্ম শেষ না করিয়াই নূতন কাজে হাত দিতেন। এই ত্রুটির জন্য তাঁহাকে বারংবার ভাগ্য-বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছিল। হুমায়ূন অহিফেনসেবী ছিলেন। এই নেশার ফলেই সম্ভবতঃ তাহার দেহ ও মনের শৈথিল্য আসিয়া পড়িত।

প্রশ্নোত্তর

1. Attempt an estimate of Babur's achievements and character.

বাবরের কৃতিত্ব ও চরিত্র বর্ণনা কর

উত্তর-সূত্র:—(১) কৃতিত্ব:—বাবর তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতি পূর্ববর্তী মুঘল আক্রমণ-কারীদের ন্যায় লুন্ঠনকারীরূপে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই—ভারতবর্ষে স্থায়ী মুঘল সাম্রাজ্য সংস্থাপনের প্রত্যাশায় ভারতবর্ষ অভিযান করেন। এই ভারত অভিযানের মধ্যে তাঁহার দুঃসাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম পানিপথের যুদ্ধের পূর্বে বাবর দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীর শত্রুপক্ষ পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলতখাঁর সাহায্য-প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যকালে পানিপথের রণক্ষেত্রে বাবর ইহাদের প্রতিশ্রুত সাহায্য লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে মাত্র দ্বাদশ সহস্র সৈন্য লইয়া প্রতিপক্ষের এক লক্ষ সৈন্যের সম্মুখীন হইতে হইল। কৃতিত্বপূর্ণ সৈন্য-পরিচালনা ও দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের বলে বাবর ইব্রাহিমলোদীকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। প্রথম পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভ হইলেও ভারতবর্ষে বাবরের অধিকার দৃঢ় হয় নাই। সাম্রাজ্যের সর্বত্র আফঘান নায়কগণ স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সর্বোপরি মেবারের রাণা সঙ্গ রাজপুত জাতির

অধিনায়করূপে বাবরের জয়লাভে শঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে বিতাড়িত করার উদ্যোগ করিতেছিলেন। এত বিপদের সম্মুখীন হইয়াও বাবর ধৈর্যচ্যুত হইলেন না। তিনি প্রথমে আফঘান নায়কদিগকে পরাজিত করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং খানুয়ার যুদ্ধে রাজপুতদের সম্মুখীন হইলেন। এই যুদ্ধে রাজপুতগণ অসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়াও জয়লাভ করিতে পারিলেন না। বাবর এই যুদ্ধে জয়ী হইলেন। ফলাফলের দিক দিয়া পানিপথের যুদ্ধ অপেক্ষা অপেক্ষা খানুয়ার যুদ্ধ অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। পানিপথের যুদ্ধবিজয়ে বাবর নাম মাত্র দিল্লীর সুলতানের ক্ষমতা নষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু খানুয়ার যুদ্ধে জয়লাভের ফলে তিনি রাজপুত সংহতি বিধ্বস্ত করিয়া দিল্লীর আধিপত্য নিরাপদ করিলেন। ইহার ফলে দিল্লী সুলতানির অবসর-সময়ে রাজপুতদের নেতৃত্বে যে হিন্দু-আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল তাহা বিনষ্ট হইল। খানুয়ার যুদ্ধের পরে নিশ্চিন্ত হইয়া মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে পত্তন করিতে সক্ষম হইলেন। অতঃপর আফঘান সর্দারদের শক্তি গোগ্রার যুদ্ধে (১৫২৯) বিনষ্ট করিয়া মধ্য এশিয়ার অক্সাস হইতে গোগ্রা এবং হিমালয় হইতে গোয়ালিয়র পর্যন্ত বাবরের অধিকারভুক্ত হইল। স্বল্পকালের মধ্যে একক প্রচেষ্টার বলে এতখানি অঞ্চলের আধিপত্য অর্জন করা বাবরের স্বল্প কৃতিত্বের পরিচয় নহে।

(২) চরিত্র :— (পৃষ্ঠা)।

2. Make an estimate of Shershah as a conqueror and and an administrator.

দিগ্বিজয় ও শাসন ব্যবস্থার বিবরণসহ শেরশাহের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

উত্তর-সূত্র : (১) দিগ্বিজয় :—সাসারামের জায়গীরদার—চুণারের দুর্গ অধিকার—হুমায়ুনের দেহ জয়লাভ করিয়া বিহারের অধিপতি— বঙ্গদেশের অঞ্চলবিশেষ অধিকার —হুমায়ুনের অধিকৃত চুণার দুর্গের পুনরুদ্ধার—চৌসা ও বিলগ্রামের যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সম্রাট হন।

অতঃপর পাঞ্জাব, মালব সিন্ধু, মুলতান বিজয়—বাংলা দেশের শাসনকর্তা বিদ্রোহী হইলে তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। রাইসিন দুর্গ ও মাড়বার অধিকার।—আজমীর হইতে আবু অঞ্চলের আধিপত্য কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধের সময়ে মৃত্যু।

(২) শাসনব্যবস্থা। (পৃষ্ঠা)।

3. Write briefly the Mughal Afghan contest for supremacy in India.

ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য মুঘল আফঘান দ্বন্দ্বের বিবরণ দাও।

উত্তর সূত্র : (১) তুর্ক-আফঘান সুলতানগণের মধ্যে সর্বশেষ রাজত্বকারী রাজবংশ লোদীবংশ আফঘান ছিলেন। এই বংশ ৭৫ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। এই বংশের সর্বশেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদী ঔদ্ধত্য ও ক্ষমতাপ্রিয়তার জন্য সকলের অপ্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন। অচিরে লাহোর শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী এবং সম্রাটের নিকট আত্মীয় আলম খাঁ কাবুলের মুঘল অধিপতি বাবরকে দিল্লী আক্রমণ করিতে আহ্বান করিলেন। প্রথম পানিপথের রণক্ষেত্রে বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর আফঘান বংশধরদের শাসনের অবসান করেন এবং ভারতবর্ষে মুঘল রাজত্বের সূচনা করেন।

(২) (প্রথম পানিপথের যুদ্ধে বাবরের জয়লাভে মুঘল অধিকারের সূত্রপাত হয় কিন্তু আফঘান শক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট না হওয়ার ফলে দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে আকবরের বিজয়লাভের পূর্ব পর্যন্ত মুঘলদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত অবস্থায় ছিল।) ১৫২৬ হইতে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধের অন্তবর্তী সময়কালকে মুঘল আফঘান দ্বন্দ্বের যুগ বলা যাইতে পারে। এই দ্বন্দ্বের সময়কালকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম অংশ ১৫২৬ হইতে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। প্রথম পানিপথের যুদ্ধে দিল্লীর সিংহাসন অধিকৃত হইলেও বাবরকে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে অবস্থিত আফঘান শক্তি দমনে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে গোগার যুদ্ধে (১৫২৯ খ্রীঃ) মামুদ লোদীকে পরাজিত করিয়া বাবর আফঘান শক্তিকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিলেন। দ্বিতীয় অংশ ১৫৩০—১৫৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। বাবরের মৃত্যুর পরে শেরশাহের নেতৃত্বে আফঘান শক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়। বাবরের পুত্র হুমায়ুন মুঘল শক্তি দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অগ্রসর হইলে শেরশাহের সঙ্গে তাঁহার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। হুমায়ুন মালব, গুজরাট ও বঙ্গদেশে পরাজিত হইয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন। শেরশাহ মুঘল বংশের হস্ত হইতে বিনষ্ট প্রায় তুর্ক আফঘান সাম্রাজ্য কাড়িয়া লইয়া তাহাকে সাময়িকভাবে সঞ্জীবিত করেন। তৃতীয় পর্ব ১৫৫৫—১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে শেরশাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার বংশধরগণের দুর্বলতা ও বিবাদের সুযোগে হুমায়ুন পুনরায় দিল্লী, পাঞ্জাব ও আগ্রা অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু হওয়ার ফলে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব আকবরের উপর পড়িল। ইতিমধ্যে হুমায়ুনের মৃত্যু সংবাদে শেরশাহের বংশধর মহম্মদ আদিলশাহের সেনাপতি হেমু দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে আকবরের সেনাপতি বৈরাম খাঁর হস্তে পরাজিত হইলেন। আদিল শাহ মুঙ্গেরের নিকট এক যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। শূরবংশীয় অন্যতম আফঘান নায়ক সিকিন্দার শাহ

১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং ইব্রাহিম শূর দশ বৎসর বাদে উড়িষ্যায় নিহত হইলেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভের পরে বাবর যে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধে জয়লাভের ফলে সেই সাম্রাজ্য বিপন্মুক্ত ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। মুঘল আফঘান দ্বন্দ্বের পরিণতি এইভাবে ঘটিল।

4. Write notes on (a) First battle of Panipat (b) Rana Sanga (c) Battle of Kanauj.

টীকা লিখ :—(ক) পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (খ) সঙ্গ (গ) কনৌজের যুদ্ধ।

উত্তর সূত্র :—(ক) পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (পৃষ্ঠা) (খ) রাণা সঙ্গ (পৃষ্ঠা) (গ) কনৌজের যুদ্ধ (পৃষ্ঠা)।

5. Sketch the career and make an estimate of the character of Humayun.

হুমায়ুনের জীবনী ও চরিত্র আলোচনা কর।

উত্তর-সূত্র : (১) হুমায়ুনের জীবনী : (ক) সিংহাসনারোহণ ও ভ্রাতৃবিরোধ (খ) গুজরাটের বাহাদুর শাহের সহিত বিরোধ (গ) পুনরুজ্জীবিত আফঘান শক্তির সহিত দ্বন্দ্ব-শেরশাহের সঙ্গে চৌসা ও বিলগ্রামের যুদ্ধে পরাজয় ও পারস্যের সুলতানের নিকট আশ্রয় গ্রহণ (ঘ) পারস্যরাজের সাহায্যে কান্দাহার ও কাবুল হস্তগত (ঙ) শেরশাহের মৃত্যুর পরে লাহোর, দিল্লী ও আগ্রা অধিকার—ছয়মাস পরে আকস্মিক মৃত্যু।

(২) চরিত্র : (পৃষ্ঠা)।

বিংশতি অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার ঃ আকবর ঃ জাহাঙ্গীর ঃ শাহ্ জাহান

Syllabus—Fxpansion of the Mughul Empire—Akbar—Conquest and annexation. Rana Pratap. Conquest of Bengal and Orissa, Bara Bhuiyas of Bengal. Akbar and the Deccan. Akbar's religion and personality. Rajput policy.

Jahangir—Nurzahan. Conquest of Mewar. Struggle against Ahmadnagar. Set-back in Kandahar.

Saha Jahan's rebellion, Mahabbat Khan's rebellion. Riligious eclecticism but beginning of the persecution of the Shiks. Tujuk-in-Jahangiri. Sahajahan's North-West Frontier and Central Asian policy. His Deccan policy. War of Succession. The Mughul Empire at zenith.

পাঠ্যসূচী ঃ মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার আকবর—বিজয় অভিযান ও সাম্রাজ্য বিস্তার। রাণা প্রতাপ। বঙ্গ ও উড়িষ্যা বিজয়। বঙ্গদেশের বারো ভুইয়া, আকবর ও দক্ষিণ ভারত। আকবরের ধর্ম ও ব্যক্তিত্ব। আকবরের রাজপুত নীতি।

জাহাঙ্গীর—নূরজাহান। মেবার বিজয়। আহম্মদনগরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কান্দাহারে ব্যর্থতা।

শাহজাহানের বিদ্রোহ, মহাবৎ খানের বিদ্রোহ। ধর্ম সমন্বয়, কিন্তু শিখগণের প্রতি নির্যাতনের সূত্রপাত। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীর। শাহ্জাহানের সীমান্ত ও মধ্য এশিয়া নীতি। শাহ্জাহানের দাক্ষিণাত্য নীতি। উত্তরাধিকার লইয়া যুদ্ধ। শীর্ষস্থানে মুঘল সাম্রাজ্য।

আকবর—হুমায়ুন যখন স্বরাজ্য ও সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইয়া সিন্ধুদেশে ঘুরিতেছিলেন, তখন অমরকোট নামক ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্যের রাজা রাণা প্রসাদের আশ্রয়ে

বেগম হামিদাবানুর গর্ভে আকবর জন্মগ্রহণ করেন (১৫৪২)। হুমায়ুন পারস্যে যাইবার প্রাক্কালে এক বৎসর বয়স্ক পুত্র আকবরকে কাবুলে ভ্রাতা কামরানের নিকট রাখিয়া যান। শের শাহের বংশধরগণের দুর্বলতার সুযোগে হুমায়ুন যখন ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দিল্লী ও আগ্রা পুনরধিকার করেন, তখন তিনি বালক আকবরকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। হুমায়ুনের মৃত্যুকালে আকবর পাঞ্জাবে পিতৃবন্ধু তাঁহার অভিভাবক বৈরাম খাঁর নিকটে ছিলেন। হুমায়ুনের মৃত্যু সংবাদে ওমরাহগণ ত্রয়োদশ বর্ষীয় আকবরকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। বৈরাম খাঁ আকবরের নাবালক অবস্থায় অভিভাবকরূপে রাজ্যশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

আকবর

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে আকবরের সিংহাসনারোহণের প্রাক্কালে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছিল। আকবর সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইলেও তাঁহার সাম্রাজ্য দিল্লী, আগ্রা ও পাঞ্জাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মির্জা মহম্মদ হাকিম কাবুলে রাজত্ব করিতেছিলেন। শূরবংশীয়েরা বাংলাদেশ শাসন করিতেছিল। সিন্ধু, কাশ্মীর, মূলতান, মালব, উড়িষ্যা, গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতের আহম্মদনগর, খান্দেশ, বেরার, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি রাজ্যের শাসকগণ স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেছিল।

ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা

পর্টুগীজগণও ভারতের পশ্চিম উপকূলে গোয়া, দিউ প্রভৃতি বন্দরগুলিতে অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সর্বোপরি আফঘান অভিজাতগণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তখনও প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি ভোগ করিতেছিলেন। শূরবংশীয় আফঘানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন, মহম্মদ আদিল শাহ। আদিল শাহ স্বয়ং অকর্মণ্য হইলেও তাহার প্রধান মন্ত্রী হেমু তাঁহার রাজ্যকে খুব শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। হেমু প্রথম জীবনে মেওয়াটের সামান্য হিন্দু বনিক ছিলেন। স্বীয় ক্ষমতাবলে ক্রমশঃ তিনি আদিল শাহের মন্ত্রী ও সেনাপতির পদে নিযুক্ত হন। হুমায়ুনের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া আদিল শাহ হেমুকে দিল্লী,

হেমু

আগ্রা প্রভৃতি জয় করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে আফঘান আধিপত্য স্থাপনের জন্য সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। দিল্লীর ভারপ্রাপ্ত মুঘল সেনাপতি তর্দী বেগ হেমুর সহিত পরাজিত হইয়া বাদশাহী শিবিরে পলায়ন করিলেন। হেমু দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া স্বয়ং 'রাজা বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিলেন। এই সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া আকবর ও বৈরাম খাঁ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাণিপথের রণক্ষেত্রে হেমু তাঁহাদিগকে বাধা প্রদান করেন। পাণিপথে পুনরায় মুঘল ও আফঘানদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিল (১৫৫৬)। এই সংঘর্ষ দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধ নামে খ্যাত। হেমুর সৈন্য সংখ্যা অধিক থাকাতে তাঁহার নিশ্চিত জয়ের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ হেমুর চক্ষু তীরবিদ্ধ হওয়াতে তিনি হস্তীপৃষ্ঠে হাওদার উপর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া যান। হেমুকে দেখিতে না পাইয়া আফঘান সৈন্যগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিতে থাকে। হেমু বন্দী হইলেন এবং বৈরাম খাঁ (অনেকের মতে বৈরামের আদেশে আকবর) হেমুকে স্বহস্তে হত্যা করিলেন। আদিল শাহ বঙ্গদেশে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে মুঙ্গেরের নিকট এক যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হইলেন। শূরবংশীয় সিকান্দার শাহ ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে পরাজিত হইয়া মুঘলদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং ইব্রাহিম শূর দশ বৎসর পরে উড়িষ্যায় নিহত হইলেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভের পরে বাবর যে সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলে সেই সাম্রাজ্য বিপন্মুক্ত ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। আফঘানদের ভারতে সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা চিরতরে নির্মূল হইল।

পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ, (১৫৫৬)

আফঘান শক্তির পতন

আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার—আকবর তাঁহার রাজত্বের প্রথম চারি বৎসর অভিভাবক বৈরাম খাঁ-র কর্তৃত্বাধীনে ছিলেন। আফঘান শক্তি বিনষ্ট করার পরে বৈরাম খাঁ রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। ১৫৫৬ হইতে ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বৈরামের চেষ্টায় ভারতের গোয়ালিয়র দুর্গ, রাজপুত রাজ্য আজমীঢ় এবং জৌনপুর মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

বৈরাম খাঁর ক্ষমতাচ্যুতি আকবরের রাজত্বকালের প্রথম দিকের প্রধান ঘটনা। বৈরাম খাঁর কৃতিত্বের ফলেই মুঘল শক্তি ভারতবর্ষে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু অচিরেই তাঁহার উদ্ধত আচরণ ও সর্বাত্মক প্রভুত্বকামিতায় দরবারের ওমরাহগণ এমন কি স্বয়ং আকবরও তাঁহার উপর বিরক্ত হইলেন। আকবর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বৈরামের

বৈরামের ক্ষমতাচ্যুতি

অভিভাবকত্বের নাগপাশ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য কামনা করিতেছিলেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে আকবর স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া বৈরাম খাঁ-কে অবসর গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। বৈরাম আকবরের অনুরোধ মানিয়া লইয়া মক্কা গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু মক্কা যাওয়ার পথে আকবরের দ্বারা নিযুক্ত পথপ্রদর্শক পীর মহম্মদ নামে জনৈক ব্যক্তির অভদ্র ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বিদ্রোহী হইলেন। অবশেষে বৈরাম খাঁ আকবরের সৈন্যদলের হস্তে পরাস্ত হইয়া আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। আকবর তাঁহার অপরাধ মার্জনা করিয়া তাঁহাকে মক্কা যাওয়ার অনুমতি দেন। মক্কার পথে গুজরাটের পত্তনে বৈরাম খাঁর একজন পূর্ব্ববৈরী জনৈক আফঘান তাঁহাকে হত্যা করেন।

বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিলেও আকবরকে আরও চারি-বৎসরকাল আকবরের ধাত্রীমাতা মাহম অনগা, তাঁহার পুত্র আধম খাঁ ও অপরাপর আত্মীয় স্বজনের প্রভাবাধীনে থাকিতে হয়। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে আকবর ইহাদের প্রভাব কাটাইয়া স্বহস্তে রাজ্যের সমস্ত শাসনভার গ্রহণ করেন।

বৈরাম খাঁর কর্তৃত্বাধীনে আকবরের রাজ্যবিস্তারের সূত্রপাত হয়। ১৫৫৬ হইতে ১৫৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গোয়ালিয়র, আজমীঢ় ও জৌনপুর অধিকৃত হয়। বৈরামের ক্ষমতাচ্যুতির পরে আকবরের ধাত্রীমাতা আধম খাঁ ও পীর মহম্মদ মালব জয় করেন।

গোয়ালিয়র, আজমীঢ়, জৌনপুর, মালব

১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে গণ্ডোয়ানা রাজ্য জয় করার জন্য আকবর আসফ খাঁকে প্রেরণ করেন। গণ্ডোয়ানার রাণী দুর্গাবতী নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা রূপে রাজ্যশাসন করিতেন। বাদশাহী সৈন্যের হস্তে পরাজিত হইয়া শত্রু হস্তে অপমানিত হইবার আশঙ্কায় দুর্গাবতী আত্মহত্যা করেন। বালক নরপতি বীরনারায়ণ বীরত্বসহকারে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করেন।

গণ্ডোয়ানা রাণী দুর্গাবতী

গণ্ডোয়ানা মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করার পরে আকবর রাজপুতনা জয় করার জন্য অগ্রসর হইলেন। দূরদর্শী আকবর এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, মাত্র সামরিক শক্তির সাহায্যে রাজপুত জাতিকে সম্পূর্ণ বশে আনা যাইবে না। প্রত্যক্ষভাবে রাজপুতানার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে তিনি রাজপুতদের শত্রুতা অর্জন করিবেন। রাজপুতদের শত্রুতা যেমন আকবরের সাম্রাজ্যগঠন ও স্থায়িত্বের পক্ষে মারাত্মক, তদ্রূপ ইহাদের মৈত্রী ও সহযোগিতা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে অমূল্য সম্পদ। সুতরাং আকবর প্রথমে বন্ধু-

রাজপুতনা

ভাবে তাহাদের বশে আনিতে চেষ্টা করিলেন। প্রথমে অম্বরের (জয়পুর) রাজা বিহারীমল স্বেচ্ছায় আকবরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া আকবরের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিলেন। বিহারীমলের পুত্র ভগবান দাসের এবং ভগবান দাসের পুত্র মানসিংহ মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে উচ্চ সরকারী পদ লাভ করিলেন। শাসনকার্য্যে ও রণক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া মানসিংহ মুঘল সাম্রাজ্যের অকৃত্রিম সেবা করিয়াছিলেন।

অম্বরের আনুগত্য স্বীকার

কিন্তু মেবারের রাণা উদয়সিংহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেন না। তাঁহার পিতা রাণা সঙ্গ বাবরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রাণা সঙ্গের মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকার লইয়া মেবারে গোলযোগ উপস্থিত হয়। গোলযোগের অবসানে উদয়সিংহ মেবারের রাণা হন। এই গোলযোগের মধ্যে আকবর মেবার আক্রমণ করেন। কাপুরুষ রাণা উদয়সিংহ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পাহাড়ে পলায়ন করেন। কিন্তু জয়মল্ল ও পুত্ত নামক দুইজন রাজপুত বীর চারিমাসকাল প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া বাদসাহী সৈন্যগণের আক্রমণ ব্যর্থ করিলেন। আকবরের গোলার আঘাতে জয়মল্ল নিহত হইলেন এবং পুত্ত শত্রুর হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজপুত রমণীরা 'জহর' ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। অতঃপর আকবর মেবারের রাজধানী চিতোর অধিকার করিলেন।

চিতোর জয়

রাণা প্রতাপসিংহ

রাজপুতনার সর্বশ্রেষ্ঠ দুর্গ চিতোরের পতনে অন্যান্য রাজপুত রাজ্যের নরপতি ভীত হইয়া আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন, একে একে রণথম্ভোর, কালিঞ্জর, বিকানীর ও যশল্মীর প্রভৃতি রাজপুত রাজ্য আকবরের অধীনতা স্বীকার করিল। বিকানীর ও যশল্মীরের অধিপতি আকবরকে কন্যা দান করিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিলেন।

আকবর চিতোর অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু মেবারের উপর স্থায়ী প্রভুত্ব স্থাপন

করিতে সক্ষম হইলেন না। (উদয়সিংহের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র রাণা প্রতাপসিংহ চিতোর ভিন্ন মেবারের যে অংশটুকু তখনও মুঘলদের অনধিকৃত ছিল, সেখানে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।)

রাণা প্রতাপসিংহ

প্রতাপসিংহ সকল প্রকার প্রলোভন অস্বীকার করিয়া মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। প্রতাপসিংহ প্রায় পঁচিশ বৎসর মুঘলদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন। কিন্তু আকবর প্রতাপসিংহের এই স্বাধীনতাস্পৃহার ধৃষ্টতা সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ এবং আসফ খাঁর নেতৃত্বে মুঘলবাহিনী প্রতাসিংহকে গোগুণ্ডা শহরের নিকটবর্তী হলদিঘাটের গিরিবর্ত্মে আক্রমণ করিল।) এই যুদ্ধে অশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও প্রতাপসিংহ মুঘলদের নিকট পরাজিত হইলেন। প্রতাপসিংহ গিরিকন্দরে ও অরণ্যপ্রদেশে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন, তথাপি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। বন্য ফলমূল ভক্ষণ করিয়া তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতেন। শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তাঁহার স্বাধীনতার আদর্শ কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। রাজপুতনার অধিকাংশ রাজ্যই মুঘলদের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। এমন কি প্রতাপের ভ্রাতা সগরজী পর্যন্ত প্রতাপের বিরুদ্ধে আকবরের সহযোগিতা করিতে দ্বিধা করেন নাই। আকবরের বশ্যতা স্বীকার করার জন্য বহু রাজপুত নরপতি অনেক সুবিধা ভোগ করিতেন। ইহারা প্রতাপকে মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করাইয়া নিজেদের সমস্তরে আনিবার জন্য আকবরের যথেষ্ট আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার একান্ত উপাসক প্রতাপের প্রকৃতি ভিন্ন ধাতুতে গড়া ছিল। তিনি শত প্রলোভনের সম্মুখেও স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হন নাই। পৃথিবীর স্বদেশপ্রেমী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রতাপসিংহ অন্যতম। কয়েক বৎসর পরে আকবরের দৃষ্টি অন্যদিকে আকৃষ্ট হওয়ায় প্রতাপসিংহ মুঘলদের নিকট হইতে কয়েকটি দুর্গ পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাধের চিতোর, আজমীঢ় ও মণ্ডলগড় দুর্গ মুঘলদের হস্তেই রহিয়া গেল। ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পরে পুত্র অমরসিংহ মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে থাকেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ রাণা অমরসিংহের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। অমরসিংহ যুদ্ধে পরাজিত হইলেও মুঘলরা মেবার হস্তগত করিতে পারিল না। আকবরের জীবিতবস্থায় মেবারের বিরুদ্ধে আর কোন অভিযান প্রেরিত হয় নাই।

হলদিঘাটের যুদ্ধ

প্রতাপসিংহের স্বাধীনতা স্পৃহা

চিতোরের পতনের পরে আকবর রণথম্ভোর ও কালিঞ্জর আক্রমণ করিয়া ইহাদের বশ্যতা আদায় করেন (১৫৬৯ খৃঃ)। অতঃপর আকবর গুজরাট জয়ে মনোনিবেশ করেন। গুজরাটের সুলতান তৃতীয় মুজঃফর শাহের অপদার্থতার সুযোগে আকবর ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে গুজরাট অধিকার করেন। পরবৎসর আকবর সুরাট হস্তগত করেন। এই স্থানে আকবর পর্টুগীজদের সংস্পর্শে আসেন এবং পর্টুগীজদের সহিত তাঁহার মিত্রতা হয়। পর্টুগীজগণ মুসলমান তীর্থযাত্রীদের মক্কা যাওয়ার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। গুজরাট সাম্রাজ্যের অন্যতম সুবায় পরিণত হইল। টোডরমল গুজরাটের রাজস্ব সম্বন্ধে ব্যবস্থা করার জন্য প্রেরিত হইলেন।

রণথম্ভোর ও কালিঞ্জর জয়

গুজরাট অধিকার

পর্টুগীজদের সহিত মৈত্রী

পশ্চিম দিকে আরব সাগর পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করার পরে আকবর পূর্ব ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বঙ্গদেশ বিজয়ে অগ্রসর হইলেন। শূরবংশের পতনের পরে বঙ্গদেশ সুলেমান কররাণী নামে এক আফগান সর্দারের অধীনে আসে (১৫৬৪)। সুলেমান উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করেন। উড়িষ্যার নরপতি এই আক্রমণের ফলে নিহত হন। সুলেমানের মৃত্যুর পরে ক্রমান্বয়ে তাঁহার পুত্রদ্বয় বায়াজিদ ও দাউদ বাংলার সুলতান হন। সুলতান সুলেমান আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াও কার্যতঃ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। দাউদ সুলেমানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করিয়া বঙ্গদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। উপরন্তু তিনি আকবরের সীমান্তস্থিত জামানিয়া দুর্গ আক্রমণ করেন। ফলে দাউদ খাঁর সহিত আকবরের যুদ্ধ বাধিল। আকবর প্রথমে মুনিম খাঁ-কে দাউদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল না হওয়াতে স্বয়ং দাউদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন (১৫৭৪ খৃঃ)। দাউদ পাটনা ও হাজিপুর হইতে বিতাড়িত হইলেন। সেনাপতি মুনিম খাঁ ও টোডরমল দাউদ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। দাউদ খাঁ ১৫৭৫ খৃঃ বালেশ্বরের নিকট মুনিম খাঁর হস্তে পরাস্ত হইয়া আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। মুনিম খাঁর মৃত্যুর পরে দাউদ পুনরায় বিদ্রোহ করিলে আকবর পুনরায় দাউদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিলেন। রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ পরাজিত ও নিহত হইলেন এবং বঙ্গদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল (১৫৭৬ খৃঃ)।

বঙ্গদেশ বিজয়

বঙ্গদেশ মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও ইহার সমগ্র অঞ্চলে মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল। বঙ্গদেশের বহু স্থান স্থানীয় অসংখ্য হিন্দু ও মুসলমান

ভৌমিকদের অধিকারে ছিল। ইহারা প্রায় স্বাধীনই ছিল এবং ইহাদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সকল স্বাধীন জমিদারদের মধ্যে 'বার ভুঁইয়া' বা দ্বাদশ ভৌমিকের কীর্তিকাহিনী সুপ্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে ঢাকা-ময়মনসিংহের ঈশাখাঁ, বিক্রমপুরের কেদার রায়, যশোহরের প্রতাপ রায়, বাকলা—চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বার-ভুঁইয়া

বঙ্গদেশ বিজয়ের কিছুকাল পরে আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মির্জা মহম্মদ হাকিম কাবুলে বিদ্রোহ করেন। এই বিদ্রোহের সংবাদ অবগত হইয়া আকবর ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে কাবুল অভিযান করেন। মির্জা মহম্মদ পরাজিত হইয়া আকবরের আনুগত্য স্বীকার করে। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে মির্জা হাকিমের মৃত্যুর পরে কাবুল মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যাও আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কাবুল অধিকারের পর আকবর ক্রমান্বয়ে কাশ্মীর, সিন্ধুদেশ, মাকরান উপকূলসহ সমগ্র বেলুচিস্থান স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। উক্ত বৎসরই কান্দাহার প্রদেশ আকবরের হস্তগত হয়। এইভাবে ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে আকবর উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে নর্মদা এবং পশ্চিমে হিন্দুকুশ হইতে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক ভূ-খণ্ডের অবিসম্বাদী অধীশ্বর হইলেন।

কাবুল, উড়িষ্যা, কাশ্মীর, সিন্ধু, বেলুচিস্থান, কান্দাহার

উত্তর-ভারত বিজয় সম্পূর্ণ করিয়া আকবর দাক্ষিণাত্যের দিকে লক্ষ্য করিলেন। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহম্মদনগর ও খান্দেশ অধিকৃত হইলেই আকবরের সাম্রাজ্য সমগ্র ভারতব্যাপী হয়। আকবর প্রথমে ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করাইবার জন্য এই চারিটি রাজ্যে দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু খান্দেশ ব্যতীত কোন রাজ্য মুঘলদের অধীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইল না।

আহম্মদ নগরের সুলতান নাবালক ছিলেন বলিয়া তাহার নামে রাণীমাতা চাঁদবিবি রাজ্যশাসন করিতেন। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে আকবর পুত্র মুরাদের অধীনে একদল মুঘলসৈন্য আহম্মদনগর অধিকার করার জন্য প্রেরণ করিলেন। চাঁদবিবি কূটনীতি ও অসামান্য বুদ্ধির অধিকারিণী ছিলেন। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে চাঁদবিবি মুঘলদের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। সন্ধির শর্তানুযায়ী বেরার মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। মুঘল বাহিনীর প্রস্থানের পরে আহম্মদনগরে গোলযোগ উপস্থিত হইল এবং চাঁদবিবির অনিচ্ছা ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও আহম্মদনগর বিদ্রোহী হইয়া মুঘল সৈন্যদলকে বেরার হইতে বিতাড়িত করার জন্য চেষ্টা করিল। মুঘল সৈন্য ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে আহম্মদনগরের সৈন্যদলকে সুপা-তে পরাজিত করিল। চাঁদবিবি বিদ্রোহী

আহম্মদনগরের চাঁদবিবি

সৈন্যদলের হস্তে নিহত হইলেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইলেন। ১৬০০ খৃঃ-এ আহম্মদনগর মুঘলদের দ্বারা অধিকৃত হইল। কিন্তু শাহ্‌জাহানের রাজত্বের পূর্বে আহম্মদনগর মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

ইতিমধ্যে খান্দেশের সুলতান বাহাদুর শাহ আকবরের অধীনতা স্বীকার করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে আকবর স্বয়ং বুরহানপুর অধিকার করিলেন এবং বিখ্যাত আসিরগড় দুর্গ অবরোধ করিলেন। ছয়মাস অবরোধের পরও আসিরগড় দুর্গ মুঘলদের অনধিকৃত রহিল। অবশেষে আকবর কৌশল অবলম্বন করিলেন। প্রথমে তিনি সন্ধির নাম করিয়া সুলতান বাহাদুর শাহকে মুঘল শিবিরে আনাইলেন এবং দুর্গ আত্মসমর্পণের এক আদেশ পত্র লিখিয়া দিতে বাধ্য করিলেন। এই আদেশপত্রেও কোন কাজ হইল না দেখিয়া আকবর খান্দেশের কর্মচারীবর্গকে প্রচুর উৎকোচ প্রদানে বশীভূত করিলেন। এইভাবে আসিরগড় মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। ইহাই আকবরের সর্বশেষ অভিযান।

দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলে আকবরের রাজ্যসীমা দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল।

আকবরের ধর্মমত ঃ—আকবরের পূর্ববর্তী মুসলমান নরপতিগণের মধ্যে একমাত্র শেরশাহ ব্যতীত অন্য কেহ ধর্ম সম্বন্ধে উদার মনোভাব অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই। আকবরের বাল্য ও কৈশোরের শিক্ষা ও পরিবেশে উদারতার আবহাওয়া ছিল বলিয়া আকবর পরধর্মসহিষ্ণু হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আকবরের মাতামহ বিখ্যাত পারসিক পণ্ডিত ছিলেন, ফলে আশৈশব মাতার নিকট হইতে পরধর্ম সম্বন্ধে সহিষ্ণুতার উপদেশ লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত কাবুলে অবস্থানকালে তিনি বহু সুফী পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার শিক্ষক আবদুল লতিফও তাঁহার মনে উদার মতবাদ গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করেন। হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে বিরাট সাম্রাজ্য গঠনের জন্য অবশ্য আকবরের পক্ষে ধর্মমত সম্বন্ধে সহিষ্ণু না হইয়া উপায় ছিল না কিন্তু ইহাই তাঁহার ধর্মীয় উদারতার একমাত্র কারণ নহে। ধর্মের স্বরূপ কি তাহা জানিবার জন্য আকবর আন্তরিকভাবে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। ইহা তাঁহার বিরোধী গোঁড়া সুন্নী বদায়ুনী পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। প্রকৃত আধ্যাত্মিক পিপাসাই তাঁহাকে সকল ধর্মমত জানার জন্য এবং পরিণামে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের প্রচেষ্টার জন্য অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

সুফী মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত

মাতা ও শিক্ষকের প্রভাব

আকবর আনুষ্ঠানিকভাবে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুন্নী মতবাদই মানিয়া চলিতেন। অতঃপর শেখ মোবারক ও তাঁহার পুত্রদ্বয় এবং আবুল ফজলের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া

তাঁহার ধর্মসম্বন্ধীয় অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ধর্মালোচনার জন্য তিনি ফতেপুর সিক্রীতে 'ইবাদৎখানা' বা উপাসনা মন্দির নির্মাণ করেন। এইস্থানে আকবর হিন্দু, জৈন, পার্শী, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মমতের পণ্ডিতগণকে ধর্মালোচনার জন্য আহ্বান করিতেন এবং শ্রদ্ধালু মনে ইহাদের মতামত শ্রবণ করিতেন। এই ইবাদৎখানায় আলোচিত বিভিন্ন ধর্মের মতবাদগুলির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার ফলে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। এই নূতন ধর্মমত 'দীন-ইলাহি' নামে খ্যাত। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে আকবর দীন-ইলাহি মতবাদ ঘোষণা করেন। ইসলাম, হিন্দু, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের সারবস্তু লইয়া দীন-ইলাহি গঠিত হয়। এই নূতন ধর্মে কোন বিশিষ্ট ধর্মমতে, মহাপুরুষে বা দেবদেবীতে বিশ্বাসের স্থান ছিল না; ইহা ছিল এক প্রকার যুক্তি-আশ্রয়ী ধর্ম। সম্রাটের দ্বারা প্রবর্তিত হইলেও আকবর কখনও কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই ধর্ম কোন ব্যক্তিকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন নাই। এই ধর্ম আকবরের ইচ্ছা ও পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যে পুষ্ট হয় এবং মাত্র স্বল্প কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যেই ইহা সীমাবদ্ধ থাকে; রাজসভার বাহিরে এই ধর্ম সাধারণ লোকের মধ্যে প্রসার লাভ করে নাই।

দীন-ইলাহি

হিন্দুগণ সম্পর্কে আকবরের নীতি ঃ পরধর্মমত সম্বন্ধে সহিষ্ণুতা ভারতবর্ষের হিন্দু সম্রাটগণের সাম্রাজ্য শাসনের মূলনীতি ছিল। মৌর্য্য, গুপ্ত বা হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে এই নীতির ব্যতিক্রম হয় নাই। মুসলমান শাসকগণের মধ্যে আকবরের পূর্ববর্তী সম্রাট শেরশাহ এই নীতির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। আকবরও শেরশাহের অবলম্বিত নীতি কার্য্যে পরিণত করেন। হিন্দুগণের প্রতি উদার ধর্মমত অবলম্বনের পশ্চাতে আকবরের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কতকটা ছিল সত্য, কেননা হিন্দু-প্রধান হিন্দুস্থানে প্রজাদের সদিচ্ছার উপরই মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব নির্ভর করে—ইহা সাম্রাজ্যবাদী আকবর সহজেই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ যে বাল্য ও কৈশোরের শিক্ষা ও পরিবেশের ফলে আকবরের চিত্তে কোন ধর্মান্ধতা স্থান পায় নাই; উপরন্তু তৎকালীন উলেমা ও মুসলমান কর্মচারীদের ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামির ফলে তাঁহার চিত্ত ইসলাম সম্বন্ধে যে বহুল পরিমাণে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল ইহাও সত্য। এইজন্য তিনি হিন্দুগণ সম্বন্ধে উদার ও প্রীতিমধুর মনোভাব প্রদর্শন করেন এবং হিন্দুদের সহিত বন্ধুত্বের জন্য আগ্রহান্বিত হন। হিন্দু মহিষীগণের প্রভাবে আকবর হিন্দুদের ধর্মাচরণ সহ্য করিতেন এবং সশ্রদ্ধভাবে হিন্দু সাধক ও পণ্ডিতগণের ধর্মালোচনা ও দার্শনিক তত্ত্ববিচার শ্রবণ করিতেন। তিনি স্বয়ং এবং যুবরাজ সেলিম

উদার মনোভাব হইতে উদ্ভূত

রাজপুত রমণী বিবাহ করিয়া হিন্দু মুসলমান ঐক্যের পথ প্রশস্ত করেন। আকবরের পূর্ববর্তী মুসলমান নরপতিগণ হিন্দু রমণী বিবাহ করিয়া গিয়াছিলেন। গিযাসউদ্দিন তুঘলক, ফিরুজ তুঘলক বা বাহমনী সুলতানগণের নাম এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আকবরের সঙ্গে তাহাদের পার্থক্য ছিল আকবর বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই হিন্দুরমণী বিবাহের নীতি অবলম্বন করিযাছিলেন, তিনি বিবাহবন্ধনের মধ্য দিয়া হিন্দুগণকে আপন বন্ধু ও পরমাত্মীয় করিয়া তুলিতে চেষ্ট করেন। কোনও ব্যাপারে 'বিধর্মী' হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে তিনি ব্যবধান রাখেন নাই। বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে বহু হিন্দু নিযুক্ত হইয়াছিল—বহু হিন্দুকে তিনি মন্‌সব্‌ প্রদান করিযা উল্লেখযোগ্য সমরাভিযানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অম্বরের নরপতি ভগবান দাস, রাজা মানসিংহ, রাজা টোডরমল ও রাজা বীরবলের ন্যায় অকৃত্রিম সুহৃদ মুঘল সাম্রাজ্যের সম্পদরূপে পরিগণিত হইযাছিলেন।

হিন্দুনারী বিবাহের দ্বারা আত্মীয়তা বন্ধন

দায়িত্বপূর্ণ পদে হিন্দু নিয়োগ

হিন্দুগণের শ্রদ্ধা অর্জনের জন্য আকবর মুসলমান অধিকারের প্রথম হইতে অনুসৃত বহু হিন্দু-বিরোধী প্রথা রহিত করেন। অম্বর রাজকুমারীর সঙ্গে বিবাহের অত্যল্পকাল পরেই তিনি ১৫৬৩ খৃঃ-এ বাৎসরিক এক কোটি টাকা আযের হিন্দু-তীর্থযাত্রী কর এবং ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে জিজিয়া কর তুলিয়া দেন। আকবর যুদ্ধ-বন্দী হিন্দুগণকে ক্রীতদাস করার রীতিও নিষিদ্ধ করেন। অন্যান্য ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার উৎকর্ষের জন্য তাঁহার আগ্রহ ছিল—হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাও প্রদর্শন করিতেন। হিন্দুধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের আলোচনা তিনি ইবাদৎখানায় সাগ্রহে শ্রবণ করিতেন। আবুল ফজল প্রভৃতি উল্লিখিত একুশ জন প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতদের মধ্যে নয়জনই হিন্দু ছিলেন। আইন ই-আকবরীতে হিন্দু ভিষকের উল্লেখ আছে এবং চন্দ্রসেন নামে জনৈক শল্যচিকিৎসা-বিশারদ আকবরের আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন।

তীর্থ-যাত্রী কর ও জিজিয়া-কর রহিত করেন

হিন্দুধর্মে আন্তরিক আগ্রহ

হিন্দুদের শিবরাত্রির পর্বদিবসে আকবর হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে একত্র বসিয়া পান-ভোজন করিতেন। বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ তাঁহার অভিপ্রায়-বিরোধী ছিল, পক্ষান্তরে যদি কোন হিন্দু বাল্যকালে বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া থাকে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া সে যাহাতে স্বধর্মে ফিরিয়া যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। আকবরের একটি স্থায়ী নির্দেশ ছিল যে ধর্মের জন্য কাহাকেও উৎপীড়িত করা

হিন্দু-ধর্ম সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্ব

চলিবে না। অন্য একটি নির্দেশ ছিল যদি কোন 'বিধর্মী' (অ-মুসলমান) গির্জা, সিনাগগ (ইহুদীদের ভজনালয়), দেবমন্দির বা অগ্নিগৃহ (পার্শীদের উপাসনাগৃহ) নির্মাণ করে তাহার কার্য্যে যেন হস্তক্ষেপ না করা হয়। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার উদারতা, বিশেষতঃ হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব দর্শনে গোঁড়া মুসলমানগণ আকবরের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হইয়াছিলেন, এমন কি তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার সঙ্কল্পও করিয়াছিলেন।

হিন্দুর সামাজিক অপবিধি-রহিত করার চেষ্টা

হিন্দুদের সামাজিক কুপ্রথাসমূহ রহিত করার প্রতিও আকবরের দৃষ্টি ছিল। সতীদাহ প্রথা তুলিয়া দেওয়ার জন্য তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং কোন বিধবাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 'সতী' করা যাইবে না বলিয়া আদেশ জারি করেন। আকবর স্বয়ং একজন রাজপুত রমনীকে 'সতীদাহ' হইতে উদ্ধার করেন। অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকার বিবাহ দেওয়া সম্বন্ধেও আকবর প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করিতেন।

হিন্দু গুণীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

হিন্দুগণের প্রতি উদার আচরণের ফলে আকবরের সময়ে ভারতীয় মনীষা বিভিন্ন দিকে প্রকাশ পাইয়াছিল। কেবল যে হিন্দু রাজনীতিজ্ঞ ও সমর বিশারদগণ আকবরের আনুকূল্যে উচ্চ-সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন তাহা নহে, আকবরের উদার মনোভাবের পরিচয় পাইয়া বিভিন্ন স্থান হইতে কবি, দার্শনিক, সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রকর প্রভৃতি বহু হিন্দু গুণী ও জ্ঞানী তাঁহার সভায় আগমন করিতেন এবং সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা কৃতার্থ হইতেন। আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দী সাহিত্যের উন্নতি হয়। বীরবল, সুরদাস ও তুলসীদাস প্রভৃতি হিন্দী কবি আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় অথর্ববেদ, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

ফল

হিন্দুগণের প্রতি আকবরের উদার আচরণ তাঁহাকে জনসাধারণের নিকট অত্যন্ত প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। আকবরকে তাহারা বিধর্মী বা বিদেশী বলিয়া মনে করে নাই, 'জাতীয় নরপতি' মনে করিয়া তাহার রাজত্বের স্থায়িত্বের জন্য আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করিয়াছে। বিশেষতঃ রাজপুতগণ আকবরকে যথেষ্ট সমাদর করিত এবং সৈন্যবল ও সেনানী সাহায্যের দ্বারা মুঘল সাম্রাজ্যের উন্নতি বিধানে সাহায্য করিয়াছিল। এই উদার আচরণের দ্বারাই আকবর প্রজাদের সদিচ্ছা ও সহযোগিতা অর্জন করিয়াছিলেন। ইহার উপর অবস্থিত বলিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলক সুদৃঢ় এবং শতাধিক বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। তাঁহার

প্রপৌত্র ঔরংজেব আকবরের অনুসৃত নীতির অমর্য্যাদা করেন বলিয়াই মুঘল সাম্রাজ্যের অধঃপতন হয়।

আকবরের রাজপুত নীতি : ১৫২৭ খৃষ্টাব্দের খানুয়ার যুদ্ধে রাজপুত বীর রাণা সঙ্গের পরাজয় ঘটিলেও রাজপুতদের ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। শেরশাহের ন্যায় পরাক্রান্ত সম্রাটকেও বিশেষ সতর্কতার সহিত রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল এবং ন্যায়-নীতি অনুযায়ী যুদ্ধ হইলে তিনি রাজপুতানায় সর্বত্র জয়ী হইতে সক্ষম হইতেন কিনা সন্দেহ। বিশেষ চেষ্টা করিয়াও শেরশাহ রাজপুত জাতির স্বাধীনতা বিনষ্ট করিতে পারেন নাই।

দূরদর্শী আকবর সিংহাসনারোহনের পরেই উপলব্ধি করিলেন যে তিনি যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতেছেন তাহাকে সার্থক করিতে হইলে রাজপুতদের বৈরিতা অপেক্ষা সহযোগিতা অধিকতর মূল্যবান। রাজপুতদের তেজস্বিতা বা সামরিক খ্যাতির কথা আকবরের অজ্ঞাত ছিল না—তিনি এই সমরপ্রিয় জাতিকে স্বীয় উচ্চাশার প্রতিবন্ধক না করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির সহায়করূপে লাভ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। দিল্লীর অধিপতির পক্ষে রাজপুতানায় প্রভুত্ব বিস্তার অপরিহার্য্য ছিল, রাজপুতগণ শত্রুভাবাপন্ন থাকিলে দিল্লীশ্বরের পক্ষে গুজরাট শাসন করা বা দাক্ষিণাত্যে সৈন্য প্রেরণ করা কঠিন হইত। সুতরাং আকবর স্বাধীনতাপ্রিয় রাজপুতদের স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট করার চেষ্টা না করিয়া অন্য উপায়ে তাহাদের মৈত্রী অর্জনের চেষ্টা করিলেন। আকবরের অপরাজেয় শক্তির কথা মনে করিয়া অধিকাংশ রাজপুত রাজাই স্বেচ্ছায় আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। কেহ কেহ মুঘল রাজপরিবারে কন্যা সম্প্রদান এবং মুঘল সম্রাটের অধীনে উচ্চপদ গ্রহণ করিয়া দরবারে উচ্চ শ্রেণীর ওমরাহগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। অম্বর (জয়পুর) মারবার (যোধপুর) বুন্দী, বিকানীর, যশল্মীর, সিরোহী, রণথম্ভোর, কালিঞ্জর প্রভৃতি একে একে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে। কেবলমাত্র মেবার আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিতে সম্মত না হওয়ায় আকবরকে মেবারের বিরুদ্ধে দণ্ডনীতি প্রয়োগ করিতে হয়। রাণা প্রতাপসিংহ সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর স্বদেশ রক্ষার জন্য মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। শেষ পর্য্যন্ত চিতোর দুর্গ মুঘলদের করায়ত্ত হয়। জীবিতকালে প্রতাপসিংহ মেবারের অন্য কয়েকটি দুর্গ মুঘলদের হস্ত হইতে পুনরধিকার করিতে সক্ষম হইলেও চিতোর হইতে তিনি মুঘলদিগকে বিতাড়িত করিতে পারেন নাই। যাহা হৌক আকবরের উদার-নীতির ফলে মেবার ব্যতীত অন্য রাজপুতগণ মুঘলদের শ্রেষ্ঠ মিত্ররূপে পরিণত হয় এবং তৈমুরশাহী সাম্রাজ্য বিস্তারের মূলে তাহারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আকবরকে

আকবরের উদারনীতি

সাহায্য করে। রাজপুতদের মধ্য হইতে আকবরের দরবারের গুণী সভাসদ, সেনাপতি, প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা রাজস্ব-ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করা হয়। মুঘল সাম্রাজ্যের অশ্বারোহী সৈন্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজপুতানা হইতে সংগৃহীত হইত।

আকবরের রাজপুত-নীতির পশ্চাতে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল এবং স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য তিনি কাহারও স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকুক ইহা মোটেই কামনা করেন নাই. সকলকেই অধীনতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আকবরের রাজপুতনীতির মধ্যে পূর্ববর্তী তুর্কী সুলতানগণ অপেক্ষা এইটুকু পার্থক্য ছিল যে আকবরের অনুগত হইয়া তাঁহার উদার নীতির গুণে কোন রাজপুত রাজাকেই 'কাফের' বলিয়া পূর্বে যে রাজনৈতিক হীনতা বা গ্লানি ভোগ করিতে হইত তাহার কিছুই করিতে হয় নাই। রাজনীতির ক্ষেত্রে আকবর সাম্রাজ্যের স্বার্থকে প্রধান করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া তিনি তাহার সঙ্গে ধর্মকে মিশ্রিত করেন নাই। গুণানুসারে রাজপুত বা মুসলমানের মধ্যে কোন বৈষম্য ছিলনা বলিয়া মানসিংহ, টোডরমল, রাজা বীরবল প্রভৃতি রাজপুতগণ সাম্রাজ্যের উচ্চতম পদের অধিকারী হইতে সক্ষম হইয়াছিল। ফলে রাজপুতগণ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম স্তম্ভরূপে পরিগণিত হয়।

আকবরের চরিত্র ঃ—আকবরের চরিত্রে বহুবিধ গুণের সমাবেশ হইয়াছিল। তিনি একাধারে নির্ভীক যোদ্ধা, প্রজাহিতৈষী ও ন্যায়পরায়ণ শাসক, যুগাতিগ উন্নত ভাবাদর্শের অধিকারী ও লোকচরিত্রাভিজ্ঞ ছিলেন। এই সমস্ত গুণের বিচারে আকবরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নরপতিদের সমতুল্য বলা যাইতে পারে। তিনি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ছিলেন, স্বভাব-নিষ্ঠুরতা তাঁহার ছিল না। আলাপ ব্যবহারেও তিনি অমায়িক ছিলেন। চরিত্র মাধুর্য্য ও উদারতার জন্য তিনি প্রজাদের আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রজাদের নিকট 'দিল্লীশ্বর' 'জগদীশ্বরে'র মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন।

ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট

নিরক্ষর হইলেও আকবর অশিক্ষিত ছিলেন না। তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞানপিপাসা ছিল। তাঁহার পাঠাগারে বহুমূল্যবান গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল; নিজের জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য বহু জ্ঞানী ও গুণী পণ্ডিতকে তাঁহার ইবাদৎ-খানায় আমন্ত্রণ করিতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শ্রবণ করিতেন। ললিতকলা, স্থাপত্যবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যায় আকবরের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল।

নিরক্ষর অথচ জ্ঞানপিপাসু

আকবর যে পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম কৃতী পুরুষ তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি

বিঘ্নসঙ্কুল সামান্যপরিমিত পিতৃরাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী রাজত্বকালের মধ্যে সেই ক্ষুদ্র রাজ্যটিকে প্রায় সমগ্র ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যে পরিণত করেন এবং বিবিধ শাসন নীতির প্রবর্তন করিয়া সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। বিবিধ বিরোধী শক্তির প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আকবরের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য দেড়শত বৎসরকাল স্থায়ী ছিল। এই সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের মূলে তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা অত্যাশ্চর্য্য ফল প্রদর্শন করিয়াছিল। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নরপতির সুশাসন ও ন্যায়নীতির উপর নির্ভর করে। ইহাই ছিল আকবর-অনুসৃত নরপতিত্বের মর্মকথা। আকবরের উদার ধর্মবোধ, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টা, শাসনদক্ষতা, রাষ্ট্রনৈতিক বিচক্ষণতা প্রভৃতি গুণাবলীই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।

আকবরের কৃতিত্ব

আকবরের শেষ জীবন ঃ—সম্রাট আকবরের শেষজীবন খুব সুখের হয় নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং এলাহাবাদ অধিকার করিয়া নিজেকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। আকবর পরামর্শের জন্য আবুল ফজলকে দাক্ষিণাত্য হইতে আহ্বান করিলেন। পথে আবুল ফজল সেলিমের নিযুক্ত লোকের হস্তে নিহত হইলেন। ইতিপূর্বে আকবরের অন্যতম সুহৃদ ফৈজীর মৃত্যু হইয়াছিল। এই সমস্ত ব্যাপারে আকবর অত্যন্ত মর্মাহত ও শোকগ্রস্ত হন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ মুরাদ মারা যান এবং ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ দানিয়াল অত্যধিক মদ্য পানের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ফলে আকবরের পরে সিংহাসনের জন্য সেলিম ব্যতীত আর কোন উত্তরাধিকারী রহিল না। ঐ বৎসরই আকবর সেলিমকে ক্ষমা করিয়া তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়া আকবর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বিয়োগ ব্যথা ও অন্যান্য দুঃখকর ব্যাপার

জাহাঙ্গীর (১৬০৫—১৬২৭) :—আকবরের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম 'নুরুদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজি' উপাধি গ্রহণ করিয়া নির্বিবাদে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা যুবরাজ খস্রুর বিদ্রোহ। আকবরের জীবিত অবস্থায়ই খস্রুকে সেলিমের পরিবর্তে সিংহাসনে বসাইবার জন্য এক ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে। খস্রুর মাতুল মানসিংহ এবং শ্বশুর আজিজ কোকা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। আকবরের মৃত্যুর পরে সেলিম সিংহাসনে আরোহণ করিলে সিংহাসন লাভের কোন আশা নাই দেখিয়া খস্রু বিদ্রোহ করিলেন এবং পাঞ্জাব

অভিমুখে অগ্রসর হইয়া লাহোর অধিকার করিলেন। শিখগুরু অর্জুন খস্রুকে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিদ্রোহ সফল হইল না। বাদশাহী সৈন্যের হস্তে খস্রু পরাজিত হইলেন এবং ধৃত হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় পিতার সম্মুখে আনীত হইলেন। খস্রুকে কারাগারে প্রেরণ করা হইল। খস্রুকে সাহায্য করার জন্য শিখগুরু অর্জুন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে আর একটি ষড়যন্ত্র হয়। এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল জাহাঙ্গীরকে হত্যা করিয়া খস্রুকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা। এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ অবগত হইয়া জাহাঙ্গীর চারিজন ষড়যন্ত্রকারী নায়ককে হত্যা করিয়া খস্রুর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করার আদেশ দেন।

জাহাঙ্গীর

সাম্রাজ্য বিস্তার ঃ—আকবরের ন্যায় জাহাঙ্গীরও সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণ করেন। আকবর সমগ্র রাজপুতানায় প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং চিতোর দুর্গও অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু মেবারের রাণা প্রতাপসিংহ মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। প্রতাপের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র অমরসিংহ মেবারের রাণা হন। তিনি পিতার ন্যায় দৃঢ়চিত্ত ও কষ্টসহিষ্ণু স্বদেশপ্রেমিক না হইলেও সহজে মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। সিংহাসনে আরোহণ করার পরে জাহাঙ্গীর দ্বিতীয় পুত্র পরভেজকে মেবারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত থাকে। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে মহাবৎ খাঁর নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার মেবারের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হয়। এই বারেও মুঘলদের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর তৃতীয় পুত্র খুররমকে মেবার অভিযানে প্রেরণ করেন। মুঘলদের অবরোধের ফলে মেবারে দুর্ভিক্ষ, মহামারী দেখা দেয়। ফলে অমরসিংহ সিংহ সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। এই সন্ধির শর্তানুসারে অমরসিংহ জাহাঙ্গীরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। মুঘল রাজসভায় উপস্থিত হইবার বা মুঘল পরিবারে কন্যাদানের সম্বন্ধে কোন বাধ্যবাধকতা তাঁহার উপর আরোপ করা হইল না। অতঃপর ঔরংজীবের রাজত্বের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত মেবার মুঘলদের সহিত মৈত্রী বজায় রাখিয়া চলিয়াছিল।

মেবারের বশ্যতা স্বীকার

আকবর আফঘান শক্তি বিনষ্ট করিয়া বঙ্গদেশে মুঘল প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাংলাদেশের কয়েকজন পরাক্রান্ত ভৌমিক এবং আফঘান ওমরাহ বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করিতেছিলেন। বারংবার বঙ্গদেশের সুবাদারের পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও তথায় মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছিল না। পরিশেষে ইসলাম খাঁ বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন এবং তাঁহারই কর্মকুশলতায় পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশ মুঘলদের আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

১০
বাংলাদেশে মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে অঞ্চলের রাভি ও শতদ্রুর পার্বত্য অঞ্চল তখনও স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছিল। এই অঞ্চলের কাংড়া-নগরকোটের পার্বত্য দুর্গটি প্রায় দুর্ভেদ্য ছিল। ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে দীর্ঘকাল অবরোধের পরে এই দুর্গ মুঘলদের অধীনে আসে এবং কাংড়া মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কাংড়া অধিকার

জাহাঙ্গীর দাক্ষিণাত্যে আকবরের রাজ্যবিস্তার নীতি গ্রহণ করেন। আকবরের সময় আহম্মদনগরের পতন হইলেও উক্ত রাজ্য সম্পূর্ণরূপে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। আহম্মদনগরের একাংশে মালিক অম্বর নামে জনৈক মন্ত্রীর পরিচালনায় নিজামশাহী বংশের একজন রাজপুত্র দ্বিতীয় মুর্ত্তজা নিজাম শাহ্ রাজত্ব করিতেছিলেন। আহম্মদনগর মুঘলদের অধীনে থাকায় মালিক অম্বর খরকাতে রাজধানী স্থাপন করেন। মালিক অম্বর প্রথম জীবনে হাবসী ক্রীতদাস ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কর্মভূমি দাক্ষিণাত্যকে মুঘলদের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। মালিক অম্বর সুদক্ষ শাসনকর্তা ও দূরদর্শী রাজনীতিক ছিলেন। তিনি আহম্মদনগরের ভূমিরাজস্ব ও করসংক্রান্ত বহুবিধ সংস্কার সাধন করেন। কেবলমাত্র বেতনভুক মুসলমান সৈন্যের দ্বারা মুঘল সৈন্যের গতিরোধ করা সম্ভবপর নহে ইহা উপলব্ধি করিয়া মালিক অম্বর মারাঠাগণকে লইয়া এক গেরিলা বাহিনীও গড়িয়া তোলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজের সহিত সন্ধি করেন। বাদশাহী সৈন্য বহু চেষ্টা করিয়া মালিক অম্বরকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইল না। শেষ পর্য্যন্ত ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ খুর্‌রমের হস্তে পরাজিত হইয়া মালিক অম্বর রাজ্যের একাংশ মুঘলদিগকে ছাড়িয়া দিলেন এবং বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা কর দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন (১৬১৭ খৃঃ)। খুর্‌রমের এই অভিযানে সাফল্যের জন্য জাহাঙ্গীর খুর্‌রম-কে

আহম্মদনগর

মালিক অম্বর

'শাহ্‌জাহান' বা 'জগতের সম্রাট' এই উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে মালিক অম্বর সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করিলে পুনরায় শাহ্‌জাহান মালিক অম্বরকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলেন এবং নূতন করিয়া মালিক অম্বরের সঙ্গে সন্ধি হয়। মালিক অম্বর যতদিন জীবিত ছিলেন, তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রতিবন্ধকতার জন্য ততদিন মুঘলগণ দাক্ষিণাত্য সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারে নাই। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে মালিক অম্বরের মৃত্যু হইলে এই বাধা দূরীভূত হয়। ক্রীতদাস হইলেও মালিক অম্বর বহুবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে, শাসনকার্যে, বিবেচনা শক্তিতে সর্বত্র তিনি অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁহার শাসন-দক্ষতায় দাক্ষিণাত্যের পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ দীর্ঘকালের জন্য স্থগিত ছিল ও তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন সুনামের সহিত রাজ্যশাসন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে মালিক অম্বরের পরাক্রমের ফলেই জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে মুঘল সাম্রাজ্য যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই।

পারস্যের সহিত সম্পর্ক

পারস্যের সহিত বিবাদে জাহাঙ্গীর বিশের সুবিধা করিতে পারেন নাই। পারস্যের শাহের সাহায্যদানের বিনিময়ে হুমায়ুন পারস্যরাজকে কান্দাহার অর্পণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য কান্দাহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইহা বিবেচনা করিয়া আকবর কান্দাহার হস্তগত করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পারস্যের শাহ আব্বাস কান্দাহার অধিকার করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। তিনি ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে একবার কান্দাহার অধিকার করিতে যাইয়া ব্যর্থ হন, অতঃপর ছলনার আশ্রয় লইয়া উহা অধিকারের জন্য চেষ্টা করেন। তিনি জাহাঙ্গীরের সহিত মিত্রতার ভাণ করেন এবং জাহাঙ্গীরের অন্যমনস্কতার সুযোগে ১৬২২ খৃষ্টাব্দে কান্দাহার অধিকার করেন। জাহাঙ্গীর কান্দাহার পুনরধিকারের জন্য শাহ্‌জাহানের অধীনে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু এই সময়ে সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া নানারূপ ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, সেইজন্য শাহ্‌জাহান রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া দূরে যাইতে সম্মত হইলেন না। ফলে কান্দাহারের পুনরুদ্ধার আর সম্ভবপর হইল না।

কান্দাহার মুঘলদের হস্তচ্যুত

জাহাঙ্গীরের পরে কে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবে তাহা লইয়া রাজ্যের মধ্যে নানাবিধ চক্রান্ত চলিতে থাকে। জাহাঙ্গীরের চারি পুত্র খসরু, পরভেজ, খুররম (শাহ্‌জাহান) ও শাহরিয়র এর মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু ইতিপূর্বেই লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। অবশিষ্ট তিন পুত্রের মধ্যে তৃতীয় শাহ্‌জাহানই যোগ্যতর ছিল। নুরজাহান তাঁহার প্রথম বিবাহজাতা কন্যার সহিত কনিষ্ঠ শাহরিয়রের বিবাহ

দিয়াছিলেন এবং জাহাঙ্গীরের পরে তাহাকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে যখন শাহজাহান কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য আদিষ্ট হইলেন, তখন কান্দাহার প্রেরণের পশ্চাতে নুরজাহানের কোন দুরভিসন্ধি আছে মনে করিয়া শাহ্‌জাহান বিদ্রোহী হইলেন। সেনাপতি মহাবৎ খাঁ ও পরভেজকে শাহ্‌জাহানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল। শাহ্‌জাহান পরাজিত হইয়া দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিলেন। পুনরায় পরভেজ ও মহাবৎ খাঁ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলে শাহজাহান বাধ্য হইয়া পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং পুত্র দারা ও ঔরংজেবকে প্রতিভূস্বরূপ পিতার নিকট রাখিলেন। জাহাঙ্গীর অনুতপ্ত শাহ্‌জাহানকে মার্জনা করিলেন।

শাহজাহানের বিদ্রোহ

শাহজাদা শাহজাহানের বিদ্রোহ দমনের গৌরব সেনাপতি মহাবৎ খাঁ র প্রাপ্য। মহাবৎ খাঁ-র প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া তাঁহার ক্ষমতা খর্ব করার জন্য নুরজাহান মহাবৎ খাঁ-কে রাজধানী হইতে সুদূর বঙ্গদেশে পাঠাইতে চাহিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য উপায়ে মহাবৎ খাঁ কে হেয় ও অপমানিত করার বন্দোবস্তও হইল। এই সমস্ত ব্যাপারে মহাবৎ খাঁ বুঝিলেন নুরজাহানের আক্রোশ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য বিদ্রোহ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। ঐ সময়ে জাহাঙ্গীর ও নুরজাহান লাহোর হইতে কাবুলে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে মহাবৎ খাঁ ঝিলাম নদীর তীরে অকস্মাৎ তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন। নুরজাহান বুদ্ধিকৌশলে সম্রাটকে ও নিজেকে মুক্ত করিলেন। মহাবৎ খাঁ ভীত হইয়া দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিলেন এবং তথায় শাহ্‌জাহানের সহিত মিলিত হইলেন।

মহাবৎ খাঁর বিদ্রোহ

ইহার অল্পকাল পরেই জাহাঙ্গীরের মৃত্যু ঘটিল (১৬২৭)। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খস্রু ও দ্বিতীয় পুত্র পরভেজ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। সুতরাং তৃতীয় পুত্র শাহ্‌জাহানই সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

নুরজাহান :—জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তাঁহার স্ত্রী নুরজাহানই রাজ্যের সর্ববিধ ব্যাপারে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের সহিত বিবাহের পূর্বে নুরজাহানের নাম ছিল মেহেরউন্নিসা। তাঁহার পিতা মির্জ্জা গিয়াস বেগ পারস্য হইতে আকবরের দরবারে আসিয়া উচ্চপদ লাভ করেন। মেহেরউন্নিসা অসামান্য রূপবতী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। সতেরো বৎসর বয়সে মেহেরউন্নিসার সহিত আলি কুলি শের আফ্‌গান নামে একজন ইরাণীয়ের বিবাহ হয়। শের আফ্‌গান বাংলাদেশের বর্দ্ধমানের জায়গিরদার ছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে শের আফগান স্বাধীনচেতা ও উদ্ধত

হইয়া উঠিলে জাহাঙ্গীর তাঁহাকে দমন করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন এবং জাহাঙ্গীরের প্রেরিত সৈন্যদলের হস্তে শের আফগান নিহত হন। বন্দিনী অবস্থায় মেহেরউন্নিসা দিল্লীতে প্রেরিত হয়। বিধবা হওয়ার চারি বৎসর বাদে জাহাঙ্গীর মেহেরউন্নিসাকে বিবাহ করেন। নুরজাহানের পিতা গিয়াস বেগ্ ইতিমদ্দৌলা নাম ধারণ করিয়া জাহাঙ্গীরের প্রধান মন্ত্রী হন এবং নুরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁ জাহাঙ্গীরের দরবারের প্রধান ওমরাহের পদ লাভ করেন। নুরজাহানের প্রথম বিবাহের কন্যার সহিত জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়রের এবং ভ্রাতা আসফ খাঁর কন্যা মমতাজমহলের (আর্জুমন্দবানু) সহিত জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র শাহ্জাহানের বিবাহ হয়। এইরূপে নুরজাহান জাহাঙ্গীরের পারিবারিক ও রাজনৈতিক জীবনে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। ১৬১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নুরজাহান মুঘল সাম্রাজ্য

নুরজাহান

পরোক্ষতঃ পরিচালনা করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র রূপলাবণ্যে নহে, বুদ্ধিমত্তায় তিনি অসামান্যা ছিলেন। জাহাঙ্গীরের জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নুরজাহান প্রকৃত প্রস্তাবে সাম্রাজ্যের পরিচালিকা ছিলেন। জাহাঙ্গীরের সহিত তাঁহার নাম মুদ্রায় মুদ্রিত হইত। কিন্তু ক্ষমতাপ্রিয়তা ও অহমিকার জন্য নুরজাহান বাদশাহী সাম্রাজ্যের যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হইয়াছিলেন। তাঁহার ষড়যন্ত্রের ফলে বিশ্বস্ত কর্মচারী মহাবৎ খাঁ বিদ্রোহী হন, শাহ্জাহান পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং তাঁহার চক্রান্তের পরিণামে কান্দাহার হস্তচ্যুত হয়। স্বীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য নুরজাহান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে দলগত বিরোধের সৃষ্টি করেন। এই দল উপদলের চক্রান্তের মধ্যে তাঁহার হস্ত ক্রীড়নক ও মদ্যাসক্ত জাহাঙ্গীরের পক্ষে কিছু উল্লেখযোগ্য কার্য্য করার উপায় ছিল না। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরে নুরজাহান ক্ষমতাচ্যুত হন। স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি প্রায় আঠারো বৎসর জীবিত থাকিয়া ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে মারা যান।

জাহাঙ্গীরের চরিত্র ও কৃতিত্ব :—জাহাঙ্গীরের চরিত্রে আকবরের ন্যায় বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ না হইলেও তিনি যে বুদ্ধিমান, সুকৌশলী এবং রাজ্যের দুরূহ সমস্যা-সমূহ বুঝিবার মত শক্তির অধিকারী ছিলেন সে সম্বন্ধে সকল ঐতিহাসিকই একমত।

তিনি স্বয়ং শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। ন্যায় বিচারের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য ছিল—যাহাতে রাজ্যের দীনতম প্রজাও তাঁহার নিকট আবেদন করিতে পারে, সেইজন্য একটি লৌহশৃঙ্খলে ৬০টি ঘণ্টা বাধা থাকিত। যে কোনও বিচারপ্রার্থী এই ঘণ্টা বাজাইলে সম্রাট তাঁহার অভিযোগ শ্রবণ করিতেন। তাঁহার চরিত্রে স্নেহ ও কোমলতার যথেষ্ট স্থান ছিল। পুত্রগণ বিদ্রোহী হইলেও তাঁহারা পিতার ক্ষমালাভে সমর্থ হইয়াছিল। নুরজাহানের প্রতি তাঁহার অনুরাগ আদর্শ স্থানীয় ছিল। নুরজাহানের প্রতি অত্যাসক্তি পরিণামে সাম্রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়াছিল। ইহা জাহাঙ্গীরের চরিত্রগত দুর্বলতারই পরিচায়ক। মদ্যাসক্তি তাঁহার চরিত্রের অন্যতম দুর্বলতা। ক্রমশঃ তিনি এত অত্যধিক মদ্যাসক্ত ও আরামপ্রিয় হইয়া পড়িলেন যে নুরজাহান ও আসফ খাঁ রাজ্যের সর্বেসর্বা হইয়া পড়িলেন।

চরিত্রের কোমলতা

ত্রুটি

জাহাঙ্গীরের প্রকৃত ধর্মমত কি ছিল তাহা বলা দুরূহ। সুন্নী ধর্মমতে তাঁহার আস্থা ছিল, কিন্তু কোন প্রকার গোঁড়ামি ছিল না। তিনি হিন্দু সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইলেও ধর্মোন্মাদনার প্রেরণায় মাঝে মাঝে অনুদার আচরণ করিতেন। বারাণসীর কয়েকটি অর্দ্ধ-নির্মিত হিন্দুমন্দির সম্পূর্ণ করার অনুমতি দেন নাই।

ধর্মমত

শিল্প ও সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি স্বয়ং চিত্রবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। তাঁহার আত্মজীবনী তুজুক-ই জাহাঙ্গিরী তাঁহার সাহিত্যিক শক্তির নিদর্শন।

অনেকে জাহাঙ্গীরের চরিত্রে বিপরীত গুণের সমাবেশ রহিয়াছে বলিয়া মনে করেন। তাঁহার চরিত্রে দোষ ও গুণ উভয়ই চরম সীমায় দেখা যাইত। ঐতিহাসিক বেভারিজ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—যিনি জীবন্ত লোকের গাত্রচর্ম উৎপাটিত করার দৃশ্য দর্শন করিতে পারিতেন, তিনি আবার ন্যায়বিচারের অনুরাগী ছিলেন এবং বৃহস্পতিবারে সায়াহ্ন ধর্মালোচনায় অতিবাহিত করিতেন। তিনি হিন্দু সাধু সন্ন্যাসীকে শ্রদ্ধা করিতেন; আবার তিনিই আজমীঢ়ের হিন্দুর বরাহ অবতারের মূর্তি ভগ্ন করিয়া জলে ফেলিবার আদেশ দিয়াছিলেন। শেষ বয়সে অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলেই সম্ভবতঃ তাঁহার চরিত্রে এই পরস্পরবিরোধী গুণের সমাবেশ হইয়াছিল।

চরিত্রে স্ববিরোধী গুণের বিকাশ

শাহ্‌জাহান (১৬২৮—১৬৫৯):—জাহাঙ্গীরের মৃত্যুকালে শাহ্‌জাহান দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। তাঁহার শ্বশুর আসফ খাঁ শাহ্‌জাহানের সিংহাসন লাভের পথ

প্রশস্ত রাখিবার জন্য সাময়িকভাবে মৃত খস্রুর পুত্র দাওয়ার বক্সকে সিংহাসনে বসাইলেন। নুরজাহান লাহোরে থাকিয়াই জামাতা শাহরিয়রকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। মৃত দানিয়ালের এক পুত্র শাহরিয়রের পক্ষ সমর্থন করিল। আসফ খাঁ সসৈন্যে লাহোর অবরোধ করিয়া অযোগ্য শাহরিয়রকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। শাহরিয়রের চক্ষুদ্বয় নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। ইতিমধ্যে শাহ্‌জাহান দ্রুত দাক্ষিণাত্য হইতে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্য হইতেই শাহ্‌জাহান সিংহাসনের প্রতিপক্ষগণকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে অপসৃত করার জন্য আসফ খাঁর নিকট নির্দেশ প্রেরণ করিলেন। আসফ খাঁ জামাতার সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার জন্য শাহ্‌জাহানের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেন। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শাহ্‌জাহান রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। দাওয়ার বক্সকে বন্দী করা হইল। পরে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইলে তিনি পারস্যে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। সিংহাসন লাভের সাহায্যের পুরস্কারস্বরূপ আসফ খাঁ ও মহাবৎ খাঁকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। নুরজাহানের প্রতি শাহ্‌জাহান সদয় আচরণ করিলেন। তাঁহার ভরণপোষণের জন্য বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল।

শাহ্‌জাহান

বুন্দেলা-সর্দ্দার ঝুঝার সিংহ ও খানজাহান লোদীর বিদ্রোহ দমন

বিদ্রোহ দমন:—রাজত্বের প্রথম দিকে শাহ্‌জাহানকে বুন্দেলখণ্ডের সর্দার ঝুঝার সিংহের ও দাক্ষিণাত্যের সুবেদার খানজাহান লোদীর বিদ্রোহ দমনে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল। ঝুঝার সিংহের বিদ্রোহ অতি দ্রুত দমন করা হয়, কিন্তু খানজাহান লোদীকে দমন করিতে প্রায় তিন বৎসর লাগিয়াছিল

এতদ্ব্যতীত পর্টুগীজদের অত্যাচার হইতে দেশকে রক্ষা করার জন্য পর্টুগীজদের বিরুদ্ধেও অভিযান প্রেরণ করার প্রয়োজন হইল। পর্টুগীজরা দিল্লীর সম্রাটের অনুমতি বলে বঙ্গদেশের হুগলীতে বাণিজ্যকুঠি নির্ম্মাণ করিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছিল। কিন্তু পর্টুগীজরা শান্তভাবে বাণিজ্যাদি করার লোক ছিল না। তাহারা বে-আইনীভাবে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া বাদশাহী আয়ের ক্ষতি করিতে লাগিল। উপরন্তু তাহারা হিন্দু ও মুসলমান বালক-বালিকাদিগকে

বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া খৃষ্টান করিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহাদের স্পর্দ্ধা সীমা অতিক্রম করিল;—তাহারা সাম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের দুইটি ক্রীতদাসী বালিকাকে আটক করিল। এই সকল ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে শাহজাহান পর্টুগীজদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া অবিলম্বে কাশিম খাঁ কে বাংলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া তাহার উপর পর্টুগীজদের দমনের ভার অর্পণ করিলেন। বাদশাহী সৈন্য হুগলী অধিকার করিয়া বহু পর্টুগীজকে নিহত করিল এবং চারি সহস্র পটুগীজ বন্দী অবস্থায় আগ্রায় নীত হইল। এই শিক্ষার ফলে পটুগীজরা আর ভবিষ্যতে কোনও উপদ্রব করিতে সাহস করে নাই।

পর্টুগীজ দমন

দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তার ঃ—শাহজাহান তাঁহার পিতা ও পিতামহের ন্যায় সাম্রাজ্যবিস্তারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কিয়দংশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে মুঘল আধিপত্য বিস্তারের জন্যই শাহজাহানের রাজত্বকাল বিখ্যাত।

আকবর কেবলমাত্র খান্দেশ এবং বেরারের কিয়দংশ দখল করিয়াছিলেন। মালিক অম্বরের বিরোধিতার ফলে জাহাঙ্গীরের সময় আহম্মদনগর অধিকারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশিষ্ট বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা স্বাধীনভাবে স্ব স্ব অস্তিত্ব রাখিয়াছিল। সুতরাং দাক্ষিণাত্যে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজ বহুলাংশেই অসমাপ্ত ছিল। শাহজাহান প্রথমে আহম্মদনগরের আভ্যন্তরীণ বিবাদের সুযোগে আহম্মদনগর অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। আহম্মদনগরের সুলতান নিজাম উল মুল্কের সহিত মন্ত্রী মালিক অম্বরের পুত্র ফতে খাঁর বিরোধ চলিতেছিল। উচ্চাভিলাষী ফতে খাঁ মুঘলদের সহিত গোপনে মৈত্রীবদ্ধ হইয়া সুলতানকে হত্যা করিলেন। অতঃপর ফতে খাঁ সুলতানের নাবালক পুত্র হুসেন খাঁকে বসাইয়া তাহার নামে রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। অচিরেই ফতে খাঁ-র সহিত মুঘলদের বিরোধ বাধিল। প্রথমে ফতে খাঁ মুঘল সৈন্যকে বাধা দেন পরে দশলক্ষ মুদ্রা উৎকোচের বিনিময়ে দৌলতাবাদ দুর্গ মুঘলদের হস্তে সমর্পণ করেন। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে আহম্মদনগরের স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হইয়া ইহা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

আহম্মদনগর অধিকার

অতঃপর শাহজাহান বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মুঘল সৈন্যদের উদ্যোগ আয়োজন দেখিয়া গোলকুণ্ডার সুলতান আবদুল্লা শাহ ভীত হইলেন এবং শাহজাহানের সার্বভৌমত্ব মানিয়া সম্রাটকে বাৎসরিক কর দিতে, সম্রাটের নামে মুদ্রা প্রচলন করিতে এবং খুত্‌বা পাঠ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

গোলকুণ্ডার আনুগত্য স্বীকার

কিন্তু বিজাপুরের সুলতান বিনা যুদ্ধে মুঘলদের আনুগত্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেন না। মুঘল সৈন্য তিন দিক হইতে বিজাপুর আক্রমণ করিলে; বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহ প্রাণপণে বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন। পরিশেষে উভয় পক্ষ ক্লান্ত হইয়া সন্ধির দ্বারা যুদ্ধ সমাপ্ত করিলেন। আদিল শাহ সম্রাটের সার্বভৌম অধিকার স্বীকার করিলেন; বিজাপুরের অখণ্ডতা বজায় রহিল, উপরন্তু বিজাপুর আহম্মদনগর রাজ্যের পঞ্চাশটি পরগণা প্রাপ্ত হইল। শাহজাহান তৃতীয় পুত্র ঔরংজেবকে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের সুবাদার নিযুক্ত করিলেন।

বিজাপুরের আনুগত্য স্বীকার

মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত দাক্ষিণাত্যের রাজস্ব ও শাসনবিষয়ক নানাবিধ সংস্কার সাধন করিয়া ঔরংজেব যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ঔরংজেব বিজাপুর ও গোলকুণ্ডাকে সাম্রাজ্যভুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। গোলকুণ্ডার নিকট হইতে প্রাপ্য কর অনেক বাকী পড়িয়াছিল। এদিকে গোলকুণ্ডার সুলতান আব্দুল্লা কুতুবশাহের সহিত তাঁহার মন্ত্রী মীরজুমলার বিরোধ চলিতেছিল। মীরজুমলা স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঔরংজেবের শরণাপন্ন হইলেন। ঔরংজেব সম্রাটের নির্দেশের অপেক্ষা না রাখিয়াই নিজের দায়িত্বে গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিলেন (১৬৫৬)। মুঘল বাহিনী গোলকুণ্ডার রাজধানী হায়দ্রাবাদ অধিকার করিল। সুলতান কুতুবশাহ অনন্যোপায় হইয়া দারাশিকোর শরণাপন্ন হইলেন। শাহজাহান দারা ও কন্যা জাহানারার অনুরোধে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য ঔরংজেবকে নির্দেশ দিলেন। ঔরংজেব নিশ্চিত জয়লাভের গৌরব হইতে বঞ্চিত হইলেন। মুঘলরা দশ লক্ষ টাকা এবং বনগীর অঞ্চল ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রাপ্ত হইল। মীরজুমলা ঔরংজেবের অনুরোধে মুঘলদের অধীনে উচ্চপদ লাভ করেন।

গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে যুদ্ধ

সন্ধি

অত্যল্পকাল পরে ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের সুলতানের মৃত্যু হইলে উত্তরাধিকার লইয়া বিরোধ আরম্ভ হইল। এই সুযোগে ঔরংজেব তাঁহার প্রিয়পাত্র মীরজুমলার সাহায্যে বিজাপুর আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এবারও দারাশিকোর প্রভাবে শাহজাহান যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দিলেন। বিজাপুর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রচুর অর্থ এবং বিদর, কল্যাণী ও পরেন্দা মুঘলদিগকে ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিল।

বিজাপুর আক্রমণ

সন্ধি

শাহজাহানের দাক্ষিণাত্য নীতি সার্থক হইলেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও মধ্য-এশিয়া সম্পর্কে তাঁহার নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। তিনি পারস্যরাজের প্রতিনিধিকে

উৎকোচে বশীভূত করিয়া কান্দাহার অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে পারস্যরাজ পুনরায় কান্দাহার অধিকার করিলেন। অতঃপর শাহ্‌জাহান প্রচুর অর্থ ও সৈন্য ক্ষয় করিয়াও কান্দাহার মুঘলদের অধীনে আনিতে সমর্থ হইলেন না। এতদ্ব্যতীত শাহ্‌জাহান মধ্য-এশিয়ায় অবস্থিত স্বীয় পূর্বপুরুষদের বাসস্থান বালখ্‌ ও বদাক্‌সান পুনরুদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করেন। ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে শাহ্‌জাদা মুরাদ ও সেনাপতি আলি মর্দান খাঁ সাময়িকভাবে ঐ দুইটি স্থান অধিকার করেন। কিন্তু ঐ অঞ্চলের স্বাধীনতাপ্রিয় উজবেকদের প্রতি-আক্রমণের ফলে মুঘল বাহিনীকে বালখ্‌ ও বদাক্‌সান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে হয়। দুই বৎসরব্যাপী এই অভিযানে চারি কোটি মুদ্রা ব্যয়িত ও অসংখ্য লোকক্ষয় হয়। এতদ্ব্যতীত পাঁচ লক্ষ টাকার খাদ্যশস্য পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হয়।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও মধ্য-এশিয়া সংক্রান্ত নীতির ব্যর্থতা

গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষ :—শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালের চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসরে গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই শোচনীয় দুর্ভিক্ষের বিবরণ দরবারী ঐতিহাসিক আবদুল হামিদ লাহোরীর রচনায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। "এক টুকরা রুটির বিনিময়ে মানুষ আত্ম-বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু খরিদ্দার জুটিত না; খাদ্যের অভাবে মানুষ মানুষের মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল; পুত্রস্নেহ অপেক্ষা পুত্রের মাংস অধিক লোভনীয় ছিল। মৃতদেহের স্তূপের জন্য রাজপথে যাতায়াত কষ্টকর হইয়াছিল।" এই সকল দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালের ঐশ্বর্য্য-সমারোহকে ম্লান করিয়া দিয়াছিল।

শাহ্‌জাহানের শেষ জীবন: উত্তরাধিকার লইয়া পুত্রগণের মধ্যে বিরোধ :—১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে শাহ্‌জাহান অসুস্থ হইয়া পড়েন। ফলে সিংহাসনের অধিকার লইয়া চারিপুত্রের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। শাহ্‌জাহানের চারিপুত্র দারাশিকো, সুজা, ঔরংজেব ও মুরাদ এবং দুই কন্যা জাহানারা ও রোশনারা। পুত্রদের মধ্যে সকলেই মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের ভারপ্রাপ্ত শাসক ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার মধ্যে তারতম্য ছিল। জ্যেষ্ঠ দারাশিকো শাহ্‌জাহানের সর্বাধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং দারাই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন, ইহাই পিতার অভিপ্রায় ছিল। দারা পাঞ্জাব, এলাহাবাদ ও মুলতানের শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু তিনি রাজধানীতে পিতার নিকট থাকিয়া প্রতিনিধির সাহায্যে ঐ সমস্ত প্রদেশ শাসন করিতেন। দারা স্বয়ং বিদ্বান,

শাহ্‌জাহানের চারি পুত্র

বিদ্যোৎসাহী ও ধর্ম সম্বন্ধে উদার মতাবলম্বী ছিলেন। উপনিষদ, বাইবেল ও সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত লেখকদের রচনার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি হিন্দু পণ্ডিতদের সাহায্যে ফার্সী ভাষায় অথর্ববেদ এবং উপনিষদের অনুবাদের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইত্যবস্থায় গোঁড়া মুসলমানদের নিকট তিনি অপ্রিয় ছিলেন। তবে শাহ্‌জাহানের অতিরিক্ত স্নেহ ও প্রশ্রয়ের ফলে দারা শাসনকার্য্য ও সৈন্যপরিচালনার অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। দারার রাজনৈতিক বুদ্ধি তেমন তীক্ষ্ণ ছিল না বলিয়া যুবরাজের বিপদ ও দায়িত্ব সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন না।

দারাশিকো

দ্বিতীয় পুত্র সুজা বাংলা দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে সুজাই যোগ্যতম ছিলেন। দারার দাক্ষিণ্য ও চরিত্রমাধুর্য্য, ঔরংজেবের বাস্তবজ্ঞান, ব্যবহারিক বুদ্ধি, শৌর্য্য ও শাসনক্ষমতার সমাবেশ তাঁহার মধ্যে ছিল অথচ কোন প্রকার গোঁড়ামি, ভণ্ডামি কিংবা সহজাত দুষ্টবুদ্ধি তাঁহার ছিল না। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের সতেরো বৎসর একটানা নিরুপদ্রব সুবেদারির ফলে সুজার রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিভা পঙ্গু ও মলিন হইয়া পড়িয়াছিল। বাংলাদেশের জলবায়ুর গুণে তিনি বিলাসী ও আরাম-প্রিয় হইয়া গিয়াছিলেন। শরাব ও নর্ত্তকী লইয়াই তিনি পরমানন্দে কালাতিপাত করিতেন।

সুজা

তৃতীয় পুত্র ঔরংজেব ভ্রাতৃগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী, কূটনীতিজ্ঞ, মাত্রাজ্ঞান সম্পন্ন ও দুরদর্শী ছিলেন। সরল জীবন যাত্রা, সৌজন্য ও প্রিয়ভাষিতা এবং ইসলাম ধর্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় ঔরংজেব প্রথম হইতেই মুসলমানদের প্রিয়পাত্র 'জিন্দাপীর' (জীবিত সাধু) ছিলেন। লক্ষ্য সম্বন্ধে ঔরংজেবের ধারণা স্পষ্ট ছিল এবং লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য মনে, কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রাখিতেন না।

ঔরংজেব

সর্ব্বকনিষ্ঠ মুরাদ সাহসী ও শক্তিশালী ছিলেন; চিন্তা-ভাবনা, ভয় ও কপটতা, সংযম-ধর্মনিষ্ঠা প্রভৃতি তাঁহার ছিল না। কিন্তু মদ্য ও নারী সম্বন্ধে সুজার মত তাঁহার যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল এবং এই দোষের জন্যই তাঁহার অন্য গুণাবলী তেমন বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই।

মুরাদ

কন্যাদ্বয়ের মধ্যে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের সময়ে জাহানারা পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এবং রৌশনারা ঔরংজেবের পক্ষপাতী ছিলেন।

কন্যাদ্বয়

শাহ্‌জাহানের অসুস্থতার সময়ে তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে একমাত্র দারাশিকোই আগ্রায় সম্রাটের নিকট ছিলেন; সুজা বঙ্গদেশে, ঔরংজেব দাক্ষিণাত্যে এবং মুরাদ গুজরাটে ছিলেন। পিতার অসুস্থতার সংবাদে অপর তিন ভ্রাতা মনে করিল সম্রাট

জীবিত নাই—দারা নির্বিবাদে সিংহাসনে বসার জন্য সম্রাটের মৃত্যু সংবাদ গোপন করিতেছেন। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তিন ভ্রাতাই সিংহাসন অধিকার করার জন্য সসৈন্যে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সুজা ও মুরাদ ইতিমধ্যে নিজেদের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সুচতুর ঔরংজেব মালবের নিকট মুরাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। স্থির হইল উভয়ে একযোগে দারা ও সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন এবং যুদ্ধজয়ের পরে সাম্রাজ্য উভয়ে বণ্টন করিয়া লইবেন।

সুজার পরাজয়

পুত্রগণের রাজধানী অভিমুখে আগমনের সংবাদ পাইয়া শাহজাহান দারার পুত্র সুলেমান ও জয়সিংহকে সুজার বিরুদ্ধে এবং যশোবন্ত সিংহ ও কাশিম খাঁকে মুরাদ ও ঔরংজেবের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কাশীর নিকটে সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর নিকট পরাজিত হইয়া সুজা বঙ্গদেশে ফিরিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে ঔরংজেব ও মুরাদের সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে ধর্মাটের রণক্ষেত্রে সম্রাটের প্রেরিত সৈন্যদলের তুমুল যুদ্ধ হইল। রাজপুতগণ যশোবন্ত সিংহের নেতৃত্বে প্রাণপণে যুদ্ধ করিল, কিন্তু অপর সেনাপতি কাশিম খাঁ সৈন্যদল সহ এক প্রকার নিষ্ক্রিয় থাকাতে ঔরংজেব ও মুরাদ জয়ী হইলেন। বিজয়ী ঔরংজেব ও মুরাদের সৈন্যবাহিনী আগ্রার অভিমুখে অগ্রসর হইলে প্রায় অর্দ্ধলক্ষ সৈন্যসহ দারা সামুগড়ে ঔরংজেব ও মুরাদকে বাধা দিলেন।

ধর্মাটের যুদ্ধ

সামুগড়ের যুদ্ধে দারার জয়লাভ প্রায় যখন সুনিশ্চিত সেই সময়ে অকস্মাৎ দারার হস্তী তীরবিদ্ধ হওয়াতে তিনি হস্তীপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া অশ্বারোহণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ দারার হস্তীর হাওদা শূন্য দেখিয়া তিনি নিহত হইয়াছেন; ইহা ভাবিল, এবং ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইল। ফলে ঔরংজেব ও মুরাদ এই যুদ্ধে জয়ী হইলেন। পরাজিত দারা পাঞ্জাবে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঔরংজেব অবিলম্বে আগ্রায় উপস্থিত হইয়া আগ্রাদুর্গ অবরোধ করিলেন।

সামুগড়ের যুদ্ধ

বৃদ্ধ শাহজাহানের সমস্ত প্রতিরোধ ও আপোষরফার প্রস্তাব নিষ্ফল করিয়া ঔরংজেব আগ্রার দুর্গ অধিকার করিলেন এবং শাহজাহানকে বন্দী করিলেন। আগ্রা হইতে ঔরংজেব দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন ও পথে মথুরার সন্নিকটে কৌশলে মুরাদকে বন্দী করিয়া গোয়ালিয়র দুর্গে আটক রাখিলেন। তিন বৎসর বাদে এক হত্যাকাণ্ডের মিথ্যা অপরাধে তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

মুরাদের কারাদণ্ড ও মৃত্যু

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সুজা কাশীর নিকটে দারার পুত্র সুলেমানের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। অতঃপর ধর্মাট ও সামুগড়ের যুদ্ধে দারার পরাজয়ের ফলে সুলেমান আর সুজার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ইত্যবসরে সুজা পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া শক্তিবৃদ্ধি করিলেন। ঔরংজেব আগ্রা অধিকার করিয়া সুজার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং খাজুয়ার যুদ্ধে সুজাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। অতঃপর সেনাপতি মীর জুম্‌লা সুজার পশ্চাদ্ধাবন করেন। সুজা বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া আরাকান অঞ্চলে পলায়ন করেন। সম্ভবতঃ সুজা আরাকানেই সপরিবারে নিহত হন।

খাজুয়ার যুদ্ধ ও সুজার পরাজয়

দারার পরাজয়ের পরে তাঁহার পুত্র সুলেমান শিকো গাড়োয়ালের হিন্দু রাজার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। গাড়োয়ালের রাজকুমার সুলেমানকে ঔরংজেবের হস্তে সমর্পণ করেন। তাঁহাকে গোয়ালিয়রের দুর্গে আটক রাখা হয় এবং বিষ প্রয়োগের ফলে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দারার পুত্র সুলেমানের মৃত্যু

সামুগড়ের যুদ্ধে পরাজয়ের পরে দারা কিছুকাল বিভিন্ন স্থানে পলায়ন করিয়া বেড়াইলেন। অবশেষে শেষ চেষ্টা হিসাবে দারা কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দেওরাই-এর গিরিবর্ত্মে ঔরংজেবের সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধেও পরাজিত হইয়া তিনি কান্দাহারের পথে পারস্যে পলায়নের চেষ্টা করেন। পথিমধ্যে দাদারে জনৈক আফগান-সর্দারের আতিথ্য গ্রহণ করেন। দারার আশ্রয়দাতা তাঁহাকে ঔরংজেবের হস্তে সমর্পণ করেন। বন্দী দারার লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতনের অবধি রহিল না। পরিশেষে ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে দারা মোল্লাদের বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

দারার তৃতীয় বার পরাজয়

দারার প্রাণদণ্ড

এই ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতৃত্রয় পৃথিবী হইতে অপসৃত হইলে, ঔরংজেবের সিংহাসন নিরাপদ হইল। বৃদ্ধ শাহ্‌জাহানকে আট বৎসরকাল আগ্রার দুর্গে বন্দীজীবন যাপন করিতে হয়। বন্দীদশায় তাঁহাকে বহু দুঃখ দুর্দশা সহ্য করিতে হইয়াছিল। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ৭৪ বৎসর বয়সে শাহ্‌জাহানের মৃত্যু হয়।

শাহ্‌জাহানের মৃত্যু

শাহ্‌জাহানের চরিত্র ও আড়ম্বরপ্রিয়তা:—স্যার টমাস রো, বার্নিয়ার, টেরি প্রভৃতি ইউরোপীয় লেখকগণের মতে শাহ্‌জাহান অত্যন্ত স্বভাবনিষ্ঠুর ও ব্যসনপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু ইহাদের এই বর্ণনা সর্বাংশে সত্য নহে। শাহ্‌জাহানের চরিত্রের মধ্যে কর্মপ্রচেষ্টা, উদ্যম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বহু সদ্‌গুণের সমাবেশ হইয়াছিল। সিংহাসনারোহণের প্রাক্কালে কয়েকটি নিষ্ঠুর কার্য্য তাঁহার চরিত্রকে কলঙ্কিত করিয়াছিল

সত্য, কিন্তু পরে নিষ্ঠুরতার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এতদ্ব্যতীত পারিপার্শ্বিক অবস্থা'র বিচার করিলে শাহ্‌জাহানকে বিশেষ দোষী করা যায় না। নিজেকে বাঁচিতে হইলে শাহ্‌জাহানের পক্ষে অপরকে বাঁচাইয়া রাখার কোন উপায় ছিল না। তিনি যে নুরজাহানের চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচায়ক। তাঁহার হৃদয়ে স্নেহ মমতারও যথেষ্ট স্থান ছিল। তাঁহার অপত্যস্নেহ ও আদর্শ পত্নীপ্রেম অতুলনীয়। প্রিয়তমা মহিষী মমতাজমহলের প্রতি ভালবাসাকে অমর করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার স্মৃতি-মন্দির তাজমহলকে জগতের অদ্বিতীয় বিস্ময়রূপে নির্মাণ করেন। তাঁহার অতিরিক্ত পুত্রবাৎসল্যই তাঁহার শোচনীয় পরিণামের জন্য দায়ী। শাহ্‌জাহান পিতামহ আকবরের মত নিরক্ষর ছিলেন না। আরবী, ফার্সী ও হিন্দীতে তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। তিনি গুণীজনের সমাদর করিতে জানিতেন এবং প্রকৃত গুণীকে অর্থ, জায়গীর ও উপাধিদানে পুরস্কৃত করিতেন। রাজ্যবিস্তার, গুণীর সমাদর, সাম্রাজ্যের রূপ-সজ্জা, শাসনকার্য্যে পরিশ্রম ইত্যাদি সর্ববিষয়ে শাহ্‌জাহান পিতামহকে প্রশংসনীয় ভাবে অনুকরণ করিয়াছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে আকবরকেও হার মানাইয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। ধর্মসম্বন্ধে শাহ্‌জাহান পিতা-পিতামহের মত উদার ছিলেন না—বরঞ্চ তিনি নীতিগতভাবে হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। বুন্দেলা বিদ্রোহ দমনের সময়ে তাঁহার নৃশংস ধর্মান্ধতা প্রকট হইয়াছিল। পর্টুগীজদের সম্বন্ধে আচরণেও তাঁহার ধর্মান্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সময়ে হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলে পুরস্কৃত হইত। শাহ্‌জাহানের আদেশে কাশীতে ৭৬টি হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়া ফেলা হয়।

সাময়িক নিষ্ঠুরতা দ্বারা কলঙ্কিত

পত্নীপ্রেম ও স্নেহমমতা

বিদ্বান্ ও সৌন্দর্য্যানুরাগী

ধর্মসম্বন্ধে অসহিষ্ণু

মমতাজমহল

শাহ্‌জাহানের বৈভব ও আড়ম্বরপ্রিয়তা তাঁহার রাজত্বকালকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। টাভার্নিয়ার বার্নিয়ার প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকগণ শাহ্‌জাহানের দরবারের জাঁকজমক ও ঐশ্বর্য্য এবং তৎকর্তৃক নির্মিত সৌধাবলী দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। শাহ্‌জাহানের সময়ে মুঘল স্থাপত্যের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটিয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে নির্মিত সৌধগুলিতে হিন্দো-পারসিক রীতির ছাপ পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার উদ্যোগে আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, কাবুল, কাশ্মীর, কান্দাহার, আজমীর, আহম্মদাবাদ প্রভৃতি শহরে সুরম্য প্রাসাদ, দুর্গ, মসজিদ ও উদ্যান সমূহ নির্মিত হয়। শাহ্‌জাহানের সময়ে নির্মিত আগ্রার দুর্গের অভ্যন্তরস্থিত শীশমহল, খাসমহল, মতিমহল প্রভৃতি সৌধাবলী অদ্যাপি উপভোগ্যরূপে দর্শনীয়। শাহ্‌জাহানাবাদের দিইওয়ান-ই-খাস ও দিইওয়ান-ই-আম স্থাপত্য সৌন্দর্য্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। দিল্লীর জামি মসজিদ ও আগ্রার মতি মসজিদ দুইটিই শিল্পরীতি ও ঐশ্বর্য্যের দিক দিয়া অনবদ্য সৃষ্টি।

বিভিন্ন সৌধ
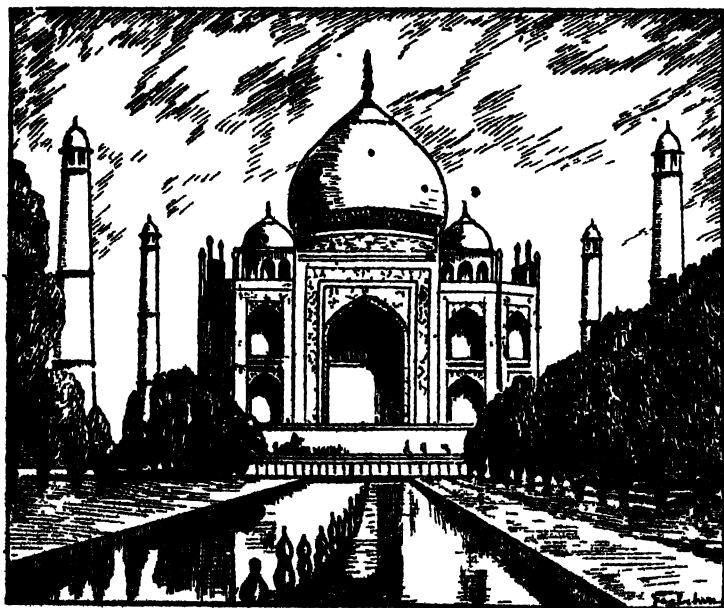
তাজমহল—আগ্রা

শাহ্‌জাহানের স্থাপত্য সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি তাজমহল। তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী আজামন্দ বানুর (মমতাজমহল নামে পরিচিত) স্মৃতিরক্ষার্থে এই সমাধি মন্দির নির্মিত হয়। পৃথিবী-বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসনও শাহ্‌জাহানের অন্যতম কীর্তি। আট কোটি টাকা ব্যয়ে এই রাজসিংহাসন গঠিত হয়। পারস্যরাজ নাদির শাহ ভারত আক্রমণ কালে এই সিংহাসন পারস্যে লইয়া যান (১৭৩৯ খ্রীঃ)।

তাজমহল।

ময়ূর সিংহাসন

শাহজাহানের রাজত্বকালের সমালোচনা:—শাহ্‌জাহানের ত্রিশ বৎসরব্যাপী রাজত্বকাল মুঘল সাম্রাজ্যের চরম উন্নতির সময় বলিয়া বিবেচিত হয়। তাঁহার রাজত্বকালের প্রথমভাগে উত্তরাধিকারের বিসম্বাদ, বুন্দেলা ও খাঁ জাহান লোদীর বিদ্রোহ ব্যতীত অন্য কোন বিদ্রোহ বা কোন প্রকার আভ্যন্তরীণ অশান্তির ছায়াপাত হয় নাই। এই সময়ে ভারতের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্য সম্পর্ক ঘনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। এই বাণিজ্য ব্যাপারে ভারতের পণ্যই রপ্তানী হইত এবং রাজকোষে প্রচুর অর্থাগম হইত। এই দীর্ঘকালের মধ্যে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য কোনও বহিঃশক্রর দ্বারা আক্রান্ত হয় নাই—মাত্র কান্দাহার পারসিকদের হস্তগত হইয়াছিল। কান্দাহার বা মধ্য এশিয়ায় মুঘল সৈন্যের পরাজয় ঘটিলেও সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ইহার কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয় নাই। সংস্কৃতি, শিল্পকলা, স্থাপত্য-রীতি ও সৌধনির্মাণ কুশলতা উন্নতির অত্যাশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিল। জগতে অতুলনীয় তাজ, মতি মসজিদ, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, জামি মসজিদ, ময়ূর সিংহাসন প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টিসমূহ মুঘলদের ঐশ্বর্য্যকে সহস্র ছটায় বিকশিত করিল।

গৌরবের উচ্চ শীর্ষে উঠিয়াছিল

কিন্তু শাহজাহানের রাজত্বের এত ঐশ্বর্য্য ও সমারোহের মধ্যেই মুঘল সাম্রাজ্যের দৌর্বল্যের চিহ্ন বর্তমান ছিল বলিয়া বহু ঐতিহাসিক মনে করেন। বিভিন্ন দিক দিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের সৌভাগ্যরশ্মি ম্লান হইয়া আসিতেছিল। মুঘলদের সামরিক শক্তি যে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল তাহা কান্দাহার অভিযানের ব্যর্থতার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। শাহ্‌জাহানের রাজত্বের সময়ের জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা শিবাজীর অভ্যুদয় হয়। অর্থনীতির দিক দিয়াও সাম্রাজ্যের অবস্থা খুব উৎসাহপ্রদ ছিল না—আপাতদৃষ্ট না হইলেও সমকালীন ইউরোপীয় পর্য্যটকদের মতে নানা কারণে প্রজাদের আর্থিক অবস্থার অধোগতি হইতেছিল। বাদশাহী শাসনযন্ত্র, সৈন্যবাহিনীর গুরুভার ও

নানা দিক দিয়া দৌর্বল্যের চিহ্ন

ব্যয়বহুল হর্ম্যাবলীর নির্মাণকার্য্য সমস্তই কৃষক ও শিল্পীকুলের উপর করভার চাপাইয়া নির্বাহিত করা হইত। প্রজারা কর সামর্থ্যের প্রায় ন্যূনতম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। তদুপরি প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণের অযথা উৎপীড়ন ছিল। পক্ষান্তরে কৃষি ও শিল্পের ব্যাপক উন্নতির কোন প্রচেষ্টাই হয় নাই। মুঘল সাম্রাজ্যের আর্থিক অবনতির সূচনা শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালেই হয়। পরিণামে ঔরংজেবের সময়ে সাম্রাজ্য নিশ্চিত অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হয়। যে হিন্দু বিদ্বেষিনীতি উত্তরকালে ঔরংজেবের রাষ্ট্রশাসনের মূলনীতি হয় এবং যাহা মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের অন্যতম কারণ তাহার পূর্বাভাসও শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে দেখা যায়। এ সম্বন্ধে শাহ্‌জাহানের যে দ্বিধাগ্রস্ত মনোবৃত্তি ছিল ঔরংজেব তাঁহাকে দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করেন মাত্র নতুবা এ সম্বন্ধে পিতা ও পুত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালকে মুঘল সাম্রাজ্যের ভাবী পরিণতির অঙ্গুলি সঙ্কেতরূপে অভিহিত করা যাইতে পারে।

মুঘলযুগের স্থাপত্যশিল্প—

ইতিমদৌলার সমাধি

জুম্মা মসজিদ
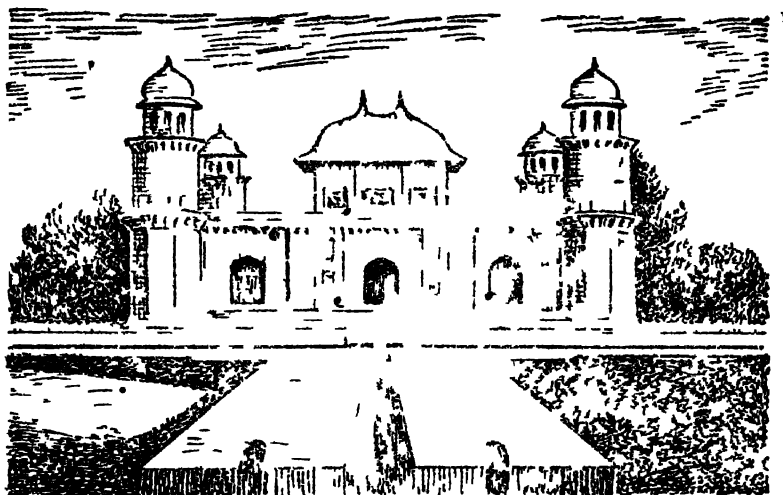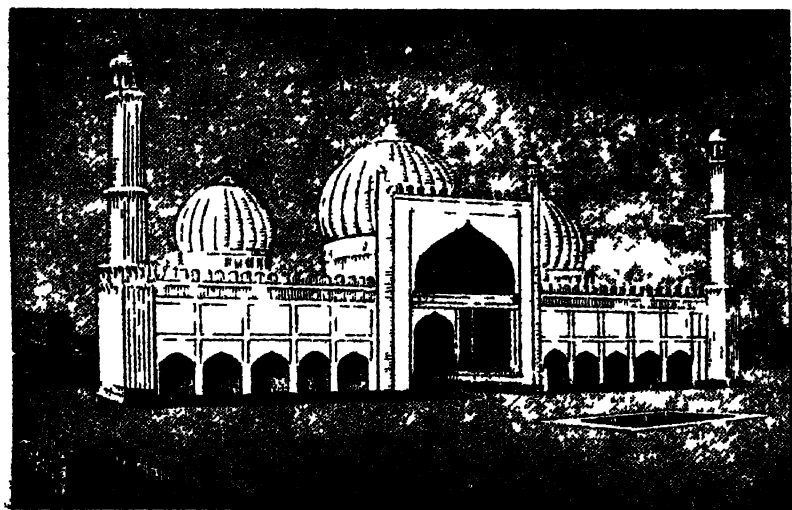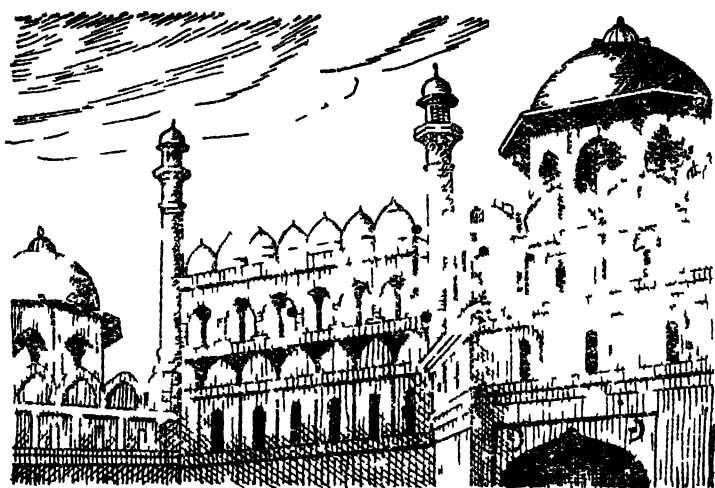
লালকেল্লা—দিল্লী
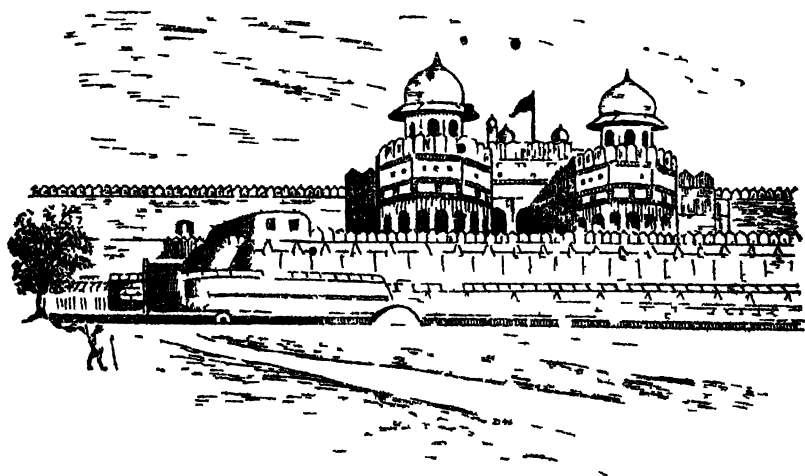
আগ্রার দুর্গ
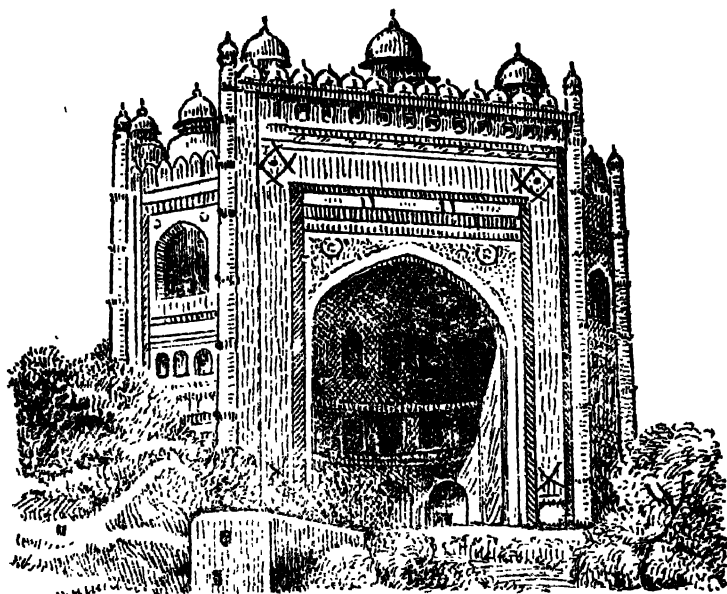
বুলন্দ্ দরওয়াজা—ফতেপুর সিক্রি
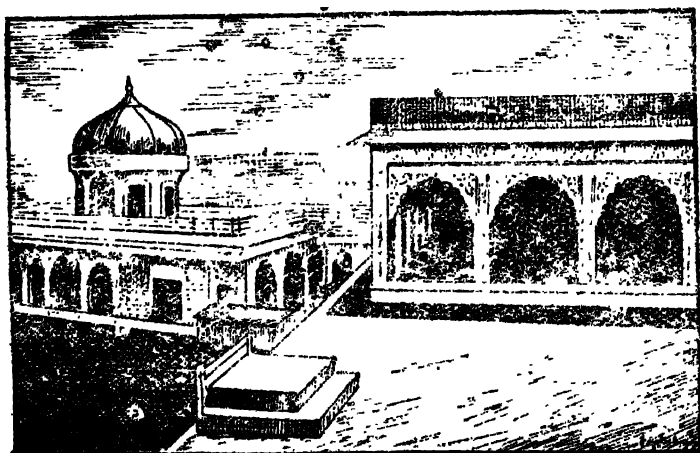
দিওয়ান-ই-আম—দিল্লী

মুঘল যুগের চিত্রাবলি

রাজপুত রীতিতে অঙ্কিত চিত্র

প্রশ্নোত্তর

1. Sketch briefly the career of Akbar and account for his greatness.

আকবরের জীবনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ বিবৃত কর।

উত্তর-সূত্র : (১) আকবরের জীবনী (২৭১ পৃষ্ঠা),

(২) শ্রেষ্ঠত্বের কারণ :—আকবরের চরিত্রে বহুবিধ গুণের সমাবেশ হইয়াছিল। তিনি একাধারে নির্ভীক যোদ্ধা, প্রজাহিতৈষী ও ন্যায়পরায়ণ শাসক, যুগাতিগ উন্নত ভাবধারার অধিকারী ও লোকচরিত্রাভিজ্ঞ ছিলেন। এই সমস্ত দিক দিয়া বিচারে আকবর পৃথিবীর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ নরপতিদের সমপর্য্যায়ভুক্ত। তিনি বিবিধ বিঘ্নসঙ্কুল ও সামান্যপরিসীমিত পিতৃরাজ্যের উত্তরাধিকারী হন কিন্তু প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী রাজত্বের মধ্যে সেই ক্ষুদ্র রাজ্যটিকে প্রায় সমগ্র ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যে পরিণত করেন এবং সুদৃঢ় শাসননীতি ও পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়া আকবর তাহাকে স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। বিবিধ বিরোধী শক্তি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও আকবর-প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য দেড়শত বৎসরের অধিক কাল সগৌরবে বর্ত্তমান ছিল। এতদ্ব্যতীত আকবরের উদার ধর্মবোধ, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টা শাসন দক্ষতা, রাষ্ট্রনৈতিক বিচক্ষণতা, জ্ঞানপিপাসা, ধর্মীয় উদারতা, সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রচেষ্টা ইত্যাদি গুণ তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। ("Akbar was a born king of men, with a rightful claim to be one of the mightiest sovereigns known to history. That claim rests securely on the basis of his extraordinary natural gifts, his original ideas, and his magnificent achievements." V. Smith)।

2. Discuss Akbar's attitude towards the Hindus.

আকবরের হিন্দুনীতি বর্ণনা কর।

উত্তর-সূত্র :—(৩২৫ পৃষ্ঠা)।

3. Describe Akbar's Rajput policy.

আকবরের রাজপুতদের সম্বন্ধে নীতি বর্ণনা কর।

উত্তর সূত্র :—আকবরের রাজপুতনীতি (৩২৮ পৃষ্ঠা)।

4. Give a brief account of Akbar's conquests.

আকবরের দিগ্বিজয় বর্ণনা কর

উত্তর সূত্রঃ—আকবরের সাম্রাজ্যবিস্তার (৩১৮ পৃষ্ঠা)।

5. What is the importance of the reign of Jahangir? Write a note on the part played by Nur Jehan.

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের গুরুত্ব বর্ণনা কর। তাঁহার রাজত্বকালে নূরজাহানের ভূমিকা কি ছিল?

উত্তর-সূত্রঃ—(১) জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের গুরুত্বঃ জাহাঙ্গীরের রাজত্ব-কালকে সমস্ত দিক দিয়া আকবরের রাজত্বকালের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যাইতে পারে। তাঁহার চরিত্রে আকবরের ন্যায় বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ না হইলেও তিনি বুদ্ধিমান, সুকৌশলী এবং সাম্রাজ্যের দুরূহ সমস্যাসমূহ বুঝিবার মত শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনিও আকবরের ন্যায় সাম্রাজ্যবিস্তারের নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেবারের রাণা প্রতাপসিংহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই কিন্তু তাঁহার পুত্র অমরসিংহ জাহাঙ্গীরের বশ্যতা স্বীকার করেন। আকবর আফঘান শক্তি বিনষ্ট করিয়া বঙ্গদেশে মুঘল প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাংলাদেশের কয়েকজন পরাক্রান্ত ভৌমিক এবং আফঘান ওমরাহ বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করিতেছিলেন। জাহাঙ্গীরের সময়ে বঙ্গদেশের সুবাদার ইসলাম খাঁর কৃতিত্বের ফলে প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশ মুঘলদের আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। উত্তর পশ্চিম ভারতের কাংড়া দুর্গ তাহার সময়ে মুঘলদের অধিকারে আসে। দাক্ষিণাত্যের আহম্মদনগর অধিকারের জন্যও তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। আকবরের ন্যায় তিনি ন্যায়-বিচারক ছিলেন এবং যে কোন ন্যায়বিচারপ্রার্থী অবাধে তাঁহার সন্নিকটে উপস্থিত হইতে পারিত। ধর্ম সম্বন্ধে আকবরের মত উদার না হইলেও তাঁহার গোঁড়ামি ছিল না। আকবরের ন্যায় জাহাঙ্গীরও বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতগণের সঙ্গে বাদানুবাদ করিতেন। তাঁহার রাজপুত নীতিও উদারতামূলক ছিল। সমস্ত দিক দিয়া জাহাঙ্গীরের রাজত্ব গৌরবময় হইলেও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে কান্দাহার মুঘলদের হস্তচ্যুত হওয়ার ঘটনা মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়াছিল। জাহাঙ্গীরের অসতর্কতার ফলে কান্দাহার পারস্যের দ্বারা অধিকৃত হয় এবং ভবিষ্যতে ইহার পুনরুদ্ধার আর সম্ভবপর হয় নাই। মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে স্থলপথে ভারতবর্ষের বাণিজ্যের

কেন্দ্রস্থল ছিল কান্দাহার। কান্দাহার হস্তচ্যুত হওয়াতে মুঘলসাম্রাজ্যের যথেষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতি হইয়াছিল।

(২) নূরজাহানের ভূমিকা : (নূরজাহান ৩৩৪ পৃষ্ঠা)।

6. Critically discuss the pre-eminence of the reign of Saha Jahan.

শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালের গুরুত্ব আলোচনা কর। উত্তর-সূত্র :—(৩৩৮ পৃষ্ঠা)।

7. Give an account of his achievements in the realm of architecture and other forms of art.

স্থাপত্য ও অন্যান্য শিল্পকলায় শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালের বিবরণ দাও। উত্তর-সূত্র :—(৩৩৯ পৃষ্ঠা)।

একবিংশ অধ্যায়

ঔরংজেব : মুঘল সাম্রাজ্যের পতন : মারাঠাগণের অভ্যুদয়

Syllabus : Aurangzeb—his character. Anti-Hindu measures. Bigotry. Hindu revival—Satnami rebellion, Sikhs, Rajputs and Marathas. Career of Shivaji—estimate of his character and contributions. The Deccan ulcer. Policy towards the Shia Sultans. Decline begins. Weak and corrupt successors—disintegration of administration. The Peshwas. Last battle of Panipat (1761).

ঔরংজেব - তাঁহার চরিত্র। হিন্দুবিদ্বেষীনীতি—ধর্মান্ধতা—হিন্দুগণের পুনরুত্থান, সৎনামী বিদ্রোহ। শিখ, রাজপুত ও মারাঠা—শিবাজীর জীবনী—শিবাজীর চরিত্র ও তাঁহার দান সম্বন্ধে আলোচনা। দাক্ষিণাত্যের ক্ষত—শিয়া সুলতানদের সম্বন্ধে নীতি, পতনের সূত্রপাত, দুর্বল ও অপদার্থ বংশধরগণ—শাসনপদ্ধতিতে বিশৃঙ্খলা - পেশোয়াদের অভ্যুত্থান। পানিপথের তৃতীয় বা শেষ যুদ্ধ (১৭৬১)।

ঔরংজেব (১৬৫৮—১৭০৭): ধর্মাট, সামুগড়, দেওরাই ও খাজুয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ঔরংজেব আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। অবশ্য ইতিপূর্ব্বে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে আগ্রা অধিকার করিয়া ঔরংজেব একবার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের অভিষেকের সময়ে ঔরংজেব 'আলমগীর বাদশাহ গাজি' উপাধি গ্রহণ করেন।

রাজত্বকালের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

ঔরংজেবের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল রাজত্বকালকে সমান দুইভাগে বিভক্ত করা যায় প্রথমার্দ্ধ ১৬৫৮—৮১ খৃষ্টাব্দে উত্তর ভারতে ও দ্বিতীয়ার্দ্ধ ১৬৮২—১৭০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি দাক্ষিণাত্যে অতিবাহিত করেন। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দের পরে তিনি আর আর্য্যাবর্ত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার রাজত্বকালের প্রথমার্দ্ধের ঘটনা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধ, রাজপুত-শিখ-জাঠ-

বুন্দেলা-সৎনামী বিদ্রোহ ও শিবাজী ও মহারাষ্ট্র জাতীয়তাবাদের সহিত যুদ্ধ। দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রধান ঘটনা দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর বংশধরগণের সহিত যুদ্ধ এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা বিজয়। রাজত্বকালের শেষার্দ্ধে তিনি সাম্রাজ্যের শাসনতন্ত্র, সৈন্যবল, কর্মচারিবৃন্দ এমন কি স্বীয় পরিবারবর্গ ও বাদসাহী দরবারকে পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে স্থানান্তরিত করেন। মোটকথা সাম্রাজ্যের সকল শক্তিই দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত হয়। ইহার ফলে উত্তর-ভারত তাঁহার রাজত্বের শেষার্দ্ধে সমস্ত দিক দিয়া অবহেলিত হয় এবং শাসনযন্ত্র দুর্বল, অপরাধপ্রবণ ও অত্যাচারী হইয়া পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল সাম্রাজ্য যে অরাজকতার লীলাভূমিরূপে পরিণত হয়, তাহা ইহারই পরোক্ষ ফল।

ঔরংজেব

শাহজাহানের পুত্রগণের মধ্যে ঔরংজেবই সর্বাপেক্ষা উদ্যমী, বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। সামরিক বিষয়ে বা কূটনীতিতে তাঁহার অসামান্য নৈপুণ্য ছিল, অসম-সাহসিকতার দৃষ্টান্তও তিনি বহু স্থলে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিপদকে তিনি বড় হইবার ন্যায্য ঝুঁকি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চরিত্রের দোষ ত্রুটি

তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র ছিল অনিন্দ্যনীয়, যুগোচিত বিলাস ব্যসন বা জাঁকজমক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি গোঁড়া মুসলমান হিসাবে মদ্যপান বা অন্যান্য ব্যসন সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া চলিতেন। ইসলাম ধর্মে তিনি গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। ধর্মাচরণের মধ্যে কোন প্রকার প্রবঞ্চনা ছিল না। তিনি স্বয়ং যেরূপ আন্তরিকভাবে ইসলামে বিশ্বাসী ছিলেন, অপরকে সেরূপ বিশ্বাসী দেখিতে চাহিতেন। গোঁড়া মুসলমানের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন 'জিন্দাপীর'। অতিরিক্ত ধর্মশীলতা তাঁহার কোমলবৃত্তিগুলিকে একেবারে লুপ্ত করিয়া দিয়াছিল—শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য, সাহিত্য সকল সুকুমার শিল্পে তাঁহার বিরাগ ছিল—স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার প্রতিও তিনি মমত্বলেশশূন্য হইয়াছিলেন। সকল কর্মচারী, পুত্রকন্যা, আত্মীয়স্বজন সকলকে তিনি সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। ধর্মীয় গোঁড়ামির সঙ্গে চিত্তের সঙ্কীর্ণতা মিশ্রিত হইয়া তাঁহার চরিত্রকে আপোষবিরোধী এক যন্ত্রবিশেষে পরিণত করিয়াছিল—স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি কোন প্রকার শাঠ্য বা ক্রূরকর্ম করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। এই সন্দিগ্ধচিত্ততার জন্য

তাঁহার সুদীর্ঘজীবনে কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সান্ত্বনা বা পরামর্শ জোটে নাই, নিঃসঙ্গ ও একাকিত্বের অসহায় অবস্থায় তাঁহার জীবনের শেষ অধ্যায় রচিত হইয়াছে।

সাম্রাজ্যবিস্তার ঃ সীমান্তের উপদ্রব নিবারণ ঃ—ঔরংজেব তৈমুরের বংশধরগণের দ্বারা অনুসৃত সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি অনুসরণ করেন এবং সাম্রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি করেন। তাঁহার সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে গোলযোগ উপস্থিত হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে আসামের অহোমজাতি, আরাকানের মগেরা ও কোচবিহারের কোচজাতি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নানাভাবে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে। এই উপদ্রব দূরীকরণের জন্য ঔরংজেব বাংলার শাসনকর্তা মীরজুমলাকে প্রেরণ করেন। মীরজুমলা প্রথমদিকে অহোমদের বিরুদ্ধে অভিযানে কৃতকার্য হইলেও শেষ পর্যন্ত তাহাদের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। মীরজুমলার মৃত্যুর পরে ঔরংজেবের মাতুল শায়েস্তা খাঁ বঙ্গদেশের সুবেদার নিযুক্ত হন। আরাকানের মগদের সহিত সম্মিলিতভাবে পর্টুগীজ বা ফিরিঙ্গী দস্যুগণ পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে উৎপাত করিয়া বেড়াইত। শায়েস্তা খাঁ ইহাদের প্রধান কেন্দ্র সন্দ্বীপ অধিকার করেন। পরিশেষে চট্টগ্রাম অধিকৃত হইলে পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ মগ ও ফিরিঙ্গীদের উৎপাত হইতে কিঞ্চিৎ নিষ্কৃতি লাভ করে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্তে উপদ্রব

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ইউসুফজাই, আফ্রিদী, খাটক প্রভৃতি আফঘান উপজাতির লোকেরা নানা প্রকার উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিলে প্রথমে তাহাদিগকে দমন করার জন্য ক্রমান্বয়ে কয়েকবার অভিযান প্রেরিত হয়। কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। অবশেষে স্বয়ং ঔরংজেব পেশোয়ারের সন্নিকট হাসান আবদালে উপস্থিত হইয়া যুগপৎ সমরনীতি ও কূটনীতি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ঔরংজেব উপজাতির মধ্যে কয়েকটিকে উপহার, জায়গির ইত্যাদির দ্বারা বশীভূত করিলেন এবং অবশিষ্ট কয়েকটি সৈন্যদের দ্বারা দমন করিলেন। এইভাবে সীমান্ত অঞ্চলের শান্তি ও শৃঙ্খলা কোন মতে রক্ষিত হইল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গোলযোগ মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে পরিণামে ক্ষতিকর হইয়াছিল। প্রথমতঃ, সীমান্তিক উপজাতিদের জাগরণের ফলে ইহাদের মধ্য হইতে বাদশাহী সৈন্য সংগ্রহ করা দুরূহ হইত। দ্বিতীয়তঃ, এই অঞ্চলের জন্য দাক্ষিণাত্য হইতে রণকুশল সৈন্য ও সেনাপতি স্থানান্তরিত করার ফলে রাজপুত ও মারাঠাগণের পক্ষে শক্তিসঞ্চয় করার সুবিধা হইয়াছিল।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উপদ্রব

ঔরংজেবের ধর্মনীতি ও তাহার ফলাফল ঃ—জাহাঙ্গীরের সময় হইতে যে

অনুদার ধর্মনীতি অনুসৃত হইতে থাকে, ঔরংজেবের রাজত্বকালে তাহা পূর্ণমাত্রায় প্রকট হয় এবং তিনি এই অসহিষ্ণু নীতি ব্যক্তিগত আচরণে এবং রাষ্ট্রের ব্যাপারে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। অনুদার সুন্নী সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকরূপেই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেকে মাত্র বাদশাহ (সম্রাট) বলিয়া ঘোষণা করেন নাই নিজেকে 'গাজি' বা ধর্মযোদ্ধা বলিয়াও ঘোষণা করেন। তিনি নিজেকে ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক ও প্রচারক মনে করিতেন এবং 'দার-উল-হারাব' বা অমুসলমানের দেশকে 'দার-উল-ইসলাম' বা মুসলমানের দেশে পরিণত করার জন্য রাষ্ট্রের শক্তিসামর্থ্য নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। হিন্দু ও মুসলমান ব্যবসায়ীর মধ্যে শুল্কের তারতম্য করিলেন—হিন্দু দেবালয় ধ্বংস করার জন্য 'মুহতাসিব' নামে সরকারী কর্মচারীর পদ সৃষ্ট হইল, হিন্দু মেলা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং আকবর কর্তৃক নিষিদ্ধ জিজিয়া কর পুনঃ প্রবর্তিত হইল। ধর্মান্তরিত হিন্দুগণকে মাসোহারা, উপহার বা উচ্চপদের দ্বারা উৎসাহিত করা হইল। গুজরাটের সোমনাথের মন্দির, কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির, মথুরার কেশবদেবের মন্দির এবং রাজপুতানার ইতিহাসে ২৩৯টি মন্দির সম্রাটের নির্দেশে ধ্বংস করা হয়। কিন্তু ঔরংজেব বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, তিনি কেবল ইসলামের প্রচারক বা গাজি নহেন, সুবিশাল হিন্দুস্থানের শাসক। এই দিক দিয়া শেরশাহ বা আকবর যে রাষ্ট্রনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, ঔরংজেব তাহা পারিলেন না। তাঁহার সাম্রাজ্যের অধিকাংশ প্রজা যে অমুসলমান তাহা তিনি বিস্মৃত হইলেন। রাষ্ট্র ও ধর্মকে অভিন্ন মনে করিয়া ঔরংজেব মুষ্টিমেয় শাসকজাতির ধর্ম হিন্দুদের উপর চাপাইতে গেলেন।

অনুদারতা

ঔরংজেবের এই ধর্মান্ধ নীতি অনুসরণের ফলে হিন্দুদের মনে যে বিক্ষোভ ও অশান্তির অনল প্রজ্জ্বলিত হইল, তাহা নির্বাপিত করার শক্তি তাঁহার রহিল না। অর্দ্ধশতাব্দীকালের রাজত্বের অধিকাংশ সময়ই তাঁহাকে উত্তর ভারতে জাঠ, বুন্দেলা, সৎনামী, শিখ ও রাজপুত জাতির এবং দাক্ষিণাত্যে মারাঠা জাতির অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

ফলাফল

মারাঠাজাতির বিরোধিতা :—রাজপুতদের বিরোধিতা হইতে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা জাতির অভ্যুদয় ও মুঘলশক্তির সঙ্গে প্রতিপক্ষতা ঔরংজেবের পক্ষে অধিকতর আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। ঔরংজেবের সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বেই মারাঠা জাতি শিবাজীর নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল। শিবাজী প্রথমদিকে বিজাপুরের সুলতানের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া

শিবাজী

স্বীয় প্রতিপত্তি ও রাজ্যসীমা বর্দ্ধিত করেন। বিজাপুরের সুলতান শিবাজীকে দমন করার জন্য আফজল খাঁ কে প্রেরণ করিলে তিনি শিবাজীর হস্তে নিহত হইলেন। অতঃপর শিবাজী মুঘল সাম্রাজ্যের অংশ বিশেষ আক্রমণ করিয়া স্বরাজ্যের আয়তন বর্দ্ধিত করিতে আরম্ভ করেন। ঔরংজেব তাহাকে দমন করার জন্য দাক্ষিণাত্যের সুবাদার শায়েস্তা খাঁ-কে প্রেরণ করিলেন (১৬৬০ খৃঃ)। শায়েস্তা খাঁ পুণা অধিকার করিয়া কল্যাণ অঞ্চল হইতে মারাঠাগণকে বিতাড়িত করেন। কিন্তু শিবাজী কর্তৃক এক অতর্কিত নৈশ আক্রমণে পরাজিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া শায়েস্তা খাঁ পলাইয়া চলিয়া আসেন। শিবাজী সুরাট বন্দর ও আহম্মদনগর লুণ্ঠন করেন। শিবাজীর শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত হইয়া ঔরংজেব সেনাপতি জয়সিংহ ও দিলওয়ার খাঁ কে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এইবার শিবাজী পরাজয় স্বীকার করিয়া পুরন্দরের সন্ধি অনুযায়ী বারটি দুর্গ রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত সম্রাটের হস্তে অর্পণ করেন। জয়সিংহের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিয়া শিবাজী পুত্রসহ আগ্রায় মুঘল দরবারে উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। সুকৌশলে শিবাজী পুত্রসহ বন্দীদশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আগ্রা হইতে পলায়ন করেন এবং স্বরাজ্যে উপস্থিত হন। অতঃপর শিবাজী মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিশাল মারাঠা রাজ্য গড়িয়া তোলেন। ঔরংজেব শিবাজীকে রাজা উপাধি প্রদান করিয়া তাহাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে শিবাজী ছত্রপতি উপাধি গ্রহণ করিয়া রায়গড়ে অভিষিক্ত হইলেন। ঔরংজেব কোনক্রমেই মারাঠাশক্তিকে দমন করিতে কৃতকার্য্য হইলেন না।

আফজল খাঁ। শায়েস্তা খাঁ। পুরন্দরের সন্ধি শিবাজীর অভিষেক

শিবাজীর মৃত্যুর পরে পুত্রদ্বয় শম্ভুজী ও রাজারাম ঔরংজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। রাজারামের মৃত্যুর পরে তাঁহার বীরপত্নী তারাবাই তাঁহার নাবালক পুত্র তৃতীয় শিবাজীর অভিভাবিকারূপে যোগ্যতার সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করিতে লাগিলেন। মারাঠারা ক্রমশঃ মালব, গুজরাট, বেরার আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিল। ঔরংজেব আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত মারাঠাশক্তি দমন করিতে সক্ষম হন নাই।

শিবাজীর মৃত্যুর পরেও মারাঠাদের বিরোধিতা চলিয়াছিল

ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি : ঔরংজেবের রাজত্বের প্রথমার্দ্ধ উত্তর ভারতের ব্যাপারেই অতিবাহিত হয়, এই সময়ে তিনি দাক্ষিণাত্যের দিকে দৃষ্টি প্রদান করার অবসর পান নাই। সুবাদারগণের দ্বারাই তিনি দাক্ষিণাত্যের শাসনভার পরিচালিত

করেন। দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে তাঁহার কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। কেননা দাক্ষিণাত্যের দুইটি নাম মাত্র স্বাধীন রাষ্ট্র বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার ক্ষমতা ইতিপূর্বেই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছিল। আর মারাঠাজাতির অভ্যুদয় তখন পর্য্যন্ত হয় নাই। ইতিমধ্যে ক্রমক্ষীয়মান বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার শক্তিহ্রাসের সুযোগে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির অভ্যুদয় ঘটিল এবং মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতি-স্পর্দ্ধাকারী মারাঠাশক্তি দাক্ষিণাত্যে মুঘল আধিপত্য সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিল। ইত্যবস্থায় ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে প্রধান কর্তব্য হইল দুইটি—বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করা এবং মারাঠা শক্তিকে দমন করা। ঔরংজেব প্রথম দিকে দাক্ষিণাত্য সমস্যায় তাদৃশ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহার রাজত্বের প্রথম চব্বিশ বৎসরকাল দাক্ষিণাত্যে ক্রমাগত সাম্রাজ্যের সৈন্যবল ও অর্থক্ষয় করিয়াও দেখা গেল কি বিজাপুর কি গোলকুণ্ডা কি মারাঠাশক্তি কেহই মুঘলদের নিকট মস্তক অবনত করিলনা। শিবাজীর নেতৃত্বে নবাভ্যুদিত মারাঠাশক্তি এতই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল যে ঔরংজেব শেষ পর্য্যন্ত শিবাজীকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে শিবাজী পূর্ব পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে মারাঠা প্রতিপত্তি মুঘল সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি অগ্রাহ্য করিয়া সগর্বে বর্তমান রহিল। শিবাজীর মৃত্যুর পরেও মারাঠা শক্তি হ্রাস পাইল না। শিবাজীর পুত্র শম্ভূজীর নেতৃত্বে মারাঠাগণ মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া যাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে শাহজাদা আকবর পিতার বিরুদ্ধে মারাঠাদের সঙ্গে যোগদান করেন। এই যোগাযোগের ফলে ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি নূতন রূপ ধারণ করে। তিনি স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত থাকিয়া মারাঠা শক্তিকে দমন করার চেষ্টা করিলেন। এই চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা দমনে মনোনিবেশ করিলেন।

মূল সূত্র দুইটি

(১) বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার করা

(২) মারাঠা শক্তি দমন করা

মারাঠা শক্তি দমনে অকৃতকার্য্য হইলেও বিজাপুর গোলকুণ্ডা অধিকৃত হয়

দাক্ষিণাত্যের এই দুইটি রাজ্যের প্রতি ঔরংজেবের লুব্ধ দৃষ্টি বহুদিন হইতেই ছিল। শাহজাহানের রাজত্বকালে দারা ও জাহানারার বিরোধিতায় ঔরংজেব ইহাদিগকে হস্তগত করিতে পারেন নাই। এই রাজ্যদ্বয় অধিকার করার পশ্চাতে সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি বহুলাংশে ছিল সন্দেহ নাই কিন্তু এই রাজ্যদ্বয় শিয়াপন্থী ছিল বলিয়া গোঁড়া সুন্নী ঔরংজেব ইহাদের স্বাধীনতা বিলোপের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ১৬৮৫-৮৭ খৃষ্টাব্দে

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার

ঔরংজেবকে এই সুলতানীদ্বয় কুক্ষিগত করার কার্য্যে ঔরংজেবকে ব্যস্ত থাকিতে হয়। প্রথমে তিনি বিজাপুর আক্রমণ করিলেন। পনেরো মাস প্রতিরোধের পরে বিজাপুর আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। অতঃপর তিনি গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়া গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিলেন। গোলকুণ্ডা সহজেই অধিকৃত হইল।

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকৃত হইলেও ঔরংজেব কোন মতেই মারাঠা শক্তিকে দমন করিতে কৃতকার্য্য হইলেন না। ঔরংজেব শম্ভুজীকে নিহত করিলেও শিবাজীর

মারাঠা দমনে নিষ্ফলতা

অন্যতম পুত্র রাজারাম এবং রাজারামের মৃত্যুর পরে তাঁহার বিধবা পত্নী তারাবাঈ যোগ্যতার সহিত মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ঔরংজেব সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করিয়াও জীবিতকালে মারাঠা শক্তি দমনে কৃতকার্য্য হইলেন না।

মারাঠা শক্তির দমন না হইলেও বিজাপুর গোলকুণ্ডা অধিকৃত হওয়াতে ঔরংজেবের

ফলাফল

দাক্ষিণাত্য নীতির একটি উদ্দেশ্য সফল হইল। সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি সাফল্য লাভ করিলেও ইহা মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে পরিণামে ক্ষতিকর হইয়াছিল। প্রথমতঃ, অনেক ঐতিহাসিকের মতে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা স্বাধীন থাকিলে তাহারা মারাঠাদের বিরুদ্ধে মুঘল শক্তিকে সাহায্য করিত কিংবা ইহাদের ভয়ে মারাঠা শক্তি দাক্ষিণাত্যের বাহিরে স্বক্ষমতা বিস্তার করিতে পারিত না। দ্বিতীয়তঃ, দাক্ষিণাত্য সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়াতে সাম্রাজ্য এত বিস্তৃত হইল যে সুদূর দিল্লী হইতে একজনের পক্ষে এই সাম্রাজ্য শাসন করা দুরূহ হইয়া পড়িল। তৃতীয়তঃ, দাক্ষিণাত্য জয়ের জন্য ঔরংজেবকে সুদীর্ঘকাল তথায় অবস্থান করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অনুপস্থিতিতে উত্তর ও মধ্য-ভারতের শাসনব্যবস্থায় এক প্রকার অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। সর্বোপরি দীর্ঘস্থায়ী দাক্ষিণাত্য অভিযানে মুঘল রাজকোষ একেবারে নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছিল। ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য নীতিকে মুঘল সাম্রাজ্য পতনের অন্যতম কারণ বলা হইয়াছে। এই 'দাক্ষিণাত্য ক্ষত' (Deccan Ulcer) মুঘল সাম্রাজ্যকে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল।

ঔরংজেবের শেষের দিনগুলো মোটেই সুখের হয় নাই। ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা পুঞ্জীভূত হইয়া তাঁহার বার্দ্ধক্যকে পীড়িত করিয়া তুলিল এবং সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ চিন্তা

ঔরংজেবের মৃত্যু
১৭০৭ খৃঃ

করিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কেবল মারাঠাশক্তির অভ্যুত্থান নহে, সাম্রাজ্যের অবশ্যম্ভাবী পতন এবং সিংহাসনের জন্য পুত্রগণের মধ্যে বিবাদের আশঙ্কা তাঁহাকে ভীত ও চিন্তাগ্রস্ত করিয়া তুলিল। তিনি পুত্র কামবক্স ও আজমের নিকট স্বীয় জীবনের

বিফলতার বিষয় উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিলেন। এইরূপে দেহে ও মনে পীড়িত ঔরংজেব ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে নব্বই বৎসর বয়সে দাক্ষিণাত্যে আহম্মদনগরে দেহত্যাগ করেন। যে কর্মবহুল দাক্ষিণাত্যের ভূমিতে ঔরংজেবের গৌরবরশ্মি প্রথম বিকীর্ণ হয়, জীবন সায়াহ্নে পুনরায় সেই স্থলেই তাঁহার নিজের ও মুঘলদের সযত্নগঠিত সাম্রাজ্যের জীবনসূর্য্য অস্তমিত হয়।

জাঠ, বুন্দেলা ও সৎনামী বিদ্রোহ :—মুঘল ফৌজদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মথুরার হিন্দু জাঠ কৃষকগণ গোকলা নামে জনৈক নেতার অধীনে বিদ্রোহ করে (১৬৬৯ খৃঃ)। ঔরংজেব গোকলাকে বন্দী করিয়া তাঁহাকে সপরিবারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। কিন্তু জাঠদিগকে সম্পূর্ণ দমন করা গেল না—তাহারা পুনরায় রাজারামের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। রাজারাম মুঘলদের হস্তে পরাজিত ও নিহত হইলে তাহারা পুনরায় চূড়ামন নামে জনৈক নেতার অধীনে সঙ্ঘবদ্ধ হয় এবং ঔরংজেবের মৃত্যুর পরে মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

জাঠবিদ্রোহ

বুন্দেলখণ্ডে ও মালবে হিন্দুগণ বুন্দেলা রাজকুমার ছত্রশালের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। ছত্রশাল শিবাজীর আদর্শে উত্তর ভারতে স্বাধীন হিন্দু রাজ্য স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। মালব ও বুন্দেলখণ্ডের হিন্দুজাতি ও ধর্মের মুখপাত্ররূপে ছত্রসাল ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। ছত্রসালের হস্তে মুঘলগণ কয়েকবার পরাজিত হয় এবং মৃত্যুর পূর্বে ছত্রসাল পূর্ব-মালবে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

বুন্দেলা বিদ্রোহ

পাতিয়ালা ও আলোয়ার অঞ্চলে সৎনামী নামে এক হিন্দু ভক্ত সম্প্রদায় ছিল। জনৈক মুঘল পদাতিক সৈন্য ইহাদের সম্প্রদায়ের একজনকে হত্যা করাতে ইহারা বিদ্রোহী হইয়া নারনল শহরটি অধিকার করে। ঔরংজেবের প্রেরিত মুঘল বাহিনী কঠোর হস্তে ইহাদিগকে দমন করে।

সৎনামী বিদ্রোহ

শিখ বিদ্রোহ :—ঔরংজেবের হিন্দুবিদ্বেষী নীতির ফলে শিখ সম্প্রদায়ও বিদ্রোহী হইয়াছিল। জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরুকে সাহায্য করার জন্য জাহাঙ্গীর শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জুনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। পরবর্তী গুরু অর্জুনের পুত্র হরগোবিন্দ মুঘলদের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য শিখগণকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলেন। অতঃপর পরবর্তী বিভিন্ন গুরুর সময়ে শিখ সম্প্রদায় ক্রমশঃ সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইতে থাকে। নবম গুরু তেগবাহাদুর ঔরংজেবের অনুদারনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলে ঔরংজেব তাহাকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে

আনয়ন করেন এবং তাঁহাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বলেন। তেগবাহাদুর ইহাতে অস্বীকৃত হইলে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। তাঁহার পুত্র ও পরবর্ত্তী (দশম) শিখগুরু
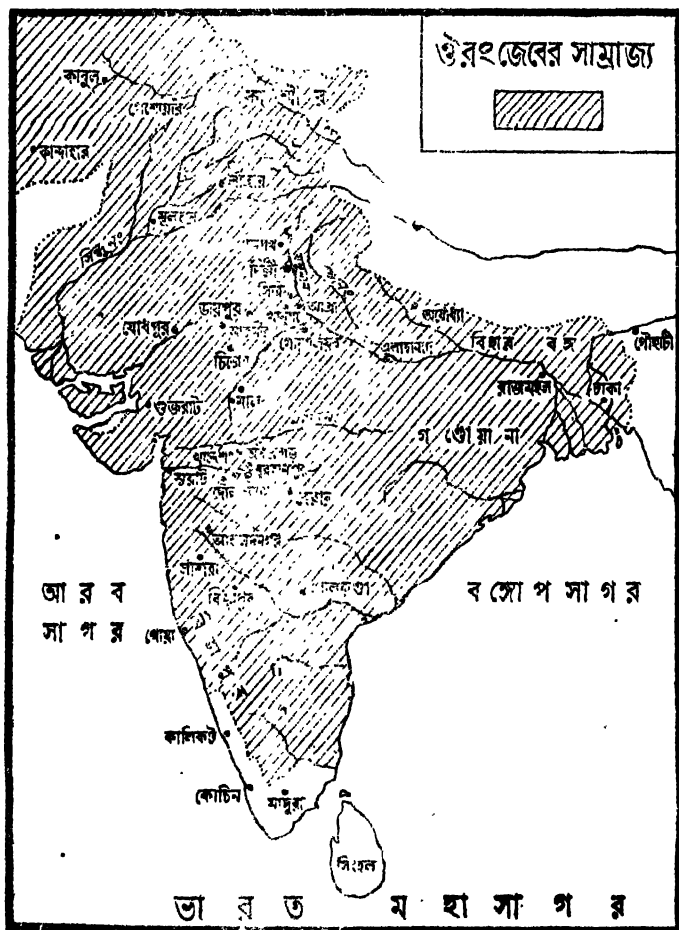
গুরুগোবিন্দ সিংহ পিতার হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হন এবং শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে নানাবিধ সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিয়া ঐক্য ও সংহতির সৃষ্টি করেন। তাঁহার আদেশে শিখগণ তামাক পরিত্যাগ করে এবং কেশ, কংঘী (চিরুণী); কৃপাণ,

কচ্ছ (খাটো পায়জামা) এবং করা (লৌহবলয়) ধারণ করার নীতি গ্রহণ করে। তিনি শিখজাতিকে তরবারি যোগে দীক্ষার প্রচলন করেন এবং শিখগণকে সম্পূর্ণ যোদ্ধসম্প্রদায়ে পরিণত করিয়া 'খালসা' (শুদ্ধ)-র সৃষ্টি করেন। জাহাঙ্গীর ও ঔরংজেবের নির্য্যাতন নীতিই পরোক্ষভাবে শিখগণকে সঙ্ঘবদ্ধ ও সামরিক জাতিতে পরিণত হইতে সাহায্য করিয়াছিল। ঔরংজেব এই শিখজাতিকে দমন করিতে সক্ষম হন নাই।

ঔরংজেবের রাজপুত নীতি ও তাহার ফল ঃ—দূরদর্শী আকবর রাজপুতগণের বন্ধুত্বের মূল্য উপলব্ধি করিয়া রাজপুত জাতি সম্বন্ধে সহৃদয় নীতি অনুসরণ করেন এবং রাজপুতগণ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম স্তম্ভ হইয়া দাঁড়ায়। জাহাঙ্গীর বা শাহ্‌জাহানের সময়েও রাজপুতদের সম্বন্ধে আকবরের উদারনীতিই মোটামুটি অনুসৃত হয়। কিন্তু ঔরংজেব রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও ধর্মনৈতিক অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া রাজপুত জাতির শত্রুতা অর্জন করিলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথমদিকে অম্বররাজ জয়সিংহ ও মাড়বারের যশোবন্ত সিংহ নামে দুইজন বিশিষ্ট কর্মচারী ছিলেন। জয়সিংহ যখন দাক্ষিণাত্যে ছিলেন তখন তাঁহাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়। যশোবন্ত সিংহ পূর্বে দারার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া ঔরংজেব তাঁহার উপর বিদ্বিষ্ট হন এবং যশোবন্ত সিংহকেও পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে সরাইয়া দিবার সঙ্কল্প করেন। যশোবন্ত সিংহ যখন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন তখন অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। অনেকে মনে করেন ঔরংজেব কর্তৃক বিষপ্রয়োগের ফলেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সুযোগে ঔরংজেব যশোবন্ত সিংহের দেশ মারবাড় অধিকার করেন এবং ইন্দ্রসিংহ নামে এক তাঁবেদারকে সিংহাসনে বসাইয়া মারবাড়ের উপর হিন্দু বিরোধী কার্য্যক্রম অনুসরণ করিতে থাকেন।

মারবাড় অধিকার

যশোবন্তের মৃত্যুর সময়ে তাঁহার স্ত্রী মহামায়া গর্ভবতী ছিলেন, শীঘ্রই তাঁহার গর্ভে যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। একটি সন্তান মারা যায়, অপর সন্তান অজিত সিংহ যশোবন্তের মৃত্যুর পরে তাহার অনুচরবর্গের দ্বারা দিল্লীতে আনীত হয়। রাজপুতগণ অজিত সিংহকে মারবাড়ের সিংহাসনে বসাইবার জন্য ঔরংজেবকে অনুরোধ করেন। ঔরংজেব অজিতসিংহকে মুঘল অন্তঃপুরে প্রতিপালন করিয়া তাহাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ঔরংজেব রাণী মহামায়া ও অজিত সিংহকে বন্দী করার জন্য একদল মুঘল সৈন্য নিযুক্ত করেন; কিন্তু রাঠোর বীর দুর্গাদাস অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া মুঘলদের হস্ত হইতে রাণী মহামায়া ও অজিত সিংহকে উদ্ধার করিয়া নিরাপদে যোধপুরে উপস্থিত হইলেন। ঔরংজেব ক্রুদ্ধ হইয়া

রাঠোর বীর দুর্গাদাসের বীরত্ব

মাড়বার রাজ্যের অন্তর্গত যোধপুর ও অন্যান্য নগর অধিকার করিলেন। এই ঘোর সঙ্কটের সময়ে অজিত সিংহের মাতা তাঁহার আত্মীয় মেবাররাজ রাজসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ঔরংজেব হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর পুনঃ স্থাপন করিয়া রাজপুতদের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। রাজসিংহ অজিতসিংহের পক্ষ সমর্থন করিয়া ঔরংজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। মুঘলবাহিনী মেবারের সমতল প্রদেশ অধিকার করিয়া লুণ্ঠন ও অত্যাচারের দ্বারা মেবারকে শ্মশানে পরিণত করিলেন। রাজসিংহ দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মাঝে মাঝে মুঘল সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া বিব্রত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। ঔরংজেবের চতুর্থ পুত্র আকবর রাজপুতদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিতেছিলেন। রাজপুতদের খণ্ড যুদ্ধের আক্রমণে আকবর বিব্রত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। ঔরংজেব আকবরের ব্যর্থতায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে মেবার হইতে মারবাড়ে স্থানান্তরিত করিলেন। শাহজাদা আজম মেবারে মুঘল সৈন্যদলের ভারপ্রাপ্ত হইয়া আসিলেন। কিন্তু আকবর, আজম বা মোয়াজ্জেম কোন শাহাজাদাই রাজপুতদের বিরুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। পিতার আচরণে অসন্তুষ্ট ও অপমানিত আকবর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া রাজপুতগণের সঙ্গে যোগদান করিল। ঔরংজেব এই ঘটনায় প্রমাদ গণিলেন এবং চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাজপুতদের সহিত আকবরের বন্ধুত্ব বিনষ্ট করার সঙ্কল্প করিলেন। ঔরংজেবের চক্রান্ত সফল হইল এবং রাজপুতগণ আকবরকে বিশ্বাসঘাতক স্থির করিয়া তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। নিরুপায় আকবর রাঠোর বীর দুর্গাদাসের সাহায্যে দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিয়া শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর আশ্রয়-গ্রহণ করিলেন। সেখানেও শম্ভুজীর ঔদাসীন্যে আকবরের সমস্ত উদ্যম নিষ্ফল হইল। অগত্যা আকবর ভারতবর্ষ ছাড়িয়া পারস্যে প্রস্থান করিলেন। এদিকে ঔরংজেব রাজপুতদের সহিত দীর্ঘ সংগ্রামের পরে রাজসিংহের পুত্র জয়সিংহের সহিত সন্ধি করিলেন (১৬৮১)। ঔরংজের জিজিয়া কর প্রত্যাহার করিলেন এবং রাজপুতগণ তাহার পরিবর্ত্তে তিনটি পরগণা মুঘলদের হস্তে অর্পণ করিলেন। রাঠোরবীর দুর্গাদাস কিন্তু ঔরংজেবের সহিত সন্ধি করিলেন না। তিনি ক্রমাগত মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া গেলেন। ঔরংজেবের সেনাপতিগণ দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়াও রাঠোরদিগকে দমন করিতে সক্ষম হইল না। ঔরংজেবের মৃত্যুর পরে প্রথম বাহাদুর শাহ সম্রাট হইয়া অজিত সিংহকে মারবাড়ের রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন (১৭০৯)। এইরূপে রাঠোরগণের

মেবারের রাণার যুদ্ধ ঘোষণা

শাহাজাদা আকবরের বিদ্রোহ

সহিত মুঘলদের ত্রিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধের অবসান হয়। রাজপুতদের সহিত মুঘলদের যুদ্ধবিগ্রহ ঔরংজেবের রাজনীতিক বিচক্ষণতার অভাব সূচনা করে। ইহাতে বাদশাহী সম্মান যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুন্ন হয় এবং মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম স্তম্ভ রাজপুতগণ সাম্রাজ্যের চরম শত্রুতে পরিণত হয়।

ঔরংজেবের কৃতিত্বের পরিমাপ:—অনেক ঐতিহাসিক ঔরংজেবের চরিত্রের ত্রুটিগুলিকে বড় করিয়া দেখাইয়া তাঁহার গুণগুলিকে উপেক্ষা করিয়াছেন। ঔরংজেব পিতা শাহ্‌জাহানকে বন্দী করিয়া এবং ভ্রাতৃগণকে পৃথিবী হইতে অপসৃত করিয়া সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। কিন্তু সমকালে এজাতীয় ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল; বিশেষতঃ মুঘলবংশে এই শ্রেণীর দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না। জাহাঙ্গীর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, শাহজাহানও জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই এবং সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ঔরংজেবের নহে—কোন ভ্রাতাই অপরকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে বা শান্তিপূর্ণভাবে সাম্রাজ্য বণ্টন করিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল না। যে যুগে 'মর অথবা মার' এই নীতি শাহজাদাদের পক্ষে সাধারণ প্রথা তখন ঔরংজেবের নিষ্ঠুর আচরণকে তেমন ঘৃণিত বলিয়া মনে করা অনুচিত।

ঔরংজেব সম্বন্ধে পক্ষপাতহীন বিচারের প্রয়োজন

শাসকরূপে ঔরংজেব ব্যর্থতার প্রতিমূর্তি ছিলেন। কেবল মাত্র কূটনীতিজ্ঞ ও অক্লান্ত পরিশ্রমী হইলেই সাম্রাজ্যশাসন করা যায় না এই তত্ত্ব তিনি বুঝিতে পারেন নাই। সাম্রাজ্যের উন্নতির মূলে প্রজাসাধারণের সম্মতি ও সদিচ্ছা থাকা প্রয়োজন। ধর্মান্ধতা দ্বারা পরিচালিত ঔরংজেব এই নীতিকে সম্পূর্ণ পদদলিত করিয়া সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে শত্রুবেষ্টনীর সৃষ্টি করেন। সাম্রাজ্যের অধিকাংশ প্রজা ছিল অ-মুসলমান, ঔরংজেবের ধর্মীয় গোঁড়ামি পদে পদে হিন্দুদের মন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার অনুদারতার ফলে রাজপুত, জাঠ, মারাঠা, শিখ সকল শ্রেণীর হিন্দুই সাম্রাজ্য ধ্বংসের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। স্বীয় অদূরদর্শিতা ও ভ্রান্ত নীতির ফলে ঔরংজেব সাম্রাজ্যের বিপদ ডাকিয়া আনিলেন, দ্বিতীয়তঃ, ঔরংজেবের সন্দিগ্ধচিত্ততা ও স্বহস্তে রাজ্যপরিচালনা তাঁহার শাসনকালেরও ব্যর্থতার জন্য দায়ী। রাজ্যের সামান্য বিষয়ও তিনি নিজে দেখিতে চেষ্টা করিতেন। ইহার ফলে কর্মচারীবর্গ অকর্মণ্য ও দায়িত্বহীন হইয়া গেল। সাম্রাজ্যের সর্বত্র শাসনব্যবস্থা শিথিল হইয়া গেল। ব্যক্তিগত গুণাবলীর দিক দিয়া ঔরংজেব আকবর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু আকবর

ভ্রান্ত নীতি ও অনুদারতার ফলে সাম্রাজ্য ধ্বংসের বীজ উপ্ত হইল

যেমন হিন্দুপ্রজাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপিত করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যকে ভারতের জাতীয় সাম্রাজ্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবে ঔরংজেব তাহা করিতে পারিলেন না. উপরন্তু ইহার বিপরীত আচরণের দ্বারা সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়া গেলেন। ঔরংজেব মুঘল সাম্রাজ্যকে যেমন বিস্তৃত করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার পতনের বীজও তিনি বপন করিয়া গিয়াছিলেন। কর্মশক্তি ও ব্যর্থতা, উভয়ের বীজই তাঁহার চরিত্রের মধ্যে নিহিত ছিল।

মারাঠা জাতির অভ্যুত্থান :—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে মারাঠা জাতির অভ্যুত্থান ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। মধ্যযুগের প্রারম্ভে দেবগিরির যাদববংশীয়গণ মহারাষ্ট্র দেশ শাসন করিতেন। আলাউদ্দিন খিলজির আমলে যাদব বংশের পতন হইলেও পরবর্তী চল্লিশ বৎসরের মধ্যেই মহারাষ্ট্র দেশ বাহমনী রাজ্যের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। বাহমনী রাজ্যের পতনের পরে এখানে বিজাপুর ও আহম্মদনগরের সুলতানগণ রাজত্ব করিতে থাকেন। মুসলমান সুলতানগণের সময়ে বহু মারাঠা জায়গিরদার উচ্চ সম্মান ও সামরিক প্রতিপত্তি লাভ করে। মধ্যযুগে পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে কয়েকজন মারাঠী ধর্মাচার্য্য একনাথ, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি উদার ধর্মমতের প্রচার করেন। এই ধর্ম প্রচারকগণের চেষ্টার ফলে মারাঠা জাতির মধ্যে জাগরণের সূত্রপাত হয় ও তাহারা স্বধর্ম রক্ষার জন্য তৎপর হইয়া পড়ে। উচ্চ ভাবাদর্শ সম্বলিত পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মারাঠী সাহিত্য ও জনমানসকে এই জাগরণে সাহায্য করে। মারাঠা দেশের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যও মারাঠা জাতির অভ্যুদয় ও চরিত্রগঠনে সাহায্য করিয়াছে। পশ্চিমাংশে সহ্যাদ্রি ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এবং উত্তরে বিন্ধ্য ও সাতপুরা ইহাকে পর্বতসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে। নর্মদা ও তাপ্তীর স্রোতধারাও মহারাষ্ট্র দেশকে সুবিস্তৃত ও সুগভীর পরিখার ন্যায় রক্ষা করিতেছে। এই সকল প্রাকৃতিক কারণে মহারাষ্ট্রদেশ একদিকে যেমন আক্রমণকারীর পক্ষে অসুবিধাজনক অপর পক্ষে এই দেশের ভূমি অত্যন্ত অনুর্বর এবং বারিপাত অনিশ্চিত হওয়ায় মারাঠারা সহিষ্ণু, কর্মনিষ্ঠ ও সংগ্রামশীল হইয়াছে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর নবজাগরণের ফলে মারাঠাগণ যেমন স্বধর্মনিষ্ঠ হয় সঙ্গে সঙ্গে তাহারা স্বাধীনতার কামনায়ও উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাদের কামনা মূর্ত্ত হইয়া উঠে। শিবাজী মারাঠা জাতিকে সংহত ও

পূর্বগৌরব

অভ্যুত্থানের কারণ

ধর্মাচার্যগণ

মারাঠী সাহিত্য

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

শক্তিশালী করিয়া একটি জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করেন। মুঘল সম্রাটদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্য লাভ করিয়া এই রাষ্ট্র শক্তি সঞ্চয় করে এবং পেশোয়াদের সময়ে মারাঠারা মুঘলোত্তর ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়।

শিবাজী ছত্রপতি :—শিবাজী ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৬৩০) জুন্নারের নিকটবর্তী শিবনের পার্বত্য দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। শিবাজীর পিতা শাহজী ভোঁসলে প্রথমে আহম্মদনগরের সৈন্যবাহিনীতে কাজ করিতেন, পরে তিনি আহম্মদনগর রাজ্যে প্রচুর সম্পত্তি ও প্রতিপত্তির অধিকারী হন। শাহজাহান আহম্মদনগর অধিকার করিলে শাহজী প্রচুর যশ ও ধন সম্পত্তি লাভ করেন। তাঁহার পুরাতন জায়গীর পুনা ছাড়াও তিনি কর্ণাটকের সুবিস্তৃত জায়গীর লাভ করেন। শাহজী বিজাপুরে কর্ম গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় পত্নী তুকাবাঈ-কে লইয়া কর্মস্থলে যান। বালক পুত্র শিবাজীসহ জিজাবাঈ দাদাজী কোণ্ডদেব নামে এক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে পুনায় বাস করিতে থাকেন। মাতা জিজাবাই ও

ছত্রপতি শিবাজী

শৈশব ও শিক্ষা

দাদাজী কোণ্ডদেবের স্নেহ ও শিক্ষা শিবাজীর জীবন ও চরিত্র গঠনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। শিবাজীর আক্ষরিক জ্ঞান লাভ হইয়াছিল কিনা তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে মাতা দাদাজীর মুখে মহাকাব্যের উপাখ্যানসমূহ শ্রবণ করিয়া তিনি মাতৃভূমিকে বিদেশীর অত্যাচারমুক্ত করিবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। তিনি বাল্যকালেই অশ্বারোহণে ও অস্ত্রচালনায় পারদর্শী হন। শৈশব হইতেই শিবাজীর সহিত স্থানীয় পার্বত্য মাওয়ালী জাতির ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। এই মাওয়ালী জাতির লোককে লইয়া শিবাজী পরে তাঁহার বিশ্বস্ত মহারাষ্ট্র সৈন্যবাহিনী গঠন করেন।

বিজাপুরের বিরুদ্ধে কার্য্যকলাপ

দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণের ক্রমবর্দ্ধমান দৌর্বল্য এবং উত্তর ভারতের মুঘল শক্তি ব্যস্ত থাকার ফলে মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থানের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে শিবাজী তাঁহার নবগঠিত সৈন্যদলের সাহায্যে বিজাপুরের অধীন তোরণা দুর্গ অধিকার করেন এবং উহার সন্নিকটে রায়গড় দুর্গ নির্মাণ করেন। দাদাজী কোণ্ডদেব শিবাজীর

এই সকল কার্য্য অনুমোদন করিতেন না। দাদাজীর মৃত্যুর পরে শিবাজী প্রয়োজনমত উৎকোচ দানে বা বল প্রয়োগে বহু দুর্গ স্বীয় অধিকারে আনিতে সমর্থ হইলেন। শিবাজীর এই সকল কার্য্যকলাপের ফলে বিজাপুর দরবার শিবাজীকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পিতা শাহজীকে বন্দী করেন। ফলে ছয় বৎসর (১৬৪৯—৫৫) শিবাজীকে আক্রমণাত্মক কার্য্যকলাপ বন্ধ রাখিতে হয়। কিন্তু এই সময়ে তিনি একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া ছিলেন না। তিনি মাউলী নামক অর্দ্ধস্বাধীন মারাঠা রাষ্ট্রের অধিপতি চন্দ্ররাও মোরেকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করাইয়া এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি অধিকার করেন।

মুঘলের সহিত সংঘর্ষ

অতঃপর শিবাজী মুঘল শক্তির সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে মুঘলবাহিনীর সহিত বিরোধের সূত্রপাত হয়। ঔরংজেব এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন। ঔরংজেব বিজাপুর আক্রমণ করিলে মুঘল সৈন্যের ব্যস্তভাব সুযোগে শিবাজী জুন্নার ও আহম্মদনগরে মুঘল অধিকৃত অঞ্চল আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। ঔরংজেব শিবাজীর বিরুদ্ধে দ্রুত সৈন্য প্রেরণ করিলে শিবাজী পরাজিত হন। বিজাপুরের আদিল শাহ ঔরংজেবের সহিত সন্ধি করিলেন। শিবাজীও মুঘলদের আধিপত্য মানিয়া লন। ঔরংজেব চতুর শিবাজীকে মোটেই বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু শাহজাহানের অসুস্থতার সংবাদে তাঁহাকে অতি সত্বর দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ করিতে হয়। শিবাজী অতঃপর উত্তর কোঙ্কণের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং কল্যাণ, ভিওয়াণ্ডী ও মাহুলী অধিকার করিয়া মাহাদ পর্য্যন্ত অগ্রসর হন।

মুঘল আক্রমণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বিজাপুররাজ এইবার শিবাজীকে ধ্বংস করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে বিখ্যাত সেনাপতি আফজল খাঁ-কে একদল সৈন্যসহ প্রেরণ করিলেন। আফজল খাঁ-র আগমনের সংবাদ পাইয়া শিবাজী প্রতাপগড়ের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আফজল খাঁ কোন ক্রমেই প্রতাপগড় অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন না। অগত্যা আফজল খাঁ কৌশলে শিবাজীকে নিজ শিবিরে আনিয়া তাঁহাকে হত্যা করার মতলব করিলেন। আফজল খাঁ শিবাজীর সহিত আপোষ মীমাংসার আলোচনা চালাইতে লাগিলেন এবং নিজ শিবিরে শিবাজীকে সাক্ষাৎকারের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন।

আফজল খাঁ ও শিবাজী

আফজল খাঁ-র দুরভিসন্ধির কথা শিবাজী ইতিপূর্বেই জ্ঞাত হইয়াছিলেন, সুতরাং আফজল খাঁ-র সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই শিবাজী পরিচ্ছদের নীচে বর্ম ও অঙ্গুলিতে 'বাঘনখ' পরিধান করিয়া প্রস্তুত হইয়াই গিয়াছিলেন। উভয়ের সাক্ষাৎকারের সময় আলিঙ্গন করার ভান করিয়া আফজল খাঁ শিবাজীর গলা চাপিয়া ধরিয়া তাঁহাকে

ছুরিকাঘাতে হত্যা করার চেষ্টা করেন। আফজলের ছুরিকা শিবাজীর পরিহিত বর্মে প্রতিহত হয়। অনন্যোপায় শিবাজী বাঘনখের সাহায্যে আফজলের বক্ষ চিরিয়া হত্যা করেন। সেনাপতির মৃত্যু সংবাদে আফজল খাঁর সৈন্য বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়। অতঃপর শিবাজী দক্ষিণ কোঙ্কন ও কোলাপুর জেলায় প্রবেশ করেন। কিন্তু ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর বাহিনী শিবাজীর হাত হইতে পানহালা দুর্গটি জোর করিয়া কাড়িয়া লইল।

পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া সম্রাট হইবার পরে ঔরংজেব শিবাজীকে দমন করার জন্য মনোযোগী হইলেন। ঔরংজেবের নির্দেশে শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযান করার জন্য দাক্ষিণাত্যের সুবাদার শায়েস্তা খাঁ প্রেরিত হইলেন।

শায়েস্তা খাঁ ও শিবাজী

শায়েস্তা খাঁ শিবাজী অধিকৃত পুণা, চাকন ও কোঙ্কনের অন্তর্গত কল্যাণ জেলা অধিকার করিলেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে এক দিন নিশীথে শিবাজী মুষ্টিমেয় কয়েকজন অনুচর সহ পুণাস্থিত শায়েস্তা খাঁর আবাস ভবনে (এই ভবনেই শিবাজীর বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়) শায়েস্তা খাঁর পুত্র আবুল ফতে ও প্রায় চল্লিশজন রক্ষীকে নিহত করিলেন। শায়েস্তা খাঁ-ও অক্ষত রহিল না; তাঁহার একটি অঙ্গুলী ছিন্ন হইল। শিবাজী অতঃপর সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর ধনরত্ন লাভ করিলেন।

শায়েস্তা খাঁ-র অকর্মণ্যতায় বিরক্ত হইয়া ঔরংজেব তাঁহাকে বাংলাদেশে বদলী করিলেন এবং তৎপরিবর্তে জয়সিংহ ও দিলীর খাঁ কে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।

জয়সিংহ ও দিলীর খাঁ

জয়সিংহ ছিলেন অত্যন্ত কূটকৌশলী। জয়সিংহ শিবাজীর পক্ষভুক্ত কয়েকজন জায়গীরদারকে শিবাজীর পক্ষত্যাগ করাইলেন। অতঃপর জয়সিংহ পুরন্দর দুর্গ অবরোধ করিলেন। প্রতিরোধের চেষ্টা নিষ্ফল জানিয়া শিবাজী ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে মুঘলদের সঙ্গে পুরন্দরের সন্ধি করিলেন (১৬৬৫)। এই সন্ধির সর্ত অনুসারে শিবাজী নিজের জন্য দ্বাদশটি দুর্গ রাখিয়া অবশিষ্ট ২৩টি দুর্গ মুঘলদের হাতে প্রদান করিলেন ও মুঘলদের দাক্ষিণাত্য অভিযানে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। শিবাজীর এই আচরণে প্রীত হইয়া ঔরংজেব শিবাজীকে আগ্রায় মুঘল দরবারে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন।

শিবাজী কর্তৃক পুরন্দরের সন্ধি

জয়সিংহ শিবাজীকে আগ্রায় নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলেন। জয়সিংহের আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া শিবাজী পুত্র শম্ভুজী সহ আগ্রায় গমন করিলেন। আগ্রার দরবারে ঔরংজেব শিবাজীর প্রতি যথেষ্ট শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন না। উপরন্তু তাঁহাকে মাত্র পাঁচ হাজারী মনসবদার নিযুক্ত করাতে শিবাজী নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়া দরবারগৃহেই অসন্তুষ্টি

আগ্রায় আগমন

প্রকাশ করেন। ঔরংজেব শিবাজীর উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখার নির্দ্দেশ দেন। কিন্তু চতুর শিবাজী ঔরংজেবের সকল সতর্কতা ব্যর্থ করিয়া কৌশলে মিষ্টান্নের ঝুড়িতে আত্মগোপন করিয়া আগ্রা হইতে পলায়ন করেন এবং মথুরা, প্রয়াগ, বারাণসী, গয়া প্রভৃতি স্থান পর্য্যটনের পরে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নজরবন্দী ও পলায়ন

স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর শিবাজী তিন বৎসর কাল চুপচাপ থাকিয়া রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। শিবাজীকে দমন করা অসম্ভব বুঝিয়া ঔরংজেব তাঁহাকে রাজা উপাধি এবং বেরারে একটি জায়গির এবং পুত্র শম্ভুজীকে পাঁচহাজারী মনসব প্রদান করিলেন। কিন্তু ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে হইতে পুনরায় মুঘল মারাঠা সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। শিবাজী পূর্ব্বে প্রদত্ত সমস্ত দুর্গ মুঘলদের হস্ত হইতে অধিকার করিয়া লইলেন। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে শিবাজী দ্বিতীয়বার সুরাঠ লুণ্ঠন করিলেন। দুই বৎসর পরে তিনি সুরাট হইতে চৌথ আদায় করিলেন। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে রায়গড়ে শিবাজীর রাজ্যাভিষেক হইল। শিবাজী 'ছত্রপতি' ও গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক উপাধি গ্রহণ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে শিবাজীর রাজ্য উত্তরে সুরাটের সন্নিহিত ধরমপুর হইতে দক্ষিণে কানাড়া জেলার কারোয়ার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, পশ্চিমে আরব সাগর হইতে পূর্ব্বদিকে তাঁহার রাজ্য বাগনালা হইতে কোলাপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শিবাজীর রাজ্যাভিষেক

শিবাজীর শাসনব্যবস্থা :—মাত্র সামরিক ব্যাপারে শিবাজীর কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ ছিল না। সুদক্ষ শাসক হিসাবেও তিনি তাঁহার প্রতিভার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। রাজত্বের অধিকাংশ কাল যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে কাটিলেও তিনি অবকাশ সময়ে শাসন-সম্পর্কিত যে সকল সংস্কার সাধন করেন তাহা শেরশাহ বা আকবরের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। শেরশাহ এবং আকবরের ন্যায় তিনি রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য স্থায়ী ও সুদৃঢ় করার জন্য উন্নত শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করেন।

মুঘল সম্রাটদের ন্যায় শিবাজী স্বৈরতান্ত্রিক ছিলেন, কিন্তু প্রজার হিতসাধনই তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল। শাসনব্যবস্থায় সর্ব্বোচ্চ ছিলেন স্বয়ং রাজা। শাসনকার্য্যে তাঁহাকে পরামর্শ দিবার জন্য অষ্টপ্রধান বা আটজন মন্ত্রী লইয়া গঠিত একটি পরিষদ ছিল। পেশোয়া (প্রধান মন্ত্রী), মজুমদার (অমাত্য), সুনিশ (সচিব), ওয়াকিয়ানবীশ (রাজকার্য্যের বিবরণী লেখক), দবীর (সামন্ত), সেনাপতি, পণ্ডিতরাও এবং ন্যায়াধীশ লইয়া অষ্টপ্রধান গঠিত। পণ্ডিতরাও

অষ্টপ্রধান

ধর্মবিষয়ে এবং ন্যায়াধীশ ব্যতীত অপর সকল মন্ত্রীকে স্ব স্ব বিভাগীয় কর্তব্যের সহিত সামরিক কর্তব্যও পালন করিতে হইত।

শিবাজীর রাজ্য কয়েকটি প্রান্ত বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক প্রদেশ একজন

শাসনকর্তার অধীনে ছিল। রাজা প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে নিযুক্ত বা বরখাস্ত করিতেন। তাঁহারাও প্রত্যেকে আটজন প্রধান কর্মচারীর সাহায্যে শাসন করিতেন। কর্ণাটকের শাসনকর্তার ক্ষমতা অপরাপর শাসনকর্ত অপেক্ষা অধিক ছিল। প্রান্ত বা প্রদেশগুলি আবার কতিপয় পরগণা বা তরফে বিভক্ত ছিল এবং রাজ্যের ক্ষুদ্রতম অংশ ছিল গ্রাম। শিবাজী গ্রামগুলির

রাজ্যশাসন ব্যবস্থা

পঞ্চায়েৎ শাসনব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দিয়াছিলেন। গ্রামের শাসনদায়িত্ব কর্তৃপক্ষ 'দেশমুখ' বা 'দেশমুখ্য' নামক কর্মচারীর উপর উত্তরাধিকারসূত্রে ন্যস্ত থাকিত।

সমগ্র জমির পরিমাপ করিয়া উৎপন্ন শস্যের দুই পঞ্চমাংশ রাজকররূপে ধার্য হইয়াছিল। কৃষকগণ শস্য বা নগদ টাকা দ্বারা রাজস্ব পরিশোধ করিতে পারিত।

রাজস্ব

রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে যথেষ্ট দৃঢ়তা অবলম্বিত হইত, কিন্তু কৃষকদের উপর কোন অত্যাচার না হয় তৎপ্রতি শিবাজী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। মহারাষ্ট্র পর্বতসঙ্কুল অনুর্বর দেশ ছিল বলিয়া উৎপন্ন শস্যের প্রাচুর্য ছিল না। ফলে রাজকোষে কম অর্থাগম হইত। তজ্জন্য শিবাজী স্বরাজ্যের বহির্ভূত হইতে অঞ্চল 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' নামে দুই প্রকার বিশেষ কর আদায় করিতেন। 'চৌথ' অর্থ রাজস্বের এক চতুর্থাংশ আর 'সরদেশমুখী' অর্থ রাজস্বের এক দশমাংশ। বিজাপুর ও মুঘল সাম্রাজ্যের দক্ষিণাংশ হইতে কর আদায় করা হইত।

সামরিক সংগঠন ব্যবস্থা :—নূতন পদ্ধতিতে মারাঠা সামরিক বিভাগের সংগঠন ব্যবস্থা শিবাজীর সামরিক প্রতিভার অন্যতম নিদর্শন। শিবাজীর সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষগণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। নিম্নতম সৈন্যাধ্যক্ষের উপাধি ছিল 'নায়ক'—নায়কের উপর হাবিলদার এবং হাবিলদারের উপর জুমলাদার। সর্বপ্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ 'সনৌবৎ' বা সেনাপতি নামে অভিহিত হইত।

শিবাজীর পূর্বে মারাঠাদের কোন স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ছিল না। শিবাজী পূর্বপ্রথা রহিত করিয়া সৈন্যদের জন্য উপযুক্ত বেতন ও আবাসস্থলসহ স্থায়ী সৈন্যদল গঠন করেন। সৈন্যাধ্যক্ষগন জায়গিরের পরিবর্তে নগদ বেতন পাইতেন। তাঁহার সামরিক দলের দুইটি প্রধান অঙ্গ ছিল—অশ্বারোহী সৈন্য ও নৌবহর। অশ্বারোহী বাহিনী বারগীর (বর্গী) ও শিলাদার। বারগীগণকে রাষ্ট্র হইতে পরিচ্ছদ ও অস্ত্রাদি দেওয়া হইত। শিলাদারগণ নিজস্ব পরিচ্ছদ, অশ্ব ও অস্ত্রাদিসহ সৈন্যদলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যোগদান করিত। শিবাজীর সামরিক সাফল্যের মূলে ছিল সৈন্যবিভাগের জন্য কঠোর নিয়মানুবর্তিতা। প্রবর্তিত নিয়মগুলি যাহাতে কঠোরভাবে প্রতিপালিত হয় তৎপ্রতিও তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। মারাঠা শিবিরে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, ইহা অমান্য করিলে মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত ছিল। গাভী লুণ্ঠন নিষিদ্ধ ছিল; ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করিতে দেওয়া হইত না। মূল্যবান লুণ্ঠিত দ্রব্য রাজার প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইত। মারাঠাগণ স্বল্পাহারী, ব্যসন-বিমুখ ও পরিশ্রমী ছিল। তজ্জন্য বিলাসপ্রিয় ও শ্রমবিমুখ মুঘল সৈন্যদল তাহাদিগকে

বারগীর ও শিলাদার

মারাঠা সৈন্যের সাফল্যের কারণ

পরাজিত করিতে পারে নাই। শিবাজী কদাচিত মুঘলদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ করিতেন। ইহার পরিবর্তে তিনি রসদ লুণ্ঠন ইত্যাদির দ্বারা মুঘলবাহিনীকে বিব্রত করিতেন। ইহাও শিবাজীর সামরিক সফলতার অন্যতম কারণ।

নৌ-বহর

শিবাজী একটি শক্তিশালী নৌ-বহরও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শিবাজীর নৌ বহর তৎকালীন ইউরোপীয় নৌ-বহর অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল না। এই নৌ বহর শিবাজীর সময়ে তাদৃশ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে না পারিলেও পরবর্তীকালে নৌ-সেনাপতি আংগ্রিয়ার সর্দারদের অধীনস্থ নৌবহর ইংরেজ, পর্টুগীজ ও ওলন্দাজ নৌ বাহিনীর পক্ষে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছিল।

দুর্গ

শিবাজীর সামরিক ব্যবস্থায় দুর্গ সমূহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল। শিবাজী স্বয়ং বহু দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক দুর্গের কর্তৃত্বভার একাধিক লোকের উপর প্রদত্ত হইত। পাছে দুর্গরক্ষকগণ বিশ্বাসঘাতকতা করে তজ্জন্য এই সতর্কতার বন্দোবস্ত ছিল।

শিবাজীর চরিত্র ও কৃতিত্বঃ—শাসক ও ব্যক্তি হিসাবে ছত্রপতি শিবাজী ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র আদর্শস্থানীয় ছিল। তিনি নিজেকে 'গো-ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক' বলিয়া বর্ণনা করিতেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি কখনও গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেন নাই, পরধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা বা অন্যায় আচরণ প্রদর্শন করেন নাই। শেখ মহম্মদ নামক সাধুকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। আক্রমণ বা লুণ্ঠনকালে তিনি মসজিদ বা কোরাণকে কখনও কলুষিত বা অপমানিত হইতে দেন নাই। নারীর প্রতি সম্মান শিবাজীর চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব। তাঁহার সৈন্য বা রাজকর্মচারীবর্গ যাহাতে শিশু ও রমণীর নিগ্রহ বা অসম্মান না করে সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। মুসলমান ঐতিহাসিক কাফি খাঁ' শিবাজীকে 'নরকের কুকুর' বলিয়া গালি দিয়াছেন। কিন্তু তিনিও শিবাজীকে এই বিষয়ে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। রাজনৈতিক কারণে শিবাজীকে অনেক সময় মিথ্যা বা প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। কিন্তু ঔরংজেব বা আফজল খাঁ-র মত ধূর্ত প্রতিপক্ষের সহিত 'শঠে শাঠ্যম্' নীতি অবলম্বন করা ব্যতীত শিবাজীর উপায়ান্তর ছিল না।

চরিত্র

পৃথিবীর ইতিহাসের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে শিবাজীকে অন্যতম মহাপুরুষ বলা যাইতে পারে। মুঘল সাম্রাজ্য যখন শক্তি ও প্রতিপত্তির সর্ব্বোচ্চ শিখরে তখন একক প্রচেষ্টার বলে ভারতে এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা শিবাজীর অসামান্য প্রতিভারই পরিচায়ক।

কৃতিত্ব

ক্ষুদ্র এক জায়গীরদারের অবহেলিত নিরক্ষর পুত্র স্বীয় বীরত্ব ও কূটনীতির বলে কেবল যে ছত্রপতি হইয়াছিলেন তাহা নহে তিনি এমন এক সুদৃঢ় শাসন ও সামরিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিলেন যাহা শতাধিক বৎসর প্রবল প্রতিকূলতার মুখেও বর্তমান ছিল। শিবাজীর সর্বাধিক কৃতিত্ব এই যে তিনি শতধাবিভক্ত খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত মারাঠাগণকে এক নূতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া এক পরাক্রান্ত জাতিরূপে গড়িয়া তোলেন। মারাঠা জাতীয়তাবাদের প্রথম উদ্বোধক ও কার্য্যকারক হিসাবে শিবাজীর অবদান সর্বাপেক্ষা স্মরণযোগ্য। মুসলমান শক্তির প্রতিকূলতায় শতাব্দীর পর শতাব্দী স্বাধীন হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ব্যর্থ হইতেছিল। কিন্তু শিবাজী সেই স্বপ্নকে স্বীয় প্রতিভাবলে কার্য্যে রূপায়িত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মারাঠা রাষ্ট্র ও সামরিক ব্যবস্থাকে তিনি স্বীয় উদ্ভাবিত রীতিনীতির দ্বারা গড়িয়া তোলেন, রণজিৎ সিংহের মত মত বিদেশী ফরাসী)-দের দ্বারা তিনি সৈন্যদলকে শিক্ষিত করেন নাই। মারাঠা-বাহিনী স্বজাতীয় লোকের দ্বারাই পরিচালিত হইত। শিবাজী নিরক্ষর ছিলেন, অপর কোন উন্নত রাষ্ট্রের দরবার, নগর বা সৈন্যব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করার সুবিধা তাঁহার জোটে নাই; এতৎ সত্ত্বেও স্বীয় সহজ প্রতিভা ও চেষ্টার বলে তিনি একটি সুসংহত রাষ্ট্র, এক অজেয় বাহিনী এবং এক কল্যাণকর ও দক্ষ শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র জাতি ও রাষ্ট্রগঠনে তাঁহাকে সমকালীন শক্তি-চতুষ্টয়—মুঘল সাম্রাজ্য, বিজাপুর, পর্টুগীজ অঞ্চল ও জাঞ্জিরার হাবসীদের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তিনি বিজাপুর ও দিল্লীর তীব্র প্রতিপক্ষতা অগ্রাহ্য করিয়া এক নূতন রাষ্ট্র ও জাতি গড়িয়া তুলিলেন এবং প্রমাণিত করিলেন যে হিন্দু-জাতি কেবলমাত্র জমায়েতদার (অধস্তন কর্মচারী) ও চিটনিস (কেরানী)-এর সৃষ্টি করেনা, তাহাদের মধ্য হইতে লোকনায়ক এমন কি-'ছত্রপতি' (King of Kings)-ও উদ্ভূত হইতে পারে।

বিপক্ষতার মধ্যে জাতি ও শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন

কাফি খাঁ প্রমুখ বহু দেশী ও বিদেশী ঐতিহাসিক শিবাজীকে নিছক পররাষ্ট্র আক্রমণকারী দস্যু ('freebooter') বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহাদের বিচারে শিবাজী ছিলেন আলাউদ্দিন বা তৈমুরের হিন্দু সংস্করণ মাত্র। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে এই মন্তব্য অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়। তাঁহার স্বল্পপরিসর জীবন শত্রুদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যই ব্যয়িত হইয়াছিল—অর্থাৎ উদ্যোগপর্বেই তাঁহার জীবন ব্যয়িত হয়, ফললাভ তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি মারাঠা জাতিকে সঞ্জীবিত করিয়া তাঁহাদের জন্য একটি সুগঠিত রাষ্ট্রের পত্তন করিবার সার্থক চেষ্টা করেন। এই

উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য তাঁহাকে মুঘল সাম্রাজ্য বা প্রতিবেশী দক্ষিণী রাষ্ট্রসমূহের অঙ্গ হইতে প্রয়োজনীয় অঞ্চল বলপ্রয়োগে স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইয়াছে। ইহাতে দোষাবহ কিছু ছিল না। কেননা দক্ষিণী রাষ্ট্রসমূহের নিজস্ব কোন স্বাভাবিক রাষ্ট্রসীমা ছিল না কাজেই আত্মরক্ষার জন্যই হউক বা আগ্রাসী মনোবৃত্তির জন্যই হোক পরস্পর পরস্পরকে সুযোগমত আক্রমণ করিয়া স্বীয় রাজ্যের পরিসর বৰ্দ্ধিত করিয়া লইত। ইত্যবস্থায় মুঘল সাম্রাজ্য বা বিজাপুর রাষ্ট্রকে বঞ্চিত করিয়া জাতীয়তার ভিত্তিতে গঠিত নব রাষ্ট্র সৃষ্টি করা শিবাজীর পক্ষে অন্যায় হয় নাই।

ঔরংজেবের উত্তরাধিকারিগণ :- মৃত্যুর পরে পুত্রগণের মধ্যে গৃহযুদ্ধ নিবারণ করার জন্য ঔরংজেব মৃত্যুর পূর্বেই জীবিত তিন পুত্র মোয়াজ্জেম, আজম ও কামবকস্ এর মধ্যে সাম্রাজ্য বণ্টন করিয়া দিয়া যান। ঔরংজেবের মৃত্যুর পরে পুত্রগণ পিতার নির্দেশ অমান্য করিয়া সিংহাসনের জন্য যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন। এই গৃহযুদ্ধে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মোয়াজ্জেমের হস্তে অপর ভ্রাতৃদ্বয় আজম ও কামবকস্ পরাজিত ও নিহত হন। মুয়াজ্জেম বাহাদুর শাহ বা প্রথম শাহ আলম নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। (১৭০৮)।

প্রথম বাহাদুর শাহ (১৭০৮—১২)

১৭১২ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হইলে তাঁহার চারি পুত্র জাহান্দার শাহ, আজিম-উস-শান, জাহান শাহ ও রফি-উস-শানের মধ্যে গৃহযুদ্ধ উপস্থিত হইল। তিন ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া জাহান্দার শাহ সিংহাসনে বসলেন। জাহান্দার শাহ অপদার্থ ছিলেন। আজিম উস-শানের পুত্র ফররুকসিয়ার জাহান্দারকে হত্যা করিয়া সম্রাট হইলেন (১৭১৩)। ফররুকসিয়র নিজের চেষ্টায় সম্রাট হইতে পারেন নাই। সেই সময়ে মুঘল দরবারের অভিজাত শ্রেণী ইরাণী ও হিন্দুস্থানী এই দুইটি দলে বিভক্ত ছিলেন। ইরাণীদলের অন্যতম নেতা ছিলেন জুলফিকার খাঁ। জুলফিকার খাঁর সাহায্যেই জাহান্দার শাহ সিংহাসনে বসিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফররুকসিয়ার জাহান্দার সাহের সঙ্গে জুলফিকার খাঁ-কেও হত্যা করিয়াছিলেন। ফররুকসিয়ার হিন্দুস্থানী দলের নায়ক সৈয়দ ভ্রাতৃযুগল হুসেন আলি ও আবদুল্লা খাঁর সাহায্যে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। ফররুকসিয়ার নিজে অপদার্থ ছিলেন সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে সাম্রাজ্যশাসনের প্রকৃত ক্ষমতা 'সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ে'র হাতে আসিল। ক্রমে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভুত্ব অসহ্য হইয়া উঠিলে

জাহান্দার শাহ

ফররুকসিয়ার

'সৈয়দ' ভ্রাতৃদ্বয়

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধী কয়েকজন ওমরাহের পরামর্শে ফররুকসিয়ার ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে সৈয়দ ভ্রাতারা ক্রুদ্ধ হইয়া ফররুকসিয়ারকে প্রথমে সিংহাসনচ্যুত ও পরে অন্ধ করিয়া হত্যা করিলেন। ১৭১৯)। অতঃপর সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় সাম্রাজ্যের 'নৃপতিস্রষ্টা' হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা নিজেদের প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য ক্রমান্বয়ে বাহাদুর সাহের দুই পৌত্র, রফি-উশ-শানের পুত্রদ্বয় রফি-উদ দরাজাত ও রফি উদ দৌলাকে সিংহাসনে বসাইলেন। অল্পকালের মধ্যে ইহাদের মৃত্যু হওয়ায় জাহান শাহের পুত্র রোহ শান আখতার সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যে মহম্মদ শাহ নামে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মহম্মদ শাহ দীর্ঘকাল (১৭১৯-৪৮) পর্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মহম্মদ শাহ

তিনি সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তপুত্তলিকা হইয়া থাকিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মহম্মদ শাহ দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিজাম-উল মুলুকের সঙ্গে যুক্ত হইয়া সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের চেষ্টা করিলেন। হুসেন যখন নিজামকে শাস্তি দিবার জন্য মালবের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তিনি নিহত হন। আবদুল্লা অপর একজনকে সিংহাসনে বসাইয়া স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ধৃত ও বিষ প্রয়োগে নিহত হইলেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভাব হইতে অব্যাহতি পাইয়া মহম্মদ শাহ কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ নিজাম-উল-মুলুককে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করেন।

নিজাম-উল মুলুক

নিজাম উল মুলুক কিছুদিন এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সাম্রাজ্যের সেবা করেন। কিন্তু মন্ত্রীত্ব ভাল না লাগায় তিনি শীঘ্রই দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া হায়দ্রাবাদে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা পরবর্তীকালে হায়দ্রাবাদের নিজাম রাজ্য নামে পরিচিত হয়। মহম্মদ শাহের অপদার্থতার ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল দিল্লীর আধিপত্য অস্বীকার করিতে লাগিল, হায়দ্রাবাদ প্রকৃত প্রস্তাবে নিজামের অধীনে স্বাধীন রাজ্যরূপে পরিগণিত হইতে লাগিল। অযোধ্যার শাসনকর্তা সাদৎ খাঁ এবং বঙ্গদেশের শাসনকর্তা আলিবর্দী খাঁও কার্যতঃ স্বাধীন হইয়াছিলেন। উপরন্তু আগ্রার নিকটবর্তী জাঠগণ, এবং রোহিলাখণ্ডের রুহেলা আফঘানগণ স্বাধীন হইয়া উঠিল। পাঞ্জাবে শিখগণ প্রবল হইয়া উঠিল এবং সর্বোপরি নাদির শাহ (১৭৩৯) ও আহম্মদ শাহ দুররাণী বা আবদালীর (১৭৪৮) আক্রমণে মুঘল সাম্রাজ্যের মহিমা একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

নাদির শাহ ও আহম্মদ শাহ আবদালীর ভারত আক্রমণ

মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র আহম্মদ শাহ ছয় বৎসর (১৭৪৮—৫৪)

রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে আফঘানিস্থানের অধিপতি আহম্মদ শাহ দুররাণী দুইবার হিন্দুস্থান আক্রমণ করিয়া পাঞ্জাব ও মুলতান অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া জাহান্দার শাহের পুত্র আজিজউদ্দিনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করান হয়। আজিজ-উদ্দিন দ্বিতীয় আলমগীর উপাধি ধারণ করেন। সত্বর দ্বিতীয় আলমগীর সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয় শাহ আলম, দ্বিতীয় আকবর ও দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বৃত্তিভোগী ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহে লিপ্ত থাকার অভিযোগে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ১৮৫৮ খৃঃ রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন, তথায় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আহম্মদ শাহ

শেষ সম্রাট
দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ

নাদির শাহের ভারত আক্রমণ। নাদির শাহ প্রথম জীবনে পারস্যের সম্রাটের অধীনে রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। অচিরেই তিনি পারস্যের প্রধান কর্তা হইয়া উঠেন এবং পারস্যের সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নাদির শাহ নামে পারস্যের অধিপতি হন।

১৭৩১ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহ কান্দাহারের আফঘান দুর্গ অধিকার করেন। বহু আফঘান মুঘল সাম্রাজ্যের কাবুল প্রদেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। নাদির শাহ ইহার প্রতিবাদ করিয়া দিল্লীতে দূত প্রেরণ করেন। পারস্যের দূতকে দিল্লীর দরবারে আটক রাখায় ক্রুদ্ধ হইয়া নাদির শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ঔরংজেব পরবর্তী মুঘল সম্রাটগণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রক্ষা সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ছিলেন। ফলে নাদির শাহ একপ্রকার বিনা প্রতিরোধেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করিয়া গজনী ও কাবুল অধিকার করিলেন। অতঃপর তিনি পেশোয়ারে প্রবেশ পূর্বক পাঞ্জাব অধিকার করিয়া ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পানিপথের অনতিদূরে কার্ণালে আসিয়া উপস্থিত হন। সম্রাট মহম্মদ শাহ নাদির শাহকে বাধা

নাদির শাহ

দিবার জন্য অগ্রসর হইয়া পরাজিত হইলেন এবং মোট ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিবার শর্তে নাদির শাহের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। বিজয়ী নাদির শাহ এক প্রকার বন্দী মহম্মদ শাহকে সঙ্গে করিয়া দিল্লীতে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে নাদির শাহের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া এক গুজব রটিল। এই মিথ্যা সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া দিল্লীবাসিগণ নাদির শাহের কিছু সৈন্যকে হত্যা করিল। স্বীয় লোকজনের মৃত্যু সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া নাদির শাহ নির্বিচারে দিল্লীবাসীদিগকে হত্যা করিবার জন্য নিজের সৈন্যদলকে আদেশ করিলেন। নাদির শাহের আদেশ প্রতিপালিত হইল। দিল্লীর প্রায় অধিকাংশ গৃহ লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত করা হইল। হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ পৈশাচিকভাবে চলিতে লাগিল। এই অত্যাচারের হস্ত হইতে হিন্দু মুসলমান কেহই নিষ্কৃতি পায় নাই। অতঃপর সম্রাট মহম্মদ শাহের কাতর অনুরোধে নাদির শাহ তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে লুণ্ঠন ও অত্যাচার হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। দিল্লীতে দুইমাস অবস্থান করিয়া লুণ্ঠিত প্রচুর ধনরত্ন লইয়া নাদির শাহ পারস্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শাহ্‌জাহানের বিখ্যাত কোহিনূর মণি, ময়ূর সিংহাসন, নগদ ১৫ কোটি টাকা, বহু মণি-মাণিক্য, মূল্যবান পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র এবং রাজভাণ্ডারের যাবতীয় মূল্যবান দ্রব্য তিনি আত্মসাৎ করিলেন। সেই সঙ্গে তিনি তিন শত হস্তী, দশ সহস্র অশ্ব ও অসংখ্য উষ্ট্রও সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। কেবল ইহাই নহে, সিন্ধুনদের পারবর্তী মুঘল সাম্রাজ্যের সিন্ধু, কাবুল এবং পশ্চিম পাঞ্জাবও নাদির শাহের হস্তে অর্পণ করিতে হইল। নাদির শাহের আক্রমণের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের যেটুকু প্রতিপত্তি অবশিষ্ট ছিল তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইল এবং ইহার অন্তঃসারশূন্যতা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইল। এই আক্রমণের আঘাত কাটাইয়া উঠিবার কোন সুযোগ ঘটিল না কেননা নাদির শাহের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া অনতিকাল পরে আহম্মদ শাহ দুর্রাণী পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন।

মহম্মদ শাহ পরাজিত হইলেন

নাদির শাহের দিল্লী প্রবেশ

লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড

ফল

শিবাজীর উত্তরাধিকারিগণ :— ঔরংজেবের জীবিত অবস্থায় মারাঠাগণ 'জাতীয় যুদ্ধের' দ্বারা মুঘলশক্তিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সম্রাটের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মারাঠা অভ্যুত্থান প্রতিহত করা সম্ভবপর হয় নাই, শিবাজীর মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র শম্ভুজী সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতার ন্যায় মুঘলদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং সম্রাটের বিদ্রোহী পুত্র দ্বিতীয় আকবরকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। শম্ভুজী মুঘলদের সহিত

শম্ভুজী

যুদ্ধ করিবার সময়ে বন্দী হন এবং বন্দী দশায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। শম্ভুজীর পরাজয় ও হত্যার পরে মুঘলবাহিনী বহু মারাঠা দুর্গ এমন কি মারাঠাদের রাজধানী রায়গড়ও অধিকার করে। রায়গড় অধিকার করার সময়ে শম্ভুজীর শিশুপুত্র শাহু ও পরিবারবর্গ মুঘলদের হস্তে বন্দী হয়। কিন্তু শিবাজীর অন্যতম পুত্র রাজারাম মুঘলদের হস্ত এড়াইয়া গিয়া কর্ণাটে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেইস্থান হইতে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে আরম্ভ করিলেন। শান্তাজী ঘোড়পাড়ে, ধনাজী যাদব প্রভৃতি মারাঠা নায়কগণ ক্রমাগত মুঘলবাহিনীকে বিব্রত ও শক্তিহীন করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত আট বৎসর যুদ্ধ বিগ্রহের পরে মুঘলরা জিঞ্জি দুর্গ অধিকার করিলে রাজারাম সাতারাতে রাজধানী স্থাপন করিয়া মুঘলগণকে বিপর্যাস্ত করিতে লাগিলেন। ১৭ ০খৃষ্টাব্দে মুঘলসৈন্য সাতারাও অধিকার করিয়া লইল এই ভাবে ঔরংজেব মারাঠা প্রতিরোধ কিয়দংশ দুর্বল করিয়া তাহাদের দুর্গগুলি অধিকার করিয়া লইলেন। মারাঠাগণ ইহাতে দমিল না। তাহারা নূতন উদ্যমে আক্রমণ করিয়া অপহৃত দুর্গসমূহ পুনরাধিকার করিয়া লইল। ঔরংজেব কোন ক্রমে মারাঠাশক্তিকে দমন করিতে সক্ষম হইলেন না।

রাজারাম

ঔরংজেবের ব্যর্থতা

ইতিমধ্যে ১৭০০ খৃষ্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু হইলে তাঁহার বিধবা পত্নী তারাবাঈ তাঁহার শিশুপুত্র তৃতীয় শিবাজীকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া মুঘলদের বিরুদ্ধে আক্রমণনীতি গ্রহণ করিলেন। মারাঠাগণ প্রবল বিক্রমে মালব, গুজরাট, বেরার এমন কি আহম্মদনগর আক্রমণ করিতে লাগিল। মুঘলদের আপ্রাণ চেষ্টার ফলেও মারাঠাদের আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভবপর হইল না।

তারাবাঈ

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ঔরংজেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র আজম শাহ শিবাজীর পৌত্র শাহু বা দ্বিতীয় শিবাজীকে মুক্ত করিয়া দেন। এই মুক্তিদানের মধ্যে কোন প্রকার মহানুভবতা ছিল না, রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই শাহুকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। শাহুকে মুক্ত দিলে মারাঠাগণের মধ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইবে ইহাই সম্রাট প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যাশানুযায়ী কার্য্য ঘটিল, মারাঠাদের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হইল। শাহু মুক্তিলাভ করিয়া সিংহাসন দাবি করিলেন। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে সাতারার দুর্গে শাহুর অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। শাহু মারাঠাদের রাজা, বলিয়া স্বীকৃত হইলে তারাবাঈ কোলাপুর হইতে পানহালার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শাহুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে লাগিলেন। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে তারাবাঈর পুত্রের মৃত্যু ঘটিলে রাজারামের অন্য পত্নী রাজসবাঈ তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় শম্ভুজীর নামে রাজত্ব করিতে

লাগলেন। সাতারায় শাহুর অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। মারাঠারাজ্যের অল্প সংখ্যক নেতাই শাহুকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইল। এই সময়ে বালাজী বিশ্বনাথ নামে কোঙ্কনের জনৈক চিৎপাবন ব্রাহ্মণের অভ্যুদয় ঘটিল। তিনিই বুদ্ধি ও বাহুবলে শাহুকে প্রতিষ্ঠিত এবং মারাঠা সাম্রাজ্যকে সংহত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন।

বালাজী বিশ্বনাথ কোঙ্কনের এক চিৎপাবন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে অতি সাধারণ রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী হইতে শাহুর 'পেশোয়া' পদে উন্নীত হন। পূর্বে মারাঠা রাজ্যে রাজার স্থানই সর্বাগ্রে ছিল, তৎপরে 'প্রতিনিধি' এবং 'পেশোয়া'র স্থান ছিল। বালাজী বিশ্বনাথের আমলে এই নিয়মের পরিবর্তন ঘটিল। পেশোয়া কেবল 'প্রতিনিধি'র উর্দ্ধে স্থান পাইলেন না, প্রকৃতপক্ষে রাজাও পশ্চাতে অপসৃত হইলেন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পেশোয়াই সর্বময় কর্তা হইলেন। এইরূপে বালাজী বিশ্বনাথের আমল হইতে পেশোয়ার প্রাধান্য প্রবর্তিত হইল। বালাজী বিশ্বনাথ সমগ্র মারাঠারাজ্যে এক অভিনব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করিলেন যাহার ফলে সমস্ত মারাঠা দলপতিগণ অর্থনৈতিক দিক দিয়া পরস্পরের সঙ্গে অপরিহার্য হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে মারাঠাগণ মুঘল সম্রাটের নিকট দাক্ষিণাত্যের ছয়টি সুবায় 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' আদায়ের ভার পাইয়াছিলেন। চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের পর তাহা রাজা ও মারাঠা দলপতিগণের মধ্যে বণ্টন হইত। সরদেশমুখী সবটা রাজা পাইতেন; চৌথের এক চতুর্থাংশও তাঁহাকে দেওয়া হইত এবং ইহার শতকরা ৬৬ ভাগ মারাঠা দলপতি ভাগ করিয়া লইতেন। এইভাবে সম্মিলিতভাবে সরদেশমুখী ও চৌথ আদায় এবং পরে তাহা বণ্টন এই ব্যবস্থা মারাঠা শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তুলিল এবং মারাঠা সাম্রাজ্যবাদের পত্তন করা হইল। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু হয়। বালাজী বিশ্বনাথ মারাঠা সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

বালাজী বিশ্বনাথ ১৭১৩-২০

বালাজী বিশ্বাথের পরে তাঁহার পুত্র বাজিরাও পেশোয়া হন। রাজনৈতিক বুদ্ধি প্রাখর্য, সামরিক শক্তি ও কর্মনিষ্ঠার দিক দিয়া তিনি পিতার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বিগতপ্রায় মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তির উপরে তিনি মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবিত সাম্রাজ্যের নামকরণ করিয়াছিলেন হিন্দুপাদ-পাদশাহী। তাঁহার পরিকল্পনায় উৎসাহিত হইয়া বহু দলপতি মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তারে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। অম্বরের সোয়াই রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ এবং বুন্দেলখণ্ডের রাজপুত রাজা ছত্রশাল বাজিরাও-এর সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হইলেন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে বাজিরাও সসৈন্যে দিল্লীর সন্নিকটে উপস্থিত

বাজিরাও ১৭২০-৪০

হন সম্রাট ভীত হইয়া নিজামের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ভূপালের সন্নিকটে নিজাম বাজিরাও-হস্তে পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সন্ধির শর্ত্ত অনুসারে বাজিরাও সমগ্র মালব এবং নর্মদা ও চম্বলের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল প্রাপ্ত হইলেন। সম্রাট
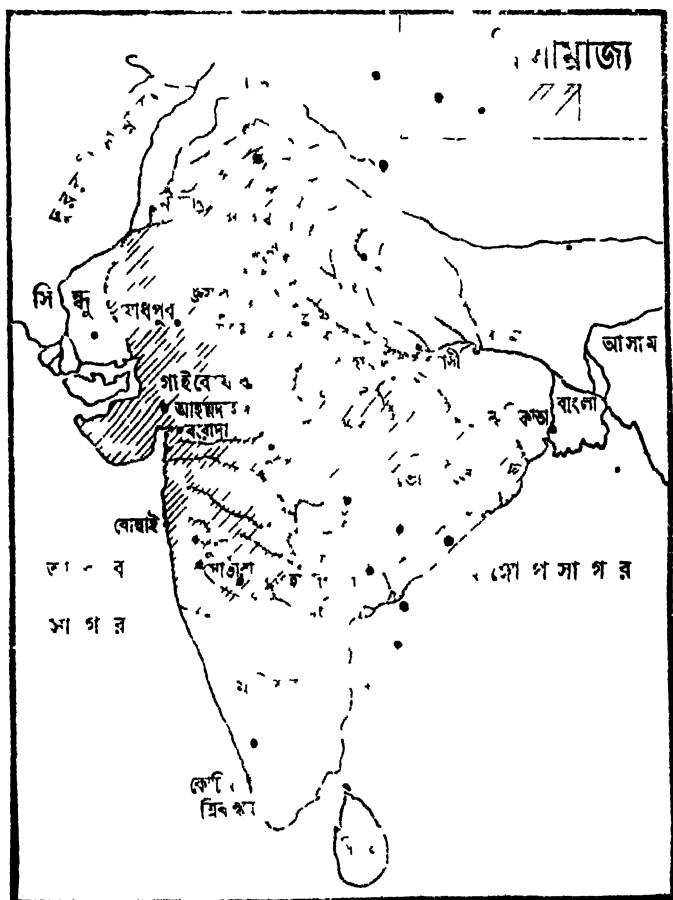
ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৫০ লক্ষ টাকা পেশোয়াকে দিলেন। ১৭৩৯খৃষ্টাব্দে বাজিরাও-এর ভ্রাতা চিমনজী আপ্পা পর্টুগীজদের হস্তে হইতে সালসেট ও বেসিন অধিকার করেন। এই সময়ে নাদির শাহের ভারত আক্রমণের সংবাদ পৌঁছিল। নাদির শাহকে সম্মিলিত

তাবে প্রতিরোধ করার জন্য বাজিরাও প্রতিবেশী মুসলমান রাষ্ট্র সমূহের সঙ্গে বিবাদ মিটাইয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু প্রস্তুত হইবার পূর্বে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইল।

ঐতিহাসিকগণ যে মারাঠা যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখ করিয়াছেন বাজিরাও-এর আমলে তাহার উদ্ভব হয়। মারাঠা সাম্রাজ্য সিন্ধিয়ার গোয়ালিয়র রাজ্য, হোলকারের ইন্দোর রাজ্য, ভোঁসলার নাগপুর রাজ্য, গাইকোয়াড়ের বরদা রাজ্য এবং ধারের পবার রাজ্য —এই রাজ্য পঞ্চকে বিভক্ত হয়। এই সকল রাজ্য আইনতঃ পেশোয়ার কর্তৃত্বাধীনে ছিল। এইভাবে বাজিরাও এক মারাঠা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়া বিশাল সাম্রাজ্যের পত্তন করেন।

আহম্মদ আবদালী বা দুররাণীর ভারত আক্রমণঃ—১৭৪৭ সালে নাদির শাহ নিহত হইলে আবদালী নামক তাঁহার জনৈক আফগান অনুচর আফঘানিস্থানে এক স্বাধীন রাজ্যের পত্তন করেন এবং 'দুরর্-ই-দুরবান' উপাধি গ্রহণ করেন। নাদির শাহের ভারত আক্রমণের কালে তিনিও ভারতে আসিয়াছিলেন এবং ভারতের ঐশ্বর্য্য ও ইহার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছিলেন। তজ্জন্য রাজ্যলাভ করিয়াই ১৭৪৮ হইতে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কয়েকবার তিনি ভারতবর্ষ অভিযান করেন। কান্দাহার কাবুল এবং পেশোয়ার অধিকার করার পর তিনি ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ভারত আক্রমণ করেন। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে তৃতীয়বার ভারত আক্রমণ করিয়া তিনি পাঞ্জাবের মুঘল শাসনকর্ত্তা মীর মন্নুকে পরাজিত করেন এবং কাশ্মীর অধিকার করিয়া মুঘল সম্রাট আহম্মদ শাহকে সরহিন্দ পর্য্যন্ত ভূখণ্ড ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করেন। আবদালী মীর মন্নুকে পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মীর মন্নুর মৃত্যুর ফলে পাঞ্জাবে অরাজকতা দেখা দিল এবং এই সুযোগে মুঘল সম্রাট পাঞ্জাব পুনরধিকার করিয়া লইলেন। এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া আহম্মদ শাহ আবদালী চতুর্থবার ভারত অভিযান করেন (১৭৫৬) এবং দিল্লী পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। দিল্লী দুররাণীর সৈন্যদলের দ্বারা লুণ্ঠিত হয় এবং দিল্লীবাসীদের দুঃখদুর্দশার আর পরিসীমা থাকে না। মুঘল সম্রাট দুররাণীকে পাঞ্জাব, সিন্ধু, কাশ্মীর ও সরহিন্দ জেলা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। ভারত পরিত্যাগের পূর্ব্বে দুররাণী পুত্র তিমুর শাহকে পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া যান। তিমুর শাহের অত্যাচারে উৎপীড়িত শিখগণ বিদ্রোহী হইয়া মারাঠাদের সাহায্য গ্রহণ করেন। পেশোয়া বালাজী বাজিরাও-এর ভ্রাতা রঘুনাথ রাও পাঞ্জাব অধিকার করিয়া আফঘানদিগকে পাঞ্জাব হইতে বিতাড়িত করেন। পুত্র তিমুরের দুর্গতির প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আহম্মদ শাহ দুররাণী পঞ্চমবার ভারতবর্ষ

আক্রমণ করিয়া পাঞ্জাব পুনরায় হস্তগত করেন। এইবার মারাঠাগণের সহিত আহম্মদ শাহের সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল, কেননা মুঘলোত্তর হিন্দুস্থানে আধিপত্য স্থাপনের জন্য উভয়ে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী পাণিপথের প্রান্তরে আহম্মদ শাহের সৈন্যদলের সঙ্গে মারাঠাদের শক্তি পরীক্ষা হইল। ইহা তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ নামে খ্যাত। এই যুদ্ধে মারাঠাগণ পরাজিত হন।

তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ ১৭৬১

আহম্মদ শাহ আবদালীর ভারতবর্ষ আক্রমণের ফলে তাঁহার ব্যক্তিগত তেমন সুবিধা হয় নাই সত্য, কিন্তু ইহার ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে নানাপ্রকার পরিবর্তন আসিয়াছে। প্রথমতঃ, দুররাণীর আক্রমণের ফলে ধ্বংসমান মুঘল সাম্রাজ্য আরও ধ্বসিয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মারাঠাদের ভারতে সার্বভৌম সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা লুপ্ত হয় এবং এই সুযোগে ইংরেজ বণিকগণ ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করে। তৃতীয়তঃ, দুররাণীর আক্রমণের ফলে প্রকারান্তরে শিখজাতি অভ্যুত্থানের সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

ফল

মারাঠা শক্তির পতন :—বাজিরাও-এর মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বালাজী বাজিরাও পেশোয়া হন। বালাজী বাজিরাও পিতার ন্যায়ই সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন। কিন্তু তিনি দুইটি বিষয়ে পিতার আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মারাঠা শক্তির ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত করেন। প্রথমতঃ, তিনি মারাঠাদের সামরিক ব্যবস্থার গুরুতর পরিবর্তন সাধন করেন। লঘু পদাতিক বাহিনীই মারাঠাদের সামরিক বিভাগের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিল। কিন্তু বালাজী বাজিরাও মারাঠাদের প্রাচীন যুদ্ধরীতি পরিত্যাগ করেন এবং পাশ্চাত্য যুদ্ধরীতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনীতে মুসলমান ও বিদেশী সৈন্য ও সেনাপতি গ্রহণ করেন। এই পরিবর্তনের ফলে মারাঠাদের সামরিক শক্তি ও জাতীয় বাহিনীর ঐক্য বিনষ্ট হয়।

বালাজী বাজিরাও ১৭৪০-৬০

দ্বিতীয়তঃ, সমস্ত হিন্দুপ্রধানকে এক পতাকামূলে সমবেত করিয়া 'হিন্দুপাদ পাদশাহী'র যে আদর্শ বাজীরাও গ্রহণ করিয়াছিলেন বালাজী বাজিরাও তাহা ত্যাগ করেন এবং মারাঠা সৈন্যদল হিন্দু-মুসলমান নির্বিচারে সকল জাতি ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযান, অত্যাচার ও লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহাতে মারাঠা সাম্রাজ্য রাজপুত জাতি ও সমগ্র হিন্দুজাতির সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইল এবং ভবিষ্যতে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার সময়ে মারাঠা নায়কগণ ভারতের সমস্ত হিন্দুশক্তিকে একত্রিত করিতে সমর্থ হইল না। তবে বালাজী বাজিরাও-এর সময়ে যে মারাঠা শক্তি ও প্রতিপত্তির

সর্বোচ্চ-বিকাশ হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পেশোয়ার ভ্রাতা রঘুনাথ আহম্মদ শাহ দুররাণীর পুত্র তৈমুরকে পাঞ্জাব হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। উপরন্তু গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে মারাঠাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অধিকন্তু মারাঠাগণ দিল্লীর দরবারে আহম্মদ-শাহ-দুররাণীর প্রতিনিধি নাজিরউদ্দৌলার প্রতিপত্তি খর্ব করিয়া তৎস্থলে মারাঠাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। পাঞ্জাব হইতে তৈমুরকে বিতাড়িত করার ফলে আহম্মদ শাহ দুররাণীর সহিত মারাঠাগণের সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠে এবং পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মারাঠা শক্তি চরম আঘাত প্রাপ্ত হয়। তৃতীয় পাণিপথের পরাজয়ের আঘাত হইতে মারাঠাগণ পরে কতক পরিমাণে সারিয়া উঠিলেও মারাঠাদের পূর্বশক্তি ও গৌরব আর ফিরিয়া আসিল না। পাণিপথের যুদ্ধের আঘাত সারিয়া মারাঠা শক্তির পুনরভ্যুদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে ইংরেজগণ ভারতে বৃটিশ অধিকার শক্তিশালী ও সংহত করার সুযোগ পায়। ফলে পরবর্তী কালে মারাঠাগণ ভারতে ইংরেজ প্রতিপত্তি বিনষ্ট করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হয়। পলাশীর যুদ্ধে বৃটিশ আধিপত্যের যে বীজ উপ্ত হয়, পাণিপথের যুদ্ধ তাহাকে মূলসহ বৃক্ষে পরিণত হওয়ার অবকাশ প্রদান করে।

তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের তাৎপর্য্য

বালাজী বাজিরাওএর মৃত্যুর (১৭৬১) পরে তাঁহার সপ্তদশ বর্ষীয় পুত্র মাধবরাও পেশোয়া হন। তিনি অতি অল্প বয়সেই শাসন ও সামরিক বিষয়ে প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার নেতৃত্বে মারাঠাগণ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে তাহাদের প্রনষ্ট গৌরব ও অধিকার অনেকখানি পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অকাল মৃত্যু হয়। পাণিপথের প্রান্তরে মারাঠা সাম্রাজ্যের যে ক্ষতি হইয়াছিল, মাধব রাওয়ের অকাল মৃত্যুতে তদপেক্ষা কম ক্ষতি হয় নাই।

মাধব রাও

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ :—মুঘলযুগে যে ধরণের রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহার সাফল্য সম্রাটের ব্যক্তিগত বুদ্ধি, কর্মনিষ্ঠা ও সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের উপর নির্ভরশীল ছিল। মুঘল সম্রাটদের মধ্যে আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও ঔরংজেব বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী ও কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাদের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের বিশালতা সত্ত্বেও আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা মোটের উপর অব্যাহত ছিল। কিন্তু ঔরংজেবের পরবর্তী সম্রাটগণ দুর্বল ও অকর্মণ্য ছিলেন এবং মন্ত্রীদের হস্তে রাজ্যের শাসনভার প্রদান করিয়া তাঁহারা বিলাস ব্যসনে সময় অতিবাহিত করিতেন। যে বিশাল সাম্রাজ্যের

(১) পরবর্তী দুর্বল সম্রাটগণের রাজত্ব

গুরু দায়িত্ব বহন করা আকবর বা ঔরংজেবের পক্ষেও কঠিন হইয়াছিল, তাহা এই সমস্ত দুর্বল সম্রাটের আমলে নিঃসন্দেহে মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পরবর্তী মুঘল সম্রাট-গণের দুর্বলতা মুঘল সাম্রাজ্য পতনের প্রথম কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, মুঘল সাম্রাজ্যের বিপুল আয়তনও ইহার স্থায়িত্বের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সম্রাটের পক্ষে সাম্রাজ্যের সকল অংশের শাসনকার্য্যের সুচারুভাবে তত্ত্বাবধান করা দুরূহ হইত। কাবুল হইতে আসাম এবং কাশ্মীর হইতে মহীশূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা যে যুগে অত্যন্ত কঠিন ছিল।

(২) বিশাল আয়তন: সাম্রাজ্য শাসনের অসুবিধা

তৃতীয়তঃ, কতিপয় মুঘল সম্রাটের হিন্দুদ্বেষী নীতি মুঘল সাম্রাজ্য পতনের অন্যতম কারণ। জাহাঙ্গীরের আমল হইতে হিন্দুদ্বেষীতার চিহ্ন পারলক্ষিত হইতে থাকে। শাহ্‌জাহান এ সম্বন্ধে আরও একটু অগ্রসর হইয়া যান এবং ঔরংজেবের সময়ে তাহা উগ্রভাবে প্রকটিত হয়। ঔরংজেবের অত্যাচারের ফলেই ভারতবর্ষে মারাঠা, রাজপুত, জাঠ ও শিখগণের অভ্যুদয় ঘটে এবং এই নবজাগ্রত হিন্দুশক্তির সহিত ক্রমাগত সংঘর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য পরিশ্রান্ত ও ক্ষীণবল হইয়া পড়ে।

(৩) হিন্দু বিদ্বেষী নীতি

চতুর্থতঃ, মুঘল দরবারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের স্বার্থপর দ্বন্দ্বকলহকে মুঘল সাম্রাজ্য পতনের অন্যতম কারণ বলা যাইতে পারে। শেষ যুগের সম্রাটগণ মন্ত্রীদের হস্ত-পুত্তলিকা ছিলেন। এই সময়ে মুঘল দরবারে তুরাণী, ইরাণী এবং হিন্দুস্থানী প্রভৃতি উপদল স্ব স্ব দলীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সাম্রাজ্যের স্বার্থ উপেক্ষা করিত। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়, নিজাম-উল-মুলুক, গাজিউদ্দিন, ইমাদ উল-মুলুক প্রভৃতি উজীরগণ সাম্রাজ্যের সর্বনাশের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ছিলেন। বহু প্রাদেশিক শাসনকর্তা নামে মাত্র দরবারের বশ্যতা স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিলেন।

(৪) মন্ত্রী ও ওমরাহগণের স্বার্থবুদ্ধি ও কলহ

পঞ্চমতঃ, মুঘলদের সামরিক অপকর্ষও সাম্রাজ্য পতনের জন্য দায়ী। মুঘল বাহিনীকে কোন প্রকারে জাতীয় বাহিনী বলা যায় না। বিভিন্ন স্থান ও জাতি হইতে সৈন্যদল সংগৃহীত হওয়ায় এক জাতীয় রণপদ্ধতি অনুসৃত হইতে পারে নাই। ফলে এই মিশ্রিত বাহিনীকে সুশৃঙ্খলভাবে আয়ত্তে রাখা দুরূহ হইয়া পড়িয়াছিল। মুঘল বাহিনীর জাঁকজমক অত্যধিক থাকার ফলে ইহার ক্ষিপ্রকারিতা নষ্ট হইয়া যায়। ক্ষিপ্রগতি অথচ স্বল্প সজ্জিত মারাঠা বাহিনী অনায়াসে মুঘল বাহিনীকে বিপর্য্যস্ত করিতে সমর্থ হয়। মুঘলদের সামরিক শক্তির এই

(৫) সামরিক অপকর্ষ

অপকর্ষের সুযোগে বৈদেশিক শক্তি বারংবার সাম্রাজ্যের উপর আঘাত হানিয়া ইহাকে দুর্বল করিয়া ফেলে।

(৬) উত্তর পশ্চিম সীমান্ত সম্বন্ধে অবহেলা

ষষ্ঠতঃ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্বন্ধে অবহেলাকেও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ বলা যাইতে পারে। এই সীমান্ত পথ দিয়াই সুদূর প্রাচীনকাল হইতে আক্রমণকারীরা ভারতে আসিয়াছে, কিন্তু মুঘলগণ এই সীমান্তের প্রতিরক্ষার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। এজন্য নাদির শাহ ও আহম্মদ শাহ দুররাণী অতি

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-পথ

সহজেই মুঘল সাম্রাজ্যকে কঠোর আঘাত করিতে পারিয়াছিল। বৈদেশিক আক্রমণে মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তিক্ষয় ও মর্যাদালোপ হয়।

(৭) ঔরংজেবের ভ্রান্তনীতি

সপ্তমতঃ, ঔরংজেবের ভ্রান্তনীতি ও রাজ্যশাসন পদ্ধতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। তাঁহার ধর্মীয় অনুদারতার ফলে রাজপুত, জাঠ, শিখ, মারাঠা ও সকল শ্রেণীর হিন্দু সাম্রাজ্যবিরোধী হয়। ঔরংজেব নিজের পুত্রপৌত্র এবং রাজকর্মচারীদিগকে অবিশ্বাস করিয়া তাহাদের সাম্রাজ্য শাসন সম্বন্ধে শিক্ষালাভের পথ রুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার দাক্ষিণাত্যনীতি মুঘল সাম্রাজ্যকে নানাদিক দিয়া দুর্বল করিয়া দিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের

ব্যাপারে দীর্ঘকাল ব্যাপৃত থাকার ফলে কেন্দ্রীয় শাসনে দুর্বলতা দেখা দিয়াছিল, অপরিমিত অর্থ ও লোকক্ষয় হইতেছিল এবং সর্বোপরি উত্তর ভারতের শাসনকার্যে অবহেলা আসিয়া গিয়াছিল। দাক্ষিণাত্য নীতিতে ঔরংজেব সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করেন নাই—মারাঠা শক্তিকে দমন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। এই 'দাক্ষিণাত্যের ক্ষত'ই মুঘল সাম্রাজ্যের অঙ্গকে দূষিত করিয়া পরোক্ষতঃ সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছিল।

(৮) বিদেশী আক্রমণ

অষ্টমতঃ, মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বল অবস্থার সুযোগে বিদেশী আক্রমণকারী নাদির শাহ ও আহম্মদ শাহ দুররাণী পুনঃ পুনঃ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া এবং দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তঃসারশূন্যতা সর্বসমক্ষে প্রকটিত করিয়া তুলিয়াছিল।

(৯) নৌশক্তিতে অবহেলা

নবমতঃ, মুঘল সম্রাটগণ নৌশক্তিকে অবহেলা করিতেন। নৌশক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ না করায় নৌশক্তিতে প্রবল ইংরাজ, ফরাসী পর্টুগীজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য শক্তি ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

(১০) প্রাদেশিক শাসকগণের স্বাধীনতা ঘোষণা

দশমতঃ, কেন্দ্রের সামরিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা শিথিল হওয়াতে প্রাদেশিক শাসকগণ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। দাক্ষিণাত্য, অযোধ্যা, বঙ্গদেশ, আগ্রার নিকটস্থ জাঠগণ, রোহিলখণ্ডের রুহেলা আফঘানগণ ও পাঞ্জাবের শিখগণ দিল্লীর শাসন সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে।

(১১) আর্থিক অপচয়

পরিশেষে অবিরত যুদ্ধবিগ্রহ, সাম্রাজ্যের নগরসমূহ সুসজ্জিত করা, দরবারের জাঁকজমক বজায় রাখা ইত্যাদি অপব্যয়ের ফলে সাম্রাজ্যের প্রচুর অর্থব্যয় হইতেছিল। অথচ কৃষি, শিল্প বা ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থাগমের উপায়মূলক কোন কার্যের প্রতি সম্রাটদের দৃষ্টি ছিল না। এই আর্থিক অপচয় ও অবনতি মুঘল সাম্রাজ্যের অধঃপতনকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল।

প্রশ্নোত্তর

1. Compare Akbar with Aurangzeb as a ruler.

শাসক হিসাবে আকবরের সহিত ঔরংজেবের তুলনা কর।

উত্তর-সূত্র ঃ (১) ভূমিকা ঃ আকবর ও ঔরংজেব উভয়েই মুঘল বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন। আকবরের সময়ে মুঘল সাম্রাজ্যের পরিধি প্রায় সমগ্র ভারতব্যাপী

হয় এবং ঔরংজেবের সময়ে দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকৃত হওয়ায় মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তৃততর হয়। সামরিক শক্তি ও সাম্রাজ্যের আয়তনের দিক দিয়া উভয় সম্রাটের শাসনকালের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য না থাকিলেও শাসকরূপে আকবর ও ঔরংজেবের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল। প্রজাদের সম্মতি, সদিচ্ছা ও মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আকবর তাঁহার শাসনপদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এই সুব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। পক্ষান্তরে শাসকরূপে ঔরংজেব ব্যর্থতার প্রতিমূর্তি ছিলেন। আকবরের শাসনের মূলে যে ধর্মীয় উদারতা বর্তমান ছিল ঔরংজেব শাসনব্যবস্থায় এই নীতি অস্বীকার করেন। ফলে সকল শ্রেণীর হিন্দু মুঘল শাসকের বিরোধী হয়, ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হয়।

(২) **আকবরের শাসননীতি :** (ক) শাসনব্যবস্থায় প্রজা কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য —বিধর্মী বলিয়া সরকারী কার্য্য হইতে বঞ্চিত করা হইত না—কাহারও স্বাধীন ধর্মাচরণে বাধা দেওয়া হইত না—সম্রাটের সতর্ক দৃষ্টির ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের শাসন-দক্ষতা কর্মকুশলতার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হইয়াছিল। (খ) ন্যায়বিচারের প্রতিও আকবরের লক্ষ্য ছিল। (গ) আকবরের রাজস্বনীতিও জমির উর্বরতা ও উৎপাদন অনুসারে অনুসৃত হয়। উৎপাদিত ফসল হিসাবে রাজস্বের হারও বিভিন্ন ছিল। ইহাতে সরকার ও কৃষককুল উভয়পক্ষেরই সুবিধা হইয়াছিল। (ঘ) জিজিয়া বা তীর্থযাত্রী-কর তুলিয়া দিয়া অসাম্প্রদায়িক নরপতিরূপে পরিগণিত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। (ঙ) ফলাফল : হিন্দুগণ আকবর তথা পরবর্তী মুঘল সম্রাটগণের সাম্রাজ্য-বিস্তার ও সংরক্ষণের অন্যতম স্তম্ভরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। বিবিধ বিরোধী শক্তি বর্তমানেও আকবরের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য দেড় শতাব্দীর অধিককাল স্থায়ী ছিল। আকবর মুঘল সামাজ্যকে ভারতের জাতীয় সাম্রাজ্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

(৩) **ঔরংজেবের শাসননীতি :** ধর্মান্ধতার দ্বারা পরিচালিত ঔরংজেবের শাসননীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হইয়াছিল। তাঁহার ধর্মের গোঁড়ামি হিন্দুদের মন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল—রাজপুত, জাঠ, মারাঠা, শিখ সকল শ্রেণীর হিন্দু মুঘল শাসনের বিরোধী হইল। অদূরদর্শী ও ভ্রান্ত শাসননীতির ফলে সাম্রাজ্যের বিপদ উপস্থিত হইল। এতদ্ব্যতীত সম্রাটের সন্দিগ্ধচিত্ততা ও স্বহস্তে রাজ্য পরিচালনা তাহার শাসনের ব্যর্থতার জন্য বহুলাংশে দায়ী। সাম্রাজ্যের সকলেই সম্রাটের মুখাপেক্ষী হইয়া রহিল—স্বীয় দায়িত্বে কার্য্য সম্পাদন করিতে কেহই অভ্যস্ত হইলনা। ঔরংজেব মুঘল সাম্রাজ্যকে যেমন বিস্তৃত করিয়াছিলেন, তেমনি তাহার পতনের বীজও তিনিই বপন করিয়া গিয়াছেন।

2. **Discuss the causes of the downfall of the Mughal Empire.**
মুঘল সাম্রাজ্য পতনের কারণসমূহ আলোচনা কর।
উত্তর-সূত্র: (৩৮৩ পৃষ্ঠা)।

3. **Give an account of Shivaji's struggle with the Mughals.**
শিবাজীর সহিত মুঘলদের সংঘর্ষের একটি বিবরণ দাও।
উত্তর-সূত্র: (৩৫৯ পৃষ্ঠা)।

4. **Sketch briefly the career and make an estimate of Shivaji.**
শিবাজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং কৃতিত্বের পরিমাপ কর।
উত্তর-সূত্র: (৩৭২ পৃষ্ঠা)।

5. **Describe the administrative system of Shivaji.**
শিবাজীর শাসনপ্রণালী বিবৃত কর।
উত্তর-সূত্র: (৩৭৭ পৃষ্ঠা)।

6. **Write the history of the Peshwas up to the Third battle of Panipath, 1761.**

তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ (১৭৬১) পর্যন্ত পেশোয়াদের ইতিহাস বিবৃত কর।

উত্তর-সূত্র: (১) শিবাজীর মৃত্যুর পরে পুত্র শম্ভুজী সিংহাসনে আরোহণ করেন। শম্ভুজী মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সময়ে বন্দী ও নিহত হন। শম্ভুজীর শিশুপুত্র শাহু মুঘলদের হস্তে বন্দী হন। শিবাজীর অন্যতম পুত্র রাজারাম মুঘলদের হস্ত এড়াইয়া কর্ণাটে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেই স্থান হইতে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে থাকেন। রাজারামের মৃত্যুর পরে তাঁহার বিধবা পত্নী তারাবাঈ শিশুপুত্র তৃতীয় শিবাজীকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া মুঘলদের বিরুদ্ধে আক্রমণনীতি গ্রহণ করিলেন। ঔরংজেবের মৃত্যুর পরে শিবাজীর পৌত্র শাহু বা দ্বিতীয় শিবাজী বন্দীদশা হইতে মুক্ত হয়। শাহু মুক্তিলাভ করিয়া সিংহাসন দাবি করিলেন। বালাজী বিশ্বনাথ নামে জনৈক ব্রাহ্মণের সাহায্যে এবং বুদ্ধিবলে শাহু মারাঠাদের অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ শাহু বালাজী বিশ্বনাথকে 'পেশোয়া' বা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। স্বীয় কৃতিত্বের বলে পেশোয়াই রাজ্যের সর্বেসর্বা হইলেন এবং মারাঠা নরপতির ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি গৌণ হইয়া দাঁড়াইল। বালাজী বিশ্বনাথের শাসনপদ্ধতি ও অর্থনৈতিক সুব্যবস্থার ফলে মারাঠা শক্তি ঐক্যবদ্ধ হইল এবং মারাঠা সাম্রাজ্যবাদের পত্তন হইল। পরবর্তী পেশোয়াদের কর্মকুশলতার ফলে মুঘলশক্তির

প্রায়াবসানকালে মারাঠারাই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে মুঘলদের পরিত্যক্ত আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

(২) **বাজিরাও :** বালাজী বিশ্বনাথের পরে তাঁহার পুত্র বাজিরাও পেশোয়া হন। তিনি বিগতপ্রায় মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তির উপরে মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন—অম্বর ও বুন্দেলখণ্ডের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হন—দিল্লী অভিযান—সম্রাটের সাহায্যার্থ আগত নিজাম পরাজিত—সম্রাট ৫০ লক্ষ টাকা পেশোয়াকে দিলেন—পঞ্চ নায়কের দ্বারা পরিচালিত মারাঠা যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব। বাজিরাও-এর ভ্রাতা চিমনজী আপ্পা পর্টুগীজদিগকে পরাজিত করিয়া সালসেট ও বেসিন অধিকার করেন।

(৩) বালাজী বাজিরাও বা দ্বিতীয় বালাজী : (ক) মারাঠাদের সামরিক ব্যবস্থার পরিবর্তন—চিরাচরিত রণনীতির পরিবর্তনের ফলে পরোক্ষে ইহা মারাঠা শক্তির পক্ষে ক্ষতিকর হয় (খ) মারাঠা সাম্রাজ্যের বিস্তার—মহীশূরের কিয়দংশ ও কর্ণাটক অধিকৃত—নিজাম পরাজিত, রাজপুতানায় ও দোয়াবে মারাঠা আধিপত্য—দিল্লীর দরবারে মারাঠাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত—পাঞ্জাব অধিকার।

(৪) পাঞ্জাব অধিকারের ফলে আফগান বীর আহম্মদ শাহ দুররাণীর সহিত অনিবার্য সংঘর্ষ—পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১), মারাঠাশক্তির পরাজয়—ফলাফল।

7. How far Aurangzeb was responsible for the downfall of the Mughal Empire.

মুঘল সাম্রাজ্য পতনের জন্য ঔরংজেবের দায়িত্ব কতখানি ?

উত্তর-সূত্র : মুঘল সাম্রাজ্য পতনের জন্য কেহ কেহ ঔরংজেবকে দায়ী করিয়া থাকে। নানা কারণ পরম্পরার সমবায়ে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল। পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের দুর্বলতা, সাম্রাজ্যের বিশাল আয়তন, আকবর ব্যতীত প্রায় সকল মুঘল সম্রাটের কম-বেশী হিন্দু-বিদ্বেষী নীতি, মন্ত্রী ও ওমরাহবর্গের স্বার্থপর কলহ, সামরিক শক্তির অপকর্ষ, নৌ-শক্তি সম্বন্ধে উদাসীনতা, আর্থিক উন্নতি বিধান সম্বন্ধে অবহেলা, নাদির শাহ ও আহম্মদ শাহ দুররাণীর আক্রমণ প্রভৃতি কারণ মুঘল সাম্রাজ্য পতনের জন্য দায়ী। এই সকল কারণের সঙ্গে ঔরংজেবের ভ্রান্ত ও শাসনপদ্ধতিকে মুঘল সাম্রাজ্য পতনের জন্য দায়ী করা যাইতে পারে। সুতরাং মুঘল সাম্রাজ্য পতনের জন্য ঔরংজেব আংশিকরূপে দায়ী।

ইহা স্বীকার্য্য যে কালক্রমে সকল সাম্রাজ্যেরই পতন ঘটে এবং বহুতর ঘটনা পরম্পরা সাম্রাজ ক্ষয়ের পশ্চাতে থাকে, কোন একক ব্যক্তির আচরণের দ্বারা কোন সাম্রাজ্যকে অনিবার্য্য পরিণতির হস্ত হইতে রক্ষা করা যায় না। তবে দূরদর্শিতা ও

শুভবুদ্ধি থাকিলে এই পতনকে সাময়িকভাবে প্রতিহত করা সম্ভবপর হয়। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের আভাস শাহজাহানের রাজত্বকালেই পাওয়া যায়; ঔরংজেব তাহা রোধ করার পরিবর্তে এমন নীতি ও পদ্ধতির অনুসরণ করেন যাহাতে তাহা ত্বরান্বিত হয়। তাঁহার ধর্মসম্বন্ধীয় অনুদারতার ফলে রাজপুত, জাঠ, শিখ, মারাঠা ও সর্বশ্রেণীর হিন্দু মুঘল সাম্রাজ্যের বিরোধী হইয়া পড়ে। মহারাষ্ট্রে, রাজপুতানায়, দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে সাম্রাজ্যের ক্ষতি পূরণ করা সাধ্যায়ত্ত হয় নাই। ঔরংজেব নিজেই সন্তানসন্ততি ও উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণকে অবিশ্বাস করিয়া তাহাদের দায়িত্ববোধ ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন, উপরন্তু বিশাল সাম্রাজ্য শাসন সম্বন্ধে যে শিক্ষালাভের প্রয়োজন তাহা হইতেও তাহারা বঞ্চিত ছিলেন। ইহা ঔরংজেবের সঙ্কীর্ণ চিন্তার অনিবার্য্য পরিণতি। জনসাধারণের স্বার্থের সহিত সাম্রাজ্যের স্বার্থ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কিন্তু ঔরংজেব সেই জনসাধারণকে তাহার আচরণের দ্বারা সাম্রাজ্যের প্রতি বিমুখ করিয়া তুলিয়াছিলেন। যে রাজপুতশক্তির সহযোগিতা মুঘল সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ছিল ঔরংজেবের অনুদার নীতির ফলে সেই রাজপুতশক্তি মুঘল সাম্রাজ্যের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল। আকবরের উদার ও দূরদর্শী শাসননীতির ফলে মুঘল সাম্রাজ্য যে ভারতের জাতীয় সাম্রাজ্যে পরিণত হইতে চলিয়াছিল ঔরংজেবের বিপরীত আচরণের ফলে তাহা নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইল।

৪. Sketch the character of Aurangzeb.

ঔরংজেবের চরিত্র বর্ণনা কর।

উত্তর-সূত্র : ('ঔরংজেবের কৃতিত্বের পরিমাপ' দ্রষ্টব্য)।

৫. Give a brief account of the Deccan policy of Aurangzeb.

ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির বিবরণ দাও।

উত্তর-সূত্র : (ঔরংজেবের 'দাক্ষিণাত্য নীতি' দ্রষ্টব্য)।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

মুঘল যুগে শাসন ব্যবস্থা, সমাজ ও অর্থনীতি

Syllabus :—Mughal administrative system—Mansabdari—social and economic conditions—Todarmal's settlement. Murshid Kuli Khan's settlement in Bengal. The refined but extravagant nobility. Decadence, Accounts of foreign travellers—Bernier. Tavernier, Manucci, Roe etc.

পাঠ্যসূচী :—মুঘল শাসন ব্যবস্থা—মনসবদারী – সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা। টোডরমলের রাজস্ব সংস্কার। মুর্শিদ কুলি খাঁর বঙ্গদেশের রাজস্ব সংস্কার। সুরুচি-সম্পন্ন হইলেও অমিতব্যয়ী অভিজাতশ্রেণী। ক্ষয়িষ্ণুতা। বার্ণিয়ার, টাভার্ণিয়ার, মানুচি, স্যার টমাস রো প্রভৃতি বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বিবরণ।

শাসন ব্যবস্থা :—বাবর ও হুমায়ুন সাম্রাজ্য রক্ষা করার জন্য ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া কোন সুনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রকৃতপক্ষে আকবরই তাঁহার সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও সুবিন্যস্ত করেন। তিনি তাঁহার শাসনব্যবস্থায় আলাউদ্দিন খল্‌জি এবং শেরশাহ কর্তৃক অনুসৃত বহু নীতিকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সম্রাটের সর্বময় ক্ষমতা

মুঘলদের শাসনব্যবস্থাকে, মধ্যযুগের সর্বত্র প্রচলিত 'যে শাসনতন্ত্র ছিল, অর্থাৎ সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্র'—বলা যাইতে পারে। সম্রাট রাষ্ট্রের সকল ব্যাপারে—শাসন, সমর, বিচার, আইন সর্ববিষয়ে সর্বময় কর্তা ছিলেন। সম্রাটের ইচ্ছাই আইন ছিল। তিনি রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন; কখনও তিনি স্বয়ং সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করিতেন। কখনও বা তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত সেনাপতি যুদ্ধে নেতৃত্ব করিতেন। মুঘল শাসনব্যবস্থা কখনও অসামরিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, মুঘল রাজপুরুষগণের সকলকেই সেনাবিভাগে নাম লিখাইতে এবং প্রয়োজনমত অস্ত্রধারণ করিতে হইত। সম্রাট সুযোগ্য হইলে শাসনকার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইত, কিন্তু সম্রাট অযোগ্য হইলে শাসন-ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত।

মন্ত্রিগণ

সম্রাট একাকী শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন না। শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগের পরিচালনার ভার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত থাকিত। ইহারা প্রয়োজনবোধে সম্রাটকে পরামর্শ দান করিতেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সম্রাটের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন থাকিতেন। অবশ্য এই সমস্ত রাজকর্মচারীর মতামত গ্রহণ করা বা না-করা সম্রাটের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ছিল। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের মধ্যে 'খান-ই-শামান', দেওয়ান', 'মীর বক্সী', 'কাজি-উস কুজাত', 'সদর ই-সুদার, 'মুহাৎসিব', 'মীর আতীশ' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। দেওয়ানের অধীনে অর্থবিভাগ, মীর বক্সীর অধীনে সমর, বৈতনাদি ও হিসাব বিভাগ, খান 'ই-সামান এর অধীনে বাদশাহী গার্হস্থ্য বিভাগ, কাজি-উস-কুজাত এর অধীনে বিচার বিভাগ, সদর-ই-সুদার এর অধীনে ধর্মসংক্রান্ত দাতব্য বিভাগ, মুহাৎসিব এর অধীনে নৈতিক-চরিত্র বিভাগ, মীর-আতীশ বা দারোগা-ই-তোপখানার অধীনে গোলন্দাজ বিভাগ ন্যস্ত ছিল।

বিভিন্ন রাজকর্মচারী

আকবরের পূর্বে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীকে নগদ বেতনের পরিবর্তে জায়গির প্রদান করা হইত। জায়গীরপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ প্রয়োজনে অশ্বারোহী সৈন্য প্রদান করিয়া সম্রাটকে সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিতেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় যথেষ্ট ত্রুটি ছিল। এই ত্রুটি দূর করার জন্য আকবর সামরিক বিভাগে জায়গিরের পরিবর্তে মনসবদারী নামক এক নূতন সামরিক প্রথার প্রবর্তন করিলেন। প্রত্যেক মনসবদার রাজকোষ হইতে নির্দিষ্ট বৃত্তি পাইতেন। রাজকর্মচারিগণ সকলেই এক একজন মনসবদার ছিলেন। মনসবদারগণের কর্তব্য ছিল বৃত্তি অনুযায়ী প্রত্যেককে প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য সরবরাহ করা। মনসবদারগণ তেত্রিশটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন, এই শ্রেণীবিভাগ সৈন্যসংখ্যার ভিত্তিতেই হইত। সর্বনিম্নশ্রেণীর মনসবদারের অধীনে ২০ জন এবং সর্বোচ্চ মনসবদারের অধীনে পাঁচ হাজার সৈন্য থাকিত। দশহাজারী বা সাতহাজারী মনসবদারও ছিল, তবে এইসব মনসব প্রধানতঃ রাজকুমার বা বিশিষ্ট কর্মচারীদের হস্তেই থাকিত।

মনসব প্রথা

মুঘল সাম্রাজ্য আকবরের রাজত্বকালে মোট ১৫টি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত হয়। ঔরংজেবের সময়ে সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে সুবার সংখ্যা হয় ১৯টি। সুবাগুলি কয়েকটি সরকারে এবং প্রতিটি সরকার কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। সুবা বা প্রদেশের শাসনভার সুবাদার বা সিপাহসালার-এর উপর ন্যস্ত থাকিত। ফৌজদার উপাধিধারী কর্মচারীরা সরকার বা জেলার শাসনকার্য নির্বাহ করিতেন।

প্রাদেশিক সরকার

ফৌজদারগণ প্রধানতঃ প্রদেশের সামরিক ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন এবং শান্তিরক্ষার কার্য করিতেন। বড় বড় শহরে কোতোয়াল শান্তিরক্ষা করিতেন। সুবেদার 'আমিল' বা রাজস্বসংগ্রাহক 'বিতিকিচি' বা রাজস্বের হিসাব-রক্ষক, ওয়াকা-ই-নবিশ (সংবাদ সংগ্রাহক) প্রভৃতি কর্মচারীর সাহায্যে শাসন করিতেন। এতদ্ব্যতীত রাজস্ববিভাগীয় কারকুন, কানুনগো, পাটোয়ারী প্রভৃতি কর্মচারীও শাসনকার্যে সুবেদারের সাহায্য করিতেন।

প্রাদেশিক কর্মচারীবর্গ

শেরশাহের ন্যায় আকবরও ন্যায় বিচারের সুব্যবস্থার জন্য যশস্বী হইয়াছিলেন। বিচার বিভাগের সর্বময় কর্তা ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। কাজি মুফ্‌তি ও মীর আদলের সাহায্যে বিচার করিতেন। মুফ্‌তিগণ আইনের ব্যাখ্যা করিতেন। ধর্মসংক্রান্ত বিচার কাজিগণ, রাজনৈতিক ও ফৌজদারী বিচারগুলি সুবেদারগণ এবং দেওয়ানী বিচারগুলি প্রাদেশিক দেওয়ানগণ নির্বাহ করিতেন। দেওয়ান ও সুবেদারগণের মধ্যে কোন মতদ্বৈধ হইলে, তাহার চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য সম্রাটের নিকট প্রেরিত হইত। উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে সম্রাটের নিকট আপীল করা যাইতে পারিত।

বিচার ব্যবস্থা

আকবরের সময়ে রাজস্ব-নীতির সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। এই বিষয়ে আকবর শেরশাহের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। রাজস্ব-সংস্কারের ব্যাপারে রাজস্ব সচিব টোডরমল সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি অবলম্বন করেন। টোডরমল কর নির্ধারণের সুবিধার জন্য সাম্রাজ্যের সমস্ত জমি জরিপ করেন। উৎপাদন অনুযায়ী রাজ্যের সমস্ত জমিকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করা হয় এবং উৎপাদনের এক গড় হিসাব ধরিয়া এই উৎপাদিত শস্যের এক তৃতীয়াংশ রাজস্বরূপে নির্ধারিত হয়। রাজস্ব উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ বা উহার নগদ মূল্য দ্বারা পরিশোধিত করা যাইতে পারিত। শস্যের মূল্য দশ বৎসরের বাজার দর ধরিয়া স্থির করা হইত। ইহাতে কৃষকগণ রাজস্বের পরিমাণ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার দুশ্চিন্তা হইতে পরিত্রাণ পাইত। রাজস্ব আদায়ের জন্য কোন মধ্যস্বত্বদারের বন্দোবস্ত হয় নাই। সরকার সোজাসুজি আমিল, বিতিকিচি, পোদ্দার, কানুনগো, পাটোয়ারী, মুখাদেম প্রভৃতি রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীদের সাহায্যে রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় করিতেন। রাজস্ব আদায়কারিগণ যাহাতে প্রজাদের উপর উৎপীড়ন না করে, সে বিষয়ে সম্রাটের নির্দেশ ছিল।

রাজস্ব সংস্কার

টোডরমল

সম্রাট ঔরংজেবের সময়েও রাজস্ব বিষয়ে বহু সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। এই বিষয়ে

মুর্শিদ কুলি খাঁ তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। মুর্শিদ কুলি খাঁ টোডরমলের রাজস্ব ব্যবস্থাকে মূলতঃ গ্রহণ করিলেও বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমির উর্বরতা, চাষের উপযোগিতা, সেচ ব্যবস্থা ও উৎপাদন অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের রাজস্বের হার স্থির করেন। মুর্শিদ কুলি খাঁ যখন বাংলা দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন, তখন তিনি বাংলা দেশের রাজস্ব সংস্কার করেন। রাজস্ব নীতির সংস্কার ও রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা করিয়া তিনি রাজকোষের আয় অনেক পরিমাণে বর্ধিত করিয়াছিলেন।

মুর্শিদ কুলি খাঁ

মুঘল শাসনরীতির ত্রুটি :—মুঘল আমলের শাসনপদ্ধতি প্রধানতঃ সম্রাটের ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করিত। সিংহাসনে উপযুক্ত সম্রাট থাকিলে শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইত। কিন্তু যখনই অপদার্থ সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করিতেন, তখন কেন্দ্রীয় সরকারে দুর্বলতা দেখা দিত এবং সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত। প্রাদেশিক শাসকগণ কেন্দ্রীয় সরকারকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রায় স্বাধীনভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন এবং নানা স্থানে বিদ্রোহও দেখা দিত। এই দুর্বলতার ফলে আকবরের প্রতিভাবলে যে সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাঁহার অযোগ্য বংশধরগণের সময়ে সেই সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হইল।

এতদ্ব্যতীত মুঘলদের শাসনব্যবস্থায় আরও ত্রুটি ছিল। আকবর অনুসৃত শাসনপদ্ধতি পরবর্তী সম্রাট, জাহাঙ্গীর বা শাহজাহানের আদর্শ হইলেও বিভিন্ন কারণে এই আদর্শ কার্য্যক্ষেত্রে অনুসৃত হইতে পারিত না। রাজধানী হইতে বিভিন্ন অঞ্চলের দূরত্ব, যাতায়াতের অসুবিধা এবং যুদ্ধবিগ্রহাদি ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকার জন্য সম্রাট স্বয়ং সকল সময়ে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকার্য্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে পারিতেন না। উৎকোচের প্রাধান্য ও বিচারমূঢ়তা প্রায়ই দৃষ্ট হইত, তৎকালীন পরিবেশের মধ্যে ইহা নিবারণ করা এক প্রকার অসম্ভব ছিল। জায়গীর প্রথা রহিত হওয়াতে জায়গীরদারগণ পূর্বে বংশ পরম্পরায় যে উচ্চ শাহী-পদ অধিকার করিয়া রাজকার্য্যে কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়া আসিত তাহার অভাব ঘটিল। জায়গীর প্রথার স্থলে প্রবর্তিত 'মনসব' একান্ত ব্যক্তিনিষ্ঠ ছিল, বংশগত ছিল না। উপরন্তু, উচ্চপদাধিকার ভোগান্তে মনসবদের অর্থসম্পদ উত্তরপুরুষদের জন্য রাখিয়া যাইবার উপায় ছিল না কেননা আইন অনুসারে ইহাদের অর্থসম্পদ মৃত্যুর পরে রাজকোষে অপরিবর্তিত হইয়া যাইত। ফলে রাজপুরুষগণ কর্তব্যনিষ্ঠার পরিবর্তে 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ' আদর্শ সার করিয়া আমোদব্যসনে জীবনযাপন করিত। পক্ষান্তরে কুলগত কোন স্থায়ী ওমরাহ শ্রেণীর অভাবে সম্রাটের স্বেচ্ছাচারিতাকে সংযত করিবার জন্য কোন শ্রেণী মুঘল শাসনব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত হইতে পারে নাই।

মুঘলদের সামরিক বিভাগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল উপকরণ বহুলতা। সৈনিকগণ ভ্রাম্যমান শিবিরে বাস করিত; সম্রাটও স্বয়ং সপারিষদ জেনানামহলসহ এই শিবিরে বাস করিতেন। এই সমস্ত বাহ্যিক উপকরণবাহুল্য প্রবেশ করায় মুঘলবাহিনী ক্ষিপ্রকারী পরিচালনা শক্তির সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। তদুপরি মুঘলদের উপযুক্ত নৌ-বাহিনী ছিল না। ইহাও মুঘলদের অন্যতম দুর্বলতার পরিচায়ক।

সমাজ ব্যবস্থা:—মুঘল যুগের সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ সমসাময়িক বিদেশী পর্য্যটক র‍্যালফ ফিচ, হকিন্স, টমাস রো, টেরি, পেলসার্ট, টেভার্ণিয়ার, বার্ণিয়ার মানুচি প্রভৃতির বিবরণ এবং ভারতীয় সাহিত্যিকদের রচনা হইতে অবগত হওয়া যায়। জনসাধারণ ধনী ওমরাহ ব্যবসায়ী ও দরিদ্র জনসাধারণ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে জীবনযাত্রার মানের যথেষ্ট পার্থক্য থাকিত। অভিজাত ওমরাহগণ, আলস্যে, বিলাসব্যসনে ও অমিতাচারে কাল কাটাইতেন। ব্যবসায়িগণ সাধারণতঃ সংযত ও মিতব্যয়ী ছিলেন। আর জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিল না—তাহাদের উপযুক্ত খাদ্য ও পরিচ্ছদ জুটিত না। শাহ্জাহানের রাজত্বের শেষভাগে প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ কৃষকদের উপর অত্যধিক অত্যাচার করিতেন। এইভাবে কৃষকগণ দলে দলে সর্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। মুঘল যুগে দুর্ভিক্ষের অভাব ছিল না। প্রায় সকল মুঘল সম্রাটের আমলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে পানদোষ অত্যধিক ছিল, ব্যবসায়ীদের মধ্যে তাহা অল্পপরিমাণেই দেখা যাইত। কিন্তু জনসাধারণ খাদ্য ও পান বিষয়ে যেমন সংযত ছিলেন, অতিথিগণের উপর ছিলেন তেমনি উদার ও প্রীতিপরায়ণ। হিন্দুদের মধ্যে এই সময়ে প্রধানতঃ সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা ও পণপ্রথা ছিল। সম্রাট আকবর এই সকল প্রথা উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করেন। ইউরোপীয় পর্য্যটকদের রচনা হইতে দেখা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে, বিশেষতঃ বাংলা দেশে সামাজিক কুসংস্কার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল। ঢাকার রাজা রাজবল্লভ বিধবা বিবাহের প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

(পার্শ্বটীকা: জনসাধারণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; ওমরাহ, বণিক ও জনসাধারণ; জনসাধারণের দুরবস্থা; সামাজিক কুপ্রথা)

তুর্কী-আফঘান শাসনের শেষভাগে ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানদের মৈত্রীর যে প্রচেষ্টা দেখা যায় মুঘল যুগের প্রথম দিকে তাহা সুদৃঢ় হয়। আকবর এই বন্ধনকে নানা প্রকারে সুদৃঢ় করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আকবরের প্রচেষ্টার ফলে উভয় সম্প্রদায়ে র

গোঁড়ামি ও কুসংস্কার বহুলাংশে দূরীভূত হইয়াছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীরের সময় হইতে যে হিন্দু-বিরোধী মনোবৃত্তি দিল্লীর দরবারে প্রশ্রয় লাভ করে, তাহাতে হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী ব্যাহত হয় এবং ঔরংজেবের উৎকট সাম্প্রদায়িক আচরণের ফলে উভয় ধর্মের মধ্যে মিলনের আশা সুদূরপরাহত হয়। কিন্তু দরবার বা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের মনোভাব সাধারণ জনসমাজকে বিশেষ প্রভাবিত করিতে পারে নাই। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রীতিমত ভাব-বিনিময় হইয়াছিল। (ঔরংজেবের শাসনকালেও মুসলমান কবি আলাওল বাংলা ভাষায় হিন্দী পদ্মাবৎ-এর অনুবাদ বা বৈষ্ণব ধর্মবিষয়ক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কখনও কখনও শাসকগণ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রজাদের ধর্মীয় আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিতেন। সৈয়দ ভ্রাতা আবদুল্লা খাঁ, বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও মীরজাফর হিন্দুর হোলী ও বসন্তোৎসবে যোগদান করিতেন। দৌলত রাও সিন্ধিয়া তাঁহার কর্মচারীবর্গ সহ মুসলমানদের মত সবুজ পোষাক পরিধান করিয়া মহরমের শোভাযাত্রায় যোগদান করিতেন।)

অর্থনৈতিক অবস্থা :—মুঘল যুগের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা আইন-ই-আকবরী ও অন্যান্য পারসিক গ্রন্থ, সমসাময়িক ইউরোপীয় বণিক ও পর্যটকগণের বিবরণী, ভারতস্থিত ইউরোপীয় কুঠিসমূহের নথিপত্র এবং সমসাময়িক ভারতীয় সাহিত্য হইতে জানা যায়।) (মুঘল যুগে বড় বড় শহরগুলিতে ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি বিরাজ করিত।) আগ্রা ও ফতেপুর-সিক্রী লণ্ডন অপেক্ষা আয়তনে বড় ছিল। লাহোর শহর তৎকালীন এশিয়া ও ইউরোপস্থ কোনও শহর অপেক্ষা হীন ছিল না। (অন্যান্য শহরের মধ্যে বারাণসী, পাটনা, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, হুগলী, ঢাকা চট্টগ্রাম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।)

সমৃদ্ধ শহরসমূহ

(বর্তমান কালের তুলনায় মুঘল যুগের কৃষির অবস্থা যে খুব খারাপ ছিল তাহা নহে। তবে বর্তমানের ন্যায় কৃত্রিম সেচ বা জলনিকাশের কোন বন্দোবস্ত ছিল না।) সাধারণ খাদ্যশস্য ব্যতীত কৃষিদ্রব্যের মধ্যে ইক্ষু, নীল, কার্পাস ও তুঁত প্রধান ছিল। (দেশে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির ফলে আবাদ না হইলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত এবং জনসাধারণের দুর্দশার পরিসীমা থাকিত না।)

কৃষি ব্যবস্থা

(মুঘল যুগে ভারতীয় শ্রমশিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ভারতের শিল্পজাত দ্রব্য ইউরোপে রপ্তানি হইত। গুজরাট, জৌনপুর, বারাণসী, পাটনা, প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে সূতীবস্ত্র নির্মিত হইত। তবে সর্বাধিক ও সর্বোৎকৃষ্ট কাপড় প্রস্তুত হইত বঙ্গদেশে। ঢাকার প্রস্তুত সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র ইউরোপেও খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত রেশমী বস্ত্রও

বস্ত্র শিল্প

যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইত। আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় রেশমী শিল্প দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।) বাংলা দেশের বস্ত্রশিল্পের প্রশংসা করিয়া বার্ণিয়ার লিখিয়া গিয়াছেন—বাংলা দেশে সুতা ও রেশমের কাপড় এমন পরিমাণে উৎপন্ন হইত যে, ঐ রাজ্যকে কেবল হিন্দুস্থান বা মুঘল সাম্রাজ্যের নহে, পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির, এমন কি ইউরোপের, ঐ দুটি উৎপন্ন দ্রব্যের ভাণ্ডার বলা চলিত'। রঞ্জন শিল্পেরও অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছিল।(এই যুগে কার্পেট ও পশম শিল্প যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত হইয়াছিল। বারুদ তৈয়ারীর অপরিহার্য্য উপাদান সোরাও ভারতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত।)

অন্যান্য শিল্প

বৈদেশিক বিবরণ:—মুঘল যুগে বহু ইউরোপীয় পর্য্যটক ভারতবর্ষে আগমন করেন; তাহাদের বিবরণী হইতে তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক বহু সংবাদ অবগত হওয়া যায়। বিদেশী পর্য্যটকদের ভারতে আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করা। আকবরের রাজত্বকালে র‍্যালফ ফিচ নামে জনৈক ইংরেজ ভ্রমণকারী ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মতে আগ্রা এবং ফতেপুর-সিক্রি সহর দুইটি তৎকালীন লণ্ডন অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল। জাহাঙ্গীরের আমলে যে সকল ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ভারতে আসিয়াছিলেন, উইলিয়ম হকিন্স, স্যার টমাসরো এবং ফ্রান্সিসকো পেলসাএর্ট তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। হকিন্স ভারতে ইংলিস খাঁ নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরের আমলে মনসবদারী প্রথার অবস্থা সম্বন্ধে লেখেন। তিনি বলেন তখন রাজকর্মচারিগণ উৎকোচ গ্রহণ করিত; পথঘাট নিরাপদ ছিল না। স্যার টমাস রো ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের রাজদূত হিসাবে ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি চার বৎসর মুঘল দরবারে ছিলেন। মুঘল দরবারের আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন।

র‍্যালফ ফিচ

হকিন্স, স্যার টমাসরো, পেলসাএর্ট

পেলসাএর্ট ওলন্দাজ ব্যবসায়ী ছিলেন। তাহার বিবরণী হইতে জানা যায়, প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও রাজকর্মচারীদের হস্তে কৃষকগণ লাঞ্ছিত হইত। তজ্জন্য দেশে কৃষিকার্য্যের উন্নতি ব্যাহত হইতেছিল। শ্রমশিল্পীরাও উপযুক্ত পরিমাণে পারিশ্রমিক পাইত না। শাহজাহান ও ঔরংজেবের রাজত্বকালে টাভার্ণিয়ার ও বার্ণিয়ার নামে দুইজন ফরাসী পর্য্যটক ভারতে আসেন। টাভার্ণিয়ার ব্যবসায়ী ছিলেন এবং বার্ণিয়ার ছিলেন চিকিৎসক। টাভার্ণিয়ারের বিবরণী বিশেষ তথ্যপূর্ণ। ভারতবর্ষের উৎপন্ন দ্রব্য ও ব্যবসাবাণিজ্যের

টাভার্ণিয়ার, বার্ণিয়ার

রীতি সম্পর্কে বহু সংবাদ তাহার বিবরণী হইতে জানা যায়। তিনি মুঘল রাজদরবারের ঐশ্বর্য্য সমারোহ দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীরের দরবারে টমাস্ রো
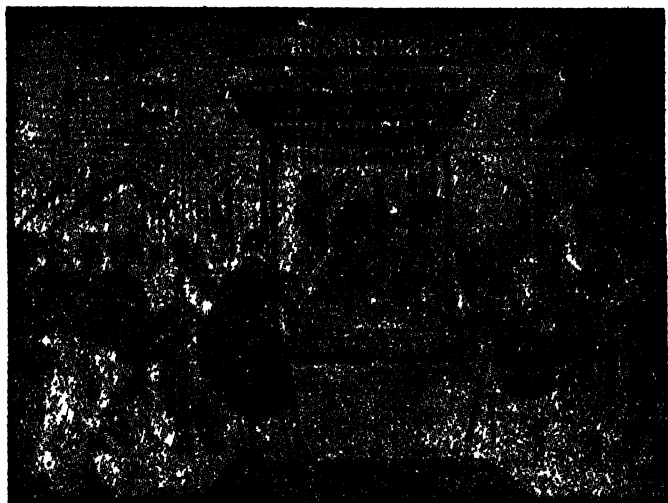
বার্নিয়ার বলেন, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ অত্যাচারী ছিলেন। বাংলা অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ছিল। মুঘল দরবার ছিল ঐশ্বর্যময় ও বিস্ময়কর। ঔরংজেবের রাজত্বকালে মানুচি নামে একজন ইতালীয় পর্যটক ভারতে আগমন করেন। তিনি বলেন, তালুকের কর হইতে রাজকোষে প্রচুর অর্থ আসিত। তাঁহার মতে দিল্লীর সম্রাটই ছিলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী। তিনি মুঘল অন্তঃপুরের ও জনসাধারণের দুরবস্থার কথাও লেখেন। ক্রুটান ও কার্টরাইট নামে দুইজন ইংরেজ বণিক বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন (১৩৬২)। ক্রুটান বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে বলেন যে, তাহারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিজ্ঞান বা শিল্প বিষয়ে সকল কিছুই তাহারা সহজে আয়ত্ত করিতে পারে।

মানুচি

বিদেশী পর্যটকদের লিখিত বিবরণী পাঠ করিলে মুঘল সাম্রাজ্যের মৌলিক দুর্বলতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মুঘল সাম্রাজ্য আয়তনে, সৈন্যবলে, ঐশ্বর্য্য-সমারোহে বিরাট ছিল, কিন্তু দরবারের শাসনের সহিত জনসাধারণের কোন প্রত্যক্ষ

সংযোগ ছিল না। জনসাধারণের ভাল মন্দ রাজকর্মচারীদের আচরণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত; মুঘল কর্মচারীবৃন্দ জনসাধারণের উপর অত্যাচার করিতেন, কিন্তু দিল্লী পর্যন্ত সেই অত্যাচারের বিবরণ পৌঁছিবার কোন উপায় ছিল না, বা পৌঁছিলেও মুঘল সম্রাটগণ প্রতিকারের জন্য কোন চেষ্টা করিতেন না। ভারতের বিপুল ঐশ্বর্য মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে সীমাবদ্ধ থাকিত, দেশের প্রতি অঙ্গে তাহা সঞ্চারিত হইতে পারিত না।

প্রশ্নোত্তর

1. What do you know about the administrative system of the Mughuls. Bring out the strong and weak points of Mughal administration.

মুঘল যুগের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (৩৯৪ পৃষ্ঠা)

মুঘল শাসনপদ্ধতির গুণ ও ত্রুটিসমূহ আলোচনা কর। (৩৯৭ পৃষ্ঠা)

2. Give an account of the social and economic condition of India during the Mughul rule.

মুঘল যুগের ভারতের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থার একটি বিবরণ দাও। (৩৯৮ পৃষ্ঠা)

3. What idea do you gather about the Mughul age from the accounts of the foreign travellers.

বিদেশী ভ্রমণকারীদের বিবরণ হইতে মুঘল যুগ সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা হয় লিখ। (৪০০ পৃষ্ঠা)

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মুঘল যুগে শিল্প, স্থাপত্য ও সাহিত্য

Syllabus : Mughul Art and Architecture—Blending of Hindu and Moslem styles. Fathepur Sikri. Islamic and Indian style. Taj, Agra Fort and Itimuddowla. Mughul, Rajput and Pahari (especially Kangra) schools of painting. Further development of vernacular Literature.

পাঠ্যসূচী :—মুঘল যুগে শিল্প ও স্থাপত্য—হিন্দু ও মুসলিম রীতির সংমিশ্রণ। ফতেপুর সিক্রি। ইসলামিক ও ভারতীয় শিল্পশৈলী। তাজমহল, আগ্রাদুর্গ ও ইতিমদ্দৌলার সমাধি। মুঘল, রাজপুত ও পাহাড়ী (বিশেষতঃ কাংড়া) চিত্ররীতি। দেশীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের আরও উন্নতি।

মুঘল যুগে স্থাপত্য শিল্প :—তুর্ক-আফঘান শাসনের শেষ যুগে সাহিত্যে ও ধর্মে যে হিন্দু মুসলমানের মিলনের সূচনা হয় মুঘল যুগে তাহাই অনুসৃত হয়। বিভিন্ন চারুকলা ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। মুঘল যুগে কি স্থাপত্যে, কি ভাস্কর্যে কি চিত্রকলায়, কি সঙ্গীতে সর্ব্বত্রই ভারতীয় হিন্দু ও বৈদেশিক মুসলমান রীতির যে মিলন ও মিশ্রণ চলিতেছিল তাহা এক আশ্চর্য্য পরিণতি লাভ করে। মাত্র ঔরংজেব ব্যতীত অন্য সকল শ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাটই শিল্প ও স্থাপত্যের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

মুঘল সম্রাটদের শিল্পানুরাগ

বাবর

বাবর তাঁহার সংক্ষিপ্ত শাসনকালের মধ্যেই প্রচুর প্রাসাদ, স্মৃতিসৌধ ও মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। স্থাপত্য কলা সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী স্রষ্টা ও সমালোচকদের মত ছিল। তিনি তাঁহার জীবনস্মৃতিতে হিন্দুস্থানী স্থাপত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বাবর নির্মিত সৌধগুলির মধ্যে পাণিপথের কাবুলী-বাগ, সম্ভল-এর জাম-ই-মসজিদ্ ও আগ্রার লোদী কেল্লা বর্ত্তমান।

হুমায়ুন

হুমায়ুনের যুদ্ধবহুল বিড়ম্বিত রাজত্বের সময়েও কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হয়; তন্মধ্যে আগ্রায় একটি ও পাঞ্জাবের হিসার জেলায় ফথবাদে একটির ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান।

হুমায়ুনের রাজ্যচ্যুতি এবং পুনরায় রাজ্যলাভের মধ্যবর্তী কয়েক বৎসরে শের শাহ ভারতের স্থাপত্যকলার বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। দিল্লীর দুইটি তোরণ ও পুরাণ কেল্লা নামক নগর দুর্গটি শেরশাহের কালের স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিলা-ই-কুহনা মসজিদও এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। শের শাহ বিহারের সাসারামে একটি হ্রদের মধ্যে নিজের যে সমাধি সৌধ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন তাহা হিন্দু মুসলিম মিলিত স্থাপত্য কল্পনার উদাহরণ।

শেরশাহ

আকবরের রাজত্বকালেও মুঘল স্থাপত্য বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কেবল সৌধ নির্মাণে তাঁহার স্থাপত্য প্রীতি নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই; বহু সংখ্যক দুর্গ, প্রাসাদ উদ্যান, মিনার, সরাইখানা ও বিদ্যালয় নির্মাণেও তাঁহার স্থাপত্য প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সময়ে নির্মিত সৌধগুলির মধ্যে হিন্দু, জৈন, ও বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম নির্মাণের জন্য ভারতীয় রীতির ও পারসিক রীতির সম্যক মিলন দেখা যায়। আকবরের নির্মিত প্রাসাদভবনগুলির মধ্যে ফতেপুর সিক্রির যোধাবাঈ-র পাসাদ ও দুইটি বাসভবন উল্লেখযোগ্য। দেওয়ান ই আম, দেওয়ান-ই-খাস, জাম-ই মসজিদ, বুলন্দ দরওয়াজা, পাঁচমহল প্রভৃতি সৌধগুলি আকবরের কীর্তি।

আকবর

আকবরের তুলনায় স্থাপত্য কীর্তিতে জাহাঙ্গীরের দান অল্প। তাঁহার আমলের সৌধগুলির মধ্যে নুরজাহানের পিতা ইতিমদ্দৌলার সমাধি ভবনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে রাজপুত রীতির ছাপ সুস্পষ্ট।

জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, ঔরংজেব প্রত্যেকেই আগ্রার দুর্গে ও দিল্লীর দুর্গে বিভিন্ন মহল নির্মাণ করেন। শাহজাহান মুঘল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পরসিক ছিলেন। আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, কাবুল, কাশ্মীর, কান্দাহার, আজমীর সর্বত্রই তিনি অনুপম প্রাসাদ, মসজিদ, ও উদ্যান নির্মাণ করেন। শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত দিল্লী ও আগ্রার দুর্গে নির্মিত দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, শিস্ মহল, অঙ্গুরীগৃহ প্রভৃতির শিল্প সৌন্দর্য্য অপরূপ। শাহজাহানের নির্মিত সৌধগুলি মৌলিকতার দিক হইতে নিকৃষ্ট হইলেও আড়ম্বর ও অলঙ্করণের দিক হইতে উন্নত ছিল। আগ্রার মতি-মসজিদ শাহজাহানের উন্নততর শিল্পরুচির পরিচায়ক। তবে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী মমতাজমহলের সমাধিভবন 'তাজমহল'। শিল্প সৃষ্টির দিক দিয়া ইহা পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময় বলিয়া পরিচিত। ইহা নির্মাণ করিতে বাইশ হাজার শ্রমিকের একুশ বৎসর লাগিয়াছিল। শাহজাহানের অন্যতম শিল্পকীর্তি ময়ূর সিংহাসন।

শাহজাহান

স্থাপত্যের ন্যায় চিত্রকলাতেও মুঘলযুগ ভারতের ইতিহাসে বিশেষ একটি স্থান অধিকার করিয়া আছে। মুঘল চিত্রকলায় ভারতীয় রীতির সহিত বহির্ভারতীয় রীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুঘলগণ যখন পারস্য অধিকার করে সেই সময়ে ভারতীয়, বৌদ্ধ, ইরাণীয়, বাহ্লীক ও মুঘল ভাবধারায় গঠিত একটি চীনা শিল্পরীতি মোঙ্গলদের সঙ্গে পারস্যে প্রবেশ করে। এই রীতি তিমুরের বংশধরগণ পারস্য হইতে ভারতবর্ষে আনয়ন করেন। এই ভাবে ভারতে মুঘল চিত্রকলা নামে এক নূতন চিত্রাঙ্কন রীতির প্রবর্ত্তন হয়। বাবর ও হুমায়ুন এই চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করিলেও আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায়ই ইহা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করে। বিদেশী শিল্পীদের মধ্যে আবদুস্ সামাদ, ফারুক বেগ, খুরসৌ-কুলী ও জামশেদের নাম উল্লেখযোগ্য। আকবরের আমলের প্রথম শ্রেণীর ১৭ জন শিল্পীর মধ্যে নূনপক্ষে ১৩ জনই ছিলেন হিন্দু। ফলে মুঘল চিত্রকলায় অনিবার্য্যরূপে ভারতীয় প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছিল। জাহাঙ্গীরের আমলের চিত্রকলা আরও উন্নতি লাভ করে। তাঁহার দরবারে ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় বহু শ্রেষ্ঠ শিল্পী বর্ত্তমান ছিলেন। শাহ্ জাহানের আমলে মুঘল চিত্রকলার পতন আরম্ভ হয়। শাহ্ জাহানের অনুরাগ চিত্রকলা অপেক্ষা স্থাপত্য ও জাঁকজমক প্রসার করার দিকে ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে অঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে শিল্পরুচি অপেক্ষা রঙের আতিশয্য ও আড়ম্বরই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ঔরংজেব সর্বপ্রকার শিল্পের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার সময়ে বহু চিত্র বিকৃত করা হয় ও সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি-সৌধের চিত্রাবলী তাঁহার আদেশে অবলুপ্ত করা হয়।

চিত্রকলা

মুঘল দরবারের উপেক্ষিত চিত্রকরগণ রাজপুত রাজন্য-বর্গের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং এই রাজন্যদের পৃষ্ঠপোষকতায় 'রাজপুত চিত্র' নামে এক নূতন চিত্রশৈলী গড়িয়া উঠে। সে যুগে পাঞ্জাব ও পাঞ্জাবের সন্নিকটস্থ পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষতঃ হিমালয়ের পাদদেশস্থ কাংড়া (কাশ্মীর) অঞ্চলে পাহাড়ী চিত্রকলার এক উৎকর্ষ দেখা যায়। এই সমস্ত অঞ্চলের চিত্রকলায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা হিন্দু পুরাণের বিশেষতঃ রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী ও রাধাকৃষ্ণের আখ্যান বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

পাহাড়ী শিল্পকলা: কাংড়া রীতি

ঔরংজেব ব্যতীত সকল মুঘল সম্রাটই সঙ্গীতের সমজদার ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিজাপুরের আদিলশাহী সুলতানগণ এবং আকবরের সমসাময়িক মালবের বাজবাহাদুর সঙ্গীতপ্রীতির জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহ্ জাহান প্রত্যেকেই সঙ্গীতানুরাগী

সঙ্গীত

ছিলেন। আবুল ফজলের মতে আকবরের দরবারে ৩৬ জন শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন। ইহাদের মধ্যে তানসেন ছিলেন অগ্রগণ্য। আকবরের সভাসদ্ মালবরাজ বাজবাহাদুর হিন্দী সঙ্গীতে ও সঙ্গীত বিজ্ঞানে সর্বাপেক্ষা পারদর্শী ছিলেন। ঔরংজেব সঙ্গীতের উপর বিদ্বিষ্ট হইয়া ইহার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

শিক্ষা ও সাহিত্য

মুঘল যুগে বর্তমান কালের ন্যায় রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকিলেও মোটামুটি দেশময় শিক্ষার ব্যবস্থা ভাল ছিল। বহু স্থলে সম্রাট অথবা বিদ্যোৎসাহী স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের উদ্যোগে বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইত এবং পরিচালনার জন্য এই সকল বিদ্যালয় বৃত্তিস্বরূপ অর্থ বা জমি প্রাপ্ত হইত। প্রত্যেকটি মসজিদে প্রায়ই একটি করিয়া মক্তব থাকিত। সেখানে মুসলমান বালক বালিকারা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিত। হিন্দুদের শিক্ষার জন্য টোল, মাতৃভাষায় শিক্ষা দিবার জন্য পাঠশালা ইত্যাদিরও অভাব ছিল না। মুঘল সম্রাটেরা প্রায় সকলেই শিক্ষানুরাগী ছিলেন। বাবরের অন্যতম সঙ্গী সৈয়দ আকবর আলি বলেন, 'সুহরৎ-ই-আম' বা পূর্তবিভাগের অন্যতম কর্তব্য ছিল নিম্ন বা উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য আবাস-গৃহ নির্মাণ করা। জাহাঙ্গীর মাদ্রাসায় হিন্দু ছাত্রদের পড়িবার ব্যবস্থা করেন। শাহ্জাহানও শিক্ষাবিষয়ে উদাসীন ছিলেন না, ঔরংজেব স্বয়ং সুপণ্ডিত ছিলেন; তিনিও দেশে অসংখ্য বিদ্যালয় ও উচ্চতর-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই সময় যথেষ্ট উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। বাবরের আত্মজীবনী হইতে আরম্ভ করিয়া আবুল ফজল, ফৈজী, বদায়ুনী, আব্দুল হামিদ লাহোরী, কাফি খাঁ প্রভৃতির রচনা মুঘলযুগকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী

পার্সি লেখকগণ

ও আকবরনামা, বদায়ুনীর মুন্তাখাব-উল-তোয়ারিখ, ফৈজীর 'লীলাবতী' প্রভৃতি আকবরের রাজত্বকালের অমূল্য সাহিত্য-সৃষ্টি। ফৈজী আকবরের রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। জাহাঙ্গীরের আত্ম-বিবরণী, তাঁহার রাজত্বকালের আব্দুল হামিদ লাহোরীর 'পাদশাহনামা', শাহজাহানের পুত্র দারাশিকোর উপনিষদ ও অথর্ববেদের পার্সী অনুবাদ মুঘল যুগের সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত দেশীয় ভাষার মধ্যে হিন্দী ও বাংলা সাহিত্যেরও উৎকর্ষের

হিন্দী কবিগণ

অনুরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। বীরবল, ভগবান দাস, সুরদাস, মানসিংহ, টোডরমল প্রভৃতি হিন্দী ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া হিন্দী সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করেন। এ বিষয়ে কাশীর তুলসীদাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচিত 'রামচরিতমানস' হিন্দী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। চৈতন্যদেবের জীবনী ও ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া অজস্র বাংলা গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত, নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকর চৈতন্য-জীবনীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত এই সময়েই কাশীরাম দাস মহাভারত ও মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ চণ্ডী রচনা করেন। মুঘল যুগে উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ-ভারতেই উর্দ্দু সাহিত্যের চর্চা অধিক হইয়াছিল।

বাংলা সাহিত্য

প্রশ্ন

1. Give an account of the progress of art and architecture during the Mughul period.

মুঘল যুগের শিল্প ও স্থাপত্যকলা সম্বন্ধে বিবরণ দাও। (৪০৪ পৃষ্ঠা)

2. What do you know about the literature and the general system of education during the Mughul rule,

মুঘল যুগের সাহিত্য ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (৪০৬ পৃষ্ঠা)

বংশ-তালিকা

দিল্লী-সুলতানি

১। দাস বংশ (১২০৬—১২৯০)
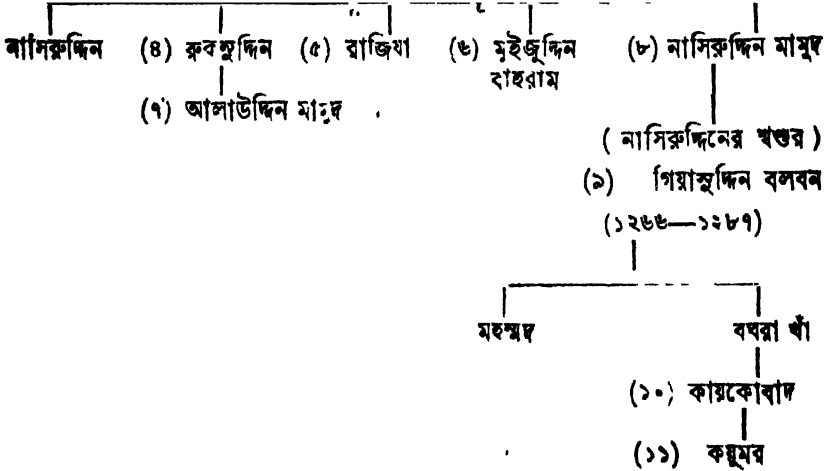
২। খল্‌জি বংশ (১২৯০—১৩২০)

(১) জালালুদ্দিন ফিরুজ
(২) রুকনুদ্দিন
(৩) আলাউদ্দিন (১২৯৬—১৩১৬)
(৪) শিহাবুদ্দিন
(৫) কুতুবুদ্দিন মোবারক

৩। তুঘলক বংশ (১৩২০—১৪১৩)

(১) গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (১৩২০—'২৫)
(২) মুহম্মদ তুঘলক (১৩২৫—'৫১)
(৩) ফিরুজ তুঘলক (১৩৫১—'৮৮)
(৪) দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিন (১৩৮৮—'৮৯)
(৫) আবুবকর (১৩৮৯—'৯০)
(৬) নাসিরুদ্দিন মহম্মদ (১৩৯০—'৯৪)
(৭) আলাউদ্দিন সিকান্দার (১৩৯৪)
(৮) নসরৎ শাহ (১৩৯৪—'৯৬)
(৯) মামুদ শাহ (১৩৯৬—১৪১৩)
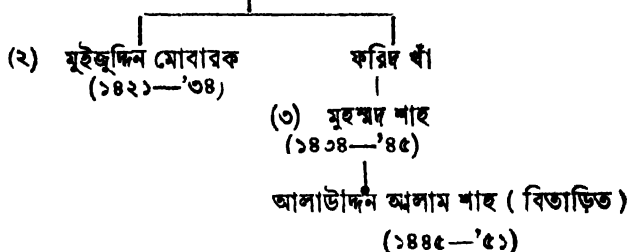
৪। সৈয়দ বংশ (১৪১৪—'৫১)
(১) খিজির খাঁ (১৪১৪—'২১)
(২) মুইজুদ্দিন মোবারক (১৪২১—'৩৪)
ফরিদ খাঁ
(৩) মুহম্মদ শাহ (১৪৩৪—'৪৫)
আলাউদ্দিন আলাম শাহ (বিতাড়িত) (১৪৪৫—'৫১)
৫। লোদী বংশ (১৪৫১—১৫২৬)
(১) বহলুল লোদী (১৪৫১—'৮৯)
(২) নিজাম খাঁ, সিকান্দার লোদী (১৪৮৯—১৫১৭)
(৩ ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭—'২৬)
৬। মুঘল বংশ
(১) বাবর (১৫২৬—'৩০)
(২) হুমায়ুন, (১৫৩০—'৩৯, ১৫৫৫—'৫৬
কামরাণ
হিন্দাল
আসকারী
(৩) আকবর (১৫৫৬—১৬০৫)
মির্জা হাকিম
(৪) জাহাঙ্গীর (১৬০৫—'২৭)
মুরাদ
দানিয়াল
খস্রু
পরভেজ
(৫) শাহ্ জাহান (খুর্‌রম) (১৬২৭—'৫৮)
শাহরিয়র
দারাশিকো
সুজা
(৬) ঔরংজেব (১৬৫৮—১৭০৭)
মুরাদ
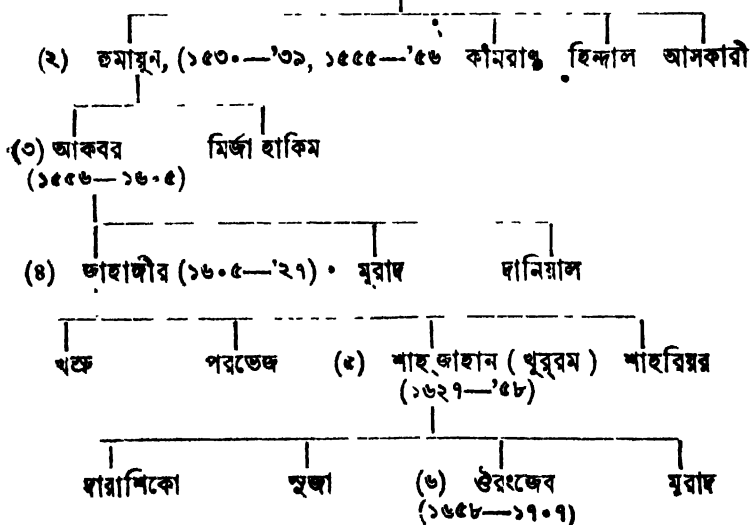
৭। ঔরংজেবের পরবর্তী মুঘল সম্রাটগণের তালিকা

ঔরংজেব (১৬৫৮—১৭০৭)

(১) শাহ আলম বাহাদুর শাহ (১৭০৭—'১২)

(২) জাহান্দার শাহ (১৭১২—'১৩) — আজিম উস্‌শান — রফিউসসান — জাহান শাহ

জাহান্দার শাহ → (৮) ২য় আলমগীর (১৭৫৪—'৫৯) → (৯) দ্বিতীয় শাহ আলম (১২৫৯—১৮০৬)

আজিম উস্‌শান → (৩) ফররুকসিয়ার (১৭১৩—'১৯)

জাহান শাহ → (৬) মহম্মদ শাহ (১৭১৯—'৪৮) → (৭) আহম্মদ শাহ (১৭৪৮—'৫৪)

(১০) দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬—৩৭) — মহম্মদ ইব্রাহিম — (৫) রফিউদ্দৌলা (১৭১৯) — (৪) রফিউদ-দরজা (১৭১৯)

দ্বিতীয় আকবর → (১১) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭—'৫৮)

৮। মারাঠা রাজবংশ

সইবাঈ = শিবাজী = সয়রাবাঈ

শম্ভুজী (১৬৮০—'৮৯) — তারাবাঈ = রাজারাম = রাজসবাঈ (১৬৯০—১৭০০)

শম্ভুজী → শাহু (দ্বিতীয়) শিবাজী (১৭০৮—'৪৯)

রাজারাম → তৃতীয় শিবাজী (১৭০০—'১২) — দ্বিতীয় শম্ভুজী (১৭১২—'৬০)

তৃতীয় শিবাজী → রামরাজা (১৭৪৯—'৭৭) → দ্বিতীয় শাহু (১৭৭৭—১৮১০)

দ্বিতীয় শাহু → প্রতাপসিংহ (১৮১০—'৩৯) — শাহজী (১৮৩৯—'৪৮)

৯। পেশোয়া বংশ

বালাজী বিশ্বনাথ
(১৭১৩—'২০)
বাজিরাও
(১৭২০—'৪০)
চিমনজী (১৭৯৬
বালাজি বাজিরাও
(১৭৪০—'৬১)
রঘুনাথরাও
(১৭৭৩—'৭৪)
বিশ্বাসরাও
মাধবরাও
(১৭৬১—'৭২)
নারায়ণরাও
(১৭৭২—'৭৩)
দ্বিতীয় বাজিরাও
(১৭৯৮—১৮১৮)
মাধবরাও নারায়
(১৭৭৪—'৯৬)

ব্রিটিশ যুগ

বৃটিশ যুগের মৌলিক তাৎপর্য্য

ইউরোপীয় অপরাপর জাতির ন্যায় ইংরেজ জাতিও বাণিজ্যলুব্ধ হইয়া ভারতবর্ষের ভূমিতে পদার্পণ করে। কিন্তু কালচক্রে বণিকের মানদণ্ড একদা রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হইয়া যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বৃটিশ শাসনের যুগ প্রধানতঃ আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী বৃটিশ শক্তির ক্রমপ্রসার ও সার্বভৌম আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ভ্রান্তনীতির ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংস হয়। ঔরংজেবের মৃত্যুর পরে যে কয়জন মুঘল বাদশাহ দিল্লীর মসনদে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নামাবশেষ বাদশাহ ছিলেন মাত্র। মুঘল শক্তির এই দুরবস্থার সময়ে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রদেশ কেন্দ্রীয় আধিপত্য হইতে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। ভারতবর্ষের এই রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার যুগে বাণিজ্যকামী ইংরেজ জাতি ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকামী অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতি ফরাসী শক্তির সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয় এবং দীর্ঘ বিরোধের পর ফরাসীগণকে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিতে সমর্থ হয়। ইত্যবসরে বঙ্গদেশের সিংহাসন লইয়া যে দরবার-ষড়যন্ত্র হয়, তাহাতে ইংরেজগণ এক পক্ষে যোগদান করে এবং ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর রণাঙ্গনে জয়লাভ করিয়া ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ ভারতে বৃটিশের রাষ্ট্রীয় প্রতিপত্তির সূচনা করেন। পলাশীর বিজয় ও ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মুঘল সম্রাটের নিকট হইতে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিলেও, সমগ্র ভারতবর্ষের আধিপত্যলাভের কথা তখনও বৃটিশের কল্পনাতীত ছিল। কেননা মুঘল মহিমা একেবারে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইলেও, তখন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন ও শক্তিমান রাষ্ট্রশক্তির অভাব ছিল না। এই সমস্ত শক্তির সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়া না করা পর্য্যন্ত ভারতে স্থায়ীভাবে বৃটিশ শক্তি প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা ছিল না। মুঘল শক্তির অন্তর্ধানের পর ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ক্রমে মারাঠা ও শিখদের হাতে চলিয়া যায়। বৃটিশকে এই শক্তিদ্বয়ের সঙ্গেই শেষ বোঝাপড়া করিতে হয়।

মুঘল শক্তির অধঃপতনের যুগে মারাঠারাই ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রীয় শক্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। শক্তিমান পেশোয়াদের নেতৃত্বে মারাঠারা সমগ্র ভারতব্যাপী 'হিন্দুপাদপাদশাহী' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিল এবং মুঘলদের প্রায়াবসিত মসনদে বসিবার উদ্যোগ করিল। মারাঠা ব্যতীত মহীশূর, কর্ণাট, হায়দ্রাবাদ, অযোধ্যা, রাজপুতরাজ্য সমূহ, পঞ্জাবের শিখশক্তিও একেবারে উপেক্ষণীয় ছিল না। সমগ্র ভারতে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাকামী কোন শক্তির পক্ষেই ইহাদিগকে অগ্রাহ্য করিবার উপায় ছিল না।

কিন্তু ইংরেজদের সৌভাগ্যবশতঃ এই সকল ভারতীয় শক্তির মধ্যে কোন রাষ্ট্রীয় ঐক্য বা সমস্বার্থের বন্ধন ছিল না। কিন্তু বহিরাগত কোন প্রবল শক্তির পক্ষে এককভাবে ইহাদিগকে পরাজিত করা একেবারে অসম্ভব ছিল না। মুঘলদের ক্ষমতার অবসানে একমাত্র মারাঠাদের শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠনের যথেষ্ট অবকাশ ও সুযোগ ছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল পেশোয়াদের সময়ে মারাঠাশক্তি সামান্য কিছুকালের জন্য ভারতের রাষ্ট্রগগনে জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া অকস্মাৎ একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া গেল। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠালিপ্সু মারাঠারা উৎপীড়নমূলক আচরণের জন্য তাহাদের অনুকূলে সাম্রাজ্যভুক্ত জনসাধারণের নৈতিক সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। জনসাধারণকে এক রাষ্ট্রের অধীনে আনয়ন করার জন্য যে স্বতঃস্ফূর্ত বন্ধনের প্রয়োজন মারাঠাদের মধ্যে তাহার অভাব ছিল। মারাঠা নায়কগণ রাষ্ট্রের শিক্ষা, সাম্প্রদায়িক উন্নতি, স্থায়ী অর্থ নৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা—কোন কিছুর জন্যই চেষ্টা করেন নাই। সাম্রাজ্যের পরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে রাষ্ট্র-শাসনের যে সুব্যবস্থা করা দরকার, তাহারা এই সত্য উপলব্ধি করেন নাই বা তদনুরূপ কোন কার্য্যক্রম অনুসরণ করেন নাই। শুদ্ধ চৌথ ও সরদেশমুখী প্রভৃতি বার্ষিক কর আদায়, অন্যথায় প্রজাশক্তির উপর উৎপীড়নের দ্বারাই তাঁহারা তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। এই সমস্ত অন্যায় আচরণের ফলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ মারাঠাদের উপর বিরক্ত হইয়াছে এবং মারাঠাশক্তিকে ধ্বংস করার জন্য সুযোগমত মারাঠাদের বিপক্ষে যোগদান করিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত ক্ষমতা লইয়া মারাঠারা আত্মকলহে লিপ্ত হয় এবং পরস্পর বিবদমান রাষ্ট্রপক্ষকে বিভক্ত হয়। আত্মকলহের রন্ধ্রপথ দিয়া ইংরেজরা মারাঠাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সুযোগ প্রাপ্ত হয়। অতঃপর পঞ্চধাবিভক্ত মারাঠাশক্তিকে পরাজিত করিতে ইংরেজদের কোন অসুবিধা হইল না। অনুরূপ দুর্দ্ধর্ষ শিখজাতি ও শিখরাষ্ট্র কালক্রমে পরস্পর কলহে লিপ্ত হইয়া ইংরেজদের হস্তক্ষেপের সুবিধা করিয়া দেয় এবং পরিণামে শিখরাষ্ট্র পাঞ্জাব বৃটিশের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

ভারতে বৃটিশ আধিপত্য স্থাপনের বিভিন্ন স্তর প্রণিধান করিয়া অনুধাবনকরিলে দেখা যায় যে ভারতবর্ষস্থ বিভিন্ন শক্তি যখন পারস্পরিক ঈর্ষাদ্বন্দ্বে লিপ্ত, তখন ইংরেজরা ক্রমশঃ তাহাদের অধিকার প্রসারিত করিয়া যাইতে লাগিল। ভারতবর্ষের নানাস্থানের বিবদমান পক্ষদ্বয়ের অন্যতম পক্ষ অবলম্বন করিয়া ইংরেজরা সমর্থিত পক্ষকে বিজয়লাভে সাহায্য করিল এবং উক্ত সাহায্যের বিনিময়ে ভৌমিক অঞ্চল লাভ বা অন্য কোন সুবিধা অর্জন করিতে সমর্থ হইল। ক্রমশঃ ইংরেজ ভারতের সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলের অধিপতি হইয়া বসিল এবং কালক্রমে সার্বভৌম বৃটিশ শক্তির নিকট অপরাপর ভারতীয় সকল শক্তিকেই মস্তক অবনত করিতে হইল।

সমগ্র ভারতের সার্বভৌম আধিপত্যলাভের জন্য ইংরেজকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রণাঙ্গনে জয়ের গৌরব অর্জন করিতে হইয়াছে। মহীশূরের আধিপত্য নষ্ট করার জন্য হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের সঙ্গে ইংরেজদের চারিটি মহীশূর যুদ্ধ; মারাঠা শক্তিকে হীনবল করার জন্য তিনটি মারাঠা যুদ্ধ ও শিখ শক্তিকে বিনষ্ট করিয়া পাঞ্জাবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য দুইটি শিখ যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। এতদ্ব্যতীত ইংরেজকে আরও কয়েকটি অপেক্ষাকৃত অপ্রধান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। ইহার মধ্যে নেপাল যুদ্ধ, ব্রহ্মযুদ্ধ সম্ভাব্য রুশ আক্রমণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য চারিটি আফঘান যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য।

উপরি উক্ত সকল যুদ্ধের পরিণামে ইংরেজ পক্ষই জয়লাভের অধিকারী হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধে বিজয় গৌরব অর্জনের মূলে ইংরেজের উচ্চতম সমরকৌশল ও কূটনীতিক বুদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে ছিল সত্য, কিন্তু সমরনীতি বা কূটনীতির সাহায্যে তাহারা এতখানি কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। অপর পক্ষের বহু ত্রুটি ইংরেজদের সাফল্য অর্জনে পরোক্ষভাবে সাহায্য করিয়াছে। প্রতিপক্ষ ভারতীয় শক্তিসমূহের রাষ্ট্রনৈতিক অদূরদর্শিতা, রণাঙ্গণে সেনানায়কদের বিশ্বাসঘাতকতা, শত্রুর বিপক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে অবতীর্ণ না হওয়া প্রভৃতি শোচনীয় ত্রুটির জন্যই ভারতে বৃটিশ শক্তি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। বহু রণক্ষেত্রে দেশীয় সৈন্যদল অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া শত্রুপক্ষের শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছে, কিন্তু সমর পরিচালনার ত্রুটি বা অন্য কোন বে সামরিক কারণে বহু ক্ষেত্রে তাহারা জয়লাভ করিয়াও জয়ের গৌরব অর্জন করিতে পারে নাই। এই সময়ের মধ্যে দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ হায়দার আলি, টিপু সুলতান, নানা ফাড়নবিশ ও রণজিৎ সিংহ ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কেহ ছিলেন না। ফলে কূটনীতির যুদ্ধেও ভারতীয় শক্তিবর্গ তাদৃশ ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। ক্রমশঃ ভারতের অধিকাংশ প্রধান রাষ্ট্রীয় শক্তি ইংরেজদের আধিপত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইল ও ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্রসমূহও সন্ধি বা করদানের স্বীকৃতির দ্বারা বৃটিশের সার্বভৌমত্ব মানিয়া লইল।

শুদ্ধ কয়েকটি রণক্ষেত্রে বিজয়লাভ ও কয়েকটি সন্ধির জোরে বৃটিশ শক্তি পৌণে দুইশত বৎসর ভারতবর্ষের উপর শাসনাধিকার চালাইয়া যাইতে সক্ষম হইত কিনা সন্দেহ। যুদ্ধ জয়ের সমান্তরালে ইংরেজরা নিজেদের অধিকারের স্থায়িত্বের জন্য ভারতবর্ষে সময়োপযোগী শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে ত্রুটি করে নাই। শাসনতান্ত্রিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই নব নব সংস্কৃত ব্যবস্থার বন্দোবস্ত হয়। শাসকজাতি ও রাষ্ট্রের স্বার্থ বজায় রাখিয়া এই সকল সংস্কার প্রবর্তিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহাতে পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের লাভও যথেষ্ট হইয়াছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীতে জয়লাভের পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত অন্তর্বর্তী এক শতাব্দী কাল ভারতের

শাসনদায়িত্ব ইষ্ট ইণ্ডিয়া বণিক কোম্পানীর হস্তেই ন্যস্ত ছিল। এই কোম্পানী তরবারির সাহায্যে লব্ধ ভারতবর্ষকে তরবারির সাহায্যে রক্ষা করার নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের প্রচণ্ড আঘাতের পর ইংরাজ জাতি উপলব্ধি করিল যে, ভারত শাসনের ব্যাপারে এযাবৎ অনুসৃত নীতির মৌলিক পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। শাসিত দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে শুভসংযোগ না রাখিলে বিদেশী শাসন অচিরেই ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা। সিপাহী বিদ্রোহের পরে বৃটিশ পার্লামেণ্ট এই বিরাট দেশের শাসনভার সামান্য বণিক কোম্পানীর হস্তে না রাখিয়া স্বয়ং গ্রহণ করিল এবং ভারতের শাসন ব্যবস্থায় ভারতবাসীর অধিকারের কথাও স্বীকার করিল। এই স্বীকৃতিকে সূত্র করিয়া ভারতবাসীর স্ব-শাসনের সূচনা হইল।

বৃটিশ শাসনের অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে ইংরেজী ভাষার পঠন-পাঠন ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইল। ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়া ভারতবাসী পাশ্চাত্য জগতের আধুনিক চিন্তাধারা ও প্রগতিমূলক কার্য্যাবলীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাইল। অতঃপর ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়, ভারতের সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষানায়কগণ প্রাচীনপন্থী সমাজ ব্যবস্থা ও শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করিতে লাগিল। ভারতবাসীর এই দাবি শাসকজাতি সম্পূর্ণ স্বীকার করে নাই সত্য, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে জনমতের চাপে বাধ্য হইয়া সমাজ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহারা যথেষ্ট প্রগতিমূলক আইনের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল এবং স্বল্প মাত্রায় স্বায়ত্তশাসনের অধিকারও প্রদান করিয়াছিল। ভারতবর্ষের শিক্ষা সংস্কার, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ইত্যাদি আশানুরূপ না হইলেও, মোটামুটি অগ্রগতির পথেই চলিয়াছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার দাবি জানাইবার মুখপাত্ররূপে জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের জন্ম হইল। কংগ্রেসকে কেন্দ্র করিয়া ভারতবাসীর রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমশঃ দানা বাঁধিতে লাগিল; বহু পতন-অভ্যুদয়, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা বিরোধ-আপোষের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস বৃটিশের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় জয়লাভে সমর্থ হইল। ভারতবাসীর আভ্যন্তরীণ আন্দোলনের সঙ্গে বহির্বিশ্বের রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনা-বিপর্যয় যুক্ত হওয়াতে, ইংরেজকে ভারতবর্ষের অধিকার পরিত্যাগ করিতে হইল। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের রাজদণ্ড বৃটিশের হস্ত হইতে স্খলিত চিরতরে হইয়া গেল—ভারতবর্ষ মুক্ত ও স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

ভারতে ইউরোপীয় বণিকদের আগমন : আধিপত্য লইয়া ইঙ্গ-ফরাসীদ্বন্দ্ব : বঙ্গদেশে ইংরেজ প্রাধান্যের সূচনা

Syllabus :—Vasco-da-Gama. The Portuguese control of the Indian Ocean. Dutch-Portuguese rivalry. The English at Surat and Coromondal—spread to the Bay of Bengal. Naval supremacy in the Bay established at the end of the 17th Century.

Anglo-French rivalry in the Carnatic. Clive and Dupleix. French defeat at Wandiwash (1760 A. D.).

Political revolutions in Bengal, 1757 and 1760 Quarrel with Mir Kasem over private trade-Buxar. The grant of Dewani—its implications.

পাঠ্যসূচী : -ভাস্কো ডা-গামা। ভারত মহাসাগরে পর্টুগীজদের আধিপত্য। ওলন্দাজ পর্টুগীজ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সুরাট ও করমণ্ডল উপকূলে ইংরেজগণ—বঙ্গোপসাগরে তাহাদের প্রসার। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে বঙ্গোপসাগরে ইংরেজ প্রাধান্য।

কর্ণাটক অঞ্চলে ইঙ্গ ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ক্লাইব ও ডুপ্লে। বন্দিবাসের যুদ্ধে (১৭৬০) খৃঃ) ফরাসীদের পরাজয়।

১৭৫৭ ও ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বঙ্গদেশে রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন। বে-সরকারী বাণিজ্য লইয়া মীরকাশিমের সহিত ইংরেজদের বিরোধ। বক্সারের যুদ্ধ। ইংরেজগণের দেওয়ানী লাভ। ইহার তাৎপর্য্য।

বৃটিশ শক্তির অভ্যুদয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :—পর্টুগীজ, ডাচ, ইংরেজ, ফরাসী, দিনেমার এবং সুইডিস প্রভৃতি বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি প্রাচ্যখণ্ডে ব্যবসার জন্য ভারতবর্ষে পদার্পণ করে। কিন্তু প্রথমোক্ত চারিটি জাতি ব্যতীত অন্য কাহারও বাণিজ্য দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই। উপরোক্ত জাতিসমূহের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রাধান্য লাভের জন্য বিবাদ বিসম্বাদ লাগিয়াই থাকিত। প্রথম দিকে পর্টুগীজ-ডাচ, পর্টুগীজ-

ইংরাজ ও ডাচ-ইংরাজ এই ত্রিকোণ সংঘাত উপস্থিত হয় এবং এই সংঘর্ষে ইংরাজগণ বিজয়ী হয়। শেষ পর্য্যায়ে আগত ফরাসীদের সঙ্গে ইংরাজদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয় এবং এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া চলে।

১৭৪০—'৬৫ এই পঞ্চবিংশতি বৎসরের কাহিনী ঘটনাবহুলতা ও গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্ম ভারতের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় রচনা করিয়াছে। এই সময়েই ইংরাজ বণিকের মানদণ্ড অলক্ষিতভাবে রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হওয়ার সূচনা হয়। ইংরাজ শক্তির প্রাধান্যের নিকট মস্তক অবনত করিয়া ইতিপূর্ব্বেই অন্যান্য বাণিজ্যকামী ইউরোপীয় শক্তি ভারতের দৃশ্যপট হইতে অপসৃত হইয়া যায় কিন্তু ফরাসীরা তখন পর্য্যন্ত সগর্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া ইংরাজের প্রতি-স্পর্দ্ধা করিতে থাকে এবং ডুপ্লের নেতৃত্বে ভারতে ফরাসী-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করে। বাংলা দেশ ও দক্ষিণ ভারত এই দুই অঞ্চলেই ফরাসীরা তাহাদের অধিকৃত স্থান হইতে নানাবিধ উপায়ে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করে। ডুপ্লে ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গের আভ্যন্তরীণ গোলযোগে এক পক্ষ সমর্থন করিয়া ফরাসীদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ও স্থানবিশেষ অধিকার করার চেষ্টা করেন। ইংরাজগণ ফরাসীদের অভিসন্ধি উপলব্ধি করিয়া সর্বত্র ফরাসীদের প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হয় এবং দক্ষিণ-ভারত ও বাংলাদেশ হইতে ফরাসী আধিপত্য চিরতরে বিদূরিত করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। এই ইংরাজ ফরাসী বিরোধের সূত্রপাত ভারতবর্ষে হয় নাই—পূর্ণ অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া ইউরোপে, আমেরিকায় এবং অন্যত্র উপনিবেশ বিস্তারের ক্ষেত্রে ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধ চলিয়াছিল; ভারতের ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধ সেই বৃহত্তর প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্যতম চূড়ান্ত অধ্যায় মাত্র। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট ও হায়দ্রাবাদের এবং বঙ্গদেশের নবাব দরবারের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের মধ্যে উভয় পক্ষই জড়িত হয়। দাক্ষিণাত্যের শক্তিদ্বন্দ্বের চূড়ান্ত মীমাংসা তিনটি কর্ণাট যুদ্ধে হইয়া যায়। ১৭৬০ খৃঃ-এ বন্দিবাসের যুদ্ধে (Battle of Wandiwash) ফরাসীরা পরাস্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যে ইংরাজের প্রাধান্য স্বীকার করে।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে উভয় জাতির ক্ষমতাদ্বন্দ্ব চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। বাংলাদেশে ফরাসী শক্তিকে পর্য্যুদস্ত করার প্রচেষ্টা তদানীন্তন বাংলাদেশের নবাব সিরাজদ্দৌলা কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইলে ইংরাজ সেনানায়ক ক্লাইভ, ওয়াটসন প্রভৃতি স্বাধীনচেতা নবাবকে অপসৃত করিয়া একজন বশংবদ নবাবকে সিংহাসনে বসাইবার উদ্দেশ্যে নবাবের দরবার-ষড়যন্ত্রে নবাবের বিপক্ষদলে যোগদান করে এবং পলাশীর রণক্ষেত্রে নবাবের শত্রুপক্ষের দ্বারা শক্তিপুষ্ট হইয়া নবাবকে পরাজিত ও সিংহাসন

হইতে অপসৃত করে। পলাশী-যুদ্ধে ইংরাজের জয়লাভ হইলে বাংলাদেশে ফরাসীরা হীনবল হইয়া পড়ে। এইরূপে বাংলাদেশে ফরাসী প্রতিপত্তি বিনষ্ট হইয়া পড়িলে দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিশেষ সুবিধা হয়। পলাশী যুদ্ধের তিন বৎসর পরে ইংরাজ ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার চূড়ান্ত সংগ্রাম তৃতীয় কর্ণাট যুদ্ধ হয়; সুতরাং বাংলার সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও বাংলার অর্থ ও জনবল তৃতীয় কর্ণাট যুদ্ধে ফরাসী শক্তিকে পরাজযের কাজে ইংরাজকে যথেষ্ট সাহায্য করে। এইরূপে ভারতের দুইটি প্রধান অঞ্চল বঙ্গদেশে ও দাক্ষিণাত্যে পরাজয় বরণ করার পর ভারতে ফরাসী আধিপত্য ও সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রত্যাশা চিরতরে নষ্ট হয় এবং সামরিক ও বাণিজ্যিক শক্তিরূপে ইংরাজের একক প্রাধান্য বঙ্গদেশে ও দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতঃপর মীরজাফর বাংলার মসনদে আসীন হইলেও রাজনৈতিক শক্তিরূপে ইংরাজের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। মাত্র কলিকাতার উপর অধিকার, পুরস্কার স্বরূপ প্রচুর অর্থপ্রাপ্তি এবং সামরিক শক্তিরূপে যথেষ্ট খ্যাতি ও সম্মানলাভ ইংরাজের অদৃষ্টে ঘটে। ইতিমধ্যে বাংলার মসনদে নবাবের পরিবর্ত্তন হয় ও মীরকাশিম নবাব হইয়া ইংরাজের কর্মচারিগণের নিঃশুল্ক ব্যক্তিগত বাণিজ্য করার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। ইংরাজ ইহাতে ক্রুদ্ধ হয় এবং মীরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিম পরাজিত হয়। পলাশীর যুদ্ধে নবাবের পরাজয় ইংরাজের সামরিক উৎকর্ষতার ফলে হয় নাই, নবাবের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতাই ইংরাজের জয়লাভের প্রধান কারণ ছিল। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে নবাবের পরাজয় সম্পূর্ণ সামরিক। মীরকাশিম ইংরাজের সঙ্গে সংঘর্ষের আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্ব হইতে সামরিক প্রস্তুতি করিয়া রাখিয়াছিলেন। এতৎসত্ত্বেও মীরকাশিম যখন পরাজিত হইলেন তখন ইহাই স্পষ্ট হইল যে এই পরাজয়ের পশ্চাতে রহিয়াছে তৎকালীন ভারতীয় সামরিক পদ্ধতি ও নবাবী রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থার কোন মৌলিক ত্রুটি। পলাশী যুদ্ধে জয়লাভ অপেক্ষা বক্সারের যুদ্ধে বিজয়ের ফলে ইংরাজের লাভ অধিক হইল। ইংরাজ বাংলার নবাব-স্রষ্টা হইয়া বাংলার প্রকৃত শাসনভার এক সন্ধির বলে নিজেদের হস্তে তুলিয়া লইল। মীরকাশিমের পর মীরজাফর এবং মীরজাফরের মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র নজমদ্দৌলা বাংলার মসনদে নামমাত্র নবাবরূপে আসীন রহিলেন, রাজদণ্ড ইংরাজের হস্তে আসিল। মীরকাশিমকে সাহায্য করার জন্য অযোধ্যার নবাবও ইংরাজের দ্বারা দণ্ডিত হইল, শাস্তিস্বরূপ তাহাকে ইংরাজের হাতে কোরা ও এলাহাবাদ সমর্পণ করিতে হইল।

কিন্তু বঙ্গদেশের প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ইংরাজের হস্তে আসিলেও আইনসঙ্গতভাবে বঙ্গদেশের মালিক ছিলেন তদানীন্তন মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম। তাঁহার সঙ্গে বাংলাদেশ সম্বন্ধে কোন প্রকার আইনানুগ বন্দোবস্ত না করা পর্য্যন্ত বাংলাদেশে ইংরাজের অধিকার ও আধিপত্য সর্বত্র স্বীকৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না বলিয়া ক্লাইভ কোম্পানীর বাণিজ্য ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সুবিধার জন্য নাম মাত্র দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হইতে বাৎসরিক ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের অধিকারের বন্দোবস্ত করিলেন (১৭৬৫ খৃঃ)। বঙ্গদেশের উপর ইংরাজের প্রকৃত সামরিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য ইতিপূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই দেওয়ানীলাভের পর বাংলাদেশের উপর ইংরাজের সর্বাঙ্গীণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। বঙ্গদেশের উপর আধিপত্য স্থাপন প্রকৃত প্রস্তাবে ভবিষ্যতে সমগ্র ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পাদপীঠ হইল।

ইউরোপীয় জাতিসমূহের আগমনঃ পর্টুগীজগণঃ—স্মরণাতীত কাল হইতেই পাশ্চাত্য জগতের সহিত ভারতের বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল, গ্রীস ও রোমের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ চলিত। এই দুই দেশের বণিক সম্প্রদায় লোহিত সাগর ও আরব সাগরের পথে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য চালাইত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মিশর আরবজাতির হস্তগত হওয়ায়, এই পথে ইউরোপের ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধ হইয়া যায় এবং ইউরোপের সহিত ভারতের ব্যবসাবাণিজ্য আরব বণিকদের কর্তৃত্বাধীনে আসে।

প্রাচীনকাল হইতে ইউরোপের সঙ্গে সম্বন্ধ

'আরব বণিকগণ ভারতবর্ষ, তথা দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া হইতে পণ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আরব সাগর ও লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া এই সমস্ত দ্রব্য ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ইটালীয় বণিকদের নিকট বিক্রয় করিত। ইটালীর ভিনিস, ফ্লোরেন্স, মিলান প্রভৃতি নগরের বণিকগণ আরবদের নিকট হইতে ক্রীত বাণিজ্য দ্রব্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিত। এই লাভজনক বাণিজ্য আরব ও ইটালীয় বণিকদের একচেটিয়া থাকায় ইউরোপের অন্যান্য দেশের বণিকগণ ভারতের সহিত প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্য করার জন্য আগ্রহান্বিত হইল এবং জলপথে সরাসরি ভারতবর্ষে আগমনের পথ আবিষ্কারের জন্য উন্মুখ হইল। ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে প্রধানতঃ স্পেন ও পর্টুগাল জলপথে ভারতবর্ষে আগমনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কলম্বাস ভারতবর্ষে আগমনের পথ আবিষ্কার করিতে বহির্গত হইয়া আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে

বাণিজ্য পদ্ধতি

জলপথে ভারতবর্ষে আগমন

বার্থালোমিউ ডিয়াজ নামে জনৈক পর্টুগীজ আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চল অতিক্রম করিয়া ভারতে আসার চেষ্টা করিলেন এবং দক্ষিণ অফ্রিকার 'উত্তমাশা' বা বাত্যাবিক্ষুব্ধ অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জলপথে প্রত্যক্ষভাবে ভারতবর্ষে প্রথম আগমনের কৃতিত্ব ভাস্কো-ডা-গামা নামক এক পর্টুগীজ নাবিকের। ভাস্কো ডা-গামা ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে জামোরিণ উপাধিধারী হিন্দু নরপতির দরবারে উপস্থিত হন। কালিকটের হিন্দু নরপতি জামোরিণ পর্টুগীজগণকে ব্যবসা করার জন্য সুবিধা প্রদান করিলেন। কিন্তু পর্টুগীজরা শুদ্ধ বাণিজ্যিক সুবিধা লইয়া সন্তুষ্ট রহিল না—তাহারা অন্যান্য ব্যবসায়ী জাতিকে বঞ্চিত করিয়া ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার আয়ত্ত করার চেষ্টা করিল।

ভাস্কো-ডা-গামা

ইহাতে সুদীর্ঘকালের বণিক জাতি আরবদের সঙ্গে তাহাদের সঙ্ঘর্ষ বাধিল। অধিকন্তু পর্টুগীজরা দক্ষিণ ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিয়া কালিকটের জামোরিণদের শত্রু কোচিনরাজের পক্ষ অবলম্বন করিল। ১৫০২ খৃষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আগমন করিয়া কোচিন ও ক্যানানোর এই দুইটি স্থানে পর্টুগীজদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে পর্টুগীজ শাসনকর্ত্তা আলাফ্সো ডি আলবুকার্ক এর সময়ে (১৫০৯-১৫) ভারতে পর্টুগীজদের ক্ষমতা সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আলবুকার্ক বিজাপুরের সুলতানের অধিকারভুক্ত গোয়া বন্দর বলপূর্বক অধিকার করেন (১৫১০)। ভারতে পর্টুগীজদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য আলবুকার্ক ভারতস্থিত পর্টুগীজদিগকে ভারতীয় নারী বিবাহ করার জন্য উৎসাহিত করেন। মুসলমানদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়া আলবুকার্ক কুখ্যাতি অর্জন করেন। ক্রমশঃ পর্টুগীজগণ তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আরবগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে ক্ষমতাচ্যুত করেন

আলবুকার্ক

বিভিন্ন স্থানে কুঠি স্থাপন

বং এআরবসাগরে পর্টুগীজদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। আলবুকার্কের পরবর্তী পর্টুগীজ শাসনকর্তাদের চেষ্টার ফলে কালিকট, ক্যানানোর, গোয়া, দমন, দিউ, সালসেট, বেসিন, চৌল, বোম্বাই, মাদ্রাজের নিকটবর্তী স্থানটমে এবং পশ্চিম বঙ্গের হুগলীতে পর্টুগীজদের বণিজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়; সিংহলের একটি বৃহত্তর অংশেও তাহাদের প্রাধান্য বিস্তৃত হইয়াছিল। লোহিত সাগরের মুখে অবস্থিত সকোত্রা দ্বীপ, পারস্য উপসাগরে অবস্থিত ওরমুজ বন্দর এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালাক্কা দ্বীপ তাহাদের অধিকারে আসিয়াছিল। এইভাবে পর্টুগীজগণ প্রাচ্যে একটি সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল এবং সমগ্র ষোড়শ শতাব্দী ধরিয়া ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যে তাহারা একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

আলবুকার্ক

পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে পর্টুগীজরা সর্বপ্রথমে ভারতে পদার্পণ করিলেও, বিভিন্ন কারণে তাহারা এই স্থানে তাহাদের স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। তাহাদের আচরণগত বহু ত্রুটির জন্য তাহারা ভারতীয় শাসকবর্গের বিরূপতা অর্জন করে। পরধর্মদ্বেষ, ব্যবসায়ে অসাধু রীতির আশ্রয়গ্রহণ, দাস ব্যবসায়, জলদস্যুতা ইত্যাদি তাহাদের চরিত্রের ধর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের এই সমস্ত অন্যায় আচরণে বিরক্ত হইয়া মুঘল সম্রাটগণ পর্টুগীজদের বিরুদ্ধে প্রতিকূল নীতি গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়তঃ এই সময়ে ব্রেজিল আবিষ্কৃত হওয়ায় পর্টুগালের কর্মকৃতি ভারত হইতে সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ, হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ড সামুদ্রিক বাণিজ্যে দ্রুত উন্নতি করায় পর্টুগীজগণ প্রতিযোগিতায় হীনবল হইয়া যায়। এইরূপে ক্রমেই ভারতে ও ভারত মহাসাগরে তাহাদের প্রাধান্য লোপ পায় এবং মাত্র গোয়া, দমন, দিউ তাহাদের অধিকারে থাকে।

পর্টুগীজদের ক্ষমতা হ্রাসের কারণ

ওলন্দাজগণ:—পর্টুগীজদের দেখাদেখি হল্যাণ্ডের অর্থাৎ ওলন্দাজ বণিকগণ

বাণিজ্যসূত্রে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করে এবং পর্টুগীজগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া তাহাদিগকে ভারতের বাণিজ্যক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হয়। ওলন্দাজগণ সুলিকট, সুরাট, চুচুড়া, কাশিমবাজার, বরাহনগর, পাটনা, বালেশ্বর, কোচিন প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন। তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে প্রধানতঃ নীল, সিল্ক, কার্পাসবস্ত্রাদি, গন্ধক, আফিম, চাউল ইত্যাদি রপ্তানী করিত এবং বিনিময়ে ভারতবর্ষে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন প্রকারের মসলাদ্রব্য আমদানী করিত। ওলন্দাজদের সঙ্গে পর্টুগীজ ও ইংরেজদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং ওলন্দাজরা পর্টুগীজদিগের শেষ পর্যন্ত বিতাড়িত করিয়া কিছুকাল টিকিয়া থাকে। ইংরেজদের সঙ্গে তাহাদের প্রতিযোগিতা দীর্ঘকাল চলিয়াছিল। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ ইংরেজদের নিকট বিদেরার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হইতে নিবৃত্ত হয় এবং বাণিজ্য ব্যাপারে সুমাত্রা, জাভা, মালয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি প্রাচ্যাঞ্চলে তাহাদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করে।

ইংরেজগণঃ—১৬০০ খৃষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে প্রাচ্যদেশে ব্যবসার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে এই কোম্পানী ভারতবর্ষে বাণিজ্য করার জন্য উদ্যোগী হয় এবং ভারতে বাণিজ্যের অনুমতি লাভের জন্য কাপ্তেন হকিন্স-কে জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রেরণ করে। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর এই কোম্পানীকে সুরাটে কুঠি স্থাপনের অনুমতি দেন। ১৬১৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইংরেজগণ সুরাট, আগ্রা, আমেদাবাদ, বরোচ, পাটনা, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস বিবাহ সূত্রে পর্টুগালের নিকট হইতে বোম্বাই শহরটি প্রাপ্ত হন এবং পরে ইহা তিনি ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করিয়া দেন। এইরূপে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রান্সিস ড্রেক নামক জনৈক ইংরেজ চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে মান্দ্রাজের ইজারা গ্রহণ করেন। দক্ষিণ ভারতের উপকূলের এই স্থানটি ক্রমশঃ ইংরেজদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। নূতন কেন্দ্র রক্ষার জন্য মান্দ্রাজে সেণ্ট জর্জ নামক এক দুর্গ নির্মিত হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজগণ খুব শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং মুঘলদের সঙ্গে বিরোধিতা করিতে সাহসী হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাহ্‌জাহানের পুত্র সুজার নিকট হইতে বাৎসরিক ৩০০০ টাকা প্রদানের বিনিময়ে বাণিজ্যশুল্ক প্রদানের নিষ্কৃতির ফরমান আদায় করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে সম্রাট ঔরংজেব ও সুবেদার শায়েস্তা খাঁর

নিকট হইতেও কোম্পানী অনুরূপ সুবিধা আদায় করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল 'ফরমান' থাকা সত্ত্বেও সর্বত্রই স্থানীয় মুঘল কর্মচারিগণ ইংরেজদের উপর জুলুম করিতে থাকে। অগত্যা ইংরেজগণ বল প্রয়োগের দ্বারা এই জুলুমের হাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য চেষ্টা করে এবং হুগলী কুঠিকে সুরক্ষিত করিয়া তোলেন। এইভাবে মুঘলদের সঙ্গে ইংরেজদের শত্রুতার সূত্রপাত হয়। (১৬৮৬)। ইংরেজরা হুগলী, হিজলী ও বালেশ্বরের মুঘল দুর্গগুলি আক্রমণ করেন। মুঘল সৈন্য হুগলী হইতে ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করিলে হুগলী কুঠির অধ্যক্ষ জব চার্ণক মুঘলদের সহিত আপোষরফা করিয়া সুতানুটিতে ফিরিয়া আসিবার অনুমতি পান (১৬৮৭)। কিন্তু পর বৎসর পুনরায় মুঘল ও ইংরেজদের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ইংরেজগণ ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত কতিপয় মুঘল অধিকৃত বন্দর অবরোধ করে এবং কয়েকটি মুঘল জাহাজ অধিকার করিয়া লয়। মুঘল সম্রাট ঔরংজেব ইহতে ক্রুদ্ধ হইয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ইংরেজগণ ভীত হইয়া কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হয়। ঔরংজেব ইংরেজদিগকে ক্ষমা করিয়া ভারতে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করেন। মুঘলদের সহিত সন্ধি হইলে জব চার্ণক পুনরায় বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া কলিকাতা মহানগরীর পত্তন করেন (১৬৯০)। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিনটি গ্রামের জমিদারি গ্রহণ করে। ক্রমে তাহারা আত্মরক্ষার জন্য সুতানুটিতে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণ করেন এবং নিরুপদ্রবে ব্যবসা বাণিজ্য চালাইতে আরম্ভ করে।

ফরাসীগণ :—ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে ফরাসীরা সর্বশেষে বাণিজ্যের জন্য ভারতে আগমন করে। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী কোলবার্টের উদ্যোগে প্রাচ্যদেশে বাণিজ্যের জন্য ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে সুরাটে প্রথম ফরাসী কুঠি স্থাপিত হয়, পর বৎসর ফরাসীরা মসলীপত্তমে কুঠি নির্মাণ করে। ক্রমে পণ্ডিচেরী, চন্দনগর, কারিকাল, মাহে প্রভৃতি অঞ্চলে ফরাসী বাণিজ্য কুঠি গড়িয়া উঠে। ফরাসীদের বাণিজ্য নষ্ট করার জন্য ওলন্দাজ ও ইংরেজগণ যথেষ্ট শত্রুতা করে। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ফরাসীরা ভারতবর্ষে শুদ্ধ ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল এবং কোন প্রকার রাজনৈতিক অভিসন্ধি তাহাদের ছিল না। ফরাসী গভর্ণর ডুপ্লের আগমনের পর হইতেই ফরাসীরা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উচ্চাশা পোষণ করিতে থাকে। ইংরেজরা তাহাদের এই উচ্চাশার প্রতিবন্ধক হওয়ায় উভয় শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং ভারতের ইতিহাস এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি :—পর্টুগীজ, ডাচ, ইংরেজ, ফরাসী ব্যতীত ইউরোপের

আরও অন্যান্য জাতি ব্যবসার জন্য ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিল। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে ডেন বা দিনেমারগণ, ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে সুইডিসগণ ও ১৭২২ খৃষ্টাব্দে ফ্লাণ্ডার্স শহরের বণিক সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রেরিত অষ্টেণ্ড কোম্পানী ভারতে ব্যবসার জন্য পদার্পণ করে। কিন্তু প্রথমোক্ত চারিটি জাতি ব্যতীত অন্য কাহারও বাণিজ্য দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই।

এই সমস্ত পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে ব্যবসার জন্য বিবাদবিসম্বাদ লাগিয়াই থাকিত। প্রথমদিকে পর্টুগীজ-ডাচ, পর্টুগীজ-ইংরেজ ও ডাচ-ইংরেজ এই ত্রিকোণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং এই সংঘর্ষে পরিণামে ইংরাজগণ বিজয়ী হয়। এই সংঘর্ষের শেষ পর্য্যায়ে সর্বশেষ আগত ফরাসীদের সঙ্গে ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ অষ্টাদশ অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া চলে।

ইঙ্গ-ফরাসীদ্বন্দ্ব:—অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ ভারতে ও বাংলাদেশে আধিপত্য লইয়া ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ হয়। ফরাসী গভর্ণর ডুপ্লে ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গের আভ্যন্তরীণ গোলযোগে এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া ফরাসীদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ও অঞ্চল বিশেষ অধিকার করার চেষ্টা করেন। ইংরেজরা ফরাসীদের অভিসন্ধি উপলব্ধি করিয়া সর্বত্র ফরাসীদের প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হয় এবং দক্ষিণ ভারত ও বাংলা দেশ হইতে ফরাসী আধিপত্য চিরতরে বিদূরিত করার জন্য সচেষ্ট হয়। এই ইংরেজ-ফরাসী বিরোধের সূত্রপাত ভারতবর্ষে হয় নাই—পূর্ণ অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া ইউরোপ-আমেরিকায় এবং অন্যত্র উপনিবেশ বিস্তারের ক্ষেত্রে ইঙ্গ ফরাসী বিরোধ চলিয়াছিল। ভারতের ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধ সেই বৃহত্তম প্রতিদ্বন্দ্বিতার চূড়ান্ত অধ্যায় মাত্র।

১৭৩১ খৃষ্টাব্দে জোসেফ ডুপ্লে চন্দননগরের শাসনকর্তা হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি পণ্ডিচেরীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি যেমন অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন, তেমনই তাঁহার উচ্চাভিলাষও ছিল অপরিসীম। তিনি তৎকালীন ভারতের রাষ্ট্রীয় অনৈক্য ও দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের কথা চিন্তা করেন এবং ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত একটি সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তোলেন।

ডুপ্লের উদ্দেশ্য

এই সময় ভারতীয় রাজাদের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়া থাকিত। ডুপ্লে ভারতীয় রাজাদের এই সমস্ত বিরোধে কাহারও কাহারও পক্ষ সমর্থন করিয়া ভারতবর্ষে ফরাসীদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্কল্প করেন। তিনি স্থির করিলেন ভবিষ্যতে দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ উপস্থিত হইলে

ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত মুষ্টিমেয় সৈন্যসহ তিনি যে পক্ষ অবলম্বন করিবেন সেই পক্ষই বিজয়ী হইবে এবং ফরাসীদের প্রতিপত্তি এইভাবে বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবে। এই উপায়ে ভারতীয় রাজ দরবারে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিলে এই সম্মান ও প্রতিপত্তির ফলে ইংরাজদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হইতে অপসৃত করা বিশেষ শক্ত হইবে না। ইংরাজরাও অচিরেই ডুপ্লের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া সুশিক্ষিত সৈন্য-বাহিনী গঠন করিল এবং সাহায্য প্রদানের অজুহাতে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করার চেষ্টা করিতে লাগিল। অচিরেই দক্ষিণ ভারতে উভয় পক্ষের হস্তক্ষেপের এবং বিরোধের একটি ক্ষেত্র জুটিল।

জোসেফ ডুপ্লে

ইউরোপীয়গণ করমণ্ডল উপকূল ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলকে কর্ণাট নামে অভিহিত করিত।

কর্ণাটে গোলযোগ

কর্ণাটের নবাব নামতঃ মুঘলদের অধীন হইলেও কার্য্যতঃ স্বাধীন ছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল আর্কটে। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটের নবাব দোস্ত আলি মারাঠাদের হস্তে নিহত হন। দোস্ত আলির মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র সফদর আলি কর্ণাটের নবাব হন। তিনিও অচিরে নিহত হন। তখন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তারূপে হায়দ্রাবাদের নিজাম আনোয়ার উদ্দিন নামে একজন ব্যক্তিকে কর্ণাটের নবাব নিযুক্ত করেন। দোস্ত আলির জামাতা চাঁদা সাহেব কর্ণাটের নবাবী পাইবার জন্য উৎসুক ছিলেন। নিজামের এই নিয়োগ কর্ণাটের জনসাধারণের মনঃপূত হয় নাই। ফলে কর্ণাটে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই গোলযোগে প্রথম দিকে ইংরেজ ও ফরাসী উভয়েই নিরপেক্ষ ছিল। কিন্তু শীঘ্রই কর্ণাটের নবাব আনোয়ারউদ্দিনের সহিত ফরাসীদের বিরোধ বাধিল। এই সময়ে রাপে অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধের সূত্রপাত হয় এবং এই যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স বিভিন্ন পক্ষে যোগদান করে। ইউরোপের যুদ্ধের ঢেউ ভারতবর্ষে পৌঁছিলে ইংরেজ ও ফরাসী পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ডুপ্লের অনুরোধে আফ্রিকার নিকটবর্ত্তী মরিসাসের শাসনকর্ত্তা লাবুর্দনে এক ফরাসী নৌ-বহর লইয়া ইংরেজ অধিকৃত মাদ্রাজ অবরোধ করেন। বিনা যুদ্ধে মাদ্রাজ ফরাসীদের নিকট আত্মসমর্পণ

করে। ইতিমধ্যে এক অঘটন ঘটিল। ইংরেজ ও ফরাসী উভয়েই কর্ণাটের নবাব আনোয়ারউদ্দিনের রাজ্যের সীমানায় পরস্পর যুদ্ধ করিতেছিল।

কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ

আনোয়ার উদ্দিন প্রথমে ইংরেজকে তাঁহার এলাকায় যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কর্ণপাত করে নাই। অতঃপর ফরাসীরা যখন মাদ্রাজ আক্রমণ করে, তখন আনোয়ারউদ্দিন ফরাসীদিগকে যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ দেন। কূটকৌশলী ডুপ্লে আনোয়ারউদ্দিনকে এই বলিয়া প্রলোভন দেখান যে মাদ্রাজ ইংরাজদের হস্ত হইতে অধিকারের পরে তাহা আনোয়ারউদ্দিনের হস্তে সমর্পিত হইবে। সুতরাং মাদ্রাজ অবরোধের সময়ে আনোয়ারউদ্দিন বিশেষ উচ্চবাচ্য করিলেন না। কিন্তু অচিরেই আনোয়ারউদ্দিন ফরাসীদের প্রতারণার কথা বুঝিতে পারিলেন এবং ফরাসীগণকে শাস্তি প্রদানের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন, কিন্তু মাইলাপুর বা সেণ্ট টোম-এর যুদ্ধে নবাবের দশ সহস্র সৈন্য ফরাসীদের পাঁচ শত সৈন্যের একটি দলের হস্তে পরাজিত হইল। এই সাফল্যে ডুপ্লে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন সেণ্ট টোম-এর যুদ্ধে জয়লাভে তাঁহার সূত্রপাত দেখিয়া উৎফুল্ল হইলেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে এক নৌ-বহর ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। এই নৌ বহর মাদ্রাজ পুনরুদ্ধারে অসমর্থ হইয়া পাণ্টা পণ্ডিচেরী অবরোধ করিল, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া অবরোধ উত্তোলন করিতে বাধ্য হইল। এই সমস্ত সাফল্যের সংবাদে ডুপ্লের খ্যাতি ও আত্মবিশ্বাস বাড়িয়া গেল। কিন্তু ডুপ্লের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সূত্রপাত হইতে না হইতেই ইউরোপে অষ্ট্রিয়া উত্তরাধিকারের যুদ্ধ আয়-লা শ্যাপেলের সন্ধিতে সমাপ্ত হইল (১৭৪৮ খৃঃ) এবং ভারতবর্ষেও ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে সন্ধি হইল। সন্ধির শর্ত্ত অনুযায়ী ফরাসীরা ইংরেজদের হস্তে মাদ্রাজ প্রত্যর্পণ করিল। ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিল এবং এইরূপে প্রথম কর্ণাট যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হইল।

আয়-লা শ্যাপেলের সন্ধি অনুযায়ী ভারতবর্ষে ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী রহিল না। ডুপ্লে যে উচ্চাশার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ না হওয়াতে, তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া রহিলেন এবং পুনরায় ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধের সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন। এই সুযোগও অনতিবিলম্বে আসিয়া গেল। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদের নিজামের মৃত্যু হইলে সিংহাসনের জন্য নিজামের পুত্র নাসির জঙ্গ ও পৌত্র মুজাফ্‌ফর জঙ্গের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল। একই সময়ে কর্ণাটের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিবাদ দেখা দিল। কর্ণাটের ভূতপূর্ব্ব মৃত নবাব দোস্ত আলির জামাতা চাঁদা সাহেব আনোয়ারউদ্দিনকে বিতাড়িত করিয়া কর্ণাটের নবাবী অধিকারের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ডুপ্লে কর্ণাট ও হায়দ্রাবাদের এই আভ্যন্তরীণ

কলহে ভারতে ফরাসীদের প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করার জন্য উদ্যোগী হইলেন। ডুপ্লে কর্ণাটে চাঁদা সাহেবের এবং হায়দ্রাবাদে মুজাফ্ফর জঙ্গের পক্ষ সমর্থন করিলেন। দক্ষিণ ভারতের এই গোলযোগে ইংরেজরাও নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিল না। ইংরেজরাও কর্ণাটে আনোয়ারউদ্দিন ও হায়দ্রাবাদে নাসির জঙ্গকে সাহায্য করিতে লাগিল। ফরাসীদের বিপক্ষতার ফলে আনোয়ারউদ্দিন পরাজিত ও নিহত হইলেন। তাঁহার পুত্র মহম্মদ আলি ত্রিচিনপল্লীতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চাঁদা সাহেব ফরাসীদের সহায়তায় কর্ণাটের সিংহাসন হস্তগত করিলেন।

দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধ

এই ভাবে কর্ণাটে ফরাসীদের প্রতিপত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। ইতিমধ্যে একদল ফরাসী সৈন্য ত্রিচিনপল্লী অবরোধের জন্য প্রেরিত হইল। মহম্মদ আলি নাসির জঙ্গের সহিত ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইংরেজরা ডুপ্লের মত উদ্যমশীল ছিল না বলিয়া প্রথমতঃ এই সব ব্যাপারে অতটা গুরুত্ব আরোপ করে নাই এবং মহম্মদ আলির জন্য ত্রিচিনপল্লীতে সামান্য সাহায্য পাঠাইয়া নিবৃত্ত রহিল। নাসির জঙ্গ স্বয়ং সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভাগিনেয় মুজাফ্ফর জঙ্গকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন; কিন্তু অচিরেই আততায়ীর হস্তে নিহত হইলেন (১৭৫০ খৃঃ)। বন্দীদশা হইতে মুক্ত মুজাফ্ফর জঙ্গ দাক্ষিণাত্যের সুবাদার বলিয়া ঘোষিত হইলেন এবং হায়দ্রাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কৃতজ্ঞ নিজাম সাহায্যকারী ফরাসীগণকে পর্য্যাপ্ত পুরস্কার প্রদান করিলেন। তিনি ডুপ্লেকে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণস্থ মুঘল অধিকারভুক্ত অঞ্চলের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন এবং পণ্ডিচেরীর সন্নিকটস্থ উড়িষ্যার উপকূলস্থ জনপদ এবং মসলীপত্তম্ ফরাসীদিগকে প্রদান করিলেন। মুজাফ্ফর জঙ্গের অনুরোধে ফরাসী সেনাপতি বুসী একদল সৈন্যসহ হায়দ্রাবাদের দরবারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অল্পদিন পরে মুজাফ্ফর জঙ্গের মৃত্যু হইলে বুসী সলাবৎ জঙ্গ নামক নিজামের এক পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। ডুপ্লের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল। ফরাসীর সাহায্যে কর্ণাটের সিংহাসনে চাঁদা সাহেব ও হায়দ্রাবাদে সলাবৎ জঙ্গ আসীন হওয়াতে ফরাসীরা দাক্ষিণাত্যে গৌরবের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আসীন হইল।

এযাবৎকাল ইংরাজরা কতকটা কর্ম্মশৈথিল্য ও উদাসীনতা অবলম্বন করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু শীঘ্রই তাহারা উপলব্ধি করিল যে, ক্রমবর্দ্ধমান ফরাসী শক্তির বিরুদ্ধে কোন উপায় অবলম্বন না করিলে দাক্ষিণাত্যে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত বিপন্ন হইবে। এই সময়ে সণ্ডার্স নামক এক ব্যক্তি মাদ্রাজের গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি সমস্ত ঘটনার গুরুত্ব ও পরিণতি উপলব্ধি করিয়া ফরাসীদের বিরুদ্ধে ইংরেজের সর্বশক্তি নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ভারতবর্ষে এই ভাবে ইংরেজ ও ফরাসীর

মধ্যে দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। তখন পর্য্যন্ত মহম্মদ আলি ত্রিচিনপল্লীতে ফরাসী সৈন্যদলের দ্বারা অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। ইংরেজগণ ফরাসীর বিরুদ্ধে মহম্মদ আলির পক্ষ অবলম্বন করিয়া একদল ইংরাজ সৈন্য ত্রিচিনপল্লীতে প্রেরণ করিলেন। ডুপ্লে সেনাপতি লা-কে ইংরেজের বিপক্ষে প্রেরণ করিয়া বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

ইতিমধ্যে এক নূতন ঘটনায় যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। রবার্ট ক্লাইভ নামক একজন অসম সাহসী ইংরেজ সেনানী মাদ্রাজ কর্ত্তৃপক্ষকে বুঝাইলেন যে, চাঁদা সাহেব যখন ফরাসীদের সাহায্যে ত্রিচিনপল্লী অবরোধ করিয়া আছেন সেই অবস্থায় তাঁহার রাজধানী আর্কট আক্রমণ করিতে পারিলে অবরুদ্ধ মহম্মদ আলির সুবিধা হইবে। ক্লাইভ মাত্র পাঁচশত ভারতীয় এবং ইংরেজ সৈন্য লইয়া অতর্কিতে আর্কট অভিযান করিলেন। চাঁদা সাহেব আর্কট পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া নিহত হইলেন। ইংরেজের সাহায্যে মহম্মদ আলি আর্কটের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। কর্ণাটে ডুপ্লের নীতি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল।

রবার্ট ক্লাইভ

রবার্ট ক্লাইভ

এই ব্যর্থতার পরেও ডুপ্লে অধ্যবসায় সহকারে যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সের কর্ত্তৃপক্ষ ডুপ্লের এই অগ্রসর নীতির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিল না। তাহারা ডুপ্লের নীতি অপছন্দ করিল এবং গডেহু নামক এক ব্যক্তিকে ডুপ্লের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করিল। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে গডেহু ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া ডুপ্লের অনুসৃত নীতি পরিত্যাগ করিলেন এবং ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। ডুপ্লে ফ্রান্সে ফিরিয়া গেলেন; সেখানে তিনি ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

ডুপ্লে:—ডুপ্লে প্রথমে চন্দননগরের গভর্ণররূপে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং

পরিশেষে তিনি পণ্ডিচেরীর গভর্ণর নিযুক্ত হন। ডুপ্লে রণকুশল সেনাপতি, অসম-সাহসী ও দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। অবশ্য তাঁহার চরিত্রে অত্যধিক আত্মবিশ্বাস, ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা প্রভৃতি ত্রুটিও ছিল। তিনি আত্মশক্তি ও স্বয়ং অবলম্বিত নীতির সার্থকতায় অত্যধিক বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া ভারতীয় কার্য্যক্রম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সংবাদ স্বদেশের কর্তৃপক্ষকে জানাইতে অত্যধিক বিলম্ব করিতেন এবং পরাজয়ের সংবাদ গোপন করিয়া মাত্র বিজয়বার্তা প্রেরণ করিতেন। ফলে ফরাসী কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ ডাচ বা ইংরেজদের চিঠিপত্র বা বার্তালিপির মারফতে প্রকৃত সংবাদ জানিয়া ডুপ্লের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন। তবে ইহাও অনস্বীকার্য্য যে, তাঁহার স্বদেশপ্রীতি ছিল অসাধারণ। স্বজাতির প্রাধান্য বিস্তারের জন্য তাঁহার আগ্রহের অন্ত ছিল না। ত্রিচিনপল্লী অভিযানের সময়ে তিনি নিজের তহবিল হইতে সাড়ে তিন লক্ষ পাউণ্ডের অধিক ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

ব্যর্থতার কারণ

ডুপ্লের অবলম্বিত নীতি ব্যর্থ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমতঃ, তিনি তাঁহার নীতিকে সার্থক ও কার্যকরী করার জন্য ফ্রান্স হইতে সমর্থন ও পর্য্যাপ্ত সাহায্য পান নাই। দ্বিতীয়তঃ, তিনি নৌ-শক্তির গুরুত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত হন নাই। ভারতবর্ষে ইউরোপীয় প্রাধান্য স্থাপনের পরিকল্পনায় নৌ-শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব যে অপরিহার্য, তাহা তিনি উপলব্ধি করেন নাই। তৃতীয়তঃ, ফরাসী সেনানায়কদের সামরিক অপদার্থতা তাঁহার অসাফল্যের অন্যতম কারণ। ফরাসী সেনাপতি লা-র কর্তব্য সম্বন্ধে ইতস্ততঃ মনোভাব ও উদ্যম-শৈথিল্যের জন্যই ফরাসীদিগকে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছে। চতুর্থতঃ, ডুপ্লে ভারতীয় রাজগণের আভ্যন্তরীণ বিবাদে পক্ষাবলম্বন করিয়া ফরাসীদের যে সুবিধা অর্জনের নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন তাঁহার প্রতিপক্ষ ইংরেজও সেই নীতি গ্রহণ করিয়া অনুরূপ সুবিধার প্রত্যাশা করিতে পারে তাহা তিনি অনুধাবন করিতে পারেন নাই। ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলে ইংরেজের সাহায্য প্রাপ্তির পূর্বেই তিনি মহম্মদ আলির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়া লইতে পারিতেন।

ডুপ্লের কৃতিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে এই কথা বলা চলে যে, তিনি সমকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে বাস্তবিকই কল্পনা-কুশলতা ও অসীম সাহসিকতার সুস্পষ্ট আভাস ছিল। তিনি ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে ফ্রান্স পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম শক্তিতে পরিণত হইতে পারিত। তাঁহার কর্মকৃতির জন্য ফ্রান্স দীর্ঘকাল প্রাচ্যদেশে মর্য্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তিনি ভারতীয়

রাজন্যবর্গের নিকটে যে উচ্চ সম্মান ও যশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা পরবর্তী যুগের অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা অতিক্রান্ত হয় নাই। তাঁহার নীতি শেষ পর্য্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রবর্তিত নীতি অনুসরণ করিয়াই ইংরেজগণ ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল।

কৃতিত্ব

বঙ্গদেশে ইঙ্গ ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা: ইংরেজের সাফল্য:—বঙ্গদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ হইলেও মুঘল সম্রাটদের অবনতির যুগে ইহা কার্য্যতঃ স্বাধীন হইয়াছিল। ১৭০৩-৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ ঔরংজেব কর্তৃক বাংলাদেশের সুবাদার নিযুক্ত হন এবং ১৭২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় স্বাধীনভাবেই বঙ্গদেশ শাসন করেন। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দিন এবং সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। ঔরংজেবের মৃত্যু পর্য্যন্ত বাংলাদেশ মুঘলদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিয়াছিল। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ঔরংজেবের মৃত্যুর পর হইতে বাংলাদেশ কার্য্যতঃ স্বাধীন হইয়া যায়। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ফারুকসিয়ার ইংরেজ কোম্পানীকে বাংলাদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি দান করিলেও তৎকালীন বঙ্গদেশের সুবাদার মুর্শিদকুলী খাঁ ইহা অগ্রাহ্য করেন।

মুর্শিদকুলী খাঁ

সুজাউদ্দিন

সরফরাজ খাঁ

সরফরাজ খাঁ যখন বাংলার শাসনকর্তা, তখন বিহারের শাসনকর্তা আলিবর্দ্দী সরফরাজ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বঙ্গদেশের নবাবী অধিকার করেন। আলিবর্দ্দী খাঁ ইতিপূর্বেই মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহের নিকট হইতে নবাবী মঞ্জুর করাইয়া ফরমান আনাইয়াছিলেন। সুতরাং আইনতঃ তিনিই সম্রাট হইলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ সুদক্ষ শাসক ছিলেন, কিন্তু মারাঠাদের আক্রমণের ফলে তাঁহার রাজত্ব কালের অধিকাংশ সময় তাঁহাকে বিব্রত থাকিতে হয়। মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা ও উড়িষ্যা প্রদেশের এক অংশ ছাড়িয়া দিবার শর্তে মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু হয় আলীবর্দ্দী খাঁর জীবদ্দশাতেই ইংরেজদের সহিত বাংলার নবাবের অসদ্ভাব ঘটিলেও আলিবর্দ্দী খাঁ ইংরেজদের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখিয়া চলিয়াছিলেন।

সিরাজউদ্দৌলা (১৭৫৬—৫৭):—আলিবর্দ্দী খাঁর পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি

তাঁহার তিন কন্যাকে তিন ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগম ও ভ্রাতুষ্পুত্র জৈনুদ্দিন আহম্মদের পুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে বাংলার নবাবীপদ দান করিয়া যান। আলিবর্দী খাঁ তাঁহার অপর দুই জামাতাকে যথাক্রমে পূর্ণিয়া ও ঢাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া যান। ইহারা সিরাজের নবাব হওয়াকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখে নাই এবং ইহারা সিরাজউদ্দৌলার বিপক্ষাচরণে প্রবৃত্ত হইল। তিন জামাতার কেহই জীবিত ছিলেন না, পূর্ণিয়ার শাসনকর্তার পুত্র শওকৎজঙ্গ ও ঢাকার শাসনকর্তার বিধবা স্ত্রী ঘসেটি বেগম সিরাজের বিপক্ষতায় সাহায্যপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ইংরেজগণের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে লাগিল।

সিরাজউদ্দৌলা

ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ

ইংরেজগণ বাংলার মসনদে আলিবর্দী খাঁ অথবা সিরাজউদ্দৌলা কাহাকেও আন্তরিকতার সঙ্গে স্বীকার করিতে পারে নাই। আলিবর্দী খাঁ তাঁহার রাজ্যের মধ্যে ইউরোপীয় বণিকদিগকে দুর্গ নির্মাণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আলিবর্দীর জীবিতকালে তাঁহার আদেশ অমান্য হয় নাই। ইংরেজ ও ফরাসীরা যখন কর্ণাটে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত তখনও নবাবের আদেশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের শান্তি ভঙ্গ করিতে সাহসী হয় নাই। আলিবর্দীর মৃত্যুর পরে ফরাসীরা চন্দননগরে এবং ইংরেজেরা কলিকাতায় দুর্গ নির্মাণ করিতে লাগিল। সিরাজউদ্দৌলা উভয় পক্ষকেই দুর্গ নির্মাণ স্থগিত রাখিতে আদেশ দিলেন। ফরাসীরা আদেশ পালন করিল, কিন্তু ইংরেজরা ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া বরঞ্চ মিথ্যা অজুহাতের দ্বারা নবাবের বিরক্তি উৎপাদন করিল। এতদ্ব্যতীত ঢাকার শাসনকর্তার বিধবা স্ত্রী ঘসেটি বেগমের দেওয়ান রাজবল্লভ নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিয়া নবাবের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস প্রভৃতি ধনরত্নসহ ঢাকা হইতে পলাইয়া আসিয়া কলিকাতায় ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নবাবের অনুরোধ সত্ত্বেও ইংরেজগণ কৃষ্ণদাসকে নবাবের হস্তে সমর্পণ করিতে অস্বীকৃত হন। সিরাজ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের অন্যতমা ঘসেটি বেগমকে ঢাকা হইতে আনিয়া স্বীয় প্রাসাদে রাখেন। এইরূপে নবাবের বিরোধীদলের অন্যতম শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখা হয়। অতঃপর সিরাজ উদ্ধত ইংরেজকে শাস্তি প্রদান করার জন্য উপযুক্ত আয়োজন

করিলেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন সিরাজ স্বয়ং সসৈন্যে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। কলিকাতার ইংরেজ গভর্ণর ড্রেক নবাবের সৈন্যদলের আগমনে ভীত হইয়া অধিকাংশ ইংরেজের সহিত ফলতায় পলায়ন করেন। অবশিষ্ট ইংরেজরা কিছুকাল যুদ্ধ করিয়া নবাবের সৈন্যদলের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। কথিত আছে যে ফোর্ট উইলিয়মস্থিত ইংরেজগণের আত্মসমর্পণের পর ১৪৬ জন ইংরেজকে রাত্রিবেলা একটি ক্ষুদ্রপরিসর কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখার ফলে তাহাদের অধিকাংশই শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ঘটনা ইতিহাসে 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে পরিচিত। হলওয়েল নামক জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজ কর্মচারী এই কাহিনী প্রচারের নায়ক। এই তথাকথিত 'অন্ধকূপ-হত্যা' সম্বন্ধে নানা প্রকার বিচার ও আলোচনার পরে ইহাই বর্তমানে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, যদি আদৌ এই প্রকার কোন ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহার জন্য নবাবকে কোন প্রকারে দায়ী করা চলে না। উপরন্তু এই ঘটনায় যাহারা নিহত হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যাও হলওয়েল প্রদত্ত সংখ্যা হইতে অনেক কম।

কল্পিত 'অন্ধকূপ হত্যা'

কলিকাতা অধিকারের পরে সিরাজ সেনাপতি মাণিকচাঁদের উপর কলিকাতার ভার অর্পণ করিয়া রাজধানী মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যে কলিকাতা পতনের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিলে মাদ্রাজ কাউন্সিল ক্লাইভ ও ওয়াটসনকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া একদল সৈন্য ও কয়েকটি রণপোত কলিকাতা প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা অনায়াসে কলিকাতা অধিকার করিলেন, মাণিকচাঁদ নাম মাত্র বাধা প্রদান করিয়া মুর্শিদাবাদে পলায়ন করিলেন। নবাব কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করিলেন কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত হইবার পূর্বেই তিনি ইংরেজদের সহিত আলিনগরের সন্ধি করিলেন (৯, ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭)। এই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ইংরেজরা তাঁহাদের কেল্লা ও কোম্পানীর পূর্বে প্রচলিত অধিকার ফিরিয়া পাইলেন। উপরন্তু তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত হইল এবং কলিকাতায় দুর্গ নির্মাণের অধিকার প্রদত্ত হইল। ইংরেজরা সাময়িক শান্তি কামনা করিতেছিল, এই সন্ধিতে তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

ইত্যবসরে ইউরোপের সপ্তবর্ষ যুদ্ধের সংবাদ ভারতবর্ষে পৌঁছিতেই ইংরেজ ও ফরাসী পুনরায় যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইল। ইংরেজগণ আলিনগরের সন্ধির শর্ত অমান্য করিয়া ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর আক্রমণ করিয়া ইহা সহজেই অধিকার করিল। পলাতক ফরাসীরা মুর্শিদাবাদের দরবারে সমাদরে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে ইংরেজরা প্রমাদ গণিল। সিরাজ দাক্ষিণাত্যের

ইংরেজ-ফরাসী বিরোধ

ফরাসী সেনাপতি বুসীর সহিত ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। ইংরেজরা বুঝিতে পারিল নবাব যদি ফরাসীদের সাহায্য প্রাপ্ত হন তাহা হইলে তিনি পণ্ডিচেরী হইতে আগত ফরাসী সৈন্যের সাহায্যে বাংলা দেশ হইতে ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না।... এইরূপ পরিস্থিতিতে সিরাজ যতদিন নবাব থাকিবেন ততদিন বঙ্গদেশে ইংরেজের স্বার্থ নিরাপদ থাকিবে না। ইত্যবস্থায় ইংরেজদের মনোনীত কোন ব্যক্তিকে বাংলার মসনদে বসাইতে পারিলে বাঙ্গলাদেশে ইংরেজদেব স্বার্থ উত্তমরূপে রক্ষিত হইতে পারিবে।

ইংরেজ কর্তৃক চন্দননগর অধিকার

এদিকে সিরাজউদ্দৌলার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া বাঙ্গালার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিল। মুর্শিদাবাদের নবাবের দরবারে কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। আলিবর্দী খাঁর ভগ্নীপতি এবং সিরাজউদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি মীরজাফর সিরাজউদ্দৌলাকে গদিচ্যুত করিযা স্বয়ং বাংলার নবাব হওয়ার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে মীরজাফর ব্যতীত ছিলেন প্রসিদ্ধ বণিক জগৎ শেঠ, ইয়ার লতিফ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ (আমিনচাঁদ) প্রভৃতি। ক্লাইভ নবাবের বিরুদ্ধে ইহাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। ষড়যন্ত্রকারিগণ রীতিমত সন্ধিপত্র রচনা করিলেন। স্থির হইল ইংরেজগণ ষড়যন্ত্রকারীদিগকে সামরিক সাহায্য প্রদান করিয়া সিরাজের পরিবর্তে মীরজাফরকে সিংহাসনে স্থাপন করিবেন। এই সাহায্যের প্রত্যুপকারস্বরূপ মীরজাফর নবাব হওয়ার পরে ইংরেজদিগকে সিরাউদ্দৌলা প্রদত্ত সমস্ত সুবিধা মঞ্জুর করিবেন, বৃটিশের সঙ্গে আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক মৈত্রীতে আবদ্ধ হইবেন, ফরাসীদিগকে বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত করিবেন, কলিকাতা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দরুণ যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন এবং কলিকাতাস্থ ইউরোপীয়ানদিগকে পর্য্যাপ্ত অর্থপ্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিবেন।

সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

উদ্যোগ আয়োজন সমাপ্ত হইলে ক্লাইভ একদিন নবাবের বিরুদ্ধে সন্ধিভঙ্গের অভিযোগ আনয়ন করিয়া প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মুর্শিদাবাদ হইতে তেইশ মাইল দূরে, পলাশীর আম্রকাননস্থিত প্রান্তরে নবাবের বাহিনী ও ক্লাইভের মধ্যে যুদ্ধ হইল (২৩ জুন, ১৭৫৭)। পূর্বনির্দিষ্ট বন্দোবস্ত অনুযায়ী নবাব পক্ষের সেনাপতিদ্বয় মীরজাফর ও রায় দুর্লভ নবাব সৈন্যের অধিকাংশ সহ নিরপেক্ষ দর্শকের ন্যায় এক পার্শ্বে অবস্থান করিয়া রহিল। মাত্র মীরমদন ও মোহনলাল এবং একজন ফরাসী সেনানায়ক স্বল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে এক গোলার

আঘাতে মীরমদন নিহত হইলে সিরাজউদ্দৌলা অত্যন্ত ভীত হইয়া মীরজাফরকে যুদ্ধের ভার গ্রহণ করার জন্য কাতর অনুনয় করিলেন। মীরজাফর সিরাজের প্রতি মৌখিক আনুগত্য প্রকাশ করিয়া আপাততঃ সেইদিনের মত মোহনলালকে যুদ্ধ স্থগিত রাখার আদেশ দিলেন। তাঁহার এই আদেশের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল ;—যে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য মোহনলালের নেতৃত্বে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছিল, তাহাদের মনোবল ভাঙ্গিয়া গেল এবং তাহারা ছত্রভঙ্গ' করিয়া পলায়ন করিল। অতঃপর যুদ্ধের মীমাংসা হইয়া গেল, মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকায় ইংরেজরা জয়লাভ করিল। সিরাজ ফরাসী সেনাপতি 'মসিয়ে লা'র সাহায্য প্রাপ্তির আশায় পাটনার দিকে পলায়ন করিলেন। পলায়নের পথে ধৃত হইয়া সিরাজউদ্দৌলা বন্দী অবস্থার মুর্শিদাবাদে আনীত হইলেন এবং মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে নিহত হইলেন। ক্লাইভ মীরজাফরকে বাংলার নবাব বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ক্লাইভ পুরস্কার স্বরূপ নগদ ২,৩৪,০০০ পাউণ্ড এবং বাৎসরিক ত্রিশহাজার টাকা আয়ের একটি জমিদারি পাইলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা সকলেই পূর্ব প্রতিশ্রুত অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। কোম্পানীকে প্রচুর অর্থ ও চব্বিশ পরগণার জমিদারী দেওয়া হইল।

পলাশীর যুদ্ধ, ১৭৫৭

পলাশী যুদ্ধের তৎপর্য্য :—যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা বিচার করিলে পলাশী যুদ্ধকে সামান্য খণ্ড যুদ্ধের পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। ইংরেজ পক্ষে তেইশ জন নিহত ও উনপঞ্চাশজন আহত এবং নবাব পক্ষে পাঁচশত জন নিহত ও অর্দ্ধশতাধিক সৈন্য আহত হয়। কিন্তু ফলাফলের গুরুত্ব বিচারে পলাশীর যুদ্ধ পৃথিবীর চূড়ান্ত মীমাংসক যুদ্ধগুলির অন্যতম। ইংরেজের সামরিক শক্তির সাহায্যে মীরজাফর বাংলার নবাবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালেও স্বীয় ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য মীরজাফরকে ইংরেজ সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ফলে বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ইংরেজগণ অতঃপর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করার অধিকারী হইয়া আসিতে লাগিলেন। অধিকন্তু পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ের দ্বারা বঙ্গদেশের ধনসম্পদ হস্তগত করিয়া ইংরেজগণ দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভে সমর্থ হইয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয় না হইলে সম্ভবতঃ বন্দিবাসে ও পণ্ডিচেরীতে লালীর পরাজয় ঘটিত না। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পলাশী যুদ্ধের পরোক্ষ ফল।

বাংলার রাজনীতিতে কৃতিত্বের সূচনা

ফরাসী শক্তিকে ক্ষমতাহীন করার সুবিধা অর্জন

সিরাজউদ্দৌলার চরিত্র :—সিরাজের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী মত আছে। এক পক্ষ সিরাজকে চরিত্রহীন, উচ্ছৃঙ্খল ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক বলিয়া

বর্ণনা করিয়াছেন। অপর পক্ষ সিরাজউদ্দৌলাকে আদর্শ দেশপ্রেমিক বলিয়া বর্ণনা করেন এবং দেশাত্মবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন এই কথা বলেন। উভয় পক্ষের বক্তব্যই অংশিকভাবে সত্য। সিরাজ অতি অল্প বয়সেই বাংলার নবাবীপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিছুটা অল্প বয়সের স্বাভাবিক প্রবণতার জন্য এবং কিছুটা স্নেহান্ধ মাতামহ আলিবর্দ্দী খাঁর প্রশ্রয়প্রাপ্তির জন্য সিরাজের চরিত্রে উপরিউক্ত দোষ ত্রুটি দেখা দিয়াছিল ইহা অনস্বীকার্য্য। আর সিরাজুদ্দৌলা অল্পবয়স্ক হইলেও তিনি যে ইংরেজদের বা দরবারের ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই তাহা নহে। ইংরেজদিগকে দমন করিতে হইলে তাহাদের প্রতিপক্ষ ফরাসীদের সঙ্গে মৈত্রীযুক্ত হওয়া যে কূটনীতি-সম্মত ইহাও তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি ফরাসী সেনাপতি বুসীর সঙ্গে এ সম্বন্ধে পত্রালাপ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষের দিকে সিরাজউদ্দৌলা কয়েকটি ব্যাপারে একটুখানি বিচক্ষণতার অভাবের পরিচয় দিয়া আত্মক্ষতি ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সিরাজ তাঁহার কর্মচারীদের মধ্যে আনুগত্যহীনতার আভাস পাইয়াছিলেন এবং আহম্মদ শাহ দুররাণীর উত্তরাপথ আক্রমণের সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। এই দুইটি ঘটনা তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

দোষগুণের সমন্বয়

রাজত্বের শেষদিকে বুদ্ধিভ্রান্তি

সিরাজের বিরুদ্ধে মীরজাফর প্রভৃতির ষড়যন্ত্রকে অনেকে দেশদ্রোহিতার পর্যায়ে ফেলেন। কিন্তু ইহা স্মরণযোগ্য যে এই জাতীয় ষড়যন্ত্র ঐ যুগের সাধারণ রীতি ছিল এবং আলিবর্দ্দীও স্বয়ং ষড়যন্ত্রের সাহায্যেই নবাবী পদ লাভ করিয়াছিলেন। পলাশী যুদ্ধের পূর্বে বা পরে ষড়যন্ত্রকারিগণ এ কথা ভাবিতেও পারেন নাই যে তাহারা স্বদেশকে বিদেশীর হস্তে সমর্পণ করিতে যাইতেছেন। পক্ষান্তরে ইংরেজগণও তখন কল্পনা করিতে পারে নাই যে যে পলাশীর জয়লাভের ফলে বঙ্গদেশের প্রভুত্ব তাঁহাদের করতলগত হইতে যাইতেছে। পরবর্ত্তীকালে যে ক্রমশঃ ইংরাজের প্রভুত্ব বঙ্গদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা অংশতঃ মীরজাফরের চরিত্রের ত্রুটির জন্য, অংশতঃ তদানীন্তন ভারতীয় তথা বঙ্গদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য।

ষড়যন্ত্রকারীদের তৎকালীন উদ্দেশ্য

তৃতীয় কর্ণাট যুদ্ধ :—১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সপ্তবর্ষ-ব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে ভারতবর্ষেও ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ডুপ্লের স্থলে কাউন্ট লালি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার জন্য ভারতবর্ষে ফ্রান্স হইতে প্রেরিত হন। লালির আগমনের পূর্বেই ক্লাইভ ও ওয়াটসন চন্দননগর অধিকার

করিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর ইংরেজদের প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি হইল এবং বঙ্গদেশ হইতে এক নৌবহর দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। কাউণ্ট লালি প্রথমে ইংরেজদের অধীন সেণ্ট ডেভিড দুর্গ অধিকার করিয়া প্রথমে তাঞ্জোর ও পরে মাদ্রাজ অবরোধ করেন। কিন্তু উপযুক্ত সাহায্যের অভাবে উভয় অবরোধেই অকৃতকার্য্য হন। অগত্যা লালি নিজামের দরবারে অবস্থিত ফরাসী সেনাপতি বুসীকে সসৈন্যে চলিয়া আসিতে নির্দ্দেশ দিলেন। বুসী নিজামের রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া আসাতে ইংরেজদের সুবিধা হইল। বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত সৈন্যদল ফরাসী অধিকৃত উত্তর সরকার প্রদেশ, রাজমহেন্দ্রী ও মসলীপত্তম অধিকার করাতে দাক্ষিণাত্যে ফরাসীশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। এতদ্ব্যতীত ইংরেজগণ নিজামের সঙ্গে সুবিধাজনক শর্ত্তে সন্ধি করিলেন। ক্রমাগত পরাজয়ে ও ভাগ্যবিপর্যায়ে ফরাসী সৈন্যদল নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িল। কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধে পরাজয়ের পর বন্দিবাসে ইংরেজ সেনাপতি স্যার আয়ার কুটের সঙ্গে লালির যুদ্ধ হইল (১৭৬০)। এই যুদ্ধে ফরাসীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল এবং এই যুদ্ধের ফলাফলের দ্বারা ক্রমে ভারতে ফরাসীদের অদৃষ্ট চূড়ান্তভাবে নির্ণীত হইল। অতঃপর ইংরাজগণ পণ্ডিচেরী অবরোধ করিলে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তথাকার ফরাসীগণ আত্মসমর্পণ করিল। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয় এবং প্যারিসের সন্ধিতে উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হয়। প্যারিসের সন্ধির শর্ত্ত অনুসারে ভারতে ফরাসীদের অধিকৃত স্থানসমূহ তাঁহাদের হস্তে প্রত্যর্পিত হয়। কিন্তু ভবিষ্যতে এই সমস্ত স্থান মাত্র বাণিজ্যকেন্দ্ররূপেই থাকিবে এই প্রতিশ্রুতি ফরাসীদিগকে দিতে হয়। ফরাসীরা ইংরেজদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিয়া ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক প্রতিপত্তি লাভের প্রত্যাশা করিয়া আসিতেছিল তাহা চিরতরে বিলুপ্ত হইল।

বন্দিবাসের যুদ্ধ
ফরাসীদের পরাজয়

প্যারিসের সন্ধি

মীরজাফর (১৭৫৭—৬০)ঃ—পলাশীর যুদ্ধের পরে মীরজাফর তিন বৎসর বঙ্গদেশের নবাব হইয়া রহিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি সর্বপ্রকার স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ইংরাজদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে বাধ্য হইলেন। নবাবী লাভের প্রত্যাশায় তিনি যে পরিমাণ আর্থিক পুরস্কার ইংরাজ কোম্পানী ও অন্যান্য কর্মচারীকে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন প্রকৃত প্রস্তাবে রাজকোষে সেই পরিমাণ অর্থ ছিল না। ফলে প্রতিশ্রুত অর্থের জন্য তাহাকে অনবরত ইংরেজদের নিকট হইতে লাঞ্ছনা লাভ করিতে

হইতেছিল। মীরজাফর নিতান্ত অপদার্থ হইলেও নিজের হীন অবস্থা সম্বন্ধে একেবারে অচেতন ছিলেন না। অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া মীরজাফর ওলন্দাজদের সাহায্যে ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করার জন্য ওলন্দাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিলেন। ওলন্দাজগণ জাভা হইতে সামরিক সাহায্য আনয়নের জন্য উদ্যোগী হইল। ক্লাইভ পূর্বাহ্নে এই সংবাদ অবগত হইয়া বিদেরার যুদ্ধে (১৭৫৯) ওলন্দাজদিগকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিলেন।

ওলন্দাজদের সহিত মীরজাফরের ষড়যন্ত্র

মীরজাফর

বিদারের যুদ্ধে ওলন্দাজদের পরাজয়

এইরূপে বঙ্গদেশে ইংরেজদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলেন। ক্লাইভের পরে ভ্যান্‌সিটার্ট কলিকাতার গভর্ণর হইলেন। মীরজাফর ইংজেদের দাবি অনুযায়ী অর্থ মিটাইয়া দিতে অক্ষম হইলে ভ্যান্‌সিটার্ট তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন এবং মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিমের নিকট বাংলার নবাবী বিক্রয় করিলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মীরজাফর সিংহাসনচ্যুত হইলেন এবং মীরকাশিম তৎস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নবাবী প্রাপ্তির বিনিময়ে মীরকাশিম কোম্পানীকে বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরের জমিদারি অর্পণ করিলেন। এতদ্ব্যতীত গভর্ণর ও তাঁহার পারিষদবর্গকে এককালীন দুই লক্ষ পাউণ্ড দেওয়া হইল।

মীরকাশিম (১৭৬০—৬৪)ঃ—মীরকাশিম তাঁহার অপদার্থ শ্বশুর অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি ইংরেজদের সহিত ষড়যন্ত্রের বিনিময়ে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি স্বাধীনচেতা ও প্রজাহিতৈষী শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং সুযোগ পাইলে তিনি সুশাসকরূপে খ্যাতি রাখিয়া যাইতে পারিতেন। তিনি ইংরেজদের কথামত চলিতে প্রস্তুত ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার সহিত ইংরেজদের সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। মুর্শিদাবাদে ইংরেজের প্রভাব প্রবল দেখিয়া তিনি কলিকাতা হইতে বহু দূরে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। সেখানে তিনি সৈন্য ও শাসন বিভাগের নানাবিধ সংস্কার সাধন করিয়া আগামী সঙ্ঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সামরিক সংস্কারের ব্যাপারে মীরকাশিম সমরু ও মার্কার নামে

দুইজন ইউরোপীয় ও গুরগণ খাঁ নামক জনৈক আর্মেনিয়ানের সাহায্য গ্রহণ করেন।

বাণিজ্যশুল্ক লইয়া ইংরেজের সহিত মীরকাশিমের বিরোধ উপস্থিত হইল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাদশাহী ফরমানের বলে বঙ্গদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারিগণকে ব্যক্তিগত বাণিজ্যের জন্য এই অধিকার দেওয়া হয় নাই। কোম্পানীর বিশেষ অধিকারের অপব্যবহার করিয়া ইংরেজ মাত্রই বিনা শুল্কে ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে একদিকে যেমন নবাবের অর্থক্ষতি হইতে লাগিল অপরপক্ষে দেশীয় বণিকদের বিশেষ দুর্দশার সৃষ্টি হইল। বিনা শুল্কে ব্যবসা করার সুবিধা পাইয়া কোম্পানীর কর্মচারীবর্গ স্বল্পমূল্যে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে লাগিল। আর দেশীয় বণিকগণ শুল্ক দিয়া মূল্যের প্রতিযোগিতায় ইহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। মীরকাশিম প্রথমে কোম্পানীর সহযোগিতায় এই অবৈধ বাণিজ্য বন্ধ করার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীবর্গ কিছুতেই বাণিজ্য শুল্ক দিতে সম্মত হইল না। অবশেষে মীরকাশিম বাধ্য হইয়া দেশীয় প্রজার স্বার্থের জন্য বাণিজ্য শুল্ক একেবারে তুলিয়া দিলেন। ইহাতে দেশীয় বণিকগণ অবৈধ বাণিজ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে মুক্তি পাইল বটে, কিন্তু মীরকাশিম ইংরেজ বণিকদের বিরাগভাজন হইলেন।

মীরকাশিমের সহিত বিরোধ

মীরকাশিম

পাটনার কুঠির অধ্যক্ষ এলিসের উদ্ধত আচরণ

পাটনার কোম্পানীর কুঠির অধ্যক্ষ এলিস সাহেব ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া পাটনা শহর অধিকার করিলেন। এলিসের এই উদ্ধত আচরণে মীরকাশিম ইংরেজদের সঙ্গে প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর দেখিলেন না। মীরকাশিম পাটনা পুনর্দখল করিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ মীরকাশিম ক্রমান্বয়ে কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, ঘেরিয়া, সুতি, উদয়নালা এবং মুঙ্গেরের

যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট পরাজিত হইলেন এবং অযোধ্যায় পলায়ন করিয়া অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে যুক্তভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমও ইহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। বক্সারের যুদ্ধে ইহাঁদের সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজ সেনাপতি মেজর মন্‌রোর নিকট পরাজিত হইল (১৭৬৪ খৃঃ)। মীরকাশিম পরাজয়ের পরে পলায়ন করিলেন এবং তেরো বৎসর পলাতক জীবন যাপনের পর ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর উপকণ্ঠস্থিত কোন স্থানে প্রাণত্যাগ করেন। অযোধ্যার নবাব ও সম্রাট উভয়েই অতঃপর ইংরেজদের কৃপাপ্রার্থী হইযা থাকিতে বাধ্য হইলেন।

যুদ্ধ: কয়েকটি যুদ্ধে মীরকাশিমের পরাজয়

বক্সারের যুদ্ধ ১৭৬৪

বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব:—বক্সারের যুদ্ধের ফলাফলের তাৎপর্য পলাশী যুদ্ধ অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভের পশ্চাতে সামরিক কৃতিত্ব অপেক্ষা ষড়যন্ত্রই অধিক কার্যকরী হইয়াছিল। কিন্তু মীরকাশিমকে রীতিমত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত করিতে হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে সিরাজউদ্দৌলার সময়ের মত কোন ষড়যন্ত্র বা বিশ্বাসঘাতকতা ইংরেজ পক্ষকে সাহায্য করে নাই। মীরকাশিম ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য জানিয়াই পূর্বাহ্ণে রাজধানী স্থানান্তরিতকরণ, দুর্গনির্মাণ বা সৈন্য-বাহিনীকে সুশিক্ষিত করার কাজে হাত দিয়াছিলেন। কূটনীতির ক্ষেত্রেও তিনি পশ্চাৎপদ ছিলেন না। অযোধ্যার নবাব বা সম্রাটের সাহায্য প্রাপ্তি হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। সমস্ত ব্যবস্থা মীরকাশিমের অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও তাঁহার পরাজয় ইংরেজদের সামরিক বলের শ্রেষ্ঠত্বেরই সূচনা করে। কোন আকস্মিকতার বলে ইংরেজরা বঙ্গদেশের ভাগ্যনিয়ন্তা হয় নাই।

পরবর্তী বাংলার নবাবগণ:—মীরকাশিমের সহিত সঙ্ঘর্ষের সূত্রপাতেই ইংরেজগণ পুনরায় মীরজাফরকে বাংলার নবাবীপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহার বিনিময়ে ইংরেজগণের যুদ্ধে যে সকল ক্ষতি হইয়াছিল এবং ইংরেজরা বাণিজ্য সম্পর্কে যে সকল সুবিধা দাবি করিয়াছিল, তাহার সমস্তই তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মীরজাফরের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র নজমুদ্দৌলা ইংরেজের অনুমোদনক্রমে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লাভ করেন। ইংরেজগণ তাঁহার নিকট হইতে পুরস্কার-স্বরূপ ১,৩৬,৩৫৭ পাউণ্ড আদায় করেন। ইংরেজদের সহিত সন্ধি অনুসারে নবাব আত্মরক্ষার জন্য কোম্পানীর সৈন্যদলের উপর নির্ভর করিতে স্বীকৃত হন। শাসনকার্যের ভার 'নায়েব সুবা' উপাধিধারী এক কর্মচারীর হস্তে ন্যস্ত

মিরজাফর

নজমুদ্দৌলা

হয়। ইংরেজের অনুমোদনক্রমে মহম্মদ রেজা খাঁ এই পদে নিযুক্ত হন এবং নবাব প্রতিশ্রুতি দেন যে ইংরেজের বিনা অনুমতিতে তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করিবেন না। এই সমস্ত বন্দোবস্তের ফলে সামরিক এবং শাসন সম্বন্ধীয় সমুদয় ক্ষমতা প্রকৃত পক্ষে কোম্পানীর হস্তগত হয়। অতঃপর বাংলার নবাবী নামমাত্রেই পর্যবসিত হইল।

কোম্পানীর দেওয়ানী লাভঃ—ক্লাইভ পুনরায় ভারতবর্ষে আগমন করিয়া কোম্পানীর স্বার্থসিদ্ধির কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি প্রথমে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে সন্ধি করিলেন। সুজাউদ্দৌলা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং এলাহাবাদ ও কোরা কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর ক্লাইভ দিল্লীর মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সহিত সন্ধি করিলেন। সম্রাটের কোন ক্ষমতা না থাকিলেও সম্মান ছিল, তিনি ন্যায়সঙ্গতভাবে ভারতের অধীশ্বর ছিলেন।

শাহ আলমের দরবারে ক্লাইভ—কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ

তাঁহার অনুমোদন ব্যতীত কাহারও পক্ষে ভারতের কোন অংশে শাসনদণ্ড পরিচালনার অধিকার নাই। এই ধারণা অনুযায়ী বাঙ্গলার কোম্পানীর অধিকার আইনসঙ্গত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এই ত্রুটি দূর করার জন্য ক্লাইভ সম্রাট শাহ আলমের নিকট হইতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের যাবতীয় অধিকার লাভ করিলেন। এই অধিকার প্রাপ্তির বিনিময়ে ক্লাইভ সম্রাটকে কারা ও এলাহাবাদ এই দুইটি স্থান দিলেন এবং বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা কর প্রদানের

প্রতিশ্রুতি দিলেন। এতদ্ব্যতীত ক্লাইভ বাংলার নিজামৎ বা শাসনবিভাগ পরিচালনার জন্য বাংলার নবাবকে বাৎসরিক ৫০ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। বাংলার নবাব বাংলাদেশের রাজস্বের উপর আর কোন অধিকার দাবি করিতে পারিবেন না ব'লিয়া স্বীকার করিলেন। এই ব্যবস্থার ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা দেশের উপর আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব স্থাপন করার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

এই ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশে দ্বৈত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। কোম্পানী দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহ ও দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন এবং রাজস্ব ব্যয় করার অধিকারও কোম্পানীর হাতে রহিল। কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীবৃন্দ এই কার্যভার স্বহস্তে গ্রহণ না করিয়া মহম্মদ রেজা খাঁ-কে বাংলার এবং সিতাব রায়কে বিহারের রাজস্ব আদায় ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিচার ব্যবস্থার সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। নবাবের শাসন-ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল। তিনি কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হইয়া রহিলেন। তাঁহার প্রতিনিধিরূপে নিজামৎ বা শাসন ক্ষমতাও রেজা খাঁ ও সিতাব রায় পরিচালনা করিতে লাগিলেন। নবাব ইহাদের কার্যের তত্ত্বাবধান করিতে অক্ষম, কোম্পানী ইহাদের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক, সুতরাং ইহারা দায়িত্বহীনভাবে দেশের লোকজনের সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন থাকিয়া নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করিতে লাগিলেন। এই দ্বৈতব্যবস্থার ফলে দেশের কল্যাণের প্রতি কাহারও দায়িত্ব রহিল না। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের মন্বন্তর 'এই দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার ফলেই ঘটিয়াছিল।

বাংলাদেশে দ্বৈত শাসন

ক্লাইভের বিভিন্ন সংস্কার ও কৃতিত্ব:—ক্লাইভ কেবল মাত্র বঙ্গদেশে ইংরেজের আধিপত্য বিস্তারে সাহায্য করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি কোম্পানীর বহুবিধ সংস্কারকার্যে মনোনিবেশ করিলেন। [তিনি কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন এবং উৎকোচ গ্রহণের রীতি রহিত করিলেন। এতদ্ব্যতীত কোম্পানীর সৈন্যগণ পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে যুদ্ধ কালের জন্য নির্দিষ্ট অতিরিক্ত ভাতা যে শান্তির সময়ে ভোগ করিয়া আসিতেছিল তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। ক্লাইভ নির্দেশ দিলেন যে যুদ্ধের সময় ব্যতীত আর অতিরিক্ত ভাতা দেওয়া হইবে না।

ক্লাইভকে ভারতবর্ষে বৃটিশ আধিপত্যের প্রকৃত সংস্থাপয়িতা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ক্লাইভ সৈন্য পরিচালনায় দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাকে অসামান্য প্রতিভাশালী সমরনায়করূপে গণ্য করা যাইতে পারে না। ক্লাইভের প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তিনি

কৃতিত্ব

সঙ্কটকালে অসামান্য সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার উদ্যম, সাহস ও বাহুবলেই কর্ণাটে এবং বঙ্গদেশে বৃটিশের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। আর্কট অধিকার, পলাশীর যুদ্ধ, উত্তর সরকার অধিকার, সম্রাটের নিকট হইতে দেওয়ানী লাভ প্রভৃতি ভারতে বৃটিশ স্বার্থের দিক হইতে বিবেচনা করিতে গেলে ক্লাইভের অক্ষয় কীর্ত্তি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

গুণাবলী

ক্লাইভ উদ্যমী উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি হইলেও তাঁহার চরিত্রের প্রধান ত্রুটি ছিল স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি শঠতা বা নীচতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। পলাশীর যুদ্ধের পর তিনি অবৈধ উপায়ে বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কোম্পানীর স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তিনি ওয়াটসনের সহি জাল করিয়া উমিচাঁদকে প্রতারিত করিয়াছিলেন। তিনি যে যুগে এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন জনসাধারণের নৈতিক মানদণ্ড তত উন্নত ছিল না, তথাপি তাঁহার উৎকোচ গ্রহণ বা জালিয়াতি সমর্থন করা চলে না। তাঁহার প্রবর্তিত দ্বৈত শাসননীতি বঙ্গদেশকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল এবং ইহাই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ হইয়াছিল। বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি যে একজন অসামান্য কৃতী ব্যক্তি তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ক্লাইভের দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটির কথা এখন প্রায় বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। তিনি যে ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই সকলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

দোষ ত্রুটি

ক্লাইভের মৃত্যু :—১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতবর্ষে অবস্থানের সময় বহুবিধ অপকার্য্যের জন্য তিনি বৃটিশ পার্লামেণ্টে অভিযুক্ত হইলেন। অবশ্য বিচারে তিনি নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইলেও জন সাধারণের বিরূপ সমালোচনায় তাঁহার জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিল। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আত্মহত্যা করেন।

প্রশ্নোত্তর

1. What do you know about the activities of the Portuguese in India.

পর্টুগীজগণের ভারতবর্ষের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

উত্তর-সূত্র : (ইউরোপীয় জাতিগণ : পর্টুগীজগণ দ্রষ্টব্য)

2. Give a brief account of the struggle between the English and the French for supremacy in India. Account for the failure of the French.

ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজ ও ফরাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্ণনা কর। ফরাসীদের ব্যর্থতার কারণ কি ?

উত্তর-সূত্র : (১) ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব : (ক) দাক্ষিণাত্যে : ফরাসী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ডুপ্লে কর্তৃক অবলম্বিত নীতি : প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কর্ণাট যুদ্ধ : ইংরেজগণ কর্তৃক প্রতিদ্বন্দ্বিতা : ক্লাইভের অভ্যুদয় এবং তাঁহার বীরত্বের ফলে দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধের দ্বিতীয় ভাগ হইতে দাক্ষিণাত্যে ফরাসী শক্তির আধিপত্য হ্রাস : ডুপ্লের বিদায় গ্রহণ ও তৃতীয় কর্ণাট যুদ্ধে (বন্দিবাসের যুদ্ধ, ১৭৬০) ফরাসীদের পরাজয় ও দাক্ষিণাত্যে বৃটিশ শক্তির একাধিপত্য।

(খ) বঙ্গদেশ : পলাশীর যুদ্ধ, ১৭৫৭ : বঙ্গদেশে ইংরাজদের আধিপত্য।

(২) ফরাসীদের ব্যর্থতার কারণ : (ক) ভারতবর্ষে ফরাসী-আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ফরাসী-গভর্ণমেণ্টের উদাসীনতা। ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গভর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে থাকায় কোম্পানী স্বাধীনভাবে কোন কর্মপন্থা অনুসরণ করিতে পারে নাই ; যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও সামরিক সাহায্য পায় নাই। পক্ষান্তরে ইংরেজ কোম্পানী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান হওয়ায় কোম্পানীর কর্মচারীবৃন্দ অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারিয়াছিল এবং স্বদেশ হইতে পর্য্যাপ্ত সাহায্য ও অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়াছিল। (খ) দ্বিতীয়তঃ নৌ-বলে ফরাসীরা ইংরাজ অপেক্ষা হীনতর থাকায় বহুক্ষেত্রে ফরাসীদের অসুবিধা হইয়াছে। (গ) তৃতীয়তঃ, পলাশী যুদ্ধে জয়লাভের পর হইতে ইংরেজগণ বঙ্গদেশ হইতে পর্য্যাপ্ত সামরিক ও আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল ("The battle of Plassey may be truly said to have decided the fate of the French in India") (ঘ) পরিশেষে ডুপ্লের পরবর্ত্তী ফরাসী শাসনকর্ত্তা লালি-র চরিত্র ও আচরণ কিয়ৎ পরিমাণে ফরাসীদের ব্যর্থতার জন্য দায়ী। তাঁহার চরিত্রে নেতৃত্বসুলভ বিচক্ষণতা ও রাজনীতিকের উপযুক্ত বিজ্ঞতার অভাব ছিল।

3. Give a connected history of Bengal from the battle of Plassey to Baksar.

পলাশী যুদ্ধ হইতে বক্সারের যুদ্ধ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখ।

উত্তর-সূত্র : (১) মীরজাফর (১৭৫৭-৬০): পলাশী যুদ্ধের পরে তিন বৎসর মীরজাফর বঙ্গদেশের নবাব রহিলেন কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ইংরাজদের হস্তে রহিল। এই হীন অবস্থা হইতে উদ্ধারের জন্য তিনি ওলন্দাজদের সাহায্যে ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্র করিলেন। এই ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইলে ওলন্দাজগণ বিদেরার যুদ্ধে ইংরাজদের হস্তে পরাজিত হইল। মীরজাফর ইংরাজদের অর্থপ্রাপ্তির ক্রমাগত দাবি মিটাইতে অক্ষম হওয়ায় ইংরেজরা তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার জামাতা মীরকাশিমকে বাংলার মসনদে বসাইল।

(২) মীরকাশিম (১৭৬০-৬৪): মীরকাশিম নবাবী প্রাপ্তির বিনিময়ে ইংরেজগণকে তিনটী জেলার জমিদারী ও নগদ দুই লক্ষ পাউণ্ড অর্পণ করিলেন। তিনি স্বাধীনচেতা ও প্রজাহিতৈষী নবাব ছিলেন। তিনি ইংরাজদের সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য্য উপলব্ধি করিয়া মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন এবং সামরিক দিক দিয়া প্রস্তুত হইলেন। অচিরেই বাণিজ্য-শুল্ক লইয়া মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের বিবাদ আরম্ভ হইল। মীরকাশিম বাণিজ্য শুল্ক সম্পূর্ণ রহিত করিলে ইংরেজগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং পাটনায় কোম্পানীর কুঠির অধ্যক্ষ এলিস সাহেব পাটনা অধিকার করিলেন। ইংরেজদের সঙ্গে মীর কাশিমের প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মীরকাশিম কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অযোধ্যায় পলায়ন করিলেন এবং দিল্লীর সম্রাট ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সহযোগিতায় বক্সারে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন (১৭৬৪ খৃঃ)। বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিম পরাজিত হইলে ইংরেজগণ প্রকৃত পক্ষে বঙ্গদেশের মালিক হইতে সক্ষম হইল।

4. Sketch the career of Robert Clive and make an estimate of his achievements.

রবার্ট ক্লাইভের জীবনী লিখ ও তাঁহার কার্য্যাবলীর কৃতিত্ব বিচার কর।

উত্তর-সূত্র : (১) জীবনী : ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরূপে ভারতবর্ষে আগমন —দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধে আর্কট অভিযানের দ্বারা কৃতিত্বের পরিচয় দান—এই সার্থক অবরোধের ফলে কর্ণাটে ফরাসী-নীতি ব্যর্থ হয়। অতঃপর ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারী ক্লাইভ ওয়াটসনের সহযোগিতায় বঙ্গদেশের নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি মাণিকচাঁদের হস্ত হইতে কলিকাতা পুনরুদ্ধার করেন। অতঃপর ক্লাইভ বঙ্গদেশ হইতে ফরাসী প্রতিপত্তি লুপ্ত করার উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশের সিংহাসনে সিরাজউদ্দৌলা-র স্থলে নিজেদের মনোনীত কোন ব্যক্তিকে বসাইবার জন্য সিরাজ-বিরোধী দরবার ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন। পলাশীর-যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইংরাজদের কামনা পূর্ণ হয়

এবং সিরাজের স্থলে ইংরেজদের মনোনীত মীরজাফর বাংলার নবাব হন। মীরজাফর ইংরেজদের বিরুদ্ধে ডাচদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলে ক্লাইভ ডাচদিগকে বিদেরা-র যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশে ইংরাজ প্রভুত্ব সুদৃঢ় করেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ স্বদেশে গমন করিয়া ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর তিনি অযোধ্যার নবাব ও দিল্লীর সম্রাটের সঙ্গে সন্ধি করেন। অযোধ্যার নবাব পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ও এলাহাবাদ ও কোরা ইংরেজদের হস্তে অর্পণ করেন। দিল্লীর সম্রাট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বঙ্গদেশের দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের অধিকার অর্পণ করেন। এই ব্যবস্থার ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গদেশের উপর আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব স্থাপন করার অধিকার প্রাপ্ত হইল। এতদ্ব্যতীত ক্লাইভ কোম্পানীর উন্নতিমূলক বহু সংস্কার সাধন করেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তথায় ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত বহু অপকার্য্যের জন্য তিনি সমালোচিত হন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আত্মহত্যা করেন।

(২) কার্য্যাবলীর কৃতিত্ব: (ক্লাইভের সংস্কার ও কৃতিত্ব দ্রষ্টব্য)

5. Describe the aims and policy of Dupleix and account for his failure.

ডুপ্লের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি ছিল? তাহার ব্যর্থতার কারণ কি?

উত্তর-সূত্র: ['ইঙ্গ ফরাসী দ্বন্দ্ব' ও 'ডুপ্লে' দ্রষ্টব্য]

6. Sketch the quarrel between Mirkashem and the English.

মীরকাশিম ও ইংরাজদের মধ্যে বিরোধ বর্ণনা কর।

উত্তর-সূত্র: ('মীরকাশিম' দ্রষ্টব্য।)

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ভারতে বৃটিশ শক্তির বিস্তার ঃ ওয়ারেন হেষ্টিংস ঃ মহীশূর ও মারাঠাদের সহিত সংঘর্ষ

Syllabus—Inexorable pressure towards expansion for markets and for strategic reasons. Background—the second round of Anglo-French rivalry in the Treaty of Versailles (1783 A. D.) Warren Hastings, the empire builder. The two remaining rivals of the English—Mysore and the Mahrattas. Struggle with Haidar Ali and Tipu Sultan up to Mangalore (1784). Struggle with the Mahrattas in the north up to Bassein (1782). Administrative and revenue organisation of Warren Hastings. Estimate.

পাঠ্যসূচী ঃ বাণিজ্যের জন্য বাজার ও সামরিক প্রয়োজনে আধিপত্য বিস্তারের জন্য দুর্নিবার চাপ। পটভূমিকা—ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে দ্বিতীয় কিস্তি সঙ্ঘর্ষ এবং ভার্সাইর সন্ধি (১৭৮৩ খৃঃ) তে তাহার সমাপ্তি। সাম্রাজ্য স্রষ্টা ওয়ারেন হেষ্টিংস। ইংরেজদের অবশিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বয়—মহীশূর ও মারাঠাগণ। ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি (১৭৮৪) পর্য্যন্ত হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের সঙ্গে সংগ্রাম। উত্তরাঞ্চলে বেসিনের সন্ধি (১৭৮২) পর্য্যন্ত মারাঠাদের সহিত সংগ্রাম। ওয়ারেন হেষ্টিংসের রাজস্ব ও শাসনবিষয়ক ব্যবস্থা। ওয়ারেন হেষ্টিংসের কৃতিত্ব বিচার।

উপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক ব্যাপারে ইংলণ্ডের সাফল্য ঃ—খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্স সর্ব্বাধিক পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ফ্রান্সের কুশলী রাষ্ট্রনীতিক রিচলু ও ম্যাজারিনের চেষ্টায় ফ্রান্স মাত্র ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রেই যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা নহে, উপনিবেশ তথা বাণিজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রেও ফ্রান্সের সর্বাধিক বিস্তার ঘটিয়াছিল। চতুর্দশ লুইর রাজত্বকালে এই বিষয়ে ফ্রান্স ইউরোপে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের প্রতিযোগিতায় ফ্রান্সকে সর্বত্রই হতমান হইতে হইল। 'সপ্ত বর্ষব্যাপী' যুদ্ধে (১৭৫৬-৬৩) পরাজয়ের ফলে ফ্রান্স মাত্র ইউরোপেই তাঁহার প্রতিপত্তি হারাইল তাহা

গ্রহে ভারতবর্ষ, আমেরিকা সর্বত্র ফ্রান্স ক্ষমতাচ্যুত হইল এবং ইংলণ্ড ফ্রান্সের প্রতিপত্তি ও প্রভাবের অধিকারী হইল। ইংরেজরা আমেরিকায় কানাডা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি দ্বীপ, পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলবর্তী কয়েকটি ফরাসী অধিকৃত স্থান এবং স্পেনের নিকট হইতে হাভানা ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিলেন।

ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব ও নিজস্ব বাজারের প্রয়োজনীয়তা

এইভাবে ফ্রান্সের উপনিবেশিক অধিকার হস্তচ্যুত হইল এবং তৎস্থলে বৃটিশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের শিল্পজগতে বিপ্লব ঘটায়, ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতি হয় এবং ইংলণ্ডের বস্ত্রকলে প্রস্তুত সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি ইউরোপের বাজার ছাইয়া ফেলে। ইউরোপের অন্যান্য দেশও শিল্প বিপ্লবের সাহায্যে বস্ত্রশিল্পের উন্নতি করিতে থাকে এবং অচিরেই ইউরোপের শিল্পপ্রধান দেশসমূহের পক্ষে কলে প্রস্তুত বস্ত্রাদি বিক্রয় করার জন্য ইউরোপের বাহিরে নিজস্ব বাজারের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইংলণ্ড, স্পেন, পর্টুগাল, হল্যাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ নিজস্ব উপনিবেশে স্বদেশের প্রস্তুত পণ্যদ্রব্য বিশেষতঃ বস্ত্র বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। ইংলণ্ডও অপরাপর উপনিবেশ ব্যতীত ভারতকে নিজস্ব বস্ত্র বিক্রয়ের কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল।

সপ্তবর্ষ যুদ্ধের পর ইংলণ্ড খুব শক্তিশালী হইয়া উঠিলেও, অচিরেই ইংলণ্ডকে উপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক ব্যাপারে এক বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হইল। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার বৃটিশ উপনিবেশগুলি মাতৃভূমির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা অর্জন করিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ভার্সাইয়ের সন্ধির ফলে ইংলণ্ড তাহার আমেরিকাস্থ উপনিবেশসমূহের এক সুবৃহৎ অঞ্চল হারাইল। এইভাবে আমেরিকার উপনিবেশের অধিকাংশ হস্তচ্যুত হওয়ায় বাণিজ্যিক ব্যাপারে ইংলণ্ডকে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইল। অগত্যা ইংলণ্ড ভারতের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দিকে অধিকতর সচেষ্ট হইল। ক্লাইভ ভারতবর্ষে যে সাম্রাজ্যের সূচনা করিয়াছিলেন তাহাকে সুদৃঢ়তর ও বিস্তৃততর করার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

ওয়ারেন হেষ্টিংস (১৭৭২-৮৫):—লর্ড ক্লাইভের আমলে প্রবর্তিত দ্বৈত শাসনের ফলে-বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। ইহার ফলে বাংলায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে শোচনীয় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হয়। এই মন্বন্তর হওয়ায় বাংলাদেশে ইংরেজ শাসনের অকর্মণ্যতা পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হয়। বাংলার এই শোচনীয় পরিস্থিতির মধ্যে ওয়ারেন হেষ্টিংস বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসিলেন।

ওয়ারেন হেষ্টিংস আঠারো বৎসর বয়সে কোম্পানীর কর্মচারীরূপে ভারতে আসিয়াছিলেন। পরে তিনি কোম্পানীর কলিকাতা ও মাদ্রাজ কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত হইলেন।

রাজস্ব সংস্কার—ওয়ারেন হেষ্টিংস সর্বপ্রথম দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা রহিত করিয়া রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কোম্পানীর হস্তে ন্যস্ত করিলেন। রেজা খাঁ ও সিতাব রায়কে পদচ্যুত করিয়া তিনি রাজস্ব আদায়ের জন্য 'কালেক্টর' নামে ইংরেজ সংগ্রাহক নিযুক্ত করিলেন। রাজস্ব সংগ্রহের জন্য একটি 'ভ্রাম্যমান কমিটি' নিযুক্ত হইল। এক কমিটি সমগ্র অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া পাঁচ বৎসরের জন্য জমিদারদের সহিত নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদানের শর্তে জমির বন্দোবস্ত করিলেন। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাকে ছয় অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশে একটি প্রাদেশিক কাউন্সিল ও দেশীয় দেওয়ান নিযুক্ত হইল এবং রাজস্ব সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করার জন্য কলিকাতায় একটি রেভিনিউ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইল। বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইল। জমিদারদের রাজস্ব সম্বন্ধীয় বিচারের ক্ষমতা লুপ্ত করিয়া কালেক্টরদের হস্তে সেই ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইল। দেওয়ানী মামলার বিচারের ভার ইংরেজ কালেক্টরের হস্তে এবং ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার দেশীয় বিচারকগণের হস্তে অর্পিত হইল। দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার আপীলের জন্য কলিকাতায় যথাক্রমে সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল।

রাজস্ব, বিচার ও শাসন-সম্বন্ধীয় সংস্কার

রেগুলেটিং এ্যাক্ট:—ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত করার জন্য ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেন্ট 'রেগুলেটিং এ্যাক্ট' বা নিয়ামক বিধি নামে এক আইন পাশ করিলেন। এই আইনের বিধি অনুযায়ী বাংলার গভর্ণর গভর্ণর জেনারেল নামে অভিহিত হইলেন। গভর্ণর জেনারেল ও অপর চারিজন সদস্য লইয়া একটি কাউন্সিল বা মন্ত্রণা-পরিষদ গঠিত হইল। গভর্ণর জেনারেলই এই পরিষদের সভাপতি হইলেন। গভর্ণর জেনারেল কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্যের মত লইয়া কার্য করিতে বাধ্য রহিলেন। সমান সংখ্যক ভোট হইলে গভর্ণর জেনারেলের নির্দেশ অনুযায়ী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। সপারিষদ গভর্ণর জেনারেলের উপর ফোর্ট-উইলিয়ম প্রেসিডেন্সীর সামরিক ও বেসামরিক শাসনভার ন্যস্ত হইল। যুদ্ধ ও সন্ধির ব্যাপারে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীগুলির উপরও গভর্ণর জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিলের অধিকার রহিল। এই সঙ্গে একজন প্রধান ও তিনজন সাধারণ বিচারপতি

লইয়া কলিকাতায় একটি 'সুপ্রীম কোর্ট' বা সর্বোচ্চ বিচারালয় স্থাপিত হইল। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হইলেন স্যার এলিজা ইম্পে।

রেগুলেটিং এ্যাক্ট অনুসারে গঠিত কাউন্সিলের প্রথম চারিজন সভ্য ছিলেন ক্লেভারিং, মন্‌সন্‌, ফ্রান্সিস ও বারওয়েল। এই চারিজনের মধ্যে একমাত্র বারওয়েল ব্যতীত অপর কেহই হেষ্টিংসকে সমর্থন করিলেন না। ফলে কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্যের মতবিরোধিতার ফলে হেষ্টিংসের পক্ষে নির্বিঘ্নে শাসনকার্য্য পরিচালনা করা দুরূহ হইয়া উঠিল।

হেষ্টিংসের কয়েকটি অন্যায় কার্য্য:—ভারতবর্ষে বৃটিশ অধিকার সুদৃঢ় করার ব্যাপারে হেষ্টিংস কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেও কয়েকটি অন্যায় কার্য্যের জন্য হেষ্টিংসের চরিত্র কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার দুষ্কার্য্যসমূহের মধ্যে রোহিলাদের স্বাধীনতা অপহরণ, মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি, বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহের সিংহাসনচ্যুতি ও অযোধ্যার বেগমদের ধনাপহরণ ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অযোধ্যার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত রোহিলখণ্ড রহমৎ খাঁ নামে এক মুসলমান সর্দার কর্তৃক শাসিত হইত। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার লুব্ধ দৃষ্টি এই সমৃদ্ধ প্রদেশটির উপর ছিল। কিন্তু অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড উভয়েই মারাঠাদের আক্রমণের ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিল। রোহিলাগণ মারাঠাদের ভয়ে ভীত হইয়া অযোধ্যার নবাবের সহিত আত্মরক্ষামূলক সন্ধিতে আবদ্ধ হইল। এই সন্ধি অনুযায়ী স্থির হইল যে যদি মারাঠারা রোহিলখণ্ড আক্রমণ করে, তাহা হইলে নবাব তাঁহার সামরিক সাহায্য দিয়া মারাঠাগণকে বিতাড়িত করিবেন,—বিনিময়ে রোহিলারা নবাবকে চল্লিশ লক্ষ টাকা দিবেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে মারাঠারা রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিলে সম্মিলিত নবাব ও ইংরেজবাহিনী মারাঠাদিগকে বিতাড়িত করিল। এই সময়ে পেশোয়া প্রথম মাধব রাও-এর মৃত্যু হওয়াতে মারাঠারা আর পুনরায় আক্রমণের জন্য উৎসাহিত হইল না। নবাব তাঁহার প্রাপ্য চল্লিশ লক্ষ টাকা দাবি করিল। রহমৎ খাঁ টাকা দিতে অস্বীকৃত হইল। অযোধ্যার নবাব প্রতিশ্রুত অর্থ আদায়ের জন্য হেষ্টিংসের নিকট বৃটিশ সৈন্য সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন এবং বিনিময়ে ইংরেজদিগকে ৪০ লক্ষ টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। হেষ্টিংসের প্রেরিত বৃটিশ সৈন্যের সাহায্যে অযোধ্যার নবাব রোহিলাদিগকে পরাজিত করিয়া রোহিলখণ্ড অযোধ্যার অন্তর্ভুক্ত করিলেন। ইংরেজ সৈন্য ভাড়া দিয়া রোহিলা রাজ্যের স্বাধীনতা নষ্ট করা হেষ্টিংসের অন্যতম অপকীর্ত্তি।

রোহিলাদের স্বাধীনতা অপহরণ

ওয়ারেন হেষ্টিংস মীরজাফরের বিধবা পত্নী মণিবেগমের নিকট হইতে তিন লক্ষ

চুয়ান্ন হাজার টাকা উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মহারাজ নন্দকুমার নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পর্য্যাপ্ত প্রমাণপত্র সহ কাউন্সিলের নিকট অভিযোগ আনয়ন করেন। ইতিপূর্বে বর্দ্ধমানের মহারাণী হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ আনিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত রাজসাহীর জমিদার রাণীভবানী অভিযোগ করিয়াছিলেন যে হেষ্টিংস তাঁহার প্রাসাদ লুণ্ঠন করিয়া বাইশ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। মহারাজ নন্দকুমারের আনীত অভিযোগে হেষ্টিংস অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। হেষ্টিংসের বিরোধী কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য ফ্রান্সিস হেষ্টিংসের অপরাধের বিচারের জন্য সচেষ্ট হইলেন। হেষ্টিংসের অপরাধের বিচার আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই মোহনপ্রসাদ নামে হেষ্টিংসের অনুগৃহীত এক ব্যক্তি নন্দকুমারের নামে জালিয়াতির অভিযোগ আনয়ন করে এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পে নন্দকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ দেন। ইহা সত্য যে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ যথোপযুক্তভাবে প্রমাণিত হয় নাই এবং হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে আনীত নন্দকুমারের অভিযোগগুলির দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য হেষ্টিংস বাল্যবন্ধু এলিজা ইম্পের সাহায্যে নন্দকুমারকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করাইয়াছেন। কোন কোন ঐতিহাসিক ইহাকে 'Judicial murder' বা বিচারের নামে হত্যাকাণ্ড বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে নন্দকুমারের অভিযোগ

নন্দকুমারের ফাঁসি

বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহের প্রতি হেষ্টিংসের আচরণ অনাবশ্যক কঠোরতা ও অনুচিত রূঢ়তার দ্বারা কলঙ্কিত। চৈৎসিংহ অযোধ্যার নবাবের অধীনে বারাণসীর একজন করদরাজা ছিলেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীকে সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা কর দেওয়ার চুক্তিতে বারাণসী কোম্পানীর অধীন মিত্ররাজ্যরূপে পরিগণিত হয়। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সময়ে অর্থাভাবে বিব্রত হেষ্টিংস বার্ষিক দেয় করের অতিরিক্ত অর্থ চৈৎসিংহের নিকট হইতে আদায় করেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের সময়ে হেষ্টিংস পাঁচলক্ষ টাকা অতিরিক্ত কররূপে চৈৎসিংহের নিকট হইতে গ্রহণ করেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস চৈৎসিংহকে এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সরবরাহ করিবার নির্দেশ দেন। চৈৎসিংহ কোন মতে প্রার্থিত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিলেও হেষ্টিংস তাঁহার আদেশ পালনে তথাকথিত শৈথিল্যের জন্য চৈৎসিংহের উপর পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করিলেন এবং স্বয়ং জরিমানা আদায়ের জন্য বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। হেষ্টিংস রাজপ্রাসাদে যাইয়া

চৈৎসিংহের সিংহাসনচ্যুতি

চৈৎসিংহকে বন্দী করিলে প্রজাবর্গ রাজার অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া কিছু ইংরেজ সৈন্য হত্যা করিল। হেষ্টিংস চুনারে পলায়ন করিলেন এবং সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বারাণসী আক্রমণ করিলেন। চৈৎসিংহ গোয়ালিয়রে পলায়ন করিলেন। বারাণসীর সিংহাসন চৈৎসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রদান করা হইল। এই নূতন রাজা পূর্বে দেয় বাৎসরিক কর সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকার পরিবর্তে চল্লিশ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র আসফউদ্দৌলা ফৈজাবাদের চুক্তির দ্বারা অযোধ্যায় ইংরেজ সৈন্য রাখিবার ব্যয় স্বরূপ পূর্বোপেক্ষা অধিক অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। রাজকোষের অবস্থা শোচনীয় থাকায় নূতন নবাব চুক্তি অনুযায়ী অর্থ দিতে অসমর্থ হয়। হেষ্টিংসের পীড়াপীড়িতে নবাব জানাইলেন যে

' .।।।
উপর অত্যাচার

তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার মাতা ও পিতামহী প্রচুর অর্থের উত্তরাধিকারিণী হইয়াছেন। তাঁহাদের ব্যক্তিগত অর্থ না পাইলে নবাবের পক্ষে ইংরেজদের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করা সম্ভবপর হইবে না। হেষ্টিংস নবাবের এই কথা শুনিয়া অনিচ্ছুক বেগমদের নিকট হইতে অর্থ আদায়ের জন্য একদল ইংরেজ সৈন্য ফৈজাবাদে প্রেরণ করিলেন। ইংরেজ সৈন্যদল বেগমদিগকে নানা প্রকারে অপমান ও লাঞ্ছনা করিয়া ৭৬ লক্ষ টাকা আদায় করিল। বেগমদের নিকট হইতে অর্থ আদায়ের ব্যাপারে হেষ্টিংস সমস্ত ন্যায়নীতি ও শ্লীলতা বিসর্জন দিয়াছিলেন। বৃটিশ পার্লামেন্টে হেষ্টিংসের বিচারের সময়ে হেষ্টিংস আত্মপক্ষ সমর্থনে বলিয়াছিলেন যে বেগমরা চৈৎসিংহের বিদ্রোহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, সুতরাং বেগমদের উপর তাহার আচরণ ন্যায্য হইয়াছে। কিন্তু এই যুক্তির কোন ভিত্তি ছিল না এবং স্বীয় আচরণের সমর্থনের জন্য এই অলীক অভিযোগ কল্পিত হইয়াছিল।

হেষ্টিংসের পররাষ্ট্রনীতি :— ক্লাইভ মাত্র বাংলাদেশে বৃটিশের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস মাত্র বাংলাদেশের আধিপত্য লইয়া সন্তুষ্ট রহিলেন না। তিনি বঙ্গদেশের বাহিরে ইংরেজদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হইলেন। সেই সময়ে বৃটিশের সমকক্ষ হইতে পারে ভারতবর্ষে এইরূপ মাত্র দুইটি শক্তি ছিল—উত্তর ভারতে পেশোয়াদের শাসিত মারাঠা শক্তি এবং দাক্ষিণাত্যে হায়দার আলির অধীনে মহীশূর রাজ্য। সুতরাং হেষ্টিংসকে প্রধানতঃ এই শক্তিদ্বয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। ভারতের অপরাপর শক্তির মধ্যে ছিলেন মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম, অযোধ্যার নবাব ও হায়দ্রাবাদের নিজাম। পাঞ্জাবে শিখ শক্তি তখনও আত্ম প্রকাশ করে নাই। ইহাদের মধ্যে সম্রাট ও অযোধ্যার নবাব

ইংরেজদের আশ্রিত ছিলেন—আর হায়দ্রাবাদের নিজাম ইংরেজদের দ্বারা অনুগৃহীত ছিলেন। ইহাদের সম্বন্ধে ইংরেজদের কোন দুর্ভাবনার কারণ ছিল না।

হেষ্টিংস মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহআলম এবং অযোধ্যার নবাবের সহিত ইংরেজের সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত করিলেন। সম্রাট শাহআলম দিল্লী হইতে বিতাড়িত হইয়া অযোধ্যায় নবাবের আশ্রয়ে ছিলেন। মারাঠাদের সাহায্যে তিনি পিতৃপুরুষের রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশ করেন। ক্লাইভ শাহ আলমের জন্য বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা বৃত্তি স্থির করিয়াছিলেন। মারাঠাদের সাহায্য গ্রহণ করার অপরাধে হেষ্টিংস তাঁহার বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে এলাহাবাদ ও কারা কাড়িয়া লইয়া ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তাহা অযোধ্যার নবাবকে অর্পণ করিলেন। অযোধ্যা সীমান্ত অঞ্চল হওয়ায়, অযোধ্যার নবাবের ব্যয়ে একদল বৃটিশ সৈন্য রাখার ব্যবস্থা হইল।

বাদশাহ ও অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে ব্যবস্থা

প্রথম ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধ (১৭৭৪—৮২):—পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা শক্তি আঘাত প্রাপ্ত হইলেও পেশোয়া মাধব রাওয়ের শাসনকালে (১৭৬১—৭২) মারাঠারা পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং ভারতবর্ষে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে মাধব রাওয়ের অকাল মৃত্যুতে মারাঠাদের মধ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হয় এবং ইংরেজরা মারাঠাদের ব্যাপারে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়।

মাধব রাওয়ের মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশোয়া হন। কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা পেশোয়া পদপ্রাপ্তির জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন এবং নারায়ণ রাওকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়া পেশোয়া হন। নারায়ণ রাওয়ের মৃত্যুকালে তাঁহার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা ছিলেন। তিনি পুত্রসন্তান প্রসব করিলে নানা ফাড়নবিশ ও অপরাপর কয়েকজন মারাঠা নায়ক নবজাত শিশু মাধব রাও নারায়ণকে পেশোয়া পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রঘুনাথ পদচ্যুত হইয়া পেশোয়া পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য বোম্বাইর ইংরেজদের শরণাপন্ন হইলেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে সুরাটের সন্ধিতে রঘুনাথ রাও ইংরেজদের সাহায্যের বিনিময়ে ইংরেজদিগকে সালসেট, বেসিন, বরোচ ও সুরাটস্থ কতিপয় জেলার আংশিক রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইলেন। সন্ধির সর্তানুসারে বোম্বাই সরকার প্রেরিত একদল বৃটিশ সৈন্য মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। ইতিমধ্যে কলিকাতার কাউন্সিল হেষ্টিংসের আপত্তি সত্ত্বেও সুরাটের সন্ধি অগ্রাহ্য করিল এবং রঘুনাথের পরিবর্তে মারাঠা দরবারের সঙ্গে নূতন করিয়া সন্ধি করার জন্য কর্ণেল আপটনকে পুনরায় প্রেরণ করিল।

সুরাটের সন্ধি

পুরন্দরের সন্ধি

সুরাটের সন্ধি বাতিল হইয়া পুরন্দরের সন্ধি হইল এবং সন্ধি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ স্বরূপ নগদ টাকা ও সালসেট ও বরোচের রাজস্ব প্রাপ্তির বিনিময়ে ইংরেজরা রঘুনাথের পক্ষ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু কোম্পানীর ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ সুরাটের সন্ধি সমর্থন করিলেন। ফলে বোম্বাই কাউন্সিল রঘুনাথের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মাধব রাও নারায়ণের বিপক্ষে যুদ্ধে অগ্রসর হইলো।

সুরাটের সন্ধি অনুযায়ী যুদ্ধ

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তেলেগাঁওয়ের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইংরেজরা মারাঠাদের সঙ্গে অপমানজনক ওয়ারগাঁও-এর সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। হেষ্টিংস এই সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে মহাদজী সিন্ধিয়ার মধ্যস্থতায় ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে সলবাই-এর সন্ধি হয় (১৭৮২)। এই সন্ধি অনুযায়ী মাধব-রাও নারায়ণ পেশোয়া বলিয়া স্বীকৃত হইলেন এবং রঘুনাথকে বার্ষিক তিন লক্ষটাকা বৃত্তিদানের বন্দোবস্ত হইল। ইংরেজরা সালসেট লাভ করিল। এই সন্ধিতে ইংরেজদের আপাততঃ কোন লাভ না হইলেও ইহা পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছিল। এই সময়ে মারাঠারাই ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত শক্তি ছিল। এবং সলবাইর-এর সন্ধির ফলে ইহাদের সঙ্গে সাময়িক শান্তি সংস্থাপিত হওয়ায় আগামী কুড়ি বৎসর কাল ইংরেজরা মহীশূর, ফরাসী, নিজাম, অযোধ্যার নবাব প্রভৃতি প্রতিপক্ষের সহিত চূড়ান্তভাবে বোঝাপড়া করার অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সলবাইর সন্ধি

ইঙ্গ-মহীশূর সংঘর্ষ :—মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই ইংরেজরা মহীশূরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িল। হায়দার আলি নামে একজন প্রতিভাবান নায়কের অধীনে মহীশূর দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

হায়দার আলি প্রথম জীবনে সামান্য সৈনিকরূপে মহীশূরের প্রধান মন্ত্রীর অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন এবং স্বীয় কর্মক্ষমতার গুণে অচিরেই মহীশূর রাজ্যের প্রকৃত শাসন-কর্তা হইয়া দাঁড়ান। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দের পর তিনি মারাঠাদের দুর্বলতার সুযোগে কর্ণাট অঞ্চল অধিকার করেন এবং কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত মহীশূরের রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন। হায়দারের এই শক্তি বৃদ্ধিতে মারাঠাগণ মহীশূর আক্রমণ করে (১৭৬৪-৬৫)। হায়দার মারাঠাদের হস্তে পরাজিত হইয়া মারাঠাগণকে ক্ষতিপূরণ ও রাজ্যের একাংশ ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করেন। হায়দার আলির অভ্যুদয় নিজাম, মারাঠা বা ইংরেজ কেহই প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতে পারিল না।

প্রথম ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধ

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট উত্তর সরকার ইংরেজদের হস্তে সমর্পণের বিনিময়ে

হায়দারের বিরুদ্ধে নিজামকে সাহায্যের জন্য প্রতিশ্রুত হইল। সুতরাং মারাঠা, নিজাম এবং ইংরেজ এই তিন শক্তি একযোগে হায়দারকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইল। হায়দার সুকৌশলে মারাঠা ও নিজামকে ইংরেজের পক্ষ ত্যাগ করাইয়া নিরপেক্ষ করিয়া রাখিলেন। শেষ পর্যন্ত নিজাম ইংরেজের পক্ষে আবার যোগদান করিল। যাহা হউক হায়দার একাকীই ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং বোম্বাইর ইংরেজ বাহিনীকে পরাজিত করিয়া মাদ্রাজের পাঁচ মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। ইংরেজরা বাধ্য হইয়া যুদ্ধের সময় বিজিত রাজ্যাংশ বিনিময় এবং কোন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইলে পরস্পরকে সাহায্য প্রদান এই শর্তে হায়দারের সঙ্গে সন্ধি করেন। কিন্তু ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে মারাঠাগণ হায়দার আলির রাজ্য আক্রমণ করিলে ইংরেজগণ তাঁহাকে সাহায্য করিল না। এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কথা হায়দার আলি জীবনে কখনও ভুলিলেন না।

সন্ধি

মারাঠা আক্রমণের সময়ে ইংরেজদের প্রতিশ্রুতিভঙ্গ

প্রথম মারাঠা যুদ্ধের সময়েই ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে ফ্রান্স আমেরিকাকে সাহায্য করায় ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজরা মহীশূরের অন্তর্গত ফরাসীদের অধিকৃত মাহে বন্দর অধিকার করিল। এই ঘটনায় হায়দার ক্রুদ্ধ হইয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইংরেজগণ গুণ্টুর জেলা অধিকার করায় হায়দ্রাবাদের নিজামও ইংরেজদের উপর বিরক্ত হইলেন। এই সময়ে রঘুনাথের পেশোয়া পদ লইয়া মারাঠাদের সহিতও ইংরেজদের যুদ্ধ চলিতেছিল। ফলে হায়দার ইংরেজদের প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ও মাহে অধিকারের শাস্তি দিবার জন্য মারাঠা ও নিজামের সঙ্গে একযোগে ইংরেজগণকে আক্রমণ করিলেন। ইহা দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ নামে খ্যাত। ইংরেজগণ গুণ্টুর জেলা নিজামকে প্রত্যর্পণ করিয়া নিজামকে হস্তগত করিলেন এবং মারাঠাদিগকেও হায়দারের পক্ষ ত্যাগ করিতে প্ররোচিত করিলেন। ফলে হায়দারকে একাই ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইল। হায়দার কর্ণেল বেইলীর অধীনস্থ এক সৈন্যবাহিনীকে বিধ্বস্ত করিয়া

হায়দার আলী

আর্কট অধিকার করিলেন। কিন্তু তিনি আয়ার কুটের হস্তে পরাজিত হইলেন, ইতিমধ্যে ফরাসী নৌ-সেনাপতি সাফ্রেন তাঁহার নৌ-বাহিনী লইয়া ভারত মহাসাগরে উপস্থিত হওয়ায় হায়দারের সাহস আরও বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু কোন প্রকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়ার পূর্বেই ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে হায়দারের মৃত্যু হয়। হায়দারের মৃত্যুর পরেও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র টিপু সুলতান ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ চালাইতে থাকেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি ম্যাথুস টিপুর হস্তে সসৈন্যে বন্দী হইলেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি ঘটিলে ভারতবর্ষেও শান্তি সংস্থাপনের চেষ্টা হয়। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধির দ্বারা দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল। বন্দী বিনিময় ও পরস্পরের অধিকৃত রাজ্য প্রত্যর্পণের চুক্তিতে এই সন্ধি সম্পন্ন হইল।)

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি, ১৭৮৪

হায়দার আলির চরিত্র ও কৃতিত্ব—হায়দার আলি ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম প্রতিভাবান ব্যক্তি। স্বীয় পুরুষকার ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের বলে তিনি অতি সাধারণ অবস্থা হইতে রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে উন্নীত হইতে সক্ষম হন। তিনি লিখিতে পড়িতে জানিতেন না বটে, কিন্তু দৃঢ় সঙ্কল্প, প্রশংসনীয় সাহসিকতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াতে তাঁহার এই ত্রুটি সংশোধিত হইয়াছিল। হায়দার রণক্ষেত্রে যেমন বীরত্ব ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন তদ্রূপ রাজ্যশাসনের ব্যাপারেও উদ্যমী ও সুকৌশলী ছিলেন। তিনি স্বয়ং সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং তাঁহারই সম্মুখে রাজকার্য্য নির্বাহিত হইত। ব্যক্তিগতভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনার ফলে বিরোধ বিসম্বাদে বিচ্ছিন্ন ও কুশাসনপীড়িত ক্ষুদ্র মহীশূরকে তিনি ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। এই অসাধারণ পরিশ্রমী শাসকের সহিত সাধারণের দেখা সাক্ষাৎ করার জন্য সকলের অবারিত দ্বার ছিল। সমান মনোযোগের সহিত একই সময়ে বহুবিধ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা তাঁহার ছিল।

হায়দার কখনও পরাজয়ে হতাশ মনোভাবের পরিচয় দিতেন না। নিজের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি তিনি কখনও ভঙ্গ করিতেন না, তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেন। বৃটিশের প্রতি তাহার মনোভাব ও আচরণে কোথাও কিছু অস্পষ্টতা ছিল না। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ হায়দার সম্বন্ধে এই মন্তব্য করিয়াছেন যে তিনি ছিলেন 'ন্যায়বিবেকবর্জিত, অধর্মনিষ্ঠ, অসচ্চরিত্র ও নির্মম'। ইহা সর্বৈব মিথ্যা। ধর্মের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে বিশেষ তৎপর না হইলেও হায়দার আলি স্বধর্মনিষ্ঠ এবং সমকালীন

সমস্ত মুসলমান নরপতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উদার ছিলেন। কঠোরতার সহিত রাজ্য-শাসন করিলেও তিনি প্রজাগণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধালাভ করিয়াছিলেন।

হেষ্টিংসের পদত্যাগ ও বিচার :—হেষ্টিংসের বিবিধ অপকীর্ত্তির কথা ইংলণ্ডে পৌঁছিলে সেইস্থানে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে এক প্রবল জনমতের সৃষ্টি হয়। অগত্যা হেষ্টিংস ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেলের পদ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেখানে ভারতের গভর্নর জেনারেল থাকাকালীন বিবিধ অন্যায় কার্য্য করার জন্য হেষ্টিংসের বিচার হয়। তৎকালীন বহু ইংরেজ রাজনীতিক বার্ক, ফক্স, শেরিডান প্রভৃতি হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে বিচার পরিচালনা করেন। হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহের মধ্যে রোহিলা যুদ্ধ, চৈৎসিংহের অপসারণ ও অযোধ্যার বেগমদের উপর অত্যাচার উল্লেখ-যোগ্য। দীর্ঘ সাত বৎসর ধরিয়া তাঁহার বিচার হয়। অবশেষে তিনি নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অত্যন্ত অশান্তি ও দুঃখের মধ্যে অতিবাহিত হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হেষ্টিংসের বিচার

হেষ্টিংসের চরিত্র ও কৃতিত্ব :—ওয়ারেন হেষ্টিংসের চরিত্র সম্বন্ধে এত বেশী বিবাদ-বিতর্ক হইয়াছে যে, প্রকৃত সত্য নিরূপণ করা অতি দুরূহ। বার্ক, মেকলে বা জেম্‌স মিলের ন্যায় বহু প্রাচীন যুগের প্রখ্যাত বাগ্মী ও ঐতিহাসিক তীব্র ভাষায় তাঁহার বহুবিধ আচরণের নিন্দা করিয়াছেন তদ্রূপ আধুনিক যুগের থর্ণটন, মার্শম্যান বা বেভারিজ প্রভৃতি মনীষিগণও তাঁহার আচরণের সমর্থন করিতে পারেন নাই। হেষ্টিংসের আচরণের সমর্থকগণও তাঁহার বিভিন্ন গর্হিত আচরণের সমর্থনে অন্য কোন যুক্তি না থাকিলে 'তৎকালীন রাজনীতিক পরিস্থিতিতে' বা 'কোম্পানীর স্বার্থরক্ষার জন্য' ঐ সব কার্য্য করিতে হইয়াছে এই কথাই বলেন। অপরাপর গর্হিত কর্ম বাদ দিলেও রোহিলাদের স্বাধীনতা অপহরণে বৃটিশ সৈন্য ভাড়া দেওয়া, চৈৎসিংহের প্রতি উৎপীড়ন, অযোধ্যায় বেগমদের ধনাপহরণে সাহায্যপ্রদান ইত্যাদি আচরণ কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নহে। এতদ্ব্যতীত উৎকোচ বা 'উপহার' গ্রহণের দ্বারা তাঁহার চরিত্র যে কতবার কলুষিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা

হেষ্টিংস

নাই। হেষ্টিংসের গুণগ্রাহী সমর্থক-গণ নানা প্রকারে তাঁহার কলঙ্কস্খালনের চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের পক্ষে নির্বিচারে তাঁহার সকল কার্য্য সমর্থন করা অসম্ভব।

পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ক্লাইভ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

হেষ্টিংসের চরিত্রে অসংখ্য দোষত্রুটি থাকিলেও তাঁহাকে প্রথমাবধি যে বহু অসুবিধা ও প্রতিকূলতার মধ্যে বৃটিশের মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হইতে হইয়াছে তাহা মনে রাখা আবশ্যক। দ্বৈত শাসনের কুফলে যখন বাংলাদেশে কোম্পানীর আর্থিক ও শাসনসম্পর্কিত নৈতিক, সম্ভ্রমপ্রতিপত্তি প্রায় বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছিল সেই সময়ে হেষ্টিংস কোম্পানীর কর্ণধাররূপে আসিয়া কোম্পানীর হৃতপ্রায় অবস্থাকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলেন। জলপথে যখন ফরাসী নৌ-সেনাপতি সাফ্রেন, স্থলপথে মারাঠা, নিজাম ও হায়দার আলির দ্বারা ইংরেজগণ আক্রান্ত ও বিপন্ন তখন তিনি স্বীয় কৃতিত্ববলে এদেশে বৃটিশ প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ক্লাইভের ন্যায় সামরিক ব্যাপারে তিনি কৃতী ছিলেন না সত্য, কিন্তু পররাষ্ট্রনীতিতে ক্লাইভ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। নানা ফাড়নবিশ, মাহাদজী সিন্ধিয়া বা হায়দার আলির মত ধুরন্ধর রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে তাঁহাকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে এবং সর্বত্র তিনি জয়লাভে সক্ষম হইয়াছেন।

বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী

আভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপারে তিনি যথেষ্টই দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরপীড়িত বাংলাদেশে তিনি শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত বিচার ও শাসন ব্যবস্থা দীর্ঘকাল অনুসৃত হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বাংলা ও ফার্সী ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল; আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষাদানের জন্য তিনি ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় স্যার উইলিয়ম জোন্স 'এশিয়াটিক সোসাইটি' স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতে বৃটিশের স্বার্থরক্ষাকর্ত্তারূপে বিচার করিলে অবশ্য হেষ্টিংসকে অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিই বলা চলে। তিনি ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্যকে আসন্ন পতন হইতে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্বের বলে রক্ষিত ভিত্তিভূমির উপরে পরবর্ত্তীকালে ওয়েলেসলী, মার্কুইস অফ্ হেষ্টিংস বা ডালহৌসী সাম্রাজ্যসৌধ নির্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সমস্ত দিক দিয়া বিবেচনা করিলে হেষ্টিংসকে ভারতে আগত বৃটিশ রাজনীতিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করা যাইতে পারে।

ইঙ্গ-বৃটিশ রাজনীতিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

প্রশ্নোত্তর

1. Narrate the Anglo-Mahratta and Anglo-Mysore relat ons during the time of Warren Hastings

ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়ে ইঙ্গ-মারাঠা ও ইঙ্গ-মহীশূর সম্পর্ক বর্ণনা কর।

প্রশ্নোত্তর : (ক) প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৭৭৪—'৮২)
(খ) দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৮০—'৮৪)

2. Describe the administration and judicial reforms of Warren Hastings.

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসন ও বিচার সম্বন্ধীয় সংস্কার বর্ণনা কর।

প্রশ্নোত্তর : (১) শাসন সংস্কার : ওয়ারেণ হেষ্টিংস দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা রহিত করিয়া দেওয়ানীর কার্য্যভার অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব সাক্ষাৎভাবে কোম্পানীর হস্তে ন্যস্ত করিলেন। তিনি নায়েব দেওয়ানের পদ তুলিয়া দিলেন এবং কোম্পানীর কোষাগার মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিলেন। রাজস্ব-আদায়ের জন্য 'কালেক্টর' বা ইংরাজ সংগ্রাহক এবং রাজস্ব সংগ্রহের জন্য একটি ভ্রাম্যমান কমিটি নিযুক্ত হইল; রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য কলিকাতায় একটি বোর্ড অফ্ রেভিনিউ' স্থাপিত হইল। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা ছয় অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশে একটি প্রাদেশিক কাউন্সিল ও দেশীয় দেওয়ান নিযুক্ত হইল। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়ে এক বৎসরের পরিবর্তে প্রথমে পাঁচ বৎসরের জন্য জমিদারগণের সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত হইল।

(২) বিচার ব্যবস্থা :—ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ে বিচার ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা প্রবর্তিত হয়। প্রত্যেক জেলায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের একটি করিয়া দেওয়ানী ও একটি করিয়া ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত নামে দুইটি উচ্চতর আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। ফৌজদারী বিভাগ দেশীয় কর্তৃপক্ষের হস্তে রহিল এবং দেশীয় বিচারপতিগণ ভারতীয় আইনবিধি অনুযায়ী ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা নিষ্পন্ন করিতে লাগিলেন। ইংরাজ কর্মচারী কালেক্টরের হস্তে দেওয়ানী বা রাজস্ব-সংক্রান্ত বিচারের ভার রহিল।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ছয়টি প্রাদেশিক সভার হস্ত হইতে বিচারের ক্ষমতা ছয়টি দেওয়ানী আদালতের উপর ন্যস্ত হইল এবং এই সকল আদালতের কার্য্য ছয়জন বৃটিশ কর্মচারীর কর্তৃত্বাধীনে স্থাপিত হইল। মোট কথা জিলা আদালত সমূহ বৃটিশের

তত্ত্বাবধানে রহিল এবং চারিটি জেলা ব্যতীত সর্বত্র বিচারের ক্ষমতা কালেক্টরের হস্ত হইতে পৃথক জজের হাতে রাখা হইল। নবাবী আমলের কর্মচারী ফৌজদার পদ রহিত করা হইল এবং ফৌজদারের অধিকার জেলা-জজকে দেওয়া হইল।

(৩) **আলোচনা:** ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সুদক্ষ আভ্যন্তরীণ শাসন ও বিচার ব্যবস্থার গুণে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরপীড়িত বঙ্গদেশে বহুল-পরিমাণে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রবর্ত্তিত হয়। বিচার-বিভাগীয় প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থা বহুদিন স্থায়ী ছিল এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত জেলা-শাসন পদ্ধতি পরবর্ত্তীকালে বৃটিশ শাসনের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছিল।

3. Sketch the career and make an estimate of Haider Ali

হায়দার আলির জীবনী ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

উত্তর-সূত্র: (১) **জীবনী:** হায়দার সামান্য সৈনিকরূপে মহীশূরের প্রধান মন্ত্রীর অধীনে কার্য্য আরম্ভ করেন এবং স্বীয় কর্মদক্ষতাবলে প্রথমে সেনানায়ক এবং পরে মহীশূরের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা হইয়া দাঁড়ান, ক্রমশঃ তিনি শক্তিশালী হইয়া মহীশূরের রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন। হায়দার আলির আলির অভ্যুদয়ে প্রতিবেশী শক্তিত্রয় নিজাম, মারাঠা ও ইংরেজগণ শঙ্কিত হইল। ১৭৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে মারাঠাদের আক্রমণে হায়দার পরাস্ত হইয়া ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রাজ্যের একাংশ ও প্রচুর অর্থ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ, নিজাম ও মারাঠা সম্মিলিতভাবে হায়দারকে আক্রমণ করার সঙ্কল্প করে। কিন্তু হায়দারের কূটনীতির ফলে নিজাম ও মারাঠা নিষ্ক্রিয় রহিল এবং ইংরাজকে একক হায়দারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইল। হায়দারের হস্তে ইংরাজগণ পরাজিত হইল এবং ইংরেজরা বাধ্য হইয়া যুদ্ধের সময় বিজিত রাজ্যাংশ বিনিময় এবং কোন শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে পারস্পরিক সাহায্যের বিনিময়ে হায়দারের সঙ্গে সন্ধি করিল। কিন্তু কার্য্যতঃ ইংরাজরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল না—অচিরেই মারাঠারা (১৭৭১ খৃঃ) হায়দারের রাজ্য আক্রমণ করিলে ইংরাজরা তাঁহাকে সাহায্য করিল না। এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য হায়দারের ইংরাজ-বিদ্বেষ আজীবন ছিল। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইংরাজগণ মহীশূরের অন্তর্গত ফরাসীদের অধিকৃত মাহে অধিকার করে। এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ হইয়া হায়দার ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইহা দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধের প্রথম দিকে নিজাম ও মারাঠা ইংরাজদের বিপক্ষে হায়দারের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু অচিরেই উহারা হায়দারের পক্ষ ত্যাগ করাতে শেষ পর্য্যন্ত হায়দারকে একাকীই যুদ্ধ করিতে হয়। যুদ্ধের প্রথম দিকে

হায়দার আর্কট অধিকার করেন কিন্তু অচিরেই হায়দার ইংরাজ সেনাপতি আয়ার কূটের হস্তে পরাজিত হন কিন্তু তাঁহার পুত্র টিপু সুলতান ইংরেজ সেনাপতি কর্ণেল ব্রেথওয়েট-কে পরাজিত করেন। ইতিমধ্যে (১৭৮২ খৃঃ-এ) ফরাসী নৌ-সেনাপতি সাফ্রেন নৌ-বহর লইয়া ভারত মহাসাগরে উপস্থিত হইলে হায়দারের সাহস বৃদ্ধি হয়। কিন্তু সেইবৎসরই হায়দারের মৃত্যু হয়।

(২) কৃতিত্ব (হায়দারের চরিত্র ও কৃতিত্ব দ্রষ্টব্য)।

4. **Estimate the services rendered by Warren Hastings to the consolidation of British power in India.**

ভারবর্ষে বৃটিশ-শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কৃতিত্বের পরিমাপ কর।

উত্তর-সূত্র : ('হেষ্টিংসের চরিত্র ও কৃতিত্ব' দ্রষ্টব্য)।

5. **Briefly narrate the history of Mysore under Haidar Ali and Tipu Sultan.**

হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের শাসনকালীন মহীশূরের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর-সূত্র : (১) হায়দার আলি—প্রথম ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূরের যুদ্ধ (৩ নং উত্তর-সূত্র দ্রষ্টব্য)

(২) টিপু সুলতান—(ক) দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের শেষাংশ ও সন্ধি

(খ) কর্ণওয়ালিসের সময়ে তৃতীয় ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধ

(গ) ওয়েলেসলীর সময়ে চতুর্থ ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধ-ফলাফল

(৩) হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের সংক্ষিপ্ত চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা : হায়দারের একক কৃতিত্ব, সামরিক ও কূটনৈতিক বিচক্ষণতা এবং ব্যক্তিগতভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনার ফলে বিরোধ-বিসম্বাদে বিচ্ছিন্ন ও কুশাসনপীড়িত মহীশূর ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। পুত্র টিপু সুলতানও পিতার ন্যায় নির্ভীক, স্বাধীনতা-প্রিয় ও জনপ্রিয় নরপতি ছিলেন। গোঁড়া মুসলমান হইলেও পিতার ন্যায় হিন্দু প্রজাদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন। পিতা ও পুত্রের কৃতিত্বপূর্ণ কার্য্যাবলীর ফলে ক্ষুদ্র মহীশূর রাজ্য সমসাময়িক ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অর্জন করিয়াছিল।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার ঃ লর্ড কর্ণওয়ালিস হইতে মার্কুইস্ অফ্ হেষ্টিংস্

Syllabus :—Increasing control of the British Government over the Company's policy. North's Regulating Act and Pitt's India Act.

Third phase of imperial expansion under Cornwallis and Wellesley. The third and fourth Anglo-Mysore wars. Wellesley's war with the Marathas—conquest of heart of India M›ira completes annihilation of the Marathas. British paramount power in India.

পাঠ্যসূচী ঃ—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নীতির উপর বৃটিশ পার্লামেন্টের ক্রমাধিপত্য। নর্থের রেগুলেটিং এ্যাক্ট ও পিটের ভারত শাসন আইন।

কর্ণওয়ালিস ওয়েলেসলীর সময়ে বৃটিশের সাম্রাজ্য বিস্তারের তৃতীয় পর্ব, তৃতীয় ও চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ। মারাঠাদের সহিত ওয়েলেসলীর যুদ্ধ, ভারতের কেন্দ্রস্থলে বৃটিশের আধিপত্য। লর্ড ময়রা কর্তৃক মারাঠা শক্তির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ। ভারতে বৃটিশ শক্তির সার্বভৌমত্ব।

বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক কোম্পানীর কার্য্যে হস্তক্ষেপ ঃ—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠার প্রথম হইতে এই কোম্পানীর কার্য্যাবলী বৃটিশ সরকারের দ্বারা সমর্থিত ও অনুমোদিত হইয়া আসিতেছিল। প্রথম দিকে বৃটিশ সরকার কোম্পানীর স্বাধীন কার্যকলাপের উপর হস্তক্ষেপ করে নাই। পলাশী বিজয়ের পরে যখন বঙ্গদেশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রত্যক্ষ শাসনাধিকারে আসিল তদবধি ভারতের শাসন ব্যবস্থার প্রতি বৃটিশ সরকার আগ্রহশীল হইল। বণিক কোম্পানীর জন্য রচিত শাসনব্যবস্থা রাজ্য-শাসনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত কিনা তাহা বৃটিশ পার্লামেন্টের স্বার্থসম্বন্ধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিতর্কের বিষয় হইল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের নর্থের রেগুলেটিং এ্যাক্টের পূর্বে ভারতের শাসন সম্বন্ধে কোন সুনিয়ন্ত্রিত বিধি রচিত হয় নাই। রেগুলেটিং এ্যাক্ট

প্রবর্তিত হওয়ার ফলে ইংলণ্ড ভারত শাসনের ব্যাপারে অনেকটা হস্তক্ষেপ করার সুযোগ প্রাপ্ত হইল।

রেগুলেটিং এ্যাক্ট, ১৭৭৩ঃ—বঙ্গদেশের শাসনভার একজন গভর্নর জেনারেল ও চারিজন সদস্যবিশিষ্ট একটি কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত হইল। ওয়ারেন হেষ্টিংসকে গভর্নর জেনারেলের পদে এবং ক্লেভারিং, মনসন, বারওয়েল ও ফিলিপ ফ্রান্সিসকে কাউন্সিলের সভ্যপদে নিযুক্ত করা হইল। ইহাদের পাঁচ জনের মধ্যে যে পক্ষে সংখ্যাধিক্য ঘটিবে তাহার মতই গৃহীত হইবে। দুইপক্ষে ভোট সংখ্যা সমান হইলে গভর্নর জেনারেল একটি অতিরিক্ত ভোট দিতে পারিবেন এইরূপ ব্যবস্থা হইল। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর প্রত্যেকটি একজন গভর্নর ও একটি কাউন্সিলের শাসনাধীন হইল। সাধারণ শাসনকার্য সম্বন্ধে এই দুইটি প্রেসিডেন্সী বাঙ্গালা হইতে স্বতন্ত্র রহিল, কিন্তু অর্থনৈতিক ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাহারা বাঙ্গালা সরকারের অর্থাৎ সপারিষদ গভর্নর জেনারেলের কর্তৃত্বাধীন হইল।

গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল

বিচারের সুবিধার জন্য কলিকাতায় একটি সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইল। একজন প্রধান বিচারপতি ও তিনজন সাধারণ বিচারপতি ইহার বিচারকার্য্য নির্বাহ করিবেন। স্যার এলিজা ইম্পে এই বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন।

ভারতবর্ষে সুশাসন প্রবর্তনের জন্য বৃটিশ পার্লামেন্ট রেগুলেটিং এ্যাক্ট প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই এ্যাক্টের কয়েকটি ত্রুটির জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টের এই প্রত্যাশা সফল হয় নাই। প্রথমতঃ, গভর্নর জেনারেলকে সব সময় অধিকাংশ সদস্যের মতানুযায়ী চলিতে বাধ্য থাকায় বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই গভর্নমেন্টের উপর বাঙ্গালা গভর্নমেন্টের ক্ষমতার বিষয় নির্দিষ্টভাবে নির্দ্ধারিত হয় নাই। এই অস্পষ্টতার ফলে ঐ দুই গভর্নমেন্টের সঙ্গে বাঙ্গালা গভর্নমেন্টের মতানৈক্য উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথম ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধের সময়ে এই অস্পষ্টতার ফলে বিশেষ গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, সুপ্রীম কোর্ট এবং গভর্নর জেনারেলের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন ও সম্পর্ক সম্বন্ধে অস্পষ্টতা থাকায় উভয়ের মধ্যে ভবিষ্যতে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাতে বিচার ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিবার উপক্রম হইল।

ইহার দোষত্রুটি

পিট-এর ভারত শাসন আইন, ১৭৮৪ঃ—ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালেই রেগুলেটিং এ্যাক্টের দোষ ত্রুটিগুলি ধরা পড়ে। তখন বৃটিশ পার্লামেন্ট পুনরায় ভারতবর্ষের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিল। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে একটি সংশোধন আইনের দ্বারা

সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা নির্দ্ধারণ করা হইল এবং গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলের সহিত সুপ্রীম কোর্টের বিবাদের পথ রুদ্ধ হইল। অতঃপর তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী উইলিয়ম পিট ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এক নূতন আইন লিপিবদ্ধ করেন। রেগুলেটিং এ্যাক্টের ত্রুটিগুলি সংশোধন করাই এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল।

এই আইন অনুযায়ী গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলে চারিজনের পরিবর্তে তিনজন সভ্য থাকিবে বলিয়া স্থির হইল; কোম্পানীর সেনাধ্যক্ষ এই তিনজনের অন্যতম হইবেন।

গভর্নর জেনারেল ও তাহার কাউন্সিল

গভর্নর জেনারেল ও তাহার কাউন্সিলের মধ্যে মতভেদ হইলে গভর্নর জেনারেল কাষ্টিং ভোট বা অতিরিক্ত ভোট দিয়া স্বীয় মতের প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারিবেন। মাদ্রাজ ও বোম্বাই গভর্নমেন্টের উপর স-কাউন্সিল গভর্নর জেনারেলের অধিকার সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা হইল। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের এক অতিরিক্ত আইনের দ্বারা গভর্নর জেনারেলকে বিশেষ ক্ষেত্রে কাউন্সিলের মত অগ্রাহ্য করিবার এবং প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণের অধিকার দেওয়া হইল।

কোম্পানীর উপর পার্লামেন্টের অধিকার দৃঢ়তর করিবার জন্য ইংলণ্ডে ছয় জন সভ্য দ্বারা গঠিত 'বোর্ড অফ কন্ট্রোল' নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। বৃটিশ গভর্নমেন্টের একজন মন্ত্রী এই বোর্ডের সভাপতি হইবেন। তিনিই প্রকৃতপক্ষে বোর্ডের সমুদয় কার্য্য

'বোর্ড অফ্ কন্ট্রোল'

নির্বাহ করিবেন। কোম্পানীর ডিরেক্টারবর্গ ভারতবর্ষ সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র বোর্ডের নিকট দাখিল করিতে এবং বোর্ডের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য রহিলেন। কোম্পানীর অংশীদারগণের ক্ষমতাও হ্রাস করা হইল। বোর্ডের নির্দেশানুযায়ী ডিরেক্টরগণ কোন কার্য্য করিলে তাহা পূর্ব্ববৎ বাতিল বা স্থগিত রাখিবার কোন ক্ষমতা তাঁহাদের রহিল না। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের হস্তে শুধু কোম্পানীর কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত করার অধিকার রহিল। মোট কথা এইভাবে প্রকৃতপক্ষে ভারতশাসন ক্ষমতা কোম্পানীর হস্ত হইতে ইংলণ্ডের গভর্ণমেন্টের দপ্তরে স্থানান্তরিত করা হইল।

লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬—৯৩):—ওয়ারেন হেষ্টিংসের পদত্যাগের পরে স্যা জন ম্যাকফারসন কিছুদিন (১৭৮৫—৮৬) অস্থায়ী গভর্ণর-জেনারেল রূপে কাজ করেন অতঃপর লর্ড কর্নওয়ালিস গভর্নর-জেনারেল হইয়া ভারতবর্ষে আসেন (১৭৮৬)। তিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী পিটের এবং কোম্পানীর 'বোর্ড অফ্ কন্ট্রোলের' সভাপতি ডুণ্ডাসে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা বৃদ্ধি না করিলে কর্নওয়ালিস ঐ পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় পিট তাঁহাকে একটি নূতন আইনের সাহায্যে বিশে

ক্ষমতা দিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। তাঁহাকে ভারতের প্রধান সেনাপতির পদেও নিযুক্ত করা হইল। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্যের মতের বিরুদ্ধেও স্বেচ্ছানুযায়ী কার্য্য করার অধিকার দেওয়া হইল।

কর্নওয়ালিসের বিবিধ সংস্কার:—লর্ড কর্নওয়ালিস কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দূর করিয়া ভারতবর্ষে কোম্পানীর শাসনব্যবস্থা সুশৃঙ্খল করিবার জন্যই ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি ভারতে আসিয়া তাঁর শাসনকালের প্রথম দিকে আভ্যন্তরীণ সংস্কার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। ঐ সময়ে কোম্পানীর কর্মচারিগণ অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য তিনি তাহাদের বেতন বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন। কর্নওয়ালিস তাঁহার সংস্কার কার্য্যে এক ভ্রান্তনীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। ভারতবাসীদিগকে তিনি অবিশ্বাস করিতেন

কোম্পানীর কর্মচারীদের দুর্নীতি নিবারণ

উচ্চপদে ভারতবাসী নিয়োগ বন্ধ হইল

লর্ড কর্নওয়ালিস

বলিয়া দায়িত্বপূর্ণ কোন পদে ভারতীয়গণকে নিযুক্ত করা বন্ধ করিয়া দিলেন। কর্নওয়ালিসের এই নীতি পরিণামে কল্যাণকর হয় নাই। এদেশে সুযোগ্য ইংরেজের সংখ্যা পর্য্যাপ্ত না থাকায় দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রায়ই অযোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে হইত। কর্নওয়ালিস জেলার সমস্ত শাসনভার দুইজন ইউরোপীয়ানের হস্তে ন্যস্ত করিলেন—জেলাজজ ও ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টর।

দেশের শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তিনি পুলিশ ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি জমিদারগণকে তাহাদের স্থানীয় অঞ্চলের শান্তিরক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া সেই দায়িত্ব প্রত্যেক অয়ায়তন বিশিষ্ট এলাকার দারোগার উপর অর্পণ করিলেন। এই সকল দারোগা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে রহিলেন।

স্থানীয় শান্তি রক্ষা

কর্নওয়ালিস বিচারব্যবস্থারও বহু সংস্কার সাধন করেন। তিনি ফৌজদারী ও দেওয়ানী মকদ্দমার জন্য পৃথক ব্যবস্থা করিলেন। হেষ্টিংসের প্রতিষ্ঠিত সদর দেওয়ানী

আদালত ও সদর নিজামৎ আদালত দুইটি ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয়ই রহিল। তিনি সদর নিজামৎ আদালতকে মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন এবং নবাবের পরিবর্তে গভর্নর জেনারেলকে ইহার ভারপ্রাপ্তব্যক্তি নিযুক্ত করেন। প্রত্যেক জেলার দেওয়ানী মকদ্দমার ভার জেলা জজের উপর অর্পিত হইল। একজন হিন্দু পণ্ডিত এবং একজন কাজি জেলা জজকে সাহায্য করিতেন। প্রদেশের ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য কলিকাতায়, মুর্শিদাবাদে, পাটনায় ও ঢাকায় চারিটি ভ্রাম্যমান আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল। এই আদালতগুলিতে দুইজন করিয়া ইংরেজ জজ রহিলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস একখানি আইনগ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ইহা 'কর্নওয়ালিস কোড' নামে খ্যাত। এই কোডের মূলনীতি অনুযায়ী কর্নওয়ালিস বিচার ও শাসন বিভাগের আমূল সংস্কার করিলেন এবং ইহাকেই ভিত্তি করিয়া পরবর্তীযুগের বৃটিশ শাসনের সিভিল সার্ভিস'-এর 'ইস্পাত-কাঠামো' প্রস্তুত হইয়াছিল।

বিচারব্যবস্থার সংস্কার

কর্নওয়ালিসের রাজস্ব সংস্কার : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত :—লর্ড কর্নওয়ালিস রাজস্ব সংক্রান্ত যে নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে খ্যাত। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়ে প্রথমে পাঁচ বৎসরের জন্য এবং পরে এক বৎসরের জন্য জমিদারগণের সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত হইল। এই ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায়ে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আদায় না হইলে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে শাসনকার্য পরিচালনার অসুবিধা হইত। জমিদারগণ প্রায়ই জমিদারী পাইবার লোভে অত্যধিক রাজস্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া কার্যকালে প্রতিশ্রুত রাজস্ব দিতে পারিত না। ফলে কোম্পানীর আয় অনিশ্চিত ছিল। জমির উপর স্থায়ী স্বত্ব না থাকায় জমিদারেরা জমির উন্নতির দিকে মন দিত না। তজ্জন্য জমিও অনুর্বর থাকিত, প্রজাদের দুর্দশার সীমা থাকিত না।

লর্ড কর্নওয়ালিস ইংলণ্ডের জমিদারবংশের সন্তান ছিলেন। সেখানে জমিদাররাই জমির প্রকৃত মালিক। সুতরাং তিনি বৃটিশ পদ্ধতি ভারতবর্ষেও প্রবর্তিত করিতে চাহিলেন এবং রাজস্ব চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট করার সঙ্কল্প করিলেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষ স্থায়ী বন্দোবস্তের সম্ভাবনা ঘোষণা করিয়া কর্নওয়ালিস প্রথমতঃ দশবৎসরের জন্য জমিদারী প্রথার প্রবর্তন করিলেন। পরে তাঁহার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত হইলে কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে দশসালাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত করিলেন। কোম্পানীকে নির্দিষ্ট পরিমাণে রাজস্ব প্রদান করার বিনিময়ে জমিদারকে জমি

মালিক বলিয়া স্বীকার করা হইল এবং বংশানুক্রমে তাহার জমিদারী স্বত্ব স্বীকৃত হইল।

"(চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে আপাততঃ গভর্নমেণ্ট ও জমিদারের সুবিধা হইল। গভর্নমেণ্ট একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের রাজস্ব বার্ষিক পাওয়ার অধিকারী হইলেন। জমিদার জমির মালিকরূপে গণ্য হইলেন এবং তাঁহার দেয় রাজস্বের পরিমাণ চিরকালের জন্য নির্দ্ধারিত হইল। এই বন্দোবস্তের ফলে গভর্নমেণ্টের যেমন স্থায়ী রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়া গভর্নমেণ্টের সুবিধা হইয়াছে এবং একদল রাজভক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে অপরদিকে জমিদারগণের দেয় রাজস্ব চিরদিনের জন্য নির্দ্ধারিত হওয়ায় গভর্নমেণ্টের আয়ের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। ফলে গভর্নমেণ্টের ক্রম বর্দ্ধমান ব্যয় মিটাইবার জন্য প্রজার উপর বিভিন্ন প্রকারের কর স্থাপন করিতে হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্যতম প্রধান ত্রুটী ছিল প্রজার স্বার্থ সম্বন্ধে অবহিত না হওয়া। জমিদার স্বেচ্ছামত প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করা বা জমি হইতে প্রজাকে উৎখাত করার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ফলে প্রজাদের দুঃখদুর্দশার আর পরিসীমা ছিল না। জমিদারদের এই অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে রক্ষার জন্য পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করিতে হইয়াছিল।)

(**তৃতীয় ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধ ১৭৯০—৯২ :**—লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। পিটের ইণ্ডিয়া এ্যাক্টে নির্দেশ ছিল কোম্পানী ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তার করিবে না বা আত্মরক্ষা ব্যতীত দেশীয় নরপতিদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হইবে না। প্রথম কয়েক বৎসর কর্নওয়ালিস যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে বিরত থাকিলেও শেষ পর্য্যন্ত তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধে টিপুর শক্তি একেবারে খর্ব হয় নাই। ইংরেজরা গোপনে তাহাকে শত্রু বলিয়া গণ্য করিত। কর্নওয়ালিস কোম্পানীর মিত্র নিজামের নিকট এক পত্রে ইংরেজদের মিত্রগণের যে তালিকা দিয়াছিলেন তাহাতে টিপু সুলতানের নাম ছিল না। সুতরাং টিপু

টিপু সুলতান

ইংরেজদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সান্দহান হইয়া ইংরেজদের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ অনিবার্য্য

ইহা উপলব্ধি করিলেন। টিপু ফরাসীদের সাহায্য প্রার্থী হইয়া ফ্রান্সে ও কনষ্টান্টিনোপলে দূতও প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই ভাবে উভয় পক্ষের মধ্যে যখন সন্দেহ ও অবিশ্বাসের পাল্লা চলিতেছিল তখন টিপু সুলতান ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদের মিত্র ও আশ্রিত ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করিলে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। টিপু সুলতানের শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত নিজাম ও মারাঠারা টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষে যোগদান করিল। দুই বৎসর কাল টিপু একাকী সম্মিলিত তিনটি শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া গেলেন। অবশেষে স্বয়ং কর্নওয়ালিসের নেতৃত্বে মিত্রবাহিনী টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম অবরোধ করিলে টিপু বাধ্য হইয়া ইংরেজদের সঙ্গে শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন (১৭৯২)। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে টিপুকে স্বরাজ্যের অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগ করিতে হইল। এতদ্ব্যতীত ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তিনি তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত

যুদ্ধের কারণ
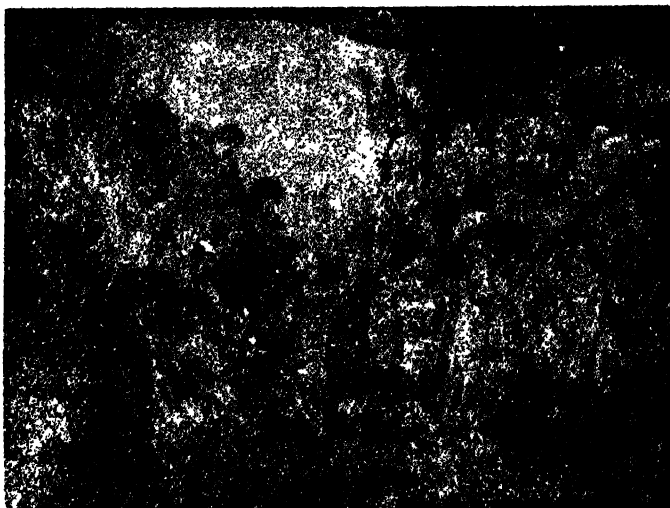
ক্ষতিপূরণের জামিনস্বরূপ টিপুর দুই পুত্রকে ইংরেজদের নিকট প্রদান

হইলেন। ক্ষতিপূরণের জামিন স্বরূপ টিপুর দুই পুত্রকে ইংরেজদের নিকট পাঠাইতে হইল। টিপুর প্রদত্ত রাজ্যাংশ নিজাম ও মারাঠারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল। ইংরেজরা মালাবার, দিন্দিগাল ও বড়মহল গ্রহণ করিলেন এবং কুর্গের রাজার উপর তাঁহাদের আধিপত্য স্থাপিত হইল।

চার্টার এ্যাক্ট ১৭৯৩ :—১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে কুড়ি বৎসরের জন্য কোম্পানীকে ভারতে একচ্ছত্র বাণিজ্য করার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে এই মেয়াদ শেষ হইলে পুনরায় কোম্পানী যাহাতে এই একচেটিয়া অধিকার না পায়, তজ্জন্য ইংলণ্ডের বণিক সম্প্রদায় আন্দোলন আরম্ভ করে। ইহাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও কর্নওয়ালিসের সমর্থনে কোম্পানীর সনদ আরও কুড়ি বৎসর বর্দ্ধিত করা হইল। কোম্পানীর কার্য্য সুপরিচালনার জন্য বোর্ড অফ্ কন্ট্রোলের সভ্যগণের বেতন নির্দ্ধারিত হইল। ভারতে গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিয়া সর্বভারতীয় হইল। বোম্বাই ও মাদ্রাজের গভর্নরের ক্ষমতা বাংলার গভর্নরের অধীন করা হইল।

স্যার জন শোর (১৭৯৩-৯৮) :—লর্ড কর্ণওয়ালিসের পরে কলিকাতা কাউন্সিলের অন্যতম প্রবীণ সদস্য স্যার জন শোর গভর্নর জেনারেলের পদে নির্বাচিত হইলেন। রাজস্ব শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব-অভিজ্ঞতা যথেষ্ট ছিল। পিটের ভারত শাসন আইন অনুসারে তিনি নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করিয়া দেশীয় রাজ্যসমূহের পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইহাই স্যার জন শোরের ঔদাসীন্য বা নিরপেক্ষতামূলক নীতি (Policy of Non-Intervention) নামে খ্যাত। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে মারাঠারা নিজামের রাজ্য আক্রমণ করিলে তিনি নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করিয়া নিজামকে সাহায্য দান হইতে বিরত হইলেন। ফলে খর্দ্দার যুদ্ধে মারাঠাদের হস্তে নিজাম পরাজিত হইলেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তিনি এই নিরপেক্ষতার নীতি মানিয়া চলেন নাই। অযোধ্যার নবাব আসফ-উদ্‌দৌলার মৃত্যু হইলে তিনি নবাবের মনোনীত ওয়াজির আলির পরিবর্তে তাঁহার ভ্রাতা সাদৎ আলিকে নবাব বলিয়া স্বীকার করেন এবং বিনিময়ে ইংরেজরা এলাহাবাদ লাভ করেন। স্যার জন শোরের এই নিরপেক্ষ নীতির ফলে ভারতে বৃটিশের সম্ভ্রম প্রতিপত্তি অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়।

নিরপেক্ষ নীতি

ফল ক্ষতিকর

লর্ড ওয়েলেসলী (১৭৯৮—১৮০৫) :—স্যার জন শোরের পরে লর্ড ওয়েলেসলী আর্ল অফ্ মর্নিংটন ভারতের গভর্নর জেনারেল হইয়া আসেন। ওয়েলেসলী যখন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন বৃটিশের রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি বহুল পরিমাণে ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। স্যার জন শোরের ঔদাসীন্য নীতির জন্যই কোম্পানীর মর্যাদা সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। এই

ওয়েলেসলী আগমনের প্রাকালে বৃটিশ শক্তির দুরবস্থা

সময়ে ফরাসীবীর নেপোলিয়নের দিগ্বিজয়ে এবং তাঁহার ভারত বিজয়ের পরিকল্পনায় ইংলণ্ডে ও ভারতে ইংরেজগণ সন্ত্রস্ত। ইংরেজদের বৈরী টিপু সুলতান ঘোরতম ইংরেজ বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ফরাসীদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। পেশোয়া, নিজাম, সিন্ধিয়া, হোলকার প্রভৃতি দেশীয় রাজগণ ফরাসী সেনানায়কের সাহায্যে সৈন্যদল শিক্ষিত করিয়া লইতেছিলেন। সর্বোপরি কাবুলের জামান শাহের ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল। নেপোলিয়ন ভারত হইতে বৃটিশ প্রতিপত্তি লুপ্ত করার জন্য ইজিপ্ট অভিযানের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। ইংরেজদের আর্থিক অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল।

লর্ড ওয়েলেসলী

এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতে বৃটিশ শক্তিকে উদ্ধার করিয়া ভারতবর্ষে বৃটিশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করাই ওয়েলেসলীর উদ্দেশ্য ছিল। দেশীয় রাজ্যগুলিতেও বৃটিশ প্রভাব ও প্রাধান্য নিষ্কণ্টক করা তাঁহার শাসননীতির মূল লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে লর্ড ওয়েলেসলী স্যার জন শোরের ঔদাসীন্য নীতি পরিত্যাগ করিয়া অধীনতামূলক মিত্রতা নামে এক সক্রিয় রাষ্ট্রনীতির প্রবর্তন করিলেন।

অধীনতামূলক মিত্রতা

যে সকল দেশীয় নরপতি অধীনতামূলক মৈত্রীবদ্ধ হইবেন তাহাদিগকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করার দায়িত্ব ইংরেজরা গ্রহণ করিবেন। ইহার বিনিময়ে আশ্রিত নৃপতিকে নিজ ব্যয়ে রাজ্যমধ্যে একদল ইংরেজ সৈন্য রাখিতে হইবে; এই সৈন্যদলের ব্যয় নির্বাহার্থ বড় রাজ্যগুলিকে রাজ্যের একাংশ ইংরেজদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজ্যকে বাৎসরিক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে হইবে। কোম্পানীর অনুমতি ব্যতীত আশ্রিত নৃপতি কোন বিদেশীকে নিজ রাজ্যে চাকুরী দিতে পারিবেন না বা কোনও বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি বিগ্রহ করিতে পারিবেন না। এই নীতি অনুসারে মৈত্রীবদ্ধ হইলে দেশীয় রাজন্যবর্গকে স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিতে হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

শর্তসমূহ

ভারতের দুর্বলতম শক্তি নিজাম সর্বপ্রথম এই অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ

হইলেন। বিনিময়ে নিজামকে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণস্থ অঞ্চল কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করিতে হইল। অতঃপর অযোধ্যার নবাব কোম্পানীর সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হইয়া গোরক্ষপুর, রোহিলখণ্ড ও দোয়াবের একাংশ কোম্পানীকে প্রদান করিলেন। ওয়েলেসলী বহুবার মারাঠাদিগকে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু মারাঠানায়ক নানা ফাড়নবিশের জীবিতকালে মারাঠারা এই আহ্বানে সাড়া দেয় নাই। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফাড়নবিশের মৃত্যু হইলে মারাঠাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় এবং পশ্চাৎ পেশোয়া পুনরায় গদিলাভের প্রত্যাশায় ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বেসিনের সন্ধিসূত্রে বৃটিশের অধীনস্থ মিত্র হইলেন।

চতুর্থ ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধ ১৭৯৯ :—টিপু সুলতান অপরাপর ভারতীয় নরপতির ন্যায় বৃটিশের আনুগত্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বরঞ্চ তিনি ইংরেজদের সঙ্গে পুনরায় শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি ইংরেজদের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধে মিত্রতা কামনা করিয়া আরব, কাবুল, তুরস্ক, ভার্সাই ও মৌরিটিয়াসে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে মৈত্রীর প্রতীক হিসাবে তিনি তাঁহার সৈন্যদলভুক্ত কয়েকজন ফরাসীকে শ্রীরঙ্গপত্তমে 'স্বাধীনতা বৃক্ষ' রোপণ করার অনুমতি দিয়াছিলেন। এমন কি তিনি বিপ্লবী ফ্রান্সের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'জ্যাকোবিন ক্লাবের' সদস্যও হইয়াছিলেন।

টিপু সুলতানের এই বিরোধী মনোভাব ওয়েলেসলী সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ওয়েলেসলী নিজামকে টিপুর বিরুদ্ধে দলভুক্ত করিলেন এবং মারাঠাদেরও সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মারাঠারা অবশ্য এই অনুরোধে আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। টিপু বৃটিশের আনুগত্য স্বীকার করিলেই রক্ষা পাইতেন কিন্তু তিনি স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইলেন না। মালভেলী, কুর্গ ও শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধে টিপু পরাজিত হইলেন। তাঁহার রাজধানী অবরুদ্ধ হইল। রাজধানী রক্ষার জন্য বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিয়া টিপু প্রাণত্যাগ করিলেন। এইরূপে স্বাধীন মহীশূর রাজ্যের পতন হইল। টিপুর রাজ্যকে তিন অংশে বিভক্ত করা হইল। মহীশূর রাজ্যে পশ্চিম অংশ ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হইল, হায়দ্রাবাদের সন্নিহিত অংশ নিজাম পাইলেন এবং অবশিষ্ট অংশ হায়দার আলির পূর্বে যে হিন্দু রাজবংশ মহীশূরে রাজত্ব করিত তাঁহাদের জনৈক বংশধরকে দেওয়া হইল। এই নূতন হিন্দু নরপতি সর্বাংশে ইংরেজদের অধীন রহিলেন।

টিপু সুলতানের চরিত্র ও কৃতিত্ব বিচার :—টিপু সুলতান ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি। নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়া তিনি

নিষ্কলুষ এবং সমকালীন কলুষিত আবহাওয়ার ঊর্দ্ধে ছিলেন। শিক্ষার দিক দিয়াও তিনি অনগ্রসর ছিলেন না—অনর্গলভাবে ফার্সী, কানাড়ী এবং উর্দ্দু ভাষায় বাক্যালাপ করিতে পারিতেন। তিনি নির্ভীক সৈনিক ও কুশলী সেনাপতি ছিলেন। কূটনীতিতেও তিনি পশ্চাৎপদ ছিলেন না। ইংরেজরাই তাঁহার একমাত্র শত্রু এই সত্য উপলব্ধি করিয়া শত্রুকে হীনবল করার জন্য শত্রুর বিপক্ষ ফ্রান্সের সাহায্যকামী হইয়াছিলেন। সেই যুগে সুদূর ইউরোপের দুইটি শক্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের মাত্রা উপলব্ধি করিয়া কূটনৈতিক কার্য্যক্রম স্থির করার মধ্যে টিপুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। টিপু স্বাধীনতাকে অন্য কিছুর বিনিময়ে খর্ব করিতে প্রস্তুত হন নাই বলিয়া তাহাকে প্রাণ বিসর্জন করিতে হইয়াছে।

উন্নত চরিত্র

কূটনৈতিক

বহু প্রাচীন ও আধুনিক ঐতিহাসিক টিপুকে নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, উদ্ধত, ধর্মান্ধ ও অনুদার বলিয়া মনে করেন। মাঝে মাঝে উগ্রপ্রকৃতির পরিচয় দিলেও এই উগ্রতা শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যতীত প্রযুক্ত হয় নাই। তিনি স্বভাবনির্দয় প্রকৃতির লোক ছিলেন না। টিপুর 'স্বদেরী পত্রাবলী' হইতেই প্রমাণিত হয় যে টিপু ধর্ম সম্বন্ধে অনুদার ছিলেন না হিন্দুদের শ্রদ্ধা অর্জনের প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল। গোঁড়া মুসলমান হইলেও তিনি পাইকারীভাবে হিন্দুদিগকে ধর্মান্তরিত করণের চেষ্টা করেন নাই। যে সমস্ত হিন্দুর আনুগত্যের উপর তিনি আস্থাশীল ছিলেন না কেবল তাহাদিগকে ধর্মান্তরিত হইতে বাধ্য করিতেন। পিতা হায়দার আলির সঙ্গে এক বিষয়ে তাঁহার পার্থক্য ছিল—রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি পিতার অপেক্ষা কম দূরদর্শিতা ও বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। সংস্কারের নামে অনেক সময়ই তিনি অনাবশ্যক পরিবর্ত্তন সাধনে ব্যস্ত হইতেন। কতকটা উদ্ধত প্রকৃতির ছিলেন বলিয়া পরাজয় স্বীকার করা তাহার নিকট অসহ্যবোধ হইত। তজ্জন্য স্বাধীনতা ত্যাগের পরিবর্ত্তে জীবন বিসর্জনই তিনি শ্রেয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ভারতের অন্য কোন নরপতি টিপুর মত পূর্বাপর ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যান নাই।

অতিরঞ্জিত বিরুদ্ধ সমালোচনা

ধর্মীয় উদারতা

স্বদেশপ্রেম ও ত্রুটি

মারাঠাশক্তি ও ওয়েলেসলী—১৭৮২ খৃষ্টাব্দে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পরে মারাঠাগণ পুনরায় রাজ্যবিস্তারের মনোনিবেশ করে। মারাঠা শক্তির কেন্দ্রস্থল পুনায় দ্বিতীয় মাধবরাও পেশোয়া থাকিলেও নানা ফাড়নবিশই ছিলেন মারাঠা সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা। তিনি টিপুসুলতানের বিরুদ্ধে তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধে যোগদান করিয়া মহীশূর

রাজ্যের কিয়দংশ লাভ করেন। নানা ফাড়নবিশের কৌশলে সিন্ধিয়া, হোলকার ও অন্যান্য মারাঠা শক্তি নিজামকে আক্রমণ করিয়া খর্দ্দার যুদ্ধে নিজামকে পরাজিত করিল এবং নিজামের নিকট হইতে তাঁহার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ও প্রচুর অর্থ আদায় করিল। এইভাবে পুনরায় পেশোয়া মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন। কিন্তু মারাঠাদের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব মোটেই ছিল না। এবং পেশোয়া মারাঠা সাম্রাজ্যের নায়ক হইলেও বেরারের ভোঁসলা ও বরোদার গাইগোয়াড পুনা দরবারের নির্দ্দেশ মানিতেন না। এই সময়ে মারাঠাদের মধ্যে ইন্দোরের মলহর রাও হোলাকারের বিধবা পুত্রবধূ অহল্যাবাঈ ও মহাদজী সিন্ধিয়ার মত কয়েকজন অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নায়কের উপস্থিতিতে মারাঠা শক্তি বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অহল্যাবাঈ বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে ২৮ বৎসরকাল (১৭৬৭-৯৫) ইন্দোর রাজ্য শাসন করেন। তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ্য-বিস্তারের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া প্রজাকল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু মারাঠা নায়কগণের মধ্যে মহাদজী সিন্ধিয়া ছিলেন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। মহাদজী সিন্ধিয়া তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি পেশোয়া প্রথম মাধব রাওয়ের সময়ে উত্তর ভারতে মারাঠা বাহিনীর অন্যতম নায়ক ছিলেন। তাঁহার মধ্যস্থতায় প্রথম মারাঠা যুদ্ধের অবসানে সলবাই-এর সন্ধি হয়। মহাদজী সুকৌশলী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি মারাঠাদের পুরাতন যুদ্ধ পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় সেনানীদের সাহায্যে নিজের সৈন্যদলকে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। বয়েন নামক একজন ইটালিয়ান তাঁহার সৈন্যদলের সামরিক শিক্ষক ছিলেন। পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষিত সৈন্যদলের সাহায্যে তিনি বহুবার রাজপুত মুসলমান ও মারাঠা প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে হস্ত-ক্রীড়নক করিয়া উত্তর ভারতে স্বীয় প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তৃত করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে মহাদজী রাজপুত জাঠদিগকে পদানত করিয়া উত্তর ভারতে সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত হইলেন। হোলকারের সঙ্গে মহাদজী সিন্ধিয়ার শত্রুতা ছিল। এই সময়ে নানা ফাড়নবিশ পেশোয়ার অভিভাবকরূপে পুনার দরবারে সর্বেসর্বা ছিলেন।

নানা ফাড়নবিশ

অহল্যাবাঈ

মহাদজী সিন্ধিয়া

উচ্চাভিলাষী মহাদজী সিন্ধিয়া নানা ফাড়নবিশের ক্ষমতা খর্ব করিয়া পেশোয়ার উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তারের জন্য পুণার দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে প্রতিবেশী ও প্রতিদ্বন্দ্বী তুকোজী হোলকার সিন্ধিয়ার আধিপত্য খর্ব করার জন্য অগ্রসর হইলেন, কিন্তু তিনি বয়েনের নেতৃত্বে সিন্ধিয়ার সুশিক্ষিত সৈন্যদলের হস্তে লাখেরীর যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে অকস্মাৎ মহাদজী সিন্ধিয়ার মৃত্যু হইলে তাঁহার ত্রয়োদশ বর্ষীয় দত্তক পুত্র দৌলতরাও সিন্ধিয়া তাঁহার বিশাল রাজ্য লাভ করেন।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ—(১৮০৩ খ্রঃ) ওয়েলেসলীর শাসনকালে মারাঠা শক্তি নানা কারণে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে পেশোয়া দ্বিতীয় মাধব রাও নারায়ণের মৃত্যু হয় এবং রঘুনাথের পুত্র দ্বিতীয় বাজীরাও পেশোয়ার পদ অধিকার করেন। দ্বিতীয় বাজিরাও যেমন দুষ্ট তেমনি দুর্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নানা ফাড়নবিশের মৃত্যু হয়। মহাদজী সিন্ধিয়া, অহল্যাবাঈ, নানা ফাড়নবিশ প্রভৃতি বিচক্ষণ মারাঠা নায়কদের মৃত্যুর ফলে মারাঠাদের মধ্যে আত্মঘাতী গৃহবিবাদের সূত্রপাত হয়। দৌলৎ রাও সিন্ধিয়া ও যশোবন্ত রাও হোলকার পেশোয়ার দরবারে প্রতিপত্তিলাভের জন্য আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইল। কাপুরুষ বাজিরাও প্রথমে সিন্ধিয়ার প্রভুত্ব স্বীকার করিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে পুনার যুদ্ধে যশোবন্ত রাও হোলকার সিন্ধিয়া এবং পেশোয়া বাজিরাওকে পরাজিত করিলেন। পরাজিত পেশোয়া অগত্যা পলায়ন করিয়া বেসিনের সন্ধিসূত্রে ইংরেজদের সঙ্গে অধীনতামূলক সূত্রে মৈত্রীবদ্ধ হইলেন। এদিকে যশোবন্ত রাও হোলকার দ্বিতীয় বাজিরাও-এর ভ্রাতা অমৃতরাওকে পেশোয়ার পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বেসিনের সন্ধির পরেই একদল ইংরেজ সৈন্য পুনায় যাইয়া বাজিরাওকে পুনায় পেশোয়ার পদে প্রতিষ্ঠিত করিল। রক্ষণের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে মারাঠা জাতির নায়ক ইংরাজদের নিকট স্বাধীনতা বিক্রয় করিলেন। পেশোয়ার এই শোচনীয় অধঃ-পতনে সিন্ধিয়া, ভোঁসলা ও হোলকার তাঁহাদের স্বাধীনতা বিপন্ন বুঝিতে পারিলেও, এই জাতীয় সঙ্কটে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিল না।

মারাঠাদের মধ্যে অনৈক্য

পেশোয়াও তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনুতপ্ত হইয়া নিজের ভ্রম স্বীকার করিলেন এবং গোপনে তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা যুগ্মভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধে রণে অবতীর্ণ হইলেন। হোলকার নিরপেক্ষ রহিলেন। অবশ্য বরোদার গাইকোয়াড় ইংরেজদের বিপক্ষে মারাঠাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন না। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার সৈন্যদল নিজাম রাজ্যের সন্নিহিত হইলে তাঁহাদের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

দাক্ষিণাত্য ও উত্তরাপথ এই যুদ্ধের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। ইংরেজপক্ষে লর্ড ওয়েলেসলীর ভ্রাতা আর্থার ওয়েলেসলী (পরে নেপোলিয়ন বিজয়ী ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন নামে খ্যাত) ও লর্ড লেক মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে লাগিলেন। আর্থার ওয়েলেসলী সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার সম্মিলিত বাহিনীকে আসাইয়ের যুদ্ধে (১৮০৩) সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। দুই মাস পরে পুনরায় ভোঁসলার বাহিনী আরগাঁওয়ের যুদ্ধে পরাজিত হইলে ইংরেজরা বিখ্যাত গোয়ালিয়র দুর্গ দখল করেন। ইতিমধ্যে উত্তর ভারতে দিল্লী ও আগ্রা সিন্ধিয়ার হস্তচ্যুত হইল। সিন্ধিয়ার সৈন্যদল একবার দিল্লীতে ও পুনরায় লাসোয়ারীর যুদ্ধে লর্ড লেকের হস্তে পরাজিত হইল। যুদ্ধারম্ভের পাঁচ মাসের মধ্যে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা পরাজয় স্বীকার করিয়া দুইটি বিভিন্ন সন্ধিতে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। দেওগাঁওয়ের সন্ধিতে ভোঁসলা ইংরেজের হস্তে উড়িষ্যা সমর্পণ করিয়া অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হইলেন। সিন্ধিয়াও ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করিয়া সুরজি অঞ্জনগাঁও-এর সন্ধি করিলেন। এই সন্ধি অনুযায়ী সিন্ধিয়া গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী সমস্ত অঞ্চল ইংরেজদের হস্তে অর্পণ করিলেন।

আসাই যুদ্ধ

আরগাঁও

লাসোয়ারী

দেওগাঁও-এর সন্ধি

সুরজি অঞ্জনগাঁওয়ের সন্ধি

এই দুইটি সন্ধির ফলে ভারতবর্ষে ইংরেজের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অনেকটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। অতঃপর মাদ্রাজ ও বাঙ্গালার বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে সংযোগসূত্র স্থাপিত হইল এবং রাজপুতনার জয়পুর, যোধপুর, বুঁদি ও ভরতপুরের জাঠ রাজার সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হইল। ফরাসী সেনানায়কের দ্বারা শিক্ষিত সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। নিজাম ও পেশোয়া পূর্বাপেক্ষা ইংরেজদের অধিকতর অনুগত হইলেন।

ফলাফল

যশোবন্ত রাও হোলকার এতকাল নিরপেক্ষ থাকিয়া যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। পরে তিনি নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার পরাজয়ের পরে ইংরেজের বিরুদ্ধে রণে অবতীর্ণ হইলেন (১৮০৪)। যুদ্ধের প্রথমদিকে হোলকার ইংরেজ সেনাপতি মনসনকে পরাজিত করিয়া দিল্লী অবরোধ করিলেন। অল্পকাল পরে ইংরেজ সেনাপতি লেকের হস্তে দীগের যুদ্ধে পরাজিত হইলেন এবং ভরতপুরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সেনাপতি লেক ভরতপুরের দুর্গ অবরোধ করিয়া অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও ভরতপুর

হোলকার রণে অবতীর্ণ

অধিকার করিতে পারিলেন না। অবশেষে ভরতপুরের অধিপতি ক্ষতিপূরণ বাবদ কুড়ি লক্ষ টাকা পাইয়া ইংরেজদের সহিত সন্ধি করিলেন। ইতিমধ্যে লর্ড ওয়েলেসলী ইংলণ্ডে চলিয়া গেলে নূতন গভর্ণর জেনারেল স্যার জর্জ বার্লো নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করাতে হোলকার তাঁহার হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইলেন এবং হোলকার ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করিলেন।

ওয়েলেসলী কর্তৃক অন্যান্য রাজ্য অধিকার—লর্ড ওয়েলেসলী মাত্র মহীশূর ও মারাঠাগণের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করেন নাই, তিনি বিনা যুদ্ধে ভারতের কয়েকটি অঞ্চলকে ইংরেজের সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল ইংরেজের অধীনে আসিলে ভারতবাসীর প্রকৃত কল্যাণ হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে কোনও উপায়ে ভারতে বৃটিশের সাম্রাজ্য বিস্তারই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সুরাট ও তাঞ্জোরের নরপতিকে বার্ষিক বৃত্তি দিয়া ঐ দুইটি রাজ্য বৃটিশের অধিকারভুক্ত করেন। ইহার দুই বৎসর বাদে কর্ণাটের নবাবকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে রাজ্যচ্যুত করেন। অযোধ্যার নবাব সাদৎ আলির বিরুদ্ধে কুশাসনের অভিযোগ আনয়ন করিয়া ওয়েলেসলী অযোধ্যার এক বৃহৎ অংশ গোরক্ষপুর এবং রোহিলখণ্ড সহ গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অংশ ইংরেজ রাজ্যভুক্ত করেন।

লর্ড ওয়েলসলীর কৃতিত্ব—ওয়েসলী ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বৃটিশ শাসকদের অন্যতম। কেবলমাত্র ক্লাইভ, ওয়ারেন হেষ্টিংস ও ডালহৌসীই তাঁহার সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারেন, কিন্তু বাস্তব কার্য্যকারিতায় তিনি ইঁহাদিগকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। ওয়েলেসলী যে সময়ে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন ভারতে বৃটিশ শক্তি অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ববর্ত্তী গভর্ণর জেনারেল স্যার জন শোরের নিরপেক্ষ নীতির ফলে ভারতে বৃটিশ মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। অধিকন্তু সেই সময়ে ইউরোপে ইংরেজ-ফরাসী বিরোধ থাকায় ভারতবর্ষেও ফরাসীরা ইংরেজদের প্রতিপত্তি খর্ব করিয়া স্থানে স্থানে ফরাসী প্রভাব বিস্তার করার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। সিন্ধিয়া, হোলকার, নিজাম ইহাদের সকলেরই ফরাসী সেনানায়ক পরিচালিত শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী ছিল এবং মহীশূরের টিপু সুলতানও ফরাসী শক্তিকে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ইংরেজশক্তি বিতাড়ন করার জন্য উৎসাহিত করিতেছিলেন। ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যে ফরাসী প্রভাব বিনষ্ট করিয়া সর্বত্র বৃটিশের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য ওয়েলেসলী উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু স্যার জন শোরের নিরপেক্ষ নীতির দ্বারা ইহা সম্ভবপর ছিল না। ওয়েলেসলী অধীনতামূলক নীতির প্রবর্তন করিয়া সাম্রাজ্যবাদী কার্য্যক্রম অনুসরণ

করিলেন। মাত্র সাত বৎসর কার্যকালের মধ্যে ওয়েলেসলীর অনুসৃত নীতি বৃটিশকে ভারতের প্রধানতম শক্তিতে পরিণত করিল। তিনি মহীশূরের ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিলেন, হায়দ্রাবাদ ও অযোধ্যার উপর বৃটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাঞ্জোরে, সুরাটে ও কর্ণাটে বৃটিশের কর্তৃত্ব স্থাপন করিলেন, পেশোয়া, সিন্ধিয়া, ও ভোঁসলাকে বৃটিশের আনুগত্য গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন, দিল্লীর বাদশাহের উপর সিন্ধিয়ার প্রভাব দূর করিলেন এবং অসময়ে পদত্যাগ করিতে না হইলে তিনি হোলকারকেও কোম্পানীর বশীভূত করিতে পারিতেন। বৃটিশ স্বার্থ ও সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে তাঁহার কার্যাবলী যে কৃতিত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ওয়েলেসলী মাত্র ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার করেন নাই, দেশীয় রাজ্যগুলিকে বৃটিশের মুখাপেক্ষী করিয়া ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে বৃটিশের অধিকতর আধিপত্য প্রসারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। মোট কথা, ওয়েলেসলী বৃটিশ শক্তিকে ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করিয়াছিলেন এবং বৃটিশ প্রভুত্ব সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস (দ্বিতীয়বার—১৮০৫ ও স্যার জর্জ্জ (বার্লো। ১৮০৫—৭) —লর্ড ওয়েলেসলীর যুদ্ধবিগ্রহাদির ফলে কোম্পানী যথেষ্ট ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং কোম্পানী পুনরায় নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করিল এবং লর্ড ওয়েলেসলী পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলেন। কর্ণওয়ালিশ ভারতে আসিয়া হোলকার ও সিন্ধিয়ার সহিত মিত্রতা করিলেন এবং সিন্ধিয়াকে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ পরিলেন। কার্যভার গ্রহণের তিনমাস পরে গাজিপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অতঃপর কাউন্সিলে অন্যতম সদস্য স্যার জর্জ বার্লো অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার শাসনকালে অন্যতম ঘটনা কর্ণাটের অন্তর্গত ভেলোর দুর্গের সিপাহীদের বিদ্রোহ। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ আর্কট হইতে সৈন্য আনয়ন করিয়া অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সহিত এই বিদ্রোহ দমন করিল। জর্জ বার্লোর সময়েই হোলকার ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া নিজ রাজ্য ফিরিয়া পান।

লর্ড মিন্টো (১৮০৭—১৩)—লর্ড মিন্টো ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলেন। তিনি বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি ছিলেন, সুতরাং ভারতে কোম্পানীর শাসন ব্যাপারে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি ওয়েলেসলীর ন্যায় যুদ্ধকামী ছিলেন না, তবে বৃটিশের স্বার্থরক্ষার জন্য শান্তনীতি পরিত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।

লর্ড মিন্টোর শাসনকালে ইউরোপে নেপোলিয়নের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল এবং নেপোলিয়ন পারস্যের সুলতানকে ভারতের ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেন। মিণ্টো স্যার ম্যালকমকে পারস্যের দরবারে প্রেরণ করিয়া নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করার চেষ্টা করেন। এতদ্ব্যতীত মিণ্টো এলফিনষ্টোনকে দূতরূপে আফগানিস্তানের আমীর শাহ সুজার দরবারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শাহ সুজা সিংহাসনচ্যুত হওয়ায় এলফিনষ্টোন কাবুলের দরবারে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এই সময়ে ইউরোপে নেপোলিয়নের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ চলিতেছিল। মিণ্টো ভারতবর্ষ হইতে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়া ভারত মহাসাগর স্থিত বুর্বোঁ দ্বীপ, বুর্বোঁ দ্বীপ ও মরিসাস দ্বীপ দখল করিলেন। ফলে ভারত মহাসাগর হইতে ফরাসী প্রভাব বিলুপ্ত হইল। এই সময়ে হল্যাণ্ড নেপোলিয়নের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল। সেইজন্য মিণ্টো হল্যাণ্ডের দক্ষিণ প্রাচ্য এশিয়াস্থ উপনিবেশ যবদ্বীপের রাজধানী বাটাভিয়া ১৮১১ সালে অধিকার করেন।

ভারত মহাসাগর ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ফরাসী প্রতিপত্তির লোপ

লর্ড মিণ্টো ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে অমৃতসরের সন্ধির দ্বারা শিখ সর্দার রণজিৎ সিংহের অগ্রগতি শতদ্রু নদীর উত্তর তীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন। মিণ্টোর দূত মেটকাফের কৃতিত্বের ফলেই এই সন্ধি সম্পাদিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মিণ্টো রাজপুতনায় অজয়গড় এবং কালিঞ্জর দুর্গ অধিকার করিয়া বুন্দেলখণ্ডে ইংরাজ প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁহার সময়ে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের নায়ারগণ বিদ্রোহী হইয়া কয়েকজন ইংরেজ হত্যা করে। অবশ্য অত্যাচারের দ্বারা নায়ারদের বিদ্রোহ দমন করা হয়।

রণজিৎ সিংহের সহিত অমৃতসরের সন্ধি ১৮০৯

লর্ড ময়রা (মার্কুইস অফ্ হেষ্টিংস্) (১৮১৩—২৩):—লর্ড মিণ্টোর পরে লর্ড ময়রা ভারতে গভর্ণর জেনারেল হন। তিনি পরে মার্কুইস অফ্ হেষ্টিংস উপাধি লাভ করার জন্য লর্ড হেষ্টিংস নামেও পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার দশ বৎসর শাসনকালের মধ্যে তিনি লর্ড ওয়েলেসলীর ন্যায় সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণ করিয়া ভারতে বৃটিশের আধিপত্য বিস্তৃততর করেন। তাঁহার শাসনকালের কার্য্যাবলীর মধ্যে পিণ্ডারী দস্যু দমন, নেপাল যুদ্ধ পরিচালনা, রাজপুত রাজ্যসমূহকে মিত্রশক্তিতে পরিণত করা মারাঠা শক্তি বিলোপ, সিঙ্গাপুরে বৃটিশের ক্ষমতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

লর্ড ময়রা মধ্য ভারত ও রাজপুতানা অঞ্চলের পিণ্ডারী নামক দস্যুদলকে দমন করেন। এই দস্যুদল তীর্থযাত্রী বা পথিকদের সঙ্গে মিশিয়া সুযোগ মত তাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিত বা অসুবিধা হইলে হত্যা করিত। পিণ্ডারী সর্দারগণ তাঁহাদের
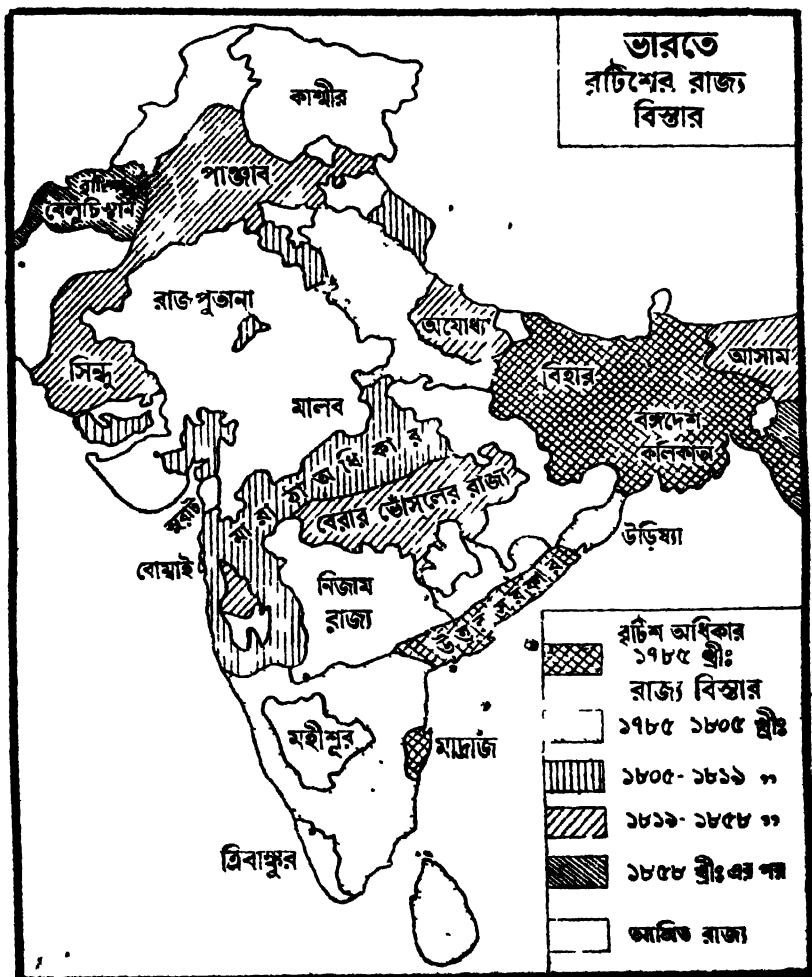
ভারতে বৃটিশের রাজ্য বিস্তার

কার্যকলাপে মহারাষ্ট্র ও রাজপুতনার দেশীয় নরপতি অথবা জমিদারের সমর্থন লাভ করিত। ১৮১২—১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পিণ্ডারীরা ইংরেজাধিকৃত অঞ্চলে হানা দিতে আরম্ভ করিলে, লর্ড হেস্টিংস ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য নিযুক্ত করিয়া পিণ্ডারীদের দমন করিতে অগ্রসর হইলেন। আট মাসের মধ্যে পিণ্ডারী দল নির্মূল হইয়া গেল। পিণ্ডারী নেতাদের মধ্যে ওয়াসিল মহম্মদ ধৃত হইল, চিতু মধ্যভারতের জঙ্গলে ব্যাঘ্র হস্তে নিহত হইল এবং আমির খাঁ বৃটিশের অধীনে টঙ্কের নবাবী পদ লাভ করিল।

পিণ্ডারী দস্যু দমন

লর্ড ময়রার সময়ে (১৮১৪—১৬) খৃষ্টাব্দে নেপালের গুর্খাদের সঙ্গেও যুদ্ধ হয়। গুর্খা নায়ক পৃথ্বী নারায়ণ ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে নেপালী উপত্যকা ও কাটামুণ্ড অধিকার করিয়া নেপালে রাজ্য স্থাপন করেন। ক্রমশঃ নেপালের রাজ্য সীমা বৃটিশ ভারতের উত্তর সীমান্তরেখার সহিত মিলিত হয় এবং সীমানা লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড ময়রা গুর্খাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে গুর্খারা পরাজিত হইয়া সগৌলির সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। সগৌলির সন্ধি অনুসারে গুর্খাগণ তরাই অঞ্চলের উপর দাবি পরিত্যাগ করিল, নেপালের পশ্চিমাঞ্চলের গাড়োয়াল ও কুমায়ুন জেলা ইংরেজের হস্তে অর্পণ করিল এবং কাটামুণ্ডুতে একজন বৃটিশ রেসিডেন্ট রাখিতে সম্মত হইল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এক সন্ধিতে সিকিমকে নেপাল প্রদত্ত একটি অঞ্চল অর্পণ করা হইল। এই ব্যবস্থার ফলে ভারতের পূর্ব সীমান্ত কতকটা সুরক্ষিত হইল।

ইঙ্গ-গুর্খা যুদ্ধ ১৮১৪—১৬

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ও মারাঠা শক্তির পতন :—পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বেসিনের সন্ধির দ্বারা বৃটিশের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই। সন্ধি সম্পাদনের পরে নিজের ভুল বুঝিয়া পেশোয়া গোপনে অপরাপর মারাঠা সর্দারদের সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। লর্ড ময়রা পেশোয়ার ক্ষমতা অধিকতর সঙ্কুচিত করার উদ্দেশ্যে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে পুনার সন্ধিতে পেশোয়াকে মারাঠাদের নেতৃত্বপদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করাইলেন। পেশোয়াকে ইংরেজের হস্তে কোঙ্কন ও আর কয়েকটি দুর্গ ছাড়িয়া দিতে হইল। পেশোয়ার ক্ষমতা এইভাবে খর্ব করিয়া লর্ড ময়রা সিন্ধিয়াকে ইংরেজের সঙ্গে আনুগত্যমূলক সন্ধি করাইতে বাধ্য করেন। নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলা মৃত হইলে তাঁহার পুত্র আপ্পা সাহেবকে ইংরেজেরা ভোঁসলা বলিয়া স্বীকার করিলেন; বিনিময়ে আপ্পা সাহেব ইংরেজের সঙ্গে অধীনতামূলক মৈত্রীতে আবদ্ধ হইলেন (১৮১৬)। এইভাবে হোলকার ব্যতীত অপর তিনটি মারাঠা শক্তির প্রাধান্য খর্ব করা হইল।

কিন্তু মারাঠা শাসকগণ কোন মতেই তাহাদের পরাধীন অবস্থাকে মানিয়া লইতে পারিলেন না। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড ময়রা যখন পিণ্ডারী দমনে ব্যস্ত, তখন পেশোয়া, ভোঁসলা ও হোলকার পৃথক পৃথক ভাবে ইংরেজ শক্তিকে আক্রমণ করিলেন। পেশোয়া পুণার সন্নিহিত কিরকীতে ইংরেজ দূতাবাস আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাজিত হইলেন।

ভোঁসলা ও হোলকার পরাজিত

ভোঁসলা ও আপ্পা সাহেব ও মলহর রাও হোলকার মাহিদপুরে পরাজিত হইলেন। আপ্পা সাহেব পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলে দ্বিতীয় রঘুজী ভোঁসলার এক পৌত্রকে নাগপুরের রাজা করিয়া দেওয়া হইল। ভোঁসলার রাজ্যের নর্মদা নদীর উত্তরাংশ বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইল। হোলকারও ইংরেজদের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। মান্দাসোরের সন্ধিতে হোলকার সমস্ত রাজপুত রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিলেন, নর্মদার দক্ষিণাঞ্চলের সমস্ত জেলা ইংরেজদের হস্তে সমর্পণ করিলেন, নিজ ব্যয়ে স্বীয় রাজ্যে একদল বৃটিশ সৈন্য রাখিতে এবং পররাষ্ট্র সম্পর্কিত ব্যাপারে

পেশোয়ার পরাজয়

ইংরেজের কর্তৃত্ব মানিতে স্বীকৃত হইলেন। ইন্দোরে স্থায়িভাবে একজন বৃটিশ রেসিডেন্ট রাখার ব্যবস্থা হইল। কিরকীতে পরাজয়ের পরে পেশোয়া পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কোরেগাঁও ও আষ্টি এই দুইস্থানে বৃটিশের সঙ্গে পরাজিত হইলেন। লর্ড ময়রা পেশোয়ার পদ লুপ্ত করিয়া দিলেন এবং বাৎসরিক আট লক্ষ টাকা পেন্সন দিয়া পেশোয়াকে বিঠুর নামক স্থানে বাস করিবার অনুমতি দিলেন। পেশোয়ার রাজ্যের কিয়দংশ লইয়া সাতারা নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি হইল এবং এই রাজ্যটিকে প্রতাপ সিংহ নামে শিবাজীর এক বংশধরের হস্তে অর্পণ করা হইল। এইভাবে মারাঠা শক্তিকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া লর্ড ময়রা ভারতে বৃটিশ আধিপত্যকে একেবারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তুলিলেন।

মারাঠাদের পতনের কারণ—যে মারাঠার শক্তি-সৌধ মুঘলদের ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও গড়িয়া উঠিয়া পেশোয়াদের শাসনকালে গগনচুম্বী হইয়া উঠিয়াছিল এবং প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল ইংরেজদের সকল সাফল্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আসিতেছিল, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তাহা একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

মারাঠাদের পতনের বীজ মারাঠা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই লুক্কায়িত অবস্থায় ছিল। মারাঠা রাষ্ট্র গঠনের মৌলিক ত্রুটিই ইহার পতনকে আসন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। মারাঠা রাষ্ট্র কোনপ্রকার জনকল্যাণকর রাষ্ট্র বা সমাজ সংগঠনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিল না। শিবাজীর সময়ে বা পেশোয়াদের শাসনকালে মারাঠা রাষ্ট্রের শিক্ষা, সাম্প্রদায়িক উন্নতি অথবা জনসাধারণকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করার জন্য কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা হয়

নাই। প্রজাবর্গের এক রাষ্ট্রের অধীনে থাকার পশ্চাতে স্বাভাবিক বন্ধন অপেক্ষা কৃত্রিমতা বা আকস্মিকতার স্থান অধিক ছিল। সুতরাং মারাঠা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সর্বদাই শঙ্কাজনক অবস্থায় ছিল। দ্বিতীয়তঃ মারাঠা রাষ্ট্রের কোন সুপরিকল্পিত অর্থনীতি ছিল না। মহারাষ্ট্র দেশের অধিকাংশই পর্বতসংকুল অনুর্বর এবং উষ্ণ হওয়ায় কৃষিকার্য, ব্যবসাবাণিজ্য বা অন্য কোন শিল্প সমৃদ্ধভাবে গড়িয়া উঠার সুযোগ কম ছিল। ফলে জীবিকানির্বাহের জন্য মারাঠাজাতিকে সর্বদা পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত এবং চৌথ বা সরদেশমুখী প্রভৃতি অর্থ আদায়ের উপর নির্ভর করিতে হইত। এই পরমুখিতা একদিক দিয়া যেমন জাতিকে দুর্বল করিয়া তুলিয়াছিল, অপর পক্ষে প্রতিবেশী রাষ্ট্রবর্গের সহানুভূতি হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কাও ছিল। তৃতীয়তঃ শিবাজী প্রবর্তিত জায়গির প্রথার ফলে মারাঠা রাষ্ট্রের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছিল। জায়গিরদারগণ জাতীয় স্বার্থবুদ্ধির বিসর্জন দিয়া ব্যক্তিগত সুবিধার লোভে অবিরত পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিত। মারাঠাদের মধ্যে শিবাজী, প্রথম মাধব রাও, মলহর রাও হোলকার, মহাদজী সিন্ধিয়া এবং নানা ফাডনবিশ ব্যতীত কোন উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রনীতিক জন্মগ্রহণ করেন নাই। যে সময় ইংরেজের মত সূক্ষ্ম কূটনীতিজ্ঞ জাতির সঙ্গে উচ্চতর কূটনীতি সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনার প্রয়োজন হইল, সেই সময়ে এমন কোন দূরদর্শী মারাঠাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন না, যিনি সমগ্র দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে এই শ্রেণীর ধুরন্ধর রাষ্ট্রনায়কের অভাবেই মারাঠা শক্তির পতন অনিবার্য হইল। উপরি-উক্ত জায়গিরদারগণ ক্ষুদ্র ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিত, কূটকৌশলী উচ্চতর প্রতিভা তাঁহাদের মধ্যে ছিল না। চতুর্থতঃ, মারাঠারা চিরাভ্যস্ত প্রাচীন রণনীতির পরিবর্তে ইউরোপীয় যুদ্ধ-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া ভুল করিয়াছিল। বিদেশী পদ্ধতি ভাগ্যান্বেষী বিদেশী সেনানায়কের উপর নির্ভরশীল ছিল বলিয়া উপযুক্তভাবে কার্যকরী হইতে পারে নাই।

প্রশ্নোত্তর

1. **Describe the various reforms of Lord Cornwallis.**

লর্ড কর্ণওয়ালিসের বিভিন্ন সংস্কারের বিবরণ দাও।

উত্তর-সূত্র: বিভিন্ন সংস্কার (১) শাসন সংস্কার: (ক) কোম্পানীর কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের দুর্নীতি নিবারণ। (খ) উচ্চপদে ভারতবাসী নিয়োগ করা বন্ধ করিয়া দিলেন—ইহার পরিণাম কল্যাণকর হয় নাই। (গ) জমিদারগণকে তাহাদের স্থানীয় এলাকার শান্তিরক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া স্থানীয় শান্তিরক্ষার

ভার ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে দারোগার হস্তে অর্পণ করিলেন। জেলার যাবতীয় শাসনভার দুইজন ইউরোপীয়ান—জেলা জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট এবং কলেক্টরের হস্তে প্রদত্ত হইল।

(২) **বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার :**—ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমার পৃথক ব্যবস্থা—সদর নিজামৎ আদালতকে মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করণ—জেলার দেওয়ানী মোকদ্দমার ভার জেলা জজের উপর—হিন্দু পণ্ডিত ও কাজির সাহায্যে বিচার ব্যবস্থা—ফৌজদারী মোকদ্দমার জন্য চারিটি ভ্রাম্যমান আদালত—'কর্ণওয়ালিস কোড' নামে আইন-গ্রন্থ।

(৩) **রাজস্ব সংস্কার :**—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—ইহার ফলাফল।

2. Discuss the merits and demerits of the Permanent Settlement.

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ ও গুণ আলোচনা কর।

উত্তর-সূত্র : (১) জমিদারের লাভ—জমিদার জমির স্থায়ী মালিকরূপে গণ্য হইলেন।

(২) গভর্ণমেন্টের লাভ—(ক) রাজস্বের পরিমাণ চিরকালের জন্য নির্দ্ধারিত হইল। (খ) এক শ্রেণীর রাজভক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব।

(৩) প্রজার ক্ষতি : জমির স্থায়ী মালিক হওয়াতে জমিদার স্বেচ্ছামত খাজনা বৃদ্ধি বা জমি হইতে প্রজা উৎখাত করার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। কৃষকের পরিশ্রমলব্ধ আয়ের অংশ জমিদার বিনা পরিশ্রমে ও অর্থব্যয় পাইতেন। পরবর্তীকালে প্রজার স্বার্থ-রক্ষাকারী কয়েকটি আইন পাশ হইলেও জমিদার শ্রেণীই অধিক সুবিধা-ভোগী হইলেন।

(৪) তৎকালীন পুরাতন জমিদারবংশের ক্ষতি : তৎকালীন কয়েকটি বিখ্যাত জমিদারবংশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে 'সূর্য্যাস্ত আইন' অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব না দেওয়ার দরুণ জমিদারী স্বত্ব হারাইয়াছিলেন।

(৫) গভর্ণমেন্টের ক্ষতি : জমিদারদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়াতে গভর্ণমেন্ট অতিরিক্ত আয়ের পথ রুদ্ধ হইয়াছে; ফলে সরকারের ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রজার উপর অতিরিক্ত কর স্থাপন করিতে হইয়াছে।

3. What do you know about Wellesley as an empire-builder.

সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতারূপে ওয়েলেসলীর কার্য্যাবলী সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

উত্তর-সূত্র :—'লর্ড ওয়েলেসলীর কৃতিত্ব' দ্রষ্টব্য।

4. **Describe the Anglo-Mysore relations during the rule of Wellesley**

ওয়েলেসলী-র শাসনকালে ইঙ্গ-মহীশূর সম্পর্ক আলোচনা কর।

উত্তর-সূত্র: 'চতুর্থ-ইঙ্গ মহীশূর' যুদ্ধ দ্রষ্টব্য।

5. **Sketch the career and character of Tipu.**

টিপুর জীবনী ও চরিত্র বর্ণনা কর।

উত্তর-সূত্র: (১) জীবনী: হায়দার আলির সুযোগ্য পুত্র—দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধে সাফল্যজনক অংশ গ্রহণ—পিতার মৃত্যুর ফলে একক যুদ্ধ পরিচালনা—১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাঙ্গালোরে ইংরাজদের সঙ্গে সম্মানজনক সন্ধি। (খ) কর্ণওয়ালিসের সময়ে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ, ১৭৯০-৯২:—নিজাম, মারাঠা ও ইংরাজ সম্মিলিত ত্রয়ীর বিরুদ্ধে টিপুর পরাজয়—শ্রীরঙ্গপত্তমের অপমানজনক সন্ধি। (গ) ওয়েলেসলীর সময়ে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ, ১৭৯৯,—টিপুর পরাজয় ও মৃত্যু।

(২) চরিত্র:—('টিপু সুলতানের চরিত্র ও কৃতিত্ব বিচার' দ্রষ্টব্য)।

6. **Describe the Third Anglo-Mahratta War. Account for the downfall of the Mahrattas**

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা-যুদ্ধ বর্ণনা কর। মারাঠাদের পতনের কারণ কি?

উত্তর-সূত্র: (১) তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা-যুদ্ধ। ('তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা-যুদ্ধ ও মারাঠা শক্তির পতন' দ্রষ্টব্য)।

(২) মারাঠাদের পতনের কারণ। ('মারাঠাদের পতনের কারণ' দ্রষ্টব্য)।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ভারতের অর্থ-নৈতিক পরিবর্ত্তন ও নবজাগরণ

Syllabus : The Cornwallis system—Capital diverted to land. Europeanization of services. Company loses India monopoly in 1813 AD. Effect of Free Trade on Indian economy-importance of the landed middle class. Beginning of the Nineteenth Century. Renaissance—Western education and ideas—Bentinck, Hare, Macaulay, Rammohan

পাঠসূচী : কর্ণওয়ালিস পদ্ধতি—জমিতে মূলধন নিয়োগ। সরকারী চাকুরির ইউরোপীয়করণ ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর ভারতে একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার লোপ, ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অবাধ বাণিজ্যের ফল—ভূম্যধিকারী মধ্যবিত্তশ্রেণীর গুরুত্ব। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা—নবজাগৃতি—পাশ্চাত্যশিক্ষা ও ভাবধারা। বেন্টিক, হেয়ার, মেকলে ও রামমোহন।

কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত পদ্ধতি: ভূমি প্রধান অর্থনীতি – লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভারতবর্ষের অর্থ-নৈতিক ইতিহাসে এক বিপ্লবের সূচনা করে। কর্ণওয়ালিসের ভূমি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পূর্বে ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রবর্তিত যে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহাতে জমিদার বা ইজারাদারের ভূমির উপর স্থায়ী অধিকার ছিল না। ভূমির উপর অস্থায়ী ও স্বল্পমেয়াদী অধিকার থাকায় লোকে জমির মালিকানা-লাভের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহশীল ছিল না। কিন্তু কর্ণওয়ালিসের ব্যবস্থা অনুযায়ী চিরস্থায়ী ভাবে জমির অধিকার পাওয়ার ফলে লোকে জমির দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। এযাবৎকাল জনসাধারণ জমিকে অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে পারিত না। বর্তমানে জমি ক্রয়বিক্রয়ের পরিপূর্ণ অধিকার প্রবর্তিত হওয়াতে সকলেই জমি ক্রয় করিয়া জমিকে স্থায়ী সম্পত্তিরূপে গণ্য করিতে লাগিল। যাহারা অর্থবান তাহারা অধিক পরিমাণে জমি ক্রয় করিয়া জমিদার বা ইজারাদার

শ্রেণীভুক্ত হইতে লাগিল। লোকের অর্থ ব্যবসায় বা কুটির শিল্পে নিযুক্ত না হইয়া জমির পশ্চাতেই ব্যয়িত হইতে লাগিল।

জমির এই নব মূল্যায়ন ভারতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করিল। অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব হইলে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে অল্পায়াসে ও অল্পব্যয়ে প্রচুর দ্রব্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। বৃটিশ শিল্পপতিরা তাহাদের পণ্যবিক্রয়ের জন্য ভারতকে তাহাদের অন্যতম বাজারে পরিণত করার জন্য উৎসুক হইল। সুতরাং ভারতবর্ষের শ্রমশিল্পের অধঃপতনই তাহাদের কাম্য ছিল। ভারতবর্ষ ইতিপূর্বে শ্রম-শিল্পে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু জমির গুরুত্ব বাড়িয়া যাওয়াতে ভারতের উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী শ্রমশিল্পাদিতে তাহাদের অর্থ বিনিয়োগ করার পরিবর্তে ভূমিতেই অর্থ নিযুক্ত করিতে লাগিল। ইহার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ ভারতের শ্রমশিল্প বিনষ্ট হইয়া গেল এবং ভারতবাসী মূলতঃ কৃষি আশ্রয়ী হইয়া উঠিল। উপরন্তু ইংলণ্ড হইতে আগত যন্ত্রশক্তির সাহায্যে উৎপন্ন জিনিসপত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতের কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যাদি দাঁড়াইতে পারিল না। ভারতবর্ষ স্বীয় শিল্পক্ষমতা হারাইয়া বিদেশী শিল্পের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। ভারতীয় শিল্পের অবনতির পশ্চাতে ভূমির নব মূল্যায়ন একটি কারণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ভারতীয় শিল্পের অবনতির পশ্চাতে রাজশক্তিরূপে ইংরেজের ভারতীয় শিল্পে অবহেলা তো ছিলই, উপরন্তু ইংরেজেরা প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন বাধানিষেধ দ্বারা ভারতীয় শিল্প ধ্বংস করিতে ত্রুটি করে নাই।

শাসনকার্য্যে ইউরোপীয়ানদের প্রাধান্য—লর্ড কর্ণওয়ালিসের পূর্ব শাসন-ব্যবস্থায় ভারতবাসীরা উচ্চপদে নিযুক্ত থাকিত। গ্রামাঞ্চলের শান্তিশৃঙ্খলা বা বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব স্থানীয় জমিদারদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার ক্ষমতা নবাবের উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিস এক ভ্রান্ত নীতির বশবর্তী হইয়া ভারতবাসীগণকে সরকারী দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য হইতে বঞ্চিত করেন। ভারতবাসী-দিগকে তিনি অবিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহার মতে তাঁহারা অযোগ্য বলিয়া তিনি তাহাদিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিতেন না। লর্ড কর্ণওয়ালিস শাসনসংস্কার প্রবর্তন করিয়া পুলিশী ব্যবস্থা জমিদারের হাত হইতে কোম্পানীর হাতে ন্যস্ত করেন। নিম্নতন কর্মচারী দারোগা হইতে উচ্চতম পুলিশ কর্মচারীর কার্য্যে ইউরোপীয়ানরাই নিযুক্ত হইতে লাগিল। কর্ণওয়ালিস জেলার সমস্ত শাসনভার দুইজন ইউরোপীয়ানদের হস্তে অর্পণ করিলেন—জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর। কর্ণওয়ালিসের এই ব্যবস্থা ভবিষ্যতে শাসকরূপে বৃটিশের পক্ষে ক্ষতির কারণ হইয়াছিল। একদিকে যেমন

বিশেষ সুবিধাভোগী ইউরোপীয় কর্মচারীদের অবিচার ও ঔদ্ধত্য সীমাহীন হইয়া উঠিয়াছিল অপরদিকে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভারতবাসী সরকারী কর্মে অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় শাসক জাতির বিরুদ্ধে ভারতবাসীর অসন্তোষ বর্দ্ধিত হইতেছিল।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনদ আইন (চার্টার এ্যাক্ট)— ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে কুড়ি বৎসরের জন্য ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার পাইয়াছিল ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে সেই মেয়াদের অবসান হয়। সেই সময়ে নেপোলিয়নের কার্যাবিধির ফলে ইউরোপের সমস্ত বন্দর ইংরেজ বণিকদের নিকট রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইংলণ্ডের বাণিজ্যপণ্য বিক্রয় করার সুযোগ বন্ধ হওয়ায় ইংলণ্ডের সাধারণ বণিক সম্প্রদায় ভারতবর্ষে বাণিজ্য করার জন্য আগ্রহান্বিত হয়। ইংরেজ বণিকগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতে একচ্ছত্র বাণিজ্য অধিকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিল। ইহাদের আন্দোলনের ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের নূতন সনদে অন্যান্য বণিক বা বণিকসঙ্ঘ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুরূপ ভারতে বাণিজ্যের অধিকার লাভ করিল। অবশ্য বিশ বৎসরের জন্য ভারত ও চীনের অহিফেন ব্যবসায়ে কোম্পানীর একচ্ছত্র অধিকার অক্ষুণ্ণ রহিল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দের সনদের অন্যতম শর্ত্ত ছিল কোম্পানীকে ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে।

বৃটিশ বণিকদের ভারতবর্ষে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার লাভের ফলাফল:—১৮১৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ব্যবসা বাণিজ্যের অধিকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া ছিল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনদের বলে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার ইংলণ্ডের বণিক ও বণিক সম্প্রদায়ের হস্তগত হওয়ায় ইংলণ্ডের বিভিন্ন বণিক কোম্পানী ও শিল্প প্রতিষ্ঠান ইংলণ্ডের উৎপন্ন বাণিজ্য পণ্যে ভারতের বাজার পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব হওয়ার যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইংলণ্ডে স্বল্পব্যয়ে অধিক শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হইতেছিল। এই সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য ভারতের কুটির শিল্পজাত দ্রব্যকে মূল্যের প্রতিযোগিতায় পশ্চাৎপদ করিয়া ফেলিতে লাগিল। ইতি পূর্ব্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলাদেশের জনসাধারণ শিল্প সম্বন্ধে আগ্রহ হারাইয়া ভূমির উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতে অবাধ বিলাতী দ্রব্যাদি আমদানীর ফলে ভারতীয় শিল্প ক্রমশঃ বিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য শিল্প—

ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব ও সস্তায় পণ্য উৎপন্ন

সূতী রেশমী ও পশমী বস্ত্র শিল্প বিলাতী বস্ত্রাদির সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। বিলাতী যন্ত্রচালিত বয়নশিল্পের উৎপন্ন স্বল্পমূল্যে প্রাপ্ত সামগ্রীর সহিত ইহারা কোন মতেই দাঁড়াইতে পারিল না। ধাতুশিল্পে, চর্ম ও মূল্যবান প্রস্তর শিল্পেও ভারতের সুখ্যাতি ছিল। এই সমস্ত শিল্পও সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। কেবল যে ভারতের বিখ্যাত শিল্প সমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইল তাহা নহে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যিক অধিকারও ভারতীয়দের হস্ত হইতে ইংরেজদের আয়ত্তে আসিল এবং দেশীয় শিল্পী ও বণিককুল বিলাতী বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার উদ্যম ও প্রেরণা পর্যন্ত হারাইল। ভারতীয় ধন সম্পদ এই ভাবে ইংলণ্ডে চলিয়া যাওয়ায় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের যেমন মূলধনের অভাব ঘটিল, তদ্রূপ বিটিশ অধিকারের প্রথম পর্য্যায়ে বিশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থার জন্য দ্রুত বাণিজ্য শক্তি পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত হইয়া পড়িল। সর্বোপরি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ার ফলে দেশের বিত্তবান জনসাধারণ অনিশ্চিত বাণিজ্যে মূলধন নিয়োগ করার পরিবর্তে ভূমিতে মূলধন নিয়োগ করা অধিকতর লাভজনক ও নিরাপদ মনে করিল। বাণিজ্যে অর্থ নিয়োগের উদ্যম ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইল এবং দেশীয় বাণিজ্য ক্রমশঃ বিদেশী বণিকদের করায়ত্ত হইয়া পড়িল। ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের অবনতির সূত্রপাত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বৃটিশ সরকারের ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদ্বিষ্ট নীতি, কলে প্রস্তুত সুলভ বিলাতী দ্রব্যের প্রতিযোগিতা এবং ভারতবর্ষের শিল্প বাণিজ্যকে রক্ষার জন্য ভারত সরকারের অনিচ্ছা বা অক্ষমতাজনিত ঔদাসিন্য সমস্ত মিলিয়া ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে।

> ভারতে অবাধ বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শিল্প পশ্চাৎপদ

> ভারতীয় জনসাধারণ ভূমিনির্ভর ও বাণিজ্যে অনুৎসাহ

> ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য ধ্বংসের কারণ

এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের ধনসম্পদের অবাধ লুণ্ঠনও ভারতের শিল্প বাণিজ্যের অবনতির অন্যতম কারণ। পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে সুদীর্ঘকাল বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষ হইতে যে অগণিত ধন সম্পদ ইংলণ্ডে রপ্তানী হইয়াছে তাহার ফলে বঙ্গদেশ প্রয়োজনীয় মূলধন হইতে বঞ্চিত হইয়া শিল্পবাণিজ্যের সামর্থ্য একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। মীর জাফর ও মীর কাশিম বাংলার নবাবীর মূল্যস্বরূপ ইংরেজদের প্রচুর অর্থ প্রদান করেন। অতঃপর দেওয়ানী লাভের পরে বঙ্গদেশের অর্থ প্রত্যক্ষভাবে ইংলণ্ডের ধন সম্পদ বৃদ্ধি করে। রাজস্ব হইতে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত অর্থ

> অর্থনৈতিক লুণ্ঠন

বঙ্গদেশের পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করার ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়। মোট কথা পলাশী যুদ্ধের পরে অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে স্বর্ণমুদ্রায় বা পণ্যদ্রব্যে ইংলণ্ড বঙ্গদেশ হইতে প্রায় যাটকোটি টাকা স্বদেশে প্রেরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। অর্থনীতিকরা বলেন যে এই 'বেঙ্গল মানি' (Bengal Money) বা বঙ্গদেশের অর্থের জোরেই ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লব সম্ভবপর হইয়াছিল। এই অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের ফলে বঙ্গদেশ ক্রমশঃ নিঃস্ব হইয়া মূলধনের অভাবে শিল্প বাণিজ্যের প্রেরণা হারাইয়া ফেলে।

এইভাবে শিল্পী ও বণিক কুলের অধঃপতন হইলে স্বভাবতই সমাজের প্রকৃত ক্ষমতা ইহাদের হাত হইতে ভূম্যধিকারী শ্রেণীর হাতে চলিয়া গেল। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারে এই শ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল। তাঁহারা শাসক জাতির অনুরক্ত অনুচরে পরিণত হইল। এতদ্ব্যতীত কোম্পানীর অধীনে বা ইউরোপীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে বহু ভারতবাসী কর্মে নিযুক্ত হইয়া চাকরিজীবী শ্রেণীর সৃষ্টি করিল। জমিদার শ্রেণী ও চাকরিয়াদের লইয়া ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইল। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক পরিবর্ত্তনের সূচনা হইল। এই শতাব্দীর ভারতীয় নবজাগরণের মূলে রহিয়াছে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দান।

জমিদার ও চাকরিয়াদের সমবায়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তন :—বৃটিশ আধিপত্যের প্রথম যুগে ভারতবর্ষের শিক্ষা-পদ্ধতি প্রাচীন প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। হিন্দুগণ টোলে এবং মুসলমানগণ মক্তব বা মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করিত। এই শিক্ষায় হিন্দুদের পক্ষে সংস্কৃত এবং মুসলমানের পক্ষে আরবী বা ফার্সী ব্যতীত মাতৃভাষার কোন স্থান ছিল না। প্রাচীনপন্থী শিক্ষাবিধির ফলে ভারতবর্ষের মন মধ্যযুগীয় ইউরোপের মত গণ্ডীর মধ্যে সীমায়িত ছিল, পরিবর্ত্তনশীল বহির্জগতের চিন্তাধারার সঙ্গে সাক্ষাৎ সংযোগসূত্র একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

প্রথম দিকে সংস্কৃত ও আরবী ফার্সী

ভারতীয় বৃটিশ কর্তৃপক্ষ প্রথমতঃ ভারতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশীয় শিক্ষায় আগ্রহ প্রকাশ করেন। স্যার উইলিয়ম জোন্স ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে বারাণসীর রেসিডেণ্ট জোনাথান ডাঙ্কান বারাণসীতে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠায়

শিক্ষা বিস্তারে প্রথম দিকে আগ্রহ

অংশ গ্রহণ করেন। স্যার জন গ্রান্ট নামে একজন সিভিল সার্ভিসের কর্মচারী ভারতবাসীর অশিক্ষা দূর করার জন্য ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। কিন্তু তাহার প্রচেষ্টা সরকারের সহানুভূতির অভাবে ব্যর্থ হইল।

বে-সরকারী প্রচেষ্টা

সরকারী সহানুভূতির অভাব থাকিলেও খৃষ্টান মিসনারী ও কতিপয় মহাপ্রাণ শিক্ষাব্রতীর প্রচেটায় বঙ্গদেশে ও মাদ্রাজে বহু ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। যে সকল মহাপুরুষের নিকট ভারতবর্ষ ইংরাজী শিক্ষার জন্য ঋণী উইলিয়ম কেরী তাহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। শুধু ইংরাজী শিক্ষা নহে বাংলা গদ্যের সূত্রপাতও এই সকল মিশনারীর প্রচেষ্টায় হয়। অতঃপর ডেভিড হেয়ার ও রাজা রামমোহন রায় ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য উদ্যোগী হন এবং তাঁহাদের চেষ্টার ফলে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইতিমধ্যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টেও ভারতবাসীর শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হয় এবং ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ পুনর্মঞ্জুর করিবার সময় নির্দেশ দিলেন যে অতঃপর কোম্পানীকে দেশীয় শিক্ষার জন্য বাৎসরিক অন্যূন এক লক্ষ টাকা খরচ করিতে হইবে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে একটি 'কমিটি অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাকসান' বঙ্গদেশে গঠিত হয় এবং এই কমিটি ইংরেজী শিক্ষার পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষার শিক্ষা প্রচারের জন্য উদ্যোগী হয়। রামমোহন রায় প্রমুখ কতিপয় চিন্তাশীল ব্যক্তি দেশীয় ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য আবেদন জানান। এই সম্বন্ধে ভারতবর্ষে প্রাচ্যপন্থী ও পাশ্চাত্য পন্থী এই দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেকলে ভারতবর্ষের আইন-সদস্য নিযুক্ত হইয়া আসিলে ভারতীয় শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে নির্দিষ্ট পন্থা স্থির হইল। মেকলের সমর্থনের বলে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইহাই স্বীকৃত হইল যে অতঃপর গভর্ণমেণ্ট শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় অর্থ ইংরেজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করিবেন। ইংরাজী শিক্ষা এইভাবে সরকারী আনুকূল্য পাওয়াতে ইহার প্রসার পরিমাণে অবশ্যম্ভাবী হইল। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ফলে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূচনা হইল এবং ইংরাজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল চিন্তারাজি ভারতের চিন্তাশীল জনমানসকে আকৃষ্ট করিল। অতঃপর ভারতবর্ষের ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষা অভূতপূর্ব পরিবর্তনের সম্মুখীন হইল।

লর্ড মেকলে ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত

ভারতের রেণেসাঁ বা নবজাগরণ :—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ভারতের রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূত্রপাত হয় এবং এই নবজাগরণের প্রবাহ পূর্ণ উনবিংশ

শতাব্দী ধরিয়া চলে এবং ভারতবর্ষ মধ্যযুগের তমিস্রা হইতে আধুনিক যুগের আলোক তোরণের মধ্যে প্রবেশ করে।

সুদীর্ঘ মুসলমান শাসনের সময়ে ভারতবাসী বিদেশী শাসক জাতির সংস্পর্শে আসিয়াও তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না। ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির সম্পদ ইসলাম অপেক্ষা উন্নত হওয়ায় বিদেশীদের চিন্তাবাজি সম্বন্ধে ভারতবাসীর এই বিতৃষ্ণা ছিল। ইতিমধ্যে জাতীয় ও সামাজিক জীবনে সঙ্কীর্ণতা আসিয়া গিয়াছিল এবং ইসলামের আধিপত্যের যুগে ভারতে জাতীয় জীবন একেবারে রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। মুঘল শাসনের শেষ পর্বে রাষ্ট্রনৈতিক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে এই সাংস্কৃতিক দৈন্য আরও পূর্ণতর রূপে দেখা দেয়। বৃটিশের আধিপত্য ভারতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে যখন পাশ্চাত্য ভাবধারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে থাকে, তখন ভারতবর্ষ তাহার দীর্ঘস্থায়ী মানসিক কূপমণ্ডুকতার হাত হইতে মুক্তি লাভ করে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে নবজাগরণ

ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক ভাবাদর্শ ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং এই সকল ভাবধারায় পুষ্ট হইয়া বিশিষ্ট ভারতীয় চিন্তানায়কগণ ভারতের ধর্ম, শিক্ষা ও সমাজকে নূতন দৃষ্টি কোণ হইতে বিচার করিতে আরম্ভ করে। তাঁহাদের বিচারের মাপকাঠি হইল বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তি, কুসংস্কারের পরিবর্তে বিজ্ঞান এবং জড়তার পরিবর্তে প্রাণস্পন্দন। নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, নব সমাজ গঠন এবং নূতন ধর্মপ্রবাহ এই নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য। ভারতে বৃটিশের আধিপত্যের সূত্রপাত হয় বঙ্গদেশে এবং কলিকাতা বৃটিশ ভারতের রাজধানী হওয়াতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি সর্বপ্রথম বঙ্গদেশই গ্রহণ করে। এই জন্যই এই নবজাগরণের ও নবচেতনার কেন্দ্রস্থল হয় বঙ্গদেশ এবং বাঙ্গালীই এই নূতন যুগের উদ্গাতার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

বঙ্গদেশ এই নবচেতনার কেন্দ্রস্থল হয়

এই নবজাগরণের ফলে আগত ভাবধারায় দীক্ষিত স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করিলেন এবং দেশের সর্বত্র এই নূতন প্রবাহকে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করিলেন। এই নবজাগরণের ভাবধারায় দীক্ষিত প্রথম চিন্তানায়ক ছিলেন ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়।

রাজা রামমোহন রায় যুগন্ধর মহাপুরুষ ছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ের বিভিন্ন ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সারমর্ম তিনি অন্তরঙ্গভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই উপলব্ধির ফলে এই সত্য তাঁহার মনে উদ্ভাসিত হইয়াছিল যে, বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান

বাদ দিলে সকল ধর্মই মূলতঃ এক। এই অর্থহীন ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেন এবং হিন্দুধর্ম ও হিন্দু জাতিকে ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। প্রচলিত হিন্দুধর্মকে সংস্কারমুক্ত করার প্রচেষ্টা হইতেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের সৃষ্টি হয়। তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন পাশ্চাত্য শিক্ষার উপযোগিতা প্রচার করিবার জন্য উৎসর্গ করেন। সংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহনের প্রচেষ্টা বহুমুখী ছিল। হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থায় যথেষ্ট অবিচার ও অযৌক্তিকতা ছিল—তিনি এই সকল অন্যায় অবিচারের প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার সময়েই সেই সকল অনাচার দূরীভূত হইয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার পরবর্ত্তী যুগে জনমত তীব্র হইয়া সামাজিক অনাচার দূর করিতে বাধ্য করিয়াছে। অনিষ্টকর জাতিভেদ প্রথার অস্পৃশ্যতা, সতীদাহ, বৈধব্য প্রভৃতি সকল কুপ্রথার বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন। জাতিভেদ ও হিন্দুনারীর তৎকালীন দুরবস্থা এই দুইটির বিপক্ষেই তিনি মুখ্যতঃ তাঁহার আন্দোলনকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় ও তাঁহার দান

রামমোহন রায়

রাজনীতির ক্ষেত্রেও রামমোহন পরবর্ত্তী জাতীয়তাবাদীদের চিন্তাধারার অগ্রনায়ক ছিলেন এবং তাহার অনুমোদিত নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন অর্দ্ধ শতাব্দী পরে 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নীতি' হিসাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও রামমোহন তাঁহার অসামান্য প্রতিভার স্পর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। স্বয়ং তিনি কয়েকটি সংবাদ পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংস যখন সংবাদ পত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়ন করেন, তখন তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আবেদন করেন। জুরী নির্বাচনে যাহাতে খৃষ্টান ব্যতীত অন্য ধর্মের লোক স্থান পাইতে পারে, তজ্জন্য তিনি চেষ্টা করেন। রামমোহন ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট অনুযায়ী শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট এক লক্ষ টাকা সংস্কৃত আরবী এবং ফারসী শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইতে দেখিয়া রামমোহন এই উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং উক্ত অর্থ ইংরেজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে অনুরোধ জানান। তদানীন্তন সরকার

বহুমুখী প্রচেষ্টা

এই আবেদন অগ্রাহ্য করিলে রাজা রামমোহন রায় ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া ইংরেজী শিক্ষাদানের জন্য হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন। খৃষ্টান মিশনারী সম্প্রদায় ও কয়েকজন পাশ্চাত্যশিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ইংরেজীতে লিখিত পুস্তক বিক্রয় করার জন্য 'স্কুল বুক সোসাইটি' নামক যে প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন, রামমোহন তাঁহার সঙ্গে যোগ দেন। সমস্ত দিক দিয়া বিবেচনা করিলে রাজা রামমোহন রায়কে উনাবংশ শতাব্দীর যাবতীয় সংস্কারপন্থী আন্দোলনের জনক বলা যাইতে পারে। নব ভারতের নব জাগরণের তিনিই ছিলেন 'প্রভাতী শুকতারা'।

ভারতীয় নবজাগরণের জনক

ভারতবর্ষের নবজাগরণের পশ্চাতে আলেকজাণ্ডার ডাফ, গভর্ণর জেনারেল বেণ্টিক ও লর্ড মেকলের দানও স্মরণীয়। ইহাদের আনুকূল্যে ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। সেই সময়ে দেশীয় শিক্ষা অথবা ইংরেজী শিক্ষা কোন্‌টার জন্য সরকারী অর্থ ব্যয় করা হইবে তাহা লইয়া দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। প্রাচ্যপন্থীরা প্রাচ্যভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন আর পাশ্চাত্যপন্থীরা ইংরেজীকেই শিক্ষার বাহন করা হউক বলিয়া দাবি করিতেছিলেন। প্রাচ্যপন্থীদের দলে ছিলেন তদানীন্তন সরকারের সেক্রেটারী এবং প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ জেমস প্রিন্সেপ এবং রাধাকান্তদেব প্রভৃতি ব্যক্তি। আর উইলিয়ম বেণ্টিক, লর্ড মেকলে প্রভৃতি পাশ্চাত্যপন্থী ছিলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেকলে আইন-সদস্য নির্বাচিত হইয়া আসিলে ভারতীয় শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে নির্দিষ্ট পন্থা স্থিরীকৃত হয়। প্রাচ্য শিক্ষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে মেকলের বিখ্যাত উক্তির ফলে প্রাচ্য শিক্ষার মূল্য কমিয়া গেল এবং মেকলের সমর্থনের বলে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এই সিদ্ধান্ত হইল যে অতঃপর গভর্ণমেণ্ট শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় অর্থ ইংরেজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হইবে। ইংরেজী শিক্ষা এইভাবে সরকারী আনুকূল্য পাওয়াতে ভারতবর্ষের সর্বত্র আদৃত হইল। ভারতের সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে লর্ড বেণ্টিঙ্কের দান অসামান্য। তাঁহার প্রচেষ্টায় কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সতীদাহ প্রথা রহিত হইয়া যায়।

ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তকগণ

বেণ্টিঙ্ক

মেকলে

আলেকজাণ্ডার ডাফ ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের অনুরাগী ছিলেন। আলেকজাণ্ডার ডাফ সাহেবের উদ্যোগে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য কলিকাতায় জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশন নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ইহার পরে ডাফ 'কলেজ' এবং

আলেকজাণ্ডার ডাফ

বহু পরবর্তীকালে 'স্কটিশ চার্চ কলেজ' নামে পরিচিত হয়। মহাত্মা ডেভিড হেয়ার এবং ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুনের নামও ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বেথুনের উদ্যোগেই স্ত্রীশিক্ষার জন্য যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, তাহা পরবর্তীকালে বেথুন কলেজ নাম ধারণ করিয়া বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছে।

বেথুন

বাংলাদেশে প্রথম ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে বাঙ্গালীই ভারতীয় নব চিন্তাধারার জনক হয় এবং ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক, ধর্মনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষানৈতিক এবং অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রেও ভারতবাসীকে অগ্রগতির পথে পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। ধর্মের নূতন নূতন মতবাদ দেখা দিল। ভারতের সকল ধর্মেই সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মীয় ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং নূতন নূতন ধর্মীয় মতবাদের সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থারও যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হইল। আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মানবতার সেবা এই সকল মতবাদের মূলে ছিল। ধর্ম জগতের এই পরিবর্তন ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আর্য সমাজ এবং রামকৃষ্ণমিশন প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিল।

ধর্মের ক্ষেত্রেও নূতন মতবাদ সমূহ

ভারতবর্ষের সামাজিক উন্নতির ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজের অবদান উল্লেখযোগ্য। নারীর সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, নারীকে পুরুষের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা, বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, বাল্যবিবাহ-নিরোধ, পর্দাপ্রথার উচ্ছেদ, উচ্চ শিক্ষার প্রবর্তন, বহু বিবাহ উচ্ছেদ, জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণ, সমুদ্রযাত্রায় জাতিনাশ অস্বীকার করা, ইত্যাদি সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক সংস্কারের জন্য জনমত সৃষ্টি এবং সরকার কর্তৃক এতৎসংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন ব্রাহ্ম সমাজের প্রচেষ্টার ফলেই হইয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজের এই সমস্ত আন্দোলনের পশ্চাতে রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মনীষীদের প্রচেষ্টা রহিয়াছে।

ব্রাহ্ম সমাজ

ইহার দান

ব্রহ্মসমাজের অনুরূপ সমাজ সংস্কার আন্দোলন প্রার্থনা-সমাজের দ্বারা মহারাষ্ট্র দেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল। ব্রাহ্ম সমাজের ন্যায় সমাজ-উন্নয়ন ও নারীকল্যাণ প্রচেষ্টা প্রার্থনা-সমাজেরও লক্ষ্য ছিল। প্রার্থনা-সমাজ ধর্মের ব্যাপারে অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী ছিল এবং নামদেব, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি মহারাষ্ট্রের সন্তদের অনুরাগী ছিল। প্রার্থনা-সমাজ ব্রাহ্মদের ন্যায় হিন্দুধর্মের বহির্ভূত কোন ধর্ম সম্প্রদায় বলিয়া দাবি করিত না, বরঞ্চ হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত এক সংস্কারক প্রতিষ্ঠান বলিয়া প্রচার করিত। প্রার্থনা-সমাজ ধর্মীয় আন্দোলন অপেক্ষা

প্রার্থনা সমাজ

অন্তঃবর্ণ বিবাহ, পানভোজন, বিধবা বিবাহ, অনুন্নত ও দুঃস্থদের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় আগ্রহশীল ছিল। পশ্চিম ভারতের অধিকাংশ কল্যাণকর সামাজিক আন্দোলন ও উন্নতির পশ্চাতে প্রার্থনা-সমাজের সক্রিয় হস্ত ছিল। প্রার্থনা-সমাজকে এইভাবে প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার কৃতিত্ব মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের।

আর্য্য সমাজ

ব্রাহ্ম সমাজ ও প্রার্থনা সমাজের আন্দোলন প্রধানতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া উদ্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অপর দুইটি ধর্মীয় ও সমাজমূলক আন্দোলন—আর্য সমাজ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রধানতঃ ভারতের সনাতন ধর্ম ও কৃষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে। ভারতের ধর্ম ও সমাজকে হিন্দু ধর্মের যুগোপযোগী ব্যাখ্যার দ্বারা নবরূপে রূপায়িত করিয়াছে।

দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪—৮৩) আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্মান্দোলনের প্রধান ভিত্তি ছিল বেদ। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্ম ও সমাজের কুসংস্কার দূরীভূত করিয়া বেদের নির্দেশের ভিত্তিতে হিন্দুধর্মকে নূতন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। দয়ানন্দ বর্ণাশ্রমের কঠোরতা, বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ বা সমুদ্র যাত্রায় নিষেধ প্রভৃতির প্রতিবাদ করেন এবং স্ত্রী-শিক্ষা ও বিধবা বিবাহ সমর্থন করেন। দয়ানন্দের ধর্মান্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল 'শুদ্ধি'র ব্যাপারে। এই শুদ্ধির ব্যাপার ছিল অ-হিন্দুকে পবিত্রকরণের দ্বারা হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভূক্ত করা। শুদ্ধি আন্দোলন অন্য ধর্মের চাপে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। আর্য সমাজ উত্তর ভারতের সর্ববিধ সামাজিক আন্দোলনের অগ্রদূত হয়।

উনবিংশ শতাব্দী ও আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশনের মধ্যে ভারতবর্ষের সনাতন কৃষ্টি ও পাশ্চাত্যের আধুনিক উদার মতবাদের সমন্বয় হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান যে মহাত্মার স্মৃতি বহন করিতেছে, সেই পুণ্যশ্লোক রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৪—৮৬) সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণীই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইসলাম বা খৃষ্টধর্ম কাহাকেও তিনি অবজ্ঞা করিতেন না। সকল ধর্মের সারমর্ম তিনি প্রচার করিতেন। রামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় তাঁহার বাণীর যথেষ্ট প্রসার হয় নাই। কিন্তু তাঁহার তিরোধানের পরে

রামকৃষ্ণ মিশন

রামকৃষ্ণ পরমহংস

বিবেকানন্দ

তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য বিবেকানন্দ (১৮৬৩—১৯০২) রামকৃষ্ণের বাণী ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচার করিয়া গুরুকে সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত করেন। চিকাগো 'ধর্ম মহা-সম্মিলনে' বক্তৃতা প্রদান করিয়া বিবেকানন্দ সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তদবধি রামকৃষ্ণ কথিত ধর্মের বাণীসমূহ পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত হয় ও দেশে-বিদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা ও মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের ধর্ম ও সমাজের যে অধোগতি আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার সংস্কার সাধন করিয়া ভারত-বর্ষকে বিশ্বের দরবারে উন্নীত ও মহিমান্বিত করা। ভারতের জাতীয় আত্ম-সম্বিৎ

ফিরাইয়া আনা ও বিশ্বের দরবারে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রকৃত মূল্য উপস্থাপিত করা এই দুইটিই রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রেষ্ঠ দান।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বাংলার নবজাগরণের বিকাশের মূলে অসংখ্য চিন্তাশীল মনীষী ও সাহিত্যিকদের দান রহিয়াছে। এই সব মনীষীর মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান হইলেও ঈশ্বরচন্দ্র যুক্তিবাদী মন দিয়া সমাজের যাবতীয়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

[illegible]

দোষত্রুটির বিচার করিয়াছেন এবং বিধবা বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, অনুন্নত ও অবহেলিত শ্রেণীর শিক্ষা, উন্নতি প্রভৃতি সামাজিক ও শিক্ষানৈতিক সংস্কারে অগ্রণী হইয়াছিলেন। প্রাচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় তাঁহাদের মধ্যে হইয়াছিল। মাইকেল পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত বাংলা সাহিত্যের সংযোগ সাধন করিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নবযুগের সূত্রপাত করেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে' ইঙ্গ-বণিক নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিবাদ রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে' ও নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধে' ভারতবাসীর জাতীয়তা তথা আধুনিকতার অভিব্যক্তি রহিয়াছে। এই সময়েই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর আনুকূল্যে ও রাজনারায়ণ বসুর

সহযোগে নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলার পত্তন করিয়া স্বদেশী শিক্ষা, সাহিত্য এবং শিল্প প্রসারের অন্তরালে জাতীয় জাগরণের উদ্বোধন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব ও জাতীয়তাবাদ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সামাজিক প্রবন্ধ এবং বিবেকানন্দের বক্তৃতা বাঙ্গালীর মনে জাতীয় গৌরববোধ জাগ্রত করে। এই জাতীয় গৌরববোধ এবং বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্যবোধ ভারতের নবজাগরণের প্রচ্ছদপট রচনা করিয়াছিল।

প্রশ্নোত্তর

1. What were the various effects of the Cornwallis system on the Indian Economic life.

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর কর্ণওয়ালিসের পদ্ধতির ফলাফল আলোচনা কর।

উত্তর-সূত্র : ('কর্ণওয়ালিসের প্রবর্তিত পদ্ধতি' দ্রষ্টব্য)।

2. Discuss the reactions of the 'Free-trade' upon the trade and Commerce of India.

অবধি-বাণিজ্য নীতি ভারতের বাণিজ্যক্ষেত্রে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা আলোচনা কর।

উত্তর-সূত্র : ('বৃটিশ বণিকদের ভারতবর্ষে অবাধ বাণিজ্যাধিকার লাভের ফলাফল' দ্রষ্টব্য)

3. Write briefly the history of the introduction of the Western education in India and its effects upon the social life of India.

ভারতবর্ষে পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রবর্তনের ইতিহাস এবং ভারতের সামাজিক জীবনের উপর ইহার ফলাফল বর্ণনা কর।

উত্তর-সূত্র : (১) পাশ্চাত্য-শিক্ষা প্রবর্তনের ইতিহাস : (পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন দ্রষ্টব্য)

(২) ইহার ফলাফল।

(ক) ধর্মব্যবস্থার নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচারের সূত্রপাত—নূতন নূতন মতবাদের সৃষ্টি ; আধ্যাত্মিক উন্নতি, জাতিভেদের সঙ্কীর্ণতা লোপ এবং মানবতার সেবা

এইসকল মতবাদের মূলে ছিল। ধর্ম জগতের এই পরিবর্তন ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা-সমাজ, আর্য্য-সমাজ এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিল—

(খ) শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন :—প্রাচ্যভাষা ও সাহিত্য ও শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রবর্তন—বিভিন্ন প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা—স্ত্রী শিক্ষা প্রচারে আগ্রহ—বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি—দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ—দেশীয় নাট্যশালা ও বাংলা নাটকের সূত্রপাত—বাংলাসাহিত্যে নবযুগ—বিভিন্ন লেখকগণ।

(গ) সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন—বাল্যবিবাহ নিরোধের প্রচেষ্টা, স্ত্রীশিক্ষা, কুসংস্কার হইতে মুক্তি, বিধবা-বিবাহ প্রচলন, অনুন্নত ও অবহেলিত শ্রেণীর শিক্ষা।

(ঘ) রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন—জাতীয় কংগ্রেসের পূর্বাভাষরূপে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান-এর গঠন—ভারতবাসীর স্বাধীনতার পরিপন্থী 'দেশীয় সংবাদপত্র আইন' ও 'অস্ত্র আইন'-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-'ইলবার্ট বিল'-এর বিরোধী আন্দোলন—'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস'-এর প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫)।

4. Discuss the different factors which contributed to the Indian Renaissance in the 19th Century.

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতের রেনেসাঁ বা নব-জাগরণে কি কি ঘটনা সাহায্য করিয়াছে তাহা আলোচনা কর।

উত্তর-সূত্র : নিম্নোক্ত ঘটনাসমূহ ভারতের নবজাগরণে সহায়ক হইয়াছিল (১) বৃটিশের আধিপত্য ভারতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে যখন পাশ্চাত্যের ভাবধারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে থাকে, তখন ভারতবর্ষ তাহার দীর্ঘস্থায়ী মানসিক কূপমণ্ডুকতার হাত হইতে মুক্তিলাভ করে। ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপক প্রচলনও এই বিষয়ে সহায়ক হইয়াছিল।

(২) রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, কেশব চন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ মনীষীগণ তাহাদের চিন্তারাজি ও কর্মাবলী নবজাগরণকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল।

(৩) বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি লেখকগণের দেশীয় ভাষায় সৃষ্ট সাহিত্যকর্ম নবজাগরণে সাহায্য করিয়াছিল।

(৪) খৃষ্টান মিশ্রনারীদের ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তন ও বিদ্যালয়াদি সৃষ্টি এবং দেশীয় ভাষা সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান—বাংলা ভাষায় গ্রন্থাদি এবং সংবাদপত্র প্রকাশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংস্কারমুক্ত আধুনিক যুগোপযোগী চেতনার উন্মেষ।

(৫) নূতন নূতন সামাজিক সংস্কার বিধিযুক্ত ধর্মীয় মতবাদ ও প্রতিষ্ঠান ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আর্য্যসমাজ এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিল এবং প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতি সমাজ ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী পরিবর্তনের সম্মুখীন করিল। ইহাও নবজাগরণের অন্যতম সহায়ক ছিল।

অষ্টবিংশ অধ্যায়

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের শেষ অধ্যায়

Syllabus : Last phase of imperial expansion. Background—Russian and Afghan menace (i) Expansion in the west. Anglo-Sikh relations in the time of Ranjit Singh. Fiasco in Afgharisthan, but conquest of Punjab and Sind. The British attain the No th western frontier. (ii) Expansion towards the East for control of the Indian Ocean, especially trade with China and the East Indies. Foundation of Singapoore. Amherst's Burma war. Annexation of Assam. Opium war in China. Dalhousie's Burma war. (iii) Internal expansion—absorption of the Princely states. Doctrine of Lapse. The Indian Revolt—Mutiny—its Consequeneçes.

পাঠসূচী: ভারতের সাম্রাজ্য বিস্তারের শেষ অধ্যায়। পটভূমিকা—রুশ ও আফঘান ভীতি। (১) পশ্চিমে সাম্রাজ্যবিস্তার—রণজিৎ সিংহের সময়ে ইঙ্গ শিখ সম্পর্ক—আফঘানিস্থানের ব্যাপারে বিপর্যয়—কিন্তু পাঞ্জাব ও সিন্ধু অধিকার, বৃটিশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার (২) ভারত মহাসাগরে একাধিপত্য স্থাপনের জন্য—বিশেষতঃ চীন পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য পূর্বদিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা। সিঙ্গাপুরের পত্তন। লর্ড আমহার্ষ্টের ব্রহ্মযুদ্ধ। আসাম অধিকার। চীনের সঙ্গে আফিমের যুদ্ধ। ডালহৌসীর সময়ে ব্রহ্মযুদ্ধ। (৩) ভারতে আভ্যন্তরীণ সাম্রাজ্য বিস্তার—দেশীয় রাজ্যগুলির সাম্রাজ্যভুক্তি। 'স্বত্ববিলোপ নীতি'। সিপাহী বিদ্রোহ ও উহার ফলাফল।

লর্ড আমহার্ষ্ট (১৮২৩—২৮) লর্ড হেষ্টিংস (ময়রা) এর পদত্যাগের পরে কলিকাতা কাউন্সিলের সদস্য জন এডামস্ সাত মাস অস্থায়ীভাবে কাজ করেন। তাঁহার পর লর্ড আমহার্ষ্ট গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসেন। লর্ড হেষ্টিংসের শাসনকালে ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল বৃটিশের অধিকারভুক্ত হইলেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও পূর্ব সীমান্ত তখনও সম্পূর্ণ নিরাপদ হয় নাই। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে

তখনও সিন্ধী, শিখ, বেলুচ, পাঠান প্রভৃতি জাতি এবং পূর্ব-সীমান্তে আসাম ও ব্রহ্মদেশ শক্তিশালী ছিল। লর্ড আমহার্স্টের শাসনকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ (১৮২৪—২৬) এবং ভরতপুর অধিকার।

প্রথম ইঙ্গ ব্রহ্মযুদ্ধ (১৮২৪—২৬)—সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ইংরেজদের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আলম্প্রা নামে একজন বর্মীনায়ক ব্রহ্মদেশে একটি প্রবল রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

যুদ্ধের কারণ

তাঁহার বংশধর বোডাপায়ার সময়ে (১৭৭৯—১৮১৯) আরাকান, মণিপুর ও সুর্মা উপত্যকা ব্রহ্মদেশের পদানত হয়। ব্রহ্মদেশের এই সম্প্রসারণে শঙ্কিত হইয়া ইংরেজগণ ব্রহ্মের সঙ্গে সংঘর্ষ নিবারণের জন্য বিভিন্ন সময়ে ব্রহ্মরাজের দরবারে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মরাজ ইংরেজদের মৈত্রী অগ্রাহ্য করিয়া আসাম ও আরাকানের যে সকল বিদ্রোহী বৃটিশ-অধিকৃত ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বাস করিতেছিল, তাহাদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে বলিলেন। অধিকন্তু রাজ্যজয়ে উৎফুল্ল ব্রহ্মরাজ ইংরেজকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে বলিলেন,—কেননা, মধ্যযুগে এই সমস্ত স্থান ব্রহ্মদেশের করদ-রাজ্য ছিল। ১৮২১—২২ খৃষ্টাব্দে আসাম ব্রহ্মদেশের দ্বারা অধিকৃত হইল। অতঃপর ব্রহ্মদেশ বৃটিশের অধিকারভুক্ত চট্টগ্রামের অংবিশেষ অধিকার করিয়া বঙ্গদেশ আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিল। লর্ড আমহার্স্ট এই সমস্ত ঘটনায় বাধ্য হইয়া ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

এই যুদ্ধের প্রথম দিকে ব্রহ্মদেশের সৈন্যগণ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। ইংরেজগণ প্রথমদিকে আসাম হইতে বর্মীদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিল কিন্তু শীঘ্রই সেনাপতি বন্দুলার নেতৃত্বে বর্মী সৈন্যবাহিনী ইংরেজকে রামু নামক স্থানে পরাজিত করিল। ইতিমধ্যে একদল বৃটিশ সৈন্য রেঙ্গুনে অবতরণ করিয়া রেঙ্গুন অধিকার করিল। রেঙ্গুন পুনরুদ্ধারের জন্য বন্দুলা চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন এবং ডোনাবিউ নামক স্থানে ইংরেজবাহিনীর হস্তে পরাজিত ও নিহত হইলেন। ইংরেজ সৈন্য প্রোম অধিকার করিয়া ব্রহ্ম রাজধানীর ষাট মাইল দূরে ইয়ান্দাবু নামক স্থানে উপস্থিত হইল। ব্রহ্মরাজ ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলে

ফলাফল

ইয়ান্দাবুতে সন্ধি হইল (১৮২৬)। সন্ধির শর্ত অনুসারে তিনি আসামের কাছাড়, জয়ন্তিয়া ও মণিপুর রাজ্যগুলির উপর সকল দাবি ত্যাগ করিলেন; ইংরেজদিগকে আরাকান ও টেনাসেরিম ছাড়িয়া দিলেন এবং এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হইলেন।

পানিপথ
দিল্লী
রাজপুত
মা রা ঠা
আহমদাবাদ
বরোদা
সুরাট
নাগপুর
বোম্বাই
সলসেট
পুনা
গোয়া
বারাণসী
মুর্শিদাবাদ
পলাশী
কলিকাতা
ভারতবর্ষ
১৭৯৫ খ্রীঃ
বৃটিশ অধিকার
বৃটিশ আশ্রিত রাজ্য
মহারাষ্ট্র অধিকার

তিব্বত
নেপাল
রাজপুতানা
সিন্ধু
দিল্লী
অযোধ্যা
গোয়ালিয়র
হোলকার
বাঙ্গালা
প্রেসিডেন্সী
কলিকাতা
বেরার
বোম্বাই
নিজাম রাজ্য
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
মাদ্রাজ
ভারতবর্ষ
১৮২৩ খ্রীঃ
বৃটিশ অধিকার

ভরতপুরে আধিপত্য স্থাপন (১৮২৬ খৃঃ)—ভরতপুরের রাজার মৃত্যুর পরে তাঁহার নাবালক পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দুর্জনশাল সিংহাসন অধিকার করার চেষ্টা করেন। লর্ড আমহার্স্ট প্রকৃত উত্তরাধিকারীর পক্ষ সমর্থন করিয়া সেনাপতি কাম্বারমিয়ারকে ভরতপুরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কাম্বারমিয়ার ভরতপুরের দুর্গ অধিকার করিয়া দুর্জনশালকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন এবং নাবালক রাজাকে সিংহাসনে পুনঃ স্থাপিত করিলেন। 'ভরতপুর অধিকারে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদীরূপ অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকটিত হইয়া পড়িল।'

লর্ড আমহার্স্টের শাসনকালে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে বারাকপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহ করে।

বারাকপুরের সিপাহী বিদ্রোহ (১৮২৪)

ব্রহ্মযুদ্ধে হিন্দু সিপাহীকে সমুদ্র পার হইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে তাহাদের ধর্মচ্যুতির ভয় হইল। এতদ্ব্যতীত সিপাহীদের বেতন বৃদ্ধিরও দাবি ছিল। একদা কুচকাওয়াজের সময় সিপাহীরা কাপ্তেনের আদেশ মানিতে অসম্মত হইল। এই বিদ্রোহ অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হইল। বহু সিপাহীর ফাঁসি হইল এবং অন্যান্য সকলে পদচ্যুত হইল।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড আমহার্স্ট পদত্যাগ করেন। তাঁহার স্থলে মাদ্রাজের প্রাক্তন গভর্ণর লর্ড বেণ্টিঙ্ক ভারতে গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক (১৮২৪—৩৫)—লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকাল নানা কারণে ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। বিভিন্ন প্রকারের সংস্কার কার্য্যের জন্যই তাঁহার নাম সমধিক খ্যাত। তাঁহার সংস্কার সমূহকে আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষা-বিষয়ক এই তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক

অর্থনৈতিক সংস্কার

প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের অতিরিক্ত ব্যয়ভারে কোম্পানীর আর্থিক সমস্যা অত্যন্ত প্রবল হইয়া পড়ে। লর্ড বেণ্টিক পদগ্রহণ করিয়া সর্বপ্রথম আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধনে মনোযোগী হইলেন। তিনি সামরিক বিভাগীয় কর্মচারীদের বেতন ও ভাতার পরিমাণ হ্রাস করেন এবং অসামরিক ব্যয় সঙ্কোচনের দ্বারা কোম্পানীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি করেন। মাদ্রাজ

প্রদেশে জমির রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত ও যুক্ত প্রদেশে ভূমির ত্রিশ বৎসরের বন্দোবস্তের দ্বারা কোম্পানীর যথেষ্ট অর্থাগম হইল। সিন্ধু প্রদেশে আমীরদের সহিত সন্ধি স্থাপন এবং পাঞ্জাবে রণজিৎ সিংহের সহিত নূতন ব্যবস্থার ফলেও বৃটিশ বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। এই সকল কারণে কোম্পানীর ঘাটতি পূরণ হইয়া প্রচুর অর্থ উদ্বৃত্ত রহিল।

বেন্টিঙ্কের বিচারসংক্রান্ত সংস্কারসমূহও উল্লেখযোগ্য। তিনি ভ্রাম্যমান বিচারালয়-সমূহ তুলিয়া দিয়া কালেক্টরদের উপর বিচারের ভার অর্পণ করিলেন। আদালতে ফার্সীর পরিবর্তে দেশীয় ভাষা ব্যবহারের রীতি প্রবর্তিত হইল। বেন্টিঙ্কই সর্বপ্রথম বিচার ও শাসনবিভাগের উচ্চপদে ভারতীয়দিগকে নিযুক্ত করার প্রথার প্রবর্তন করেন।

বিচার সংস্কার

সমাজ সংস্কার কার্যের জন্য বেন্টিঙ্ক সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সতীদাহ প্রথা বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। ঠগী নামক এক শ্রেণীর দস্যুর উচ্ছেদ তাঁহার শাসনকালের অন্যতম কীর্তি। ঠগীরা প্রধানতঃ নিরীহ পথিকদিগকে অনুসরণ করিত এবং সুযোগমত গলায় রুমাল বা দড়ির ফাঁস লাগাইয়া হত্যা করিত। এই দলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক ছিল। বেন্টিঙ্ক ঠগীদের দমনের জন্য স্যার উইলিয়ম শ্লীম্যান নামক এক ব্যক্তির উপর ভার অর্পণ করেন। শ্লীম্যানের চেষ্টায় ১৮৩১—৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিন সহস্রাধিক ঠগী ধৃত ও দণ্ডপ্রাপ্ত হয়। অতঃপর ভারতবর্ষ হইতে ঠগীর উপদ্রব সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

সতীদাহ নিষিদ্ধ
ঠগী দমন

শিক্ষাবিষয়ক সংস্কারের জন্য বেন্টিঙ্ক ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্মরণীয়। ১৮১০ খৃষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্টের নির্দেশ ছিল যে অতঃপর কোম্পানীকে ভারতবাসীর শিক্ষা প্রসারের জন্য বাৎসরিক অন্যূন এক লক্ষ টাকা পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই নির্দেশ অনুযায়ী কোন কার্য্য হয় নাই। উক্ত অর্থ ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পরিবর্তে সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী প্রভৃতি দেশীয় ভাষার শিক্ষাপ্রসারের জন্য ব্যয়িত হইবে বলিয়া একটি পরিকল্পনা হয়। রাজা রামমোহন রায় দেশীয় ভাষা শিক্ষায় উক্ত অর্থব্যয়ের পরিবর্তে ইংরেজী শিক্ষার জন্য উক্ত অর্থব্যয়ের জন্য আবেদন জানান। যাহা হউক এই বিষয়ে পরস্পর বিরোধী দুইটি দলের সৃষ্টি হয়—প্রাচ্যপন্থী ও পাশ্চাত্যপন্থী। তদানীন্তন ভারতসরকারের আইনসদস্য লর্ড মেকলে পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে যুক্তিপূর্ণ উক্তি করেন। লর্ড বেন্টিক ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের নির্দেশ দেন। এতদ্ব্যতীত চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য বেন্টিঙ্ক কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ এবং বোম্বাইর এলফিনষ্টোন ইনষ্টিটুশনের

প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপে নানা ভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের বন্দোবস্ত করিয়া বেণ্টিঙ্ক ভারতবাসীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। ১

বেণ্টিঙ্কের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি—বেণ্টিঙ্ক শান্তিবাদী গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে তিনি কোন ব্যয়বহুল যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন নাই। সাধারণভাবে তিনি দেশীয় রাজন্যবর্গের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করেন নাই। অযোধ্যা, নিজাম, গাইকোয়াড়, হোলকার প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও তিনি কোন হস্তক্ষেপ করেন নাই। রাজপুতানার উদয়পুর ও জয়পুর রাজ্যের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ব্যাপারেও তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন। প্রজার কল্যাণার্থ তিনি কাছাড় (১৮৩০), কুর্গ (১৮৩৪) ও আসামের জয়ন্তিয়া অঞ্চল (১৮৩৫) বৃটিশের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এতদ্ব্যতীত মহীশূরে হিন্দু রাজার অধীনে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে তিনি মহীশূর রাজ্যে সাময়িকভাবে ইংরেজের শাসন প্রবর্তিত করেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রাশিয়ার প্রভাব প্রতিরোধ করার জন্য হেষ্টিংস পাঞ্জাবের অধিপতি রঞ্জিৎ সিংহের সঙ্গে মৈত্রীমূলক নীতি অনুসরণ করেন। ঐ একই প্রয়োজনে তিনি সিন্ধুদেশের আমীরগণের সহিত সৌহার্দ্যপূর্ণ নীতির অনুসরণ করেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনদ---১৮১৩ খৃষ্টাব্দের বিশ বৎসরের সনদের মেয়াদ ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে শেষ হইলে পুনরায় কোম্পানী আরও বিশ বৎসরের জন্য একটি সনদ লাভ করেন। ইহার দ্বারা চীনের সহিত কোম্পানীর বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার বিলুপ্ত করা হইল। এই সনদ অনুসারে বাংলার গভর্ণর-জেনারেল ভারতের গভর্ণর-জেনারেল উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। বাংলাদেশের জন্য পৃথক একজন গভর্ণর নিযুক্ত হইল। ফলে মাদ্রাজ ও বোম্বাই গভর্ণরের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা লুপ্ত হইল। গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলে আইন প্রণয়নের জন্য একজন সদস্য নির্বাচিত হইলেন। লর্ড মেকলে আইন সভার প্রথম সভ্য নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। এই সনদের বলে ইউরোপীয়ানগণ ভারতে ভূমি ক্রয়বিক্রয়ের অধিকার লাভ করিল। বহু ইউরোপীয় বণিক ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ভূমি ক্রয় করিল। এই সমস্ত ভূমিতে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা কফি, নীল, চা, অভ্র, কয়লা প্রভৃতি খনিজ ও বনজ দ্রব্যের ব্যবসার পত্তন করিতে লাগিল। এই নূতন সনদে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষা নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুসারে ভারতবাসীকে সরকারী উচ্চ-পদে নিযুক্ত করার নীতি গৃহীত হইল। লর্ড কর্নওয়ালিসের নীতি পরিত্যক্ত হইয়া ভারতবাসী সরকারী উচ্চপদের জন্য অযোগ্য নহে এই নীতি স্বীকৃত হইল।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের কৃতিত্ব :—বিভিন্ন সংস্কার ও ভারতবাসীর কল্যাণমূলক কার্য্যাবলীর জন্য বেণ্টিঙ্কের নাম ভারতের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

সাম্রাজ্য বিস্তার বা যুদ্ধাদির ব্যাপারে তিনি ওয়ারেন হেস্টিংস, লর্ড হেস্টিংস, ওয়েলেসলী বা ডালহৌসীর ন্যায় কৃতিত্ব অর্জন করেন নাই সত্য, কিন্তু ভারতবাসীর সামাজিক, শিক্ষানৈতিক এবং উন্নতিমূলক বহু সদনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি ভারতবাসীর অশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন। ঠগী দমন, সতীদাহ প্রথা নিবারণ, উচ্চ শিক্ষার প্রবর্তন প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা তিনি ভারতবাসীর চির-কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া রহিয়াছেন।

স্যার চার্লস মেটকাফ (১৮৩৫—৩৬):—লর্ড বেন্টিংকের পদত্যাগের পরে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের সহকারী শাসনকর্তা স্যার চার্লস মেটকাফ ভারতে অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেলের পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার শাসনকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেশীয় সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা দান। মেটক্যাফের উদারনীতিতে বিলাতের কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট হইলেন, ফলে মেটকাফ পদত্যাগ করেন।

লর্ড অকল্যাণ্ড (১৮৩৬—৪২):—মেটকাফের পরবর্তী গভর্ণর জেনারেল হইলেন লর্ড অকল্যাণ্ড। শিক্ষার সংস্কারে তিনি উৎসাহী ছিলেন। তিনি দেশীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদিগকে সরকারী বৃত্তিলাভের সুযোগ প্রদান করেন। তীর্থ-যাত্রীদের উপর কর রহিত করেন এবং ভারতীয় সেচবিভাগের কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া কোম্পানীর শাসন জনপ্রিয় করিয়া তোলেন। তাঁহার শাসনকালে (১৮৩৭—৩৮) খৃষ্টাব্দে উত্তর ভারতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং ইহাতে প্রায় আশি লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অকল্যাণ্ড

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব মৃত হইলে অযোধ্যার বিধবা বেগম কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, কিন্তু সহজেই তিনি পরাজিত হইলেন। ভারতের পশ্চিম উপকূলের সাতারা রাজ্য পর্তুগীজ ও দেশীয় কয়েকজন নরপতি সহযোগে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিলে বৃটিশ সরকার সাতারার রাজাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

দেশীয় রাজ্য নীতি

মাদ্রাজের অন্তর্গত কুর্ণালের নবাবও ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। নবাবকে বিতাড়িত করিয়া কুর্ণাল রাজ্য বৃটিশের অধিকারভুক্ত হয়।

প্রথম ইঙ্গ-আফঘান যুদ্ধ (১৮৩৯—৪২ খৃঃ):—এই যুদ্ধের মূল কারণ ইংলণ্ডের রুশ-ভীতি। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে পারস্যের দরবারে রাশিয়ার প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হয় এবং

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার প্ররোচনায় পারস্য হিরাট আক্রমণ করে। হিরাট আফঘানিস্থানের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং রাশিয়ার প্রভাবান্বিত পারস্য হিরাট অধিকার করিলে বৃটিশের ভারত সাম্রাজ্য বিশেষ বিপদাপন্ন হইত কেননা হিরাটের মধ্য দিয়া রাশিয়ার পক্ষে ভারতবর্ষ আক্রমণ অত্যন্ত সুবিধাজনক ছিল। রাশিয়ার এই অগ্রসর নীতিতে তদানীন্তন ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রসচিব পামারষ্টোন অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন এবং রাশিয়ার অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করার জন্য লর্ড অকল্যাণ্ডকে নির্দেশ দেন।

যুদ্ধের কারণ

ইংরেজদের রুশ ভীতি

অকল্যাণ্ড আফঘানিস্থানের আমির দোস্ত মহম্মদের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য আলেকজাণ্ডার বার্ণেস নামে একজন কর্মচারীকে বাণিজ্যদূত হিসাবে কাবুলে প্রেরণ করেন। দোস্ত মহম্মদ মৈত্রীবন্ধনের বিনিময়ে ইংরেজের নিকট এই দাবি করিলেন যে বৃটিশকে তাঁহার হস্তে পেশোয়ার অর্পণের জন্য শিখ নেতা রণজিৎ সিংহের উপর চাপ দিতে হইবে। লর্ড অকল্যাণ্ড ইংরেজের মিত্র রণজিৎ সিংহের উপর পেশোয়ার অর্পণের জন্য চাপ দিয়া শিখদের বিরাগভাজন হইতে সম্মত হইলেন না। অতএব আফঘান মৈত্রীর আশা তিরোহিত হইল। অতঃপর দোস্ত মহম্মদ রাশিয়ার দূত ভিক্টোভিচকে সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিলেন। অগত্যা লর্ড অকল্যাণ্ড দোস্ত মহম্মদকে আমিরের পদ হইতে অপসারিত করিয়া তাঁহার স্থলে গদীচ্যুত ভূতপূর্ব আমির শাহ সুজাকে বসাইতে সঙ্কল্প করিলেন। শাহসুজা বৃটিশের বৃত্তিভোগী হইয়া লুধিয়ানায় বাস করিতেছিলেন। অতঃপর শাহসুজা, ইংরেজ এবং রণজিৎ সিংহ—এই ত্রি-পক্ষ মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আফঘানিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। অতঃপর মিত্রশক্তি আফঘানিস্থান আক্রমণ করিয়া অতি সহজেই কান্দাহার, গজনী ও কাবুল অধিকার করিল। দোস্ত মহম্মদ ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে তাহাকে বন্দীরূপে কলিকাতায় আনা হইল, এবং তাঁহার স্থলে সুজাকে আফঘানিস্থানের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। স্বাধীনতাপ্রিয় আফঘানগণ বিদেশীদের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত শাহ সুজাকে স্বীকার করিতে পারিল না। উপরন্তু কাবুলে

দোস্ত মহম্মদ

আফঘানিস্তানের সহিত মৈত্রীর চেষ্টা নিষ্ফল

যুদ্ধ

ইংরেজদের পরাজয়

অবস্থিত ইংরেজ সামরিক কর্মচারীদের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচার তাহাদিগকে ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে আফঘানগণ দোস্ত মহম্মদের পুত্র আকবর খাঁর অধীনে বিদ্রোহ করিয়া আলেকজাণ্ডার বার্ণেসকে হত্যা করিল। বৃটিশের কাবুলস্থিত অমাত্য ম্যাক্‌নাটন আকবর খাঁর সহিত এক অপমানজনক সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। ইংরাজদিগকে কাবুল পরিত্যাগ করিতে হইবে, দোস্ত মহম্মদকে আমির স্বীকার করিতে হইবে এবং ইংরেজকে শাহ সুজার পক্ষ পরিত্যাগ করিতে হইবে। অবিলম্বে ম্যাক্‌নাটন বিদ্রোহিদের দ্বারা নিহত হইলেন এবং সমস্ত বৃটিশ সৈন্যকে সমুদয় আগ্নেয়াস্ত্র আফঘানদের নিকট সমর্পণ করিয়া আফঘানিস্থান হইতে ভারতে পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইল। প্রত্যাবর্তনের পথে প্রায় পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য শীতে অথবা আফঘানদের হস্তে নিহত হয়। এই শোচনীয় দুর্ঘটনার পর অকল্যাণ্ডকে পদত্যাগ করিতে হয় এবং লর্ড এলেনবরা গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসেন।

অকল্যাণ্ডের পদত্যাগ

এলেনবরা ইংরাজদের মানরক্ষার জন্য কান্দাহার হইতে সেনাপতি নট ও পেশোয়ার হইতে পোলককে গজনী ও কাবুল হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিলেন। বৃটিশ বাহিনী গজনী নগর ও দুর্গ বিধ্বস্ত করিল। কাবুলের বাজার তোপের সাহায্যে উড়াইয়া দেওয়া হইল। ইংরেজ বন্দিগণ উদ্ধার প্রাপ্ত হইল এবং বৃটিশ বাহিনী বিজয়গর্বে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিল। এই যুদ্ধে অকারণ লোকক্ষয় ও মর্য্যাদা নষ্ট ব্যতীত ইংরেজের কোন লাভ হইল না। শাহ সুজা ইতিপূর্বেই বিদ্রোহীদের দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন। দোস্ত মহম্মদ পুনর্বার কাবুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।

ইংরাজদের প্রতিশোধ গ্রহণ

লর্ড এলেনবরা (১৮৪২-৪৪):—লর্ড এলেনবরার শাসনকালের প্রথম ঘটনা প্রথম ইঙ্গ আফগান যুদ্ধ। এই যুদ্ধে কার্য্যতঃ তিনি সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার শাসনকালের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা সিন্ধুদেশ বিজয়। সিন্ধুবিজয়কে আফগান যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সিন্ধুদেশ তালপুরের আমীর বা মীরদের দ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছিল। ইহা নামতঃ আফঘানিস্থানের অধীন হইলেও কার্য্যতঃ স্বাধীন ছিল। দীর্ঘকাল যাবৎ বৃটিশ সরকারের লুব্ধ দৃষ্টি সিন্ধুদেশের উপর পতিত হইয়াছিল। লর্ড মিণ্টো ও লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ে সিন্ধুদেশের সহিত ইংরেজদের বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে আমীরগণ তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে

সিন্ধুবিজয়

নেপিয়ার প্রেরিত হন

ইংরেজদের সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই চুক্তি অনুযায়ী হিন্দুস্থানের ব্যবসায়ীগণ সিন্ধুদেশে অবাধ বাণিজ্য করিতে পারিবেন, কিন্তু কোন রণতরী বা সামরিক দ্রব্যাদি সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে পারিবে না। প্রথম আফঘান যুদ্ধের সময়ে উপরি-উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ইংরেজগণ সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া আফিঘানিস্থানে সৈন্য প্রেরণ করিল। আমীরদের প্রতিবাদে কোন ফল হইল না। এত আনুগত্য সত্ত্বেও আমীরগণ বৃটিশের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হয় এবং স্যার চার্লস নেপিয়ারকে সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়া সিন্ধুদেশে প্রেরণ করা হয়। নেপিয়ারের উদ্ধত ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া বেলুচিগণ ইংরেজদিগকে আক্রমণ করে। মিয়ানী ও দাবোর যুদ্ধে ইংরেজগণ জয়লাভ করে। আমীরগণ রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইল এবং সিন্ধুদেশ বৃটিশের অধিকারভুক্ত হইল। সিন্ধুদেশ অধিকার সম্বন্ধে এলেনবরা ও নেপিয়ারের আচরণ অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

সিন্ধুদেশ বৃটিশের অধিকারভুক্ত

এলেনবরার সময়ে অন্যতম ঘটনা দেশীয় রাজ্য গোয়ালিয়রে বৃটিশের আধিপত্য বিস্তার। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে জনকজী সিন্ধিয়া মৃত হইলে গোয়ালিয়রে আভ্যন্তরীণ অশান্তি দেখা দেয়। এলেনবরা গোয়ালিয়রের আভ্যন্তরীণ বিরোধে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। সিন্ধিয়ার সৈন্যদল যদি পার্শ্ববর্তী শিখ রাষ্ট্রের সত্তর হাজার সৈন্যের সঙ্গে যোগদান করিয়া বৃটিশের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে, তাহা হইলে বৃটিশ আধিপত্য বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। এলেনবরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে গোয়ালিয়রের বিরোধের সমাধানে ব্যর্থ হইয়া গোয়ালিয়রের বিরুদ্ধে দুই দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। গোয়ালিয়রের সৈন্যদল মহারাজপুর ও পানিয়ারের যুদ্ধে পরাজিত হইল। গোয়ালিয়র বৃটিশের আশ্রিত রাজ্য পরিণত হইল। সৈন্যদলের সংখ্যা হ্রাস করা হইল এবং একজন বৃটিশ রেসিডেন্টের অধীনে নাবালক রাজার জন্য অভিভাবক সভা প্রতিষ্ঠিত হইল।

গোয়ালিয়র বৃটিশের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত

শিখজাতি ও রণজিৎ সিংহ (১৭৮০-১৮৩৯) :—নাদির শাহ ও আহম্মদ শাহ আবদালীর আক্রমণের ফলে যখন পাঞ্জাবে মুঘল প্রাধান্য বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন শিখজাতি পাঞ্জাবে অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠে। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে শিখরা লাহোর অধিকার করে এবং আবদালীর প্রস্থানের পরে আবদালী-অধিকৃত সমগ্র ভারতীয় অঞ্চল শিখরা হস্তগত করে এবং পূর্বে শাহরাণপুর হইতে পশ্চিমে আটক এবং দক্ষিণে মুলতান হইতে উত্তরে কাংড়া এবং জম্মু পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে শিখদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। কিন্তু অচিরেই শিখরা আধিপত্য লইয়া আত্মবিরোধে রত হয়। পরস্পর বিবদমান ও

দুর্বল শিখশক্তিকে যিনি ঐক্যবদ্ধ করিয়া একটি প্রবল রাষ্ট্রশক্তিতে পরিণত করেন, তাঁহার নাম রণজিৎ সিংহ।

রণজিৎ সিংহ শিখদের দ্বাদশটি মিসল বা গোষ্ঠীর অন্যতম সুকরচরিয়া মিসলের নায়ক মহাসিংহের পুত্র ছিলেন। দ্বাদশবর্ষে পিতৃহীন হইলে তিনি পৈত্রিক মিসল বা দলের নেতা নির্বাচিত হন। আহম্মদ শাহ আবদালীর মৃত্যুর পরে তাঁহার পৌত্র জামান শাহ কাবুল ও পাঞ্জাবের অধিপতি হন। রণজিৎ সিংহ তাঁহাকে সাহায্য করিলে তিনি অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করেন এবং লাহোরের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করেন। পঞ্জাবে তখন অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি চলিতেছিল। নূতন সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবার ইহাই সুযোগ বুঝিতে পারিয়া রণজিৎ সিংহ প্রথমে আফগান প্রভুত্ব অস্বীকার করিলেন এবং শতদ্রু নদীর উত্তরতীরস্থিত শিখ মিসলদিগকে সুকৌশলে স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন।

রণজিৎ সিংহ

শিখজাতির নায়ক

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহ শতদ্রু নদী অতিক্রম করিয়া লুধিয়ানা অধিকার করেন। অগত্যা শতদ্রুর দক্ষিণস্থ মিসলের শিখনায়কগণ ভীত হইয়া রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য বৃটিশের শরণাপন্ন হন। লর্ড মিন্টো নিরপেক্ষ নীতির পক্ষপাতী হইলেও পঞ্জাবে শিখশক্তির প্রভাব খর্ব করার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে অমৃতসরের সন্ধি দ্বারা বৃটিশের সঙ্গে রণজিৎ সিংহের মৈত্রী স্থাপিত হইল। এই সন্ধি অনুযায়ী রণজিৎ সিংহের রাজ্যসীমা শতদ্রুনদীর উত্তর তীর পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইল। শতদ্রুর দক্ষিণস্থ শিখরাজ্যগুলি ইংরেজের রক্ষণাধীনে রহিল। পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তারের আশা এইভাবে ব্যাহত হওয়াতে রণজিৎ সিংহ উত্তরে, পশ্চিমে এবং উত্তরপশ্চিমে রাজ্য প্রসারিত করিতে লাগিলেন। আটক, মুলতান, কাশ্মীর, পেশোয়ার প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া খাইবার গিরিবর্ত্ম পর্য্যন্ত নিজের রাজ্য বিস্তৃত

অমৃতসরের সন্ধি ১৮০৯

রাজ্য বিস্তার

পেশোয়ার
শ্রীনগর
কোহাট
বান্নু
জম্মু
কাংড়া
লাহোর
অমৃতসর
জলন্ধর
শিমলা
আম্বালা
পাতিয়ালা
ডেরাগাজিখাঁ
মীরাট
দিল্লী
শিখ রাজ্য ও

করিলেন। পলাতক আফগান রাজা শাহ সুজা তাঁহার আশ্রয়প্রার্থী হইলে তিনি তাঁহার নিকট হইতে জগদ্বিখ্যাত কোহিনুর হস্তগত করিলেন। প্রথম ইঙ্গ-আফঘান যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বে ১৮ ৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

রণজিৎ সিংহ আধুনিক ভারতের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি এই যে, তিনি বিশৃঙ্খল শিখজাতিকে স্বীয় শাসনগুণে এক সংহত রাষ্ট্রের পরিচালনাধীনে আনিয়া নূতন এক শক্তিশালী রাষ্ট্রশক্তির সূচনা করেন। তিনি বিবদমান শিখজাতিকে যে কেবল একরাষ্ট্রীয় রাজতন্ত্রের প্রজায় পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি শিখদিগকে সামরিক শিক্ষায় উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করিয়া এমন দুর্দ্ধর্ষ খালসা সৈন্যদলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, ইহাদিগকে স্ববশে আনিতে বৃটিশের যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। সৈন্যদের সামরিক শিক্ষার জন্য তিনি ইউরোপীয় সেনানায়কের সাহায্য গ্রহণ করেন। বিদেশীদের দ্বারা শিক্ষিত হইলেও খালসা সৈন্যদলের জাতীয়ভাব মোটেই নষ্ট হয় নাই।

রণজিৎ সিংহ মাত্র রণকুশলী সেনানায়ক ছিলেন না, তাঁহার পরাক্রম ও শাসনদণ্ডের খ্যাতি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বহু বিদেশী পর্যটক তাঁহার রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার অসামান্য রণপ্রতিভা ও রাজনীতিকুশলতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। একনায়ক রাষ্ট্রের অধিপতি হইলেও তিনি শাসনব্যবস্থায় অতিরিক্ত স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। রণজিৎ সিংহ নিরক্ষর হইলেও তাঁহার বুদ্ধিশক্তি অসাধারণ ছিল। শাসনকার্যে ন্যায় ও সততার নীতি অনুসরণ করিয়া এবং ধর্ম সম্বন্ধে সকলের প্রতি সম আচরণ করিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও প্রশংসাভাজন হন।

রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পরে শিখরাজ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। রণজিৎ সিংহের পর তাঁহার পুত্র খড়্গ সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মাত্র এক বৎসরকাল রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে শিখরাজ্য পুনরায় আভ্যন্তরীণ অশান্তির সম্মুখীন হয়। পরিশেষে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের নাবালক পুত্র দলীপ সিংহকে পিতৃসিংহাসনে স্থাপন করা হয় এবং রাজমাতা ঝিন্দন তাঁহার অভিভাবিকা নিযুক্ত হন। এই গোলযোগের মধ্যে খালসা সৈন্যদল প্রবল হইয়া পড়ে এবং রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতা লালসিংহ ও তেজসিংহ নামে দুইজন শিখ সেনানায়কের হস্তগত হয়।

লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৮৪৪—৪৮): প্রথম ইঙ্গ শিখ যুদ্ধ—এলেনবরার পরে লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। কার্য্যভার গ্রহণের অত্যল্পকাল পরেই তাঁহাকে শিখদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইল। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পরে খালসা বাহিনীর নেতৃত্ব সামরিক নেতাদের হস্তগত হইলেও তাঁহারা

খালসা বাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিতে পারিলেন না। তজ্জন্য তাঁহারা তাহাদিগকে কোন যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখার কথা চিন্তা করিতেছিলেন। ১৮৪৪—৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ শতদ্রু নদীর উপর সেতু নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা করিতেছিল এবং শিখদের মনে সন্দেহ উৎপাদক আরও বহু কার্যক্রম অনুসরণ করিতেছিল। এই সমস্ত কার্যের ফলে শিখদের মনে এই ধারণা হয় যে, বৃটিশ শক্তি অবিলম্বে শিখ রাজ্য আক্রমণ করিবে। এই সুযোগে রাণী ঝিন্দন শিখজাতিকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্ররোচিত করিলেন। ইংরেজের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলে খালসা সৈন্যদলের ক্ষমতা হ্রাস পাইবে—আর জয়ী হইলে পুনরায় যুদ্ধে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহিত করা যাইবে। খালসা সৈন্যদল ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে শতদ্রু অতিক্রম করিলে প্রথম শিখ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মুদকী, ফিরোজশাহ, আলিওয়াল ও সোব্রাওঁ এই চারিটি যুদ্ধে খালসা সৈন্যের পরাজয়ের পরে প্রথম শিখ যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। ইংরেজসৈন্য লাহোর অধিকার করিয়া শিখগণকে সন্ধির শর্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য করিল। লাহোরের সন্ধি অনুযায়ী শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্তী অঞ্চল ইংরেজকে সমর্পণ করিতে হইল, মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইল, শিখ সৈন্যদের সংখ্যা হ্রাস করা হইল এবং লাহোরে একজন বৃটিশ রেসিডেন্ট রাখা হইল। ক্ষতিপূরণের অর্থ দিতে না পারায় কাশ্মীর ও জম্মুকে গোলাপ সিংহ নামক একজন সর্দারের নিকট ৭৫ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করা হইল। পাঞ্জাব প্রকৃত পক্ষে বৃটিশের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিল।

যুদ্ধের কারণ

শিখদের পরাজয়

লাহোরের সন্ধি ১৮৪৬

লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮—৫৬)—লর্ড হার্ডিঞ্জের পরে লর্ড ডালহৌসী ভারতের গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসেন। তাঁহার শাসনকাল আধুনিক যুগের ইতিহাসে নানা কারণে স্মরণীয়। তিনি ওয়েলেসলী ও লর্ড হেষ্টিংসের ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রসারের জন্য বাহুবল ব্যতীত স্বত্ববিলোপ নীতি, প্রজার কল্যাণার্থ এবং অন্যান্য নানা প্রকার বৈধ এবং অবৈধ উপায়ে বহু দেশীয় রাজ্য বৃটিশের অধিকারভুক্ত করেন। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ তাঁহার শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনার অন্যতম।

দ্বিতীয় ইঙ্গ শিখ যুদ্ধ (১৮৪৮—৪৯)—প্রথম শিখযুদ্ধে শিখরা পরাজিত হইলেও প্রকৃত শক্তি পরীক্ষায় পরাজিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা মনে করিতে পারিল না। তাঁহারা মনে করিল সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতাই তাহাদের শোচনীয় পরাজয়ের জন্য দায়ী। সুতরাং পুনরায় শিখদের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে ইংরেজগণ বৃটিশ রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে রাজমাতা ঝিন্দনকে নির্বাসিত করিলে শিখদের অসন্তোষ আরও তীব্র হইয়া পড়িল। এই সময়ে মুলতানের শাসনকর্তা মূলরাজের সঙ্গে লাহোর-দরবারের মনান্তর হওয়ায় মূলরাজ পদত্যাগ করেন। তাঁহার স্থলে অপর একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া লাহোরের বৃটিশ রেসিডেন্ট নূতন শাসনকর্তাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দুইজন ইংরেজ কর্মচারী প্রেরণ করেন। মূলরাজের প্ররোচনায় মুলতান বিদ্রোহী হইয়া এই দুইজন ইংরেজ কর্মচারীকে নিহত করিল।

যুদ্ধের কারণ

লর্ড ডালহৌসী

মুলতানের শাসন কর্তাকে দমন করার জন্য লাহোর হইতে সৈন্য প্রেরিত হইলে তাহারা ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। লর্ড ডালহৌসী অগত্যা শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে (১৮৪৯) ইংরেজরা পরাজিত হইলেও মুলতানে ও গুজরাটের যুদ্ধে তাহারা জয়ী হইল। লর্ড ডালহৌসী পাঞ্জাবকে সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন (১৮৪৯)। মহারাজ দলীপ সিংহকে বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হইল। এইরূপে স্বাধীন শিখরাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল এবং বৃটিশ ভারতের সীমা আফঘানিস্থানের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইল।

চিলিয়নওয়ালা ও গুজরাটের যুদ্ধ

শিখদের পরাজয়

দ্বিতীয় ইঙ্গ ব্রহ্ম যুদ্ধ (১৮৫৩—৫২)—প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের পরে ইয়ান্দাবোর সন্ধির শর্ত্ত অনুযায়ী ব্রহ্মদেশে একজন বৃটিশ রেসিডেন্ট রাখার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ব্রহ্মরাজ পাগান ইয়ান্দাবোর শর্ত্তগুলি মানিয়া চলিতে রাজি হইলেন না—উপরন্তু তিনি বৃটিশ রেসিডেন্ট বা ইংরেজ ব্যবসায়ীদের উপর বহু অপমানজনক আচরণ করেন। লর্ড ডালহৌসী এই সমস্ত অবিচারের জন্য ব্রহ্মরাজের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ দাবি করিয়া কমোডোর ল্যাম্বার্ট নামে জনৈক ইংরেজ কর্মচারীকে রণপোত সহ ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করেন। ল্যাম্বার্ট ব্রহ্ম-সরকারের একটি জাহাজের উপর গোলাবর্ষণ করিলে প্রত্যুত্তরে ব্রহ্মদেশের সৈন্যগণ

ব্রহ্ম যুদ্ধের কারণ

তাহাকে আক্রমণ করে। ল্যাম্বার্ট রেঙ্গুন অবরোধ করেন এবং দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্মযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। অল্পকালের মধ্যে ইংরেজসৈন্যদল মার্তাবান, প্রোম, পেগু ও রেঙ্গুন অধিকার করে। অগত্যা ব্রহ্মরাজ ইংরেজদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাকে পেগু ইংরেজদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইল। এইরূপে দক্ষিণ ব্রহ্ম ইংরেজদের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

পাঞ্জাব ও পেগু ব্যতীত সিকিম রাজ্যের একাংশ লর্ড ডালহৌসীর সময়ে বৃটিশের অধিকারভুক্ত হয়। সিকিমরাজ বৃটিশ প্রতিনিধিকে আটক করিয়াছিলেন এবং দুইজন বৃটিশ প্রজার উপর দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন এই অভিযোগে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সিকিমের ১৬৭৮ বর্গমাইল পরিমিত অংশ বৃটিশের দ্বারা বাজেয়াপ্ত হয়। হায়দ্রাবাদের নিজাম বহুকাল যাবৎ স্বীয় রাজ্যে বৃটিশ সেনা পোষণের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করেন নাই এই অভিযোগে তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থের বিনিময়ে ডালহৌসী বেরার প্রদেশ গ্রহণ করেন।

সিকিমের একাংশ দখল

নিজামের নিকট হইতে বেরার দখল

ডালহৌসীর স্বত্ববিলোপ নীতি ও রাজ্যবিস্তার—সাম্রাজ্যবাদী ডালহৌসী রাজ্য-বিস্তারের উদ্দেশ্যে 'স্বত্ববিলোপ নীতি' বা 'বাজেয়াপ্ত নীতি' নামক এই অভিনব নীতির প্রবর্তন করিয়া বহু দেশীয় রাজ্য বৃটিশের কুক্ষিভুক্ত করেন। এই নীতি অনুসারে লর্ড ডালহৌসী প্রচার করিলেন যে বৃটিশের অধীন বা বৃটিশ শক্তির সাহায্যে গঠিত কোন দেশীয় রাজ্যের রাজার কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে সেই রাজ্য বৃটিশের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়িবে। কোন দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া তাহাকে অপুত্রক রাজার উত্তরাধিকারী করা যাইবে না। লর্ড ডালহৌসীর পূর্বেই এই নীতি উদ্ভাবিত ও কিয়ৎপরিমাণে কার্যকরী হইলেও তাঁহার সময়ে কঠোরভাবে এই নূতন নীতি প্রযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া ইহার সঙ্গে ডালহৌসীর নামই বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই স্বত্ব বিলোপের নীতি অনুসারে সাতারা, ঝাঁসি, নাগপুর, সম্বলপুর, প্রভৃতি কয়েকটি দেশীয় রাজ্য বৃটিশের অধিকারভুক্ত হইল। স্বত্ববিলোপ নীতি অনুযায়ী কয়েকটি ভূতপূর্ব নরপতির বার্ষিক বৃত্তি বা উপাধি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও-এর দত্তক পুত্র নানা সাহেবকে বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইল। কর্ণাটের নবাব ও তাঞ্জোরের রাজার দত্তক পুত্রদের উপাধি ও বৃত্তি বন্ধ করা হইল। লর্ড ডালহৌসী দিল্লীর সম্রাটের উপাধি লোপের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু বিলাতের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না পাওয়ায় ইহা কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

স্বত্ববিলোপ নীতি ব্যতীত প্রজার হিত সাধনের অজুহাতে লর্ড ডালহৌসী ১৮৫৬

খৃষ্টাব্দে অযোধ্যা বৃটিশের অধিকারভুক্ত করিলেন। নবাব ওয়াজিদ আলিকে বার্ষিক বৃত্তি দিয়া কলিকাতায় নির্বাসিত করা হইল।

অন্যান্য অজুহাতে রাজ্য অধিকার

বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদে সিকিমের কিয়দংশ এবং উত্তরাধিকারীর অভাবে উড়িষ্যার সম্বলপুর রাজ্য ইংরেজের অধিকৃত হইল।

লর্ড ডালহৌসীর এইভাবে নানা অজুহাতে দেশীয় রাজ্য অধিকার করা অত্যন্ত নীতিবিগর্হিত হইয়াছে। নাগপুর ও অযোধ্যা অধিকার করার ব্যাপারে যে নির্লজ্জ স্বার্থপরতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে ভারতবাসীর মনে অত্যন্ত অশ্রদ্ধার সৃষ্টি হইয়াছিল। ডালহৌসীর দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে অনুসৃত নীতির মর্মকথা এই ছিল যে কোন উপায়ে ভারতে বৃটিশের অধিকার বিস্তৃত করিয়া বৃটিশকে সার্বভৌম শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং অধিকার বিস্তারের জন্য তিনি বাহুবল, 'স্বত্ববিলোপ', প্রজাহিত প্রভৃতি যে সকল নীতিবিন্যাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টিকোণ ব্যতীত অন্য কোন দিক হইতে সমর্থন করা চলে না। ডালহৌসীর রাজ্যগ্রাসী নীতি বহুক্ষেত্রে প্রয়োজনানুরোধে অনুসৃত হইলেও সাধারণভাবে ইহা ভবিষ্যতের পক্ষে অকল্যাণকর হইয়াছিল। তাঁহার আচরণের ফলে দেশীয় রাজ্যসমূহে বৃটিশের উদ্দেশ্য ও সততা সম্বন্ধে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং অনতিকালপরে সমগ্র ভারতব্যাপী সিপাহী বিদ্রোহের অগ্নিপ্রজ্বলনে সহায়তা করিয়াছিল।

ডালহৌসীর আভ্যন্তরীণ শাসন:—লর্ড ডালহৌসী বহু জনহিতকর কার্যে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় ভারতে প্রথম রেলপথ ও গ্রাণ্ড ট্রাঙ্করোড নির্মিত হয় এবং গঙ্গার বিখ্যাত খালের খনন কার্য্য সম্পূর্ণ হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ও রাণীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলের মধ্যে রেলপথের ব্যবস্থা হয়। তিনি ডাক বিভাগের সৃষ্টি করেন এবং দুই পয়সার মাশুলে ভারতের সর্বত্র পত্র প্রেরণের প্রচলন করেন। ডালহৌসী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করেন। ধর্মান্তর গ্রহণের জন্য পৈত্রিক উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করার প্রথা তুলিয়া দিয়া একটি আইন পাশ করা হয়। বিধবা বিবাহ আইনসঙ্গত বলিয়া গৃহীত হয় এবং দেবতার নামে নরবলি দণ্ডার্হ বলিয়া বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা বিষয়ক নির্দেশপত্র (Education Despatch, 1851) অনুসারে ডালহৌসী শিক্ষা বিভাগের সৃষ্টি করেন এবং তাঁহার আগ্রহে ভারতের নানা স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ডালহৌসীর উৎসাহে এবং মহামতি বেথুন সাহেবের চেষ্টায় স্ত্রী শিক্ষালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া কোম্পানী শেষবারের মত সনদ লাভ করে। ইহাতে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের ক্ষমতা খর্ব করিয়া ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভাকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা সিভিল সার্ভিস বা উচ্চ রাজকার্যে লোক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।

ভারত গভর্ণমেন্টের সীমান্ত সমস্যা:—উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ক্রম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও পূর্ব সীমান্ত সমস্যার সৃষ্টি হইতে থাকে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যা প্রথম দিকে নেপোলিয়ন কর্তৃক মিশর অধিকারের পরে ভারতের দিকে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। নেপোলিয়নের পতনের পরে রাশিয়ার এশিয়া মহাদেশে অগ্রসরনীতির দ্বারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল। আফগানিস্থানের দিকে রাশিয়ার ক্রমাগ্রসরনীতি ইংলণ্ডকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল এবং ইংলণ্ড রাশিয়ার অগ্রগতি প্রতিহত করার জন্য সচেষ্ট হইল, পাছে রাশিয়া আফঘানিস্থানের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া বৃটিশ ভারতে সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, সেই আশঙ্কা প্রতিরোধ করার জন্য ইংরেজগণ শিখনেতা রণজিৎ সিংহের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হন ও আফঘানিস্থানের সহিত মিত্রতা স্থাপনে আগ্রহান্বিত হন। কিন্তু আমীর দোস্ত মহম্মদ এই সম্ভাবিত মৈত্রীর মূল্য স্বরূপ রণজিৎ সিংহের অধিকৃত পেশোয়ার দাবি করিলে এই মৈত্রীর সম্ভাবনা অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং প্রথম ইঙ্গ-আফঘান যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। ইঙ্গ আফঘান যুদ্ধে অবশ্য ইংরেজরা বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই এবং রুশ আক্রমণের আশঙ্কাও পূর্ণ উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া বৃটিশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তনীতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল। আফঘানিস্থানে রুশ প্রভাব প্রতিহত করার জন্য লর্ড লিটনের শাসনকালে দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফঘান যুদ্ধের সূত্রপাত হয় এবং লর্ড রিপনের সময়ে তাহার অবসান হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যা সুদৃঢ় করার অজুহাতেই লর্ড এলেনবরার সময়ে সিন্ধুদেশ অধিকৃত হয় এবং লর্ড ডালহৌসীও এই উদ্দেশ্যেই পাঞ্জাবকে বৃটিশের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। দ্বিতীয় আফঘান যুদ্ধে ফলে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের কালাত রাজ্য বৃটিশের অধীনে আসিলে, বৃটিশ বেলুচিস্তান নামে এক নূতন প্রদেশের সৃষ্টি হইল, কোয়েটাতে সৈন্য রাখিবার স্থায়ী ব্যবস্থা হইল এবং বোলান গিরিপথ

সমস্যার মূলে ছিল রুশভীতি

প্রথম ইঙ্গ-আফঘান যুদ্ধ

পাঞ্জাব, সিন্ধু অধিকার

পরিশেষে মোটামুটি সমস্যার সমাধান
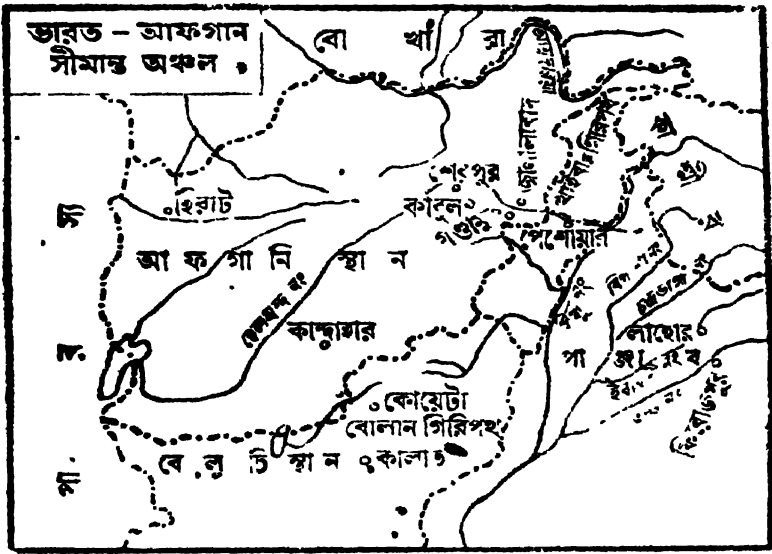
ভারত—আফগান সীমান্ত অঞ্চল

ইংরেজদের দখলে আসিল। পরিশেষে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে রুশ-আফঘান সীমানা নির্দ্ধারক কমিটি গঠিত হইয়া উভয় রাষ্ট্রের রাজসীমা নির্দ্ধারিত হইলে রুশ-ভীতি নিবারিত হইল এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তিক সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান হইল।

এতদ্ব্যতীত এই সীমান্তের উপজাতিদের দ্বারা অনুষ্ঠিত লুণ্ঠন, নরহত্যা, বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলে আসিয়া লুঠতরাজ প্রভৃতি উপদ্রব ইংরেজকে চিন্তাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। এই সমস্ত উপজাতি ইংরেজ বা আফঘানিস্থান কাহারও অধীনতা স্বীকার করিত না। ইহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া এই অঞ্চলকে সুরক্ষিত করার জন্য বৃটিশকে দমননীতি ও শান্তনীতি দুইই একসঙ্গে অনুসরণ করিতে হইয়াছে। ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের সীমান্তরেখা মটিমার ডুরাণ্ডের নেতৃত্বে স্থিরীকৃত হয় এবং এই সমস্ত উপজাতিকে উপদ্রব হইতে বিরত করার মূল্যস্বরূপ আফঘানিস্থানের আমীরকে বাৎসরিক আঠার লক্ষ টাকা প্রদান করার চুক্তি হয়। এতদ্ব্যতীত উপদ্রুত অঞ্চল সমূহে সামরিক ঘাঁটি, রেলপথ, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ করার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করা হয়। উৎকোচ গ্রহণের দ্বারা ইহাদিগকে হস্তগত রাখার চেষ্টাও যথেষ্ট করা হয়। এই সমস্ত প্রতিরোধমূলক প্রতিবিধানের দ্বারা ইহাদের উপদ্রব সম্পূর্ণ নিবারিত হয় নাই।

উপজাতিদের উপদ্রব-সমস্যা

পূর্ব সীমান্তের সমস্যা দূর করার সম্বন্ধেও উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ শক্তি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল। প্রথমদিকে ব্রহ্মদেশের আধিপত্য এই অঞ্চলে ছিল। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের পরে আসাম, আরাকান, কাছাড় প্রভৃতি বৃটিশের হস্তগত হয়। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধও এই সীমান্তিক সমস্যার তাগিদেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। যুদ্ধে ব্রহ্মরাজের পরাজয়ের ফলে বৃটিশ সরকার পেগু অধিকার করিল এবং চট্টগ্রাম হইতে সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত যাবতীয় সমুদ্রোপকূল সন্নিহিত অঞ্চল বৃটিশের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিল। সিঙ্গাপুরে বৃটিশের শক্তিশালী নৌ-ঘাঁটি নির্মিত হওয়াতে বঙ্গোপসাগরে বিপক্ষের আগমনের আশঙ্কা তিরোহিত হইল। এইরূপে ভারতের দুই সীমান্তিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হইল।

লর্ড ক্যানিং (১৮৫৬—৬২) ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ (মিউটিনি):— লর্ড ডালহৌসীর পরে লর্ড ক্যানিং ভারতবর্ষে গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। লর্ড ক্যানিং-এর শাসনকাল নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্য উল্লেখযোগ্য। তাঁহার শাসনকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহ।

পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও লর্ড ক্যানিংকে কয়েকটি ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পরে রাশিয়া ইউরোপে পরাজয়ের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এশিয়ার দিকে অগ্রসরনীতি অনুসরণ করিল। রাশিয়ার দ্বারা প্ররোচিত হইয়া পারস্য আফঘানিস্থানের হিরাট অধিকার করিলে ইংরেজের মনে রুশভীতির সঞ্চার হইল। ক্যানিং রাশিয়ার প্রভাব বন্ধ করার জন্য পারস্যে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করিলেন। এই অভিযানের ফলে পারস্যের অধিকৃত পারস্যোপসাগরস্থিত বুশায়ার নামক স্থান অধিকৃত হয়। অগত্যা পারস্য হিরাট পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাদপসরণ করে। ১৮৪০-৪২ খৃষ্টাব্দে অহিফেনের ব্যবসাকে কেন্দ্র করিয়া চীনদেশের সহিত ইংরেজের এক যুদ্ধ হয়। ইহা অহিফেন যুদ্ধ বা প্রথম চীন যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৮৫৬—৫৮ খৃষ্টাব্দেও পুনরায় দ্বিতীয়বার চীনদেশের সঙ্গে ইঙ্গ ফরাসীর সম্মিলিত শক্তির যুদ্ধ হয়। এই সমস্ত যুদ্ধ ক্যানিং-এর শাসনকালকে কথঞ্চিৎ প্রভাবিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

পররাষ্ট্রীয় কার্য্যাবলী

আফগানীস্থানে রুশ প্রভাব নিবারণ

লর্ড ক্যানিং

বিদ্রোহের কারণ ও বৈশিষ্ট্যঃ—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ক্যানিং-এর শাসনকালে ভারতবর্ষে ইংরেজের বিরুদ্ধে নানা অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহের উদ্যোক্তা ও অংশগ্রহণকারীরা প্রধানতঃ সিপাহী ছিল বলিয়া ইহা সাধারণতঃ সিপাহী বিদ্রোহ নামে পরিচিত। কাহারও কাহারও মতে ইহা ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় অভ্যুত্থান বলিয়া ইহাকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ বলা যাইতে পারে।

সিপাহী বিদ্রোহ অথবা স্বাধীনতার যুদ্ধ

এই বিদ্রোহের কারণকে প্রধানতঃ চার ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক এবং সামরিক কারণ। রাজনৈতিক কারণগুলির মধ্যে ডালহৌসীর স্বত্ববিলোপ নীতির সাহায্যে এবং নানা অজুহাতে সাতারা, ঝাঁসি, নাগপুর, অযোধ্যা সম্বলপুর, তাঞ্জোর, সুরাট, কর্ণাট প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য বৃটিশের করতলগত করার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল কার্য্যের ফলে দেশীয় হিন্দু ও মুসলমান নরপতি ও জনসাধারণের মনে বৃটিশের বিরুদ্ধে সন্দেহ ও অসন্তুষ্ট মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। অযোধ্যা অধিকার বা মুঘল বাদশাহকে পূর্ব গরিমা হইতে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা মুসলমানদিগকে বৃটিশ বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল। আবার পেশোয়ার দত্তক পুত্র নানা ধুন্দুপন্থকে বৃত্তি হইতে

(ক) রাজনৈতিক কারণ

বঞ্চিত করিয়া ইংরেজরা হিন্দুদের বিদ্বেষের কারণ হইল। প্রকৃত প্রস্তাবে ডালহৌসীর অনুসৃত নীতিতে রাজ্যবঞ্চিত বা অসন্তুষ্ট দেশীয় নৃপতিবর্গ বা তাঁহাদের সহযোগিবৃন্দই বৃটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক কারণ ব্যতীত এই বিদ্রোহের পশ্চাতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণও বিদ্যমান ছিল। বহু দেশীয় রাজ্য ও জায়গির বৃটিশের কবলিত হওয়ায় এই সমস্ত অঞ্চলের কর্মচারিবৃন্দ ও অনুচরগণ কর্মচ্যুত হইয়া অর্থনৈতিক দুরবস্থায় পতিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরকালে দাক্ষিণাত্যের প্রায় কুড়ি হাজার জমিদারের জায়গির বাজেয়াপ্ত করা হয়। অযোধ্যা প্রদেশে এই অর্থনৈতিক অশান্তি আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। কেননা এই স্থানের ভূতপূর্ব রাজকর্মচারীদের বৃত্তি ও ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অযোধ্যার সৈন্যবিভাগ ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে সামরিক বৃত্তিধারী অসংখ্য লোক কর্মচ্যুত হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে বৃটিশ শাসকশ্রেণী ভারতীয়দের প্রতি যে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের মনোভাব শাসন-ব্যাপারে ও অন্যান্য বিষয়ে প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিল, তাহার ফলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে অসম্প্রীতি ও বিদ্বেষের মনোভাব সৃষ্ট হইতে থাকে। উচ্চ সরকারী পদে ভারতীয়দের গ্রহণ না করা, বর্ণবিদ্বেষ, বিচারে শাসক ও শাসিত জাতির মধ্যে বৈষম্য-মূলক আচরণ প্রভৃতি ভ্রান্তনীতির ফলে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠে। ইহাকে বিদ্রোহের সামাজিক কারণ বলা যাইতে পারে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ

উপরি-উক্ত কারণগুলির সঙ্গে ধর্মনৈতিক কারণও জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরেজ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যে শিক্ষাদীক্ষা ও ভাবধারাও ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল। সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, শিশু বা নরবলি নিবারণ, ধর্মান্তরিত হিন্দুর সম্পত্তিতে অধিকার, খৃষ্টান মিশনারীদের উগ্র ধর্ম প্রচার, ইংরেজী ভাষার প্রচলন, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের প্রবর্তন—সমস্ত পরিবর্তন মূলক ব্যবস্থা সনাতনপন্থী হিন্দুর মনে এই ধারণার সৃষ্টি করিয়াছিল যে, ইংরেজরা ভারতীয়দিগকে বিজাতীয় ধর্ম ও সভ্যতার অনুগামী করিতেছে। এই ধর্মনৈতিক কারণেই ভেলোরের 'ওয়াহাবী' বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

ধর্মনৈতিক কারণ

বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তনে জাতিনাশের ভয়

উপরি-উক্ত কারণ সমূহ বর্তমান থাকিলেও যদি ইংরেজের দেশীয় সৈন্যদল নিশস্ত্র থাকিত, তাহা হইলে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হইত কিনা সন্দেহ। নানাকারণে দেশীয়

সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ বর্তমান ছিল এবং বিদ্রোহের পূর্বে সিপাহীরা তেরো বৎসরের মধ্যে চারিবার বিদ্রোহ করিয়াছিল। সৈন্যদলে নিয়মানুবর্তিতার যথেষ্ট অভাব ঘটিয়াছিল এবং বহু দক্ষ সামরিক কর্মচারী শাসনবিভাগে স্থানান্তরিত হওয়ায় সৈন্যবিভাগকে শৃঙ্খলার সঙ্গে অনুগত রাখার উপযুক্ত লোকের অভাব হইয়াছিল। সর্বোপরি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে বহু বৃটিশ সৈন্য ভারত হইতে প্রেরিত হওয়ার ফলে ভারতীয় সৈন্যের অনুপাত বৃটিশের তুলনায় অধিক হইয়া পড়ে।

সামরিক কারণ :—

উপযুক্ত সমরনেতার অভাব

এইভাবে যখন সমস্ত দিক দিয়া বিদ্রোহের অনুকুল ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে তখন এনফিল্ড রাইফেল নামে এক নূতন ধরনের বন্দুকের প্রবর্তন হইল। এই নূতন বন্দুকের টোটা পশুর চর্বিতে স্নেহার্দ্র ছিল এবং ইহা দাঁত দ্বারা কাটিয়া বন্দুকের নলে পূরিতে হইত। সৈন্যদলে হঠাৎ গুজব উঠিয়া গেল এই চর্বি গরু ও শূকর হইতে জাত; ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সৈন্যদল-ইংরেজরা ইচ্ছাপূর্বক তাহাদের ধর্মনাশের চেষ্টা করিতেছে—এই ধারণা করিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইল।

এনফিল্ড রাইফেল প্রবর্তন

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে বঙ্গদেশে, বারাকপুরে ও বহরমপুরে প্রথম সৈনিকদের মধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ পায়। বারাকপুরে ছাউনিতে মঙ্গল পাড়ে নামক জনৈক সিপাহী কাপ্তেনের আদেশ মানিতে অস্বীকার করে। তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং সহযোগী বিদ্রোহীদিগকে শাস্তি দেওয়া হয়। ১০ই মে মীরাটে এই বিদ্রোহ গুরুতর আকার ধারণ করে। তথাকার সিপাহীরা দলবদ্ধ হইয়া ইংরেজ সেনাপতিকে হত্যা করে। ক্রমে এই বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে। বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইয়া দিল্লী হস্তগত করে এবং মোগল বংশধর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করে। ক্রমশঃ বিদ্রোহের পরিধি বিস্তৃত হইয়া অচিরেই বেরিলী, কানপুর, এলাহাবাদ, বেনারস, ঝাঁসি ও বিহারে প্রসারিত হইয়া পড়িল। ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই তাঁতিয়া টোপী, নানা সাহেব, আজিমুল্লা খাঁ, বিহারের কুনোয়ার সিং, বাহাদুর শাহের আত্মীয় ফিরোজ শাহ প্রভৃতি বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন। বোম্বাই ও রাজপুতানায় বিদ্রোহ বিশেষ প্রকাশ পায় নাই। পাঞ্জাবের শিখগণ, কাশ্মীরের গোলাপ সিংহ এবং নেপালের গুর্খাগণ বিদ্রোহ দমনে ইংরেজদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করে। প্রথম দিকে বিদ্রোহীরা

বিদ্রোহ

বিদ্রোহের দ্বারা উপদ্রুত অঞ্চল

কতকটা কৃতকার্য্য হইলেও লরেন্স, আউটরাম, হ্যাভলক, নীল ও নিকলসন প্রভৃতি বৃটিশ সেনাপতিদের কর্মতৎপরতার ফলে এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভবপর হয়। নেতাদের মধ্যে ঝাঁসীর রাণী রণক্ষেত্রে নিহত হন, তাঁতিয়া টোপী ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং নানাসাহেব নেপালের জঙ্গলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ইংরেজরা দিল্লী বিদ্রোহীদের কবল হইতে পুনরায় অধিকার করিয়া দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে সিংহাসনচ্যুত করে এবং রেঙ্গুনে নির্বাসিত করে।

বিদ্রোহ দমন

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহকে কেহ কেহ স্বাধীনতার সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। এই বিদ্রোহ ভারতব্যাপী না হইলেও উত্তর ভারতের বহু স্থান ব্যাপিয়া বিস্তৃত হইয়াছিল এবং সকল স্থানে প্রায় জাতীয় অভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে বৃটিশশক্তিকে ভারত হইতে বিলুপ্ত করার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। অনেক ঐতিহাসিক এই বিদ্রোহকে "স্বাধীনতা সংগ্রাম" বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন—উক্ত বিদ্রোহ কখনও ভারতব্যাপী সামগ্রিক রূপ বা জাতীয় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে নাই এবং বঙ্গদেশ, পাঞ্জাব ও দক্ষিণ ভারত বিদ্রোহে যোগদান করে নাই। তিনটি প্রাদেশিক সৈন্যদলের মধ্যে একটিমাত্র দল এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। দেশীয় নরপতিদের মধ্যে এবং জমিদার শ্রেণীর মধ্যে অযোধ্যার তালুকদার শ্রেণী ব্যতীত অধিকাংশই বৃটিশের পক্ষে ছিল। ইহাকে জাতীয় আন্দোলনের পরিবর্তে নষ্ট ক্ষমতালাভের জন্য সামন্ততান্ত্রিক আন্দোলন বলাই সঙ্গত। ক্ষমতাচ্যুত কয়েকজন দেশীয় নরপতি বা জমিদার এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা ছিলেন। জনসাধারণের কোন স্বার্থ এই আন্দোলনের পশ্চাতে ছিল না। তাহারা আরও বলেন এই বিদ্রোহ সার্থক হইলে ভারতবর্ষের পক্ষে লাভের পরিবর্তে ক্ষতিই হইত। এই বিদ্রোহের সপক্ষে এবং বিপক্ষে বহু মতভেদের অবকাশ হইয়াছে। বিদ্রোহ সংক্রান্ত পর্যাপ্ত প্রমাণপত্র ও তথ্যাদি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত এই বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন স্থায়ী সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে। ইহাও অনস্বীকার্য যে এই বিদ্রোহ আঞ্চলিকতায় সীমাবদ্ধ থাকিলেও যে প্রচণ্ড বেগে ইহা অগ্রসর হইয়াছিল জাতীয় অভ্যুত্থানের আদর্শে প্রাণোদিত না হইলে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ব্যক্তিগত স্বার্থে অথবা প্রতিহিংসামূলক উত্তেজনার বশে এতখানি প্রচণ্ডতা সম্ভবপর নহে।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ব্যর্থতা ও ফলাফল :—নানাকারণে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহ সফল হইতে পারে নাই। প্রধানতঃ সামরিক দিক দিয়া সিপাহীরা ইংরেজ অপেক্ষা দুর্বল ছিল। সিপাহীরা পুরাতন গাদা বন্দুকের সাহায্যে যুদ্ধ করিয়াছিল—অথচ ইংরেজরা নবাবিষ্কৃত টোটা-বন্দুক

ব্যর্থতার কারণ

ব্যবহার করায় যুদ্ধে অধিকতর সুবিধা পাইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, কোনপ্রকার কেন্দ্রীয় ও সুনির্দিষ্ট পরিচালন ব্যবস্থার অভাবে এই বিদ্রোহ বিক্ষিপ্ত ও আঞ্চলিক রূপ ধারণ করিয়াছিল। ফলে বিদ্রোহীরা সংহত ও সর্বত্র একই গতিতে অগ্রসর হইতে পারে নাই। তৃতীয়তঃ, ইংরেজরা বিদ্রোহ দমনে অধিকাংশ দেশীয় নরপতির অকুণ্ঠ সাহায্য পাইয়াছিল। গোয়ালিয়রের স্যার দিনকর রাও, হায়দ্রাবাদের স্যার সালার জঙ্গ, নেপালের জঙ্গ বাহাদুর এবং পাঞ্জাবের শিখজাতি বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করিয়াছিল। বিদ্রোহীরা সর্বত্র সিপাহীদের দলবদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু কোন উল্লেখযোগ্য দেশীয় নরপতির সাহায্য না পাওয়ায় শক্তিশালী হইতে পারে নাই। সর্বোপরি বঙ্গদেশ ও দক্ষিণভারত একেবারে নিষ্ক্রিয় থাকায় বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ সামর্থ্য অনেক দুর্বল হইয়া পড়ে। চতুর্থতঃ, বিদ্রোহীদের মধ্যে ইংরেজদের ন্যায় পরিচালক সংখ্যায় এবং গুণবত্তায় কম ছিল। লরেন্স, আউট্রাম, হ্যাভেলক, নিকলসন, নীল বা এডোয়ার্ডস-এর মত দক্ষ ও নির্ভীক নেতা বিদ্রোহীদের মধ্যে ছিল না। পঞ্চমতঃ, উপায় অর্থাৎ বৃটিশ শক্তি বিতাড়নের ব্যাপারে সিপাহীরা একমত হইলেও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহাদের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। বৃটিশের অবসানে মুঘল বা মারাঠা কোন্ শক্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহারও স্থায়ী সিদ্ধান্ত করা হয় নাই। ইহার ফলে বিদ্রোহীদের কার্যাবলী দ্বিধাগ্রস্ত ও দুর্বল হইয়া পড়ে।

একাধিক কারণে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহ ভারতের ইতিহাসে এই নূতন পথের সূচনা করিয়াছে। ইহার শিক্ষা ভারতের শাসনযন্ত্র পরিচালকবর্গকে শাসননীতি সম্বন্ধে যথেষ্টভাবে প্রভাবিত করিল। বিদ্রোহের আকস্মিকতায় এবং প্রচণ্ডতায় ইংরেজরা তাহাদের এযাবৎকাল অনুসৃত শাসননীতির মৌলিক ব্যর্থতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া ভারতের শাসনব্যবস্থা ও পদ্ধতির সম্পূর্ণ রূপান্তর সাধন করিল। প্রত্যক্ষভাবে এই বিদ্রোহের পরে ভারতের শাসন ব্যাপারে তিনটি পরিবর্তন সাধিত হইল। প্রথমতঃ, এই বিদ্রোহ কোম্পানীর রাজত্বের অবসান ঘটাইল। ইংলণ্ডের জনসাধারণ ভারতবর্ষের শাসনভার সামান্য বণিক কোম্পানীর হাতে ফেলিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত মনে করিল না। ফলে ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের পরিবর্তে বৃটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। ইংলণ্ডের মহারাণী এক ঘোষণাপত্রের দ্বারা ভারতের শাসনভার বৃটিশ সরকারের একজন মন্ত্রী ও একটি কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করিলেন। গভর্ণর জেনারেল ভাইসরয় বা বা রাজপ্রতিনিধি উপাধিতে ভূষিত হইলেন। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজদের দেশীয়

(১) কোম্পানীর শাসনের অবসান

(২) দেশীয় রাজনীতির পরিবর্তন

রাজানীতিরও পরিবর্তন সাধিত হইল। স্বত্ব বিলোপনীতি বাতিল করা হইল এবং দেশীয় রাজ্যসমূহ ভবিষ্যতে ইংরেজের রাজ্যভুক্ত হইবে না এই প্রতিশ্রুতি তাঁহারা প্রাপ্ত হইল। (তৃতীয়তঃ সমর-বিভাগই এই বিদ্রোহে নায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া এই বিভাগকে একেবারে নূতন করিয়া গঠিত করা হইল। সৈন্যদলে ইউরোপীয়দের সংখ্যা বর্দ্ধিত করা হইল এবং সামরিক বিভাগের উচ্চপদ ইউরোপীয়দের একচেটিয়া করা হইল। আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য 'বিভাগ ও বিভেদ' বৃটিশ সামরিক বিভাগের নীতি হইয়া রহিল।

(৩) সামরিক বিভাগে ইউরোপীয়দের প্রাধান্য

এই বিদ্রোহের অন্য দুইটি পরোক্ষ ফল পরিলক্ষিত হয়, প্রথমতঃ, ভারতের শাসন ব্যাপারে ভারতবাসিগণকে বঞ্চিত রাখার নীতি পরিত্যক্ত হয় এবং শাসনকার্যে ভারতবাসী গ্রহণের নীতি গৃহীত হয়। লর্ড ক্যানিং ভারতের সর্বপ্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হইয়া নবগঠিত ভারতের শাসনপরিষদে তিনজন ভারতবাসীকে গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়তঃ, এই বিদ্রোহের পরোক্ষ ফল হিসাবেই ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরমবাদের সৃষ্টি হয়। এই বিদ্রোহের সময় উভয় পক্ষই চরম নিষ্ঠুর কার্যে লিপ্ত হইয়াছিল—এই নিষ্ঠুরতার আতিশয্যের ফলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে একটা জাতিবৈরিতা ও পারস্পরিক তিক্ত মনোভাবের সৃষ্টি হয়। এই বিদ্বেষের মধ্য দিয়াই ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতার বীজ উপ্ত হয়, এবং পরবর্তী-কালের ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা এই মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ভারতবাসীকে ঈপ্সিত উদ্দেশ্য লাভের সহায়তা করে।

(৪) ভারতবাসী শাসনকার্যে নিযুক্ত হইতে থাকে

(৫) পরবর্তী কালের স্বাধীনতা স্পৃহার অগ্রদূত

প্রশ্নোত্তর

1. Write the history of the British relations with Sikhs in the nineteenth century.

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইঙ্গ শিখ সম্পর্কে আলোচনা কর—

উত্তর-সূত্র : (১) রণজিৎ সিংহ কর্তৃক দুর্বল শিখশক্তি ঐক্যবদ্ধ এবং একটি প্রবল রাষ্ট্রশক্তিতে পরিণত—শিখজাতি, শিখরাষ্ট্র এবং দুর্দ্ধর্ষ শিখ সামরিক শক্তির সৃষ্টি। অমৃতসরের সন্ধি (১৮০৯)-র দ্বারা বৃটিশের সঙ্গে শিখদের মৈত্রী।

(২) প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ, (১৮৪৪-৪৬)—শিখজাতির পরাজয় ও লাহোরের সন্ধি।

(৩) দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ, (১৮৪৮-৪৯)—যুদ্ধের কারণ—চিলিয়ানওয়ালা ও গুজরাটের যুদ্ধ—শিখজাতির পরাজয়—পাঞ্জাব বৃটিশের অধিকারভুক্ত।

2. Sketch the career and achievements of Ranjit Singh.

রণজিৎ সিংহের জীবনী ও কার্য্যাবলীর কৃতিত্ব আলোচনা কর।

উত্তর-সূত্র : 'শিখজাতি ও রণজিৎ সিংহ' দ্রষ্টব্য।

3. Review the measures adopted by Lord Dalhousie for the expansion of British power in India.

ভারতে বৃটিশ শক্তি বৃদ্ধির জন্য লর্ড ডালহৌসী কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

উত্তর-সূত্র : ডালহৌসী ভারতে বৃটিশের অধিকার বিস্তারের উদ্দেশ্যে বহু নীতি এবং উপায় অবলম্বন করিয়া অসংখ্য দেশীয় রাজ্য বৃটিশের কুক্ষিভুক্ত করেন।

(১) স্বত্ববিলোপ নীতির দ্বারা অধিকারভুক্ত—সাতারা, জৈৎপুর, সম্বলপুর, বাঘট, উদয়পুর, নাগপুর ও ঝাঁসি প্রভৃতি।

(২) প্রজার হিতার্থে অধিকার—অযোধ্যা।

(৩) অন্যান্য কারণে অধিকার—সিকিমের কিয়দংশ ও নিজামের বেরার রাজ্য।

(৪) যুদ্ধ-বিগ্রহের দ্বারা—পাঞ্জাব।

ফলাফল : সাম্রাজ্যবাদী ডালহৌসীর উপরোক্ত নীতিসমূহ অবলম্বনের ফলে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের আয়তন ও মর্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু ইহা ভবিষ্যতের পক্ষে অকল্যাণকর হইয়াছিল। ইহাতে দেশীয় রাজ্যসমূহে বৃটিশের উদ্দেশ্য ও সততা সম্বন্ধে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয় এবং সিপাহী বিদ্রোহ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।

4. What do you mean by the 'Doctrine of Lapse'? To what extent was it successful?

স্বত্ববিলোপ নীতি কাহাকে বলা হয় এবং ইহা সার্থক হইয়াছিল কিনা বল।

উত্তর-সূত্র : ডালহৌসীর স্বত্ববিলোপ নীতি ও রাজ্যবিস্তার দ্রষ্টব্য।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া

5. Discuss briefly the causes and effects of the Revolt of 1857.

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর—

উত্তর-সূত্র : 'বিদ্রোহের কারণ ও বৈশিষ্ট্য' এবং 'বিদ্রোহের ব্যর্থতা ও ফলাফল' দ্রষ্টব্য।

6. How far was Dalhousie's Native State policy responsible for the revolt of 1857.

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের জন্য ডালহৌসীর দেশীয় রাজ্যনীতি কতখানি দায়ী তাহা বর্ণনা কর—

উত্তর-সূত্র : ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের পশ্চাতে অসংখ্য কারণ বিদ্যমান। এই সমস্ত কারণের মধ্যে লর্ড ডালহৌসীর দেশীয় রাজ্যনীতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষে বৃটিশ অধিকৃত স্থান ব্যতীত অসংখ্য দেশীয় রাজ্য ছিল। বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের সন্ধির দ্বারা বৃটিশের সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। ইংরেজের সঙ্গে সন্ধির সর্তের দ্বারা তাহাদের স্বাধীন সত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল। সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত সর্ব্বকার্য্যে তাঁহারা স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে দেখা গেল বৃটিশ গভর্নমেণ্ট দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেনা। অর্থাৎ ভারতীয় গভর্নর জেনারেলগণ বেপরোয়াভাবে রাজ্যগ্রাসী নীতি অনুসরণ করিতে বদ্ধপরিকর। অবশ্য দেশীয় রাজ্যসমূহ অধিকার করার পশ্চাতে প্রজার হিতার্থ অথবা দেশীয় রাজাদের কুশাসন এই শ্রেণীর কোন না কোন কারণ প্রদর্শিত হইত। আমহার্ষ্টের সময়ে ভরতপুর অধিকার, বেণ্টিংকের সময়ে কাছাড়, জয়ন্তিয়া এবং মহীশূর প্রভৃতি অধিকার উপরোক্ত যুক্তি দেখাইয়াই করা হইয়াছে। এই ভাবে নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের পরিচয় দিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য বিলোপের নীতি অনুসরণ করিতে ইতস্ততঃ করিল না। লর্ড ডালহৌসীও পূর্ববর্তী গভর্ণর জেনারেলদের পন্থা অনুসরণ করিয়া স্বত্ববিলোপ নীতি, প্রজাহিত, কুশাসন ইত্যাদি নীতি ও যুক্তির সাহায্যে সাতারা, ঝাঁসি, নাগপুর, জৈৎপুর, সম্বলপুর, অযোধ্যা ইত্যাদি দেশীয় রাজ্য বৃটিশের কুক্ষিভুক্ত করেন। এতদ্ব্যতীত পাঞ্জাবের কিয়দংশ ও বেরার রাজ্য অন্যান্য অজুহাতে বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। বৃটিশের সাম্রাজ্য প্রসারের জন্য তিনি বাহুবল, 'স্বত্ববিলোপ নীতি', প্রজাহিত প্রভৃতি নীতিবিন্যাস করিয়াছিলেন তাহা সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টিকোণ ব্যতীত অন্য কোন ভাবেই ব্যাখ্যা করা চলে না।

লর্ড ডালহৌসীর দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে বিরোধী ও আগ্রাসী মনোভাব এত তীব্র ও দ্রুতভাবে কার্য্যকরী হইল যে তাঁহার কার্য্যাবলীর ফলে ভারতের দেশীয় নরপতিদের মনে বৃটিশের বিরুদ্ধে সন্দিগ্ধ ও অসন্তুষ্ট মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল। অযোধ্যা অধিকার বা দিল্লীর মুঘল-বাদশাহকে পূর্ব্ব গরিমা হইতে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা মুসলমানদিগকে বৃটিশবিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল; আবার ভূতপূর্ব্ব পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও-এর দত্তকপুত্র নানা ধুন্দুপন্থকে বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া ইংরাজগণ হিন্দুজাতির বিদ্বেষের কারণ হইল। প্রকৃত প্রস্তাবে ডালহৌসীর অনুসৃত নীতিতে রাজ্যবঞ্চিত বা অসন্তুষ্ট দেশীয় নরপতিবৃন্দ বা তাহাদের সহযোগীবর্গই বৃটিশের বিরুদ্ধে অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত করিতে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব নবাবের পরামর্শদাতা আহমদউল্লা, নানা সাহেব, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাও সাহেব, নানার অনুগামী তাঁতিয়া টোপী ও আজিমুল্লা খাঁ, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, বিহারের জগদীশপুরের জমিদারী বঞ্চিত রাজপুত সর্দ্দার কুঁয়ার সিং মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের আত্মীয় ফিরোজ শাহ ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। মোট কথা, ডালহৌসীর দেশীয় রাজ্যসমূহ বৃটিশের অধিকারভুক্ত করার অত্যুৎসাহ নীতি সিপাহী বিদ্রোহকে যে ত্বরান্বিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

উনত্রিংশ অধ্যায়

বৃটিশ সম্রাটের অধীনে ভারতবর্ষ : লর্ড এলগিন হইতে লর্ড কার্জনের শাসনকাল : ভারতের জাতীয় চেতনার উন্মেষ

Syllabus :—Growth of Political consciousness. Lord Lytton—imperialist adventure. Ripon's reforms. Ilbert Bill's controversy. Rise of the Indian National Congress. Aligarh movement. Lord Cross's Act, 1892. Imperialism of Lord Curzon —his measures.

Tilak, Bipin Chandra Pal and the extremists. Partition of Bengal, Swaraj and Swadeshi movement, Bankim, Ramakrishna and Vivekananda, Surat Split. Terrorists in Bengal. Estimate.

পাঠ্যসূচী :—রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ। লর্ড লিটন ও তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী কার্য্যাবলী, রিপনের সংস্কার সমূহ। ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত বিবাদবিসম্বাদ। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম। আলিগড় আন্দোলন। লর্ড ক্রসের আইন, ১৮৯২। লর্ড কার্জনের সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাবলী।

তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল ও চরমপন্থিগণ। বঙ্গভঙ্গ। স্বরাজ ও স্বদেশী আন্দোলন, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ। সুরাট কংগ্রেসে দলাদলি। বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদিগণ। গুণাগুণ নিরূপণ।

লর্ড এলগিন (১৮৬২-৬৩) :—লর্ড ক্যানিং-এর পরে লর্ড এলগিন বড়লাটরূপে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের কার্য্যভার গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি কানাডায় শাসনকর্ত্তা এবং চীনে অহিফেনের যুদ্ধে বৃটিশ দূতরূপে কাজ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বৃটিশ বিরোধী 'ওয়াহাবী' সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের বিদ্রোহ দমন তাঁহার শাসনকালের একমাত্র ঘটনা।

স্যার জন লরেন্স (১৮৬৪-৬৯) :—এলগিনের পরে স্যার জন লরেন্স ভারতের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে উত্তর সীমান্তস্থিত ভুটানের

সঙ্গে যুদ্ধ হয়। সীমান্তবিরোধের সূত্র ধরিয়া এই যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভুটান ভুয়ার্স অঞ্চল ইংরেজদের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

ভুটান যুদ্ধ

তাঁহার শাসনসময়ে উড়িষ্যা, বুন্দেলখণ্ড ও রাজপুতানার দুর্ভিক্ষে বহুলোক নিহত হয়। কৃষকদের স্বত্বরক্ষার জন্য এই সময়ে দুইটি প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়।

বৈদেশিক ব্যাপারে লরেন্স 'প্রভুত্বমূলক নিরপেক্ষনীতি' অনুসরণ করিয়াছিলেন। আফঘানিস্থানের আমির দোস্ত মহম্মদের মৃত্যুর পরে আমীরের পদ লইয়া তাঁহার পুত্র-বর্গের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। লরেন্স এই গৃহবিবাদে কোন পক্ষ অবলম্বন না করিয়া নিরপেক্ষতার পরিচয় দিলেন এবং অবশেষে দোস্ত মহম্মদের পুত্র শের আলি গৃহবিবাদে জয়ী হইলে লরেন্স তাঁহাকেই সমর্থন করিলেন।

লর্ড মেয়ো (১৮৬৯-৭২) :—লর্ড মেয়ো জাতিতে আইরিশ ছিলেন। উদার মন ও মার্জিত চরিত্রের জন্য তিনি দেশীয় নরপতিদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি আলোয়ারের রাজার অত্যাচার হইতে প্রজাদিগকে রক্ষার জন্য রাজাকে পদচ্যুত করিলেন এবং রাজ্যের শাসনভার একটি কাউন্সিলের হস্তে অর্পণ করিলেন। রাজন্যবর্গের সন্তানদের শিক্ষার জন্য তিনি আজমীঢ়ে মেয়ো কলেজ স্থাপন করেন। লর্ড মেয়ো লরেন্সের ন্যায় আফগানিস্থান সম্বন্ধে নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। এশিয়ার দিকে রাশিয়ার অগ্রগতিতে শঙ্কিত হইয়া আমীর শের আলি বৃটিশের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিলেন। লর্ড মেয়ো আম্বালায় বহু আড়ম্বরে শের আলিকে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু শের আলি বৃটিশ সাহায্যের স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি কামনা করিলে তিনি তাহাকে নিরাশ করেন।

আফঘান নীতি

লর্ড মেয়োর শাসনকালে প্রথম লোকগণনা বা সেন্সাস-এর সূত্রপাত হয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে আন্দামান পরিদর্শনকালে লর্ড মেয়ো একজন ওয়াহাবী বন্দীর হস্তে নিহত হন।

লর্ড মেয়ো

লর্ড নর্থব্রুক (১৮৭২-৭৬) :—লর্ড মেয়োর মৃত্যুর পরে দুইজন অস্থায়ী গভর্ণর-জেনারেল ছয়মাস শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। অতঃপর লর্ড নর্থব্রুক ভারতে গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। তাঁহার শাসনকালে বরোদার বৃটিশ রেসিডেন্ট সন্দেহজনকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ভারত-সচিব বরোদার গাইকোয়াড় মলহার রাওকে দায়ী করিয়া তাঁহাকে

গাইকোয়াড় পদচ্যুত

সিংহাসনচ্যুত করেন। সিভিল ম্যারেজ আইন বা অসবর্ণ বিবাহ আইন (১৮৭২) তাঁহার সময়ে প্রচলিত হয়। আফগানিস্থান সম্বন্ধে লর্ড নর্থব্রুক পূর্ববর্তী গভর্ণর জেনারেলদের ন্যায় নিরপেক্ষতার অনুসরণ করেন। আমীর শের আলি রাশিয়ার সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে বৃটিশের সাহায্য প্রার্থী হইলে বিলাতের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তিনি শের আলীকে সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হন। ইহাতে শের আলি অগত্যা বৃটিশের পরিবর্তে রাশিয়ার দিকে ঝুঁকিতে বাধ্য হইলেন।

আফঘান-নীতি

লর্ড লিটন (১৮৭৬—৮০) :—আফঘান-নীতি সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতভেদ হওয়াতে নর্থব্রুক পদত্যাগ করেন এবং লর্ড লিটন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। লর্ড লিটন সাম্রাজ্যবাদী, রক্ষণশীল এবং ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিকূলবাদী ছিলেন। লর্ড লিটনের প্রস্তাবক্রমে প্রধান মন্ত্রী ডিজরেলী মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সম্রাজ্ঞী উপাধিতে ভূষিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই ঘোষণা করার জন্য ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে এক মহা আড়ম্বরপূর্ণ দরবারের অনুষ্ঠান হয়। লর্ড লিটনের শাসনকালে দক্ষিণ ভারতে এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। লর্ড লিটন 'দুর্ভিক্ষ কমিশন' নিযুক্ত করিয়া দুর্ভিক্ষের কারণ ও প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হন। লর্ড লিটনের নিঃশুল্ক বাণিজ্যনীতির ফলে স্বদেশী শিল্পের প্রচুর ক্ষতি হইল এবং ল্যাঙ্কাষ্টারের বস্ত্রশিল্পের অভাবনীয় উন্নতির সূচনা করিল।

ভিক্টোরিয়া ভারত-সম্রাজ্ঞী

দুর্ভিক্ষ 'কমিশন'

লর্ড লিটন

লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির স্বাধীন মত রুদ্ধ করার জন্য 'দেশীয় সংবাদপত্র আইন' (Vernacular Press Act.) প্রবর্তন করেন। বাংলা ভাষায় প্রচলিত 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এই আইনের কবল হইতে নিষ্কৃতির জন্য ইংরেজী সংবাদপত্রে রূপান্তরিত হইল। 'অস্ত্র আইন' (Arms Act.) প্রবর্তিত করিয়া তিনি বিনা লাইসেন্সে ভারতবাসীর পক্ষে অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ করেন। এই সকল কার্য্যের দ্বারা তিনি ভারতবাসীর অশ্রদ্ধা অর্জন করেন।

সংবাদপত্র দমন আইন

অস্ত্র-আইন

লিটনের সময়ে দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফঘান যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। আমির শের আলি ইতিপূর্বে লর্ড নর্থব্রুকের নিকট সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি না পাইয়া রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। লর্ড লিটন প্রধান মন্ত্রী ডিসরেলীর নির্দেশে আমিরের উপর বৃটিশের প্রভাব বিস্তার করিতে যত্নবান হইলেন। লর্ড লিটন আমিরের সঙ্গে আন্তরিক বন্ধুতার পরিবর্তে আমীরকে নানা প্রকারে ভীতি প্রদর্শন করিয়া রাশিয়ার পক্ষ হইতে নিবৃত্ত করার জন্য চেষ্টা করিলেন। লর্ড লিটন আফঘান সীমান্তবর্তী কোয়েটা নগরে বৃটিশ সেনানিবাস স্থাপন করিয়া শের আলির সন্দেহ বৃদ্ধি করিলেন। লিটনের আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া শের আলি রাশিয়ার দূতকে রাজ্যমধ্যে অভ্যর্থনা করিলেন; কিন্তু বৃটিশ দূত কাবুলে প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্ত হইল না। রাশিয়ার সহিত শের আলির এই প্রকাশ্য মিত্রতার পরিচয় পাইয়া লর্ড লিটন শের আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। বার্লিনের সন্ধিতে রাশিয়ার সঙ্গে ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান হওয়াতে রাশিয়া পুনরায় আমিরের পক্ষে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সম্মত হইল না। শের আলি একাকী যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া পরাজিত হইলেন এবং তুর্কীস্থানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র ইয়াকুব খাঁ ইংরেজের সহিত গণ্ডামুকের সন্ধি করেন। এই সন্ধিতে ইয়াকুব খাঁকে আমীর বলিয়া স্বীকার করা হয় এবং পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ইয়াকুব খাঁ বৃটিশের নির্দেশ মানিয়া চলিতে সম্মত হন। কাবুলে একজন ইংরেজ রেসিডেণ্ট রাখার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু এই ব্যবস্থা স্বাধীনতাপ্রিয় আফঘানদের মনঃপূত হইল না। আফঘানগণ বিদ্রোহী হইলে কাবুলের বৃটিশ দূত নিহত হইলেন। ফলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এইবারের যুদ্ধেও আফঘানরা পরাজিত হইল। লর্ড লিটন ইয়াকুবকে নির্বাসিত করিয়া আফঘানিস্থানকে দুই ভাগে বিভক্ত করার পরিকল্পনা করিলেন। ইতিমধ্যে বিলাতে রক্ষণশীল দলের পরিবর্তে উদারনৈতিক দল মন্ত্রিসভা গঠন করিলে লিটনের আফঘাননীতি পরিত্যক্ত হয় এবং প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোনের নির্দেশে লিটনকে পদত্যাগ করিতে হয়। লর্ড রিপন অতঃপর বড লাট হইয়া ভারতে আগমন করেন এবং আফঘান জাতির স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া আফঘানিস্থানের সঙ্গে সন্ধি করেন।

দ্বিতীয় ইঙ্গ আফঘান যুদ্ধ, ১৮৭৮
যুদ্ধের কারণ

লর্ড রিপন (১৮৮০—৮৪):—লর্ড রিপন ইংলণ্ডের উদারনৈতিক দলের নেতা গ্লাডষ্টোনের শিষ্য ছিলেন। তিনি অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় এবং ভারতবাসীর জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন।

লর্ড রিপন আফঘানযুদ্ধের সন্তোষজনক মীমাংসা করেন। ইয়াকুব খাঁনের পরে শের

আলির ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুর রহমান আমির হইয়াছিলেন। লর্ড রিপনের সঙ্গে আমিরের এই সন্ধি হইল যে আমির ইংরেজ ভিন্ন অন্য কোন বৈদেশিক শক্তির সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিবে না। ইতিমধ্যে শের আলির পুত্র আয়ুব খাঁ আবদুর রহমানকে বিতাড়িত করিয়া স্বয়ং আমির হওয়ার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল হয়। ইংরেজসঙ্ঘের সহযোগিতায় আবদুর রহমান আফঘানিস্থানের অবিসংবাদিত অধিপতি হইয়া বসিলেন। দ্বিতীয় আফঘান যুদ্ধের ফলে লোকক্ষয় ও অর্থনাশ হইলেও উহা একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। কালাতের খাঁ ইংরেজের অধীনে আসিলেন, বৃটিশ বেলুচিস্থান নামে একটি নূতন প্রদেশের সৃষ্টি হইল, কোয়েটাতে স্থায়ী সৈন্য রাখার ব্যবস্থা হইল এবং বোলান গিরিপথের উপর ইংরেজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল।

দ্বিতীয় ইঙ্গ আফঘান যুদ্ধের অবসান

লর্ড রিপন

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সময়ে মহীশূর রাজ্য ইংরেজের শাসনাধীনে আনা হয়। রিপনের সময়ে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে উহা পুনরায় হিন্দু রাজবংশের হস্তে পুনরর্পিত হয়।

মহীশূর হিন্দু রাজার হস্তে অর্পণ

লর্ড রিপনের শাসনকাল নানাবিধ আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও কল্যাণমূলক আইন প্রণয়নের জন্য খ্যাত। তিনি অবাধ বাণিজ্যনীতির পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার সময়ে লবণ ও অন্যান্য বাণিজ্যদ্রব্যের উপর হইতে শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হয়। লর্ড লিটন প্রবর্তিত দেশীয় সংবাদপত্র আইন রহিত করিয়া লর্ড রিপন ভারতীয় ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রগুলিকে স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ দেন। কারখানায় শিশু শ্রমিকদের দুরবস্থা লাঘব করার জন্য তিনি কারখানা আইন প্রবর্তিন করেন। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য হাণ্টারের অধীনে 'হাণ্টার কমিশন' নামে এক কমিশন নিযুক্ত হয়।

লর্ড রিপনের বিচারব্যবস্থা সংস্কার বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। আইনের দৃষ্টিতে ভারতীয় ও ইউরোপীয়গণের মধ্যে বৈষম্য রহিত করার জন্য লর্ড রিপনের নির্দেশে আইন সচিব এক আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। ইহা 'ইলবার্ট বিল' নামে পরিচিত। এই বিল অনুসারে ভারতীয় বিচারককে ইউরোপীয় বিচারকের সমান ক্ষমতা দেওয়া হইল। অতঃপর এই আইনের সাহায্যে ভারতীয় বিচারক ইউরোপীয় অপরাধীর

বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু ভারতবর্ষস্থিত ইউরোপীয়ানরা তাঁহাদের পক্ষে অপমানজনক মনে করিয়া এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিলেন। পক্ষান্তরে ভারতীয়গণ এই আইনের সমর্থন করিতে লাগিল। বিপক্ষদলের আন্দোলনের তীব্রতায় বাধ্য হইয়া রিপণ ইলবার্ট বিলের ক্ষমতার পরিবর্তন সাধন করিতে বাধ্য হইলেন। স্থির হইল যে ভারতীয় বিচারকগণ ইউরোপীয়দের বিচার করিবেন। কিন্তু বিচারকালে ইউরোপীয়গণ ইচ্ছা করিলে শ্বেতাঙ্গ জুরীদের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবেন। এই সংশোধনের ফলে লর্ড রিপনের মূল উদ্দেশ্য (অর্থাৎ ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে বৈষম্য রহিত করার উদ্দেশ্য) সার্থক হইল না। তবে ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত আন্দোলনে ভারতবাসীর আত্মসম্মানে এত আঘাত লাগিয়াছিল যে, ভবিষ্যৎ জাতীয়তাবাদের মনোভাব প্রসারণে এই ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত আন্দোলন উৎসাহ জোগাইয়াছিল।

লর্ড রিপন ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে একটি আইন প্রণয়ন করিয়া স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনভার সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের হস্তে করেন। স্থানীয় জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া জেলাবোর্ড এবং লোকাল বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইল। পৌরসংস্থানের অর্থাৎ মিউনিসিপালিটি বা জেলা বোর্ডের সভাপতি, সহ সভাপতির নির্বাচন প্রথা প্রচলিত হইল এবং ইহাদের হস্তে স্থানীয় শিক্ষা স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট ইত্যাদির কার্যভার অর্পণ করা হইল। এতদ্ব্যতীত রিপন কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার উন্নতি করিয়া ইহাদের পরিকল্পনার ভার ভারতীয়দের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। রিপনের সময়ে গ্রামাঞ্চলেও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন বোর্ডের সৃষ্টি হইয়াছিল।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা

লর্ড ডাফরিণ (১৮৮৪—৮৮): লর্ড রিপনের পরে লর্ড ডাফরিন ভারতের গভর্ণর জেনারেল হন। তিনি সুদক্ষ ও কর্মকুশল শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি বাংলা, অযোধ্যা ও পাঞ্জাবের জন্য প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্তন করিয়া কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। তাঁহার আগ্রহেই 'পাবলিক সার্ভিস কমিশন' বা সরকারী কর্মচারী নিয়োগ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড ডাফরিনের শাসনকালের প্রধান ঘটনা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। তিনি সিন্ধিয়াকে গোয়ালিয়র রাজ্যটি প্রত্যর্পণ করেন।

লর্ড ডাফরিণের সময়ে রাশিয়া আফঘানিস্থানে তাহার প্রভাব বর্দ্ধিত করার চেষ্টা করে এবং আফঘনস্থানের আমির্তে শহর অধিকার করিয়া বসে; ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় পাঞ্জাদে (Panjdah) নামক স্থান অধিকার করিলে রাশিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে। যাহা হউক শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষ হয়। অতঃপর রুশ আফঘান সীমানির্দ্ধারক

আফঘান নীতি

কমিটি নিযুক্ত হইয়া উভয় রাষ্ট্রের রাজ্যসীমা স্থায়িভাবে নির্দ্ধারিত হইলে যুদ্ধভীতি নিবারিত হয়।

৬. লর্ড ডাফরিনের সময়ে তৃতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ হয়। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর হইতেই ব্রহ্মরাজ ইংরেজদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিতেন না এবং ইংরেজদিগকে ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত কোন সুবিধা দিতে প্রস্তুত হন নাই। পক্ষান্তরে থিবো ফরাসীদের সঙ্গে এক মৈত্রীচুক্তি করিয়া তাহাদিগকে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিশেষ অধিকার দান করেন। উপরন্তু ব্রহ্মরাজ একটি ইংরেজ-কোম্পানীকে একটা অপরাধের জন্য অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ইংরেজরা ব্রহ্মরাজের ইংরেজবিদ্বেষী আচরণে বিরক্ত হইয়া পড়িল এবং ডাফরিন ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যুদ্ধে ব্রহ্মদেশের সৈন্যদল পরাজিত হইল এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ বৃটিশের অধিকারভুক্ত হইল।

তৃতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ

ব্রহ্মদেশ অধিকার

লর্ড ডাফরিন

লর্ড ল্যান্সডাউন (১৮৮৮—৯৪): ডাফরিনের পরবর্ত্তী গভর্ণর জেনারেল লর্ড ল্যান্সডাউনের সময়ে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পরিসর বিস্তৃততর হয় এবং পূর্বসীমান্ত ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত উভয় দিকের অধিকার সুদৃঢ়তর হয়। তাঁহার সময়ে পূর্বসীমান্তে লুসাই পর্বত এবং ব্রহ্মদেশের শান রাজ্যে বৃটিশ প্রভাব বিস্তৃত হয়। অধিকন্তু মণিপুর রাজ্যেও বৃটিশের অধিকার সম্প্রসারিত হয়। মণিপুর রাজ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধ উপস্থিত হইলে লর্ড ল্যান্সডাউন উহাতে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি আসামের চীফ কমিশনার কুইন্টনকে মণিপুরের গোলযোগের মীমাংসা করার জন্য প্রেরণ করেন। কুইন্টন মণিপুরের রাজভ্রাতা ও সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতকে নির্বাসিত করার প্রস্তাব করিলে মণিপুরবাসীরা কুইন্টন ও তাঁহার সঙ্গী কয়েকজন ইংরেজকে হত্যা করিল। ফলে মণিপুরের বিরুদ্ধে ইংরেজবাহিনী প্রেরিত হইল। টিকেন্দ্রজিৎ পরাজিত ও বন্দী হইলেন। তাঁহাকে ফাঁসি দেওয়া হইল এবং মণিপুরের দরবারে একজন স্থায়ী ইংরেজ প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা হইল। তাঁহার সময়েই কালাতের খাঁকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার এক

পুত্রকে সিংহাসন স্থাপন করা হইল। কাশ্মীরের মহারাজার বিরুদ্ধে কতকগুলি কল্পিত অভিযোগে ল্যান্সডাউন তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া একটি প্রতিনিধিসভার হস্তে রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করেন। এই ব্যাপার লইয়া ভারতে ও ইংলণ্ডে তুমুল আন্দোলন হইলে কাশ্মীরের পদচ্যুত মহারাজকে পুনরায় সিংহসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। লর্ড ল্যান্সডাউনের সময়ে কাবুলের সহিত মৈত্রী দৃঢ় করার জন্য আমিরের ১২ লক্ষ টাকার বার্ষিক বৃত্তি বর্দ্ধিত হইয়া আঠারো লক্ষ হয় এবং আফঘানিস্থানের ও ভারতের মধ্যে একটি সীমাজ্ঞাপক কল্পিত লাইন টানা হয়। ইহা ডুরাণ্ড লাইন নামে খ্যাত।

তাঁহার শাসনকালে 'ইম্পিরিয়েল সার্ভিস ট্রুপস' নামে এক নূতন সৈন্যদল গঠিত হয় এবং ব্যবসার সুবিধার জন্য স্বর্ণমান নির্দিষ্ট হয়। তাঁহার সময়ে কারখানা আইন পরিবর্ত্তিত হয়। ইহার ফলে স্থির হয় যে নয় বৎসরের নিম্নে শ্রমিক নিযুক্ত হইবে না। শ্রমিকদের দৈনিক কার্য্যকালও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের কাউন্সিল অ্যাক্ট অনুযায়ী ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয় এবং আংশিকভাবে পরোক্ষভাবে নির্বাচন প্রথা স্বীকৃত হয়।

বিবিধ কার্য

তদানীন্তন সেক্রেটারী অফ ষ্টেটস্ লর্ড ক্রশ-এর চেষ্টায় এই আইন পাশ হইয়াছিল বলিয়া ইহা ক্রস অ্যাক্ট নামেও পরিচিত। বিশ্ববিদ্যালয়, জেলাবোর্ড প্রভৃতি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ইহার সভ্য নির্বাচনের অধিকার লাভ করে। এই নূতন ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপক সভায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাসবিহারী ঘোষ ও গোখেল প্রভৃতি আইন সভার সভ্য হন।

ক্রশ অ্যাক্ট ১৮৯২

লর্ড এলগিন (১৮৯৪—৯৯): লর্ড এলগিন উদারনীতির দলের লোক ছিলেন। দুর্ভিক্ষ, প্লেগ, মহামারী, অর্থসংকট, সীমান্তবিরোধ প্রভৃতি জটিলতা তাঁহার শাসনকালকে সমস্যাপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। আর্থিক সঙ্কটের অবসানের জন্য তিনি বিদেশী দ্রব্যের উপর আমদানী শুল্ক স্থাপন করিলেন। কিন্তু বিলাতের বস্ত্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি ভারতজাত প্রস্তুত বস্ত্রের উপর আবগারী শুল্ক স্থাপন করিলেন। তিনি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের সামরিক সংস্থাগুলিকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য একজন প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। ইহার ফলে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের পরে দেশে যে সামরিক সংগঠনের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ হইল।

লর্ড এলগিনের শাসনকালে ইঙ্গ-রুশ বিরোধের পরিসমাপ্তি হইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সীমান্ত সম্পর্কিত চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাঠান উপজাতিদের উপদ্রবের ফলে এই অঞ্চলের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা প্রবল হইয়া

দাঁড়ায়। এদিকে চিত্রলে আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগে বিভিন্ন পার্বত্য উপজাতি গিলগিট ও হিন্দুকুশের মধ্যবর্তী অঞ্চল অধিকার করিল। সাম্রাজ্য অভিযানের পরে গিলগিটের সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট হইলেও বিদ্রোহী উপজাতি আফ্রিদীদিগকে দমন করা সম্ভব পর হইল না। সীমান্তে শান্তিরক্ষার জন্য খাইবার গিরিবর্ত্মে প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ সেনা স্থায়িভাবে সন্নিবিষ্ট হইল। কিন্তু সীমান্তের উপদ্রব সংক্রান্ত গোলযোগের স্থায়ী মীমাংসা সম্ভবপর হইল না।

সীমান্ত সমস্যা।

লর্ড কার্জ্জন (১৮৯৯—১৯০৫) মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে লর্ড কার্জ্জন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসেন। ভারতের শাসনভার গ্রহণের পূর্বে তিনি ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা ও অন্যান্য সমস্যা সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। এক বৎসরকাল তিনি লণ্ডনের ইণ্ডিয়া আফিসের সেক্রেটারী ছিলেন। ভারতের বহু দেশীয় নরপতি ও রাজ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের কার্য্যভার গ্রহণের পূর্বে দীর্ঘকাল মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণে এশিয়ার রাজনীতি, ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র-বিষয়ক জটিলতা এবং ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ সমস্যাদি সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। লর্ড কার্জন সাম্রাজ্যবাদী ও স্বৈরাচারী শাসনকর্তা ছিলেন। তথাপি তাঁহার কর্মকুশলতা, স্পষ্টভাবে মতামত প্রকাশের ক্ষমতা এবং কূটনৈতিক জ্ঞানের জন্য বিশেষতঃ বঙ্গ বিভাগের জন্য তিনি ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

লর্ড কার্জন

পররাষ্ট্রনীতি: লর্ড কার্জনের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং এশিয়াতে ব্রিটিশ স্বার্থবিরোধী কার্য্যকলাপ নিবারণ করা। কার্জনের পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত কার্য্যাবলীকে চারিভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) উত্তর-পশ্চিম সীমান্তনীতি (২) আফগাননীতি (৩) পারস্যনীতি (৪) তিব্বতনীতি।

শাসনভার গ্রহণের পরেই লর্ড কার্জন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সমস্যা নিবারণে মনোযোগী হইলেন। তিনি উপলব্ধি করিলেন যে যুদ্ধ বা সামরিক অভিযানের দ্বারা

স্বাধীনতাপ্রিয় সীমান্তের উপজাতিদিগকে স্থায়িভাবে বশীভূত করা যাইবে না। অগত্যা তিনি লর্ড এলগিনের সময়ের অগ্রসর নীতির পরিবর্তে আংশিক সৈন্য অপসারণও শক্তিসংহত করার নীতি অনুসরণ করিলেন। তিনি চিত্রল, মালকান্দ, কোয়েটা প্রভৃতি স্থানের সামরিক ঘাঁটি দৃঢ় করিয়া খাইবার, কুরাম উপত্যকা ও ওয়াজিরিস্থান হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারিত করিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি উপজাতীয় লোকদিগকে সৈন্যদলে নিযুক্ত করিয়া অথবা গ্রাম্যপ্রধানদের মারফতে উপজাতিদিগকে উৎকোচ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে শান্ত ও সংযত রাখার চেষ্টা করিলেন। বৃটিশ সৈন্য চলাচল ও স্বার্থরক্ষার জন্য পেশোয়ার হইতে খাইবার গিরিপথ এবং কুরাম উপত্যকার প্রান্ত হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ করিলেন। তিনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সীমান্ত অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নামে ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ অধীনে একটি নূতন প্রদেশের সৃষ্টি করিলেন। লর্ড কার্জনের এই সকল নীতির ফলে সাময়িকভাবে সীমান্তে শান্তি স্থাপিত হইল।

(১) সীমান্তনীতি

পারস্য উপসাগরে ও মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়ার প্রাধান্য বিস্তার প্রতিহত করার জন্য এবং উক্ত অঞ্চলে ইংলণ্ডের বাণিজ্যস্বার্থ রক্ষার জন্য লর্ড কার্জন তাঁহার আফঘাননীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আমীর আবদুর রহমানের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র হবিবউল্লা আমির হইলে লর্ড কার্জন নূতন আমিরের সহিত নূতন করিয়া চুক্তি করিতে চাহিলেন। আমির হবিবউল্লা তাহার পিতার সহিত ইংরেজদের যে সন্ধি হইয়াছিল তাহাই যথেষ্ট মনে করিলেন এবং নূতন চুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিতা যে ব্রিটিশের নিকট হইতে বার্ষিক টাকা পাইত তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। এই প্রত্যাখ্যানের ফলে সাময়িকভাবে ইঙ্গ-আফঘান সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠিল। পরে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী ভূলাট লর্ড এমিথিল্ হাবিবউল্লার সহিত নূতন সন্ধি করিলেন। লর্ড ল্যান্সডাউনের সময়ে অনুষ্ঠিত ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের সন্ধি স্বীকৃত হইল। আমির হবিবউল্লা স্বাধীন নরপতি বলিয়া স্বীকৃত হইলেন এবং আমির ব্রিটিশের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন।

(২) আফঘান নীতি

ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যিক স্বার্থ ও বাণিজ্য সংরক্ষণই কার্জনের পররাষ্ট্র নীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল। ভারতবর্ষের স্বার্থরক্ষার জন্য কার্জন পারস্য উপসাগরকে 'বৃটিশ হ্রদ' বলিয়া মনে করিতেন। এই স্থানে রাশিয়া, তুরস্ক, ফ্রান্স প্রভৃতি আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিল। লর্ড কার্জন পারস্য উপসাগরে বৃটিশের স্বার্থ রক্ষার জন্য স্বয়ং এই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার

(৩) পারস্যনীতি

চেষ্টায় পারস্য উপসাগরীয় বন্দরে বৃটিশ বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ঐ স্থানের সহিত যোগাযোগ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় রাজপথ ও রেলওয়ে নির্মিত হইল। এইভাবে কার্জন পারস্য উপসাগরে বৃটিশের স্বার্থরক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পর্ক করিলেন।

লর্ড কার্জনের তিব্বতনীতি আফঘান ও পারস্যনীতির অনুরূপ রুশ ভীতির দ্বারা প্রণোদিত। লর্ড কার্জনের সময়ের দালাইলামার গৃহশিক্ষক ছিলেন জনৈক রুশ। তাঁহার প্রভাবে নাকি দালাইলামা তিব্বতের সঙ্গে রাশিয়ার চুক্তি সম্পন্ন করিতে যাইতেছেন এই সংবাদ বিশ্বাস করিয়া কার্জন ইয়ং-হাসব্যাণ্ডের নেতৃত্বে একটি সামরিক মিশন তিব্বতে প্রেরণ করিলেন। তিব্বতীয়রা এই মিশনকে বাধা দিলে বহু রক্তপাতের পর ইংরেজ সৈন্য তিব্বতের রাজধানী লাসা অধিকার করিল। অগত্যা তিব্বত ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তিতে সম্মত হইল। তিব্বত হইতে ইংরেজবাহিনী চলিয়া আসিবে এবং তিব্বত ইংরেজ বণিককে তিব্বতের তিনটি বাণিজ্যকেন্দ্রে ব্যবসা করিতে দিবে। উপরন্তু তিব্বতকে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিপূরণও দিতে হইল। অবশ্য শেষ পর্যান্ত ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের উপর চীনের প্রভুত্ব স্বীকৃত হয় এবং তিব্বত হইতে রুশ প্রভাব চিরতরে দূরীভূত হইয়া যায়।

(৪) তিব্বতনীতি

আভ্যন্তরীণ নীতি :—আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে লর্ড কার্জন কয়েকটি প্রশংসনীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। যে সমস্ত অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়, সেই সমস্ত স্থানে রাজস্ব নির্দ্ধারণ বা রাজস্ব আদায়ের অব্যবস্থার ফলে কৃষকগণ অত্যাচারিত হইত। কৃষকদের এই দুরবস্থার প্রতিকার কল্পে কার্জন রাজস্ব নির্দ্ধারণ ও রাজস্ব আদায়ের জন্য কয়েকটি বিধি নিয়মের প্রণয়ন করেন। কৃষকদের আর্থিক উন্নতিকল্পে তিনি সমবায় ঋণ সমিতির প্রবর্তন করেন।

কৃষকদের উন্নতিমূলক ব্যবস্থা

এতদ্ব্যতীত কৃষকের জমি যাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত না হইতে পারে, তজ্জন্য 'ভূমি হস্তান্তর আইন' পাঞ্জাবে প্রচলন করেন। এই আইনের ফলে গভর্ণমেণ্টের বিনা অনুমতিতে মহাজন, কুসীদজীবী এবং বেনিয়ার নিকট ভূমি বিক্রয়, বন্ধক অথবা দান নিষিদ্ধ হইল। কৃষির উন্নতির জন্য তিনি সর্বভারতীয় কৃষিবিভাগের সৃষ্টি করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কৃষির উন্নতির জন্য সেচ বিভাগের সৃষ্টি হয়। দরিদ্রদের সুবিধার জন্য তিনি লবণ কর হ্রাস করেন।

লর্ড কার্জন শিক্ষাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া ভারতীয় শিক্ষা সংস্কারের পরিকল্পনা করেন।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারী অনুমতি ব্যতীত নূতন কলেজ স্থাপন নিষিদ্ধ হইল এবং নিয়মিতভাবে কলেজ পরিদর্শনের জন্য সরকারী পরিদর্শক নিযুক্ত হইল। ইহার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যাহাতে মাত্র পরীক্ষাগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান না হইয়া উচ্চশিক্ষাদানের কেন্দ্র হইয়া উঠে তজ্জন্য ব্যবস্থা হইল। অতঃপর স্নাতকোত্তর বিভাগের সৃষ্টি, গবেষণাগার স্থাপন, অধ্যাপকাদি নিয়োগ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হইল।

শিক্ষা-সংস্কার

ভারতীয় প্রাচীন কীর্তি সংরক্ষণের জন্য লর্ড কার্জন 'পুরাকীর্তিসংরক্ষণ আইন' প্রণয়ন করেন। এই আইনের দ্বারা প্রাচীন ঐতিহাসিক কীর্তিচিহ্ন রক্ষার ব্যবস্থা হইল। এই নূতন আইন প্রবর্তনের পরে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ স্থাপিত হইল। পুরাতন ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান খনন করিয়া লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধার, পুরাতন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থাদি এই বিভাগের কর্তব্য হইল।

পুরাকীর্তি সংস্কার

লর্ড কার্জনের শাসনকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম লইয়া বঙ্গদেশ গঠিত ছিল। এই বিশাল আয়তন বিশিষ্ট প্রদেশের শাসন সৌকর্যার্থে লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। আসাম ও পূর্ববঙ্গ লইয়া একটি প্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা লইয়া নূতন একটি প্রদেশ গঠিত হয়। বাংলার নেতৃবৃন্দের ধারণা হইল ভারতবর্ষের সর্ববিধ রাজনৈতিক ও জাতীয় আন্দোলনের পথপ্রদর্শক বাঙালী জাতিকে দুর্বল করার জন্যই বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বঙ্গবিভাগকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রথমে বাংলাদেশে এবং ক্রমে সমগ্র-ভারতবর্ষে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হয়, ইহাই স্বদেশী আন্দোলন নামে খ্যাত।

বঙ্গবিভাগ

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা:—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতের ধর্ম, সমাজ এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে বহু পরিবর্তন দেখা যায়। এই পরিবর্তনের ফলে ভারতের রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূত্রপাত হয়। এই নবজাগরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে ভারতের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হইয়াছে। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হইবার ফলে ভারতবাসী ইউরোপের তৎকালীন প্রগতিশীল চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইয়াছিল। আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রাম, ফরাসী বিপ্লব, জার্মানী ও ইটালীর ঐক্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম প্রভৃতি রাজনৈতিক আন্দোলন ভারতবর্ষকে জাতীয় চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। দার্শনিক কোঁৎ, মিল, বেস্থাম, হিউম ও টমাস পেইনের রচনাবলী

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব

ভারতের যুবকদের জনমানসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। 'পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য দিয়া ভারতবাসী যে নূতন জীবনাদর্শের সন্ধান লাভ করিল, তাহার ফলে তাহারা একদিকে যেমন সমাজের বিভিন্ন কুসংস্কার ও অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে শিখিল অপরদিকে স্বদেশপ্রেমের অভিনব প্রেরণাও তাহারা আন্তরিকভাবে অনুভব করিল। তৎকালীন প্রসিদ্ধ 'ইয়ং বেঙ্গল' এর কার্য্যকলাপের মধ্য দিয়া এই নূতন ভাবাদর্শ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। দেশীয় সংবাদ পত্রগুলিও দেশবাসীকে যাবতীয় অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে এবং দেশকে ভালবাসিতে শিখাইয়াছিল। এই সময়ে ভারতীয় সাহিত্যিকগণ যে সকল কাব্য, নাটক ও উপন্যাস রচনা করেন, সেইগুলির অধিকাংশেরই ভিত্তি দেশাত্মবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেইগুলিও জাতীয় চেতনার উদ্বোধনে যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছিল।'

ইয়ংবেঙ্গল

দেশাত্মবোধ মূলক রচনাবলী

ভারতের জাতীয়তা বোধের বিকাশে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীদের দানও কম নহে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়া ভারতবাসীর মনে আত্মপ্রত্যয় বোধের ও জাতির মনে আপন শ্রেষ্ঠত্ব বোধের সঞ্চার করিলেন। বিশ্বের দরবারে হিন্দুধর্মের গরিমা স্বীকৃত হওয়াতে ভারতবাসী বিজাতীয়তার মোহ কাটাইয়া স্বদেশ ও স্বাদেশিকতার প্রতি আকৃষ্ট হইল। ভারতের জাতীয়ভাবোধ ও স্বাধীন চিন্তাধারার বিকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের দানও কম নহে। তাঁহার আনন্দমঠ, রাজসিংহ, সীতারাম প্রভৃতি উপন্যাস, কমলাকান্তের দপ্তর ও অন্যান্য প্রবন্ধাবলী, তাঁহার সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন, পত্রিকা সমস্ত রচনার মধ্যেই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ রহিয়াছে এবং দেশ হিতৈষণার পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা রহিয়াছে। তাঁহার বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি জাতীয় সঙ্গীত রূপে পরবর্তীকালে গৃহীত হইয়াছে। সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম, সংবাদপত্র সকল ক্ষেত্রেই নূতন চেতনাবোধের পরিচয় ঘটিতে লাগিল।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তাঁহার দান

বঙ্কিমচন্দ্র

রাজনীতির ক্ষেত্রেও ভারতের শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের জন্য বহু সভা ও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল দাবির পশ্চাতে তেমন উগ্রতা না থাকিলেও তথ্যমূলক ও যুক্তিপূর্ণ ছিল। রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'জমিদার সভা', দাদাভাই নৌরোজীর 'বোম্বাই এসোসিয়েশন', পুনায় গোবিন্দ রাণাডের

'সার্বজনিক সভা', মাদ্রাজের 'নেটিভ এ্যাসোসিয়েসান' প্রভৃতি সঙ্ঘের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান' বা 'ভারত-সভা' গড়িয়া উঠে পরবর্তী কালে তাহাই নামান্তরিত ও রূপান্তরিত হইয়া ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের রূপ পরিগ্রহ করে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হইল দেশের যাবতীয় অভাব অভিযোগ শাসকদের গোচরে আনা এবং তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করা। ভারতবাসীর স্বার্থবিরোধী আইন কানুনের প্রতিবাদ করাও ইহার অন্যতম কর্তব্য ছিল। লর্ড লিটন যখন ভারতীয় ভাষায় রচিত সংবাদপত্র সমূহের কণ্ঠরোধ করিবার চেষ্টা করিলেন (১৮৭৮ খৃঃ), তখন দেশময় এই কার্য্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনি উত্থিত হইল। এই সময় বৃটিশ সরকার আই. সি. এস. পরীক্ষার্থীদের বয়স কমাইয়া উনিশ করিলেন—উদ্দেশ্য এই যাহাতে ভারতবাসী কম সংখ্যায় এই চাকরীতে যোগদানের সুবিধা পায়। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারতব্যাপী আন্দোলন হইল এবং এই সকল আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের গভীর ঐক্য ও জাতীয়ভাবোধ জাগ্রত হইল। লর্ড রিপনের শাসন-কালে ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে ভারতপ্রবাসী ইউরোপীয়গণ তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করিলে ভারতীয়গণও এই বিলের সমর্থন করিয়া এক পাল্টা আন্দোলন চালাইতে থাকে। এই আন্দোলন ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের উন্মেষে ও অখণ্ডতাবোধে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

জাতীয়তাবোধের আন্দোলন

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইলবার্ট বিলের প্রতিবাদ ও ইহার বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী আন্দোলন করার প্রয়োজনীয়তাকে উপলক্ষ্য করিয়া, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় একটি 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কনফারেন্স' নামে এক জাতীয় সভার আহ্বান করিলেন। এই সভায় ইলবার্ট বিলের প্রতিবাদ করা হইল এবং সঙ্গে বৃটিশ সরকারের অবিচার মূলক কার্য্যের প্রতিবাদের জন্য একটি সর্বভারতীয় স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার প্রস্তাবও হইল। ইণ্ডিয়ান ন্যাশানেল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনের পূর্বেই এলেন অক্টেভিয়ান হিউম নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ছাত্রদের নিকট একখানি 'খোলা চিঠি' লিখিলেন। এই চিঠিতে তিনি দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য একটি স্থায়ী সভা গড়িয়া তুলিবার পরামর্শ দিলেন। তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডাফরিনও এই জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ঐই সভার মধ্য দিয়া ভারতীয়দের রাজনৈতিক চেতনাকে সরকারবিরোধিতার পথ হইতে সরকার সমর্থক করিয়া তোলা। হিউমের চিঠির মধ্যে কংগ্রেসের বীজ নিহিত ছিল। সুতরাং হিউমের উদ্যোগে এবং লর্ড ডাফরিনের পৃষ্ঠপোষকতায় বোম্বাই শহরে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সর্ব প্রথম অধিবেশন আহূত হয়। বোম্বাইর বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। সুরেন্দ্রনাথের ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কনফারেন্সের কর্মপদ্ধতি ও উদ্দেশ্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অনুরূপ থাকায় ইহা কংগ্রেসের সহিত যুক্ত হইয়া গেল।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

কংগ্রেস প্রথম দিকে সরকারের শ্রদ্ধা ও সমর্থন লাভ করিয়াছিল। প্রত্যেক বৎসর কংগ্রেস দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া আবেদনের আকারে তাহা বড়লাটের দরবারে প্রেরণ করিত। প্রতি বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশনের শেষে রাজানুগত্যমূলক প্রস্তাবও গৃহীত হইত। প্রথম দিকে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল সরকারের সহযোগিতা, বিরোধিতা নহে। কংগ্রেসের এবম্বিধ আচরণের ফলে জর্জ ইউল, উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ এবং স্যার হেনরী কটন প্রভৃতি কয়েকজন উদারনৈতিক ইংরেজও ইহার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। কংগ্রেস ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ সরকারও কংগ্রেস সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। ভারতীয়গণ যাহাতে ভারতের শাসন ব্যবস্থায় উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করার অধিকার লাভ করিতে পারে, সেইজন্য কংগ্রেস আন্দোলন করিতে লাগিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে কয়েকজন ভারতীয় আইন-সভার সদস্য হইবার অধিকার পাইয়াছিল। তবে তাঁহারা সরকার কর্তৃক মনোনীত হইতেন। কংগ্রেস এখন নির্বাচনের ভিত্তিতে কাউন্সিলের সদস্য নিয়োগ এবং শাসন ব্যাপারে কাউন্সিলের অংশ গ্রহণের দাবি করিতে লাগিল। কংগ্রেস মাত্র ভারতবর্ষে সভাসমিতি করিয়া ক্ষান্ত হইল না। কংগ্রেস নেতৃবর্গ বিলাতে কংগ্রেসের একটি শাখা কার্য্যালয় স্থাপন করিলেন এবং 'ইণ্ডিয়া-নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিদেশে ভারতের দাবিদাওয়ার সমর্থনে জনমত সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এই আন্দোলনের ফলে বৃটিশ পার্লামেন্ট বাধ্য হইয়া ১৮৯২

কংগ্রেস কর্তৃক ইংলণ্ডে প্রচার

খৃষ্টাব্দে আইন সভা সম্প্রসারণ মূলক 'ইণ্ডিয়া কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট' প্রণয়ন করিল। বৃটিশ মন্ত্রী লর্ড ক্রসের চেষ্টায় এই আইন পাশ হইয়াছিল বলিয়া ইহা লর্ড ক্রসের 'আইন' নামেও পরিচিত। এই আইন অনুসারে সুপ্রীম কাউন্সিল ও প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা বাড়ান হইয়াছিল।

লর্ড ক্রসের আইন ১৮৯২

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের সংস্কার প্রবর্তিত হইলেও ভারতবাসী লক্ষ্য করিল যে ভারতের ইংরেজ শাসকশ্রেণী ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি মোটেই সহানুভূতি সম্পন্ন নহে। ১৮৯৬ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে প্লেগের মহামারীতে অসংখ্য লোকের প্রাণহানি হইল। কিন্তু সরকার এই ব্যাপারে একেবারে উদাসীন রহিলেন। একদিকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী অপরদিকে সরকারের ঔদাসীন্য ও উৎসব বিলাসে অপরিমিত অর্থব্যয় দেখিয়া ভারতবাসী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অপমানিত বোধ করিল। কংগ্রেস ক্রমশঃ সরকার বিরোধী আন্দোলনের শক্তি বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। এই সময়ে বালগঙ্গাধর তিলক নামে একজন মারাঠী আইনজীবী ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন এবং 'কেশরী' নামক পত্রিকার মধ্য দিয়া ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইলেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। তাঁহারা কংগ্রেসের আবেদন নিবেদন মূলক নীতির পরিবর্তে সরকারের প্রত্যক্ষ বিরোধিতার নীতি গ্রহণ করার অনুকূলে জনমত প্রচার করিতে লাগিলেন। এইভাবে কংগ্রেসের মধ্যে 'নরমপন্থী' ও 'চরমপন্থী' নামে দুইটি দলের সৃষ্টি হইল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরোজ শাহ

অরবিন্দ ঘোষ

কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থী দলের উদ্ভব

বিপিনচন্দ্র পাল

মেহ্‌তা, গোপালকৃষ্ণ গোখেল প্রভৃতি 'নরমপন্থী' দলের এবং বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিন চন্দ্র পাল, লালা লাজপৎরায় ('লাল-বাল পাল') প্রভৃতি চরমপন্থী দলের নেতৃত্ব করিতে লাগিলেন।

কংগ্রেসের এই সরকার বিরোধী আন্দোলন এবং ভারতীয় জনমতের দ্বারা তাহা সমর্থিত হইতে দেখিয়া বৃটিশ সরকার ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়কে জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ রূপে দণ্ডায়মান করার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। মুসলমানগণ সুদীর্ঘকাল যাবৎ বৃটিশের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছিল।

ইংরেজ সরকার কর্তৃক মুসলিম তোষণ নীতি গ্রহণ

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময়ে মুসলমানগণ বৃটিশের বিরোধী হওয়ায় ইংরেজগণ মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুদের প্রতি অধিক পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। কিন্তু অচিরেই এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। হিন্দুগণ পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করিয়া উন্নত হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া মুসলমানরাও বিরোধিভাব পথ পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতায় সঙ্কল্প করে। মুসলমানরা স্যার সৈয়দ আহম্মদ, সৈয়দ আমীর আলি, নবাব আবদুল লতিফ প্রভৃতির নেতৃত্বে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করিয়া ইংরেজদের সহিত সহযোগিতা করিতে আরম্ভ করিল। স্যার সৈয়দ আহম্মদ মুসলমানদের অজ্ঞাত কুসংস্কার ও রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা দূরীকরণে বদ্ধ পরিকর হইলেন এবং মুসলমানদের অগ্রগতির জন্য মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেসী আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে চাহিলেন। প্রথম দিকে স্যার সৈয়দ আহম্মদ সাম্প্রদায়িকতার পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি ইলবার্ট বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে উক্তি করিয়াছিলেন—'হিন্দু ও মুসলমান ভারত মাতার দুইটি চক্ষু, উহার একটিকে আঘাত করিলে স্বভাবতই অপরটি আঘাত পাইবে।' কিন্তু শীঘ্রই তিনি বৃটিশের প্ররোচনায় সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হইয়া পড়েন এবং তিনি কয়েকটি কংগ্রেস বিরোধী প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া তোলেন। তিনি আলিগড়ে 'মোহামেডেন এংলো ইণ্ডিয়ান কলেজ' নামে একটি সাম্প্রদায়িক কলেজ গড়িয়া তুলিলেন। এই কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ আর্চিবোল্ড-এর উৎসাহে আলিগড় কলেজ সাম্প্রদায়িকতা, বৃটিশ তোষণ এবং কংগ্রেস বিরোধিতার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইল।

সৈয়দ আহম্মদ ও সাম্প্রদায়িকতা

মুসলমান সম্প্রদায়কে, জাতীয়তা বিরোধী আন্দোলনে উৎসাহ ও প্রশ্রয় দিয়া ইংরেজ সরকার ভারতে 'বিভেদ ও শাসন' (Divide and Rule) এই নীতিকে কার্যকরী করিতে লাগিলেন। মুসলমানগণ বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দোলনেও উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে নাই।

ইতিমধ্যে লর্ড কার্জনের স্বৈরাচারী আচরণের ফলে দেশব্যাপী এক তীব্র বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশন বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা খর্ব করিয়া ইতি-পূর্বেই ভারতবাসীর বিক্ষোভের কারণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইত্যবস্থায় তিনি শাসনকার্য্যের সুবিধার যুক্তিতে বাংলাকে বিভক্ত করিয়া দুইটি বিভিন্ন প্রদেশের সৃষ্টি করিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্রনায়ক বাংলার প্রতিপত্তি সঙ্কুচিত করাই ছিল লর্ড কার্জনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই ভাবে বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী-জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করার বিরুদ্ধে বঙ্গদেশে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। বঙ্গভঙ্গের দিনে বাঙ্গালী ঐক্য সূচক রাখীবন্ধন ও অরন্ধন পালন করিয়া প্রতিবাদ জানাইল এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে পরোক্ষ সংগ্রাম করার জন্য বিলাতী পণ্যদ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহারের এক আন্দোলনের সূত্রপাত করিল। ইহা স্বদেশী আন্দোলন নামে খ্যাত। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের এই বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী ব্যবহারের আন্দোলন সর্বত্র অনুসৃত হইতে লাগিল। বঙ্গদেশে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল, সুবোধ মল্লিক প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন। দেশের সর্বত্র ন্যাশনাল বা জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইতে লাগিল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ১৯০৫

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চরমপন্থী ও নরমপন্থী দলের মধ্যে বিচ্ছেদ তীব্রতর হইয়া দেখা দিল। নরমপন্থীগণ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশরূপেই ভারতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া ভারতের শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের অধিকার দাবি করিতেছিল। পক্ষান্তরে চরমপন্থীগণ বৃটিশের অধিকারমুক্ত ভারতের 'স্বরাজ' দাবি করিয়াছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসে দাদাভাই নওরোজীর সভাপতিত্বে কংগ্রেস স্বরাজ সংক্রান্ত এবং স্বদেশী গ্রহণ বিদেশী বর্জনের প্রস্তাব গ্রহণ করিলে নরমপন্থীগণ এই ইংরেজ বিরোধী প্রস্তাব প্রসন্ন চিত্তে মানিয়া লইতে পারিলেন না। নরমপন্থীগণ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ডাঃ রাস বিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে সুরাট কংগ্রেসে 'স্বরাজ ও বিটিশ দ্রব্য বর্জনের' প্রস্তাব বাতিল করার চেষ্টা করিলে চরমপন্থীগণ ইহার বিরোধিতা করিলেন। ফলে সুরাটের কংগ্রেসে উভয় পক্ষের মধ্যে 'দক্ষযজ্ঞ' উপস্থিত হইল এবং গণ্ডগোলে সুরাটের কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গেল। চরমপন্থীরা কংগ্রেস পরিত্যাগ করিল

১৯০৭ খৃঃ র সুরাট কংগ্রেস ও 'নরম ও 'গরম দলের মধ্যে বিরোধ

এবং কংগ্রেসের আধিপত্য ১৯১৬ পর্য্যন্ত নরমপন্থী বা মডারেটদের দখলে রহিল।

(১৯০৭ খৃষ্টাব্দের সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থীদের সহিত চরমপন্থীদের মতবিরোধ চরমে পৌঁছাইলে চরম-পন্থিগণ কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়া সন্ত্রাসবাদের সাহায্যে ভারত হইতে বৃটিশ শাসন বিলুপ্ত করার আদর্শ গ্রহণ করিলেন। বাংলাদেশের ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'নবশক্তি', 'বন্দে মাতরম' প্রভৃতি সংবাদপত্রের মধ্য দিয়া ভারতের তরুণদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদের আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ১৯০৫—১৯১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতব্যাপী সন্ত্রাসবাদ ভীষণ আকার ধারণ করে। ক্ষুদিরাম কর্ত্তৃক মজঃফরপুরে মিসেস কেনেডীকে হত্যা, মাণিকতলায় বোমার কারখানা আবিষ্কার, আলিপুর জেলে কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসু কর্ত্তৃক বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে হত্যা, আহম্মদাবাদে বড় লাটের প্রাণনাশের চেষ্টা, বিলাতে কার্জন উইলিকে হত্যা-সন্ত্রাসবাদে দীক্ষিত বিপ্লবীরা এই সমস্ত কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান করিয়াছিল সরকার সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করার জন্য নির্য্যাতননীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। বিপ্লবী ও জাতীয় আন্দোলন বন্ধ করার জন্য সরকার দমনমূলক আইন প্রবর্ত্তন করিয়া সভাসমিতি নিষিদ্ধ করিলেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করিলেন ও দেশের নেতৃবৃন্দকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতে লাগিলেন। এত প্রচণ্ড দমননীতি অনুসরণ করা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ বন্ধ হইল না।)

সন্ত্রাসবাদ

ক্ষুদিরাম

কংগ্রেসের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের জন্মকাল হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল বৃটিশের সহযোগিতা ও আবেদন নিবেদনের মধ্য দিয়া শাসনতান্ত্রিক সুবিধা অর্জন। এই সকল আন্দোলনের জন্য নিয়মতান্ত্রিক উপায় অবলম্বন করাই কংগ্রেসের নীতি ছিল। কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিকতার সমান্তরালে সন্ত্রাসবাদ প্রচেষ্টাও চলিয়াছে চরমপন্থী দেশ প্রেমিকদের দ্বারা। তবে বঙ্গভঙ্গের পূর্ব পর্য্যন্ত স্বাদেশিকতা ও স্বজাতীয়তাব আন্দোলন তেমন তীব্র ও স্থায়ীরূপ ধারণ করে নাই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পর হইতেই জাতীয় আন্দোলনের ধারা নূতন খাতে
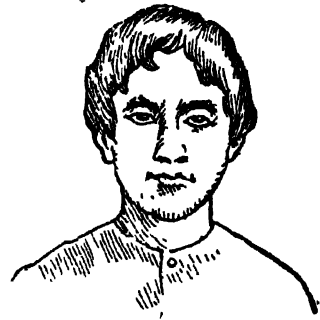
বহিতে আরম্ভ করিল। ইতিপূর্বে জাতীয়তাবাদের আন্দোলন হইতে মুসলমান সম্প্রদায়কে দূরে রাখার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নাই। কংগ্রেসের বিরোধিতা করার জন্য অতঃপর বৃটিশের উদ্যোগ ও উৎসাহে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের সৃষ্টি হইল। (১৯০৬)।

1 Discuss the British relation with the Afghans during the second half of the 19th Century.

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ইঙ্গ-আফঘান সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা কর।

উত্তর সূত্র :—(১) ইঙ্গ-আফঘান যুদ্ধের পশ্চাতে ইংরাজদের রুশ-ভীতি ছিল আফঘানিস্থানের সীমান্তের দিকে রাশিয়ার ক্রমাগ্রসর নীতি ইংলণ্ডকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল এবং ইংলণ্ড রাশিয়ার অগ্রগতি প্রতিহত করার জন্য সক্রিয় হইল। এই রুশ-ভীতি হইতেই লর্ড অকল্যাণ্ড ও এলেনবরোর সময়ে প্রথম ইঙ্গ আফঘান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের অবসানে ইঙ্গ-আফঘান সৌহার্দ্য পুনঃ প্রবর্তিত হয়।

(২) ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের প্রথম দিকে রাশিয়ার ক্রমাগ্রসর নীতিতে শঙ্কিত হইয়া আফঘানিস্থানের আমীর শের আলি বৃটিশের সাহায্য প্রার্থী হন। কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আফঘানিস্থান সম্পর্কে নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করায় লরেন্স, মেয়ো ও নর্থব্রুক এই তিনজন গভর্ণর জেনারেলের সময়ে আফঘানিস্থান রাশিয়ার বিরুদ্ধে বৃটিশের সহযোগিতা বা সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি হইতে বঞ্চিত হয়।

(৩) লর্ড লিটনের সময়ে দ্বিতীয় আফঘান যুদ্ধ (১৮৭৮ খৃঃ) হয়। লর্ড লিটন আফঘানিস্থানের আমিরের সঙ্গে মৈত্রীর পরিবর্তে তাহাকে নানাপ্রকারে ভীতি প্রদর্শন করিতে থাকেন এবং কোয়েটায় বৃটিশ সেনানিবাস স্থাপন করিয়া আমিরের সন্দেহ বৃদ্ধি করেন। আমির বৃটিশ-দূতের পরিবর্তে রুশ দূতের সম্বর্দ্ধনা করায় লর্ড লিটন আমির শের আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আফঘান জাতি পরাজিত হয় ও লিটন আফঘানিস্থানকে দুই ভাগে বিভক্ত করার সঙ্কল্প করেন। ইতিমধ্যে লর্ড রিপণ নূতন গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলে দ্বিতীয় ইঙ্গ আফঘান যুদ্ধের অবসান হয়। রিপণ আফঘানিস্থানের নূতন আমির আব্দুর রহমানের সঙ্গে মৈত্রীমূলক সন্ধি করিলেন। আফঘানিস্থান হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসৃত হইল। কাসাও ও বোলান গিরিপথ ইংরাজের দখলে আসিল, বেলুচিস্থান নামে নূতন প্রদেশ সৃষ্টি হইল এবং কোয়েটাতে স্থায়ী বৃটিশবাহিনী রাখার ব্যবস্থা হইল। লর্ড ডাফরিনের সময়ে রুশ-আফঘানিস্থানের সীমান্তরেখা নির্দিষ্ট হইলে রুশ-ভীতি নিবারিত হইল এবং আফঘানিস্থানে বৃটিশ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল।

(৪) লর্ড ল্যান্সডাউনের সময়ে আমিরের সঙ্গে মৈত্রী দৃঢ়বদ্ধ করার জন্য আমিরকে বাৎসরিক ১৮লক্ষ টাকা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হয় ও ভারত আফগানিস্থানের মধ্যে কল্পিত সীমান্ত রেখা ডুরাণ্ড লাইন রচিত হয়। লর্ড কার্জন ভারত-আফঘান সীমান্ত দৃঢ়তর করার জন্য সীমান্ত অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটির সৃষ্টি করিলেন এবং সীমান্তস্থিত উপজাতি সমূহকে দমন করার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন।

2. Give a short account of the reforms of Lord Ripon.

লর্ড রিপণের সংস্কারাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তর-সূত্র :—"লর্ড রিপণ" দ্রষ্টব্য।

3. Give a brief account of the foreign policy of Lord Curzon.

লর্ড কার্জনের পররাষ্ট্রনীতির এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তর সূত্র : "লর্ড কার্জন : পররাষ্ট্র নীতি" দ্রষ্টব্য।

4. Give the history of the Indian National Movement up to 1905 A. D.

১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তর সূত্র : (১) ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিকা : (ক) পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের ফলে ভারতের নবজাগরণ জাতীয়তাবোধের সূচনা—আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, ফরাসী বিপ্লব, জার্মানী ও ইটালীর ঐক্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ভারতের জাতীয় চেতনাবোধকে উদ্বুদ্ধ করে (খ) পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের রচনা ভারতীয় যুবকগণকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে। (গ) রামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, মাইকেল প্রভৃতির বাণী ও রচনা ভারতবাসীর মনে আত্মপ্রত্যয়বোধ ও জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের সঞ্চার করে। (ঘ) রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দেশের শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের দাবি প্রচারের উদ্দেশ্যে বহু সঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়—'জমিদার সভা', "বোম্বাই এসোসিয়েসান" 'সার্বজনিক সভা' প্রভৃতি সঙ্ঘ গঠিত হয়। (ঙ) বৃটিশ গভর্ণমেন্টের ভারতবাসীর স্বার্থ-বিরোধী কার্য্যাবলী দেশবাসীকে একটি সর্বভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য উদ্বুদ্ধ করিল। লর্ড লিটনের দেশীয় সংবাদপত্র দমন আইন, ইলবার্ট বিল, আই, সি, এস পরীক্ষার্থীদের বয়স কমাইয়া দেওয়া ইত্যাদি ভারতের স্বার্থবিরোধী আইন ছিল,—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা।

(২) কংগ্রেসের প্রথমদিকের কার্য্যাবলী ছিল—'আবেদন-নিবেদন'। অর্থাৎ দেশের বিভিন্ন সমস্যা ও ভারতবাসীর দাবি আবেদনের আকারে উপস্থিত করা। প্রথম

দিকে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল সহযোগিতা—বিরোধিতা নহে। ইহার সুফলও হইয়াছিল—ক্রমশঃ ভারতীয়গণ শাসনকার্য্যে অংশভাগী হইতে লাগিল—১৮৯২ খৃঃ-এ ইণ্ডিয়া কাউন্সিলস এ্যাক্ট।

(২) কিন্তু ভারতবাসীর আশা আকাক্ষা সম্বন্ধে বৃটিশের ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়া ক্রমশঃ ভারতবাসী ক্ষুব্ধ ও অপমানিত বোধ করিল—কংগ্রেসের মধ্যে বৃটিশের শাসন-বিরোধী এক চরমপন্থীদলের সৃষ্টি হইল—বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিন চন্দ্র পাল, লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি—বৃটিশ শাসনের সমালোচনা—ইংরাজ সরকার কর্তৃক মুসলিম তোষণ নীতি—Divide and Rule এই নীতি অবলম্বন।

(৪) লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫) বিদেশীবর্জনের সঙ্কল্প—বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ভারতের জাতীয়তাবাদী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে পরিণত।

(৫) **আলোচনা:** ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় ১৮৮৫ খৃঃ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল বৃটিশের সহযোগিতা ও আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে শাসনতান্ত্রিক সুবিধা অর্জন। এই সকল সুবিধা অর্জনের জন্য নিয়মতান্ত্রিক উপায়ই ছিল কংগ্রেসের মূলনীতি। কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিকতার সমান্তরালে চরমপন্থী দেশপ্রেমিকরা সন্ত্রাসবাদ চালাইয়াছে। তবে বঙ্গভঙ্গের পূর্ব পর্য্যন্ত স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার আন্দোলন তেমন তীব্র ও স্থায়ী আকার ধারণ করে নাই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পর হইতে এই আন্দোলন নূতন খাতে বহিতে আরম্ভ করিল।

ত্রিংশ অধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর জাতীয় আন্দোলন : শাসনতান্ত্রিক সংস্কার

Syllabus : Birth of Muslim League—Morley-Minto reforms (1909). Communal electorate. Lucknow Pact. Tilak's Home Rule Agitation. Declaration of Montague Chelmsford Reforms. Khilafat Agitation Rowlatt Bill. Jalianwallah Bag. Emergence of Gandhi. Calcutta Congress. A new man and a new technique.

পাঠ্যসূচী :—মুসলিম লীগের জন্ম—মর্লো-মিণ্টো সংস্কার (১৯০৯)। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা। লক্ষ্ণৌ চুক্তি। তিলকের হোমরুল আন্দোলন। মণ্টেগুর ঘোষণা—মণ্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার। খিলাফৎ আন্দোলন। রাউলাট বিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। গান্ধীজীর আবির্ভাব। কলিকাতা কংগ্রেস। নাগপুর কংগ্রেস। নূতন মানব এবং নব (রণ) কৌশল।

মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা : বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তায় ভীত হইয়া মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেস হইতে দূরে রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। বৃটিশের এই বিভেদনীতি ও মুসলিমতোষণ প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইল না। আলিগড়ে সাম্প্রদায়িকতার বীজ পূর্বেই বপন করা হইয়াছিল—ইংরেজের অনুগত সৈয়দ আহম্মদ, আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলি, রাজা আমির হোসেন খান প্রভৃতি মুসলিম নেতৃবৃন্দ স্বধর্মীয়দিগকে কংগ্রেস হইতে দূরে থাকিতে পরামর্শ দেন। তবে সেই সময়ে এই প্রচেষ্টা মোটেই সফল হয় নাই। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেসের অধিবেশনে তিন শতাধিক মুসলমান প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিল এবং সুবিখ্যাত মুসলিম নেতা বদরুদ্দিন তায়েবজী তৃতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ক্রমাগত শিক্ষিত মুসলমানদের এক দলকে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য প্ররোচিত করিতে লাগিল এবং ইহাদের দ্বারাই মুসলমান স্বার্থরক্ষী প্রতিষ্ঠান 'মুসলিম লীগ' সৃষ্ট হইল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে খোজা মুসলিম

সম্প্রদায়ের ধর্মনেতা আগা খাঁ ভাইসরয় লর্ড মিণ্টোর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন দাবি করিল। লর্ড মিণ্টো ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার প্রবেশে উল্লসিত হইলেন এবং গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মুসলীম স্বার্থ বিশেষভাবে সংরক্ষিত হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। শেষ পর্য্যন্ত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকার নবাব সলিমুল্লা কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে 'মুসলিম লীগ'-এর প্রতিষ্ঠা করিলেন। কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতাদের মত বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের দ্বারা মুসলমানদের জন্য রাজনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা আদায় করাই মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য। বৃটিশ সরকার এই সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানকে হস্তগত করিয়া ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে বন্ধ করিতে চাহিল।

মুসলিম লীগের সৃষ্টি
১৯০৬

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষে যে জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার চাপে বাধ্য হইয়া বৃটিশ সরকার ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে 'মর্লে-মিণ্টো' সংস্কার প্রবর্তন করিলেন। এই নূতন সংস্কারের ফলে বড়লাটের শাসন পরিষদে একজন ভারতীয় সদস্য গ্রহণের ব্যবস্থা হইল। উপরন্তু কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় বে-সরকারী সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। এই সংস্কারের দ্বারা আইন সভার সদস্যগণ আয়ব্যয় নির্দ্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে যৎসামান্য অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। এই সংস্কারের অন্যতম হইল মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। এই শাসন সংস্কার ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারিল না। উপরন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে সম্প্রদায়িকতার বিষ সঞ্চারিত করা হইল। অচিরে এই বিষ রাজনীতি ও জাতীয় জীবনকে ক্লিষ্ট ও পঙ্গু করিয়া তুলিল। ইতিমধ্যে গভর্ণমেণ্টের দমননীতি তীব্রভাবে অনুসৃত হইতে লাগিল এবং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের তিন আইন অনুযায়ী বাংলার অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কয়েকজন জননায়ক কারারুদ্ধ হইলেন। এই সকল দণ্ডনীতির ফলে ভারতব্যাপী বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। ভারতবাসীর এই অসন্তোষ প্রশমিত করার জন্য ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতে পদার্পণ করিয়া বঙ্গ ভঙ্গ রদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন এবং ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইবে এই ঘোষণাও করিলেন।

মর্লে-মিণ্টো সংস্কার
১৯০৯

বঙ্গভঙ্গ রদ

মর্লে-মিণ্টো সংস্কারের ফলে দেশের কোন পক্ষই সন্তুষ্ট হইল না। ইতিমধ্যে বহির্বিশ্বের কয়েকটি ব্যাপারের ফলে ভারতের জাতীয়তাবাদ পুনরায় নূতন উদ্দীপনায়

সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। এই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা, উগাণ্ডা, কেনেয়া প্রভৃতি কয়েকটি বৃটিশ উপনিবেশে, ভারতবাসীর উপর অত্যন্ত নির্য্যাতন করা হইতেছিল। স্বদেশীয়দের উপর এই নির্য্যাতন এবং বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদ কল্পে ব্যারিষ্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন আরম্ভ করেন। ভারতের বাহিরে দেশবাসীর এই অপমান ও লাঞ্ছনায় সমগ্র ভারতবর্ষ বিচলিত হয় এবং স্বাধীনতা অর্জিত না হইলে বিদেশে ভারতবাসীর মর্য্যাদা কোথাও রক্ষিত হইবে না উহা উপলব্ধি করে। ইসলাম রাষ্ট্রদ্বয় তুরস্কে ও পারস্যে নব জাগরণের সংবাদে ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়ও জাতীয়তাবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে 'মুসলিম লীগ' স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব করে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট দ্বারা কংগ্রেস ও লীগ যুক্তভাবে বৃটিশ বিরোধী কার্যক্রমের নীতি গ্রহণ করে; লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে কংগ্রেস মুসলমানের জন্য পৃথক নির্বাচনের নীতি মানিয়া লইল। প্রথম বিশ্বমহাসমরের পটভূমিকায় মুসলমান সম্প্রদায়ের বৃটিশ বিরোধিতার অন্য কারণও ছিল। ইসলামের ধর্মগুরু তুরস্কের খলিফার বিরুদ্ধে ইংরেজ যুদ্ধ ঘোষণা করাতে মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে।

প্রবাসী ভারতীয়ের লাঞ্ছনা, ইহার প্রতিকার

লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট ১৯১৬

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বৃটেনকে যুদ্ধে সাহায্য করার নীতি গ্রহণ করে। যুদ্ধান্তে শাসনতান্ত্রিক সুবিধালাভের প্রত্যাশায় কংগ্রেস বৃটিশকে অত্যন্ত সাহায্য করিয়াছিল। ভারতবর্ষ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রায় আটলক্ষ সৈন্য, পনরো শত কোটি টাকা, অপরিমিত খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়া সাহায্য করিয়াছিল। ভারতবাসী আশা করিয়াছিল এবং বৃটিশের পক্ষ হইতে এই আশ্বাসও পাইয়াছিল যে, যুদ্ধান্তে অন্ততঃ কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ইংরেজ ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদান করিবে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের সময়ে বালগঙ্গাধর তিলক ও মিসেস এ্যানি বেসান্ট নাম এক ইংরেজ মহিলা 'হোম রুল লীগ' বা ভারতীয় স্বায়ত্তশাসন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতের সাহায্য দান

বালগঙ্গাধর তিলক

সমিতি স্থাপন করেন। তিলক 'কেশরী' ও 'মারাঠা' পত্রিকার সাহায্যে হোমরুলের বার্তা সাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে থাকেন। সরকার দমননীতির সাহায্যে এই আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করিল। হোমরুলের নেতৃবৃন্দের উপর বিধিনিষেধ জারি করা হইল।

হোমরুল লীগ

জাতীয় আন্দোলন ক্রমশঃ তীব্র আকার ধারণ করিতেছে উপলব্ধি করিয়া ভারত সচিব মণ্টেগু ও ভাইসরয় চেমসফোর্ড ভারতের জন্য একটি শাসন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে এই নূতন সংস্কারের প্রস্তাব সমূহ প্রকাশ করিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এই পরিকল্পনানুযায়ী ভারতবর্ষে নূতন শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হইল। ইহা মণ্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার নামে খ্যাত। এই শাসন সংস্কারের মূল নীতি ছিল ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ থাকিবে, কেন্দ্রীয় শাসনে কোন মৌলিক পরিবর্তন হইবে না, প্রদেশে দ্বৈত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে এবং ভারতের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির অধিকার ক্রমশঃ প্রসারিত হইবে।

মণ্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার, ১৯১৯

চিত্তরঞ্জন দাশ

বাংলার চিত্তরঞ্জন দাশ, যুক্ত প্রদেশের মতিলাল নেহরু, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়, মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ নেতৃবৃন্দের প্রেরণায় এই নূতন সংস্কারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। কংগ্রেস দেশবাসীর পক্ষ হইতে নূতন সংস্কার গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া ইহা প্রত্যাখ্যান করিল এবং এই মণ্টেগু সংস্কারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সভাসমিতি ও আন্দোলন আরম্ভ করিল। প্রত্যুত্তরে গভর্ণমেণ্ট 'রাউলাট অ্যাক্ট' নামে এক দমনমূলক আইন বিধিবদ্ধ করিয়া জাতীয় আন্দোলনকে বিনষ্ট করার চেষ্টা

মতিলাল নেহরু

রাউলাট অ্যাক্ট

করে। এই দমনমূলক আইনের প্রতিবাদে দেশের সর্বত্র আন্দোলন আরম্ভ হইলে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক প্রতিবাদ সভায় নিরস্ত্র জনতার উপর বৃটিশ

লাজপত রায়

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড

জেনারেল ডায়ারের আদেশে সৈন্যদল গুলি চালাইয়া বহু নরনারীকে নিহত করে। অতঃপর পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করিয়া গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে। এই সময়ে দেশের বহু জননায়ককে বিনা বিচারে বন্দিশালায় এবং নির্বাসনে প্রেরণ করা হয়। এই সকল দমননীতির ফলে জাতীয় আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়। যুদ্ধান্তে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যুদ্ধের ঋণ পরিশোধের জন্য বিভিন্ন প্রকারের করবৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহাও বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বৃদ্ধি কারণ হয়।

খিলাফৎ আন্দোলন

১৯১৪—১৮ খৃষ্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ইংলণ্ড প্রমুখ বিজয়ী মিত্রশক্তি তুরস্কের খলিফাকে পদচ্যুত করে। মুসলিম জগতের ধর্মগুরু খলিফার পদচ্যুতির প্রতিবাদকল্পে মুসলিম জননায়ক মহম্মদ আলি, সৌকত আলি, আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতির নেতৃত্বে খলিফাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য খিলাফৎ আন্দোলনের সৃষ্টি হইল এবং মুসলমান সম্প্রদায় বৃটিশের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগদান করিল। গান্ধী কংগ্রেসের কর্ণধার হইয়া খিলাফৎ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আপোষরফা করিলেন এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে নাগপুর কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বৃটিশের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের সহিত যুক্ত হইয়া প্রধানতঃ ধর্মমূলক খিলাফৎ আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিবর্তিত হইয়া গেল এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করিয়া তুলিল।

আবুল কালাম আজাদ

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুর পরে, গান্ধীজীই ভারতের অবিসংবাদী নেতারূপে দেখা দিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতবাসীর জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার উপর রূঢ় আঘাত করিয়া দমনমূলক রাউলাট অ্যাক্ট পাশ করিলেন। এই আইন পাশ করিবার পূর্বে গান্ধীজী তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল চেমসফোর্ডকে এই নির্যাতন-মূলক আইন পাশ না করাইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর অনুরোধ উপেক্ষিত হইয়া যখন এই আইন চালু হইল, তখন গান্ধীজী এই আইন অমান্য করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিলেন। বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য গান্ধীজী 'সত্যাগ্রহ' নামে, নূতন পদ্ধতির আন্দোলনের প্রস্তাব দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। সত্যের ভিত্তিতে, অহিংস পদ্ধতিতে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম করিতে হইবে বলিয়া তিনি ইহার নামকরণ করিলেন 'সত্যাগ্রহ'।

গান্ধীজীর আবির্ভাব

গান্ধীজী

১৯২০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজী তাঁহার অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিলেন। এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে নাগপুরের কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে কলিকাতা কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাব অনুমোদিত হইল। শান্তিপূর্ণ এবং বৈধ উপায়ে স্বরাজলাভ এখন হইতে কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হইল।

কলিকাতা কংগ্রেস, ১৯২০

নাগপুর কংগ্রেস, ১৯২০

প্রশ্ন উত্তর

1. Discuss the circumstances leading to the birth of Muslim league and its importance in the history of the National Movement.

উত্তর-সূত্র: ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেস অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হইতে দূরে রাখিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের প্ররোচনায় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে

মুসলিম লীগের সৃষ্টি হয়। বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের দ্বারা মুসলমানদের জন্য রাজনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা আদায় করাই মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য ছিল। মুসলিম লীগ সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানরূপে গঠিত হয় এবং ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগদান করা বা বৃটিশ শাসনের বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করার পরিবর্তে ইহা স্ব সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিকার দাবি করা এবং রাজশক্তির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা সম্বন্ধে অত্যধিক যত্নবান হইল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও 'বিভেদ ও শাসন' এই নীতি অনুসরণ করিয়া সর্বপ্রকারে মুসলিম লীগকে সন্তুষ্ট করার জন্য সচেষ্ট হইল। এইভাবে বৃটিশের আনুকূল্য ও প্রশ্রয়ে ভারতের রাজনীতিতে দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং সাম্প্রদায়িকতার বীজ সঞ্চারিত হইল। বলা বাহুল্য বৃটিশের তোষণপুষ্ট এই মুসলিম লীগের দাবির ফলেই পরিণামে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতবিভাগ সম্পন্ন হইয়াছিল।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে মুসলীম লীগের গুরুত্ব অত্যধিক। মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশ ইহাতে যোগদানের পরিবর্তে কংগ্রেসেই যোগদান করিয়া জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কংগ্রেস মুসলিম লীগকে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে সংযুক্ত করার জন্য ইহার সঙ্গে লক্ষ্ণৌ চুক্তি (১৯১৬) দ্বারা মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবি মানিয়া লয়। এই সময়ে বৃটিশের তুরস্কনীতির ফলে মুসলিম লীগও বৃটিশ বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলাইয়া মুসলিম লীগ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। অতঃপর তুরস্কের সমস্যা মিটিয়া যাওয়াতে মুসলিম লীগ পুনরায় কংগ্রেস বা জাতীয় আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাম্প্রদায়িক সুযোগ সুবিধা দাবি করিতে থাকে। কংগ্রেসের সমর্থন ও বৃটিশের প্রশ্রয়ে তাহাদের দাবিসমূহ পূর্ণ হইলেও ক্রমশঃ তাহাদের দাবি চড়িতে থাকে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের Communal Award বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রে মুসলমানদের প্রাপ্যের চেয়ে অধিক আসন দেওয়া হয়। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম লীগ প্রায় মুমূর্ষু ছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের সুযোগে এবং কংগ্রেসের ঔদাসীন্যে মুসলিম লীগ বঙ্গ দেশে মন্ত্রিসভা গঠন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মুসলিম লীগ বৃটিশকে যুদ্ধে সাহায্য করার নীতি গ্রহণ করে এবং কংগ্রেসের পরিত্যক্ত মন্ত্রিসভার আসনসমূহ অধিকার করার সুযোগ লাভ করে। এইভাবে মুসলিম লীগ ক্রমশঃ ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে এবং জিন্নার নেতৃত্বে এবং বৃটিশের স্বার্থের প্রয়োজনে ও আনুকূল্যে পরিশেষে ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলিম ভেদে দুইটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়।

2. Write the history of the Indian National Movement from 1905 to 1920

১৯০৫ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস লিখ।

উত্তর-সূত্র:—ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচালক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের প্রথম যুগ অর্থাৎ ও ১৮৮৫—১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশের সহযোগিতা ও আবেদন নিবেদনের মধ্য দিয়া শাসনতান্ত্রিক সুবিধা অর্জন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ হইলে দেশবাসী উপলব্ধি করিতে পারিল যে আবেদন নিবেদনের মধ্য দিয়া ভারতবাসী ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিবেনা। অতঃপর ভারতের জাতীয় আন্দোলন নূতন ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং এই আন্দোলন পূর্বে অনুসৃত নিয়মতান্ত্রিকতার পথের পরিবর্তে সক্রিয় আন্দোলন ও অধিকতর বিপ্লবমুখী পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একটি চরমপন্থী দলের সৃষ্টি হইল। তাহারা পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত সন্তুষ্ট হইবেনা বলিয়া ঘোষণা করিল। এই চরমপন্থী দলের নেতৃত্বে বঙ্গ বিভাগের বিরোধী তীব্র আন্দোলন সৃষ্ট হয় এবং বৃটিশ দ্রব্য 'বয়কট' প্রস্তাব কার্যকরী করার চেষ্টা হয়। বৃটিশ গভর্নমেন্ট দমননীতি ও শাসনতান্ত্রিক অধিকার দানের দ্বারা এই আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মর্লে-মিন্টো সংস্কার প্রবর্তন এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ ভঙ্গ রদ হইলে সাময়িকভাবে জাতীয় আন্দোলন স্তিমিত হয়।

ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের উপর বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ নীতি অবলম্বন করেন এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জিত না হইলে বিদেশে ভারতবাসীর মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে না তাহা দেশবাসী উপলব্ধি করে। তুরস্কে ও পারস্যে নব জাগরণের সংবাদে মুসলিম লীগ স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট (১৯১৬)-এ আবদ্ধ হয়। কংগ্রেস ও লীগ যুক্ত ভাবে বৃটিশ বিরোধী কার্য্যক্রম স্থির করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কংগ্রেস শাসনতান্ত্রিক অধিকার লাভের প্রত্যাশায় ও প্রতিশ্রুতিতে বৃটেনকে যুদ্ধে সাহায্য করার নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেন্ট ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মন্টেগু চেমসফোর্ড নামে যে নূতন শাসন সংস্কার ঘোষণা করে তাহাতে স্বল্পমাত্র শাসনতান্ত্রিক অধিকার দানের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত মৌলিক কোন পরিবর্তন দেখা গেলনা। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে নূতন সংস্কার প্রত্যাখ্যাত হইল এবং এই সংস্কারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। প্রত্যুত্তরে গভর্নমেন্ট 'রাউলাট এক্ট'

নামে এক দমনমূলক আইন বিধিবদ্ধ করে। এই আইনের প্রতিবাদে দেশের সর্বত্র আন্দোলন আরম্ভ হইলে অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে এক প্রতিবাদ সভার নিরস্ত্র জনতার উপর সৈন্যদল গুলি চালাইয়া বহু লোককে হত্যা করে। এতদ্ব্যতীত বিনা বিচারে বহু লোককে বন্দিশালায় এবং নির্বাসনে প্রেরণ করা হয়। গান্ধী কংগ্রেসের কর্ণধার হইয়া ১৯২০ খৃষ্টাব্দে নাগপুর কংগ্রেস গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বৃটিশের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। 'সত্যাগ্রহ' নামে নূতন পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণ এবং বৈধ উপায়ে স্বরাজলাভ এখন হইতে কংগ্রেসের তথা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য হইল।

একত্রিংশ অধ্যায়

স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্য্যায় ঃ ভারত বিভাগ ও স্বাধীনতা লাভ

Syllabus: The Non-Co-Operation Movement—First phase. Swarajya Party and Council entry. Simon Commission. Nehru Report. Complete Independence, now the goal. Non Co-Operation Movement—2nd phase. Round Table Conference. Communal Award. The Government of India Act, 1935. Outline of a federal system. Congress Government in seven provinces. Resignation of Congress Goverment. Congress demands. Jinnah's fourteen points. His control of the League. Pakistan Resolution, 1940. Cripps Mission. August Rebellion. I. N. A. End of the war. Cabinet Mission. Transfer of power on the basis of partition (1947).

পাঠ্যসূচী:—অসহযোগ আন্দোলন ১ম পর্য্যায়। স্বরাজ্যদল ও আইন সভায় প্রবেশ। সাইমন কমিশন। নেহরু রিপোর্ট। এখন লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা। অসহযোগ আন্দোলন—২য় পর্য্যায়। গোলটেবিল বৈঠক। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা। ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার খসড়া। সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসী সরকার। কংগ্রেসী সরকারের পদত্যাগ। কংগ্রেসের দাবী। জিন্নার চৌদ্দদফা; মুসলিম লীগে জিন্নার প্রাধান্য। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের পাকিস্তান প্রস্তাব। ক্রিপস মিশন। অগষ্ট আন্দোলন। আজাদ হিন্দ ফৌজ। যুদ্ধের অবসান। ক্যাবিনেট মিশন। ভারতবিভাগের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্য্যায়:—গান্ধীজীর নেতৃত্বে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন একই সঙ্গে চলিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু, লালা লাজপত রায়, মহম্মদ আলি, সৌকত আলি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ গান্ধীজীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেশমাতৃকার

প্রথম পর্ব

আহ্বানে বহু খ্যাতিমান ব্যক্তি স্ব স্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া আন্দোলনে যোগদান করিলেন। গান্ধীজী দেশবাসীকে চাকরি, স্কুল-কলেজ, আইন-আদালত সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করিয়া ভারতে বৃটিশ শাসন ব্যবস্থা অচল করিয়া দিবার জন্য আহ্বান করিলেন। উকিল-ব্যারিষ্টারগণ আদালত পরিত্যাগ করিলেন ও ছাত্রেরা স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া আসিল। দেশের বহুস্থানে ধর্মঘট হইল—বিলাতী দ্রব্য বর্জন ও সরকারের সহিত অসহযোগিতার আন্দোলন আরম্ভ হইল। প্রচলিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ 'গোলামখানা' নামে অভিহিত হইতে থাকে এবং দেশের সর্বত্র 'ন্যাশনাল স্কুল' বা জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। বৃটিশ সরকার কঠোর হস্তে এই আন্দোলন দমন করিবার জন্য সর্বশক্তি নিযুক্ত করিলেন। পুলিশের লাঠি, বন্দুকের গুলি, বেত্রাঘাত, অর্থদণ্ড, কারাগারে প্রেরণ, সর্বপ্রকার দমননীতি প্রয়োগ করিয়াও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই আন্দোলন বন্ধ করিতে পারিলেন না। এই আন্দোলনে ত্রিশ সহস্র ভারতীয় নরনারী কারাবরণ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে গোরক্ষপুরের অন্তর্গত চৌরীচৌরা গ্রামে পুলিশের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হইয়া এক জনতা পুলিশ থানায় অগ্নি সংযোগ করিল এবং বাইশ জন পুলিশ কর্মচারীকে হত্যা করিল। গান্ধীজী এই হিংসামূলক আচরণে ব্যথিত হইয়া অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করিলেন এবং সাময়িকভাবে রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট গান্ধীজীকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন।

বৃটিশের দমন নীতি

চৌরীচৌরার হত্যাকাণ্ড
আন্দোলন প্রত্যাহার

মিত্রশক্তি কর্তৃক পদচ্যুত ও নির্বাসিত খলিফাকে পুনরায় পূর্বপদে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যাশায় মুসলমান নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের সমর্থন লাভের বিনিময়ে এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তুরস্কের জনসাধারণ খলিফাকে পদচ্যুত ঘোষণা করিয়া মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কের গণতন্ত্র ঘোষণা করিল। ইহাতে খিলাফৎ আন্দোলনের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিল এবং মুসলমান সম্প্রদায় কংগ্রেস হইতে দূরে সরিয়া গেল। উপরন্তু আরব বংশসম্ভূত মোপলা নামে মালাবারের এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ মুসলমান ১৯২১—২২ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী হইয়া প্রতিবেশী হিন্দুগণকে আক্রমণ করে—তাহাদের ঘরবাড়ী পোড়াইয়া দেয়, বহু হিন্দুকে হত্যা করে এবং মুসলমানধর্মে বলপূর্বক দীক্ষিত করে। অচিরেই মোপলাবিদ্রোহ দমন করা হয়। এই সকল হিংসামূলক আচরণে গান্ধীজী তাঁহার আন্দোলনের ব্যর্থতা (Himalayan Blunder) স্বীকার করিয়া আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত হন।

মুসলমান সম্প্রদায়
আন্দোলন হইতে
অপসৃত হয়

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইলে মণ্টেগু চেমসফোর্ডের সংস্কারের অসারতা প্রতিপন্ন করার জন্য ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু, এন সি কেলকার প্রভৃতি কয়েকজনের নেতৃত্বে স্বরাজ্য পার্টি গঠিত হয়। স্বরাজ্য দল নূতন সংস্কারের সংশোধন অথবা অবসান (Mending or ending) ঘটাইবার উদ্দেশ্যে আইরিশ নেতা পার্নেল অনুসৃত পন্থানুযায়ী ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের সংস্কার আইন অনুযায়ী নির্বাচনে যোগদান করে এবং সর্বত্র আইন সভায় প্রবেশ করিয়া সরকারের বিরোধিতার দ্বারা অচল অবস্থার সৃষ্টি করে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই অচল অবস্থা বর্তমান ছিল।

স্বরাজ্য দল

জাতীয় আন্দোলন কিয়ৎকাল স্তিমিত থাকার পরে লর্ড আরউইনের শাসনকালে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে, সাইমন কমিশন ভারতবর্ষ পরিদর্শনে আসিলেন। এই কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সংস্কার আইন কতদূর কার্যকরী হইয়াছে তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া সেই সম্বন্ধে পার্লামেণ্টের নিকট রিপোর্ট প্রদান করা। সম্পূর্ণ অ-ভারতীয় দ্বারা গঠিত সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হইল এবং ভারতবাসী ইহা বর্জন করিল। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের নির্দেশে মতিলাল নেহরু, তেজ বাহাদুর সাপ্রু প্রভৃতি কয়েকজন নেতা ভারতের জন্য উপযুক্ত শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত করিলেন। এই খসড়া নেহরু রিপোর্ট" নামে পরিচিত। 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস' বা উপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনই নেহরু রিপোর্টের মূল বক্তব্য ছিল। সুভাষ চন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু প্রমুখ কংগ্রেসের তরুণ সভ্যবর্গ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিল এবং সেই বৎসরই কলিকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল উপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের পরিবর্তে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উপস্থিত করিলেন।

সাইমন কমিশন, ১৯২৭

সুভাষচন্দ্র

অবশেষে গান্ধীজীর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের চরমলক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হয়, কিন্তু ১৯২৫ সালের মধ্যে উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিলে কংগ্রেস তাহা গ্রহণ করিবে এরূপ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দেওয়া হয়। ভারতের জনমত লক্ষ্য করিয়া ১৯২৯ সালের ৩১শে অক্টোবর গভর্ণমেণ্ট এক ঘোষণা দ্বারা জানাইয়া দেন যে উপনিবেশিক

নেহরু রিপোর্ট

স্বায়ত্ত শাসনই ভারতীয় সংস্কারের স্বাভাবিক পরিণতি। ইহা স্বীকার করা হইল। সাইমন কমিশনারের রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে সর্ববাদিসম্মত ভিত্তিতে ভারত-শাসন সংস্কারের উদ্দেশ্যে লণ্ডনে এক গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বানের উল্লেখও তাঁহার বিবৃতিতে ছিল।

জওহরলাল নেহরু

আরউইনের ঘোষণায় উপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের কথা উল্লেখ থাকিলেও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আরউইনের উক্তি সমর্থন করিল না বরঞ্চ তাহা এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। ইহার মধ্যে স্বাধীনতা দিবস এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোভাবের পরিচয়ে কংগ্রেস বৃটিশের সাদচ্ছার উপর সন্দিগ্ধ হইয়া জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে লাহোর অধিবেশনে (১৯২৯) কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিল। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী ভারতময় স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হইল এবং উক্ত বৎসর ৩০শে এপ্রিল গান্ধীজী পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন।

২৬শে জানুয়ারী ১৯৩০

ইতিমধ্যে মহম্মদ আলি জিন্নার ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ১৯২৯ সালের প্রথম দিকে চৌদ্দ দফা দাবির এক খসড়া প্রস্তুত করিয়া তাহা সর্বদলীয় মুসলিম সম্মেলনে উত্থাপন করেন এবং এই দাবির প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়। মৌলানা আজাদ প্রমুখ নেতাগণ ইহার প্রতিবাদে লীগ পরিত্যাগ করিয়া জাতীয়তাবাদী মুসলিম দল স্থাপন করেন। তাহার চৌদ্দ দফা দাবি সংক্ষেপে এই—(১) ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র ফেডারেল হইবে এবং অনির্দিষ্ট ক্ষমতাগুলি প্রদেশের হাতে থাকিবে; (২) সকল প্রদেশই একই প্রকার স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিবে (৩) প্রত্যেক প্রদেশেই

জিন্নার চৌদ্দ দফা

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় উপযুক্ত সংখ্যক আসন পাইবে, কিন্তু সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সংখ্যাগুরুত্ব বজায় রাখিতে হইবে। তাঁহাদের আসন সংখ্যালঘুর আসনের চেয়ে বেশী হইবে, (৪) কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে মুসলমানদের আসন এক তৃতীয়াংশের কম হইবে না, (৫) পৃথক নির্বাচন প্রথা চলিতে থাকিবে। (৬) কোন প্রদেশের সীমানা পরিবর্তন করিতে হইলে এমনভাবে তাহা করা যাইতে পারিবে না যাহাতে বাংলা, পঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানগণ অন্য সম্প্রদায়ের চেয়ে সংখ্যা লঘু হইয়া পড়েন; (৭) ধর্ম এবং রাষ্ট্রীয় সর্বপ্রকার অধিকার প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই থাকিবে। (৮) কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থে আঘাত লাগে এই যুক্তিতে যদি সেই সম্প্রদায়ের নির্বাচিত সদস্যের তিন চতুর্থাংশ

মহম্মদ আলি জিন্না

ব্যবস্থাপক সভায় কোন আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করে, তবে সেই আইন প্রণয়ন করা হইবে, (৯) সিন্ধুকে বোম্বাই হইতে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিতে হইবে (১০) সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্থানেও অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় শাসন সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে হইবে; (১১) কর্মকুশলতার নীতি অক্ষুন্ন রাখিয়া সর্বপ্রকার চাকরীতে উপযুক্ত সংখ্যায় মুসলমানদের গ্রহণ করিতে হইবে। (১২) শাসনতন্ত্রেই মুসলমান-সম্প্রদায়ের শিক্ষা সংস্কৃতি ইত্যাদি রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, (১৩) কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় মুসলমান সভ্যের সংখ্যা অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ হওয়া চাই, (১৪) প্রদেশগুলির মত না লইয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শাসনযন্ত্রের পরিবর্তন করা চলিবে না। জিন্নার এই দাবি সমূহের পশ্চাতে কোন গণতান্ত্রিক ভিত্তি ছিল না। সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া তিনি এই সমস্ত দাবি করিতে থাকেন, ফলে সাম্প্রদায়িক সমস্যা জাতীয় আন্দোলনের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দাবি প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে মিটাইবার জন্য গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কোন আগ্রহ না দেখাইবার ফলে গান্ধীজী ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। পুনরায় সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইল। গান্ধীজী লবণ সংক্রান্ত আইনকেই ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার ৭৮ জন অনুচরসহ লবণ প্রস্তুত করার জন্য ডাণ্ডিতে সমুদ্রতীরে অগ্রসর হইলেন (৬, এপ্রিল) এই অভিযানের মধ্যেই গান্ধীজী সংগ্রামের কর্মসূচী ঘোষণা করিলেন। ভারতের গ্রামে গ্রামে

লবণ প্রস্তুত করিয়া আইন ভঙ্গ করা বিলাতী দ্রব্য বর্জন, মদের দোকানে পিকেটিং করা, স্কুল কলেজ বর্জন, সরকারী চাকুরী ত্যাগ, সাম্প্রদায়িক ঐক্যপ্রচেষ্টা প্রভৃতি এই আন্দোলনের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইল। সর্বত্র এই কর্মসূচী অনুযায়ী আন্দোলন আরম্ভ হইল। গভর্ণমেণ্টও এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য সর্বশক্তি নিযুক্ত করিলেন। বিভিন্ন দমন আইন প্রবর্তিত হওয়ায় অসংখ্য ব্যক্তি কারারুদ্ধ হইল। কংগ্রেস ও ইহার সকল সংগঠন বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল। নেতৃগণ সকলেই কারারুদ্ধ হইলেন। কিন্তু দেশব্যাপী অশান্তির অগ্নি নির্বাপিত হইল না।

আইন অমান্য আন্দোলন, ১৯৩০

ইতিমধ্যে সাইমন কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে নূতন শাসনতান্ত্রিক অধিকার দেওয়ার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এক গোল টেবিল সভা আহ্বান করিলেন। কংগ্রেস এই বৈঠকে যোগদান করিল না। কিন্তু কংগ্রেসকে বাদ দিয়া ভারতীয় শাসনতন্ত্র রচনা নিরর্থক বুঝিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে বড়লাট লর্ড আরউইন কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ করিয়া এক সর্বদল সম্মত যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধীকে কারামুক্ত করেন এবং মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে এক চুক্তি করেন। ইহা 'গান্ধী-আরউইন' চুক্তি নামে খ্যাত। এই চুক্তির ফলে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করেন, গভর্ণমেণ্টও অর্ডিনান্স সমূহ বাতিল করিয়া সত্যাগ্রহী বন্দীগণকে (হিংসাপন্থী বন্দী ব্যতীত) কারামুক্ত করিল। অতঃপর গান্ধীজী কংগ্রেসের প্রতিনিধি রূপে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। ইতিমধ্যে বিলাতে মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হইলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোভাবের পরিবর্তন হয়; উপরন্তু মুসলমান প্রতিনিধিগণ বৃটিশ সরকারের প্ররোচনায় সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন তুলিয়া কোনপ্রকার মীমাংসার পথ রুদ্ধ করেন। সুতরাং মহাত্মাকে রিক্তহস্তে গোলটেবিল বৈঠক হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে হইতে হয়। নূতন বড়লাট লর্ড উইলিংডন ভারতে আসিয়া পূর্ণোদ্যমে দমননীতি আরম্ভ করেন। অচিরেই মহাত্মা গান্ধী এবং অন্যান্য নেতৃবর্গ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয় ও কংগ্রেস বে আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত হয়।

গান্ধী আরউইন চুক্তি

কংগ্রেসের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান

কংগ্রেসকে বাদ দিয়াই লণ্ডনে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের কার্য্য চলিতে থাকে। প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের আলোচনার সময়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিবর্গ একমত না হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড স্বয়ং এক সিদ্ধান্তে

উপনীত হন। তিনি মাত্র হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে নহে, হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কম্যুনাল এওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নামে এক প্রস্তাব ঘোষণা করেন। ইহা দ্বারা মুসলমান, শিখ, ভারতীয় খৃষ্টান, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং ইউরোপীয় সম্প্রদায় প্রভৃতিকে আইন সভায় পৃথক নির্বাচন কেন্দ্রের সুবিধা দেওয়া হয়। হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত অনুন্নত সম্প্রদায়ের (Scheduled Caste) জন্যও পৃথ নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। মহাত্মা গান্ধী হিন্দুসমাজের মধ্যে এইরূপ বিভেদ সৃষ্টির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ যারবেদা জেলে অনশন করিতে আরম্ভ করেন। মহাত্মার অনশন ভঙ্গের জন্য অনুন্নত এবং বর্ণ-হিন্দুর নেতৃবৃন্দ পুনাতে মিলিত হইয়া এক চুক্তি করেন। এই পুনা-চুক্তিতে কতকগুলি বিশেষ শর্তসাপেক্ষে ও অনুচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়। উপরন্তু বর্ণহিন্দুদের জন্য নির্দিষ্ট আসন সংখ্যা হইতে কয়েকটি আসন আইন সভায় তপশীলভুক্ত হিন্দুদের জন্য নির্দিষ্ট হয়। ইহাতে বর্ণহিন্দুদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে এবং ভেদনীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। কংগ্রেস এই ভেদনীতির ক্ষতিকর পরিণাম উপলব্ধি করিয়াও মুসলমান সম্প্রদায়ের মনস্তুষ্টির জন্য এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে এক অদ্ভুত 'না গ্রহণ না বর্জন' নীতি প্রস্তাব গ্রহণ করিল। কংগ্রেসের এই দুর্বলনীতির জন্যই পরিণামে বাংলা ও পাঞ্জাব রাজনৈতিক কণ্টকিত সমস্যাপূর্ণ প্রদেশে পরিণত হয় এবং পরবর্তীকালে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকেনা।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা

পুনা চুক্তি

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারতশাসন আইন: সাইমন কমিশনের সুপারিশ, গোলটেবিল বৈঠক সমূহের আলাপ আলোচনা এবং জয়েন্ট পার্লামেণ্টরী কমিটির সম্মুখে গৃহীত ভারতের দেশীয় রাজ্য ও বৃটিশ ভারতের কতিপয় ব্যক্তির মতামতের উপর ভিত্তি করিয়া ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্ট ভারত শাসন আইন লিপিবদ্ধ করিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইন ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে কার্য্যকরী করা হয়। নূতন সংস্কার আইন সম্বন্ধে কংগ্রেসের বিরূপ মনোভাব থাকিলেও কংগ্রেস শাসনতন্ত্র করতলগত করার জন্য সাধারণ নির্বাচনে অবতীর্ণ হয় এবং ১১টি প্রদেশের মধ্যে ছয়টি প্রদেশের আইন সভায় অন্য নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশেও সাধারণ আসন সমূহ কংগ্রেস সদস্যের দ্বারা অধিকৃত হয়। কেবল সিন্ধু ও পাঞ্জাবে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের তুলনায় সর্বাধিক ভোট পাইল না। কংগ্রেস প্রথমে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে অস্বীকার করিল—কেননা

প্রস্তাবিত আইনে গভর্নরদিগকে যে বিশেষ ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল তাহাতে স্বাধীনভাবে মন্ত্রিসভার পক্ষে কাজ করা অসম্ভব ছিল। অতঃপর বড়লাট লর্ড লিনলিথগো অসাধারণ ক্ষেত্র ব্যতীত দৈনন্দিন ব্যাপারে গভর্নরগণ মন্ত্রিসভার কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলে কংগ্রেস ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ৭টি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করিল। সিন্ধুতে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকিলেও কংগ্রেস একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় যোগ দিল এবং আসামেও অনুরূপ ব্যবস্থা হওয়ায় কংগ্রেসের নেতৃত্বে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। বাংলায় ও পাঞ্জাবে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হইল না। বাংলায় মুসলিম লীগ কৃষকপ্রজা দলের সাহায্যে মন্ত্রিসভা গঠন করিল। পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত 'ইউনিয়নিষ্ট দল' প্রাধান্য লাভ করিল।

৭টি প্রদেশে কংগ্রেসের আধিপত্য

মুসলিম লীগের নেতা জিন্না আশা করিয়াছিল যে, সর্বত্র কংগ্রেস মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। কিন্তু কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক মনোভাব পুষ্ট মুসলিম লীগের সহিত হাত মিলাইতে অসম্মত হওয়ায় জিন্না নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িলেন এবং উভয় দলের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হইল। অগত্যা জিন্না কংগ্রেসের নিন্দায় ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন।

মুসলিম লীগের ব্যর্থতা ও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব

কংগ্রেস নূতন শাসনতন্ত্রে যোগদান করিয়া দুই বৎসর অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করিল। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে একটি বামপন্থী দলের উদ্ভব হইল। গান্ধীজী রাজাগোপালাচারী, বল্লভভাই প্যাটেল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ সরকারের সহিত আপোষের মনোভাব দেখাইতে ছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি তরুণ বামপন্থী নেতা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপোষহীন মনোভাব পোষণ করিতেছিলেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতিরূপে হরিপুরা অধিবেশনে তাঁহার এই এই মনোভাবের কথা ব্যক্ত করিলেন এবং বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী নেতৃবর্গ সুভাষচন্দ্রের এই সংগ্রামশীল মনোভাবের বিরোধিতা করিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতিরূপে পট্টভি সীতারামায়াকে সুভাষচন্দ্রের প্রতিপক্ষরূপে মনোনীত করিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীকে অসংখ্য ভোটে পরাজিত করিয়া সভাপতি নির্বাচিত হইলেও ত্রিপুরী কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থীরা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কোন সহযোগিতা করিতে অসম্মত

সুভাষচন্দ্র বসু

ফরোয়ার্ড ব্লক

হওয়ায় সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ করিয়া 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে একটি বামপন্থী উপদল গঠন করিল

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইংলণ্ড জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ভারতবর্ষকেও জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দেশ বলিয়া ঘোষণা করে। বলা বাহুল্য, জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর সঙ্গে বিনা পরামর্শেই ভারতবর্ষকে যুদ্ধে জড়িত করা হয়। এই সময়ে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বৃটিশ সরকারকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহাদের মনোভাব সুস্পষ্টরূপে জানাইতে অনুরোধ করা হয়। যে গণতন্ত্র ও মানবধীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মিত্রপক্ষ এই যুদ্ধ করিতেছে ভারতে সেই গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত হইবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি না পাইলে ভারতবর্ষ এই যুদ্ধে যোগদান করিতে পারে না কংগ্রেস এই মনোভাব প্রকাশ করিল। বৃটিশের পক্ষে হইতে কোন সন্তোষজনক জবাব বা প্রতিশ্রুতি না পাওয়ায় কংগ্রেস বৃটিশ সরকারের মনোভাবের প্রতিবাদ স্বরূপ প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা সমূহকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দেয়। কংগ্রেসী আটটি প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করে এবং এই সকল প্রদেশে গভর্নর স্বয়ং কার্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু জিন্না পরিচালিত মুসলিম লীগ সর্বত্র বৃটিশের সহযোগিতা করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

কংগ্রেসের অসহযোগিতা ও কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর পদত্যাগ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন জার্মাণী ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রশক্তিকে সর্বত্র পরাজিত করিতে আরম্ভ করিল, তখন কংগ্রেস যুদ্ধে সহযোগিতার বিনিময়ে আপোষমূলক প্রস্তাব করিল। কংগ্রেসের দাবি ছিল ভারতবর্ষে বৃটিশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সদিচ্ছার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বৃটিশ সরকার আপাততঃ একটি জাতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করুক। কিন্তু তৎকালীন বড়লাট লিনলিথগো ইহাতেও সম্মত হইলেন না। তিনি ঘোষণা করিলেন যে যুদ্ধাবসানে ভারতের জন্য একটি সংবিধান রচনার জন্য একটি সংবিধান আহূত হইবে। তবে আপাততঃ তিনি ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া একটি সমরমন্ত্রণাসভা গঠন করিতে প্রস্তুত আছেন এবং অবিলম্বেই কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সভার সদস্যসংখ্যাও বৃদ্ধি করিবেন। ভবিষ্যতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে একমাত্র কংগ্রেসে দাবি তিনি অস্বীকার করিলেন। বড়লাটের ঘোষণার নিহিতার্থ এই যে, মুসলিম লীগকে বাদ দিয়া বৃটিশ গভর্নমেণ্ট শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন করিতে সম্মত নহে।

মুসলিম লীগের নেতা জিন্না এই ঘোষণায় উল্লসিত হইয়া উঠিলেন এবং তিনি অবিলম্বে হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক জাতি এই তথ্য আবিষ্কার করিলেন। তিনি

অবিলম্বে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র দাবি করিলেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ জিন্নার এই দ্বিজাতিতত্ত্ব স্বীকার করিলেন না। কিন্তু জিন্না ইহাতে বিচলিত হইলেন না; তিনি মুসলিম লীগই ভারতের মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র ক্রমাগত এই দাবিই করিতে লাগিলেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগ মুসলমানের জন্য পৃথক রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' প্রস্তাব পাশ করিল। হিন্দু-মুসলমানের মতানৈক্যের অজুহাতে বৃটিশ গভর্নমেন্ট ভারত পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত হইল না। মহাত্মা গান্ধী ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে পুনরায় ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিলেন।

জিন্নার দুইজাতি তত্ত্ব

পাকিস্তান প্রস্তাব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে জাপান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইল এবং তড়িৎগতিতে সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুন অধিকার করিয়া লইল তখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী উইনষ্টন চার্চিল উপলব্ধি করিলেন যে ভারতের অসন্তোষ দূর করা যুদ্ধপ্রচেষ্টার পক্ষে অপরিহার্য্য। ইংলণ্ডের মন্ত্রি-সভা ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে নূতন সংস্কারের প্রস্তাবসহ স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে প্রেরণ করিলেন। তিনি বৃটিশ মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে ঘোষণা করেন যে, বর্তমান মহাযুদ্ধের অবসানে ভারতবর্ষকে উপনিবেশ স্বায়ত্তশাসন-এর মর্য্যাদা ও ক্ষমতা প্রদত্ত হইবে। ভারতব্যাপী যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই মন্ত্রিসভার উদ্দেশ্য। যদি ভারতের অংশবিশেষ এই যুক্তরাষ্ট্রের সমবায়ে যোগ দিতে অস্বীকৃত হয়, তবে তাহাকে স্বতন্ত্র থাকিতে দেওয়া হইবে। ইহাতে 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার পূর্বাভাস ছিল। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যান্ত বৃটিশ গভর্নমেন্টের চরম কর্তৃত্ব অব্যাহত থাকিবে এবং যুদ্ধান্তে একটি সংবিধান সংগঠনী সংসদের আহ্বান করা হইবে, এই আশ্বাসও ক্রিপসের প্রস্তাবের মধ্যে ছিল। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ প্রকৃত স্বাধীনতা প্রদানের পূর্বে যুদ্ধকালীন জাতীয় গভর্নমেণ্ট এর দাবি জানাইলেন। পরিশেষে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে দাবি অনেকটা কমাইয়া প্রস্তাব করা হইল যে, সামরিক বিভাগ একজন ভারতীয় সদস্যের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। ভারতের প্রধান সেনাপতি সামরিক বিভাগ পরিচালনা সম্বন্ধে স্বাধীন থাকিবেন, কিন্তু আইনত

ক্রিপস প্রস্তাব ১৯৪২

উইষ্টন চার্চিল

তাঁহাকে সমর বিভাগের মন্ত্রীর অধীন থাকিতে হইবে। কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কোন প্রস্তাবেই সম্মত না হওয়ায় কংগ্রেস বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্য অন্যরূপ বুঝিতে পারিয়া ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। পাকিস্তানের উল্লেখ নাই দেখিয়া মুসলিম লীগও ক্রিপস প্রস্তাব সমর্থন করিল না। বামপন্থী বাহিনী যখন প্রায় ভারতের সীমান্তে উপনীত তখন ক্রিপস্ তাঁহার দৌত্যে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ক্রিপস প্রস্তাবের ব্যর্থতা

ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্

ক্রিপস্ মিশন ব্যর্থ হওয়ার পরে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে Quit India বা 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া পুনরায় আন্দোলন আরম্ভ করিল (৮ই আগষ্ট, ১৯৪২)। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইল এবং গান্ধী, নেহরু, আজাদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হইলেন। মহাত্মাজীর 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলন সমগ্র ভারত পরিব্যাপ্ত হইল। ভারতের সর্বত্র গণবিপ্লব দেখা দিল এবং বৃটিশের বিদ্বেষমূলক কার্য্যাবলী অনুসৃত হইতে লাগিল। দেশের বহুস্থানে বৃটিশ শাসনের পরিবর্তে জাতীয় শাসন প্রবর্তিত হইল। এই স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলন 'আগষ্ট বিপ্লব' নামে খ্যাত। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট সামরিক বলের সাহায্যে আন্দোলন চূর্ণ করার জন্য চেষ্টা করে। পুলিশের অত্যাচারে, সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে অসংখ্য ভারতবাসীর প্রাণ বিনষ্ট হয়। ফলে এই আন্দোলন দমিত হইলেও বৃটিশ সরকার দেশবাসীর সহানুভূতি ও বিশ্বাস হারায়।

আগষ্ট প্রস্তাব

আগষ্ট আন্দোলন, ১৯৪২

ইতিমধ্যে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে পূর্ব এশিয়ার আজাদহিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হইল। সুভাষচন্দ্র বসুকে ইতিপূর্বে ভারত সরকার কলিকাতায় স্বগৃহে আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি গোপনে দেশ পরিত্যাগ করিয়া জার্মানী ও জাপানের সাহায্যে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিয়াছিলেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে আজাদ বাহিনী ভারতভূমি হইতে বৃটিশ ও তাহার

নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ গঠিত

মিত্রপক্ষকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতের দিকে অগ্রসর হইল। আজাদ বাহিনীর বীরত্ব ও সাহসের সম্মুখে বৃটিশের সৈন্য বাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করিতে হইয়াছিল। আজাদ বাহিনী মণিপুরের প্রধান সহর ইম্ফল অবরোধ করিয়া আসামের অন্তর্গত কোহিমা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দৈবদুর্যোগের জন্য আজাদ বাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করিতে হইল। এই সময়ে মিত্রশক্তির হস্তে জাপানের পরাজয় হওয়াতে আজাদ হিন্দ ফৌজকে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইল। কিন্তু ইহাদের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হইল না! আজাদ বাহিনী স্বদেশ-প্রেমিকতা ও শৌর্য্যের যে পরিচয় দিল তাহাতে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করিল যে তাহাদের ভারত পরিত্যাগের দিন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। বৃটিশ সরকার আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃবর্গের কয়েকজনকে দিল্লীতে বিচারের জন্য আনিয়া ভারতবাসীর মনে ভীতির উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিলেন।

আজাদ বাহিনীর ভারত অভিযান

জাপানের পরাজয়

যুদ্ধের অবসানে বড় লাট লর্ড ওয়াভেল ভারতের নেতৃবৃন্দের সহিত শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধানের জন্য আলোচনা আরম্ভ করেন, কিন্তু মুসলিম লীগের সভাপতি জিন্নার অনমনীয় মনোভাবের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হইল না। ইতিপূর্বে মহাত্মা গান্ধী এবং জিন্নার মধ্যে তিন সপ্তাহব্যাপী আলোচনা হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতেও ভারতের হিন্দু মুসলমানের সমস্যার কোন সমাধান হইতে পারে নাই। জিন্না পাকিস্তানের দাবি পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। লর্ড ওয়াভেলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল।

ওয়াভেল প্রস্তাব

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সাধারণ নির্বাচনের ফলে মিঃ এটলির নেতৃত্বে শ্রমিক গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে, এটলি মন্ত্রিসভা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ভারতীয় সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাপতিবর্গ ও সৈনিকদের বিচার দিল্লীর লাল কেল্লায় চলিতেছিল। কংগ্রেস আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষ সমর্থন করিলে সমগ্র ভারতময় কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে ভারতেরও সাধারণ নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে

কংগ্রেস সর্বত্র জয় লাভ করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলমান গরিষ্ঠ হইলেও সেখানে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিকাংশ হইলেন কংগ্রেসদলভুক্ত। নির্বাচনের পরে কংগ্রেস বাংলা ও সিন্ধু এই দুইটি প্রদেশ ব্যতীত সর্বত্র কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠন করিল। ইত্যবস্থায় বৃটিশ সরকার আর নীরব থাকা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করিল না।

যুদ্ধের পরে সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস সর্বত্র জয়ী হইল

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বৃটিশ সরকার ভারতে নব শাসনতন্ত্র গঠনের জন্য এবং তৎসম্পর্কিত আলোচনার জন্য এক মন্ত্রী মিশন অর্থাৎ বৃটিশ মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্য লর্ড প্যাথিক লরেন্স, স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ও মিঃ আলেকজাণ্ডারকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। অতঃপর কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও মন্ত্রী মিশনের মধ্যে ত্রিদলীয় সম্মেলন আরম্ভ হয়। কিন্তু কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে আপোষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এতৎ সত্ত্বেও মন্ত্রী মিশন তাহার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন এবং পাকিস্তান দাবি অগ্রাহ্য করিয়া সর্ব-ভারতীয় যুক্ত-রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন। হিন্দু প্রধান অঞ্চলগুলিকে 'ক' শ্রেণী মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলিকে 'খ' শ্রেণী এবং বাংলা ও আসামকে 'গ' শ্রেণীতে ভাগ করিয়া এই তিন অঞ্চল হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা একটি সংবিধান পরিষদ গঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইল। এই তিনটি অঞ্চল পৃথকভাবে স্ব স্ব এলাকার শাসনতন্ত্র স্থির করিবে। অতঃপর এই তিনটি বিভাগীয় অঞ্চল এবং যে সকল দেশীয় রাজ্য যোগদানে ইচ্ছুক সেই সমস্ত লইয়া একটি সর্ব-ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে। যে পর্য্যন্ত না ভারতে নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইয়া কার্য্যকারী হয় ততদিনের জন্য ভারতবাসীদের লইয়া একটি অন্তর্বর্ত্তী সরকার গঠনের প্রস্তাবও মন্ত্রী মিশন করেন। ক্যাবিনেট মিশনের এই ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সংবিধান পরিষদের নির্বাচন হয়। সংবিধান পরিষদের ২৯৬টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২১১টি অধিকার করিল, মুসলিম লীগ মাত্র ৭২টি আসন দখল করিল। সংবিধান পরিষদে কংগ্রেসের এইরূপ বিপুল সংখ্যাধিক্য দেখিয়া ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই তারিখে মুসলিম লীগ পূর্ব সম্মতি প্রত্যাহার ঘোষণা করিল, মুসলিম লীগ মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সম্মত নহে এবং মুসলিম লীগ সংবিধান সভায় যোগদান করিবে না। কিন্তু কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের সমস্ত শর্ত্তের অনুমোদন না করিলেও অন্তর্বর্ত্তী সরকার গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিল। কংগ্রেসের এই প্রাধান্য বৃদ্ধিতে ভীত হইয়া জিন্না সাম্প্রদায়িকতার অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। মুসলিম লীগ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর

'ক্যাবিনেট মিশন'

পরিকল্পনা

সাহায্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমান সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করিল। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে কলিকাতায় এক ব্যাপক নরহত্যা ও লুণ্ঠনের তাণ্ডবলীলা অনুষ্ঠিত হইল। বাংলার কর্তৃত্ব তখন মুসলিম লীগের হস্তে ছিল। বাংলার প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দী এই অরাজকতা সৃষ্টির জন্য মুসলমান সম্প্রদায়কে পূর্বাহ্নে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিয়াছিলেন। এই দাঙ্গা বন্ধ করিবার জন্য সরকারের পক্ষ হইতে কোন চেষ্টাই হইল না। আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুদের পাল্টা প্রতিশোধাত্মক আক্রমণেও মুসলমানদের মধ্যে হতাহত হইল। অচিরেই এই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ভারতের অন্যত্র প্রসারিত হইল। নোয়াখালী, ত্রিপুরা প্রভৃতি মুসলমান প্রধান অঞ্চলে হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও লুণ্ঠন চলিল। বিহার ও বোম্বাই প্রদেশে এই সব দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। এই সকল স্থানে হিন্দুরা মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করিল।

অন্তর্বর্তী সরকার

ইতিমধ্যে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ২রা সেপ্টেম্বর পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে কেন্দ্রে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হইল। জিন্না ও মুসলীম লীগ ইহাতে যোগদান করিতে প্রথম অস্বীকৃত হইলেও তদানীন্তন বড়লাট ওয়াভেলের আগ্রহে ইহাতে যোগদান করিল। লীগের সদস্যবৃন্দ অন্তর্বর্তী সরকারে সতর্ক প্রহরী রূপে যোগদান করিয়াছে বলিয়া জিন্না ঘোষণা করিলেন এবং গণ পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য দাবি করিলেন। ইতিমধ্যে বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের সমর্থনে অন্তর্বর্তী সরকারের মুসলিমলীগের সদস্যবৃন্দ নেহরুর মন্ত্রিসভার অসুবিধা সৃষ্টি করিতে লাগিল। এই সময়ে বৃটিশের প্রধান মন্ত্রী এটলি ঘোষণা করিলেন যে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে ভারতের শাসনভার দায়িত্বশীল ভারতীয়দের হস্তে অর্পণ করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। এই ঘোষণায় মুসলিম লীগ অসন্তুষ্ট হইল এবং পাঞ্জাবে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ করিল।

মাউণ্টব্যাটেন

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতের বড়লাট হইয়া আসিলেন। তখন বাংলা ও পাঞ্জাবের সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু ও শিখদের অবস্থা মুসলমানদের অত্যাচারে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। নব নিযুক্ত বড়লাট বৃটিশ মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ভারতকে ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করার পরিকল্পনা প্রকাশ করেন (৩রা জুন, ১৯৪৭)। এই পরিকল্পনানুযায়ী স্থির হইল যে, পশ্চিমে সিন্ধু ও পাঞ্জাবের এবং পূর্বে বাংলা ও আসামের আইন পরিষদের নির্বাচিত ভারতীয় সদস্যদের অধিকাংশের মত হইলে এই প্রদেশগুলি

ভারতীয় ইউনিয়নে থাকিবে। অন্যথা এই কয়েকটি প্রদেশ লইয়া পাকিস্তান গঠিত হইবে।) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আইন পরিষদের উপর এই প্রদেশ ভারত ইউনিয়নে থাকিবে কি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইবে সেই বিষয়ে মতপ্রকাশের অধিকার দেওয়া হয় নাই। বলা বাহুল্য এই প্রাদেশ মুসলমান গরিষ্ঠ হইলেও আইন পরিষদে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। এই স্থানে গণ-ভোটের দ্বারা এই বিষয়ের মীমাংসার ভার দেওয়া হয়। এই সময়ে আরও স্থির হয় যে, পাঞ্জাব ও বাংলার ব্যবস্থা পরিষদের অধিকাংশ সদস্য পাকিস্তানের পক্ষে মত দিলেও এই প্রদেশদ্বয়ের হিন্দু প্রধান অঞ্চলের

ভারত বিভাগের পরিকল্পনা

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন

প্রতিনিধিগণ ইচ্ছা করিলে অধিকাংশের মতানুযায়ী পাকিস্তানে যোগদান না করিয়া ভারতীয় ইউনিয়নে থাকিতে পারিবেন। আসাম ভারতীয় ইউনিয়নে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মুসলমান গরিষ্ঠ শ্রীহট্ট জেলা গণভোটের দ্বারা পাকিস্তান বা ভারতে যোগদান করিতে পারিবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারত স্বাধীনতা আইন গৃহীত হইল। ১৫ আগষ্ট ভারতবর্ষ বিখণ্ডিত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিল। পশ্চিম পাঞ্জাব উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান, সিন্ধু এবং শ্রীহট্টজেলা সহ পূর্ব্ব-বঙ্গকে সম্মিলিত করিয়া পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হইল। বৃটিশ শাসিত অবশিষ্ট প্রদেশগুলি ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইল। দেশীয় রাজ্যগুলিকে ইচ্ছামত ভারত ইউনিয়নে বা পাকিস্তানে যোগ দিবার অধিকার প্রদত্ত হইল। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী হইতে ভারত এক সার্বভৌম গণশাসিত সাধারণতন্ত্র বলিয়া ঘোষিত হইল।

প্রশ্নোত্তর

1. What part did the Muslim League play in the National Movement in India.

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে মুসলিম লীগ কি অংশ গ্রহণ করিয়াছিল?

উত্তর-সূত্র: (পূর্ব অধ্যায়ের প্রশ্নোত্তরের ১ম প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য)

2. Write the history of freedom movement from 1920-21—1935.

১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস বিবৃত কর।

উত্তর সূত্র: (১) রাউলাট এক্ট ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পরে ভবাসী উপলব্ধি করিল যে বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষের স্বরাজের দাবি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে—বরঞ্চ দমননীতির সাহায্যে ভারতের জাতীয় আন্দোলন বন্ধ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অগত্যা গান্ধীর নেতৃত্বে আরম্ভ হইল ১৯২০-২১ সালের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। বৃটিশ সরকার দমননীতির সাহায্যে ইহা বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করিলেন। চৌরাচৌরার হত্যাকাণ্ডে ব্যথিত হইয়া গান্ধী অকস্মাৎ এই অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করিলেন। সাময়িকভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পাইল। ইতিমধ্যে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে স্বরাজ্য দল গঠিত হয়। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল নূতন সংস্কার বিধির অবসান অথবা সংশোধনের জন্য সর্বত্র নূতন নির্বাচন অনুযায়ী আইন সভায় প্রবেশ করিয়া সরকারের বিরোধিতা করা। এই অবস্থা ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ অবধি ছিল।

(২) ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে সাইমন কমিশন ভারতবর্ষে আসে। ইহার উদ্দেশ্য ছিল, ভারতবর্ষ স্বায়ত্তশাসনের জন্য কতটা উপযুক্ত হইয়াছে সেই সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া তদনুযায়ী রিপোর্ট প্রদান করা। ইহার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রবল প্রতিবাদ—১৯২৯ সালের কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি। এই দাবি অস্বীকৃত হইলে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় গান্ধীজী কর্তৃক আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত। ইতিমধ্যে লণ্ডনে রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স—কংগ্রেস ব্যতীত সমস্ত দলের যোগদান। ১৯৩০-৩১ আইন অমান্য আন্দোলন ভারতব্যাপী অনুসৃত—দমননীতি। পরিশেষে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে গান্ধী-আরউইন চুক্তি—গান্ধীজির দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান—রিক্তহস্তে প্রত্যাবর্তন লর্ড উইলিংডন কর্তৃক পূর্ণ দমন নীতি।

(৩) দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক—কংগ্রেসকে বাদ দিয়া অন্য সকল দলের উপস্থিতিতে ভারতশাসন আইন প্রণয়ন—সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা (Communal Award) ও গান্ধীজির অনশন—হিন্দুদের মধ্যে বিভেদ নীতির পরিবর্তন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী নির্বাচন ও ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় কংগ্রেসের জয়লাভ।

3. Write briefly the history of the freedom movement in our country from 1935-1947

১৯৩৫-১৯৪৭ সালের অন্তর্বর্তী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।

উত্তর-সূত্র : ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনই ভারতবাসীর লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হইল। কংগ্রেসের এই দাবি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অস্বীকার করিলে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করে। এই আন্দোলন কঠোরভাবে দমন করা হইলেও বৃটিশ সরকার ভারতবাসীর দাবির দৃঢ়তা উপলব্ধি করিতে পারে এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণীত ও ১৯৩৭ সালে এই আইন অনুযায়ী নির্বাচন ও মন্ত্রিসভার কার্য্য আরম্ভ হয়। কংগ্রেস প্রথমদিকে নূতন সংস্কার আইনের উপর বিরূপ থাকিলেও শাসনতন্ত্র করতলগত করার জন্য নির্বাচনে অবতীর্ণ হইয়া ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৭টি প্রদেশে আধিপত্য লাভ করে। নূতন শাসনতন্ত্রে যোগদান করিয়া কংগ্রেস দুই বৎসরের জন্য কৃতিত্বের সঙ্গে শাসনকার্য্য পরিচালনা করে। মুসলিম লীগের নেতা কিন্তু বৃটিশের প্রশ্রয়পুষ্ট হইয়াও বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্য কোন প্রদেশে বিশেষ সাম্প্রদায়িক মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইলেন না।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের সম্মতি না লইয়া ভারতবর্ষকে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দেশ বলিয়া ঘোষণা করে। যুদ্ধান্তে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি না পাইলে কংগ্রেস এই যুদ্ধে বৃটিশের সহযোগিতা করিবে না বলিয়া প্রকাশ করেন এবং বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে কোন সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া প্রতিবাদ স্বরূপ কংগ্রেস সর্বত্র মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করে। মুসলিম লীগ সর্বত্র বৃটিশের সহযোগিতা করিতে থাকে এবং ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে মুসলিম লীগ পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের জন্য 'পাকিস্তান প্রস্তাব' পাশ করে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী পুনরায় ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করে। যুদ্ধে কংগ্রেসের সহযোগিতা লাভের জন্য ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ক্রিপস মিশন প্রেরিত হয় কিন্তু প্রস্তাব কংগ্রেসের মূল দাবির পরিপন্থী হওয়ায় কংগ্রেস ইহা প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী 'Quit India' বা 'ভারত ছাড়' আন্দোলন হয় এবং ভারতের নেতৃবৃন্দ কারাগারে প্রেরিত হইলেও ভারতের সর্বত্র বৃটিশবিরোধী গণ-বিপ্লব দেখা দেয়। ইহা 'আগষ্ট আন্দোলন' নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের তীব্রতার মধ্য দিয়া ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়।

ইতিমধ্যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনী ও সরকার গঠন ও ইহাদের সাহসিক কার্য্যাবলীর সংবাদ প্রকাশিত হয়। আজাদ বাহিনীর স্বদেশপ্রেমিকতা ও শৌর্য্যের পরিচয়ে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করিল যে তাহাদের ভারত ত্যাগের দিন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। যুদ্ধান্তে লর্ড ওয়াভেল একবার শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনেও কংগ্রেস সর্বত্র জয়লাভ করে। ইত্যবস্থায় বিলাতের শ্রমিক সরকার ভারতের নব শাসনতন্ত্র রচনার আলোচনার জন্য ভারতে ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণ করে। এই মিশন সকল দলের সঙ্গে আলোচনা করিয়া সর্ব ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করে। এই প্রস্তাবে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব নাই দেখিয়া জিন্না পরিচালিত মুসলিম লীগ ইহা প্রত্যাখ্যান করে এবং ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি ও দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের নেতৃত্বে কেন্দ্রে অন্তর্বর্তী জাতীয় সরকার গঠিত হয়। মুসলিম লীগ আপত্তি সাপেক্ষে ইহাতে যোগদান করিয়াও মন্ত্রিসভার অসুবিধা সৃষ্টি করিতে লাগিল। এই সময়ে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী এটলী ভারতবর্ষের শাসনভার ভারতবাসীর হস্তে অর্পণ করিয়া ইংরেজরা ভারত পরিত্যাগ করিয়া যাইবে এই ঘোষণা করায় মুসলিম লীগ অসন্তুষ্ট হয় এবং বঙ্গদেশে পাঞ্জাবে ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ভীষণ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সৃষ্টি করে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতের বড়লাট হইয়া আসেন এবং ভারতের পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়া বৃটিশ মন্ত্রিসভার পরামর্শে ভারতকে ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করার প্রস্তাব করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারত স্বাধীনতা আইন গৃহীত হইল এবং উক্ত বৎসরের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইয়া স্বাধীনতা অর্জন করিল।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

বৃটিশ শাসনকালে ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

(১৮৫৮—১৯৪৭)

Syllabus :—Economic and social changes from 1858 to 1947 A. D. Higher education, Nationalism in Literature and Art.

পাঠ্য সূচী :—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন। উচ্চতর শিক্ষা। সাহিত্যে ও শিল্পে জাতীয়তাবাদ।

অর্থ নৈতিক অবস্থা : শ্রমশিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য :—ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের মূলে অর্থ নৈতিক লুণ্ঠন যে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। পলাশীযুদ্ধে ভারতবর্ষে বৃটিশের রাষ্ট্রনৈতিক আধিপত্য সূচনা হওয়ার পর পরবর্তী প্রায় এক শতাব্দী কাল ভারতবর্ষ নির্মমভাবে বৃটেনের দ্বারা অর্থ নৈতিক দিক দিয়া শোষিত হইয়া আসিয়াছে। এই সুদীর্ঘ এক শতাব্দীকাল ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্য দিয়া বা অন্য উপায়ে ভারতবর্ষের দীর্ঘকাল অর্জিত ও সঞ্চিত স্বর্ণ ও রৌপ্য ইংলণ্ডে রপ্তানী হওয়াতে ভারতবর্ষে নিদারুণ অর্থ নৈতিক দৈন্য উপস্থিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লব হওয়াতে ইংলণ্ডের বিভিন্ন শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছিল। ফলে উৎপন্ন বিভিন্ন বিলাতী দ্রব্য ভারতবর্ষের বাজারে অজস্র পরিমাণে আমদানী করা হইতে লাগিল। উৎকর্ষতা ও মূল্যের দিক দিয়া এই সমস্ত দ্রব্য ভারতের কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যকে সহজেই অতিক্রম করিয়া গেল। ইহার ফলে ভারতের কুটিরশিল্প ক্রমশঃ অবনতির মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমশঃ ভারতবর্ষ বিলাতী পণ্যের একচেটিয়া বাজারে পরিণত হইল। মাত্র দেশীয় শিল্পের অবনতি নহে ভারতের ব্যবসাবাণিজ্যও ক্রমশঃ বিদেশী বণিকদের হস্তগত হইতে লাগিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে

বিলাতী দ্রব্যের প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের শ্রমশিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংসোন্মুখ

সুয়েজখাল খনিত হইলে ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে যাতায়াত পূর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক হইল এবং ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বহু গুণ বৃদ্ধি পাইল। এই বৃদ্ধির ফলে ভারতীয় বণিকদের কিছুই লাভ হইল না, বৃটিশ বণিকদের বাণিজ্যলব্ধ আয়ের অঙ্ক স্ফীত হইতে স্ফীততর হইতে লাগিল। বিলাত হইতে কলে প্রস্তুত বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য ভারতে আমদানী হওয়ার ফলে মানুষের রুচিরও পরিবর্তন ঘটিল এবং এইসকল দ্রব্যের চাহিদাও বাড়িয়া চলিল। নানাপ্রকার বিলাসদ্রব্য, রেশমী, সুতী ও পশমী বস্ত্রাদি, চামড়া ও চামড়ার দ্বারা প্রস্তুত বিভিন্ন দ্রব্য, আসবাবপত্র, ঘড়ি, বাসনপত্র, নানাপ্রকার মনিহারী জিনিষ, কাচ ও কাচ নির্মিত দ্রব্য, কাগজ, নানা প্রকারের গাড়ি, সাইকেল, সেলাইয়ের কল, ছাতা, সিগারেট, নিত্যব্যবহার্য লবণ, কেরোসিন, দিয়াশলাই, কমল, পেন্সিল, নিব, সাবান, এলুমিনিয়াম, এলুমিনিয়ামের জিনিস, ছুরি-কাঁচি সমস্ত কিছুই বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী হইতে লাগিল। এইভাবে বিদেশ হইতে আমদানীকৃত দ্রব্যের প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পের প্রায় বিলোপ সাধন ঘটিল এবং ভারতীয় শিল্পকে বিধ্বস্ত করিয়া ভারতবর্ষকে বিলাতী দ্রব্যের বাজারে পরিণত করা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য ছিল তাহা সাধিত হইল।

বিলাতী দ্রব্যের ক্রয়প্রিয়তা এবং দেশী দ্রব্য অবহিত

শিল্প বাণিজ্যে বিলাতী দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পশ্চাৎপদ হইয়া অগত্যা ভারতবর্ষকে কৃষির উপর নির্ভরশীল হইতে হইল। ভারতবর্ষের সমস্ত শিল্পের ধ্বংস সাধন করিয়া ভারতকে কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করা এবং কাঁচা মালের উৎপাদন করা ইহাই বৃটিশ শিল্পপতিদের লক্ষ্য ছিল। এক সময়ে ভারতবর্ষ কৃষির ব্যাপারে যথেষ্ট অগ্রণী ছিল। কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্য বা শিল্পকর্মের অবনতি হওয়ায় জনসাধারণ অত্যধিক মাত্রায় কৃষিনির্ভর হইতে লাগিল এবং ভূমির উপর অত্যধিক চাপ পড়িতে লাগিল। এই অত্যধিক চাপের ফলে উৎপাদন কম হইতে লাগিল। উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থার অভাবে এবং বৃষ্টি হীনতার জন্য দুর্ভিক্ষ ভারতবর্ষের বাৎসরিক রীতি হইয়া দাঁড়াইল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার ও তালুকদার শ্রেণীর যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল, কিন্তু জমিদারের খাজানা, বিভিন্ন সেচ জাতীয় অতিরিক্ত করের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাওয়াতে কৃষকদের দুরবস্থা চরমে উঠিল। ভারতে উৎপন্ন কাঁচা মালের মধ্যে তুলার চাহিদা বেশী ছিল। ইংলণ্ড প্রথমে ল্যাঙ্কাসায়ারের বস্ত্রশিল্পের জন্য আমেরিকা হইতে তুলা আমদানী করিত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ হওয়ায় ঐ দেশ হইতে ইংলণ্ডে তুলা আমদানী বন্ধ

জনসাধারণ কৃষি নির্ভর হইয়া পড়িল

প্রধান রপ্তানী দ্রব্য তুলা

হইয়া যায়। ফলে ইংলণ্ডের বাজারে ভারতীয় তুলার চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং ভারতীয় তুলার সাহায্যে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্প রক্ষা পায়। অতঃপর ভারতে তুলার চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল। তুলা ব্যতীত চা, কফি, পাট, নীল, রবার, তামাক প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্যে ভারতবর্ষ কৃতিত্ব অর্জন করে।

চা

ইংরেজদের উদ্যোগে ভারতে চা উৎপাদনেরও প্রচেষ্টা হয়। লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ে ভারতে চা-চাষের প্রথম উদ্যোগ হয়। অতঃপর ভারতবর্ষের আসামে, হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে বাংলা হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত সর্বত্র চা উৎপন্ন হইতে থাকে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ভারতে চায়ের উৎপাদন চার কোটি পাউণ্ড হয় এবং চায়ের রপ্তানী দ্বারা ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতে থাকে।

পাট ও চট

পাটও চায়ের মত ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃষিপণ্য। চটের প্রয়োজনে পাটচাষের উন্নতি হইতে থাকে। ভারতবর্ষে ক্রমশঃ চটকলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে এবং পাটের প্রয়োজনীয়তাও বর্ধিত হয়। স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডিতেও চটকল স্থাপিত হওয়ায় প্রচুর কাঁচা পাট ব্রিটেনে রপ্তানী হইতে থাকে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ৩৮ কোটি টাকার পাট ও বোনা চট বিদেশে রপ্তানী হয়।

নীল

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে প্রচুর নীলের চাষ হইয়াছিল। নীলকরেরা নীল চাষীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়া নীল চাষের দ্বারা প্রচুর অর্থ লাভ করিয়াছিল। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে নীলের চাষ অব্যাহত থাকে। পরিশেষে কৃত্রিম নীল প্রস্তুত হওয়ায় নীলের চাষ ও চাহিদা কমিয়া যায়। বলা বাহুল্য ভারতবর্ষে এই সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন হইলেও এই সমস্ত জিনিসের ব্যবস্থা ও মুনাফার সমস্তটাই বিদেশীর হস্তগত ছিল। শিল্পের প্রয়োজনে কাঁচা মাল প্রস্তুত ও সরবরাহ করাই ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার ভিত্তি ছিল। এই সমস্ত দ্রব্যের অনুপাতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই। ফলে দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর ইত্যাদি ভারতবাসীর নিত্যসহচর হইয়া উঠিয়াছিল।

খাদ্য শস্যের উৎপাদন কম ছিল

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষে শ্রমশিল্প ও দেশীয় কুটিরশিল্পের পুনরুজ্জীবনের এক উৎসাহ দেখা দিল। ভারতীয়গণ সমস্ত শিল্পদ্রব্যে বিদেশের উপর নির্ভর না করিয়া ভারতে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইল এবং সর্বত্রই আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে নূতন কল কারখানা গড়িয়া তোলার আগ্রহ দেখা

ছিল। এই শিল্পপ্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় ভারতে কাপড়ের কলগুলি প্রতিষ্ঠার মধ্যে। এই শিল্পে বোম্বাই প্রদেশ অগ্রণী হয়—নাগপুর, শোলাপুর, কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে কাপড়ের মিল স্থাপিত হইয়া থাকে। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প প্রভৃতি উন্নতিলাভ করে। বস্ত্র শিল্পের প্রথম যুগে ইহাকে নানাভাবে বিরুদ্ধ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। ভারতের বস্ত্রশিল্পকে দুর্বল করার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বিলাতী দ্রব্যের উপর আমদানী শুল্ক রহিত করিল এবং ভারতীয় মিলে উৎপন্ন কাপড়ের উপর কর বসাইতে দ্বিধা করিল না।

ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে বৃটিশের অবহেলা ও ঔদাসীন্য উদ্দেশ্যমূলক ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে স্বতই স্বদেশজাত দ্রব্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি হয় এবং বহু দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। কিন্তু বিদেশী শিল্প পণ্যের প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় নাবালক শিল্পসমূহের রক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কোন রক্ষণনীতি গ্রহণ করিল না, উপরন্তু অবাধ বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করিল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ভারতসচিব লর্ড মর্লে ভারত সরকার যাহাতে দেশীয় শিল্পোন্নতিতে কোন উৎসাহ প্রদান না করে তাহা জানাইয়া এক অনুজ্ঞা পত্র প্রেরণ করে। গভর্ণমেণ্টের এই স্বেচ্ছাকৃত উদাসীনতার ফল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হইল। যুদ্ধকালে সামরিক কার্যের জন্য বহু শিল্প-পণ্যের প্রয়োজন হইলে দেখা গেল শিল্পে অবহেলার দরুণ ভারতবর্ষ উপরি-উক্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতে অক্ষম। ইহাতে ভারত গভর্ণমেণ্টের একটু চৈতন্য হইল এবং যুদ্ধের রসদাদি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যাহাতে ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত হইতে পারে তজ্জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে একটি মিউনিসান্স বোর্ড (Munitions Board) স্থাপন করে। এই বোর্ড ভারতীয় পণ্য সংরক্ষণে এবং সামরিক সরবরাহের অর্ডার ভারতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানে প্রদান করায় ভারতবর্ষের শিল্পসৃষ্টি যথেষ্ট পরিমাণ বর্ধিত হয়। এই সময়েই ভারতের জনমতের চাপে গভর্ণমেণ্ট একটি 'শিল্প কমিশন' নিযুক্ত করে। এই কমিশন ভারতীয় শিল্প প্রসারের জন্য কেন্দ্রে ও প্রদেশে শিল্পমন্ত্রী নিয়োগ, কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন, শিল্পে সরকারী সাহায্য প্রদান, পণ্যদ্রব্য চলাচলে রেলভাড়া হ্রাস ও বিশেষ সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করে। গভর্ণমেণ্ট শিল্প কমিশনের প্রস্তাবসমূহ আংশিকভাবে অনুমোদন ও কার্যে পরিণত করে এবং মণ্টেগুচেম্‌সফোর্ড সংস্কারের পরে শিল্প বিভাগ ভারতীয় সচিবের অধীনে রাখা হয়।

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময়ে বৃটিশ সরকার দেশীয় শিল্পের উন্নতি বিষয়ে সচেতন হইল

'শিল্প কমিশন'

ইহা স্মরণযোগ্য যে ভারতীয় শিল্পোন্নতির সঙ্গে গভর্ণমেণ্ট বাণিজ্যনীতি ও 'টারিফ' বা শুল্কনীতি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অসুবিধায় পড়িয়া গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় শিল্পে মনোযোগী হইয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধান্তে পুনরায় বিলাতী শিল্প দ্রব্য নির্মিত হইলে ভারতীয় শিল্পের দুরবস্থা হয়। অবাধ আমদানীর ফলে শুধু বিলাতী নহে, বিদেশী পণ্যদ্রব্য ভারতের বাজার প্লাবিত করিয়া ভারতবর্ষের শিশু শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যাদিকে প্রতিযোগিতায় পরাজিত করে। জাপানী দ্রব্য এত সুলভে ভারতের বাজারে আমদানী হইতে থাকে যে বিলাতী পণ্য পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় পশ্চাৎপদ হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়, তখন ইংলণ্ড ভারতের বাজারের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে থাকে। কিন্তু জাপানী প্রতিযোগিতায় পশ্চাৎপদ হওয়ার আশঙ্কায় ইংলণ্ড দ্রুত ভারতবর্ষের স্বার্থরক্ষার জন্য অনুগ্রহান্বিত হয় এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় শিল্পদ্রব্যাদি সংরক্ষণের জন্য 'টেরিফ বোর্ড' গঠন করে। এই বোর্ডের অনুমোদনে ভারতীয় লৌহ ইস্পাত, তুলা, কাগজ, চিনি, দিয়াশলাই ইত্যাদি শিল্প দ্রব্যের জন্য 'শুল্ক প্রাচীর' এর বন্দোবস্ত হয়। ইহাতেও স্বীয় স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট না হইয়া ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড 'অটোয়া চুক্তি' দ্বারা ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে এই নীতি ঘোষণা করে যে ভারতে বাণিজ্য পণ্য আমদানী বিষয়ে ইংলণ্ড বা সাম্রাজ্যভুক্ত অন্য কোন দেশ শুল্ক-ব্যাপারে অধিকতর সুবিধা লাভ করিবে। এই চুক্তির দ্বারা ইংলণ্ডের শিল্প ও বাণিজ্যস্বার্থের নিকট ভারতের স্বার্থের বলি দেওয়া হয়। 'টেরিফ বোর্ড' দ্বারা রক্ষণ প্রাচীর নির্মাণে ভারতের কয়েকটি শিল্প উন্নত হয় সত্য, কিন্তু মূলতঃ ইংলণ্ডের শিল্প দ্রব্যের পক্ষে অধিকতর সুবিধাই হয়। আমদানী শুল্ক হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য বহু বিলাতী ও বিদেশী দ্রব্যের কলকারখানা ভারতবর্ষে নির্মিত হইতে হইতে থাকে। যাহা হোক বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে গভর্ণমেণ্টের রক্ষণব্যবস্থার ফলে ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত, সিমেণ্ট, চিনি, বস্ত্র, বহু বিলাসদ্রব্যাদির শিল্প উৎসাহ প্রাপ্ত হয় এবং ভারতবর্ষ এই সকল শিল্পে ভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করে। কিন্তু যাহাদিগকে 'Key-Industries' বলে যথা, কলকব্জা, জাহাজাদি, মোটর যান, বিভিন্ন ইঞ্জিন প্রভৃতি শিল্প যাহাতে ভারতবর্ষে নির্মিত না হয়, তজ্জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট যত্নবান ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে শিল্পজাত দ্রব্যের প্রয়োজন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে সরকারী ঔদাসীন্য

'টেরিফ বোর্ড'

ইহার ফলে ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি

প্রধান শিল্প

ও চাহিদা অত্যধিক হওয়ায় এবং বিদেশ জাত আমদানী বন্ধ হওয়ায় সরকার বাধ্য হইয়া ভারতীয় শিল্প উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করে।

ভারতের শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের সমস্যার প্রতিও গভর্ণমেণ্টের লক্ষ্য করার প্রয়োজন হয় এবং গভর্ণমেণ্টও শ্রমিক উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম শ্রমিক সম্পর্কিত আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইহাতে শ্রমিকদের সর্বনিম্ন বয়স, দৈনিক কার্য্যকাল, মজুরী বা ছুটি সম্পর্কে নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন পাশ হওয়াতে কার্যকালে আঘাত প্রাপ্ত বা নিহত মজুরদের ক্ষতিপূরণের বন্দোবস্ত হয়। অতঃপর শ্রমিকদের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি গভর্ণমেণ্ট লক্ষ্য রাখিতে আরম্ভ করে এবং কারখানা আইন পাশ করিয়া কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া শ্রমিক সমস্যা সমাধানে তৎপর হয়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে শাসন সংস্কার চালু হওয়ার পরে কংগ্রেস মন্ত্রিত্বের সময়ে প্রত্যেক প্রদেশে একজন শ্রম-মন্ত্রী নিযুক্ত হয়। শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য 'ট্রেড ইউনিয়ন' বা সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অধিকার প্রদত্ত হয় (১৯২৬)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এবং তাহার পরে যখন প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন শ্রমিকগণ ব্যয়বৃদ্ধির অনুপাতে তাহাদের মজুরী, ভাতা ইত্যাদি বৃদ্ধির জন্য দাবি করিতে থাকে। শ্রমিক-মালিক বিরোধ সন্তোষজনক ভাবে মিটাইবার জন্য সরকারের পক্ষ হইতে 'শ্রমিক বিচারালয়' ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এই সমস্ত বিচারালয়ে শ্রমিক-মালিক বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করিয়া মীমাংসিত হয়। বিভিন্ন 'ট্রেড ইউনিয়ন' বা শ্রমিক পন্থা, নানা আন্দোলনের দ্বারা শ্রমিকদের আর্থিক এবং সামাজিক উন্নতি সাধন করিয়াছে। সম্প্রতি শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তার জন্য আবশ্যিক শ্রমিক জীবনবীমা প্রবর্তিত হইয়াছে।

শ্রমিক-কল্যাণ প্রচেষ্টা

সামাজিক অবস্থা :—ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে এক নূতন সমাজ-চেতনা ভারতের জীবনে দেখা দেয়। সামাজিক বা ধর্মীয় বিধি ব্যবস্থায় যে সকল অযৌক্তিক ও ক্ষতিকর রীতিনীতি ছিল, সেই সমস্ত পরিবর্তনের জন্য এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। সামাজিক জীবনে নারী জাতির উন্নতি বিধায়ক বহু প্রচেষ্টা এই সময়ে হয়। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, স্ত্রী স্বাধীনতা, বিধবা বিবাহ, সিভিল ম্যারেজ, অসবর্ণ বিবাহ, সমস্ত ব্যাপারেই এই যুগের সমাজচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগের বহু মনীষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে এবং সামাজিক উন্নতি বিধানে তৎপর হন। ক্রমশঃ অর্থনৈতিক চাপের ফলে স্ত্রীজাতি চাকরী ক্ষেত্রেও পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইতে

সমাজের পরিবর্তন

থাকে এবং পুরুষের সব পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হয়। এই সময়ে সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণী আধিপত্য লাভ করিতে থাকে এবং বিত্তবানরা ক্রমশঃ নগরকেন্দ্রিক জীবন যাপনে আগ্রহান্বিত হন। ফলে গ্রামীন সমাজে যৌথ ব্যবস্থা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে থাকে এবং পূর্বতন সমাজ ব্যবস্থার মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর নবলব্ধ চেতনা শুধু সমাজের ক্ষেত্রে নহে ধর্মের ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের ধারা আনিল। ধর্মীয় ও সামাজিক ত্রুটি সমূহ সংশোধনের জন্য বিভিন্ন ধর্ম সংস্কারক ও সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইয়াছিল। প্রথম দিকে সংস্কারকগণ ভারতের সমস্তই খারাপ এবং পাশ্চাত্যের সমস্তই ভাল এই মনোভাব গ্রহণ করিয়া প্রগতিমূলক পাশ্চাত্যের ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি ভারতবর্ষে প্রবর্তন করিবার স্বপক্ষে মত প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাতে সংস্কার পন্থীদিগকে ভারতীয় সনাতন পন্থীদের বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। পরবর্তী যুগের সমাজ বিপ্লবীরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হইল এবং মূলতঃ হিন্দুধর্মকেই আশ্রয় করিয়া তাঁহারা যুগোপযোগী নূতন মতবাদের প্রচার করিল। ভারতের সকল ধর্মেই সমাজ ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটিল। এই সকল মতবাদের মূলে মানবতার সেবা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বাণীও ছিল। যে সকল প্রতিষ্ঠান এই নূতন মতবাদ প্রচারে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে, তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনা-সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন ও আর্যসমাজের নাম উল্লেখযোগ্য।

নূতন নূতন ধর্ম নৈতিক মতবাদ ও প্রতিষ্ঠান

শিক্ষা ব্যবস্থা:—ভারতের শাসনভার কোম্পানীর নিকট হইতে পার্লামেন্টের হস্তান্তরিত হওয়া সত্বেও শিক্ষার ব্যাপারে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে স্যার চার্লস উডের এডুকেশন ডেসপ্যাচ দীর্ঘকাল ভারতের শিক্ষা পদ্ধতির নির্দেশক হইয়া রহিল। ডেসপ্যাচের পরিকল্পনানুযায়ী ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর ও এলাহাবাদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বহু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে উচ্চতর পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হইল। ভারতীয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মূলতঃ স্বদেশবাসীর প্রচেষ্টা ও অর্থানুকূল্যেই গড়িয়া উঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মহীশূর, পাটনা, হায়দ্রাবাদ, ঢাকা, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, নাগপুর, অন্ধ্র, আগ্রা, আন্নামালাই, বিশ্বভারতী, পুনা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এইভাবে

বে-সরকারী প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপন

ভারতের সর্বত্র অসংখ্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় দ্রুত গড়িয়া উঠে এবং উচ্চ শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটে।

দেশে প্রাথমিক শিক্ষার আশানুরূপ উন্নতি না হওয়ায় এই বিষয়ে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট হাণ্টার কমিশন নিযুক্ত করিলেন। এই কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার ভার পৌর-সভা এবং জেলা-বোর্ডের উপর অর্পণ করার অনুমোদন করিলেন।

'হাণ্টার কমিশন'

ভারতবর্ষের শিক্ষা-বিস্তারের প্রথম দিকে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার পরিবর্তে সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিল। ভারতে শিক্ষাবিস্তারের জন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ, চন্দ্রবরকর, বিষ্ণুপতি রানাডে প্রভৃতি মনীষিগণ যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করেন। অবশ্য ভারতের শিক্ষাবিস্তারের প্রথমদিকে বিজ্ঞান

জগদীশ বসু

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ও গণিত অবহেলিত হইলেও ক্রমেই তাহা দূরীভূত হইতে থাকে। ভারতবর্ষে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করার ফলে এই দেশ বিশ্ববাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করে। ভারতের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে জগদীশ চন্দ্র বসু, সি, ভি, রমন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি কয়েকজন বিশ্ববিশ্রুত। প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য গুরুট্রেনিং স্কুল, বি, টি, কলেজ এবং সাংবাদিকতা ও লাইব্রেরিয়ানশিপ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিল্প ও সাহিত্যে জাতীয়তাবাদ: উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের সমাজজীবনে যে পরিবর্তন ও আত্মচেতনা দেখা দিল তাহার প্রতিফলন এই যুগের সাহিত্যে

ও শিল্পে পরিলক্ষিত হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে ভারতের আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের অভাবনীয় সমৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। এই সময়কালের সাহিত্যের মূল সুর ছিল—মানবতাবোধ, ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধা, পরাধীনতার মর্মবেদনা ও স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, মানুষ হিসাবে নারীজাতির বৈশিষ্ট প্রভৃতি। গল্পে উপন্যাসে, কাব্যে, নাটকে সঙ্গীতে সাহিত্যের সমস্ত ক্ষেত্রেই এই নূতন ধ্যানধারণা প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বাংলা সাহিত্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্য সেবকদের দানে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত হওয়ায় বঙ্গসাহিত্য বিশ্বসাহিত্য-রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। বঙ্গভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অন্যান্য ভাষাও সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। আলতাফ হোসেন আলি, নুমানি, আবদুল হালিম শারর, মহম্মদ ইকবাল প্রভৃতির রচনায় উর্দু সাহিত্য এবং ভারতেন্দু, প্রেমচন্দ, সুমিত্রানন্দন পন্থ সূর্য্যকান্ত ত্রিপাঠী, মহাদেবী বর্মা প্রভৃতির রচনায় হিন্দী সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। মারাঠী, গুজরাটি, উড়িয়া প্রভৃতি অপরাপর ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্যগুলিও এই সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে বিকাশ লাভ করে।

উর্দু সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হিন্দী ও অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্য

ভারতের নবজাগরণ ও আত্মচেতনার প্রকাশ এই যুগের চিত্রশিল্পের মধ্য দিয়াও পরিস্ফুট হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েকটি দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে ভারতীয় চিত্রশিল্পের মধ্যে দুইটি বিভিন্ন রীতি পরিলক্ষিত হয়—পাশ্চাত্য শিল্পরীতি এবং প্রাচীন ভারতীয় শিল্প। অজন্তার প্রাচীরচিত্রগুলির সন্ধান লাভ করায় ভারতীয় চিত্রশিল্পিগণ এক নূতন প্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। পাশ্চাত্যপন্থী

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মেঘনাদ সাহা

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

রাজা রবি বর্মা

ভারতের কৃতী সন্তানগণ
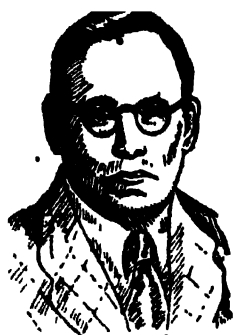
চিত্রশিল্পীদের মধ্যে রাজা রবি বর্মার নাম উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা সরকারী আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেলের প্রচেষ্টায় ভারতীয় চিত্রশিল্পরীতি পুনরুজ্জীবিত হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, যামিনী রায় প্রভৃতি শিল্পী ভারতীয় চিত্রকলাকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন। ভাস্কর্যশিল্পেও ভারতবর্ষ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। বর্তমানে কালের শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের মধ্যে দেবী প্রসাদ রায় চৌধুরী, বি, রাম কিঙ্কর, ডি, পি, কর্মকার, চিন্তামণি কর প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্নোত্তর

1. Give a brief account of the economic and social changes in India from 1858—1947.

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তর-সূত্র :—'অর্থ নৈতিক অবস্থা' ও সামাজিক অবস্থা' দ্রষ্টব্য।

2. Write an essay on the progress of higher education in India during the last century of the British rule.

বৃটিশ শাসনের শেষ শতাব্দীতে উচ্চ শিক্ষার উন্নতির জন্য কি প্রচেষ্টা হইয়াছিল সেই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ।

উত্তর-সূত্র : 'শিক্ষা-ব্যবস্থা' দ্রষ্টব্য

3. Write brief notes on nationalism in literature and art during the British rule.

বৃটিশ শাসনকালে সাহিত্যে ও শিল্পে জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখ

উত্তর সূত্র :—'শিল্পে ও সাহিত্যে জাতীয়তাবাদ দ্রষ্টব্য'।

পেশোয়াগণের বংশ-তালিকা

বিশ্বনাথ
- ১। বালাজী বিশ্বনাথ—১৭১৩-২০
  - ২। প্রথম বাজিরাও—১৭২০-৪০
    - ৩। বালাজী বাজিরাও—১৭৪০-৬১
      - ৪। প্রথম মাধবরাও ১৭৬১-৭২
      - ৫। নারায়ণ রাও ১৭৭২-৭৩
        - ৭। দ্বিতীয় মাধব রাও ১৭৭৪-৯৬
    - ৬। রঘুনাথ রাও—১৭৭৩-৭৪
      - দ্বিতীয় বাজিরাও—১৭৯৬-১৮১৮
        - নানা ধুন্দুপন্থ (দত্তক পুত্র)
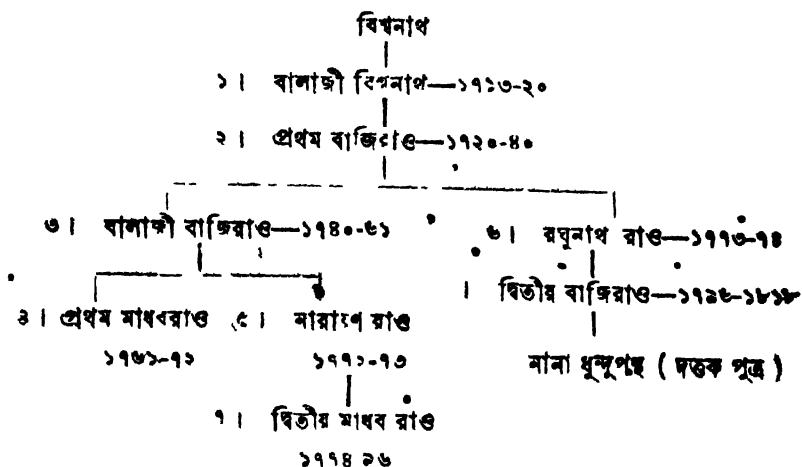
বৃটিশ আমলের গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয়গণ

(১) বাংলার গভর্ণরগণ

রবার্ট ক্লাইভ, ১৭৫৭—৬০
ভ্যান্সিটার্ট, ১৭৬০—৬৪
রবার্ট ক্লাইভ (২য় বার), ১৭৬৪—৬৭
ভেরেলেষ্ট, ১৭৬৭—৬৯
কার্টিয়ার, ১৭৬৯—৭২
ওয়ারেন হেষ্টিংস, ১৭৭২—৭৪

(২) বাংলার ফোর্ট-উইলিয়মের গভর্ণর জেনারেলগণ
(১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী)

ওয়ারেন হেষ্টিংস, ১৭৭৪—৮৫
স্যার জন ম্যাকফারসন, ১৭৮৫—৮৬
মার্কুইস অফ্ কর্নওয়ালিস, ১৭৮৬—৯৩
স্যার জন শোর, ১৭৯৩—৯৮
স্যার, এ, ক্লার্ক (অস্থায়ী), ১৭৯৮
মার্কুইস অফ্ ওয়েলেসলী, ১৭৯৮—১৮০৬

লর্ড কর্নওয়ালিস (২য় বার), ১৮০৫
স্যার জর্জ বার্লো (অস্থায়ী), ১৮০৫—১৮০৭
আর্ল অফ মিণ্টো (১ম), ১৮০৭—১৮১৩
মার্কুইস অফ হেষ্টিংস, ১৮১৩—১৮২৩
লর্ড আমহার্ষ্ট, ১৮২৩—২৮
লর্ড উইলিম বেণ্টিঙ্ক, ১৮২৮—৩৩

৩। ভারতের গভর্ণর জেনারেলগণ

(১৮৩৩ খৃঃর চার্টার অ্যাক্ট অনুযায়ী নিযুক্ত)

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক, ১৮৩৩—৩৫
স্যার চার্লস মেটকাফ, ১৮৩৫—৩৬
লর্ড অকল্যাণ্ড, ১৮৩৬—৪২
লর্ড এলেনবরা, ১৮৪২—৪৪
লর্ড হার্ডিঞ্জ, ১৮৪৪—৪৮
লর্ড ডালহৌসী, ১৮৪৮—৫৬
লর্ড ক্যানিং, ১৮৫৬—৫৮

৪। গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয়গণ

(১৮৫৮ খৃঃ মহারাণীর ঘোষণাপত্র অনুযায়ী নিযুক্ত)

লর্ড ক্যানিং, ১৮৫৮—৬২
লর্ড এলগিন, ১৮৬২—৬৪
স্যার জন লরেন্স, ১৮৬৪—৬৯
আর্ল অফ মেয়ো, ১৮৬৯—৭২
স্যার জন ষ্ট্রাচী, ১৮৭২
লর্ড নর্থব্রুক, ১৮৭২—৭৬
লর্ড লিটন, ১৮৭৬—৮০
লর্ড রিপন, ১৮৮০—৮৪
লর্ড ডাফরিণ, ১৮৮৪—৮৮
লর্ড ল্যান্সডাউন, ১৮৮৮—৯৪
লর্ড এলগিন (২য়), ১৮৯৪—৯৯
লর্ড কার্জন, ১৮৯৯—১৯০৫
লর্ড মিণ্টো, (২য়), ১৯০৫—১০
লর্ড হার্ডিং- ১৯১০—১৬
লর্ড চেমসফোর্ড, ১৯১৬—২১
লর্ড রিডিং, ১৯২১—২৫
লর্ড আরউইন, ১৯২৫—৩১
লর্ড উইলিংডন, ১৯৩১—৩৬
লর্ড লিনলিথগো, ১৯৩৬—৪৩
লর্ড ওয়াভেল, ১৯৪৩—৪৭
লর্ড মাউণ্টব্যাটেন, ১৯৪৭

বিশ্ব-কাহিনী

(১৭৬৩—১৯৪৯)

প্রথম অধ্যায়

ইউরোপ ও পৃথিবী

Syllabus : Europe and the world. Colonisation by European ations (up to mid-eighteenth century.)

olitical survey of Europe (after the Seven Years' War).

পাঠসূচী : ইউরোপ ও পৃথিবী। ইউরোপীয় জাতিবর্গের উপনিবেশ স্থাপন (অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত)।

ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা (সপ্তবর্ষ যুদ্ধের পর)।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের উপনিবেশ স্থাপন ও বাণিজ্যের প্রসার :— চীনকালে গ্রীস ও রোমক সাম্রাজ্যের যুগে ইউরোপের সহিত প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশগুলির প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইউরোপের রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর এই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া যায় এবং ইউরোপের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার কর্তৃত্ব আরবদের হস্তগত হয়। সুতরাং দীর্ঘকাল আরব বণিকদের মাধ্যমেই প্রাচ্যখণ্ডের সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্য ও অন্যান্য সম্পর্ক চলিতে থাকে। আরব বণিকগণ ভারতবর্ষ, চীন ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের পণ্যদ্রব্য মিশর বা সিরিয়ার মধ্যদিয়া স্থলপথে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে উপস্থিত করিত এবং তথা হইতে ইটালীয় বণিকরা সেইগুলি ক্রয় করিয়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যাইয়া বিক্রয় করিত। ব্যাপারে ইটালী ব্যতীত ইউরোপের অন্য কোন দেশের হাত বা কর্তৃত্ব ছিল না। সুতরাং ইউরোপের অন্যদেশগুলি স্বভাবতই প্রাচ্য ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য তৎপর হইতে উঠিল। প্রাচ্যদেশের মূল্যবান বাণিজ্যদ্রব্য ছিল মসলা। ইউরোপের রন্ধনদ্রব্য সুস্বাদু করার জন্য এই মসলার অত্যন্ত চাহিদা ছিল। কাজেই পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপের নাবিকদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল ভারতবর্ষ ও পূর্বভারতীয় মসলা-উৎপাদক দ্বীপগুলির সহিত সরাসরি সমুদ্রপথে যোগ স্থাপন করা।

মধ্যযুগে প্রাচ্যবাণিজ্যের কর্তৃত্ব

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তুরস্কের হাতে কনষ্টাণ্টিনোপলের পতনের পর হইতে প্রাচ্য অঞ্চলের জল ও স্থল পথ নিয়ন্ত্রণের ভার তুর্কী জাতির হস্তগত হইল। সুতরাং

ভূমধ্যসাগরের পথে প্রাচ্য দেশের সঙ্গে ইউরোপীয় জাতির বাণিজ্যের নিরাপত্তা ভোগ করা আর সম্ভবপর হইল না। এই কারণেই ইউরোপের অভিযাত্রীবর্গ ভূমধ্যসাগর বাদ দিয়া আটলান্টিক বা প্রশান্ত মহাসাগরের পথে সামুদ্রিক অভিযানের ক্ষেত্র বাছিয়া লইল। যদি সমুদ্রপথে প্রাচ্যদেশের সঙ্গে সংযোগের পথ আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে আরব বণিকদের একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার বিনষ্ট হইবে, ইটালীয় বণিকদের কর্তৃত্ব আর থাকিবে না, উপরন্তু তুরস্কের ভূমধ্যসাগরীয় অত্যাচারের হস্ত হইতেও ইউরোপীয় বণিকগণ নিষ্কৃতি পাইবে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভাস্কো-দা-গামা, কলাম্বাস, ক্যাবট, ম্যাগেলন, পর্টুগালের রাজপুত্র নৌযাত্রী হেনরী, 'দি নেভিগেটর', বার্থালোমিউ দিয়াজ প্রভৃতি অভিযাত্রীবর্গ মসলা দ্বীপপুঞ্জ তথা প্রাচ্য দেশগুলির সমুদ্রপথে সংযোগ স্থাপনের জন্য বিভিন্ন সময়ে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। প্রাচ্যদেশগুলিতে উপনীত হইবার প্রচেষ্টা প্রসঙ্গেই আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ আবিষ্কৃত হয়।

প্রাচ্যদেশের সহিত সমুদ্রপথে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা

প্রাচ্যদেশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের পশ্চাতে ব্যবসা-বাণিজ্য করার কামনা ব্যতীত আবিষ্কারের আনন্দ ও প্যাগান বা বিধর্মীদের দেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারের আকাঙ্ক্ষাও বিভিন্ন অভিযাত্রীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

বাণিজ্যক্ষেত্র প্রসার ব্যতীত খৃষ্টধর্ম প্রচারের ইচ্ছা

সামুদ্রিক অভিযানে পর্টুগালের প্রচেষ্টা:—পঞ্চদশ শতাব্দীর ভৌগোলিক আবিষ্কারে পর্টুগাল ইউরোপের মধ্যে সর্বাধিক অগ্রণী ছিল। পর্টুগালের যুবরাজ হেনরী সামুদ্রিক অভিযানের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি স্বয়ং অজ্ঞাতপূর্ব-প্রাচ্যের দেশে আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ হইয়া পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল বরাবর দক্ষিণদিকে বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং আফ্রিকার বহুস্থানে পর্টুগীজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে বার্থালোমিউ দিয়াজ নামে জনৈক পর্টুগীজ নাবিক জলপথে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরিয়া একেবারে দক্ষিণের প্রান্তবিন্দু পর্যন্ত উপস্থিত হন এবং তথা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বার্থালোমিউ বর্তমানে 'উত্তমাশা অন্তরীপ' নামে পরিচিত আফ্রিকার দক্ষিণতম বিন্দুর নামকরণ করেন 'বাত্যাক্ষুব্ধ অন্তরীপ' (Cape of Storm)। কিন্তু পর্টুগালের তৎকালীন নরপতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই অন্তরীপ হইয়াই একদিন ভারত মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জে উপনীত হওয়া যাইবে। এই প্রত্যাশায় তিনি এই অন্তরীপের নামকরণ করেন 'উত্তমাশা অন্তরীপ' (Cape of good Hope)।

যুবরাজ হেনরী

বার্থালোমিউ দিয়াজ ১৪৮৬

বার্থালোমিউ দিয়াজের অভিযানের বার বৎসর পরে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামা নামে জনৈক পর্টুগীজ নাবিক উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের মালাবার উপকূলে অবতরণ করেন। এইভাবে ইউরোপ হইতে জলপথে সরাসরি ভারতবর্ষে আগমনের পথ আবিষ্কৃত হইলে ইউরোপের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই ভাবে ভারতবর্ষে আগমনের নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া পর্টুগীজরা ভারতে ও প্রাচ্যে বহু সুরক্ষিত ঘাঁটির প্রতিষ্ঠা করিল। আরব ও তুরস্ক তাহাদের প্রাচ্যবাণিজ্যের একাধিপত্য হস্তচ্যুত হওয়ায় পর্টুগীজদের বিরোধিতা করিয়াছিল। পর্টুগীজ নৌ-সেনাপতি আলমাইডা ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে এক নৌযুদ্ধে আরব ও তুরস্কের সম্মিলিত নৌবাহিনীকে পরাজিত করিয়া প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্যিক একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রাচ্য অঞ্চলের পর্টুগীজ অধিকৃত ঘাঁটিগুলিকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ করার জন্য পর্টুগালের প্রতিনিধিরূপে আলবুকার্ক প্রেরিত হইলেন। তিনি ভারতে গোয়ায় পর্টুগীজদের রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং পারস্যোপসাগরের উপকূলবর্ত্তী অরমুজ বন্দর অধিকার করিয়া ভারত মহাসাগরকে পর্টুগীজের পক্ষে নিরাপদ করিয়া তুলিলেন। সুদূর প্রাচ্যে মালাকায়ও পর্টুগীজদের অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্টুগীজ উপনিবেশে পরিণত হইল এবং মসলার বাণিজ্য পর্টুগীজরা একচেটিয়া করিয়া লইল।

ভাস্কো দা-গামা ১৪৯৮

প্রাচ্য ব্যবসায়ে পর্টুগীজদের একাধিপত্য

আলবুকার্ক

স্পেনের অভিযান ও পশ্চিম গোলার্দ্ধ আবিষ্কার :— পর্টুগালের ন্যায় স্পেনও জলপথে নব নব দেশ আবিষ্কারের কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিল। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলাম্বাস সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়া নূতন মহাদেশ অর্থাৎ আমেরিকা আবিষ্কার করেন। চীন ও ভারতবর্ষে গমন করার জন্য অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি এই অভিযানে বহির্গত হইয়াছিলেন এবং বাহামায় উপস্থিত হইয়া তথায় স্পেনের পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। কলাম্বাস সর্বশুদ্ধ চারিবার আমেরিকায় অভিযান করিয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তাঁহার ধারণা ছিল তিনি এশিয়ার পূর্ব উপকূলভাগে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার পরে আমেরিগো ভেসপুচি নামে আর একজন নাবিক আমেরিকায় উপস্থিত হন। তখন জানা গেল যে ইহা একটি নূতন মহাদেশ এবং তাঁহার নামানুসারে ইহার নামকরণ হইল।

কলাম্বাস—১৪৯২

আমেরিগো ভেসপুচি

১৫১৯ খৃষ্টাব্দে ম্যাগেলান নামে এক পর্টুগীজ নাবিক স্পেনের সম্রাটের আনুকূল্যে সমুদ্রপথে পৃথিবী পরিক্রমায় বহির্গত হন। ম্যাগেলান আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ আমেরিকার ম্যাগেলান প্রণালী (পরে তাঁহার নামানুসারে এই নাম হয়) অতিক্রম করার পর প্রশান্ত মহাসাগরে উপস্থিত হইলেন। পথে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে স্থানীয় অধিবাসীদের হস্তে তিনি নিহত হইলে তাঁহার সঙ্গীরা একটি জাহাজে করিয়া ভারত মহাসাগর ও আফ্রিকা ঘুরিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ম্যাগেলানের এই সার্থক অভিযান হইতে পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণিত হইল।

ম্যাগেলান

আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কারের পরে জনৈক স্পেনিস নাবিক কার্টিজ মেক্সিকোতে উপস্থিত হন এবং তথাকার প্রাচীন জাতি আজটেকদিগকে পরাজিত করিয়া মেক্সিকো স্পেনের অধিকারভুক্ত করেন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে স্পেনিস নাবিক পিজারো দক্ষিণ আমেরিকার পেরু এইভাবে অধিকার করিয়া স্পেনের সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করেন। স্পেন ও পর্টুগাল এই সকল আবিষ্কারে অগ্রণী ছিল। সুতরাং অচিরেই আবিষ্কৃত দেশ ও অধিকার লইয়া দুই দেশের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। তদানীন্তন 'পোপ' ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডার মধ্যস্থতা করিয়া উভয় রাষ্ট্রের সীমানা নির্দ্ধারিত করিলেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কার্য্যতঃ স্পেন পাইল আমেরিকা আর পর্টুগাল লাভ করিল ভারতবর্ষ, চীন, জাপান এবং অন্যান্য প্রাচ্যদেশগুলি।

স্পেন ও পর্টুগাল ব্যবসাবাণিজ্য ও লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে অজস্র সম্পদ আনয়ন করিতেছিল। স্পেনের এই সৌভাগ্যোদয়ে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি ঈর্ষ্যান্বিত হইল এবং তাহারা স্পেনের এই ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক সৌভাগ্যের অংশীদার হইতে চাহিল। ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্স স্পেনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রথম যুগে ইংলণ্ড ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবর্ত্তে আমেরিকা হইতে জাহাজ-যোগে আনীত স্পেনের ধনসম্পদ লুণ্ঠনের পথ ধরিয়াছিল। ফ্রান্সিস ড্রেক, স্যার জন হকিন্স প্রভৃতি বৃটিশ নাবিক এই জলদস্যুতার কার্য্যে অগ্রণী হন। ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে স্পেনের, অজেয় নৌবহর, ইংলণ্ডের হস্তে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে স্পেনের সামুদ্রিক আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয় এবং ইংলণ্ড হল্যাণ্ড ও ফ্রান্স সামুদ্রিক অভিযানে ও উপনিবেশ স্থাপনে স্পেন অপেক্ষা অগ্রবর্ত্তী হইয়া পড়ে। হল্যাণ্ড আমেরিকায় ও প্রাচ্য ভূখণ্ডে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় ও বাণিজ্য প্রসারে সচেষ্ট হয়। হল্যাণ্ড যবদ্বীপ ও সিংহলে প্রাধান্য বিস্তার করে এবং ভারতে কালিকট ও সুরাটে কুঠি নির্ম্মাণ করে। ফরাসীরাও আমেরিকায়

হল্যাণ্ড
ফরাসী

নোভাস্কসিয়া ও কুইবেকে কানাডায় এবং ভারতবর্ষে পণ্ডিচেরী, চন্দননগর, মাহে, কারিকল প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করে।

ইংরেজ

ইংরেজরাও উপনিবেশ বিস্তার ও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করিয়া আমেরিকায় ও ভারতবর্ষে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে। ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং প্রাচ্য ভূখণ্ডে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, ভারতবর্ষে, চীনদেশে, সর্বত্র বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির মধ্যে বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক আধিপত্য লইয়া তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। প্রাচ্য ভূখণ্ডে প্রথমে আগত পর্টুগীজগণ প্রতিযোগিতায় হল্যাণ্ডের হস্তে পরাজিত হয়। ডাচ শক্তি পর্টুগীজদিগকে ক্রমশঃ স্থানচ্যুত করিয়া সামান্য কয়েকটি স্থানে তাহাদিগকে কেন্দ্রীভূত করে। ডাচগণের এই সৌভাগ্যও চিরদিন রহিল না। ভারতবর্ষে তাহাদের সাময়িক প্রতিপত্তি হইয়াছিল। প্রথমে ইংরেজগণ ডাচদের সহযোগিতা করে, কিন্তু পরিশেষে ইংরেজরা তাহাদিগকে ভারত হইতে বিতাড়িত করে। ভারতবর্ষ হইতে স্থানচ্যুত হইয়া ডাচরা পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অর্থাৎ স্মবর্ণদ্বীপ, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া বাণিজ্য করিতে থাকে।

পর্টুগীজরা পরাজিত ও পশ্চাৎপদ

ওলন্দাজ বণিকগণ ইংরেজের হস্তে পরাজিত

এইভাবে উপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে পর্টুগীজ ও ডাচরা পূর্ব ক্ষমতাচ্যুত হইলে একমাত্র ইংরেজ ও ফরাসীরা অবস্থান করিতে লাগিল। শেষ পর্য্যায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিণামে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হইল।

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাঃ—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ভারতবর্ষে ও আমেরিকায় বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক আধিপত্য লইয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ফ্রান্স এই সময়ে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ছিল এবং নরপতি চতুর্দ্দশ লুইর নেতৃত্বে ফ্রান্স সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করিতে আরম্ভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ১৭০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইউরোপে তিনটি উল্লেখযোগ্য দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই তিনটি যুদ্ধেই ফ্রান্স ও ইংলণ্ড পরস্পরের বিরুদ্ধ পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। প্রথম যুদ্ধ হয় স্পেনের উত্তরাধিকারের যুদ্ধ ১৭০১ হইতে ১৭১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ইউট্রেক্টের সন্ধিতে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী ইংলণ্ড ভূমধ্যসাগরে জিব্রাল্টার ও মিনর্কা দ্বীপ এবং আমেরিকায়

স্পেনীয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধ— ইউট্রেক্টের সন্ধি, ১৭১৩

ফ্রান্সের নিকট হইতে নোভাস্কোসিয়া ও হাডসন উপসাগরীয় অঞ্চল সমূহ প্রাপ্ত হয়। ইউট্রেক্টের সন্ধির বলে ইংলণ্ড যে সমস্ত অঞ্চল প্রাপ্ত হইল তাহাতে ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিপত্তি বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল।

অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ ও আই-লা স্যাপেলের সন্ধি, ১৭৪৮

অতঃপর ১৭৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। এই যুদ্ধে ফ্রান্স প্রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিলে ইংলণ্ডের মনে আশঙ্কা হয়, সম্ভবতঃ এই সুযোগে ফ্রান্স ইউট্রেক্টের সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করিতে পারে। সুতরাং ইংলণ্ড এই যুদ্ধে ফ্রান্সের বিপক্ষে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যোগদান করে (১৭৪৩)। এই যুদ্ধ ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব ও অস্ট্রিয়া প্রাশিয়ার দ্বন্দ্বে পরিণত হইল। ইউরোপের এই যুদ্ধ আমেরিকা ও ভারতবর্ষের উপনিবেশগুলিতেও বিস্তৃত হয়। ভারতে ফরাসী ও ইংরেজ কোম্পানীর মধ্যে যুদ্ধ বাধে এবং ফরাসী সৈন্য ইংরেজদের মাদ্রাজ কুঠি অবরোধ করে। ইংরেজরা মাদ্রাজ পরিত্যাগ করে। কর্ণাটের নবাবের সহিত যুদ্ধেও ফরাসীরা জয়লাভ করে। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে আই-ল্যা-স্যাপেলের সন্ধিতে এই যুদ্ধের অবসান হয়। ইংরেজরা ভারতবর্ষে মাদ্রাজ ফিরিয়া পায়। অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে যদিও ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ভারতবর্ষে ও আমেরিকায় পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল, তথাপি এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই। তজ্জন্য সপ্তবর্ষ যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করিতে হইল।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে 'সপ্তবর্ষ' যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ ইউরোপ হইতে ভারতে ও আমেরিকায় সম্প্রসারিত হয়। আমেরিকায় ফরাসীরা ইংরেজের হস্তে কুইবেক ও মন্ট্রিলের যুদ্ধে পরাজিত হয়। ভারতবর্ষে এই যুদ্ধের পূর্বেই দাক্ষিণাত্যের আধিপত্য লইয়া ইংরেজ ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংরেজরা বঙ্গদেশে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে এবং ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে বন্দীবাসের যুদ্ধে ফরাসীদিগকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিয়া ইংরেজরা ভারতবর্ষ হইতে ফরাসীদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি চিরতরে বিলুপ্ত করিল। অবশেষে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধির দ্বারা সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান হইল।

প্যারিসের সন্ধি, ১৭৬৩

এই সন্ধির বলে ইংলণ্ড ফ্রান্সের নিকট হইতে কানাডা, নোভাস্কোসিয়া, কেপ বৃটেন ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি অঞ্চল প্রাপ্ত হইল। ফরাসীরা ভারতবর্ষে পূর্ব অধিকৃত কয়েকটি স্থানের উপর কর্তৃত্ব ফিরিয়া পাইল এবং ভারতবর্ষে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রাপ্ত হইল; কিন্তু ভারতবর্ষে

সুরক্ষিত দুর্গ রক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। এইরূপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর ইংলণ্ড বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

সপ্তবর্ষ যুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্য :—দীর্ঘ ৬৮ বৎসর কাল রাজত্বের পর ফ্রান্সের খ্যাতনামা নরপতি চতুর্দ্দশ লুই ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে তাঁহার পৌত্র পঞ্চদশ লুই ফ্রান্সের অধিপতি হন। সিংহাসনে আরোহণ করার সময়ে তিনি নাবালক ছিলেন—১৭২৩ খৃষ্টাব্দে সাবালক হইয়া লুই ফ্রান্সের শাসনভার গ্রহন করেন। পঞ্চদশ লুই অত্যন্ত বিলাসী এবং ইন্দ্রিয় পরায়ণ ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ বহু রাজকার্য্য স্বয়ং সম্পাদন না করিয়া অযোগ্য লোকের হস্তে ন্যস্ত করিতেন। ফলে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারিল না—অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে এবং সপ্তবর্ষের যুদ্ধে ফ্রান্সকে পরাজয় ও মর্য্যাদাহানির গ্লানি ভোগ করিতে হইয়াছিল। ফ্রান্সে যে বিপ্লব আসন্ন তাহা তিনি পূর্বাহ্ণে বুঝিতে পারিয়া এই উক্তি করিয়াছিলেন—'After me the deluge' (আমার পরেই মহাপ্লাবন আসবে। কিন্তু আসন্ন প্লাবনের হস্ত হইতে ফ্রান্সকে পরিত্রাণ করার কোন প্রচেষ্টাই তিনি করেন নাই। ইন্দ্রিয়ভোগে এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় অপর্য্যাপ্ত ব্যয় করিয়া জাতীয় ঋণভার বিপুলায়তন করিয়া গেলেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে পঞ্চদশ লুইর মৃত্যু হইলে ষোড়শ লুই সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালেই ফরাসী-বিপ্লব আরম্ভ হয়।

ফ্রান্স

ষোড়শ লুই

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাশিয়া শুধু জার্মানীতে নহে ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল। ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর ব্রাণ্ডেনবার্গ নামক ক্ষুদ্র স্থানের অধিপতি প্রাশিয়ার আধিপত্য লাভ করেন। ব্রাণ্ডেনবার্গ-প্রাশিয়ার একীকরণই প্রাশিয়া রাষ্ট্রের অভ্যুত্থানের প্রথম সোপান। ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধে (১৬১৮—৪৮) যোগদান করিয়া প্রাশিয়া লাভবান হয় এবং যুদ্ধান্তে সন্ধির শর্তানুযায়ী প্রাশিয়ার যথেষ্ঠ বিস্তার ঘটে। প্রাশিয়া ফ্রেডারিক দি গ্রেট ইলেক্টর (১৬৪০—৮৮), প্রথম ফ্রেডারিক
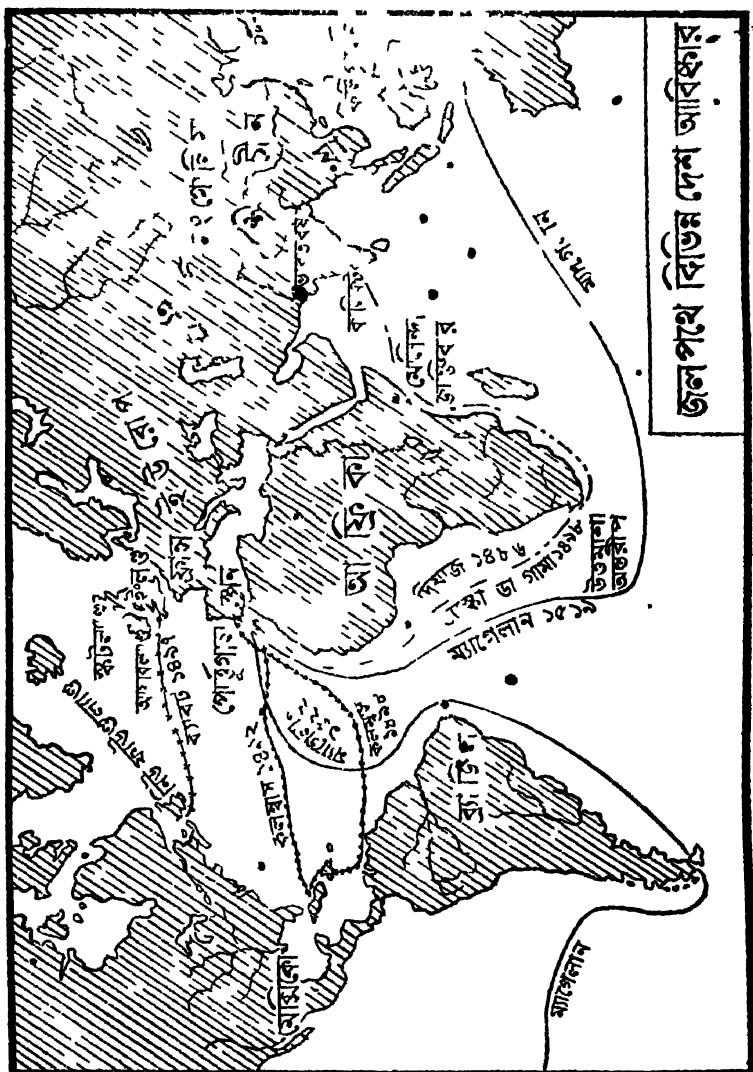
প্রাশিয়া

(১৬৮৮—১৭১৩), প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়ম (১৭১৩—৪০), ফ্রেডারিক দি গ্রেট (১৭৪০—৮৬) প্রভৃতি খ্যাতনামা সমরনায়ক নরপতিদের রাজত্বকালে ক্রমশঃ আয়তনে,সামরিক শক্তিতে এবং মর্যাদা প্রতিপত্তিতে মধ্য ইউরোপে অগ্রগণ্য হইয়া উঠে। এযাবৎকাল জার্মানীতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য ছিল; অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে এবং সপ্তবর্ষ যুদ্ধে প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং সাইলেশিয়া অধিকার ও অন্যান্য সুবিধা লাভের দ্বারা জার্মানীতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য খর্ব করিয়া তৎস্থলে প্রাশিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। পোলাণ্ড ব্যবচ্ছেদের সময়ে পশ্চিম প্রাশিয়া রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয়। সাইলেশিয়া ও পোলাণ্ড এই ভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে প্রাশিয়ার আয়তন পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণিত হয় এবং প্রাশিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে একটানা এক সংহত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। প্রাশিয়া জার্মানীতে অস্ট্রিয়ার প্রতিপক্ষরূপে দেখা দিল তাহা নহে মধ্যে ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে সামরিক খ্যাতির দিক দিয়া ফ্রান্সকে অতিক্রম করিল এবং প্রাশিয়া ফ্রান্সেরও প্রতিপত্তির স্থলাভিষিক্ত হইতে চলিল।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মধ্য ইউরোপে অস্ট্রিয়া সর্বাধিক খ্যাতিমান রাষ্ট্র ছিল। 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট' রূপে অস্ট্রিয়ার নরপতি ইউরোপে যথেষ্ট খ্যাতি ও মর্যাদার অধিকারী ছিল। ত্রিশবর্ষ যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয়ের ফলে অস্ট্রিয়ার পূর্ব প্রতিপত্তি অনেকটা খর্ব হয় এবং ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অস্ট্রিয়াকে ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হইতে হয়। যাহা হোক এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যস্থলে থাকিয়া কখনও যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা কখনও আপোষ সন্ধি করিয়া অস্ট্রিয়া কোন মতে আত্মরক্ষা করিয়া অবস্থান করিল। সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে তাঁহার কন্যা মেরিয়া থেরেসা অস্ট্রিয়ার সিংহাসনে বসেন এবং তাঁহার স্বামী ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট নির্বাচিত হন। সিংহাসনে আরোহণ করার অব্যবহিত পরে মেরিয়া থেরেসাকে বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। মেরিয়া থেরেসা ও তাঁহার স্বামীর বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও প্রাশিয়া দণ্ডায়মান হয় এবং মেরিয়া থেরেসার সিংহাসনের উত্তরাধিকার ও স্বামীর সম্রাট পদ এই অধিকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থিত হয়। প্রাশিয়া সাইলেশিয়া অধিকার করিয়া বসে। আই-লা স্যাপেলের সন্ধিতে (১৭৪৮) উত্তরাধিকার সমস্যার মীমাংসা হইল। সাইলেশিয়া প্রাশিয়ার হস্তে অর্পণ করিতে হইল। সাইলেশিয়া পুনরুদ্ধারের জন্য মেরিয়া থেরেসা ইংলণ্ডের পরিবর্তে ফ্রান্সকে মিত্রশক্তি করিয়া সপ্তবর্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন (১৭৫৬-৬৩)। কিন্তু সপ্তবর্ষ যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় সাইলেশিয়ার পুনরুদ্ধার সম্ভবপর হইল না।

অস্ট্রিয়া

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে মেরিয়া থেরেসা পোলাণ্ড বাঁটোয়ারায় অংশ গ্রহণ করেন এবং রাশিয়া ও প্রাশিয়ার সঙ্গে পোলাণ্ডের অংশ বিশেষ অষ্ট্রিয়ার জন্য প্রাপ্ত হন। মেরিয়া থেরেসার স্বামী প্রথম ফ্রান্সিসের মৃত্যুর পরে তাঁহার ও মেরিয়া থেরেসার পুত্র দ্বিতীয় জোসেফ (১৭৬৫—৯০) সম্রাট পদে নির্বাচিত হন এবং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মেরিয়া থেরেসার মৃত্যু হইলে তিনি অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অধিপতি হইলেন। দ্বিতীয় জোসেফ অষ্ট্রিয়াকে আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। তিনি অবাধ ধর্ম চরণের অনুমতি দান, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সার্ফ প্রথার প্রায় উচ্ছেদ, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি প্রবর্ত্তনের দ্বারা অষ্ট্রিয়াকে সর্বপ্রকারে উন্নত করার পরিকল্পনা করেন। অষ্ট্রিয়ার বিজ্ঞ মন্ত্রী কৌনিট্জ তাঁহার পরামর্শদাতা সহযোগী ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের উত্তরাঞ্চলিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে রাশিয়াই সর্বাধিক অগ্রগণ্য ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে রাশিয়ার উন্নতির সূত্রপাত হয়। মধ্য এশিয়ার তাতার জাতি এবং পশ্চিমাঞ্চলের সুইডেন ও পোলাণ্ড দীর্ঘকাল রাশিয়ার উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিয়াছিল। রুরিক

রাশিয়া

বংশ ও রোমানফ বংশের নরপতিদের চেষ্টায় রাশিয়া এই সমস্ত বহিঃশক্তির প্রভাব অতিক্রম করে এবং রাশিয়াকে সর্বতোভাবে স্বাধীন করিয়া তোলে। কিন্তু রাশিয়া ভৌগোলিক দিক দিয়া ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইউরোপের অপরাপর রাষ্ট্রের তুলনায় রাশিয়া অনগ্রসর ছিল এবং ইউরোপের রাষ্ট্রজগতে অপাংক্তেয় ছিল। রোমানফ বংশীয় জার (নরপতি উপাধি) পিটার দি গ্রেট (১৬৮৩—১৭২৫) নানা সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়া এবং সার্থক পররাষ্ট্রনীতির অনুসরণ করিয়া রাশিয়াকে ইউরোপীয় জগতে একটি স্থায়ী ও মর্যাদাপূর্ণ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। পিটারের সময়ে রাশিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে দীক্ষিত হয় এবং রাশিয়ার সমাজ জীবনে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়। পিটার সুইডেনকে পরাজিত করিয়া বাল্টিক সাগরীয় কয়েকটি রাষ্ট্রের উপর রাশিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুতঃ তাঁহার নেতৃত্বে রাশিয়া উত্তর ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়। পিটারের পরবর্ত্তী কালের রাশিয়ার শাসকদের মধ্যে জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিণ (১৭৬২—৯৬) প্রকৃত প্রস্তাবে পিটারের উপযুক্ত অনুবর্তিনী ছিলেন। ক্যাথারিণের কৃতিত্ববলে রাশিয়া অতি দ্রুতপাদক্ষেপে আভ্যন্তরীণ উন্নতি ও পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মর্য্যাদা অর্জ্জন করিয়া ইউরোপের অগ্রবর্ত্তী রাষ্ট্রসমূহের অন্যতমরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৭৭২, ১৭৯৩ ও ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের পোলাণ্ড বাটোয়ারায় ক্যাথারিণ পোলাণ্ডের প্রায় এক তৃতীয়াংশ রাশিয়ার অধিকারভুক্ত করেন। ক্যাথারিণের সময়ে তুরস্ক রাশিয়ার নিকট পরাজিত হইয়া রাশিয়ার হস্তে ক্রিমিয়া আজফ এবং ইউক্রেন সমর্পন করিতে বাধ্য হইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক বিস্তৃতি।

ষ্টুয়ার্ট যুগে রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকার লইয়া ইংলণ্ডে রাজা ও প্রজাদের মধ্যে যে দীর্ঘস্থায়ী গৃহবিবাদ চলে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে তাহার অবসান হয়। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের 'যশস্কর বিপ্লব'-এর ফলে নরপতি দ্বিতীয় জেমস সিংহাসনচ্যুত হন এবং তাঁহার কন্যা ও জামাতা মেরী ও হল্যাণ্ডের অরেঞ্জ বংশীয় তৃতীয় উইলিয়ম ইংলণ্ডের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। এই বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মের জয় হইল এবং পার্লামেণ্টের সার্বভৌম অধিকারও স্বীকৃত হইল। উইলিয়ম বিদেশী হইয়াও দেশের স্বার্থ ও সিংহাসনের স্বার্থ অভিন্ন করিয়া দেখিলেন এবং পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ইংলণ্ডের প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত করিলেন। উইলিয়মের পরে দ্বিতীয় জেমসের কন্যা এ্যান (১৭০২–১৪ রাজত্ব করেন। এই সময়ে ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মনোমালিন্য তীব্রতর আকার ধারণ করে এবং ইংলণ্ড অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে ফ্রান্সের বিপক্ষে যোগদান করে। যুদ্ধান্তে ইউট্রেক্টের সন্ধিতে ইংলণ্ড ফ্রান্সের নিকট হইতে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, নোভাস্কাসিয়া এবং হাডসন উপসাগরীয় অঞ্চল ও স্পেনের নিকট হইতে জিব্রাল্টার ও মিনর্কা প্রাপ্ত হয়। তাঁহার রাজত্বকালেই স্কটল্যাণ্ড ইংলণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্তান অবস্থায় এ্যানের মৃত্যু হইলে জার্মানীর অন্তর্গত হ্যানোভারের 'ইলেক্টর প্রথম জর্জ্জ' (১৭১৪—২৭) এবং তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় জর্জ (১৭২৭—৬০) ইংলণ্ডের নরপতি হন। তাঁহার রাজত্বকালে স্পেনের সঙ্গে স্পেনীয় উপনিবেশ সংক্রান্ত বিরোধকে উপলক্ষ্য করিয়া যুদ্ধ হয়। অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে (১৭৪০—৪৮)ও সপ্তবর্ষ যুদ্ধ (১৭৫৬—৬৩) তাঁহার সময়েই হয়। উভয় যুদ্ধেই ইংলণ্ড যোগদান করিয়া ভারতবর্ষে ও আমেরিকায় আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। সপ্তবর্ষ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি পরবর্ত্তী নৃপতি তৃতীয় জর্জ (১৭৬০-১৮২০) এর রাজত্বকালে ঘটে। তৃতীয় জর্জের দীর্ঘ রাজত্বকাল ঘটনাবৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের আবির্ভাব এবং ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধবিগ্রহ তাঁহার রাজত্বকালকে তাৎপর্য্য পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

ইংলণ্ড

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক স্পেন, পর্টুগাল প্রভৃতি অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। জার্মানী ও ইটালী তখন বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সমবায় ছিল। পূর্ব ইউরোপের বল্কান অঞ্চল অটোম্যান সম্রাট বা তুর্কী সম্রাটের অধীনে ছিল। তুরস্কের সাম্রাজ্য এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা তিন মহাদেশবিস্তৃত হইলেও তুরস্ক প্রকৃত প্রস্তাবে দুর্বল ছিল।

ইউরোপের অপরাপর রাষ্ট্র

সমসাময়িক ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা:—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইউরোপের সর্বত্র স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল—একমাত্র ইংলণ্ডেই ১১৮৮ খৃষ্টাব্দে বিপ্লবের পরে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সর্বত্র রাজা স্বেচ্ছামত রাজ্যশাসন করিতেন, প্রজাদের মতামত নেওয়ার প্রয়োজন মনে করিতেন না। দেশে রাজা থাকিলেও অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থেই অভিজাত শ্রেণীর দ্বারাই দেশ শাসিত হইত। নিয়মতান্ত্রিক দেশ ইংলণ্ডেও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের কোন অধিকার ছিল না—মুষ্টিমেয় কতিপয় ভূম্যধিকারী শাসনব্যবস্থা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল। লিপিবদ্ধ শাসনতন্ত্র কোথাও ছিল না—সর্বত্র নরপতি দায়িত্বহীন নিরঙ্কুশভাবে শাসন করিতেন। ভিনিস বা সুইজার্লাণ্ড সাধারণ তন্ত্রের অধীনে ছিল, কিন্তু কার্যতঃ সেখানেও অভিজাত বংশীয়দের হস্তেই শাসন ক্ষমতা ছিল। ইউরোপের সর্বত্র ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হইত—মাত্র ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে নামমাত্র ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল। কি রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে কি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, কি ধর্মে কোন ক্ষেত্রেই সাম্যনীতি অনুসৃত হইত না। ফলে জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিবার কোন সুযোগই ছিল না। অধিকন্তু সামন্ত প্রথানুযায়ী সার্ফ বা ভূমিদাস প্রথা সর্বত্র (ইংলণ্ড ব্যতীত) কম বেশী প্রচলিত ছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ নরপতিই বিশ্বাস করিতেন যে রাষ্ট্রের রাজস্ব ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বা অহমিকা চরিতার্থতার জন্য রাষ্ট্র বা প্রজাকল্যাণের জন্য নহে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ যুদ্ধবিগ্রহ নরপতিদের ব্যক্তিগত বা বংশগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নরপতিদের এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে যখন জনমত জাগ্রত হইল এবং রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও একজন নরপতির প্রাণদণ্ড ও আর একজন সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইল তখন ইউরোপের স্বেচ্ছাচারী নৃপতিদের মধ্যে কয়েকজন প্রজাহিতৈষী অক্লান্ত কর্মা শাসক দৃষ্ট হইল। তাঁহারা শাসনব্যবস্থায় স্বৈরাচারী হইলেও পূর্ববর্তীদের মত রাজকল্যাণে উদাসীন ছিলেন না, বরঞ্চ আপনাদিগকে জন সেবক মনে করিয়া স্ব স্ব রাষ্ট্রকে যথেষ্ট উন্নত করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য ইহাদিগকে Benevolent Despot বা সদাশয় স্বৈরাচারী বলা হয়। এই জাতীয় স্বৈরাচারীদের মধ্যে রাশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথারিণ, প্রাশিয়ার ফ্রেডারিক, দি গ্রেট ও অষ্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা যথেষ্ট রাজক্ষমতায় বিশ্বাস করিতেন এবং রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থায় প্রজার কোন অধিকার মানিতেন না, কিন্তু এই যথেচ্ছ রাজ শক্তিকে প্রজার স্বার্থেই পরিচালিত করিতে হইবে ব্যক্তিগত খেয়াল খুশী চরিতার্থতার জন্য নহে— এই নীতিতে তাঁহারা আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপ
প্রাশিয়া
সুইডেন
অস্ট্রিয়া
রোমান সাম্রাজ্য
রাশিয়া
পোলাণ্ড
গ্রেট বৃটেন
লণ্ডন
হল্যাণ্ড
হ্যানোভার
স্যাক্সনি
প্যারিস
ব্যাভেরিয়া
ভিয়েনা
হাঙ্গেরী
ফ্রান্স
মিলান
ভেনিস
অটোমান সাম্রাজ্য
কনস্টাণ্টিনোপল
জেনোয়া
কর্সিকা
রোম
স্পেন
পোর্তুগাল
ন্যাপলস
সার্ডিনিয়া
মেজোর্কা
সিসিলি
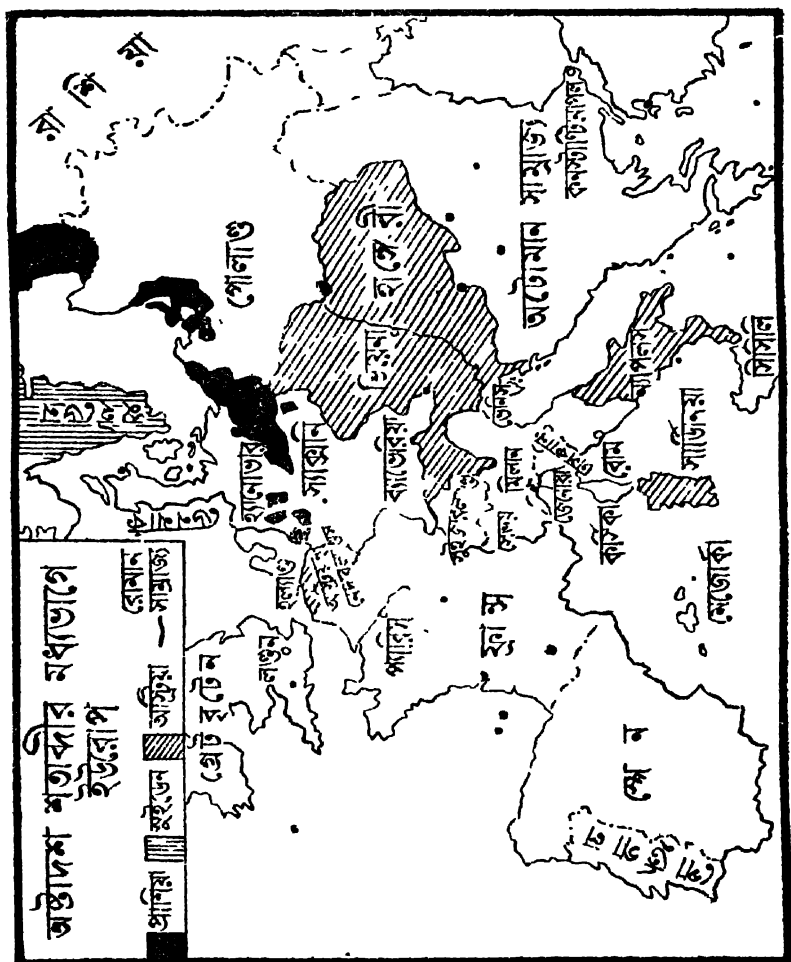
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, ইউরোপের সর্বত্র সামাজিক অবস্থা বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমাজের অন্তর্ভুক্ত তিনটি শ্রেণীর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ অভিজাত ও ধর্মযাজক সম্প্রদায় সর্বপ্রকার সুবিধা ভোগ করিত। এই দুই শ্রেণীকে কোন প্রকার কর দিতে হইত না। ব্যয় নির্বাহের জন্য তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ জনসাধারণের নিকট হইতে রাষ্ট্রের কর আদায় করা হইত। এই আর্থিক চাপের ফলে জনসাধারণ অত্যন্ত নিষ্পেষিত হইতেছিল। ইউরোপের অধিকাংশ স্থানেই সামন্তপ্রথা কম বেশী প্রচলিত ছিল। ভূম্যধিকারিগণ ভূমিদাস সার্ফদের উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিতেন এবং ভূমির সমস্ত উপস্বত্ব ভোগ করিতেন। চাষের মালিক কৃষকেরা হইলেও গ্রামের মালিক ছিলেন ভূম্যধিকারী। সার্ফদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলিয়া কিছু ছিল না। ভূমি পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে অন্য জীবিকা সন্ধানের জন্য তাহাদের যাওয়ার অধিকার ছিল না। শুধু জমিদারের কর নহে, চার্চকে এবং গভর্ণমেণ্টকেও নির্দিষ্ট স্বল্প আয়ের অধিকাংশ করস্বরূপ প্রদান করিতে হইত। দেশের জনসাধারণের এই শোচনীয় দুরবস্থা থাকার জন্যই অধিকাংশ রাষ্ট্রের জনসাধারণ ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতির জন্য বিপ্লবকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল।

সামজিক অবস্থা

প্রশ্নোত্তর

1. Write briefly the political condition of the different countries of Europe after the Peace of Paris, 1763

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধির পরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর।

উত্তর-সূত্র : (১) ভূমিকা : সপ্তবর্ষ যুদ্ধের পশ্চাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের তিন প্রকারের দ্বন্দ্ব সমাধানের অপেক্ষায় ছিল। ইংলণ্ড ফ্রান্সের মধ্যে উপনিবেশিক বাণিজ্যিক ও সামুদ্রিক আধিপত্যের দ্বন্দ্ব, অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে জার্মানীর উপর প্রভুত্ব সম্পর্কে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে মধ্যে ইউরোপের সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের দ্বন্দ্ব—এই তিন শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করিয়া সপ্তবর্ষ যুদ্ধের সূচনা হয়। যুদ্ধান্তে প্যারিসের সন্ধিতে এই তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বতার স্থায়ী মীমাংসা হয়। প্রথমটিতে ইংলণ্ড এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টিতে প্রাশিয়া জয়লাভ করে।

(২) সামুদ্রিক বাণিজ্যিক ও উপনিবেশিক ক্ষেত্রে ইংলণ্ড শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকায় ও ভারতবর্ষে বৃটিশের অধিকার স্থাপিত হয়। (৩) প্রাশিয়া

অষ্ট্রিয়ার একাধিপত্য খর্ব করিয়া জার্মানীতে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অংশীদার হয়। উপরন্তু মধ্য ইউরোপে প্রাশিয়ার সামরিক শ্রেষ্ঠত্বও স্বীকৃত হয়। (৪) ফ্রান্স চতুর্দশ লুইর মৃত্যুর পরে অকর্মণ্য পঞ্চদশ লুই নরপতি হন। ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, অর্থ-নৈতিক দুরবস্থা ও সর্বোপরি অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের ও সপ্তবর্ষ যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি; ভারতবর্ষে ও আমেরিকার উপনিবেশ সমূহ হস্তচ্যুত। (৫) অষ্ট্রিয়া: জার্মানীতে তাহার পূর্ব গৌরব হ্রাস: প্রাশিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পশ্চাৎপদ: সাইলেশিয়া হস্তচ্যুত। (৬) রাশিয়া: বাল্টিক অঞ্চল, উত্তর-পূর্ব ইউরোপের পোলাণ্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন প্রভৃতির স্থলে রাশিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত; অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় জাতিরূপে স্বীকৃত। (৭) তুরস্ক: অটোম্যান সাম্রাজ্যের ক্ষীয়মান অবস্থা-বল্কান অঞ্চলের খৃষ্টান রাজ্যগুলির উপর আধিপত্য থাকিলেও তাহাদের মনে অসন্তোষ ও স্বাতন্ত্র্য অর্জনের মনোভাব: প্রাচ্য সমস্যা (Eastern question)-র উদ্ভব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবচেতনার উন্মেষ ও ফরাসী বিপ্লব

Syllabus :—Enlightenment and Revolution. The French Philosophers. American War of Independence. The French Revolution. Napoleon.

পাঠ্যসূচী :—নবচেতনার উন্মেষ ও বিপ্লব। ফরাসী দার্শনিকগণ। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ। ফরাসী বিপ্লব। নেপোলিয়ন।

ভূমিকা :—১৬৪৮ খৃষ্টাব্দের পরে ইউরোপের ইতিহাসে একক ফরাসী আধিপত্যের সূত্রপাত হইল এবং প্রায় এক শতাব্দীকাল ফ্রান্সের এই রাষ্ট্রনৈতিক প্রাধান্য বজায় রহিল। ফরাসী নরপতি চতুর্দশ লুই-এর অর্ধশতাব্দীব্যাপী রাজত্বকালে ফ্রান্সের ভৌমিক বিস্তৃতি ও আর্থিক উন্নতি দুই-ই ঘটিল। ফ্রান্স সর্বতোভাবে ক্ষমতা ও গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আসীন হইল। কিন্তু ফ্রান্সের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী মনোবৃত্তির পরিচয়ে ইউরোপের শক্তিসমতা বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইল। ফ্রান্সের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার প্রয়োজনে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে শত্রুজোটের সৃষ্টি হইল। এই শত্রুজোটের মুখপাত্র হইল ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড। দৈবযোগে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের সিংহাসন একই নরপতি তৃতীয় উইলিয়মের অধিকারে আসায় ফ্রান্সকে তীব্র প্রতিপক্ষতার সম্মুখীন হইতে হইল। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের ইউট্রেক্টের সন্ধিতে ফরাসী প্রতিপত্তি বাধাপ্রাপ্ত হইল এবং অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে, সপ্তবর্ষ যুদ্ধে অর্থাৎ ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্সকে নবাভ্যুদিত প্রতিবেশী প্রাশিয়ার ও ইউরোপের বাহিরে ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া কোনও প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে হইল। অতঃপর আত্মরক্ষা-পরায়ণ ফ্রান্সকে একভাবেই অষ্ট্রিয়া, স্পেন, প্রাশিয়া ও ইংলণ্ডের প্রতিযোগিতা সহ্য করিতে হইল।

এই সকল বিরোধ-বিসম্বাদে এবং যুদ্ধবিগ্রহে ফ্রান্সের কেবল বাহিরের প্রতিপত্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইল না, দেশের রাজাকোষও শূন্যপ্রায় হইয়া আসিল। চতুর্দশ লুইর মৃত্যুর পরে পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুই ক্রমান্বয়ে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসিলেন। কেহই ফ্রান্সকে ক্রমাধিপতিত অবস্থা হইতে উদ্ধার করিতে পারিলেন না। রাজকোষ শূন্য হইয়া আসিয়াছিল। তাঁহারা ঋণ করিয়া বা সাধারণ প্রজার উপর করভার চাপাইয়া সাময়িক-ভাবে অর্থসঙ্কটের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের চেষ্টা করিলেন। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের

উন্নতির জন্য উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া কিংবা রাজদরবারের বিলাসব্যসনের ব্যয়বাহুল্য সঙ্কুচিত করিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তাঁহারা মোটেই চেষ্টা করিলেন না। রাজকোষে অর্থাভাব, সাধারণ প্রজা করভারে ক্লিষ্ট ও পিষ্ট, অথচ রাজপ্রাসাদের ব্যয়ের অঙ্ক স্ফীত হইতে স্ফীততর হইতে লাগিল।

এইভাবে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যখন জনসাধারণের অসন্তোষ ও অশ্রদ্ধা পুঞ্জীভূত হইতেছিল, তখন ফ্রান্সের তৎকালীন কয়েকন বিপ্লবী দার্শনিক ও সাহিত্যিক মন্টেস্কু, ভল্টেয়ার, রুশো প্রভৃতি তাঁহাদের রচনার মধ্য দিয়া প্রচলিত রাষ্ট্রজীবনের ও সামাজিক ব্যবস্থার দোষত্রুটির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন এবং কিভাবে এই সকল ত্রুটির নিরাকরণ হইতে পারে সেই বিপ্লবী পন্থারও ইঙ্গিত দিলেন। আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণ যে ভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া স্বাধীনতার অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাও ফরাসী জনসাধারণের মনে অত্যাচারী শাসন ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করার সঙ্কল্প দৃঢ়তর করিয়াছিল। এই ভাবে ফ্রান্সে আসন্ন বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া রহিল।

ইতিমধ্যে ফ্রান্সের নরপতি ষোড়শ লুই ফ্রান্সকে আর্থিক দুরবস্থার হাত হইতে উদ্ধারের জন্য দীর্ঘকাল উপেক্ষিত ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় পরিষদ ষ্টেটস জেনারেলের সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়া ইহার অধিবেশন আহ্বান করিলেন। এই আহ্বানের দ্বারা ফ্রান্সের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের ব্যর্থতা প্রমাণিত হইল এবং জনসাধারণের মনে দীর্ঘকাল সঞ্চিত বিক্ষোভ বিরাট অগ্ন্যুৎপাতের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। এই অগ্ন্যুৎপাতই ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লব নামে বিখ্যাত। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করিয়া এই বিপ্লবের ধারা নানাবিধ আলোড়ন বিলোড়ন, পতন-অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। বিপ্লবী প্লাবনের বেগে সামন্ত প্রথা, অভিজাতশ্রেণীর বিশেষ অধিকার, চার্চের আধিপত্য প্রভৃতি মধ্যযুগীয় অন্যায় অবিচার এমন কি, রাজা ও রাজতন্ত্র পর্যান্ত বিলুপ্ত হয়। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার জয়গানে ইউরোপ মুখরিত হইয়া উঠে। ফরাসী বিপ্লব ফ্রান্স ও ইউরোপের জীবনে এক নূতন যুগের উদ্বোধন করিল।

কিন্তু নূতন যুগকে নিরাপদে উপভোগ করার সুযোগ ফ্রান্সের বেশীদিন রহিল না। শীঘ্রই ফরাসী সাধারণতন্ত্র চারিদিক হইতে শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইল। ফ্রান্সের এই দুঃসময়ে ত্রাণকর্তারূপে নেপোলিয়নের আবির্ভাব হইল। ফ্রান্সের বিপক্ষে দলবদ্ধ রাষ্ট্রজোটের সঙ্গে যুদ্ধ করার দায়িত্ব নেপোলিয়ন গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ফ্রান্সের ইতিহাস ও নেপোলিয়নের কর্মকৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত হইয়া গেল। অলোকসামান্য প্রতিভাধর নেপোলিয়ন ফ্রান্সকে ঘরের ও বাহিরের সর্বপ্রকার বিপদ হইতে নিরাপদ

করিলেন এবং স্বীয় কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ ফ্রান্সের সম্রাটপদে অভিষিক্ত হইলেন। প্রায় দশবৎসরকাল নেপোলিয়ন ইংলণ্ড ব্যতীত প্রায় সমগ্র ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা হইয়া রহিলেন। সমগ্র ইউরোপ তাঁহার অঙ্গুলীহেলনের অধীনে আসিতে বাধ্য হইল। একমাত্র ইংলণ্ড নেপোলিয়নের উচ্চাশা পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করিয়া উন্নতশিরে দণ্ডায়মান রহিল এবং নেপোলিয়নের দম্ভ চূর্ণ করার জন্য ইউরোপে নেপোলিয়ন বিরোধী রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি করিল। পরিণামে ইংলণ্ডের একনিষ্ঠ বিরোধিতার সম্মুখে নেপোলিয়নকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল।

ফরাসী দার্শনিকবৃন্দ ও বিপ্লবী চিন্তাধারা:—ফ্রান্সের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লব আসিবার পূর্ব্বেই ভাব-জগতে বিপ্লব আসিয়া গিয়াছিল। অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে কয়েকজন সাহিত্যিক ও দার্শনিক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সমসাময়িক যুগের Rationalism বা যুক্তিবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। এই সব দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গী, ভাবাবেগ অথবা গতানুগতিকতা দ্বারা আচ্ছন্ন হয় নাই বলিয়া ইহাদের রচনার মধ্যে একটা নির্ভীক অনুসন্ধিৎসু ও বিপ্লবী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের রচনার মূল প্রতিপাদ্য ছিল ফ্রান্সের তদানীন্তন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার নানাবিধ অসামঞ্জস্য ও দোষত্রুটির উদ্ঘাটন; কি উপায়ে অসাম্য ও অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত অব্যবস্থার প্রতিকার হইতে পারে, সেই বিষয়েও তাঁহারা আলোকপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চিন্তাধারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত ফরাসী জনসাধারণের মনে রেখাপাত করে এবং আগামী বিপ্লবে মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুতির কাজে আশ্চর্য্যরূপে সাহায্য করে।

মণ্টেস্কু

ফরাসী দার্শনিকদের মধ্যে মণ্টেস্কু (১৬৮৯—১৭৫০) ইংলণ্ডের মত ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রবর্ত্তনের সমর্থক ছিলেন। তিনি ফ্রান্সের দায়িত্বহীন স্বৈরাচারী শাসনপদ্ধতির কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থের মধ্যে The Spirit of the Laws বা 'আইনের মৌলিক উদ্দেশ্য' পরবর্ত্তীকালে বিপ্লবী শাসনতন্ত্র প্রণয়নে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

ভলটেয়ার

বিপ্লবী সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভলটেয়ারের (১৬৯৪—১৭৭৮) প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ। তাঁহার ব্যঙ্গাত্মক ও প্রহসনাত্মক প্রবন্ধাবলীর মধ্য দিয়া সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রের অন্যায় অবিচারের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। স্বল্পবাক্যে অধিক ভাবদ্যোতক প্রকাশ কুশলতা তাঁহার রচনাতে ছিল। চার্চ্চের কুসংস্কার ও অনুদারতার বিরুদ্ধেই তাঁহার আক্রমণ ছিল সর্বাধিক। তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন। প্রচলিত ফরাসী শাসনব্যবস্থার বিপক্ষে জনসাধারণের মনকে বিরূপ করিতে তাঁহার মত অন্য কেহ এতখানি কৃতকার্য্য হন নাই। ভলটেয়ারের ন্যায় রুশোও

ও (১৭১২—'৭৮)-র প্রচলিত কোন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থা ছিল না। রুশোর মতে সমাজ বা রাষ্ট্র পারস্পরিক চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। স্ব স্ব কর্তব্য সম্বন্ধে শাসক ও শাসিতের মধ্যে এই অ-লিখিত চুক্তিই রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা শাসিতের উপর ন্যস্ত। 'মানুষ স্বাধীন সত্তা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সর্বত্রই মানুষ পরাধীন'—ইহা রুশোর বিখ্যাত Social Contract নামক গ্রন্থের মূল বক্তব্য। রুশোর এই উক্তি প্রচলিত সামাজিক বৈষম্য ও শ্রেণীগত অত্যাচারের মূলে কুঠারাঘাত করিল। এতদ্ব্যতীত ডিডেরট (১৭১৫—৮৪), ডি এলেমবার্ট, বিশ্বকোষ প্রণেতৃবর্গ ও অন্যান্য বহু লেখক তাঁহাদের রচনার মধ্য দিয়া ফ্রান্সের তদানীন্তন ধর্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমতকে সক্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

রুশো। ডিডেরট প্রভৃতি

ফরাসী দার্শনিকদের বাণী আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। ফ্রান্সের জনসাধারণ আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বেচ্ছা-সৈন্য ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিল এবং অন্য দেশের শৃঙ্খল মুক্তির দ্বারা নিজেদের অচরিতার্থ কামনা কথঞ্চিৎ তৃপ্ত হইল বলিয়া মনে করিল। আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জন ফরাসী বিপ্লবের আগমনে পরোক্ষ সহায়তা করিয়াছিল।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে রচনার প্রভাব

আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ:—(উত্তর আমেরিকার পূর্ব-উপকূলে ইংলণ্ডের যে তেরোটি উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল কালক্রমে তাহারা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক নীতি স্বার্থপরতাদোষে দুষ্ট ছিল। বৃটিশ সরকার উপনিবেশগুলিকে অর্থ-নৈতিক শোষণ দ্বারা সর্বতোভাবে পঙ্গু করার নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে বৃটিশ পার্লামেণ্ট ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে এক নৌ-আইন (Navigation Act.) পাশ করে, এই আইন অনুসারে আমেরিকার উপনিবেশিকগণ ইংলণ্ড ভিন্ন অপর কোন দেশের উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবে না বা ইংলণ্ড ভিন্ন অন্য কোন দেশে তাহাদের কাঁচা মাল বিক্রয় করিতে পারিবে না; আমদানী বা রপ্তানী বাণিজ্য ইংলণ্ডের মারফতে করিতে হইবে। এই আইনের ফলে আমেরিকার অর্থ-নৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হওয়ার উপক্রম হইল এবং মাতৃভূমির বিরুদ্ধে উপনিবেশিকদের মনে বিদ্বেষের ভাব সঞ্চারিত হইল।)

ইংলণ্ডের শোষণ নীতি

সপ্তবর্ষ যুদ্ধের ফলে কানাডা ফরাসীদের হস্তচ্যুত হইয়া ইংরেজদের অধিকারে

আসিয়াছিল। কানাডায় ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের মনে এযাবৎকাল যে ফরাসী আক্রমণের ভীতি ছিল তাহ দূর হইয়া যায়। (ফরাসী-ভীতি হইতে পরিত্রাণ লাভ করার ফলে শাসনের বিরুদ্ধে তাহাদের মনোভাব তীব্র হইয়া উঠে এবং তাহাদের মনে স্বাধীন জাতিরূপে পরিচিত হইবার তীব্র স্পৃহা জাগরিত হয়।)

ফরাসী আক্রমণের ভীতি দূর

(মাতৃভূমি ইংলণ্ড হইতে আমেরিকার সুদীর্ঘ ভৌগোলিক ব্যবধানও আমেরিকাকে ইংলণ্ডের শাসনাধীনে রাখার অন্তরায় ছিল। বৃটিশ পার্লামেণ্ট আইনতঃ আমেরিকার শাসনব্যবস্থার মালিক ছিল কিন্তু ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক বিধি অনুযায়ী পার্লামেণ্টে আমেরিকার কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি রাখার অধিকার ছিল না।)

ভৌগোলিক ব্যবধান

(সপ্তবর্ষ যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের প্রচুর অর্থব্যয় হওয়ায় জাতীয় ঋণও অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পূর্বে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের নৌ আইনের শর্ত তেমন কঠোরভাবে প্রযুক্ত হইত না। কিন্তু জাতীয় ঋণের পরিমাণ অত্যধিক থাকায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই আইন অত্যন্ত কঠোরতার সহিত কার্য্যকরী করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু এই চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হইল না; পরন্তু ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকার অসন্তোষের মাত্রা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।)

(নৌ-আইন যথাযথভাবে প্রযুক্ত না হওয়াতে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্রেনভিল ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে উপনিবেশিকদের উপর ষ্ট্যাম্প অ্যাক্ট নামে এক কর স্থাপন করিলেন। এই কর হইতে গৃহীত অর্থ হইতে আমেরিকার উপকূল রক্ষার জন্য বর্ণ নরী মোতায়েনের ব্যয় নির্বাহিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। এই আইন অনুযায়ী যে কোনও দলিল বৈধ করার জন্য সরকারী ষ্ট্যাম্প যুক্ত কাগজ ক্রয় করা বাধ্যতামূলক হইল। এই 'ষ্ট্যাম্প অ্যাক্ট' এর বিরুদ্ধে আমেরিকায় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। মৌলিক নীতিগত প্রশ্নেই আমেরিকার উপনিবেশগুলি ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিল।) ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে আমেরিকার কোন প্রতিনিধি নাই। সুতরাং তাহাদের প্রতিনিধিহীন পার্লামেণ্টের তাহাদের উপর কোন কর বসাইবার অধিকার নাই। (No taxation, no representation) সুতরাং আমেরিকা বৃটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক ধার্য্য কর দিতে অস্বীকার করিল।

'ষ্ট্যাম্প আইন'

(অতঃপর পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী রাকিংহাম ষ্ট্যাম্প অ্যাক্ট প্রত্যাহার করিলেন কিন্তু সেই সঙ্গে Declaratory Act নামে অপর একটি আইন প্রবর্তন করিয়া ঘোষণা

করিলেন যে, উপনিবেশিকদের উপর ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের ন্যায়সঙ্গত ভাবে কর ধার্য্য করার অধিকার আছে। কিন্তু এই ঘোষণায় উপনিবেশিকদের অসন্তোষ প্রশমিত হওয়ার পরিবর্তে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল।

স্ট্যাম্প অ্যাক্ট প্রত্যাহার

বাকিংহামের পরবর্তী মন্ত্রিসভার রাজস্বমন্ত্রী টাউনসেণ্ড আমেরিকায় আনীত চা, চিনি, কাগজ, কাচ প্রভৃতির উপর আমদানী শুল্ক ধার্য্য করিলে উপনিবেশিকদের মধ্যে তুমুল বিক্ষোভ উপস্থিত হইল এবং নানাস্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইল। উপনিবেশিকরা এই সকল দ্রব্যের উপর শুল্ক দিতে অস্বীকার করিল এবং ইংলণ্ডে উৎপন্ন কোন দ্রব্য যাহাতে আমেরিকায় ব্যবহৃত না হয় তজ্জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে লর্ড নর্থ প্রধানমন্ত্রী হইয়া ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে চা ব্যতীত অন্য দ্রব্যের উপর হইতে শুল্ক প্রত্যাহার করিলেও উপনিবেশিকদের অসন্তোষ দূরীভূত হইল না। বোষ্টন বন্দরে চা-বোঝাই একখানা জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হইলে কয়েকজন আমেরিকান রেড ইণ্ডিয়ানের ছদ্মবেশে জাহাজে উঠিয়া সমস্ত চায়ের বাক্স জলে নিক্ষেপ করিল। এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ হইয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বোষ্টন বন্দর বন্ধ করিয়া দিলেন এবং ম্যাসাচুসেট্‌সের স্বায়ত্তশাসনাধিকার কাড়িয়া লইল।

বাকিংহাম মন্ত্রিসভা

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এই জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য আমেরিকার তেরোটি উপনিবেশের মধ্যে জর্জিয়া ব্যতীত বারোটি উপনিবেশের প্রতিনিধিগণ ফিলাডেলফিয়া শহরে সমবেত হইলেন (১৭৭৪)। এই সভায় বৃটিশ পার্লামেণ্টের নিকট অন্যায়ের প্রতিকার দাবি করা হইল এবং ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করার প্রস্তাব গৃহীত হইল।

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে লেক্সিংটনে ইংরেজসৈন্য ও উপনিবেশিকদের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল এবং ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ম্যাসাচুসেট্‌সে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। ইংলণ্ডের নরপতি তৃতীয় জর্জ ও বৃটিশ পার্লামেণ্ট বিদ্রোহ দমন করার জন্য সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। উপনিবেশিকগণ জর্জ ওয়াশিংটনকে নেতৃত্বপদে বরণ করিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

উপনিবেশিকদের তীব্র আক্রমণের সম্মুখে পরাজিত হইয়া বৃটিশ সৈন্য ম্যাসাচুসেটস পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইল। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই ফিলাডেলফিয়া শহরে আমেরিকার কংগ্রেসের

আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা—১৭৭৬

তৃতীয় অধিবেশনে আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ সাত বৎসর চলিয়াছিল। এই যুদ্ধে ইংরেজেরা প্রথম দিকে জয়লাভ করিলেও পরিশেষে পরাজিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ ফ্রান্স, স্পেন ও হল্যাণ্ড আমেরিকার পক্ষে যোগদান করায় ইংরেজরা বিশেষ অসুবিধায় পড়িল।

যুদ্ধের পরিসমাপ্তি

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড কর্ণওয়ালিস ইয়র্ক-টাউনে আত্মসমর্পণ করায় ইংরেজদের প্রতিরোধ শক্তি নষ্ট হইয়া গেল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ভার্সাই-র সন্ধিতে ইংলণ্ড আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন উপনিবেশের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া নূতন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করিলেন। নূতন সংবিধান অনুযায়ী আমেরিকায় প্রজাতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইল। জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হইলেন।

ভার্সাইর সন্ধিতে স্বাধীনতা লাভ

আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ ও স্বাধীনতা লাভের ফলে ইংরেজদের পুরাতন ঔপনিবেশিক নীতি পরিবর্তিত হইয়া নূতন নীতি গৃহীত হইল। উপনিবেশিকদের স্বার্থ সম্বন্ধে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট উদাসীনতার পরিবর্তে অধিকতর উদারতা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে বাধ্য হইল। ফ্রান্সের উপরও আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রভাব গভীরভাবে অনুভূত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে যোগদানের ফলে ফ্রান্সের প্রভূত অর্থ ক্ষয় হইয়াছিল এবং ফ্রান্স গুরুতর ঋণগ্রস্ত হইয়াছিল। এই ঋণভার দূর করার অভিপ্রায়ে ফরাসী সরকার ফরাসী পার্লামেণ্ট ষ্টেটস জেনারেলের আহ্বান করায় ফরাসী বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল। আদর্শের দিক দিয়াও আমেরিকার স্বাধীনতা ফ্রান্সে স্বদেশপ্রেমিকদের অনুপ্রাণিত করিল এবং আমেরিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া স্বদেশে স্বেচ্ছাচারের অবসান করার জন্য তাহারা অগ্রসর হইল।

আমেরিকার স্বাধীনতার প্রভাব

ফরাসী বিপ্লবের কারণ :—ফরাসী বিপ্লব মুখ্যতঃ ফ্রান্সের স্বৈরাচারী শাসন ও সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা—ইহাই ছিল ফরাসী বিপ্লবের বাণী। এই বিপ্লব কোন আকস্মিকতার ফলে অথবা একটি কারণ বা ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া সঙ্ঘটিত হয় নাই। ফ্রান্স তথা ইউরোপের রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে বহুকাল ধরিয়া যে দুর্নীতি, অনাচার ও শ্রেণী বৈষম্য পুঞ্জীভূত হইতেছিল ফরাসী বিপ্লব উহাদের বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিবাদ। অসংখ্য কারণের সমাবেশে এই বিপ্লব সম্ভবপর হইয়াছিল।

রাজনৈতিক কারণ :—ফরাসী নরপতি চতুর্দশ লুইর মৃত্যুর পরে ফ্রান্সের সকল

রাজতন্ত্রের অধঃপতন ঘটিয়াছিল। চতুর্দশ লুই স্বৈরাচারী নরপতি হইলেও স্বীয় কৃতিত্বের বলে ফ্রান্সকে ইউরোপে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রজা-সাধারণ রাজানুগত্য প্রদর্শনে বিরত থাকে নাই। বরং তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও কার্যাক্ষমতাকে তাঁহারা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। কিন্তু পরবর্তী নরপতিদ্বয় পঞ্চদশ লুই এবং ষোড়শ লুই ব্যক্তিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন না। তাঁহারা দেশের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া বিলাসের স্রোতে নিমজ্জিত হইয়া রহিলেন এবং রাজ-কোষের অধিকাংশ অর্থ অপদার্থ পারিষদবর্গের সহিত স্ফূর্তি ও ইন্দ্রিয়-বিলাসিতা চরিতার্থ করিতে ব্যয় করিতেন। ইহাদের দুর্বলতার সুযোগে অভিজাত শ্রেণী পুনরায় ফ্রান্সের রাজশক্তি হস্তগত করিয়া ফেলিল। শাসন বিভাগের সর্বত্র অনাচার ও দুর্নীতি ব্যাপক আকারে দেখা দিল। অভিজাতশ্রেণী ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাজাকে যথেচ্ছাচারিতার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে প্ররোচিত করিতে লাগিল। ফ্রান্সের কোন নাগরিকের সম্পত্তি ও ব্যক্তিস্বাধীনতার কোন মূল্য রহিল না। রাজাও অভিজাতশ্রেণীর পরামর্শে বিনা বিচারে নাগরিকগণকে কারারুদ্ধ করিয়া ফ্রান্সের ব্যক্তি স্বাধীনতা বিপন্ন করিয়া তুলিলেন। ফ্রান্সের নরপতিদের অদূরদর্শিতা ও অপদার্থতা যে ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম কারণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সামাজিক কারণঃ -ফ্রান্সের সামাজিক জীবনেও ইউরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় ঘোরতর বৈষম্য ছিল। সমাজের তিন শ্রেণীর মধ্যে প্রথম দুইশ্রেণী ভূম্যধিকারী সামন্ত ও যাজকবর্গ জন্মসত্ত্বে রাষ্ট্র ও সমাজগত সকল সুবিধা ভোগ করিতেন। আর দেশের অপর সকল অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীকে উচ্চতর শ্রেণীদ্বয়ের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য অর্থপ্রদান ও কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা এই শ্রেণীর মনোরঞ্জন করিতে হইত। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে একাধিপত্যভোগ করিতেন। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণী যাহাদের লইয়া গঠিত ছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাহারা রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী করদানে পূর্ণ বা আংশিক নিষ্কৃতিলাভের অধিকারী ছিল। অধিকন্তু তাহারা রাষ্ট্রের উচ্চপদ বা রাজকীয় সকল প্রকার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ ভোগ করিত। ফ্রান্সের বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ও তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিক্ষাদীক্ষায়—মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রথম দুই শ্রেণী অপেক্ষা কোন অংশেই হীন ছিল না। তথাপি তাহাদিগকেও এই বৈষম্যজনিত অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ফ্রান্সে প্রকৃত শ্রেণী দুইটি ছিল—এক পক্ষ বিনা আয়াসে, বিনা প্রতিদানে ভোগ করিত, অপর পক্ষ বহু বিধিনিষেধে জর্জরিত হইয়াও প্রথম পক্ষের সুখ সুবিধার উপকরণ যোগাইত। ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে

অন্যান্য কারণ থাকিলেও সামাজিক জীবনের এই অসাম্য যে বিপ্লবের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।

অর্থনৈতিক কারণঃ ফরাসী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দুরবস্থাও বিপ্লব আনয়নে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্রের সার্থকতা আর্থিক পর্য্যাপ্তির উপর নির্ভর করে। কিন্তু এক শতাব্দীর অধিককাল বিপুল অর্থব্যয়ের ফলে ফ্রান্সের আর্থিক দুর্গতি উপস্থিত হইযাছিল। চতুর্দ্দশ লুই-র রাজত্বকালে যে চারিটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হয় তাহাতে রাজকোষ প্রায় শূন্য হইয়া যায়। বিদেশে ফ্রান্সের আর্থিক মর্য্যাদা মোটেই ভাল ছিল না—জাতীয় ঋণের মাত্রা ক্রমান্বয়ে স্ফীত হইতেছিল। পঞ্চদশ বা ষোড়শ লুই বাণিজ্য বা শিল্পসমৃদ্ধির দ্বারা জাতীয় আর্থিক উন্নয়নের জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। মাত্র করভার বৃদ্ধি করিয়া এই অর্থনৈতিক ঘাটতি পূরণ করিবার কোন উপায় ছিল না। কারণ জনসাধারণ করপ্রদানের সামর্থ্যের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়াছিল। একমাত্র উপায় ছিল উচ্চতর শ্রেণীর উপর কর স্থাপন করা। ষোড়শ লুই সার্বজনীন ভূমি-রাজস্বের প্রবর্তন করিয়া আর্থিক উন্নতি বিধানের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিধানের দ্বারা তাঁহাদিগকে বিশেষ সুবিধাভোগের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে বলিয়া তাহারা ইহার বিরোধিতা করিল। রাণী এন্টয়নেট ইহাদের পক্ষে ছিলেন। ইত্যবস্থায় নরপতি ষোড়শ লুই শোচনীয় আর্থিক দুর্গতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতির জন্য ১৭৬ বৎসর যাবৎ উপেক্ষিত প্রতিনিধি সভা ষ্টেটস্ জেনারেলের অধিবেশন আহ্বান করিলেন। এই সভা আহ্বানের দ্বারা ফ্রান্সে স্বৈরাচারের ব্যর্থতা প্রমাণিত হইল এবং বিপ্লব আসন্ন হইয়া আসিল।

দার্শনিক চিন্তাধারার প্রভাবঃ—উপরিউক্ত কারণসমূহের ফলে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যখন সব দিক দিয়া বিপর্যস্ত তখন মন্টেস্কু, রুশো, ভলটেয়ার, ডিডেরট ও বিশ্বকোষ প্রণেতৃবর্গ তাঁহাদের রচনার মধ্য দিয়া জনসাধারণকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুরবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করাইতেছিলেন এবং এই সমস্ত অন্যায় অবিচারের দায়িত্ব কাহার ও প্রতিকারের উপায় কি সে সম্বন্ধেও ইঙ্গিত করিতে ত্রুটি করিলেন না। রুশো তাঁহার মতবাদের মধ্য দিয়া প্রচার করিতেন যে পারস্পরিক কর্তব্যের চুক্তির উপর রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। এক পক্ষ সেই চুক্তি অনুযায়ী কর্তব্যপালন না করিলে সেই চুক্তি বাতিল হইয়া যায়। অর্থাৎ সরকার জনকল্যাণবিরোধী কার্য করিলে তাহাকে পদচ্যুত করার অধিকার জনসাধারণের আছে। ইহাদের উত্তেজনাপূর্ণ, শ্লেষাত্মক অথচ যুক্তিপ্রধান রচনা জনসাধারণকে অত্যধিকরূপে প্রভাবিত করিয়া বিপ্লবাত্মক ক্ষেত্র প্রস্তুতির সহায়তা করিল।

আমেরিকার স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রভাব :—বিদ্রোহী উপনিবেশিকগণ কর্তৃক আমেরিকার স্বাধীন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা যে আসন্ন বিপ্লবের জন্য ফরাসী জনসাধারণকে প্রেরণা দান করিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমেরিকার উপনিবেশিকগণ যে ভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতার অভীষ্ট লক্ষ্যে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাও ফরাসী জনসাধারণের মনে অত্যাচারী শাসনব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করার সঙ্কল্প দৃঢ়তর করিয়াছিল। লাফায়েৎ প্রমুখ বহু ফরাসী স্বেচ্ছাসৈনিক ঐ যুদ্ধে যোগদান করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিল এবং এই অভিজ্ঞতা বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে সহায়তা করিয়াছিল।

ইংলণ্ডের ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের গৌরবজনক বিপ্লবও ফরাসী জনসাধারণকে তাহাদের অত্যাচারী শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধনার চেষ্টায় উৎসাহিত করিয়াছিল।

বিপ্লব :—আর্থিক দুরবস্থা হইতে মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণের জন্য ষোড়শ লুই প্রতিনিধি সভা ষ্টেটস্ জেনারেলের অধিবেশন আহ্বান করিলেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ৫ই মে তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে এই মহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই মহাসভার পুরাতন রীতি অনুযায়ী শ্রেণীগতভাবে প্রতিনিধিরা আহূত হইয়াছিলেন এবং ভূম্যধিকারী, যাজক ও সাধারণ (তৃতীয়) ইহাদের প্রত্যেকটি শ্রেণী মাত্র একটি ভোটের অধিকারী ছিলেন। প্রত্যেক সদস্যের স্বতন্ত্র ভোট গণনা করা হইত না। পৃথকভাবে প্রত্যেক সদস্যের ভোট গণনার পরিবর্তে সমষ্টিগতভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর ভোট গণনা হইলে প্রথম দুই শ্রেণী ভূম্যধিকারী ও যাজক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ তৃতীয় শ্রেণীর কোন সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করা সম্ভব হইবে না ইহা বিবেচনা করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ প্রত্যেক সদস্যের ভোট স্বতন্ত্রভাবে গণনা করা হউক এই দাবী করিলেন। রাজা এবং প্রথম দুই শ্রেণী ইহাতে আপত্তি করিলেও সাধারণ শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ নিজেদের ফ্রান্সের ন্যাশানাল এসেম্বলী বা জাতীয় পরিষদরূপে ঘোষণা করিয়া অপর দুই শ্রেণীর প্রতিনিধিগণকে তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিতে আহ্বান করিল। মীরাবো-র নেতৃত্বে তৃতীয় শ্রেণীর অনমনীয় মনোভাব দেখিয়া রাজা তাহাদের দাবি মানিয়া লইলেন।

ষ্টেটস জেনারেল আহূত

জাতীয় পরিষদ

ইতিমধ্যে ষ্টেটস্ জেনারেল যখন জাতীয় পরিষদরূপে আপন দাবি প্রতিষ্ঠায় ব্যাপৃত তখন জনসাধারণ প্যারিসে ও ফ্রান্সের অন্যত্র অভ্যুত্থিত হইয়া অভিজাতশ্রেণী, সরকারী কর্মচারী ও আবাসাদির উপর আক্রমণ চালাইতে আরম্ভ করে। জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্তভাবেই শান্তিরক্ষার জন্য

প্যারিসে ও অন্যত্র বিক্ষোভ

লাফায়েৎ-এর নেতৃত্বে এক জাতীয়-রক্ষীদল (National Guard) সৃষ্টি করিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে প্যারিসের এক উন্মত্ত জনতা বাস্তিল নামক এক

বাস্তিল কারাদুর্গ জনতা কর্তৃক আক্রমণ

কারাদুর্গ আক্রমণ করিয়া উহা ধ্বংস করিল। বাস্তিলে রাজার আদেশে বিনা বিচারে বন্দীদের রাখা হইত এই জন্য জনসাধারণ ইহাকে স্বেচ্ছাতন্ত্রের প্রতীকরূপে মনে করিত। বাস্তিল দুর্গের পতন জনমতের সাফল্যরূপে সর্বত্র অভিনন্দিত হইল। অতঃপর প্যারিসের জনতা ভার্সাই-এর রাজসভা হইতে রাজা ও রাজপরিবারকে বলপূর্বক প্যারিসে আনিয়া এক প্রকার বন্দী অবস্থায় রাখিয়া দিল।

বাস্তিল-দুর্গ ধ্বংস

অতঃপর জাতীয়-পরিষদ সংবিধান-পরিষদ নাম ধারণ করিয়া ফ্রান্সের জন্য একটি নূতন সংবিধান রচনা করিলেন। এই নূতন সংবিধান অনুযায়ী ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রবর্তিত হইল। রাজার বিভিন্ন ক্ষমতা হ্রাস করিয়া সমস্ত ক্ষমতা ফরাসী জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিমূলক' আইন-সভার হস্তে ন্যস্ত করা হইল। এতদ্ব্যতীত সংবিধান-পরিষদ আমেরিকার অনুকরণে মানবাধিকারের সাম্যনীতি ঘোষণা

জাতীয় পরিষদ কর্তৃক নূতন সংবিধান রচনা

করিলেন। আর্থিক সমস্যা দূরীকরণের জন্য চার্চের অধিকারভুক্ত সমস্ত ভূসম্পত্তি রাষ্ট্রসাৎ করা হইল এবং চার্চকে রাষ্ট্রের অধীনে আনয়ন করা হইল। ইতিপূর্বেই জাতীয় পরিষদ ফ্রান্স হইতে সামন্ত প্রথার বিলোপ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

নূতন সংবিধান অনুযায়ী যে নূতন আইন-সভা গঠিত হইল তাহার প্রতিনিধিদের মধ্যে কেহই শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছিল না। এই আইন-সভার তিনটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে 'গিরণ্ডিষ্ট' ও 'জেকোবিন' এই দুইটি রাজনৈতিক দলই বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিল। জেকোবিন দল রাজতন্ত্রের উচ্ছেদকারী এবং সাধারণতন্ত্রের সমর্থক ছিল এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহারা সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপেও পশ্চাদপদ ছিল না। সুতরাং অচিরেই আইন-সভা ও রাজার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল এবং উভয় পক্ষের বিরোধ বাড়িয়া চলিল। এই সময়ে লুই একটি ভুল করিলেন। তিনি একদিন সপরিবারে ফ্রান্স হইতে গোপনে পলায়নের চেষ্টা করিতে গিয়া ধরা পড়িলেন এবং পুনরায় বন্দী অবস্থায় প্যারিসে আনীত হইলেন। রাজার পলায়নের প্রচেষ্টায় ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ আশঙ্কাপূর্ণ হইল। জনসাধারণের মনে এই ধারণা হইল, দেশের রাজা জনসাধারণের দ্বারা রচিত শাসনতন্ত্রের বিরোধী। রাজাকে বাদ দিয়া শাসনতন্ত্র রচনা অসম্ভব নহে এই মনোভাব অপ্রকাশিত রহিল না। রাজানুগত্যে জনসাধারণের আস্থা কমিয়া আসিল এবং সংবিধান পরিষদে রোবেস্পীয়ার ও ড্যাণ্টনের নেতৃত্বে এক সাধারণতন্ত্রী দলের উদ্ভব হইল। ইতিমধ্যে দেশের সর্বত্র অশান্তি ও অরাজকতা ব্যাপকতর আকারে দেখা দিলে আইন-সভা জাতীয় বাহিনীকে অস্ত্রধারণের আদেশ দিলেন এবং 'বিপ্লবী কম্যুন' নামে এক উগ্রপন্থী সংস্থা প্যারিসের শাসনভার গ্রহণ করিল।

ফ্রান্সের রাণী মেরী এণ্টয়নেট

এযাবৎকাল ইউরোপ নিরপেক্ষ দর্শকের ন্যায় ফ্রান্সের ঘটনাবলী লক্ষ্য করিতেছিল। কিন্তু অচিরেই ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ ফরাসী বিপ্লবের সহিত জড়াইয়া পড়িল। ফ্রান্সের রাণী মেরী এণ্টয়নেট অষ্ট্রিয়ার রাজার ভগ্নী ছিলেন। রাজা ও রাণীর প্রাণনাশের আশঙ্কায় অষ্ট্রিয়ার নরপতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতে

পারিলেন না, তিনি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই ব্যাপারে প্রাশিয়াও অষ্ট্রিয়ার সহযোগী হইল। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট প্রাশিয়ার সহযোগে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে পিলনিজের ঘোষণায় প্রচার করিলেন যে ফ্রান্সের রাজার স্বার্থ ইউরোপের অন্যান্য দেশের রাজার সমতুল্য। প্রয়োজন হইলে ইউরোপের অপরাপর রাজার সম্মতি ও সহযোগিতায় অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া ফ্রান্সের নরপতি স্বার্থরক্ষার জন্য অভিযান করিতে পারে। এই ঘোষণায় ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইল এবং ফ্রান্সের আইন-পরিষদ অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে ষোড়শবর্ষক যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইল। ফরাসীবাহিনী যুদ্ধের প্রথম দিকে অশিক্ষিত থাকায় পরাজিত হইতে লাগিল, শত্রুবাহিনী ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে প্যারিসের দিকে অগ্রগামী প্রাশিয়ার সেনাধ্যক্ষ ডিউক অফ্ ব্রান্সউইক এক হুঁসিয়ার বাণী প্রচার করিলেন যে, প্যারিসের অধিবাসিগণ যদি রাজপরিবারের প্রতি কোন অত্যাচার করে তাহা হইলে তিনি প্যারিসের জনসাধারণকে সমুচিত শিক্ষা দিবেন এবং রাজধানী ধ্বংস করিবেন। ইহাতে ক্ষিপ্ত ফরাসী জনতা আক্রমণকারী শত্রুর সঙ্গে রাজার চক্রান্ত সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া প্যারিসের রাজপ্রাসাদ 'ট্যুইলারিস' আক্রমণ করিয়া রাজার দেহরক্ষীদিগকে হত্যা করিল। রাজা ও রাণী ভীত হইয়া সন্নিহিত আইন-পরিষদগৃহে আশ্রয় লইলেন। উন্মত্ত জনতা আইন-সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া প্রতিনিধিগণকে রাজতন্ত্রের অবসান ঘোষণা করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য করিল। রাজা ও রাণী বন্দী হইলেন। রাজা পদচ্যুত হওয়ার ফলে ফ্রান্স একটি সাধারণতান্ত্রিক দেশে পরিণত হইল এবং সাধারণতন্ত্রের নূতনশাসনতন্ত্র রচিত হওয়ার জন্য একটি নূতন জাতীয়সভা (National Convention) আহ্বান করা হইল।

নূতন সংবিধান রচনার জন্য আহূত জাতীয় সভায় উগ্রপন্থীদেরই প্রাধান্য ছিল। তাহারা ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজার বিচারের জন্য ব্যবস্থা করিল। রাজাকে উদ্ধারের জন্য ফ্রান্সের অভ্যন্তরে যখন শত্রুবাহিনী প্রবেশ করিয়াছে, তখন রাজাকে জীবিত রাখা আর নিরাপদ নহে মনে করিয়া রাজার বিচারের প্রহসন করা হইল। রাজা দেশের শত্রুর সঙ্গে যোগদান করিয়া দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন এই অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ২১ শে জানুয়ারী ষোড়শ লুই বধ্যযন্ত্র গিলটিনে প্রাণ দিলেন।

রাজার বিচার ও প্রাণদণ্ড—১৭৯৩

ফ্রান্সের নূতন সাধারণতন্ত্র মাত্র ফ্রান্সের রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া ক্ষান্ত রহিল না। বিভিন্ন ঘোষণাপত্রের দ্বারা ইউরোপের জনসাধারণকে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিল। এইভাবে বিপ্লব প্রচারধর্মী হওয়াতে

ইউরোপের রাজতান্ত্রিক দেশসমূহ শঙ্কিত হইল এবং ফ্রান্সকে ধ্বংস করার জন্য রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি করিল। ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, স্পেন, পর্টুগাল, সার্ডিনিয়া, নেপলস, টাস্কানী প্রভৃতি দেশ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইল। শুধু বাহিরে নহে ফ্রান্সের অভ্যন্তরেও গোলযোগের অভাব ছিল না। ফ্রান্সের কয়েকটি প্রদেশ সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল; উপরন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যেও কর্মপন্থা লইয়া

ফ্রান্সের বিপক্ষে রাষ্ট্রজোট
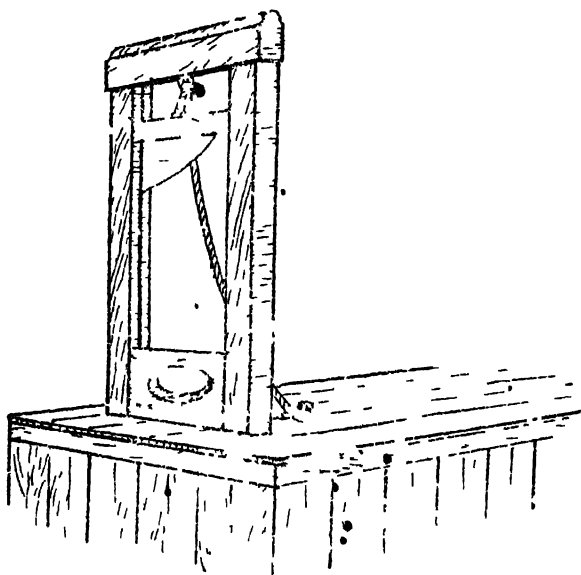
বধ্যযন্ত্র গিলোটিন

বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হইল। এই সকল প্রতিকূল আভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণের হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করার জন্য সাধারণতন্ত্রের বামপন্থী নেতৃবর্গ এক কঠোর শাসনব্যবস্থার বন্দোবস্ত করিলেন। এই বিভীষিকাপূর্ণ শাসনকাল তের মাস ধরিয়া চলিল। ইহা সন্ত্রাস রাজত্ব (Reign of Terror) নামে পরিচিত। রোবেস্পিয়ার, ড্যান্টন ও ম্যারাট এই তিন জন নেতার নির্দেশে দেশ রক্ষার নামে সহস্র সহস্র নরনারীকে বিচারের প্রহসন করিয়া গিলোটিনে হত্যা করা হইল। এই সন্ত্রাসময় রাজত্ব নিরর্থক হয় নাই। ইহার ফলে ফ্রান্সের জাতীয় সংহতি ফিরিয়া

আসিল এবং ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অনৈক্য দূর হইল। সাধারণতন্ত্রের সেনাবাহিনী ফ্রান্স আক্রমণকারী প্রথম ইউরোপীয় রাষ্ট্রজোটকে অদ্ভুত সামরিক ক্ষমতা ও তৎপরতার সঙ্গে পরাজিত করিয়া আপাততঃ সাধারণতন্ত্রকে রক্ষা করিল। ইংলণ্ড ডানকার্ক অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাদপসরণ করিল এবং টুর্লো শহর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। অষ্ট্রিয়াও দুইটি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইল এবং স্পেন ও প্রাশিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হইল (Treaty of Basel 17' 5)।

অতঃপর 'ন্যাশনাল কন্‌ভেন্‌শান' বা জাতীয় সভা সাধারণতন্ত্রী ফ্রান্সের জন্য নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিল। রাষ্ট্রের নির্বাহক ক্ষমতা ডাইরেক্টরী নামে পাঁচ ব্যক্তির সম্মিলিত এক সংস্থার উপর ন্যস্ত হইল। রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের দায়িত্ব দুইটি কক্ষবিশিষ্ট একটি আইন সভার উপর অর্পিত হইল।

নেপোলিয়ন :—এই নূতন শাসনতন্ত্র প্রচলিত হওয়ার অল্প কয়েকদিন বাদেই প্যারিসের এক বিরাট জনতা জাতীয় সভার অধিবেশনের স্থান টুইলারিসের রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয় (৫, অক্টোবর, ১৭০৫)। এই জনতার আক্রমণ হইতে জাতীয় সভাকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেপোলিয়ন বোনাপার্টি নামক এক তরুণ সেনানীর হস্তে অর্পিত হইলে তিনি আশ্চর্য্য বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষিপ্রতার পরিচয় দিয়া অল্প সংখ্যক সৈন্যের সাহায্যে আক্রমণোদ্যত জনতার হাত হইতে জাতীয় সভাকে রক্ষা করেন।

নেপোলিয়ন

নেপোলিয়ন ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট কর্সিকা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। কর্সিকা ইটালীর জেনোয়া-র অধিকারভুক্ত ছিল, কিন্তু ফ্রান্স এই দ্বীপটি অধিকার করে। তাঁহার পিতা কার্লো বোনাপার্টি কর্সিকায় স্বাধীনতার জন্য ফ্রান্সের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিয়াছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ফ্রান্স কর্সিকাকে ফ্রান্সের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে সমাধিকার প্রদান করিলে কর্সিকা ফ্রান্সের শাসন মানিয়া লয়। নেপোলিয়ন প্রথমে ব্রিয়েন ও পরে প্যারিসের সামরিক শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভ করেন। তিনি শুধু সামরিক শিক্ষায় আগ্রহান্বিত ছিলেন তাহা নহে। প্লেটো, প্লুটার্ক প্রভৃতির রচনা এবং ইতিহাস, দর্শন ও গণিত তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে যখন টুর্লো বন্দর ফরাসী সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বৃটিশ নৌ-বহরের সাহায্য গ্রহণ করে

তখন নেপোলিয়নের নেতৃত্বে ফরাসী গোলন্দাজ বাহিনী বৃটিশ নৌবহরকে টুলোঁ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করে। ফরাসী সরকার তাঁহাকে এই কৃতিত্বের জন্য ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের পদে উন্নীত করেন। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের নেতা কর্তৃক যখন ফরাসী জাতীয় সভা আক্রান্ত হয়, সেই সময়ে নেপোলিয়ন কৃতিত্বের সঙ্গে এই বিদ্রোহ দমন করিয়া জনসাধারণের ও ডাইরেক্টরীর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন।

ইটালী অভিযান

ডাইরেক্টরীর শাসনকালে ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইটালীতে অষ্ট্রিয়ার আধিপত্য বিনাশের জন্য অষ্ট্রিয়া সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে নেপোলিয়ন ইটালীতে প্রেরিত হন। লোদী, আর্কোলা ও রিভলির যুদ্ধে অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করিয়া নেপোলিয়ন ইটালীতে অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য নষ্ট করেন। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে ক্যাম্পো ফর্মিও-র সন্ধিতে অষ্ট্রিয়া ইটালীর উপর আধিপত্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

অষ্ট্রিয়ার পরাজয়

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন রোম অধিকার করিয়া রোমে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন।

মিশর অভিযান

ফরাসী সাধারণতন্ত্রের অন্যতম শত্রু ইংলণ্ড তখনও ফ্রান্সের নিকট নতি স্বীকার করে নাই। ইংলণ্ডকে অর্থনৈতিক দিকদিয়া জব্দ করার জন্য নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য অধিকার উদ্দেশ্যে প্রাচ্য অভিযানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মিশর অধিকার করিয়া সিরিয়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। মিশরে তিনি পিরামিডের যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন, কিন্তু ফ্রান্সের নৌ-শক্তির দুর্বলতার জন্য ফরাসী নৌবহর নীলনদের যুদ্ধে বৃটিশ সেনাধ্যক্ষ নেলসনের হস্তে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল।

নীলনদের যুদ্ধ

নেপোলিয়নের অনুপস্থিতির সময়ে ডাইরেক্টরীর বিবাদ-বিসম্বাদ ও অকর্মণ্যতার সুযোগে পুনরায় ফ্রান্সের বিপক্ষে রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি হয়। অপদার্থ ডাইরেক্টরী আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিপক্ষ রাষ্ট্রজোট সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা করিতে অসমর্থ হইয়া নেপোলিয়নকে প্রাচ্য অভিযান হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিল। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া নেপোলিয়ন ডাইরেক্টরী বাতিল করিয়া দিলেন এবং ফ্রান্সের নূতন শাসনতন্ত্র কনসালেট (Consulate)-এর প্রথম কন্সাল হইয়া ফ্রান্সের প্রকৃত ভাগ্যবিধাতা হইয়া পড়িলেন (১৭৯৯)। নেপোলিয়নের রণকৌশল ও কূটনৈতিক কৃতিত্বের বলে দ্বিতীয় রাষ্ট্রজোটের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া গেল। অষ্ট্রিয়ার বিপক্ষে রণে অবতীর্ণ হইয়া নেপোলিয়ন দ্বিতীয় বার ইটালী অভিযান করিলেন এবং ম্যারেঙ্গো ও হোহেনলিণ্ডনের যুদ্ধে অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য করিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডও আমিয়েন্স এর সন্ধির দ্বারা ফ্রান্সের সঙ্গে শত্রুতা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন যাবজ্জীবন প্রধান কন্সাল নিযুক্ত হইলেন এবং ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর ফ্রান্সের সম্রাট পদবী গ্রহণ করেন এবং ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের পতনের পূর্ব পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

অষ্ট্রিয়া ও ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি হইবার পর নেপোলিয়ন ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও বিবিধ উন্নতিমূলক কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের বহু সামাজিক অন্তরায় অন্তর্হিত হইয়াছিল। এই সমস্ত বৈষম্য ও সামাজিক অন্তরায় স্থায়ীভাবে বিদূরিত হইয়া যাহাতে ফ্রান্সের কল্যাণ হয়, তজ্জন্য নেপোলিয়ন উক্ত পরিবর্ত্তন সরকারীভাবে স্বীকার করেন এবং পরিবর্ত্তনগুলিকে আইনের মর্য্যাদা প্রদান করেন। তাঁহার সংস্কারের ফলে ফ্রান্সে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তিনি অনেকাংশে সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমতা, গুণানুসারে সরকারী চাকুরীতে সর্বশ্রেণীর জন্য প্রবেশাধিকার প্রভৃতি গণতান্ত্রিক অধিকার সকলকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত 'ন্যায়-সংহিতা' (Code Napoleon) ফ্রান্সের তথা ইউরোপের সামাজিক প্রগতির পথে সহায়ক হইয়াছিল। ইহার ফলে আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান এই নীতি সর্বত্র প্রসারিত হইল এবং সামন্তযুগীয় শ্রেণীবৈষম্য ইউরোপ হইতে লুপ্ত হইল। নেপোলিয়নের সিভিল কোডের মূলনীতি অথবা অধিকাংশ বিধান পরবর্ত্তীকালে ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রে গৃহীত হইয়াছিল। ফ্রান্সের আর্থিক সুবিধার জন্য তিনি 'ব্যাঙ্ক অফ্ ফ্রান্স' প্রতিষ্ঠা করেন। এতদ্ব্যতীত নেপোলিয়ন লিজিয়ন অফ অনার (Legion of Honour) সৃষ্টি করিয়া কেবলমাত্র গুণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নূতন এক অভিজাত সমাজের সৃষ্টি করেন। জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। জনশিক্ষার জন্য তিনি মিউজিয়ম, আর্ট গ্যালারী, ইউনিভারসিটি অফ ফ্রান্স' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ফ্রান্সের পুরাতন কীর্তিসৌধ সমূহের সংস্কার করিয়া এবং নূতন কীর্ত্তিসৌধ নির্মাণ করিয়া তিনি প্যারিস ও ফ্রান্সের অন্যান্য শহরের শ্রীবর্দ্ধন করেন। নূতন নূতন রাস্তাঘাট নির্মাণ, খাল-খনন, পোতাশ্রয়গুলির সংস্কার এবং শিক্ষার উন্নতির জন্য বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি নেপোলিয়নের কর্মকৃতির অন্যান্য দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে।

নেপোলিয়নের সংস্কার

কেবলমাত্র ফ্রান্সের জন্য নহে ইউরোপের জন্যও নেপোলিয়ন যাহা করিয়াছেন, তাহার মূল্য কম নহে। ইউরোপের যে সকল রাষ্ট্রের উপর তিনি অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, সর্বত্র তিনি ফ্রান্সের অনুরূপ আইনের প্রবর্ত্তন-সমাজ সংস্কার ও সামন্তযুগীয় অবিচারের উচ্ছেদে যত্নবান হইয়াছিলেন। তাঁহার সংস্পর্শে আসার জন্যই এই সকল রাষ্ট্রে মধ্যযুগের

বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর অবসান হইয়া আধুনিক যুগের সূত্রপাত হইয়াছিল। উপরন্তু জার্মানী ও ইটালীর উত্তরকালীন ঐক্যের জন্য নেপোলিয়নের দান স্মরণীয়। তাঁহার হস্তক্ষেপের ফলেই এই দুই রাষ্ট্রের জটিল রাজনৈতিক ব্যবস্থা সংক্ষিপ্ত হইয়া ভবিষ্যৎ ঐক্যের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল।

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ও পতন, ১৮০৪—১৮১৫ :—ফ্রান্সকে সাধারণতন্ত্র হইতে সাম্রাজ্যে পরিণত হইতে দেখিয়া ইউরোপের বিভিন্ন শক্তি আবার নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সমবেত হইল। ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া প্রাশিয়া, রাশিয়া এই রাষ্ট্রচতুষ্টয়ই জোটবদ্ধ হইয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হইল। নৌশক্তিতে শক্তিমান ইংলণ্ডকে পরাজিত করার জন্য নেপোলিয়ন ফ্রান্সের বুলোন বন্দরে রণবহর সজ্জিত করিলেন, কিন্তু ট্রাফালগারের জলযুদ্ধে (১৮০৫) ফ্রান্সের নৌবহর বৃটিশ নৌ-সেনাপতি নেলসনের হস্তে পরাজিত হওয়াতে ইংলণ্ড অপরাজিত রহিল। অতঃপর নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়াকে অষ্টারলিজ-এর যুদ্ধে (১৮০৫) চূড়ান্ত পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন। প্রাশিয়া জেনা ও অষ্টারলিজ-এর যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হইয়া নেপোলিয়নের আধিপত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। রাশিয়া পুনরায় ফ্রীডল্যাণ্ডের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া টিলসিটের সন্ধিতে নেপোলিয়নের সঙ্গে শত্রুতা পরিহার করিতে সম্মত হইল। এইরূপে যুদ্ধ বা সন্ধির শর্তের দ্বারা নেপোলিয়ন ইউরোপে তাঁহার অবিসংবাদিত প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন। অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া ফ্রান্সের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ রহিল আর রাশিয়া ফ্রান্সের মিত্ররাষ্ট্ররূপে নেপোলিয়নের ইউরোপে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় সহায়ক হইল। অতঃপর নেপোলিয়ন স্বেচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন রাষ্ট্রের সীমানা পরিবর্তিত করিয়া নূতন নূতন রাষ্ট্র সৃষ্টি করিলেন। এই সমস্ত তাঁবেদার রাষ্ট্র তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত শাসকের অধীনে তাহার ব্যক্তিগত ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হইতে লাগিল। ওয়েষ্টফেলিয়ার রাজ্য, বার্গের গ্রাণ্ড ডাচি, গ্রাণ্ড ডাচি অভ ওয়ার্স, ইটালী, নেপলস্, রাইনের রাষ্ট্রসংঘ প্রভৃতি নেপোলিয়ন সৃষ্ট নূতন রাষ্ট্রসমূহের অন্যতম। এতদ্ব্যতীত হল্যাণ্ড, স্পেন ও পর্টুগালের সিংহাসনেও নেপোলিয়নের মনোনীত ব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই ভাবে এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হইতে লাগিল এবং প্রয়োজনানুসারে তিনি স্বয়ং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের শাসনকর্তার নিয়োগ ও পরিবর্তন করিতে লাগিলেন।

ইউরোপে একমাত্র ইংলণ্ডই নেপোলিয়নের আজ্ঞাবহ হইতে সম্মত হইল না। নেপোলিয়ন ইংলণ্ডকে অবনত করার জন্য অর্থনৈতিক অবরোধের নীতি অবলম্বন করিলেন। তিনি এক ঘোষণা-পত্রের দ্বারা ইউরোপের কোন বন্দরে ইংলণ্ডের উৎপন্ন

দ্রব্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই অর্থ-নৈতিক অবরোধের ব্যাপার 'কন্টিনেন্টাল সিস্টেম' (Continental System) নামে খ্যাত, কিন্তু নেপোলিয়নের এই অবরোধ সার্থক হইল না। তৎকালীন ইংলণ্ড শিল্পবাণিজ্যে ইউরোপে অদ্বিতীয় ছিল। ইংলণ্ডের শিল্পপণ্য দ্বারা ইউরোপের অন্যান্য দেশ তাহাদের প্রয়োজন মিটাইত। এই ব্যবস্থায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশ অভূতপূর্ব আর্থিক বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইল এবং নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। এই অসন্তোষ ক্রমশঃ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইউরোপকে সংঘবদ্ধ করিল। পরিশেষে মিলিত শত্রুপক্ষের বিপক্ষতায় নেপোলিয়ন ওয়াটার্লু-র যুদ্ধে পরাজিত ও ফ্রান্সের সিংহাসনচ্যুত হইলেন।

ইংলণ্ডকে পদানত করার জন্য অর্থনৈতিক অবরোধ

কন্টিনেন্টাল সিস্টেম

নেপোলিয়নের পতন :—নেপোলিয়নের পতনের পশ্চাতে তাঁহার স্বকৃত বহু ত্রুটি ও অপরাপর যথেষ্ট কারণ ছিল। প্রথমতঃ তিনি ইউরোপে তাঁহার নিজের প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য যে বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, উহার মধ্যেই তাঁহার পতনের বীজ নিহিত ছিল। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উচ্চাশা তাঁহাকে বাস্তব প্রতিকূলতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইউরোপের জনগণকে পদদলিত করিয়া দীর্ঘকাল ইউরোপকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি যে ভাবে ন্যায়নীতির সীমা লঙ্ঘন করিয়া রাজ্যবিস্তারে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহার স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ সমগ্র ইউরোপে তাঁহার বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ ও প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হইয়াছিল। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে ইউরোপে বিভিন্ন সময়ে যে সকল রাষ্ট্র-জোটের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাদের বিরোধিতার ফলেই নেপোলিয়নের পতন সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য সামরিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি দৃকপাত না করিয়া তিনি সামরিক শক্তির সাহায্যে তাহাদিগকে স্বীয় আধিপত্যের অধীনে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন তাঁহার সাম্রাজ্যের এই দুর্বলতা সম্যকরূপে অনুধাবন করিতে পারেন নাই। যথাসময়ে সাম্রাজ্যের অধীন বিভিন্ন দেশের জনসাধারণ জাতীয়তার ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান করিল। এই জাতীয় প্রতিরোধ প্রথমে স্পেনে দেখা দেয়; স্পেনের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রাশিয়া, ইটালী এবং অপরাপর অঞ্চলের

(১) অপরিমিত উচ্চাশা

(২) তাঁহার সাম্রাজ্য মাত্র সামরিক নীতির উপর

অধিবাসিগণও দুর্জয় সঙ্কল্প লইয়া ফরাসী সম্রাটের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইল, তখন নেপোলিয়নের পক্ষে এই জাতীয় প্রতিরোধের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া সম্ভবপর হইল না। তৃতীয়তঃ, নেপোলিয়নের স্বকৃত বহুত্রুটিপূর্ণ কার্য্য তাঁহার পতনে সহায়ক হইয়াছিল। তাঁহার 'কন্টিনেন্টাল সিস্টেম' ইউরোপের বাণিজ্যক্ষেত্রে এক বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণকে ভয়ানক দুরবস্থার সম্মুখীন করিল। জিনিস-পত্র দুর্লভ ও দুর্মূল্য হওয়াতে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দারুণ ঘৃণ্য মনোভাবের সৃষ্টি হইল। কন্টিনেন্টাল সিস্টেমকে কার্য্যকরী করিবার জন্য নেপোলিয়ন যে আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। পর্টুগাল আক্রমণ, স্পেনের সিংহাসন অধিকার, পোপের সঙ্গে বিবাদ এবং সর্বোপরি রাশিয়ার জারের শত্রুতা অর্জন সমস্তই কন্টিনেন্টাল সিস্টেমকে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত হইয়াছিল।

জাতীয় প্রতিরোধ

(৩) স্বকৃত বহু ত্রুটি

কন্টিনেন্টাল

পর্টুগাল ও স্পেন অধিকার পোপের সঙ্গে বিবাদ

এতদ্ব্যতীত স্পেনের বৈধ নরপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সেইস্থানে স্বীয় ভ্রাতাকে উপবিষ্ট করানো সঙ্গত হয় নাই। এই ভ্রমের ফলে নেপোলিয়ন স্পেনের জাতীয়তাকে জাগ্রত করিলেন। স্পেনের গণশক্তি সর্বস্বপণ করিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে উত্থিত হইল। এই গণঅভ্যুত্থানে নেপোলিয়নের অপরিমিত সৈন্য ও ধনক্ষয় হইয়াছিল। স্পেনের এই জাতীয়তাবোধের সার্থক দৃষ্টান্ত প্রাশিয়া ও রাশিয়াকে উদ্বুদ্ধ করিল এবং নেপোলিয়নের পতন অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিল।

চতুর্থতঃ, রাশিয়াকে দমন করার জন্য নেপোলিয়ন মস্কো অভিযানের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার ব্যর্থতাও তাঁহার পতনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। এই অভিযানে তাঁহার আড়াই লক্ষাধিক সৈন্য বিনষ্ট হয়। এই অভিযান ব্যর্থ হওয়াতে নেপোলিয়নের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ধারণা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং মধ্য ইউরোপে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ শক্তির সৃষ্টি হয়। মস্কো হইতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই লিপজিগের যুদ্ধে (১৮১৩) নেপোলিয়নকে বিপক্ষের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীর হস্তে পরাজিত হইতে হয়। এই যুদ্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্র নেপোলিয়নের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিল বলিয়া ইহা বিভিন্ন জাতির যুদ্ধ (Battle of Nations) নামে পরিচিত। পঞ্চমতঃ, কন্টিনেন্টাল সিস্টেমকে উপলক্ষ্য করিয়া নেপোলিয়ন পোপের প্রতি যে রূঢ় আচরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে

(৪ মস্কো অভিযান

তিনি ইউরোপের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। ক্যাথলিকগণের বিরোধিতাও তাঁহার অসাফল্যের অন্যতম কারণ। ষষ্ঠতঃ, ইংলণ্ডের নৌ-শক্তির শ্রেষ্ঠতার ফলে নেপোলিয়নের পতন অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। নেপোলিয়নের প্রাচ্যপরিকল্পনা, ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনা এবং ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের পরিকল্পনা সমস্তই ইংলণ্ড তাহার অজেয় নৌ-শক্তির সাহায্যে ব্যর্থ করিয়াছিল। এই নৌ-বলের শ্রেষ্ঠত্বের জোরেই ইংলণ্ড স্পেনের ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের গণজাগরণকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে সমর্থ হয়। সপ্তমতঃ ইংলণ্ডের আপোষবিহীন একক প্রতিকূলতাকে নেপোলিয়নের পতনের সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ বলা যাইতে পারে। ইংলণ্ডের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া ইউরোপের অপরাপর রাষ্ট্র ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ প্রতিরোধ রচনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডের নেতৃত্বে ও উৎসাহে গঠিত ইউরোপের সম্মিলিত প্রতিরোধের নিকট নেপোলিয়নকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

(৫) পোপের সঙ্গে বিবাদ

(৬) ইংলণ্ডের নৌ শ্রেষ্ঠত্ব

(৭) ইংলণ্ডের প্রতিকূলতা

ফরাসী বিপ্লবের ফল : ইউরোপ এবং পৃথিবীর ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লব এক যুগান্তকারী ঘটনা। আধুনিক ইতিহাসে জাতীয়তাবাদের ও গণতন্ত্রের বিকাশ ফরাসী বিপ্লবের ফলেই সম্ভবপর হইয়াছে। অর্থনৈতিক সাম্য, সামাজিক মৈত্রী ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার আদর্শ পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রেই স্বীকৃত হইয়াছে এবং এই আদর্শকে কার্যে পরিণত করার জন্য চেষ্টা চলিয়াছে। পূর্ণ ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের পশ্চাতে ফরাসী বিপ্লবের বাণী প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের বিভিন্ন আদর্শ অনুসৃত হইয়াই জার্মানী ও ইটালীর ঐক্যসাধন হইয়াছিল, বল্কানের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে জাতীয়তাবাদের সঞ্চার হইয়াছিল। আইনের দৃষ্টিতে সার্বজনীন সমতা, জন্মকৌলিন্যের পরিবর্তে গুণকৌলিন্যের শ্রেষ্ঠত্ব, ধর্ম সম্বন্ধে উদারতা, মানুষে মানুষে সাম্য এই সমস্ত মৌলিক সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক বা ধর্মীয় আদর্শ ফরাসী বিপ্লব হইতেই উদ্ভূত হইয়া ইউরোপে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

প্রশ্নোত্তর

1. Describe the causes and the circumstances leading to the American war of Independence. What were its results? Account for the success of the colonists.

যে সমস্ত কারণ ও ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল তাহা বর্ণন কর। ইহার ফলাফল এবং আমেরিকার জয় লাভের কারণ নির্ণয় কর।

উত্তর-সূত্র : (১) ভূমিকা: অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের ইতিহাসে আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড আমেরিকা মহাদেশের পূর্ব উপকূলে তেরটি উপনিবেশ স্থাপন করে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোনীত গভর্ণরের শাসনাধীন হইলেও মোটামুটি বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথমদিকে তাহাদের কোন অভিযোগ ছিল না। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক লইয়া মাতৃভূমির সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বিরোধ পরিণামে স্বাধীনতার যুদ্ধে পরিণত হয়।

(২) অর্থনৈতিক কারণ: উপনিবেশগুলির উপর একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার, বিরক্তিকর নৌ-সংক্রান্ত আইন (Navigation Act 1651), আমদানী রপ্তানী সম্বন্ধে বিধি নিষেধ—শিল্প-বাণিজ্য প্রসারের অসুবিধা—তীব্র অসন্তোষ।

(৩) রাজনৈতিক কারণ: জন-প্রতিনিধি সভা বা আইন পরিষদের সঙ্গে বৃটিশ গভর্ণরের মতানৈক্য।

(৪) সপ্তবর্ষ যুদ্ধের ফলে কানাডা ফরাসীদের হস্তচ্যুত হয়। ইহার ফলে ফরাসী আক্রমণের ভীতি দূরীভূত হয় ও স্বাধীনতা স্পৃহা জাগরিত হয়।

(৫) আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব আমেরিকার বিদ্রোহের অন্যতম সহায়ক ঘটনা ছিল।

ঘটনাবলী : (১) তৃতীয় জর্জ কর্তৃক নৌ-আইন কঠোরভাবে প্রযুক্ত। (২) সপ্তবর্ষ যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহার্থ প্রধান মন্ত্রী গ্রেণভিল কর্তৃক ষ্ট্যাম্প এ্যাক্ট-এর প্রবর্তন (১৭৬৫) এবং ইহার ফলে আমেরিকার প্রবল বিক্ষোভ; আমেরিকার প্রতিনিধিবর্জিত পার্লামেণ্টের আমেরিকার উপর কোন কর চাপাইবার অধিকার নাই। (৩) রকিংহাম

কর্তৃক ষ্ট্যাম্প এ্যাক্ট প্রত্যাহার (১৭৬৬)। কিন্তু Declaratory Act দ্বারা ঘোষিত হইল যে উপনিবেশের উপর কর স্থাপনের অধিকার পার্লামেণ্টের আছে, ইহাতে আন্দোলন বন্ধ হইল না। (৪) টাউনশেণ্ড কর্তৃক চা, চিনি, কাগজের উপর শুল্ক ধার্য— অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি: বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা। (৫) লর্ড নর্থ কর্তৃক চা ব্যতীত অন্য দ্রব্যের উপর কর বাতিল। (৬) বোষ্টন বন্দরে জাহাজ হইতে চা-এর বাক্স জলে নিক্ষিপ্ত। (৭) বোষ্টন বন্দর বন্ধ ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের দমননীতি— বিভিন্ন স্থানে গুলিচালনা। (৮) জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই স্বাধীনতা ঘোষণা। স্বাধীনতার যুদ্ধ ও ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ভার্সাই এর সন্ধিতে আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকৃত।

ফলাফল: (১) পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধারণতন্ত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সূচনা। (২) ইংলণ্ডের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সাময়িকভাবে ক্ষুণ্ণ—উপনিবেশিক নীতির পরিবর্তন। (৩) ফ্রান্স আমেরিকার পক্ষে যোগদান করিয়া অর্থব্যয় করে—রাজকোষ অর্থশূন্য, তদুপরি আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের দ্বারা ফ্রান্সের জনসাধারণ প্রভাবিত— ফরাসী বিপ্লবের বীজ অঙ্কুরিত।

উপনিবেশিকদের সাফল্যের কারণ: (১) স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমেরিকাবাসীদের দুর্দমনীয় স্পৃহা। (২) আমেরিকার প্রকৃত শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে ইংলণ্ডের জ্ঞানের অভাব। (৩) ভৌগোলিক দূরত্বের জন্য ইংলণ্ডের অসুবিধা। (৪) ফ্রান্স, স্পেন কর্তৃক আমেরিকাকে সাহায্যদান। (৪) জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্ব, দেশাত্মবোধ, কর্মক্ষমতা ও উদ্যম উপনিবেশিকদের মধ্যে গভীর প্রেরণার সৃষ্টি করিয়াছিল।

2. Discuss the causes of the French Revolution.

ফরাসী বিপ্লবের কারণসমূহ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর-সূত্র: (১) ভূমিকা: ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে বিপ্লবের সূচনা হয়। এই বিপ্লব প্রধানতঃ স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্র ও সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে ছিল। এই বিপ্লব সম্পূর্ণ আকস্মিক নহে—ইহার পশ্চাতে দীর্ঘ প্রস্তুতি ছিল। সুতরাং অসংখ্য কারণ পুঞ্জীভূত হইয়া এই বিপ্লব সৃষ্টিতে সাহায্য করিয়াছিল।

(২) রাজনৈতিক কারণ: ফরাসী রাজতন্ত্রের দেশকে কুশাসন ও বিশৃঙ্খলার হস্ত হইতে রক্ষা করার অক্ষমতা ও ব্যর্থতা—বিচার ব্যবস্থা স্বৈরাচারী অত্যাচারের যন্ত্রে পরিণত, অভিজাতশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য সাধারণ স্তরের প্রজার স্বার্থ উপেক্ষিত—ব্যক্তি স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অভাব—ঋণের ফলে রাষ্ট্র দেউলিয়া-প্রায়।

(৩) সামাজিক কারণ : সমাজ ব্যবস্থা অসাম্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—সমাজের তিন শ্রেণীর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ ধর্মযাজক ও অভিজাত শ্রেণী রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক যাবতীয় বিশেষ অধিকারভোগী—এমনকি এই দুই শ্রেণীকে কর পর্যন্ত দিতে হইত না। পক্ষান্তরে তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ মধ্যবিত্ত, কৃষক, শ্রম-শিল্পী প্রভৃতি অবশিষ্ট জনসাধারণকে রাষ্ট্রের সমস্ত দায় ভোগ করিতে হইত।

(৪) অর্থনৈতিক : ক্রমাগত বিভিন্ন যুদ্ধের ফলে ফ্রান্সের রাজকোষ শূন্য—অপরিমিত মাত্রায় ঋণগ্রস্ত—ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য অত্যধিক মাত্রায় কর স্থাপন—তৃতীয় শ্রেণীকেই বিপুল করভার বহন করিতে হইত। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিভিন্ন প্রকারের কর : জমিদার, চার্চ ও রাষ্ট্র এই তিনজনকে বিভিন্ন প্রকারের কর প্রদান করিতে হইত।

(৫) ইনটেলেকচুয়াল বা বুদ্ধিপ্রসূত কারণ : মন্টেস্কু, রুশো, ভলটেয়ার প্রভৃতি দার্শনিক ও চিন্তাশীল মনীষীদের রচনা ; তাঁহারা মাত্র অন্যায়-অবিচারের কারণ নির্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—এই দুরবস্থার প্রতিকার সম্বন্ধেও ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

(৬) ইংলণ্ডের ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা-প্রাপ্তির প্রভাব : লাফায়েৎ প্রভৃতি ফরাসী স্বেচ্ছাসেবক আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান করিয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

(৭) প্রত্যক্ষ কারণ : আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে অর্থসাহায্যের ফলে রাজকোষে অর্থাভাব—অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রতিকারে নরপতি ষোড়শ লুই-এর অক্ষমতা—অগত্যা ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদ ষ্টেটস জেনারেলের অধিবেশন আহ্বান। ইহা দ্বারা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের ব্যর্থতা স্বীকৃত হইল।

বিপ্লবের বিবিধ কারণের মধ্যে অর্থনৈতিক কারণই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

3. Give an account of the reforms of Napoleon.

নেপোলিয়নের সংস্কারসমূহের বিবরণ দাও।

উত্তর-সূত্র : (১) ভূমিকা : ১৭৯৯ হইতে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নেপোলিয়ন প্রথম কন্সালরূপে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতা পরিচালনা করেন। কন্সাল পদ লাভের পরেই নেপোলিয়ন ইউরোপে শান্তি স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন—যাহা হউক বহু যুদ্ধ-বিগ্রহের পরে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সঙ্গে আমিয়েন্সের সন্ধি হওয়াতে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ সংস্কারকার্যে মনোনিবেশের সময় পান।

(২) তাঁহার সংস্কার : (ক) দেশত্যাগী ও রাজভক্তদের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, (খ) সরকারী চাকুরীতে সকলের প্রবেশাধিকার, (গ) Concordat

(১৮০১)-এর দ্বারা পোপের সঙ্গে ধর্মসম্বন্ধীয় আপোষ, (ঘ) রাস্তাঘাট নির্মাণ, খাল খনন, পৌতাশ্রয়গুলির সংস্কার, ফ্রান্সের প্রধান সৌধসমূহের সংস্কার ও নূতন নূতন সৌধ নির্মাণের দ্বারা বিভিন্ন শহরের শোভাবর্দ্ধন, (ঙ) শিক্ষার উন্নতিকল্পে বহু বিদ্যালয় স্থাপন - ইউনিভার্সিটি অব্ ফ্রান্স, মিউজিয়ম, আর্ট গ্যালারী স্থাপন—বহু স্থান হইতে দুর্লভ শিল্পকীর্তি, চিত্রাদি আনয়ন (চ) সিভিল কোড (Civil Code) বা কোড নেপোলিয়ন প্রণয়ন—সমদর্শী আইনবিধি প্রবর্তিত—বৈষম্য অন্তর্হিত, (ছ) আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্সের প্রতিষ্ঠা, (জ) লিজিয়ন অব্ অনার বা সম্মান প্রতীকের সৃষ্টি, (ঝ) স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাধীনতা হরণ করিয়া সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা।

ফলাফল : (১) স্বৈরাচারী প্রজাহিতৈষণার আদর্শের অনুসরণ করিলেও বিপ্লবের আদর্শকে অস্বীকার করেন নাই। ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম বাণী সাম্যকে তিনি বাস্তব রূপ দেন—সমদর্শী আইনবিধি, সরকারী চাকুরীতে সার্বজনীন অধিকার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য দূরীকরণ, জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষার প্রবর্তন ইত্যাদি ইহার দৃষ্টান্ত। (২) জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার স্বীকার করেন নাই—বিপ্লবের আদর্শ আংশিকভাবে তাঁহার সংস্কারসমূহের মধ্য দিয়া কার্যকরী হইয়াছিল।

4 What were the causes of the downfall of Napoleon?

নেপোলিয়নের পতনের কারণ কি?

উত্তর-সূত্র : ১) ভূমিকা। কর্সিকা দ্বীপের এক স্বল্পপরিচিত পরিবারের সন্তান নেপোলিয়ন স্বীয় কৃতিত্ববলে ফরাসী-জাতির ভাগ্যনিয়ামক পদের অধিকারী হন—কালক্রমে তিনি ইংলণ্ড ব্যতীত প্রায় সমগ্র ইউরোপের সর্বময় কর্তৃত্বের মর্যাদায় উন্নীত হন। কিন্তু সমগ্র ইউরোপে প্রভুত্ব স্থাপনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিণতি স্বরূপ সমগ্র ইউরোপে তাঁহার বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ ও প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হয়। ফলে ইউরোপে বিভিন্ন সময়ে নেপোলিয়ন-বিরোধী রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি হয় এবং প্রধানতঃ ইহাদের বিরোধিতার ফলে তাঁহার পতন অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। ওয়াটারলুর যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়।

(২) **পতনের কারণ :** (ক) অপরিমিত উচ্চাশা ও ইহার বিরুদ্ধে ইউরোপব্যাপী প্রতিক্রিয়া, (খ) মাত্র সামরিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য স্থায়ী হইতে পারে না—নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ, ইহার দৃষ্টান্ত স্পেন, প্রাশিয়া ও রাশিয়া (**"It was national patriotism which crushed Napoleon"**)।

(গ) স্বকৃত অসংখ্য ত্রুটিপূর্ণ কার্য :

(১) ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের দ্বারা শত্রুবৃদ্ধি, পর্তুগাল আক্রমণ, স্পেন-অধিকার, পোপের সঙ্গে বিবাদ ও রাশিয়ার সহিত সংঘর্ষ। (২) স্পেনের সিংহাসনে ভ্রাতাকে স্থাপন অদূরদর্শিতার কার্য, (৩) মস্কো-অভিযান, (৪) পোপের সহিত বিরোধিতার ফলে ক্যাথলিকদের বিরাগভাজন, (৫) কন্টিনেণ্টাল সিষ্টেমের ব্যর্থতা ও প্রতিক্রিয়া।

(ঘ) ইংলণ্ডের প্রতিপক্ষতা ও নৌ-শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব—ফরাসী-নৌবাহিনীর অভাবে নেপোলিয়নের প্রাচ্য পরিকল্পনা ব্যর্থ—নীলনদের যুদ্ধে পরাজয়। ইংলণ্ড আক্রমণ ব্যর্থতায় পরিণত—ট্রাফালগারের যুদ্ধে পরাজয়। ইংলণ্ড আপোষবিহীনভাবে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়নের বিরুদ্ধতা করে : ইংলণ্ডের নেতৃত্বে গঠিত ইউরোপের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের নিকট নেপোলিয়নকে নতি স্বীকার করিতে হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

ইউরোপের পুনর্গঠন, ১৮১৫—১৮৭৮ঃ বিপ্লব ও জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম

Syllabus :—Reconstruction of Europe, 1815—1878. Settlement of 1815. Revolutions of 1830 and 1848. Nationalism and National States.

পাঠসূচী :—১৮১৫ হইতে ১৮৭৮ পর্য্যন্ত ইউরোপের পুনর্গঠন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের পুনর্বিন্যাস। ১৮৩০ ও ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব। জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্র।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায় পরিচয় ঃ—ভিয়েনা কংগ্রেসে সমবেত বিজয়ী মিত্রবর্গ অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার মেটারনিকের নেতৃত্বে নেপোলিয়ানোত্তর ইউরোপের পুনর্বিন্যাস করিতে বসিলেন। তাঁহারা ছিলেন পরিবর্তনবিরোধী, সুতরাং তাঁহারা চাহিলেন ইউরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থাপকে প্রাক্-বিপ্লবের অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে। মোট কথা, তাঁহারা ফরাসী বিপ্লবের ফলে বা নেপোলিয়নের যুগে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের যে সকল রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে, সেই সমস্ত সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেন। কিন্তু এই কার্য্যের দ্বারা রাষ্ট্রনীতিবিদগণ যুগের শিক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া অশান্তির কারণ দীর্ঘস্থায়ী করিলেন। ফরাসী বিপ্লব মাত্র শোণিত ক্ষরণের কাহিনী নহে ইহার মধ্যে নূতন যুগের অভ্যুদয়ের বার্তাও ছিল। এই বিপ্লব ইউরোপের প্রচলিত, সামাজিক, আর্থিক রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করিয়া গণমানসের সম্মুখে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লব সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার উদাত্তবাণী ঘোষণা করিয়া উচ্চনীচ ভেদাভেদ অস্বীকার করিয়াছে। পরাধীন দেশকে শৃঙ্খল-মুক্তির প্রেরণা দিয়াছে এবং স্বাধীন স্বৈরাচারী দেশের জনগণের মধ্যে প্রতিনিধিমূলক এবং দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র গঠনের জন্য আন্দোলনের আদর্শ জোগাইয়াছে। কিন্তু ভিয়েনা কংগ্রেসে বিজয়ী শক্তিবর্গ ফরাসী বিপ্লবের ও নেপোলিয়নকৃত সমস্ত পরিবর্তন অস্বীকার করিয়া সন্ধি শর্ত রচনা করিলেন। ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রাচীন ব্যবস্থা বহাল রাখিয়া প্রতিক্রিয়াপন্থীর পরিচয় দিলেন। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের ইতিহাসের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইল দুইটি স্ববিরোধী মতবাদের সংঘর্ষে—একপক্ষে গণতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদীরা;

অপরপক্ষে স্বৈরাচারপন্থী প্রতিক্রিয়াবাদীরা। গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ক্ষেত্র হইল ইংলণ্ড, ফ্রান্স বা রাশিয়ার মত স্বাধীন বা স্বৈরাচারী রাষ্ট্র সমূহে। আর ন্যাশানালিজম বা জাতীয়তাবাদের আন্দোলন চলিয়াছে আয়র্ল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, ইটালী, গ্রীস, জার্মানী বা বল্কান রাষ্ট্রসমূহে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করিয়া ভাষা, জাতি ও সংস্কৃতিগত ঐক্যের ভিত্তিতে স্বশাসিত নূতন নূতন রাষ্ট্র গঠন করার জন্য। স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং পরাধীন রাষ্ট্রে স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টা—মূলতঃ এই দুইটি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়াই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বাঁধিয়াছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের এই আন্দোলন নানা ত্রুটির জন্য সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। ঐক্যমূলক সংহতির অভাব, সংগঠনী প্রচেষ্টার অভাব এবং সমাজের নিম্নস্তরের জনসাধারণের সমর্থনের অভাবেই ইহা সফল হইতে পারে নাই। বিরোধী শক্তির প্রতিকূলতায় গণতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ১৮৫০ পর্যন্ত ইউরোপে তাদৃশ সফল হয় নাই, কিন্তু এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত মূলনীতি ও আদর্শ নূতন আঙ্গিক ও কার্যক্রমের দ্বারা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতে থাকে। শিল্পসমৃদ্ধ ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে যে অর্থনৈতিক ব্যবধান গড়িয়া যাইতেছিল তাহা দূর করার জন্য ইউরোপে সোসিয়ালিজম নামক এক চিন্তাধারার প্রকাশ হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই চিন্তাধারা সমাজ ও রাজনীতিবিদদের হস্তে এক সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। প্রচলিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সম্যক পরিবর্তন হইলে এই অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হইতে পারে বলিয়া সোসিয়ালিষ্ট বা সমাজতন্ত্রবাদীরা প্রচার ও আন্দোলন করিতে থাকে। এই নূতন মতবাদ গণতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়াতে বিরোধী শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। ফ্রান্সে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব ও দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্রের উদ্ভবের মধ্যে এই আন্দোলনের জয়ের সূচনা হয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্র ধ্বংস করিয়া দ্বিতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন বটে, কিন্তু তিনি ইউরোপের তৎকালীন গণতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদের দাবি একেবারে অস্বীকার করিতে পারিলেন না। প্রধানতঃ, তৃতীয় নেপোলিয়নের সহানুভূতি ও সাহায্যের ফলেই ইটালী ও জার্মানীর জাতীয়তার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ঐক্যবন্ধন সম্ভবপর হইয়াছে। স্বদেশ ফরাসী রাষ্ট্রেও তিনি আংশিক দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্টের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্য বজায় রাখা ও উদার মতবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এই দুই স্ব-বিরোধী অবস্থার মধ্যে পড়িয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন মানসিক ভারকেন্দ্র রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার সকল কাজের মধ্যে অব্যবস্থিত ও দোলাচল মনোভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল।

ইহার ফলে তিনি উদারপন্থীদের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইলেন। তাঁহার দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিকূলে, সমগ্র ইউরোপে বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হইল। সিডানের যুদ্ধে (১৮৭০) তাঁহার পরাজয় হইল—ফ্রান্স তৃতীয় সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করিল। জার্মানী ও ইটালীর অসম্পূর্ণ ঐক্যবন্ধন সম্পূর্ণ হইল। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ জয়যুক্ত হইল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বার্লিন কংগ্রেসে বল্কান অঞ্চলের জাতীয়তাবাদও জয়লাভ করিল। মণ্টিনিগ্রো, সার্বিয়া ও রুমানিয়া তুরস্কের স্বাধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইল।

ইউরোপের পুনর্বিন্যাস : নেপোলিয়নের আধিপত্যের সময় ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাভাবিক রাজ্যসীমা পরিবর্তিত হইয়াছিল। সাম্রাজ্যশাসনের সুবিধার জন্য নেপোলিয়ন নিজের ইচ্ছামত এই সমস্ত পরিবর্তন করিয়াছিলেন। ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়ের পরে ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন হইল নেপোলিয়ন-বিজয়ী বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ এই পুনর্বিন্যাসের উদ্দেশ্যে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরে এক অধিবেশনে সমবেত হইলেন। ইহাই ভিয়েনা কংগ্রেস (১৮১৪-১৮১৫) নামে পরিচিত।

ভিয়েনা কংগ্রেস : ভিয়েনা কংগ্রেসে তুরস্ক ব্যতীত ইউরোপের সকল রাষ্ট্রই প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল সমবেত রাষ্ট্র-প্রতিনিধিদের মধ্যে অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার বা প্রধানমন্ত্রী মেটারনিক, রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার এবং ইংলণ্ডের প্রতিনিধি ক্যাসালরী কংগ্রেসের সর্বব্যাপারে কর্তৃত্ব করিতেছেন। অচিরেই মেটারনিক আর সকলকে অতিক্রম করিয়া এই কংগ্রেসের কার্য্যাবলীর একমাত্র নিয়ন্তা হইয়া পড়িলেন।

ভিয়েনা কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রাক্কালে নেতৃবৃন্দ যুদ্ধ-ক্লান্ত ও যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপকে ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

প্রারম্ভিক সদিচ্ছার ঘোষণা

এতদ্ব্যতীত ভবিষ্যতে যাহাতে যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা ইউরোপের শান্তি বিঘ্নিত না হয়, সে সম্বন্ধেও তাঁহারা উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। কার্য্যতঃ তাঁহারা স্ব স্ব রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য যাহা প্রয়োজন তদনুযায়ীই বিধিব্যবস্থা স্থির করিয়াছিলেন, ন্যায় ও সততার নীতি অধিকাংশ সিদ্ধান্তই উপেক্ষিত হইয়াছিল।

যাহা হৌক তিনটি মূলনীতি অনুযায়ী ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয়

ভিয়েনা কংগ্রেসের নীতি প্রধানতঃ তিনটি

প্রথমতঃ বিজয়ী মিত্রপক্ষের জন্য পুরস্কার ও ক্ষতিপূরণ এবং ইহার সঙ্গে পরাজিত ফ্রান্স ও তাহার অনুগামী রাষ্ট্রগুলির যথাযুক্ত দণ্ডবিধান; দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যথাসম্ভব ফরাসী

বিপ্লবের পূর্বে অবস্থার পুনঃ প্রবর্তন এবং তৃতীয়তঃ ইউরোপের ভবিষ্যৎ শান্তি অব্যাহত রাখার যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করা।

প্রথম নীতি অনুযায়ী নেপোলিয়নের আমলে অধিকৃত ইউরোপের অঞ্চল মিত্রপক্ষের হাতে আসিল এবং উপরি-উক্ত অঞ্চলগুলি হইতে রাশিয়া প্রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া, ইংলণ্ড ও সুইডেন পুরস্কার স্বরূপ খানিকটা করিয়া ভূখণ্ড প্রাপ্ত হইল। সুইডেন পাইল নরওয়ে, রাশিয়া মধ্য পোলাণ্ডের অধিকারী হইল এবং ইংলণ্ড হেলিগোলাণ্ড ও মাল্টা দ্বীপ এবং স্পেন, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের অধিকৃত কয়েকটি উপনিবেশ প্রাপ্ত হইল। সুইডেন পুরস্কার স্বরূপ নরওয়ে প্রাপ্ত হইল এবং উপনিবেশিক অঞ্চল পরিত্যাগ করার বিনিময়ে হল্যাণ্ডের সঙ্গে বেলজিয়ম জুড়িয়া দেওয়া হইল। নেপোলিয়নের পক্ষে যোগদানস্বরূপ অপরাধের শাস্তি হিসাবে স্যাক্সনীর কিঞ্চিৎ ভূখণ্ড কাড়িয়া লওয়া হইল। প্রধান অপরাধী ফ্রান্সকে ব্যবচ্ছেদ করার অনুকূলে সিদ্ধান্ত প্রথমতঃ গৃহীত হইয়াছিল পরে এই উদ্দেশ্য পরিত্যক্ত হয়। যুদ্ধ ঘটাইবার অপরাধ হিসাবে ফ্রান্সের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণস্বরূপ অর্থ দাবি করা হইল।

(১) পুরস্কার ও দণ্ডদান

দ্বিতীয় নীতি অনুসারে ইউরোপকে প্রাক্-বিপ্লব অবস্থায় আনিবার জন্য ভিয়েনা কংগ্রেস বৈধ অধিকার নামে এক নূতন নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। এই নূতন নীতির অর্থ এই যে দীর্ঘকাল যাবৎ যে রাজবংশ যে অঞ্চলে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছে তাহারাই সেই অঞ্চলের বৈধ শাসক বলিয়া পরিগণিত হইবে। বিপ্লবের যুগে বা নেপোলিয়নের আমলে যে সকল আইন সম্বন্ধীয় বা রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল বৈধ অধিকারের নামে তাহা অস্বীকৃত হইল। এই নীতি অনুযায়ী ফ্রান্সের সিংহাসনে পুরাতন বুর্বোঁ বংশ এবং স্পেন ও নেপলস্-এও পুরাতন বুর্বোঁ বংশের আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। পীডমণ্ড-সার্ডিনিয়া ও হল্যাণ্ডে অনুরূপ নীতি অনুসৃত হইল। এই নীতির বলে পোপ তাঁহার গদি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং জার্মানীর রাইন অঞ্চলের রাজন্যবর্গ তাঁহাদের স্ব স্ব রাজ্য ও সিংহাসন ফিরিয়া পাইলেন।

(২) প্রাক্ বিপ্লব অবস্থা আনয়ন

ফ্রান্সের সামরিক ক্ষমতা যাহাতে দুর্বল থাকে এবং ভবিষ্যতে শক্তিসম্পন্ন হইয়া আর কোন অশান্তি সৃষ্টি করিতে না পারে তজ্জন্য ভিয়েনা কংগ্রেস যথেষ্ট প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা করিল। ফ্রান্সকে তাহার স্বাভাবিক সীমানা হইতে বঞ্চিত করা হইল এবং ফ্রান্সের চতুষ্পার্শ্বস্থ রাষ্ট্রসমূহের আয়তন বর্দ্ধিত করিয়া ফ্রান্সকে সতর্ক পাহারার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা

ইউরোপের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বিধান

হইল। হল্যাণ্ডের সঙ্গে বেলজিয়ামকে সংযুক্ত করাইয়া উত্তর দিকে এবং প্রাশিয়াকে রাইন অঞ্চলের কিছু ভূখণ্ড প্রদান করাইয়া পূর্বে এবং সার্ডিনিয়া-পীডমণ্টকে জেনোয়া প্রদান করিয়া দক্ষিণ-পূর্বদিকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দৃঢ় আবেষ্টনী সৃষ্টি করা হইল।

ভিয়েনা কংগ্রেসের বিধানাবলীর বিরুদ্ধে সর্বপ্রধান অভিযোগ এই যে, ইহা ফরাসী-বিপ্লবের মূলনীতি অর্থাৎ গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করিয়াছিল। ইউরোপের শান্তিরক্ষা, শক্তিসমতা রক্ষা, বা বৈধ অধিকারের নামে ইহা ইউরোপের কয়েকটি রাজবংশের স্বার্থরক্ষার প্রতিই দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়াছিল, এবং জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে একেবারে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছিল। জার্মানীর জনমতের বিরুদ্ধে জার্মানীকে সংহতিবিহীন দুর্বল অবস্থায় রাখা হইল, ইটালীতে অষ্ট্রিয়া ও বুরবোঁ বংশের অধিকার ফিরিয়া আসিল, বেলজিয়মকে হল্যাণ্ডের সঙ্গে এবং নরওয়েকে সুইডেনের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইল। ভিয়েনার সর্তরচয়িতৃগণ ইউরোপের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া স্বার্থপরতা, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ইউরোপের রাষ্ট্রবিধির নববিন্যাস করিলেন। দূরদর্শিতার অভাব থাকায় ভিয়েনার কার্য্যাবলী অধিকদিন স্থায়ী হইল না; পূর্ণ ঊনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া ভিয়েনা কংগ্রেসের ত্রুটির জের চলিল এবং যুদ্ধ বা জন-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া ইহার পরিবর্তন বা সংশোধন চলিল। তবে ভিয়েনার শর্তাবলীর স্বপক্ষে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, উপরি-উক্ত ত্রুটি সত্ত্বেও এই সকল শর্তের ভিত্তি-ভূমিতেই ইউরোপের শান্তি আগামী চল্লিশ বৎসর কাল মোটামুটি অব্যাহত ছিল।

ভিয়েনা কংগ্রেসের সমালোচনা

ভিয়েনা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মতে মাত্র ফ্রান্স নহে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শবাদও ইউরোপে অশান্তি সৃষ্টির অন্যতম কারণ। সুতরাং বিপ্লবী আদর্শের প্ররোচনা হইতেও ইউরোপকে রক্ষা করা অন্যতম কর্তব্য। ইত্যবস্থায় ভিয়েনা কংগ্রেসের পরেই ইহার নেতৃবৃন্দের কর্তব্য শেষ হইল না। ভিয়েনা কংগ্রেসের শর্তাবলী প্রতিপালিত হইতেছে কিনা এবং তৎসঙ্গে বিপ্লবী মতবাদের প্ররোচনায় ইউরোপের শান্তি ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইতেছে কিনা—এই সকল কার্য্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য তাহারা ইউরোপে আন্তঃরাষ্ট্রিক একটি সক্রিয় রাজনৈতিক সংস্থার প্রয়োজন অনুভব করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা 'ইউরোপীয় ঐক্য-সমবায়' (Concert of Europe) এর বন্দোবস্ত করেন। 'ইউরোপীয় ঐক্য সমবায়' নামে পরিচিত আন্তঃরাষ্ট্রিক সংস্থা ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে দুইটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন—প্রথমটি 'পবিত্র সঙ্ঘ (Holy Alliance) এবং দ্বিতীয়টি চতুঃশক্তি সম্মেলন Quadruple

কনসার্ট অব ইউরোপ

Alliance)। এই দুইটি সংস্থার উদ্দেশ্য প্রায় এক হইলেও ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। পবিত্র সঙ্ঘ রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগঠিত হইয়াছিল। বিভিন্ন রাষ্ট্র এই সঙ্ঘের সর্ত পালনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হইলেও ইহার শর্ত পালনের জন্য কোন রাষ্ট্রনৈতিক বাধ্যবাধকতা ছিল না—কেবলমাত্র নৈতিক দায়িত্ব ছিল। চুক্তি অনুযায়ী ইহার সভ্যবৃন্দ অর্থাৎ ইউরোপের খৃষ্টান রাজন্যবর্গ খৃষ্টীয় ন্যায়নীতি, উদারতা ও শান্তি (Justice, Charity and Peace) তাঁহাদের শাসনব্যবস্থার আদর্শরূপে অনুসরণ করিবেন। ইউরোপের রাষ্ট্রবর্গ আলেকজাণ্ডারের মনস্তুষ্টির জন্য পবিত্র সঙ্ঘের 'সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হয়, কিন্তু অনেকেই এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য লইয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়াছেন। একমাত্র ইহার প্রধান উদ্যোক্তা আলেকজাণ্ডার ব্যতীত সকলেরই এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আন্তরিকতার অভাব ছিল। এতদ্ব্যতীত চতুঃশক্তি সম্মেলনের' সঙ্গে একযোগে গঠিত হওয়ায় পবিত্র সঙ্ঘকে চতুঃশক্তি 'সম্মেলনের সঙ্গে অনেকে অভিন্ন মনে করিয়াছেন। চতুঃশক্তি সম্মেলন ১৮১৫ হইতে ১৮২৫ পর্যন্ত ইউরোপের সর্বপ্রকার জাতীয় আন্দোলন ও স্বাধীন মতবাদকে নিষ্পিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং পবিত্র সঙ্ঘকেও তাহারা নিপীড়ন যন্ত্রের প্রতীক বলিয়া ঘৃণা ও বিরূপ সমালোচনা করিয়াছিল।

(ক) পবিত্র সঙ্ঘ

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লুপ্ত হইয়া যায়। অপর সংস্থা চতুঃশক্তি সম্মেলনের সভ্য ছিল ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া। পরিশেষে ফ্রান্সকেও ইহার সদস্যভুক্ত করিয়া ইহাকে পঞ্চশক্তি সম্মেলনে পরিণত করা হয়। এই সম্মেলন মেটারনিকের নেতৃত্বে পরবর্তী দীর্ঘকাল ইউরোপীয় শান্তিরক্ষার অজুহাতে সর্বত্র জাতীয়তা ও গণতান্ত্রিক চেতনার কণ্ঠরোধ করিয়াছিল। ইউরোপের নৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা করা এবং কোনও সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে তাহার প্রতিবিধান করার জন্য এই সম্মেলনের সভ্যবৃন্দ আই-লা-স্যাপেল (১৮১৮) ট্রপ্পৌ, (১৮২০), লেইবাক (১৮২১), ভেরোনা (১৮২২) এই চারিটি অধিবেশনে সমবেত হয়। এই জাতীয় আন্তঃরাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট উপযোগিতা থাকিলেও

(খ) চতুঃশক্তি সম্মেলন

মেটারনিক

নানা কারণে ইহার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারিল না। বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক স্বার্থদ্বন্দ্ব এবং পরিশেষে ইংলণ্ডের সহযোগিতার অভাবে এই সংস্থার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত ইউরোপের গণমানস ইহার প্রতিক্রিয়াশীল কার্য্যাবলী সমর্থন করিতে পারিল না। ইহার সম্বন্ধে জনসাধারণের অনাস্থা ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লব এবং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিল।

ইহাদের ব্যর্থতা

১৮৩০ এ ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লব:—নেপোলিয়নের পতনের পরে বৈধ-অধিকারের নীতি অনুযায়ী ফ্রান্সের পূর্ব্বতন রাজবংশের অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের নরপতি হইলেন। অষ্টাদশ লুই বিপ্লবকালীন পরিবর্ত্তনকে স্বীকার করিয়া তাঁহার রাজত্বের প্রথমদিকে নির্বাচিত আইন-সভা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ মোটামুটি স্বীকার করিয়া একটি সংবিধানও গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতা দশম চার্লস (১৮২৪-৩০) ভ্রাতার দ্বারা স্বীকৃত সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহ অগ্রাহ্য করিয়া স্বৈরাচারী শাসন প্রবর্ত্তিত করিলেন, এবং প্রগতিমূলক সমস্ত আন্দোলন ও চিন্তাধারা দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই উদ্দেশ্যে দশম চার্লস চারিটি দমনমূলক আইন জারি করিলে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ফ্রান্সে স্বৈরাচারী বুরবোঁ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। বিপ্লবীরা দশম চার্লস্‌কে ফ্রান্সের সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিয়া অর্লিয়েন্স বংশের জনৈক বংশধর লুই ফিলিপকে সিংহাসনে স্থাপন করিল। ভিয়েনা কংগ্রেস বা পরবর্ত্তী কনসার্ট-অফ-ইউরোপের কার্য্যকলাপের দ্বারা যে জাতীয়তা ও গণতন্ত্রবিরোধী নীতি অনুসৃত হইয়াছিল ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লব এই স্বৈরাচারী কার্য্যকলাপের সার্থক প্রতিবাদ। ফ্রান্সের সিং . . বোঁ বংশের পরিবর্ত্তে অর্লিয়েন্স বংশের প্রতিষ্ঠায় ভিয়েনা কংগ্রেসের 'বৈধ অধিকার' নীতিকে অগ্রাহ্য করা হইল। জনমত প্রয়োজন বোধ করিলে বৈধ নরপতিকে অপসৃত করিয়া নূতন ব্যক্তি বা বংশকে সিংহাসনের অধিকার প্রদান করিতে পারে—এই অভিমত ইহার দ্বারা স্বীকৃত হইল। প্রকারান্তরে সিংহাসনের উপর নরপতির 'দৈবস্বত্ব'এর দাবিও অগ্রাহ্য করা হইল।

ভিয়েনা কংগ্রেসের সর্ত্ত অগ্রাহ্য করা

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লব মাত্র ফরাসীদেশে সীমাবদ্ধ রহিল না, ইহার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ইউরোপের অপরাপর রাষ্ট্রেও কমবেশী অনুভূত হইল। ফ্রান্সের বিপ্লবের

সফলতায় উৎসাহিত হইয়া পোলাণ্ড, বেলজিয়ম, জার্ম্মানী ও ইটালীতে জনসাধারণ স্ব স্ব রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের সৃষ্টি করে। কিন্তু মেটারনিক প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াপন্থীদের শক্তি প্রবল থাকায় এই আন্দোলন কোথায়ও সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। একমাত্র বেলজিয়ামের হল্যাণ্ড হইতে স্বতন্ত্র হওয়ার আন্দোলন জয়যুক্ত হয় এবং বেলজিয়মের স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হয়। জুলাই বিপ্লব পরোক্ষতঃ ইংলণ্ডের ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে প্রথম পার্লামেণ্টারী সংস্কার আইন প্রবর্তিত হওয়ার ব্যাপারে প্রেরণা জোগাইয়াছিল।

ইউরোপের অন্যত্র বিপ্লব

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ফরাসী বিপ্লবঃ—১৮৩০ হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইউরোপে আর কোন ব্যাপক জাতীয়তাবাদী বা গণতন্ত্রী আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই। এই সময়কালের মধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদীরা ক্রমশঃ বিপ্লবী ও উদারনৈতিক আদর্শ প্রচারের দ্বারা দলীয় শক্তিসঞ্চয় করিতেছিল। ইউরোপে ইটালী অষ্ট্রিয়া, জার্ম্মানী ও রাশিয়ায় স্বৈরাচারী শাসনপদ্ধতি অব্যাহত ছিল। অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিক সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনের বিরোধী ছিলেন। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য বিভিন্ন জাতির সমবায়ে গঠিত ছিল। গণতন্ত্র বা জাতীয়তাবাদ প্রচারিত বা প্রসারিত হইলে এই সকল বিভিন্ন জাতি অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইয়া অষ্ট্রিয়ার ঐক্য বিনষ্ট করিবে মেটারনিকের এই আশঙ্কা ছিল। সুতরাং তিনি ভিয়েনা কংগ্রেস হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিভিন্ন আন্তঃরাষ্ট্রিক সংস্থা বা দমনমূলক নীতির দ্বারা অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য ও মধ্য ইউরোপের অপরাপর দেশগুলি হইতে বিপ্লবী আদর্শ ও আন্দোলন বন্ধ করার জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করেন।

মেটারনিক ও তাহার মতবাদ

জার্মান-রাষ্ট্রসঙ্ঘের মাধ্যমে জার্মানী, অষ্ট্রিয়ার আংশিক অধিকারভুক্ত ইটালী এবং অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্যত্র মেটারনিকের প্রযত্নে গণতান্ত্রিক বা পরিবর্ত্তনমূলক সমস্ত আন্দোলন প্রতিরুদ্ধ হয়। কিন্তু তাঁহার প্রচেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত সফল হয় নাই, গণতন্ত্রী ও ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার দুর্বার গতিকে রুদ্ধ করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত হয় নাই। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসের বিপ্লবের মধ্য দিয়া ইহা দুর্দ্দাম বেগে আত্মপ্রকাশ করিল।

জুলাই বিপ্লবের ফলে লুই ফিলিপ ফ্রান্সের নরপতি হইয়া রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসর উদার নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং উদারনৈতিক বিভিন্ন সংস্কারেরও প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই সমস্ত কার্য্যে বিপ্লবপন্থীদের আশা আকাঙ্ক্ষা

ফলবতী না হওয়ায় তাহারা জুলাই রাজতন্ত্রের বিরোধী হইলেন। তাহারা রাজাকে অধিকতর সংস্কারপন্থী ও অগ্রগামী হওয়ার জন্য চাপ দিতে লাগিলেন। লুই ফিলিপ এই উগ্রপন্থীদের ইচ্ছা আকাজ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে পারিলেন না। ব্যক্তিগতভাবে তিনিও অত্যধিক পরিবর্তনের সমর্থক ছিলেন না।

জুলাই রাজতন্ত্র ও লুই ফিলিপ

সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ রাজত্বকালের মধ্যে তিনি ফ্রান্সের কোন বড় রাজনৈতিক দলের সমর্থন লাভ করিতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বৈদেশিক নীতিও বহু ক্ষেত্রে ফ্রান্সের পক্ষে গৌরববর্দ্ধক না হইয়া মর্য্যাদাহানিকর হইয়াছে। ইটালী ও পোলাণ্ডে জাতীয় আন্দোলন লুই সমর্থন করিবেন বলিয়া জনসাধারণ প্রত্যাশা করিয়াছিল, কিন্তু কার্য্যকালে ফ্রান্স নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিল। বেলজিয়মের স্বাতন্ত্র্য অর্জনের আন্দোলনে প্রথমে ফ্রান্স হস্তক্ষেপ করিয়াছিল, কিন্তু ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পামারষ্টোনের হস্তক্ষেপের ফলে ফ্রান্স কর্তৃত্ব করার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল, ইংলণ্ডের মতানুসারী হইয়াই ফ্রান্সকে চলিতে হইল। নিকটপ্রাচ্য অর্থাৎ তুরস্কের সমস্যার সমাধানের ব্যাপারেও ফ্রান্সকে উপেক্ষা করা হইল, ফ্রান্সকে বাদ দিয়াই এই সমস্যার সমাধান হইয়া গেল।

আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অকর্মণ্যতা

ইটালির ঐক্য আন্দোলনে ফ্রান্স নিষ্ক্রিয় রহিল, স্পেন সংক্রান্ত ঘটনায় লুই ফিলিপ ইউরোপের দরবারে ফ্রান্সকে হতমান করিলেন। সুইজারল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াও তিনি ব্যর্থতার পরিচয় দিলেন। সর্বোপরি আফ্রিকার মরক্কোতে ফ্রান্সের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইয়াও তিনি তাহা উপেক্ষা করিলেন। নেপোলিয়নের যুগের গৌরবোজ্জ্বল ফ্রান্সের কথা ইতিমধ্যে জনসাধারণের স্মৃতিপথে নূতন করিয়া জাগরূক হইতেছিল, ইত্যবস্থায় লুইর নিষ্ফল পররাষ্ট্র নীতির পরিচয়ে জনসাধারণের জাতীয় মর্য্যাদা অত্যধিক আহত হইল। সুতরাং ঘরের এবং বাহিরের সকল ব্যাপারে জনসাধারণের ইচ্ছার বিরোধী কাজ করা এবং অযোগ্যতা প্রমাণিত হওয়ায় জুলাই রাজতন্ত্রের পতন অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতা

ফিলিপও রাজত্বের শেষ দিকে সিংহাসন রক্ষার জন্য ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াপন্থীদলের সহযোগিতায় সর্বপ্রকার পরিবর্তনের বিরোধী হইয়া উঠিলেন। পরিশেষে ভোটাধিকারের সম্প্রসারণের দাবিকে উপলক্ষ্য করিয়া ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে বিরোধী পক্ষ ফ্রান্সে আন্দোলন আরম্ভ করে। ফিলিপ কোন প্রকার সংস্কার প্রবর্তন করিতে অসম্মত হন। অবশেষে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এই আন্দোলন

ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ১৮৪৮

দেশব্যাপী বিপ্লবের রূপ পরিগ্রহ করে। এই পরিস্থিতিকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া লুই সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। অতঃপর বিপ্লবী বিভিন্ন দল সম্মিলিত হইয়া ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের অবসান ঘোষণা করিলেন এবং ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল (১৮৪৮)।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফরাসীবিপ্লব মাত্র ফ্রান্সেই সীমাবদ্ধ রহিল না, ইহার প্রভাব ইউরোপের অন্যান্য দেশে, বিশেষতঃ মধ্য-ইউরোপে—বিস্তৃত হয়। অষ্ট্রিয়া, ইটালী, বোহেমিয়া, হাঙ্গারী, জার্মানী এমন কি ইংলণ্ডেও এই বিপ্লবের অনুসরণে বিপ্লব দেখা দিল। ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মূলকেন্দ্র অষ্ট্রিয়ায় অত্যন্ত তীব্রভাবে গণ-আন্দোলন দেখা দিল। গণ-বিপ্লবের চাপে মেটারনিক অষ্ট্রিয়ার প্রধান মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। অবশ্য আপাত ফললাভের দিক দিয়া ১৮৪৮ খৃঃ-র বিপ্লব যথেষ্ট সার্থক হয় নাই। অচিরেই দমননীতির সাহায্যে প্রায় সর্বত্র এই বিপ্লবকে স্তব্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ইউরোপের জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রকে যে আর দীর্ঘকাল রুদ্ধ করিয়া রাখা যাইবে না এই ধারণা বদ্ধমূল হইল।

ইউরোপে ইহার প্রভাব ও ফল

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইউরোপ : ফ্রান্স :—১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহা স্থায়ী হইল না। আইনতঃ ইহা প্রায় পাঁচ বৎসরকাল স্থায়ী (১৮৪৮ খৃঃর ফেব্রুয়ারী হইতে ১৮৫২ খৃঃর ২রা ডিসেম্বর) ছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ এক বৎসর পূর্বেই ইহার পরমায়ু শেষ হইয়া যায় এবং তৃতীয় নেপোলিয়ন গণভোটের দ্বারা দশ বৎসরের জন্য ফরাসী সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় নেপোলিয়ন গণভোটের সাহায্যে ফ্রান্সের সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইলেন। ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রথম নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্য ১৮ বৎসর কাল (১৮৫২—৭০) স্থায়ী ছিল। তৃতীয় নেপোলিয়ন ফরাসী জাতির সমর্থন লাভের জন্য স্বদেশে বহু প্রজাহিতকর কার্য্যাবলীর অনুষ্ঠান করেন এবং চমকপ্রদ বৈদেশিক নীতির অনুসরণ করেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের মলডেভিয়া ও ওয়ালেচিয়া নামক দুইটি স্থান অধিকার কারণে ইউরোপে এক যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ইহা ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নামে পরিচিত (১৮৫৪—৫৬)। এই যুদ্ধে ইংলণ্ড ও সার্ডিনিয়া রাশিয়ার বিপক্ষে অবতীর্ণ হয়। ফ্রান্সও এই যুদ্ধে রাশিয়ার বিপক্ষে যোগদান করে এবং রাশিয়ার পরাজয়ে সাহায্য করে। ১৮৫৬ খৃঃ

প্যারিসের সন্ধিতে এই যুদ্ধের অবসান হয়। এই সন্ধির ফলে রাশিয়া তুরস্কের অধিকৃত স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয় এবং সাময়িকভাবে তুরস্ক সাম্রাজ্য সঞ্জীবিত হয়। এই যুদ্ধের পরে প্যারিস সন্ধির শর্ত আলোচিত হওয়ার স্থান নির্বাচিত হইলে ইউরোপে ফ্রান্সের প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হয়। এতদ্ব্যতীত নেপোলিয়নের সাহায্যে ইটালী অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে উত্তর-ইটালীয় রাষ্ট্র সৃষ্ট হওয়াতে ইটালীর ঐক্যসাধন প্রায় সম্পূর্ণ হয়। এই সকল কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ফ্রান্স স্যাভয় ও নীস নামে দুইটি অঞ্চল প্রাপ্ত হয়। এইভাবে নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তা সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। কিন্তু নেপোলিয়নের এই গৌরব বেশী দিন স্থায়ী রহিল না। দেশবাসীর জন্য সীমাবদ্ধ উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করিলেও তিনি সিংহাসনে আরোহণের প্রাক্কালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ হইলেন না। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পর বৈদেশিক ক্ষেত্রে অনুসৃত সমস্ত চমকপ্রদ নীতি ব্যর্থতায় ও ফ্রান্সের অগৌরববৃদ্ধিতে পর্য্যবসিত হইল। তাঁহার ইটালী-নীতি, মেক্সিকোতে সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রচেষ্টা, পোলাণ্ডের বিদ্রোহ, ডেনস যুদ্ধ, অষ্ট্রিয়া-প্রাশিয়া যুদ্ধ কোন ব্যাপারেই তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সের মর্য্যাদার অনুরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। পরিশেষে প্রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী বিসমার্কের সঙ্গে কূটনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃতীয় নেপোলিয়ন পরাজিত হইলেন। ইতিপূর্বেই ডেনমার্কের সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধে এবং অষ্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার যুদ্ধে নেপোলিয়ন নিরপেক্ষ থাকিয়া জার্মান ঐক্যের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর ঐক্য সম্পূর্ণ করার জন্য বিসমার্ক ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধ অনিবার্য্য মনে করিলেন এবং যুদ্ধের উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া ফ্রান্সকে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য করিলেন। ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধে ফ্রান্স জার্মানীর হস্তে পরাজিত হইল। এই যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদে ফ্রান্সের জনসাধারণ দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের অবসান ঘোষণা করিয়া ফ্রান্সে তৃতীয় সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করিল। পদচ্যুত তৃতীয় নেপোলিয়ন ইংলণ্ডে গমন করিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন—১৮৭০

ইটালীর ঐক্যবন্ধন :—নেপোলিয়নের আধিপত্যের সময়ে নেপোলিয়ন পোপের রাজ্য ব্যতীত অবশিষ্ট সমগ্র স্থান লইয়া ইটালীর রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা না পাইলেও ইটালীর অধিকাংশ সাময়িকভাবে জাতীয় ঐক্য লাভ করিয়াছিল। নেপোলিয়নের পতনের পরে ভিয়েনা কংগ্রেসের বন্দোবস্ত অনুযায়ী ইটালীকে পুনরায় কয়েকটি ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করা হইল। ইহাদের মধ্যে লম্বার্ডি-ভিনিশিয়া অষ্ট্রিয়ার প্রত্যক্ষ

অধিকারে রহিল এবং পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়া ও পোপের রাজ্য ব্যতীত বাকি সবগুলি অষ্ট্রিয়ার তাঁবেদার হইল। সর্বত্র স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র ফিরিয়া আসিল।

এই পরিস্থিতিতে ইটালীতে গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তার ঐক্য আন্দোলন আরম্ভ হইল। 'কারবোনারি' নামে এক গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির পরিচালনায় ১৮২০ ও ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইটালীর বিভিন্ন রাজ্যে বিপ্লব আন্দোলন দেখা দিল। অষ্ট্রীয়া সামরিক শক্তির সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করিল। কিন্তু ইটালীর স্বাধীনতার আন্দোলন কোন মতেই রুদ্ধ করা গেল না। ম্যাটসিনি, কাভুর ও গ্যারিবল্ডীর মত স্বদেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দের অভ্যুদয়ে ইটালীর জাতীয় আন্দোলন নবরূপ পরিগ্রহ করিল।

জোসেফ ম্যাটসিনি:—ম্যাটসিনি ইটালীর জাতীয়তাবাদের প্রথম মন্ত্রগুরু ছিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইটালী যখন মাত্র 'ভৌগোলিক নামাবশেষ' বলিয়া অভিহিত হইত, সেই সংশয়াচ্ছন্ন যুগে ম্যাটসিনি স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ইটালীর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি 'কারবোনারি'তে যোগদান করিয়া ইটালী হইতে অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য বিদূরিত করিয়া ইটালীর ঐক্য সাধন করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইলেন। কারামুক্তির পরে তিনি ইটালীর তরুণ সম্প্রদায়কে জাতীয় আন্দোলনে দীক্ষিত করার জন্য নব্য ইটালী (Young Italy) নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের
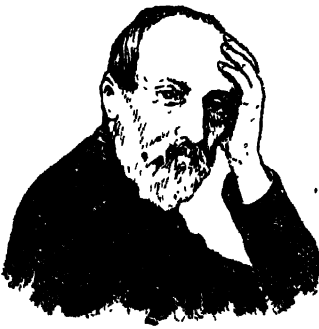
ম্যাটসিনি

ইটালীর স্বাধীনতা তাঁহার উদ্দেশ্য ও দান

মধ্য দিয়া ম্যাটসিনি ইটালীর তরুণদিগকে ত্যাগ, সংযম ও কষ্টের মধ্য দিয়া অখণ্ড ইটালীর উদ্ধারব্রতে দীক্ষিত করিলেন। বিদেশীর অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকা ব্যতীত ইটালীর ঐক্যবন্ধনের অন্যতম অন্তরায় ছিল দেশবাসীর মনে একদেশবোধের অভাব—অখণ্ড ইটালীর অনুভব শক্তির অভাব। ম্যাটসিনি প্রচার ও আন্দোলনের মধ্য দিয়া দেশবাসীর হৃদয়ে এই অখণ্ডতাবোধের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩০ এবং ১৮৪৮—৪৯ সালের ইটালীয় গণ-আন্দোলনের মূলে ছিল ম্যাটসিনি পরিচালিত যুবশক্তির সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। ম্যাটসিনি সাধারণতন্ত্রী ইটালীয় রাষ্ট্র

অখণ্ডতাবোধ ও স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার

প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিলেন। বাস্তবক্ষেত্রে তাঁহার কার্য্যাবলী বিশেষ সাফল্য লাভ করে নাই বা ইটালী তাহার সাধারণতন্ত্রী লক্ষ্য স্বীকার করে নাই। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য মানসিক ক্ষেত্রে প্রস্তুতিই ইটালীর জাতীয়তার জীবনে তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান। তাঁহার দ্বারা প্রস্তুত ভিত্তিমূলের উপরেই পরবর্তীদের চেষ্টায় ইটালীর স্বাধীনতা-সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই তাঁহাকে ইটালীর স্বাধীনতার জনক বলা হইয়া থাকে।

কাউন্ট কাভুর ঃ -ম্যাটসিনির আদর্শকে বাস্তবক্ষেত্রে রূপদান করিয়া কাউন্ট কাভুর ইটালীর ঐক্যবন্ধন সম্পূর্ণ করিলেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে পীডমণ্টের এক অভিজাত পরিবারে কাভুরের জন্ম হয়। যৌবনে তিনি সামরিক শিক্ষা লাভ করিয়া ইঞ্জিনিয়াররূপে সমর-বিভাগে যোগদান করেন ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে উক্ত পদ ত্যাগ করিয়া তিনি পরবর্তী পনেরো বৎসরকাল স্বীয় জমিদারীর উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করেন।

প্রথম জীবন
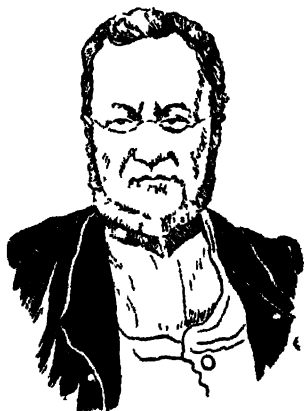
কাভুর

এই সময়ে তিনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্স বহুবার পরিভ্রমণ করিয়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বিদেশে পর্য্যটনকালে তিনি ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হন। অতঃপর তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য স্বীয় অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে প্রয়াসী হন। তিনি একখানা সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনা করিয়া সক্রিয়ভাবে ইটালীর রাজনীতিতে অবতীর্ণ হন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি পীডমণ্টের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া ইটালীর স্বাধীনতা ও ঐক্যের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তিনি পীডমণ্টের নেতৃত্বে ইটালীর স্বাধীনতা ও ঐক্যবন্ধনে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা আন্দোলনে পীডমণ্টের নরপতি নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিল। উপরন্তু পীডমণ্টে গণতান্ত্রিক শাসনও প্রবর্তিত হইয়াছিল। ইটালীর মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্বপদের জন্য পীডমণ্টকে যোগ্য করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে কাভুর পীডমণ্টের নানাবিধ আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধন করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় পীডমণ্ট ইটালীর মধ্যে সমস্ত দিক দিয়া আদর্শ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হইল। পার্লামেন্টারী শাসনপদ্ধতির তিনি একান্ত অনুরাগী ছিলেন।

পীডমণ্টের প্রধানমন্ত্রী

কাভুর বাস্তববাদী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। ইটালী হইতে অষ্ট্রিয়াকে বিতাড়িত না করিতে পারিলে ইটালীর স্বাধীনতা অর্জিত হইবে না একথা তিনি বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে ইটালীর স্বপ্রচেষ্টার দ্বারা হইবে না। ইটালীর সমকক্ষ কোন ইউরোপীয় শক্তির সাহায্য অর্জন করিতে হইবে এবং অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তাহাকে যুদ্ধে অবতীর্ণ করাইয়া ইটালীর স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। এই জন্য ইটালীর সমস্যাকে অষ্ট্রিয়ার গৃহ সমস্যার স্তর হইতে ইউরোপীয় সমস্যার স্তরে উন্নীত করিতে হইবে—যাহাতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ ইটালীর স্বাধীনতাকে তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষা বা 'শক্তি সমতা' রক্ষার উপযুক্ত মনে করিয়া ইটালীর সহায়তা করিতে পারে। এই উদ্দেশ্য কার্য্যকরী করার জন্য কাভুর প্রবন্ধাদির সাহায্যে ইউরোপের বিভিন্ন সংবাদপত্রে ইটালীর স্বপক্ষে এবং অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সংবাদ প্রেরণ করিয়া ইউরোপের জনমতকে ইটালীর অনুকূলে আনার চেষ্টা করিলেন। এইভাবে তিনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সহানুভূতি অর্জন করিতে সমর্থ হইলেন। ইতিমধ্যে কাভুর ইটালীর ঐক্যসাধনের প্রথম পর্বরূপে ইটালীকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার বিপক্ষে অবতীর্ণ করাইলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদানের পুরস্কার স্বরূপ তিনি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধি-র বৈঠকে যোগদানের অধিকার অর্জন করিলেন। এই সম্মেলনে তিনি ইটালীর সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহানুভূতি অর্জন করিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন প্লমবিয়ার্সের (Plombiers) চুক্তির দ্বারা অষ্ট্রিয়ার সহিত ইটালীর যুদ্ধ বাধিলে ইটালীকে সামরিক সাহায্য করিবে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন। এই চুক্তির উপর নির্ভর করিয়া কাভুর আসন্ন যুদ্ধের জন্য সর্বপ্রকারে প্রস্তুত হইলেন এবং নানা প্রকারে উত্তেজিত করিয়া অষ্ট্রিয়াকে পীডমণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য করিলেন। ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার বিপক্ষে রণে অবতীর্ণ হইল (১৮৫৯)। ম্যাজেণ্টা ও সলফারিনো-র যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া পরাজিত হইল, কিন্তু যুদ্ধজয়ের মধ্যখানে তৃতীয় নেপোলিয়ন অকস্মাৎ কাভুরের সঙ্গে কোন পরামর্শ না করিয়া অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে ভিলাফ্রাঙ্কার যুদ্ধবিরতি সম্পন্ন করিলেন (১৮৫৯)। তৃতীয় নেপোলিয়ন ইটালী হইতে অষ্ট্রিয়ার বিতাড়নের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ফ্রান্সের স্বার্থরক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ ইটালী সৃষ্টির জন্য

কাভুরের লক্ষ্য ও পন্থা

পীডমণ্টের নেতৃত্বে ইটালীর ঐক্য এবং ইউরোপীয় রাষ্ট্রের মিত্রতা লাভ

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান

ফ্রান্সের সহানুভূতি ও সাহায্য

অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম

প্রস্তুত ছিলেন না। উক্ত যুদ্ধবিরতি ও পরবর্তী সন্ধির শর্ত হিসাবে পীডমণ্ট অষ্ট্রিয়া-অধিকৃত লম্বার্ডি লাভ করিল, কিন্তু ভিনিস অষ্ট্রিয়ার অধিকারেই রহিয়া গেল। অতঃপর মধ্য ইটালীর পার্মা, মডেনা, টাস্কানী এবং পোপের অধিকারভুক্ত কিছু স্থান স্বেচ্ছায় সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্ত হইলে পীডমণ্টের নেতৃত্বে উত্তর ইটালীর ঐক্যসাধন সম্পূর্ণ হইল (১৮৬০)। মাত্র পোপের অধীন রোম ও দক্ষিণের নেপল্‌স ও সিসিলী নবগঠিত উত্তর ইটালীর রাজ্যের বহির্ভূত রহিল।

উত্তর ইটালীর ঐক্যসাধন

উত্তর ও মধ্য ইটালীর ঐক্য সম্পন্ন হইলে দক্ষিণের নেপলস্ ও সিসিলীর জনসাধারণের মধ্যে তথাকার বুরবোঁ বংশীয় নরপতির বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই স্থানে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিল এবং বিদ্রোহীরা ইটালীর বীর যোদ্ধা গ্যারিবল্ডীকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানাইল। গ্যারিবল্ডী এক সহস্র 'লালকর্তা' অনুচর লইয়া সিসিলীতে অবতরণ করিলেন। অনতিবিলম্বে সিসিলী তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। তিনি নেপলস্-এ উপস্থিত হইলেন এবং নরপতিকে বিতাড়িত করিয়া নেপলস্ও অধিকার করিলেন। গ্যারিবল্ডীর এই অভিযান কাভুরের জ্ঞাতসারেই হইয়াছিল। কাভুরের পক্ষে দক্ষিণ ইটালী জয় বা প্রত্যক্ষভাবে গ্যারিবল্ডীর সাহায্য বা সমর্থন করা তৎকালীন রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির দিক হইতে সম্ভবপর ছিল না। কাজেই গ্যারিবল্ডীর সাহায্যে দক্ষিণ ইটালীর মুক্তিসাধনই তিনি চাহিয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডী নেপলস্ ও সিসিলী জয় করিয়া পোপের রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে কাভুর প্রত্যক্ষভাবে রণে অবতীর্ণ হইলেন এবং গ্যারিবল্ডী জয় করার পূর্বেই পোপের রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। অতঃপর গ্যারিবল্ডীর বিজিত নেপলস্ ও সিসিলী পীডমণ্টের সহিত সংযুক্ত হইতে চাহিলে গ্যারিবল্ডী তাহাতে বাধা দিলেন না। এইভাবে একমাত্র ভিনিস ও রোম ব্যতীত সমগ্র ইটালী ঐক্যবদ্ধ হইল। ১৮৬৬ খৃঃ অষ্ট্রিয়া-প্রাশিয়া যুদ্ধের সময়ে ভিনিস ও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ার যুদ্ধের সময়ে রোম ইটালীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রোম অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ইটালী ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

ইটালীর স্বাধীনতা ও ঐক্যবন্ধনের সংগ্রামে চারিজন নেতার নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য—ম্যাটসিনী, গ্যারিবল্ডী, কাভুর ও পীডমণ্টের নরপতি ভিক্টর ইমানুয়েল। এই নেতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে ম্যাটসিনীর আদর্শবাদ, কাভুরের কূটনৈতিক বুদ্ধি, গ্যারিবল্ডীর অসি এবং ভিক্টর ইমানুয়েলের ধৈর্য এই চারিটি গুণের সম্মিলিত ফল হইল পরাধীনতা হইতে ইটালীর মুক্তি ও ঐক্যবন্ধন

গ্যারিবল্ডী :—গ্যারিবল্ডী ইটালীর স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নায়ক ছিলেন। তিনি অল্প বয়সে 'তরুণ ইটালী' দলে যোগদান করেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহের অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। প্রাণদণ্ডাজ্ঞার হাত এড়াইয়া তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় পলায়ন করেন এবং তথাকার স্থানীয় বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেন। ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে জন-অভ্যুত্থানের সংবাদ অবগত হইয়া তিনি ইটালীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং একদল অনুচর সংগ্রহ করিয়া স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগদান করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইটালীর আন্দোলন ব্যর্থ হইলে তাঁহাকে ধৃত করার জন্য অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনী চেষ্টা করেন। গ্যারিবল্ডী ইহাদের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইটালীর গিরিকন্দরে এবং বনে জঙ্গলে আত্মগোপন করেন। এই পলায়মান অবস্থায় তাঁহার পত্নী ও সঙ্গিনী এ্যানিটার মৃত্যু হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে গ্যারিবল্ডী আমন্ত্রিত হইয়া নেপলস ও সিসিলীকে মুক্ত করেন। এইভাবে স্বদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রত্যেক সঙ্কট সময়ে রণে অবতীর্ণ হইয়া তিনি স্বদেশকে সঙ্কটের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের অবসানের পরে ত্যাগের জন্য যখন পুরস্কারের সময় আসিল, তখন তিনি পদমর্য্যাদা বা প্রতিষ্ঠালাভের সকল প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া স্বীয় বাসস্থানে ফিরিয়া গেলেন। ম্যাটসিনী ছিলেন আদর্শবাদী কিন্তু গ্যারিবল্ডী মূলত পুরুষকার ছিলেন। ইটালীর স্বাধীনতা যুদ্ধের আদর্শ সৈনিকরূপে তিনি দেশের জন্য সর্বতোভাবে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি একমাত্র তরবারির শক্তির উপরেই বিশ্বাস করিতেন, রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনে যে সময়ে সময়ে রফা আপোষ বা সুযোগের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হয় তাহাতে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। গ্যারিবল্ডীর কৃতিত্ব সম্বন্ধে ইহা স্বীকার্য্য যে ইটালীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষ পর্বে যেখানে কাভুরের কূটনীতিক চাল ব্যর্থ হইয়াছে, সেখানে তিনি তরবারির সাহায্যে প্রতিবন্ধকতা দূর করিয়া স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। কাভুর গ্যারিবল্ডীর এই ব্যক্তিস্বরূপের সম্যক পরিচয় জানিতেন তাহাকে দক্ষিণ ইটালী জয়ে অব্যর্থ অস্ত্ররূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

গ্যারিবল্ডী

জার্মানীর ঐক্য :—ইটালীর ঐক্য আন্দোলনের সমকালেই জার্মানীরও

ঐক্যসাধনের আন্দোলন চলে। ইটালীর ন্যায়—জার্মানীর ঐক্যলাভের পশ্চাতে জার্মানীর একটি মাত্র রাষ্ট্রের প্রচেষ্টা রহিয়াছে। উত্তর জার্মানীর প্রাশিয়া নামক দেশের নেতৃত্বে সমগ্র জার্মানীর ঐক্য সাধিত হইয়াছিল।

জার্মানীর সমস্যা ইটালী অপেক্ষা জটিল ছিল। নেপোলিয়নের বিজয়ের পূর্বে ইহার রাজ্যসংখ্যা তিনশতের অধিক ছিল। নেপোলিয়ন জার্মানীর উপর অধিকার স্থাপন করিয়া জার্মানীকে ৩৯টি রাজ্যে পরিণত করিলেন। ইহা দ্বারা তিনি জার্মানীর ভবিষ্যৎ ঐক্যের পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ফরাসী বিপ্লবের ভাবাদর্শও জার্মান জাতির মনে নূতন প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছিল। নেপোলিয়নের অধীনতাপাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য জার্মানী নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় এবং লিপজিকের যুদ্ধে জার্মানী বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। নেপোলিয়নের আসন্ন পতনের সম্ভাবনায় সমগ্র জার্মানী মুক্ত ও স্বাধীন জীবন যাপনের প্রত্যাশায় উন্মুখ হইয়া উঠিল। ভিয়েনা কংগ্রেসের সদস্যগণ প্রাক-বিপ্লবকালীন রাজনৈতিক অবস্থার পুনঃ প্রবর্তন করিয়া জার্মানীতে পুনরায় ৩৯টি রাজ্যের সমবায়ে একটি দুর্বল রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন করিলেন। এই রাষ্ট্রসঙ্ঘকে জার্মানীর বৃহত্তম রাজ্যদ্বয় অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার কর্তৃত্বাধীনে রাখা হইল। এইভাবে জার্মান জাতির জাতীয়তা ও ঐক্যসাধনের পরিপন্থী সমস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করায় জার্মান জাতি অসন্তুষ্ট হইয়া রহিল। জার্মানী পরবশ্যতা হইতে মুক্ত হইল বটে, কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য দূরে রহিল।

জার্মানীর ঐক্যের পথে যথেষ্ট অন্তরায় ছিল। জার্মান ঐক্যের প্রথম প্রতিবাদী ছিল অস্ট্রিয়া। অস্ট্রিয়া জার্মান রাষ্ট্র হইলেও ইহার সাম্রাজ্য জার্মানেতর জাতিগোষ্ঠী লইয়া গঠিত ছিল। যদি জার্মানীতে জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের নীতি গৃহীত হয়, তাহা হইলে জার্মানেতর জাতিগোষ্ঠী দ্বারা গঠিত অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব জার্মানীতে আর চলিবে না, অস্ট্রিয়ার হস্ত হইতে একদিকে যেমন জার্মানীর নায়কত্ব স্খলিত হইয়া পড়িবে, অপরদিকে জাতীয়তাবাদ জয়যুক্ত হইলে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যও ভাঙ্গিয়া যাইবে; এই সকল কারণে অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিক মাত্র জার্মানীকে দুর্বল করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না জার্মানীর জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমূলে বিনষ্ট করার জন্য জার্মানীর কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি পরিষদ ডায়েটের হাত দিয়া ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কার্লসবাদ বিধানাবলী নামে দমনমূলক আইন পাশ করাইয়া লইলেন। অস্ট্রিয়ার প্রতিকূলতা ব্যতীত জার্মানীর বিভিন্ন রাষ্ট্রবর্গের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও ঈর্ষা জার্মানীর

জার্মান ঐক্যের প্রতিবন্ধক

অস্ট্রিয়ার প্রতিকূলতা

(খ) বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব

ঐক্যের অন্যতম অন্তরায় হইয়াছিল। কোন রাষ্ট্রই স্বীয় সার্বভৌম-অধিকার কাহারও নিকট বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল না। মেটারনিকের বিরোধিতা বা অন্যান্য প্রতিকূলতার জন্য জার্মানীর ঐক্য-প্রচেষ্টা ব্যাহত হইলে প্রাশিয়া জোলভারেন (Zollverein) নামে একটি শুল্ক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্থনৈতিক ঐক্যসূত্রের দ্বারা পরবর্তী রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পূর্বসূচনা করিল। অষ্ট্রিয়া ব্যতীত জার্মানীর আটত্রিশটি রাষ্ট্র এই সঙ্ঘের সভ্য এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার সদস্যেরা একটি সাধারণ নীতি অনুসরণ করিয়া চলিল। এতদ্ব্যতীত দার্শনিক ফিচে, হেগেল, রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাবীদ হেগেল, ঐতিহাসিক হাউসার প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক চিন্তার ধারা জার্মানীর দৃষ্টিভঙ্গীকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিল।

জোলভারেন

চিন্তার ক্ষেত্রে উন্নত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রচার

১৮৪০ হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জার্মানজাতি জার্মানীর রাষ্ট্রীয় ঐক্য আনয়নের জন্য বিবিধ আন্দোলন করে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে বিপ্লব উপস্থিত হইলে জার্মানীতেও উহার প্রভাব বিস্তৃত হয়। শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও ঐক্য সম্পাদনের ভিত্তিতে এই আন্দোলন আরম্ভ হয়। ফ্রাঙ্কফোর্ট নামক স্থানে জার্মানীর সংবিধান রচনার প্রণয়ন করিয়া নেতৃত্বভার প্রাশিয়ার হস্তে সমর্পণ করিলে অষ্ট্রিয়ার প্রতিকূলতায় ভীত প্রাশিয়া এই সম্মান ও দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। এইভাবে ১৮৪৮—৫০ সালের জাতীয় আন্দোলন ব্যর্থ হইয়া গেল জার্মানীর উপর অষ্ট্রিয়ার প্রভাব ও আধিপত্য জার্মানীর ঐক্যের অন্তরায় এই সত্য প্রমাণিত হইল।

১৮৪৮—৫০ খৃষ্টাব্দের আন্দোলন

বিসমার্ক: জার্মানীর ঐক্য সাধন:—১৮৬১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম প্রাশিয়ার অধিপতি হন। প্রাশিয়ার উজ্জ্বল ভবিষ্যতে তাঁহার যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল এবং প্রাশিয়ার নেতৃত্বে যে জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিবে এই আশাও তিনি পোষণ করিতেন। প্রাশিয়ার নেতৃত্বপদ এবং জার্মানীর ঐক্য নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আসিবে না, শক্তির পরিচয় দিয়া অর্জন করিতে হইবে তাঁহার এই মনোভাব ছিল। এই কার্যের জন্য তিনি বিসমার্ককে উপযুক্ত মনে করিয়া ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে প্রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী (Minister-President) নিযুক্ত করেন। ইতিপূর্বে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রাশিয়ার পার্লামেন্টে যখন এক প্রস্তাব আনীত হয়, তখন বিসমার্ক খুব যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা ইহা সমর্থন করেন। এই বক্তৃতা নরপতি উইলিয়মের মনোভাবের অনুকূল ছিল। সুতরাং উইলিয়ম বিসমার্ককে প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করিতে দ্বিধা করিলেন না। বিসমার্ক রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন এবং রাজতন্ত্রে অধিক আস্থাশীল

ছিলেন। সামরিক-শক্তির (blood and iron) সাহায্য ব্যতীত জার্মানীর ঐক্যবন্ধন অসম্ভব ইহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ১৮৬৪—১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি তিনটি জয়লাভ করিয়া জার্মানীর ঐক্য সম্পন্ন করিলেন। প্রথমে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি জার্মানীর রাজ্য সীমায় অবস্থিত অথচ ডেনমার্কের দ্বারা অধিকৃত ও শাসিত শ্লেসউইগ্ ও হলেষ্টিন নামক দুইটি স্থানের আধিপত্য লইয়া ডেনমার্কের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এই যুদ্ধে বিসমার্ক অষ্ট্রিয়াকে প্রাশিয়ার সহযোগী করিয়া লইয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে ডেনমার্কের পরাজয়ের পরে এই দুইটি স্থানের অধিকার লইয়া বিসমার্ক পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ীই অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে বিবাদের সৃষ্টি করিলেন। অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য্য স্থির করিয়া বিসমার্ক ইতিপূর্বেই কূটনীতির বন্দোবস্তের দ্বারা ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইটালীর প্রাশিয়া-পক্ষ সমর্থনের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

বিসমার্ক

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে স্যাডোয়ার যুদ্ধে অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করিয়া বিসমার্ক প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করিলেন। ইটালী প্রাশিয়ার পক্ষে ছিল বলিয়া পুরস্কার স্বরূপ অষ্ট্রিয়ার অধিকৃত ভিনিস অধিকার করিল। জার্মানীর চারিটি দক্ষিণস্থ রাজ্য উত্তর-জার্মান রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগদান করিল না। এই চারিটি রাষ্ট্র প্রাশিয়ার নেতৃত্ব অস্বীকার করিয়া ফ্রান্সকেই তাহাদের পৃষ্ঠপোষক মনে করিত এবং প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের মুখাপেক্ষী ছিল। বিসমার্ক উপলব্ধি করিলেন যে যদি ফ্রান্সকে জার্মানজাতির আক্রমণকারী প্রতিপন্ন করা যায়, তাহা হইলে দক্ষিণী রাষ্ট্রবর্গ জার্মাণজাতির সহজ বৈরী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে উত্তর জার্মানীর সঙ্গে যোগদান করিতে পারে। মোট কথা ফ্রান্সের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়া ফ্রান্সকে পরাজিত করিতে পারিলেই জার্মানীর ঐক্য সম্পন্ন হইতে পারিবে। ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বিসমার্ক অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া এবং ইটালীকে স্বীয় দলভুক্ত করিয়া লইলেন। অতঃপর বিসমার্ক স্পেনের সিংহাসনের প্রার্থীর পদ লইয়া ফ্রান্সের সঙ্গে বিবাদের সৃষ্টি করিলেন। বিসমার্ক ঘটনাচক্রকে এমন সুকৌশলে পরিচালিত করিলেন যে ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স সেডানের যুদ্ধে জার্মানীর নিকট পরাজিত হইল।

ফ্রান্সের যুদ্ধ ঘোষণায় দক্ষিণী রাষ্ট্র চতুষ্টয় ইতিপূর্বেই ফ্রান্সের বিরুদ্ধে উত্তর জার্মানীর সঙ্গে সংযুক্তভাবে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। এই ভাবে বিসমার্কের কূটনীতির প্রতিভার বলে জার্মানীর ঐক্য সম্পাদিত হইল। ইটালী এই যুদ্ধে জার্মানীর পক্ষে থাকিয়া ফরাসী সৈন্যদের দ্বারা পরিরক্ষিত পোপের নগরী রোম অধিকার করিয়া লইল। জার্মানীর সঙ্গে ইটালীর ঐক্যও সম্পূর্ণ হইল।

বিসমার্কের কৃতিত্ব

১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিসমার্ক জার্মানীর ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন। তিনি অসাধারণ রাষ্ট্রনৈতিকজ্ঞান ও কূটনৈতিক বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে এমন ব্যক্তি তাঁহার সমকালে ইউরোপে বিরল ছিল। প্রতিপক্ষ যত প্রবল হোক না কেন, কৌশলে তিনি তাহাকে স্বীয় মতানুবর্তী করিয়া লইতে সক্ষম ছিলেন। ইউরোপের সকল দেশের রাষ্ট্রনেতারা বিসমার্কের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন যে, তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী ইহাদের যুক্তি [illegible] স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধ করিতেন। জার্মানীর ঐক্য সাধনের ব্যাপারে তাঁহার লোকোত্তর দূরদর্শিতা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। জার্মানীর ঐক্য সম্পাদিত হইবার পর তিনি নবগঠিত জার্মান রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ইউরোপের অপরাপর দেশের সঙ্গে জার্মানীকে মৈত্রী বন্ধ করিয়া ফ্রান্সকে মিত্রহীন অবস্থায় রাখিয়া দেন। নানা প্রকারে ইংলণ্ডের প্রীতিসাধন করিয়া তিনি ইংলণ্ডের সদিচ্ছা অর্জন করেন। আভ্যন্তরীণ দিক দিয়াও বিসমার্ক জার্মানীর উন্নতি সাধনের জন্য বহুবিধ সংস্কার সাধন করেন। বিসমার্কের অর্থনৈতিক ও শিল্পোন্নয়ন মূলক ব্যবস্থার ফলে শিল্প এবং বাণিজ্যে জার্মানী ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। বিসমার্ক রাজতন্ত্রে আস্থাশীল ছিলেন, গণতন্ত্রে তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। জার্মানীকে সুদৃঢ় রাজতন্ত্রের অধীনে একটি আদর্শ উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য তিনি আগ্রহান্বিত ছিলেন। গণতন্ত্রী বা সমাজতন্ত্রীরা তাঁহার অ-গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তির জন্য তাঁহার প্রতিকূলতা করেন। ইহাদের সহিত তাঁহার সুদীর্ঘকাল বিরোধ চলে। অবশেষে জার্মানীতে সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার বন্ধ করার জন্য তিনি রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে শ্রমিক কল্যাণমূলক বহু আইন প্রণয়ন করেন। তাঁহার এই ব্যবস্থা ষ্টেট সোসিয়ালিজম নামে পরিচিত। ফ্রান্সের ক্যাথলিকদের সঙ্গে বিসমার্কের তীব্র বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। এই বিসমার্ক-ক্যাথলিক সংগ্রাম জার্মানীর ইতিহাসে কুলটুর ক্যাম্ফ (Kultur Kampf) বা সভ্যতার সংগ্রাম বলিয়া খ্যাত। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিসমার্ককে ক্যাথলিক দলের সঙ্গে আপোষ করিতে হয়। জার্মানীর

অধিপতি দ্বিতীয় উইলিয়মের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বিসমার্ককে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নিকট-প্রাচ্য সমস্যা: তুর্কী সাম্রাজ্য ও বল্কান অঞ্চলের ইতিহাস:— ইউরোপের নিকট-প্রাচ্য সমস্যা অটোমান বা তুর্কী সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র করিয়া উদ্ভূত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত তুর্কী সাম্রাজ্য এশিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপের বল্কান অঞ্চলে বিস্তার নীতি অনুসরণ করিতে থাকে। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কী বাহিনী ভিয়েনার দ্বার পর্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানা কারণে তুর্কী সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। তুর্কী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে স্বাতন্ত্র্য লাভের জন্য বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিশেষতঃ বল্কানের অত্যাচারিত খৃষ্টানগণ তুর্কী শাসনের দুর্বিষহ অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য জাতিগতভাবে অভ্যুত্থানের চেষ্টা করে।

তুর্কী সাম্রাজ্যের এই দুর্বলতার সুযোগে প্রতিবেশী রাষ্ট্র রাশিয়া তুর্কী সাম্রাজ্যের নিকট হইতে কৃষ্ণ সাগরীয় অঞ্চল অধিকার করিয়া ভূমধ্যসাগরে প্রবেশের চেষ্টা করে। রাশিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জলপথে পশ্চিম ইউরোপে যাতায়াতের পথ আবিষ্কার করা। রাশিয়ার জার প্রথম পিটারের আমল হইতে পরবর্তী কালের সকল ক্ষমতাপন্ন নরপতিই তুরস্কের অংশ বিশেষ হস্তগত করিয়া রাশিয়ার সীমানা প্রসারিত করার চেষ্টা করিতেছিলেন। এইভাবে রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতিতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতিতে ইংলণ্ডের স্বার্থই সর্বাধিক বিপন্ন হইবার আশঙ্কা ছিল। রাশিয়া যদি তুর্কী সাম্রাজ্যকে গ্রাস করিয়া কাস্পিয়ান সাগরের আধিপত্য হস্তগত করে তাহা হইলে ইংলণ্ডের মিশর, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচ্য সাম্রাজ্য বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে। অষ্ট্রিয়াও রাশিয়ার রাজ্যসীমা বৃদ্ধির বিপক্ষে ছিল কেন না রাশিয়ার আধিপত্য তুরস্কের বল্কান অঞ্চলে বিস্তৃত হইলে এই অঞ্চলে অষ্ট্রিয়ার রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা। ফ্রান্সও রাশিয়ার রাজ্যবিস্তারের বিরোধী ছিল। কেননা ফ্রান্স তুর্কী সাম্রাজ্যে বাণিজ্য ও ধর্ম-সংক্রান্ত কতকগুলি বিশেষ অধিকার ভোগ করিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পতনোন্মুখ তুর্কী সাম্রাজ্য সম্বন্ধে কি করা কর্তব্য তাহা ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের সম্মুখে এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। রাশিয়ার নিজের স্বার্থের জন্য মুমূর্ষু (Sick man of Europe) তুর্কী সাম্রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়া স্ব স্ব স্বার্থে রাশিয়ার প্রস্তাবের বিরোধিতা করিল। রাশিয়া বিভিন্ন

নিকট-প্রাচ্য বা তুর্কী সাম্রাজ্যের সমস্যা

সময়ে সুযোগমত তুর্কী সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া অংশ বিশেষ গ্রাস করার চেষ্টা করিল। ইংলণ্ড প্রমুখ অন্যান্য রাষ্ট্র তুরস্কের রক্ষার জন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে লাগিল; ১৮৫৪—৫৬ খৃষ্টাব্দের ক্রিমিয়ার যুদ্ধ এইরূপ পরিস্থিতিতে উদ্ভূত হয়। রাশিয়া পরাজিত হইয়া প্যারিসের সন্ধিতে তুরস্কের যে সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, প্যারিসের সন্ধি ১৮৫৬

ইতিমধ্যে তুরস্কের অধিকৃত বল্কান রাজ্যসমূহে স্বাধীনতার আন্দোলন উপস্থিত হয়। ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা স্বাতন্ত্র্য অর্জনের চেষ্টা করে। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে গ্রীস স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তুরস্কের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মলডেভিয়া ও ওয়ালেচিয়া প্রদেশদ্বয় সম্মিলিত হইয়া রুমানিয়া নাম ধারণ পূর্বক স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি করে। তুরস্ক ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ইহার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে। রুমানিয়া সৃষ্টির পরে বল্কানের অন্যান্য খৃষ্টান রাজ্যে তুরস্কের অধীনতা পাশ হইতে মুক্তির আন্দোলন আরম্ভ হয়। সার্বিয়া, বসনিয়া মন্টিনিগ্রো, বুলগেরিয়া ও হার্জিগভনিয়ায় এই আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠে। তুরস্ক অত্যন্ত নিষ্ঠুর বর্বরতার সঙ্গে এই জাতীয় আন্দোলন দমন করিতে চেষ্টা করে। রাশিয়া বল্কানে তুরস্কের এই দমননীতির বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তুরস্ক পরাজিত হইয়া সান ষ্টিফানোর সন্ধিতে সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো ও বুলগেরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিল এবং রাশিয়া ইউরোপে তুর্কী সাম্রাজ্যের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রাপ্ত হইল।

বল্কান সমস্যা

স্বাধীনতার আন্দোলন

সান ষ্টিফানোর সন্ধিতে তুরস্কে রাশিয়ার প্রতিপত্তি অত্যধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে দেখিয়া ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া রাশিয়াকে সান ষ্টিফানোর সন্ধি পুনঃ বিবেচিত হওয়ার প্রস্তাবে সম্মত করাইল। বার্লিনে নূতন করিয়া এই সন্ধি বিবেচিত হইল (১৮৭৮)। বার্লিনের সন্ধিতে মন্টিনিগ্রো, সার্বিয়া ও রুমানিয়া এই তিনটি রাষ্ট্রের সার্বভৌম স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। বুলগেরিয়াকে তিন অংশে বিভক্ত করা হইল; ম্যাসিডোনিয়া নামে এক অংশ ও পূর্ব রুমেলিয়া নামে অপর এক অংশ তুরস্কের অধীনে রহিল। তবে পূর্ব রুমেলিয়া একজন খৃষ্টান শাসকের দ্বারা শাসিত হইবে ইহা স্থির হইল; অবশিষ্ট অংশ বুলগেরিয়া নামে স্বায়ত্তশাসিত দেশরূপে পরিচিত হইল।

সানষ্টিফানো ও বার্লিনের সন্ধি ১৮৭৮

রুমানিয়া ও হার্জিগভিনিয়া অষ্ট্রিয়ার দখলে ও শাসনাধীনে আসিল। রাশিয়া আর্মেনিয়ার কিয়দংশ ও বেসারাবিয়া প্রাপ্ত হইল। ইংলণ্ড তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে সাইপ্রাস দ্বীপ লাভ করিল।

বার্লিন চুক্তি তুরস্কের ভৌমিক অক্ষুণ্ণতা রক্ষার জন্য রচিত হইলেও কার্যতঃ ইহার ফলে তুরস্ক তাঁহার আয়তন ও জনসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধাংশ হইতে বঞ্চিত হইল। ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ রাশিয়ার প্রাধান্য খর্ব করিতে সমর্থ হইল এবং বল্কানে কয়েকটি নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইল। কিন্তু বল্কানের বিভিন্ন অঞ্চলের জাতীয়তাবাদের আশা অপূর্ণ রাখার ফলে ভবিষ্যতে বল্কান ইউরোপের অশান্তির লীলানিকেতন হইয়া উঠিল। স্বার্থান্ধ বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গ বল্কানে স্ব স্ব আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য স্বেচ্ছানুরূপ বল্কানের গঠন ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর দীর্ঘকালব্যাপী জাতীয় আন্দোলন ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করিলেন। ম্যাসিডোনিয়াকে তুরস্কের অধীনে রাখা, রুমানিয়ার অঞ্চল বিশেষ রাশিয়াকে অর্পণ করা, বুলগেরিয়াকে দ্বি-খণ্ডিত করা এবং সর্বোপরি বসনিয়া ও হার্জিগভিনিয়াকে সার্বিয়ার পরিবর্তে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত রাখা মোটেই সঙ্গত হয় নাই। বল্কানের এই অপূর্ণ জাতীয়তাবাদকে উপলক্ষ্য করিয়াই ১৯১২ ও ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের বল্কান যুদ্ধ এবং ১৯১৪—১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়াছিল।

বার্লিন সন্ধির ত্রুটি ভবিষ্যৎ অশান্তির কারণ

প্রশ্নোত্তর

1. Briefly describe the principles underlying the European settlement at the Congress of Vienna, 1815. Criticise its provisions.

১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ভিয়েনা বন্দোবস্তের মূলনীতিসমূহ সংক্ষেপে বিবৃত কর। এতৎসহ ভিয়েনা বন্দোবস্তের সমালোচনা কর।

উত্তর-সূত্র : (১) ভূমিকা : ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়নকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার পর বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গের প্রতিনিধিগণ ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের জন্য ভিয়েনায় সমবেত হইলেন। তাঁহাদের সম্মুখে সমাধানসাপেক্ষ দুইটি প্রধান সমস্যা ছিল—প্রথমতঃ নেপোলিয়নকৃত ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা; দ্বিতীয়তঃ ভবিষ্যতে যাহাতে ইউরোপের শান্তি বিঘ্নিত না হয় সে সম্বন্ধে আত্ম-

এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রতিবিধান করা। আপাতদৃষ্টিতে মাত্র এই দুইটি প্রধান সমস্যা থাকিলেও এই দুইটি সমস্যা হইতে উদ্ভূত উপ-সমস্যা এবং তাহাদের জটিলতা এত অধিক ছিল যে ইহাদের সকলের সুষ্ঠু সমাধান এক প্রকার অসম্ভব ছিল। ভিয়েনা বৈঠকের প্রধান কর্মকর্তাগণ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণের সঙ্গে আলোচনার পরিবর্তে প্রথমে তাঁহারা নিজেদের মধ্যে আপোষ আলোচনা এবং পারস্পারিক সন্ধি-সর্তের সাহায্যে অনেক সমস্যা মিটাইয়া ফেলিলেন। পরিশেষে, তাহারা তাহাদের কৃত সিদ্ধান্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহকে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য করিলেন।

(২) তিনটি প্রধান নীতিকে কেন্দ্র করিয়া ভিয়েনা বৈঠকের সিদ্ধান্ত স্থির করা হয়। প্রথমতঃ, বিজয়ী মিত্রপক্ষের জন্য পুরস্কার ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা এবং তৎসহ বিজিত ফ্রান্স ও ফ্রান্সের সহকারী রাষ্ট্রসমূহের যথোপযুক্ত দণ্ডবিধান; দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যথাসম্ভব প্রাক-বিপ্লব অবস্থার পুনঃ প্রবর্তন, এবং তৃতীয়তঃ, ইউরোপের ভবিষ্যৎ শান্তি অব্যাহত রাখার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা।

(৩) মিত্রপক্ষের ক্ষতিপূরণ ও পুরস্কার: রাশিয়া, প্রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া, ইংলণ্ড ও সুইডেন বিস্তীর্ণ অঞ্চল লাভ করিল। শাস্তিস্বরূপ ফ্রান্সের বিজিত অঞ্চল কাড়িয়া লওয়া হইল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ফ্রান্সের নিকট হইতে অর্থ দাবি করা হইল এবং পাঁচ বৎসরের জন্য একদল অবস্থানকারী সৈন্য চাপাইয়া দেওয়া হইল।

(৪) ইউরোপীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রাক-বিপ্লব অবস্থার প্রবর্তন: এই উদ্দেশ্যে যথাপূর্বং নীতি অনুসৃত হইল, ফ্রান্স, নেপলস, স্পেন, পীডমণ্ট, সার্ডিনিয়া, হল্যাণ্ড, রাইন অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহে পূর্বতন রাজবংশ ও ভ্যাটিকান সহরে পোপ পুনঃ অধিষ্ঠিত হইলেন।

(৫) ইউরোপের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা: ফ্রান্সের দ্বারা ইউরোপের শান্তি বিঘ্নিত হইতেছে দেখিয়া ফ্রান্সের চতুর্দ্দিকে রক্ষাবলয়স্বরূপ রাষ্ট্রবর্গকে শক্তিশালী করা হইল। এতদ্ব্যতীত ফরাসী বিপ্লবের আদর্শবাদ হইতে ইউরোপকে দূরে রাখার জন্য ভিয়েনার কর্তৃপক্ষ Concert of Europe বা ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমবায়ের ব্যবস্থা করিলেন।

(৬) সমালোচনা: ত্রুটিসমূহ (ক) স্বার্থপরতাদুষ্ট বন্দোবস্ত (খ) বিপ্লবী নবযুগকে অস্বীকার করা (গ) গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের নীতি অস্বীকৃত: (ঘ) প্রাক বিপ্লব অবস্থার প্রবর্তনে রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা (ঙ) যথাপূর্বং ও বৈধাধিকার নীতি সর্বত্র অনুসৃত হয় নাই (চ) পূর্ণ ঊনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া পরিবর্তন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়া ভিয়েনা বন্দোবস্তের জের টানিয়াছিল।

ভিয়েনা বন্দোবস্তের সমর্থনে নিম্নোক্ত ঘটনাসমূহও উল্লেখযোগ্য : (ক) এই ব্যবস্থা আগামী চল্লিশ বৎসর ইউরোপের শান্তিরক্ষায় সহায়ক হইয়াছিল (খ) ইহার সর্তাবলীর কয়েকটির মধ্যে ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনার বীজ নিহিত ছিল—ইটালী ও জার্মানীর ঐক্যবন্ধনের পরোক্ষ সূচনা (গ) বহুক্ষেত্রে বিপ্লবের যুগে বা নেপোলিয়নের আমলে কৃত রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক পরিবর্তন স্বীকৃত।

2. Give an account of the July Revolution of 1830 and its effects. ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের জুলাই বিদ্রোহ ও তাহার ফলাফল সম্বন্ধে বিবরণ দাও।

উত্তর-সূত্র : - (৫৭ পৃষ্ঠা)

3. What do you know about the Revolution of 1848 in France and in Europe? ফ্রান্স ও ইউরোপের ১৮৪৮ খৃঃ-র বিপ্লব সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

উত্তর সূত্র :—(১) ভূমিকা : এই বিপ্লবের সূচনা হয় ফ্রান্সে; ক্রমশঃ এই বিপ্লব ইউরোপে বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনসাধারণের মনে রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি করিয়া বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য অনুপ্রাণিত করে। ফ্রান্সের অনুকরণে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে, ইটালীতে, বোহেমিয়ায়, হাঙ্গারীতে, এবং জার্মান রাষ্ট্রে ও গ্রেটব্রিটেনে কম-বেশী আন্দোলন দেখা দেয়।

(২) বিপ্লবের কারণ : ফ্রান্সে জুলাই রাজতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক অকর্মণ্যতার বিরুদ্ধে অসন্তোষ; অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে কেন্দ্রীয় শাসনের স্বৈরাচার ও অ-ব্যবস্থা এবং জাতীয়তাবাদের অস্বীকার; ইটালী ও জার্মানীতে গণতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, সমাজতন্ত্রী মতবাদের প্রসারও এই বিপ্লবের অন্যতম কারণ।

(৩) বিপ্লব : ফ্রান্সে রাজতন্ত্র বিলোপ ও দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা; অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যভুক্ত ইটালীতে, বোহেমিয়ায়, কসুথের নেতৃত্বে হাঙ্গারীতে এবং অন্যত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দেখা দেয় এবং প্রথম দিকে সাফল্যলাভ করে; জার্মানীতে গণতন্ত্রী ও ঐক্যমূলক আন্দোলন—ফ্রাঙ্কফোর্ট মহাসভা; ইটালীতে ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডীর নেতৃত্বে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুদয় : কাষ্টোজা ও নোভারার যুদ্ধে পরাজয় ও ব্যর্থতা।

(৪) ব্যর্থতার কারণ : (ক) উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা লইয়া মতদ্বৈধতা, (খ) ইটালী ও জার্মানীতে অন্তর্বিরোধ, (গ) আঞ্চলিক স্বার্থচিন্তা ও সঙ্কীর্ণতামূলক দ্বন্দ্ব, (ঘ) অষ্ট্রিয়ার সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব, (ঙ) বিচক্ষণ নেতৃত্বের অভাব।

(৫) ফলাফল : আপাততঃ ব্যর্থ হইলেও ব্যর্থতা হইতে শিক্ষালাভ;

আন্দোলনের দোষত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত এবং তদনুযায়ী পরবর্তী কর্মপন্থা অনুসরণ করা। বিসমার্ক ও কাভুর পরবর্তীকালে আন্দোলনের ধারা পরিবর্তন করিয়া যথাক্রমে জার্মানী ও ইটালীর ঐক্য আন্দোলন পরিচালিত করেন এবং সাফল্যলাভ করেন।

4. Write briefly the story of the Unification of Italy. ইটালীর ঐক্যবন্ধনের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর।

উত্তর সূত্র :—(১) ভূমিকা : ইটালীতে ঐক্যবন্ধনের যথেষ্ট অন্তরায় ছিল। নেপোলিয়ন ইটালী জয় করিয়া ইহার উত্তর অঞ্চলকে একটি ঐক্যবদ্ধ রাজ্যাংশ রূপে শাসন করেন। ইহাতে ইটালিয়ানদের মনে ঐক্যবদ্ধতার স্পৃহা জাগ্রত হয়। কিন্তু ভিয়েনা সম্মেলন নেপোলিয়নকৃত ব্যবস্থা বাতিল করিয়া প্রাচীন বিচ্ছিন্ন অবস্থা বহাল রাখেন। ইহাতে জাতীয়তাবাদীদের মনে নিরাশার সঞ্চার হয়।

(২) ইটালীর ঐক্যবন্ধনের অন্তরায় : উত্তরাঞ্চল অষ্ট্রিয়ার প্রত্যক্ষ অধিকারভুক্ত—মধ্য ইটালীতে অষ্ট্রিয়ার হ্যাপস্‌বার্গ বংশীয়র রাজত্ব করিতেন; নেপলস-সিসিলীতে ফ্রান্সের বুরবোঁ বংশধর নরপতি ছিলেন; পোপের রাজ্য ঐক্যের অন্যতম প্রতিবন্ধক ছিল। সর্বোপরি ইটালিয়ানদের মধ্যে প্রাদেশিকতাবোধ ও ঐক্যতন্ত্রী মনোভাবের অভাব।

(৩) আন্দোলনের ইতিহাস, ১৮১৫-৫০ : ঐক্য আন্দোলনের দুইটি ভাবধারা—গণতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদী, দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের চেষ্টা ও অষ্ট্রিয়ার নাগপাশ হইতে মুক্ত করা। প্রথম দিকে কার্বোনারি (গুপ্ত সমিতি)-র নেতৃত্ব ১৮২০ ও ১৮৩১-৩২ সালের নিষ্ফল বিদ্রোহ, ম্যাটসিনীর জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রচারের জন্য কর্মপ্রচেষ্টা : 'ইয়ং ইটালী' সমিতি, ইটালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে পীডমণ্টের নেতৃত্বে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা : কাষ্টোজা ও নোভারায় পরাজয়—রোমে ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডীর নেতৃত্বে প্রথমে জয়লাভ পরিশেষে ফ্রান্সের হস্তক্ষেপে পরাজয় ও পলায়ন : আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত।

(৪) ১৮৫০-৭০ : (ক) কাভুরের অভ্যুদয় ও তাঁহার নীতি : বিদেশী সাহায্য গ্রহণ ও পীডমণ্টের নেতৃত্বে ইটালীর ঐক্যবন্ধন; এই নীতি অনুযায়ী তাঁহার কর্মপন্থা; ক্রিমিয়ায় যুদ্ধে যোগদান ও ফরাসী-মৈত্রী অর্জন; সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সহিত প্লমবিয়ার্স-এর চুক্তি, অষ্ট্রিয়া সার্ডিনিয়া যুদ্ধ—অষ্ট্রিয়ার পরাজয়—ভিলাফ্রাঙ্কার সন্ধি—উত্তর ও মধ্য ইটালীর ঐক্যবন্ধন (১৮৬০)। ভিনিস, রোম ও নেপলস-সিসিলী ব্যতীত সমগ্র ইটালী সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ

(খ) কাভুরের কূটকৌশলে ও গ্যারিবল্ডীর বীরত্বের ফলে নেপলস-সিসিলী উত্তর ইটালীর অন্তর্ভূক্ত (১৮৬০)।

(গ) ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের সময়ে ভিনিস অধিকৃত।

(ঘ) ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ার যুদ্ধের সময়ে রোম অধিকৃত।

(ঙ) ইটালীর ঐক্যবন্ধনের পশ্চাতে ম্যাটসিনীর ত্যাগ ও আদর্শ, কাভুরের কূটনীতি, গ্যারিবল্ডীর শৌর্য এবং সার্ডিনিয়ার নরপতি ভিক্টর ইম্মানুয়েল-এর ধৈর্য বর্তমান ছিল।

5. Write briefly the story of the German Unification

জার্মানীর ঐক্যবন্ধনের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর সূত্র: (১) ভূমিকা: ইটালীর ন্যায় ১৮১৫-৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জার্মানীর ইতিহাস অষ্ট্রিয়ার আধিপত্য, জাতীয় অনৈক্য, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ঈর্ষা ও ক্ষমতাদ্বন্দ্ব এবং গণতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদী আশা, আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের পরে বিসমার্কের নেতৃত্বে প্রাশিয়ার অধীনে পরিবর্তিত নীতি অনুসরণের ফলে জার্মানী ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত। মাত্র তিনটি যুদ্ধ—ডেনিস যুদ্ধ (১৮৬৪), অষ্ট্রো প্রাশিয়ান যুদ্ধ (১৮৬৬) ও ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ (১৮৭০) দ্বারাই জার্মানী ঐক্য সম্পাদিত হইয়াছিল।

(২) জার্মানীর ঐক্যের অন্তরায়: নেপোলিয়নের সময়ে জার্মানী শতশত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সমষ্টি হইতে ৩৯টি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। জার্মান ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র তিনটি প্রধান অন্তরায়ের জন্য সম্ভবপর হয় নাই। প্রথমতঃ, নেতৃত্ব লইয়া অষ্ট্রিয়া প্রাশিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা; দ্বিতীয়তঃ, অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্য প্রধানতঃ অ-জার্মান দেশ ও জাতি লইয়া গঠিত হওয়ায় জার্মান ঐক্য প্রচেষ্টায় অষ্ট্রিয়ার বিরোধিতা; তৃতীয়তঃ, জার্মানীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা বিভেদ।

(৩) জার্মানীর ঐক্যবন্ধনের জন্য প্রাশিয়ার নেতৃত্বই স্বাভাবিক ছিল। প্রথমতঃ, প্রাশিয়া খাঁটি জার্মান রাষ্ট্র; দ্বিতীয়তঃ, সামরিক শক্তিতে প্রাশিয়া জার্মানীতে শ্রেষ্ঠতম রাষ্ট্র; তৃতীয়তঃ, ইতিমধ্যে প্রাশিয়া Zollverein নামক শুল্ক সঙ্ঘের দ্বারা অর্থনৈতিক নেতৃত্ব করিয়া জার্মানীতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের পূর্ব সূচনা করে।

(৪) ১৮৪৮-৫০ খৃষ্টাব্দের জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন অষ্ট্রিয়ার বিরোধিতায় ব্যর্থ জার্মানীর উপর অষ্ট্রিয়ার প্রভাব ও আধিপত্য জার্মানীর ঐক্যের পরিপন্থী হইয়া রহিল।

(৫) বিসমার্কের অভ্যুদয় এবং তাঁহার লক্ষ্য ও কার্যক্রম: তিনটি নীতি: সামরিক শক্তিতে বিশ্বাস, গণতান্ত্রিক উপায়ে অবিশ্বাস এবং প্রাশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বে ও নেতৃত্বে

বিশ্বাসী। তাঁহার কার্য্যক্রম প্রথমতঃ, অষ্ট্রিয়াকে জার্মানীর ভাগ্যনিয়ামকের পদ হইতে বিতাড়িত করা; দ্বিতীয়তঃ, জার্মানীর ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের প্রাশিয়ার নেতৃত্ব সম্বন্ধে ঈর্ষাসন্দিগ্ধ মনোভাবের দূরীকরণ।

(৬) প্রাশিয়ার সামরিক বলের সাহায্যে বিসমার্ক তাঁহার কার্যক্রম বাস্তবে পরিণত করিলেন। প্রথমতঃ, কূটনৈতিক প্রতিভার দ্বারা রাশিয়ার নিরপেক্ষতা অর্জন করেন। অতঃপর তিনি তিনটি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, প্রথমটি ডেনমার্কের সঙ্গে যুদ্ধ (১৮৬৪); ইহার দ্বারা অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে বিরোধের কারণ সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের পূর্বে ফ্রান্স ও রাশিয়ার নিরপেক্ষতা অর্জন করিলেন। অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সাত সপ্তাহের যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া পরাজিত হইল (১৮৬৬)। অষ্ট্রিয়া জার্মানীর ব্যাপার হইতে বিতাড়িত, উত্তর জার্মান রাষ্ট্র (North German Union) সৃষ্ট। দক্ষিণী রাষ্ট্র চতুষ্টয় যোগদান করিল না। তাহারা ফ্রান্সের মুখাপেক্ষী হইয়া রহিল।

দক্ষিণী রাষ্ট্রসমূহকে উত্তর জার্মান রাষ্ট্রে যোগদানে সম্মত করার জন্য ফ্রান্সের সঙ্গে প্রাশিয়ার যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা, বিসমার্ক কর্তৃক যুদ্ধের উপলক্ষ্য সৃষ্টি। ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের প্রাক্কালে বিসমার্কের সফল কূটনীতির ফলে ফ্রান্স মিত্রচ্যুত—সিডানের যুদ্ধে (১৮৭০) ফ্রান্সের পরাজয়। দক্ষিণী রাষ্ট্র চতুষ্টয় উত্তর জার্মান রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগদান করিল জার্মান ঐক্য সম্পন্ন হইল।

6. What were the contributions of Mazzini, Garibaldi and Cavour for the Unification of Italy?

ইটালির ঐক্যবন্ধনের জন্য ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডী ও কাভুরের দান বর্ণনা কর।

ম্যাটসিনি: ইটালীর জাতীয়তাবাদের প্রথম উদ্গাতা—ভৌগোলিক নামমাত্রশেষ (Geographical Expression) ইটালীর সংশয়াচ্ছন্ন যুগে তিনি স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ইটালীর স্বপ্ন দেখেন ও 'নব্য ইটালী' সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশবাসীকে এই স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব—দেশবাসীকে স্বদেশের জন্য মমত্ববোধ, ত্যাগ ও স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা। এতদ্ব্যতীত তিনি ইটালিয়ানদের মনে আল্পস হইতে আড্রিয়াটিক পর্যন্ত অখণ্ডতাবোধের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। স্বদেশ সম্বন্ধে আঞ্চলিকতার পরিবর্তে সমগ্রতাবোধের সঞ্চার করা—ইহাই স্বাধীনতা সংগ্রামে ম্যাটসিনির সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। ১৮৩০ ও ১৮৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দের গণ-আন্দোলনের মূলে ছিল ম্যাটসিনির পরিচালিত যুবশক্তির সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। ম্যাটসিনি সাধারণতন্ত্রী ইটালীর রাষ্ট্র স্থাপনে বিশ্বাসী ছিলেন। বাস্তব কর্মতালিকায় তাঁহার কার্যাবলী বিশেষ সাফল্য লাভ করে নাই বা ইটালী তাহার

সাধারণতন্ত্রী লক্ষ্য স্বীকার করে নাই; কিন্তু স্বাধীনতার জন্য মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুতিই ম্যাটসিনির স্বাধীনতা আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ দান। তাহার দ্বারা প্রস্তুত ভিত্তির উপর পরবর্তীদের চেষ্টায় স্বাধীনতা-সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে। এইজন্যই তাঁহাকে ইটালীর স্বাধীনতার জনক বলা হইয়া থাকে।

গ্যারিবল্ডী: ম্যাটসিনি ছিলেন আদর্শবাদী, গ্যারিবল্ডী ছিলেন মূর্ত প্রকাশকার। ইটালীর স্বাধীনতা যুদ্ধের আদর্শ সৈনিকরূপে তিনি দেশের জন্য সর্বতোভাবে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, পারিবারিক আরাম-বিলাস বা বিশ্রাম সুখ কোন কিছুকেই তিনি প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল দেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং এইজন্য তিনি তরবারির শক্তির উপরই বিশ্বাস করিতেন, রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনের খাতিরে যে সময়ে সময়ে রফা-আপোষ বা সুযোগের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয় তাহাতে তিনি বিশ্বাস করিতেন না।

এই আপোষহীন বে-পরোয়াভাবের ফলে অনেক সময় তিনি কাভুরকে বিব্রত ও স্বোপার্জিত বিজয়কে বিপন্ন করিয়াছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্বে যেখানে কাভুরের কূটনৈতিক চাল ব্যর্থ হইয়াছে সেখানে তিনি তরবারির সাহায্যে প্রতিবন্ধকতা দূর করিয়া স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন।

স্বয়ং সাধারণতন্ত্রে বিশ্বাসী হইলেও তিনি সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে রাজতন্ত্রী ব্যবস্থা মানিয়া লইয়াছেন এবং কষ্টার্জিত বিজয়ের ফল নরপতি ভিক্টর ইম্যানুয়েল-এর হস্তে অর্পণ করিয়া অলক্ষ্যে ইটালীর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ হইতে অপসৃত হইয়াছেন। এমনই অপূর্ব ছিল তাঁহার আত্মমতবাদের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত দেশানুরাগ। এইরূপ নিরভিমান, নির্লোভ আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুব সুলভ নহে (He turned history into an epic and politics into romance)।

কাভুর: কাভুর ম্যাটসিনির বিপরীতধর্মী—বাস্তববাদী এবং লক্ষকর্মের ফল-প্রাপ্তিতে আস্থাশীল। তিনি সার্ডিনিয়ার রাজতন্ত্রী অধিনায়কত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। ইটালী আত্মশক্তিতে স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারিবে ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। ইটালীর সমস্যাকে ইউরোপীয় সমস্যায় পরিণত করিয়া বিদেশী রাষ্ট্রের সহানুভূতির সাহায্যে ইটালীর স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে—ইহা তাঁহার বিশ্বাস ছিল। এই লক্ষ্য অনুযায়ী তিনি কর্মপন্থা অনুসরণ করেন এবং ফ্রান্সের মৈত্রী অর্জন করিয়া ইটালীর স্বাধীনতা অর্জনে সাফল্যলাভ করেন। সুযোগের জন্য অপেক্ষা করা, সুযোগের উপলক্ষ্য সৃষ্টি করা এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য সম্পন্ন করা এই বিচক্ষণ রাষ্ট্রনৈতিক বুদ্ধি তাঁহার ছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান, ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী, অষ্ট্রিয়াকে আক্রমণকারী

প্রতিপন্ন করা এবং কার্যসিদ্ধির জন্য গ্যারিবল্ডীকে পরোক্ষে উৎসাহিত করা এবং কার্যোদ্ধারের পর তাহাকে নিষ্ক্রিয় করা তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক বিচক্ষণতার অপূর্ব দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে। তিনি বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহকে স্বমনোনীত লক্ষ্যাভিমুখে চালিত করিয়া কার্যসিদ্ধি করিয়াছেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের উচ্চাশা, মাট্‌সিনীর ভাবাদর্শ, গ্যারিবল্ডীর সমরপ্রতিভা—সকল অনুকূল প্রবাহকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তিনি ইটালীর স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালিত করিয়াছেন। "Italy as a nation, is the legacy, the life work of Cavour"—এই উক্তি কাভুরের কৃতিত্ব সম্বন্ধে অনিবার্যরূপে প্রযোজ্য।

7. What is 'Near Easten Question' and how it was sought to be solved by the European Powers in the 19th Century.

'নিকট-প্রাচ্য সমস্যা' কাহাকে বলে? উনবিংশ শতাব্দীতে এই সমস্যার সমাধানের জন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের দ্বারা কি চেষ্টা হইয়াছে বল!

উত্তর-সূত্র :—(৬৬ পৃষ্ঠা)।

চতুর্থ অধ্যায়

শিল্প-বিপ্লব ঃ শিল্পমূলক সভ্যতা ও তাহার ফলাফল

Syllabus : Industrial Civilization. Industrial Revolution in England Changes in Europe and impact upon the world with special reference to India.

পাঠ্যসূচী :—শিল্পমূলক সভ্যতা। ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব। ইউরোপে বিভিন্ন পরিবর্তন এবং সমগ্র পৃথিবীর উপর শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব। ভারতের উপর শিল্প-বিপ্লবের বিশেষ আলোচনা।

শিল্প-বিপ্লব :—অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনার ফলে ইংলণ্ডে শ্রমশিল্পে যন্ত্রের প্রয়োগ হইতে লাগিল। মানুষের শ্রমশক্তির পরিবর্তে যন্ত্রশক্তি অর্থাৎ বাষ্পীয় শক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি ইত্যাদি শিল্প সৃষ্টির কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে যন্ত্রশক্তির প্রয়োগ ক্রমাগত চলিতে থাকিলেও উনবিংশ শতাব্দীতে তাহা অত্যন্ত দ্রুত হইয়া উঠে। যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংলণ্ডে অংসখ্য কলকারখানা গড়িয়া উঠিল—ইংলণ্ডে তিনটি বৃহৎ ব্যবহারিক শিল্প গড়িয়া উঠিল। বয়ন, লৌহ ও কয়লা। এইভাবে ইংলণ্ডের শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন সংঘটিত হইল তাহাই 'শিল্প-বিপ্লব' নামে পরিচিত। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে ইংলণ্ডেই শিল্পবিপ্লবের সূত্রপাত হয় এবং ক্রমশঃ অপরাপর দেশেও ইহা বিস্তৃত হয়। যন্ত্রের প্রয়োগের ফলে এই ভাবে যে শিল্পের উন্নতি ও বাণিজ্যের বিস্তার ঘটিল তাহাতে ইংলণ্ডের সুবিধাই সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। ইংলণ্ডে লৌহ ও কয়লার খনি পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল, উপরন্তু তাহার ছিল বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য ও উপনিবেশের সুবিধা। শিল্পবিপ্লবের প্রথম যুগে ইউরোপের অন্যান্য দেশ আভ্যন্তরীণ সমস্যা লইয়াই বিব্রত ছিল, আর অ্যামেরিকা সদ্য নূতন রাষ্ট্ররূপে দেখা দিয়াছে। আভ্যন্তরীণ সমস্যা মিটিয়া যাইবার পরে ক্রমশঃ এই সমস্ত দেশে শিল্পে বিপ্লব আসিল।

ইংলণ্ডের বয়ন শিল্পেই নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রযুক্ত হইতে থাকে। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে কে (Kay) দ্রুতগামী মাকু (Flying Shuttle) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহাতে হাতে ঠেলা মাকুর অপেক্ষা অতি দ্রুত বস্ত্র বয়ন সম্ভবপর হইয়াছিল। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে হারগ্রীভস (Hargroaves) কর্তৃক স্পিনিং জেনী (Spinning Jenny) বা সূতা কাটিবার কল উদ্ভাবিত হইল। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে আর্করাইট (Arkwright) ওয়াটার ফ্রেম (Water-frame) বা একপ্রকার জলচালিত যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়াতে সূক্ষ্ম ও শক্ত সূতা

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার
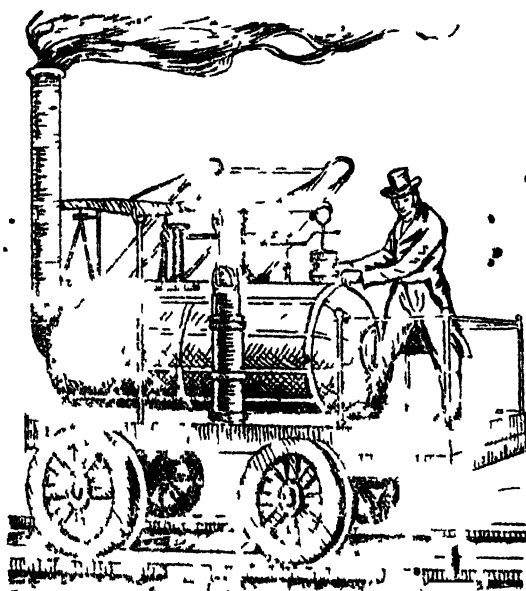
জেমস ওয়াট

কাটা হইতে লাগিল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কার্টরাইট যন্ত্রচালিত তাঁত আবিষ্কার করিলেন। এইভাবে বিভিন্ন যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে বয়ন শিল্পের দ্রুত উন্নত হইতে থাকে এবং অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ সূতা কাটা বা অধিক পরিমাণ বস্ত্রের উৎপাদন হইতে থাকে। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে জেমস্ ওয়াট বাষ্পশক্তির সাহায্যে চালিত এঞ্জিন আবিষ্কার করাতে এই যন্ত্র সূতা কাটা ও বস্ত্র বয়নের কাজে নিযুক্ত হইল।

প্রথম রেল ইঞ্জিন

বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হওয়াতে রেল ইঞ্জিন ও রেলপথ এবং বাষ্পচালিত জাহাজও নির্মিত হইল। বাষ্পীয় শক্তি ব্যবহারের ফলে জলপথে ও স্থল পথে পরিবহণ ব্যবস্থারও আশ্চর্য্যরকম উন্নতি হইল। ইহাদের সাহায্যে কাঁচা মাল ও পণ্যসামগ্রী দেশ দেশান্তরে প্রেরণ করা সম্ভবপর হইল। এই সমস্ত নূতন ব্যবস্থা শিল্পবিপ্লবকে দ্রুততর করিয়া তুলিল। উনিশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বিদ্যুৎ-শক্তি আবিষ্কৃত হইল। ইহার দ্বারা উৎপাদন প্রণালী আরও সহজতর হইয়া উঠিল। বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা যন্ত্র চালিত হইতে লাগিল। লোহ ও ইস্পাত গালানো এবং ঢালাইয়ের কাজেও বৈদ্যুতিক শক্তি প্রযুক্ত হইতে লাগিল। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে যানবাহন চলিতে আরম্ভ করিল। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতি আবিষ্কারের ফলে সংবাদ প্রেরণের ও গ্রহণের সুযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। এইভাবে যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটিল। ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লব কালক্রমে সমগ্র ইউরোপে এবং আমেরিকায় প্রসারিত হইল। এশিয়ার দেশগুলিও ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত রহিল না।

বাষ্পশক্তি

বিদ্যুৎশক্তি

হারগ্রীভস

শিল্পমূলক সভ্যতা :—শিল্পজগতে এই প্রকার বিপ্লবী পরিবর্তন সংঘটিত হওয়াতে ক্রমশ মানব-সভ্যতা শিল্প নির্ভর হইয়া উঠিল। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক—জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে মানুষ যান্ত্রিক শিল্পের মুখাপেক্ষী হইতে বাধ্য হইল। স্বল্প সময়ে এবং সুলভে অজস্র শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন হওয়াতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া গেল এবং আধুনিক সভ্যতার শিল্পনির্ভর না হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর রহিল না। জীবনযাত্রার যাবতীয় উপকরণ, যানবাহন-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার, জ্ঞানার্জনের সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধা শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমেই মানুষের করায়ত্ত হইয়াছে। বিশ্বের সুদূর প্রান্তের ক্ষুদ্রতম ঘটনাও আজ মানুষের জ্ঞানের পরিধির মধ্যে আসিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্তমান পৃথিবীর সভ্যতা 'যান্ত্রিক' সভ্যতায় রূপান্তরিত হইয়াছে বলিলেই ভুল বলা হয় না। শিল্পবিপ্লবের ফলাফলকে বিভিন্ন দিক দিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে।

সামাজিক :—সামাজিক জীবনে শিল্পবিপ্লবের ফলে এক বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইল। লোক এযাবৎকাল কৃষিনির্ভর ছিল। জমির এবং গ্রামাঞ্চলের সহিত এযাবৎকাল লোকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু শিল্পবিপ্লব দেশের অর্থনৈতিক জীবনে শিল্পের প্রাধান্য সৃষ্টি করাতে কৃষিকার্য্যের গুরুত্ব কমিয়া গেল। এতদিন সভ্যতা ছিল গ্রামীণ ও কৃষিপ্রধান, বর্তমানে সভ্যতা হইল নগর-কেন্দ্রিক ও শিল্পনির্ভর। গ্রাম হইতে লোক শহরের শিল্পাঞ্চলে কর্মপ্রত্যাশায় আসিয়া ভিড় করিতে আরম্ভ করিল। নূতন নূতন কলকারখানায় অজস্র শ্রমিক নিযুক্ত হইতে লাগিল। যান্ত্রিক উৎপাদনে মানুষের শ্রমের বেশী প্রয়োজন না হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে বেকার সমস্যাও প্রবল হইয়া উঠিল। শিল্পবিস্তারের ফলে দেশের যাহা ধনসম্পদ তাহা মালিকদের হস্তগত হইতে লাগিল। ফলে সমাজে মূলধনী ও শ্রমিক এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মালিকরা যেমন শ্রমিকদের শোষণ করিয়া একদিকে নিজেদের ঐশ্বর্য্য, প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত করিতে লাগিল অপরদিকে দরিদ্র শ্রমিক-শ্রেণী ঘনবসতি বস্তী অঞ্চলে স্বল্পায়তন বিশিষ্ট এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করিয়া মনুষ্যজীবনের আনন্দ, সুখস্বাচ্ছন্দ্য স্বাস্থ্য, নৈতিকতা সমস্ত কিছু হইতে ভ্রষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে সমাজে ধনী ও দরিদ্র, মালিক ও শ্রমিকের বৈষম্য বিস্তৃত হইল।

গ্রামীণ সভ্যতার পরিবর্তে নাগরিক সভ্যতা

ধনী দরিদ্রের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য

অর্থনৈতিক :—যান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর সাহায্যে অল্পসময়ে অজস্র শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং ইহার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রও দেশ হইতে দেশান্তরে প্রসারিত হইতে লাগিল। বিভিন্ন দেশের মধ্যে নিজস্ব পণ্য বিক্রয়ের জন্য প্রতিযোগিতা ও নূতন নূতন বাজার সন্ধানের চেষ্টা আরম্ভ হইল। সুতরাং যন্ত্রবিপ্লবের পরিণামস্বরূপ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের সূত্রপাত হইল। এই সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ পূর্বতন কালের সাম্রাজ্যবাদ হইতে পৃথক। এই সাম্রাজ্যবাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কাঁচা মাল ও প্রস্তুত পণ্য বিক্রয়ের জন্য নিজস্ব বাজার সংগ্রহ করা। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে নূতন নূতন বাজার সংগ্রহের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল। পৃথিবীর অনগ্রসর কোন অঞ্চল ইহাদের লোলুপ দৃষ্টির বাহিরে যাইতে পারিল না। এশিয়া ও আফ্রিকা ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে নিজস্ব প্রভাবান্বিত অঞ্চলরূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাজনৈতিক শাসন ও অর্থনৈতিক লুন্ঠন সমভাবেই চলিতে আরম্ভ করিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ বাণিজ্যের দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতে লাগিল।

সাম্রাজ্যবাদ

যান্ত্রিক উন্নতির ফলে পুরাতন শিল্পোৎপাদন প্রণালীর পরিবর্তে নূতন শিল্পোৎপাদন প্রণালী প্রবর্তিত হওয়ায়, বিপুলায়তন কলকারখানার সৃষ্টি হইতে লাগিল। এই সকল বৃহদায়তন কলকারখানায় লক্ষ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত হইতে লাগিল এবং বড় বড় মূলধনীরা শিল্পের পশ্চাতে অধিকতর অর্থ মূলধনরূপে নিযুক্ত করিয়া অধিকতর অর্থ উপার্জনের পন্থা উদ্ভাবন করিতে লাগিল। শিল্পাঞ্চলসংশ্লিষ্ট নূতন নূতন শহর, বন্দর এবং শিল্পদ্রব্য পরিবহণের জন্য দেশের সর্বত্র রাস্তাঘাট, রেলওয়ে, ষ্টীমার ইত্যাদি প্রচলনের ফলে সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক জীবনে রূপান্তর আসিল।

রাজনৈতিক :—এই সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা রাজনৈতিক জীবনেও প্রতিফলিত হইল। প্রত্যেক দেশের শিল্পপতিগণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ গ্রহণ করিল। শ্রমিকশ্রেণীও নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তারের জন্য অগ্রসর হইয়া আসিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শ্রমিকদের রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। ইউরোপের বিভিন্ন রাজনৈতিক বিপ্লব ও আন্দোলনে তাহারা নিজেদের সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের ভিত্তিতে অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল। ইউরোপের ১৮৪৮ ও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিল—ইংলণ্ডের চার্টিষ্ট আন্দোলনও ছিল মুখ্যতঃ শ্রমিক আন্দোলন। শ্রমিকরা ক্রমশঃ 'ট্রেড ইউনিয়ন' গঠন করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে চেষ্টা করে। শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার উন্নতির জন্য মালিক ও শ্রমিককে ভিত্তি করিয়া সোস্যালিজম বা সমাজতন্ত্রবাদ নামে নূতন মতবাদ গড়িয়া উঠে। এই মতবাদ মুখ্যতঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক হইলেও ইহা কার্য্যকরী করার জন্য রাজনৈতিক আধিপত্যের প্রয়োজন ছিল। সমাজতন্ত্রী আন্দোলন ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়া পৃথিবীর সমস্ত দেশেই স্বীকৃত হইয়াছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে শ্রেণীবৈষম্য বিলোপ করিয়া সর্বস্তরে অর্থনৈতিক সমতা আনয়ন করাই সমাজতন্ত্রবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্রবাদ সর্বপ্রথম জার্মানীতে স্বীকৃত হয়। বিসমার্কের ন্যায় স্বৈরাচারী রাষ্ট্রনায়ক পর্যন্ত, সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া শ্রমিককল্যাণ আইনসমূহ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

শ্রমিক ও মূলধনীর মধ্যে বিরোধ

সমাজতন্ত্রী মতবাদ

ভারতের উপর শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল :—শিল্পবিপ্লবের ফলে প্রত্যেক দেশেই দেশের প্রয়োজনের অনুপাতে অত্যধিক পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইতেছিল। এই সমস্ত মাল দেশের অভ্যন্তরে বিক্রয় করা সম্ভবপর ছিল না বলিয়া শিল্পোন্নত দেশসমূহ পৃথিবীর সর্বত্র বিক্রয়ের জন্য বাজার খুঁজিতে আরম্ভ করিল এবং এই বাজার অধিকার করারই

নামান্তর হইল সাম্রাজ্যবাদ। এই সাম্রাজ্যবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যাধীন দেশের শিল্প ধ্বংস করিয়া যান্ত্রিকশিল্পজাত দ্রব্য তথায় প্রচলন করা। ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষ এই ব্যাপারের উজ্জল দৃষ্টান্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বৃটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সমকালেই ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব আরম্ভ হয়। বৃটিশ-অধিকারের পূর্বে শ্রমশিল্পে প্রস্তুত ভারতের সূক্ষ্ম বস্ত্র মসলিন, তাঁতের কাপড়, সিল্ক, কাঠ ও হস্তিদন্তনির্মিত দ্রব্যাদির ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যথেষ্ট চাহিদা ছিল। যন্ত্রবিপ্লবের পরেও ভারতে প্রস্তুত তুলাজাত ও রেশমজাত বস্ত্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বারা ইংলণ্ডে আমদানী করা হইলে এই সকল দ্রব্য অত্যন্ত সমাদৃত হয়। কিন্তু যান্ত্রিক উন্নতি হওয়ার ফলে ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পের ক্রমশঃ উন্নতি হয়। যন্ত্রচালিত তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্রের মূল্যের সহিত প্রতিযোগিতায় হস্তচালিত তাঁতবস্ত্র টিকিতে পারিল না। ভারতীয় বস্ত্র শিল্পকে রক্ষা করার জন্য ভারতবর্ষে প্রয়োজনীয় আইন অথবা যান্ত্রিক সুবিধা প্রবর্তনের জন্য শাসক ইংরেজজাতি কোন চেষ্টা করিল না। বরঞ্চ বৈধ বা অবৈধ বহুবিধ উপায়ে ভারতীয় বস্ত্র শিল্প ধ্বংস করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হইল না। বস্ত্র ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যও ইংলণ্ড হইতে ভারতে অবাধে আমদানী করা হইতে লাগিল। বিলাতী দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতের কুটির শিল্পসমূহ টিকিতে না পারিয়া ক্রমশঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যিক অধিকারও ভারতের হস্ত হইতে ইংরেজদের আয়ত্তে আসিল। ভারত উৎপন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্র হইতে কাঁচা মাল সরবরাহের দেশে পরিণত হইল। এইরূপে ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হইয়া গেল।

যান্ত্রিক পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে শ্রমশিল্পের পরাজয়

ভারতের শিল্প সম্পূর্ণ বিনষ্ট

ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের অবনতির সূত্রপাত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বৃটিশ পার্লামেন্টের ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে নির্দিষ্ট নীতি, কলে প্রস্তুত সস্তা বিলাতী দ্রব্যের প্রতিযোগিতা এবং দেশীয় শিল্পবাণিজ্যকে রক্ষার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের অনিচ্ছা বা অক্ষমতাজনিত উদাসীনতা—সমস্ত মিলিয়া একযোগে ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Explain 'Industrial Revolution'. Give a brief account of the Industrial Revolution in England.

শিল্প বিপ্লব বলিতে কি বুঝায়? ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তর-সূত্র : (১) ভূমিকা : অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা—ইহার ফলে শিল্পোৎপাদন প্রণালীতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন। মানুষের শ্রমশক্তির পরিবর্তে বাষ্পীয় শক্তি এবং পরবর্তীকালে বৈদ্যুতিক শক্তি ইত্যাদির ব্যবহার। এইভাবে শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত যুগান্তকারী পরিবর্তন শিল্পবিপ্লব নামে পরিচিত।

(২) ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে ইংলণ্ডেই শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয় এবং ক্রমশঃ অপরাপর দেশেও বিস্তৃত হয়। ইংলণ্ডে তিনটি প্রধান ব্যবহারিক শিল্প গড়িয়া উঠে—বয়ন, লৌহ ও কয়লা।

(৩) শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডেরই সর্বাধিক সুবিধা হইয়াছিল—ইংলণ্ড বিশ্বব্যাপী উপনিবেশ ও ব্যবসাবাণিজ্যের অধিকারী ছিল। শিল্পবিপ্লবের প্রথম যুগে ইউরোপের অন্যান্য দেশ আভ্যন্তরীণ সমস্যা লইয়া বিব্রত ছিল, আর আমেরিকা সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

(৪) ইংলণ্ডে বয়ন শিল্পে নূতন আবিষ্কারের প্রয়োগ—বাষ্পচালিত ইঞ্জিন—উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রমশিল্পে বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োগ।

(৫) ফলাফল।

2. What were the various effects of the Industrial Revolution?

শিল্প-বিপ্লবের বিভিন্ন ফলাফলের বিবরণ দাও।

উত্তর সূত্র : ফলাফল : (১) সামাজিক গ্রামীণ সভ্যতার পরিবর্তে নাগরিক সভ্যতা—ধনী দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি। (২) অর্থনৈতিক : যান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর সাহায্যে অজস্র উৎপাদন—বিভিন্ন দেশের মধ্যে পণ্য বিক্রয়ের জন্য প্রতিযোগিতা ও নূতন নূতন বাজারের সন্ধান—সাম্রাজ্যবাদের সূত্রপাত—নূতন নূতন শহরের সৃষ্টি—রাস্তাঘাট রেলওয়ে ষ্টীমার ইত্যাদির প্রচলনের ফলে সর্বত্র অর্থনৈতিক জীবনের রূপান্তর। (৩) রাজনৈতিক শিল্পপতিগণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য করিতে

লাগিল—শ্রমিক শ্রেণী অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্যের জন্য অগ্রসর হইয়া আসিল। শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা—সমাজতন্ত্রী মতবাদের প্রসার।

3. What was the impact of the Industrial Revolution in India ?

ভারতবর্ষে শিল্প বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া কি?

উত্তর-সূত্র : (১) ভূমিকা : অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বৃটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সমকালেই ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব আরম্ভ হয়। ফলে ভারতবর্ষকেও এই বিপ্লবের ফলাফলের অংশীদার হইতে হয়। ভারতবর্ষ লাভবান হওয়া অপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্তই বেশী হয়।

যন্ত্রচালিত শিল্পনৈপুণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শিল্প পশ্চাৎপদ—ফলে ভারতীয় কুটির শিল্পের অধোগতি ও পরিণামে শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত।

(৩) ভারতীয় শিল্প ধ্বংস করার জন্য বৃটিশ সরকারের বৈধ ও অবৈধ বহু উপায় গ্রহণ—ভারতের অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত।

(৪) বৃটিশ পার্লামেন্টের ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিধিষ্টনীতি, যন্ত্রে প্রস্তুত সস্তা বিদেশী দ্রব্যের প্রতিযোগিতা এবং ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য রক্ষার জন্য ভারত সরকারের অনিচ্ছা বা ঔদাসীন্য—এই সমস্তই ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংসের কারণ এবং ভারতবর্ষে শিল্পবিপ্লবের প্রতিক্রিয়া।

পঞ্চম অধ্যায়

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ১৮৭৮-১৯১৪

Syllabus :—International Relations from 1878—1914 The expansion of Europe—partition of Africa.

পাঠ্যসূচী :—১৮৭৮ হইতে ১৯১৪ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। ইউরোপের সাম্রাজ্যবিস্তার—আফ্রিকার বাটোয়ারা।

১৮৭৮–১৯১৪ সময়কালের বৈশিষ্ট্য :—১৮৭৮ খৃষ্টাব্দকে এক হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম যুগ-সন্ধিকাল বলা যাইতে পারে—এই সন্ধিক্ষণে পুরাতনের বিদায় ও নূতনের উদ্বোধন হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে ইউরোপের সর্বত্র যে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের ধ্বনি উত্থিত হয়, তাহা বার্লিন কংগ্রেসে একপ্রকার সার্থকতার মধ্যে পরিসমাপ্ত হয়। বার্লিন কংগ্রেস এই দুইটি নীতিকে স্বীকৃতির মর্যাদা দিয়া বল্কানে কয়েকটি নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। তদুপরি দুইটি প্রধান রাষ্ট্র জার্মানী ও ইটালী সম্পূর্ণাঙ্গ হওয়াতে ইউরোপের রাজনৈতিক ভারসাম্য এক নূতন অবস্থার সম্মুখীন হইল। সর্বোপরি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নব নব আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের দৃষ্টিশক্তি মাত্র নিজ মহাদেশের চতুঃসীমায় আবদ্ধ রহিল না, ইউরোপের প্রভাব ও কর্মক্ষেত্র পৃথিবীর উভয় গোলার্দ্ধে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। নব নব রাষ্ট্রীয় আদর্শবাদ ও নব নব সমস্যা ইউরোপের রাষ্ট্রমানসকে বিচলিত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল।

এই সব উদ্বোধনের মূলে রহিয়াছে বিজ্ঞান ও শিল্পজগতের বিপ্লবকারী পরিবর্তন সমূহ। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়কে ব্যবহারিক কার্য্যে নিযুক্ত করিতে লাগিল। বাষ্পচালিত পোত, রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতি ভৌগোলিক ব্যবধানকে সংক্ষিপ্ত করিয়া দূরবর্তী দেশ ও মানুষকে নিকটতম করিল। কলকারখানায় নিজ নিজ দেশের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণ্যদ্রব্য স্বল্পব্যয়ে ও স্বল্পসময়ে উৎপন্ন হইতে লাগিল। সুয়েজ খাল খনিত হওয়াতে এশিয়া বা আফ্রিকা মহাদেশের সঙ্গে ইউরোপখণ্ডের যাতায়াতের সুবিধা হইল—পানামা খালের সাহায্যে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের ব্যবধান সংক্ষিপ্ত হইল; এক দেশের উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য অন্যদেশে স্বল্পব্যয়ে ছড়াইয়া দিবার সুযোগ হইল। এই সকল পরিবর্তনের

ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও যুগান্তর উপস্থিত হইল। ইউরোপের শিল্পপ্রধান দেশসমূহ কাঁচা মাল সংগ্রহ ও প্রস্তুত-পণ্যসম্ভার বিক্রয় করার জন্য একান্ত নিজস্ব বাজার খুঁজিতে আরম্ভ করিল। এইজন্য ইউরোপের দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের দেশসমূহের উপর পড়িল এবং এই দুই মহাদেশ লইয়া ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে উৎকট প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল। প্রধানতঃ বাণিজ্য-স্বার্থ রক্ষার জন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সামরিক ও পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হইতে লাগিল। উপনিবেশ স্থাপন বা বিদেশে সাম্রাজ্য প্রতিযোগিতা হইতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের তীব্র বিরোধ আরম্ভ হইল এবং এই পারস্পরিক বিরোধের মধ্যেই ভাবী মহা সমরের বীজ উপ্ত হইয়া রহিল।

শিল্পের অত্যধিক প্রসার ও সাম্রাজ্যবাদের সূত্রপাত বহু পূর্বেই হইয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে তাহা এত উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই। কেননা ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহের অধিকাংশেরই এত আভ্যন্তরীণ সমস্যা ছিল যে, তাহারা স্ব স্ব গার্হস্থ্য সমস্যার সমাধান না করিয়া বাহিরের এই সকল ব্যাপারে মনোনিবেশ করার মত অবকাশ পায় নাই। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের পরে ইউরোপের ঘরোয়া সমস্যার অনেকটা সুরাহা হয়। মধ্য ইউরোপে জার্মানী ও ইটালী স্বাধীন শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে অভ্যুদিত হইয়া এযাবৎকাল বিভিন্ন প্রকারের অধিকারভোগী রাষ্ট্র ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের সমকক্ষ হইবার জন্য সচেষ্ট হইল। সামাজিক উপনিবেশ বিস্তারে তাহারাও অগ্রগামী হইল। নূতন গোলার্দ্ধ হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও এশিয়ার নবোদিত সূর্য্যের দেশ জাপানও ক্রমশঃ উপনিবেশ বিস্তারে তৎপর হইল। ইহাদের স্বার্থ-সংঘাতে পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত হইতে চলিল। এই সময়কালে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলি তাৎপর্য্য মূলক—

(১) সমরোপকরণ বৃদ্ধির প্রতিদ্বন্দ্বিতা :—১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে সশস্ত্র শান্তির যুগ বলা চলে। এই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র নানা প্রকারে সমরোপকরণ বৃদ্ধি করিয়া স্ব স্ব রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করে। এই সমরোপকরণ বৃদ্ধির মূলে ছিল সদ্য ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর স্বীয় সামরিক ক্ষমতায় অত্যধিক বিশ্বাস ও তজ্জনিত দম্ভ। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতাদ্বন্দ্ব—পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহের আবহাওয়া বর্ত্তমান থাকায় শান্তির যুগের সমরসজ্জা হ্রাসপ্রাপ্ত না হইয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ ইউরোপে দুইটি পরস্পর বিরোধী দলের সৃষ্টি হইল—জার্মানী—অষ্ট্রিয়া—ইটালী এবং ফ্রান্স—রাশিয়া—ইংলণ্ড।

(২) **উগ্র জাতীয়তাবাদ**—একমাত্র জার্মানীতে এই উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ও বিকাশ হয়। জার্মান জাতি ইউরোপের অন্য সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই 'অহং'

মনোভাব জার্মানীর রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইতে থাকে। জার্মান সভ্যতা বা 'কুলটুর' পৃথিবীর অনগ্রসর অঞ্চলে প্রচার করিতে হইবে—ইহাই তদানীন্তন জার্মানীর সাহিত্য, শিল্প, দর্শন ও ইতিহাসের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইতে লাগিল। জার্মান্ কুলটুরের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান হইতে উৎপন্ন হইল উপনিবেশ বিস্তারের আগ্রহ। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মানীর জঙ্গী মনোভাব উগ্র জাতীয়তাবোধ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

(৩) **অপূর্ণ জাতীয়তাবাদ:** উগ্র জাতীয়তাবাদের সঙ্গে অপূর্ণ জাতীয় ও আশা ইউরোপের রাষ্ট্রসমাজকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। ফ্রান্স জার্মানীর হাত হইতে আলসেস লোরেন প্রদেশদ্বয় আনিবার জন্য ব্যগ্র; চেলেস উইগ এর ডেনগণ ও পোজেন-এর পোলগণ জার্মানীর প্রজা হওয়ার জন্য বিক্ষুব্ধ; অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারীর সাম্রাজ্যভুক্ত সার্ব, শ্লোভ, পোল—রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত পোল ও বাল্টিক উপকূলের ফিন প্রভৃতি জাতি স্ব স্ব ভাবাভাবীদের লইয়া স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের জন্য উন্মুখ। বল্কান অঞ্চলে এই অ-পরিতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিল এবং বল্কানের জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করিয়াই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হইল।

(৪) শ্রমিক সমস্যা ও সমাজতন্ত্রবাদ (পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে)।

(৫) **দূর প্রাচ্যে জাপানের অভ্যুদয়:** এই সময়েই প্রথম শ্রেণীর বিশ্বশক্তি-রূপে জাপানের অভ্যুদয় হয় এবং অল্পকালের মধ্যেই জাপান পাশ্চাত্যের শিক্ষা-দীক্ষা এমন কি কূটনীতিকে পর্যন্ত অনুকরণ ও আত্মস্থ করিয়া ফেলে। ১৮৯৪--৯৫ খৃষ্টাব্দে জাপান চীনকে পরাজিত করিয়া স্বীয় শক্তি সামর্থের পরিচয় দিল এবং ১৯০৪—৫ খৃষ্টাব্দে রাশিয়াকে পরাজিত করায় জাপানের ক্ষমতা বিশ্ব-রাষ্ট্ররূপে সর্বত্র স্বীকৃত হইল। অতঃপর দূরপ্রাচ্যে জাপানের সাম্রাজ্যবাদ ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরে এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিল।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক: ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি: ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সকে পরাজিত করার পর জার্মানীর প্রধানমন্ত্রী বিসমার্কের একমাত্র চেষ্টা ছিল পরাজিত ও রাইন অঞ্চলচ্যুত ফ্রান্সকে মিত্রহীন অবস্থায় ইউরোপে কোন ঠাসা করিয়া রাখা। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জার্মানী এবং অষ্ট্রিয়া হাঙ্গারীর মধ্যে দ্বিশক্তি জোট (Dual Alliance) সম্পন্ন করিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বিসমার্ক ইটালীকেও এই দলে টানিয়া দ্বিশক্তি জোটকে ত্রিশক্তি জোটে পরিণত করিলেন। বিসমার্ক রাশিয়াকেও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে হস্তগত করার জন্য চেষ্টা করিলেন। ১৮৭৮

বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি

খৃষ্টাব্দে বার্লিন কংগ্রেসে বিসমার্ক রাশিয়াকে বঞ্চিত করিয়া অষ্ট্রিয়াকে বল্কান-অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারে সুযোগ দিলে রাশিয়া জার্মানীর উপর বিরূপ হয়। তথাপি, বিসমার্ক যতদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, ততদিন রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে কোন বৈরীভাবের সৃষ্টি হয় নাই। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে জার্মানী এবং রাশিয়া এক চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিল যে, ইহাদের মধ্যে কেহ তৃতীয় রাষ্ট্রদ্বারা আক্রান্ত হইলে অপরজন কোন রাষ্ট্রে যোগদান না করিয়া নিরপেক্ষ থাকিবে। ইংলণ্ডও যাহাতে ফ্রান্সের সাহায্যের জন্য অগ্রসর না হয়, তজ্জন্য তিনি নানাবিধ উপায়ে ইংলণ্ডের মনস্তুষ্টির জন্য চেষ্টা করিলেন। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে বাণিজ্য ও উপনিবেশ লইয়া এশিয়া ও আফ্রিকায় যে মনান্তর ঘটিতেছিল, বিসমার্ক তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে ইংলণ্ড ও জার্মানীর মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। এইরূপে বিসমার্ক ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রকে জার্মানীর স্বপক্ষে আনিলেন এবং ফ্রান্সকে মিত্রহীন অবস্থায় রাখিয়া দিতে সমর্থ হইলেন। ইউরোপে জার্মানীর বিরুদ্ধে কোনপ্রকার রাষ্ট্রজোট গঠিত হইতে পারিল না।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের সহিত মনান্তর ঘটিলে বিসমার্ক অবসর গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় উইলিয়ম স্বহস্তে জার্মানীর শাসনভার গ্রহণ করিলেন। পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কাইজার বিসমার্কের ব্যবস্থার বিপরীত পন্থার অনুসরণ করিলেন। তিনি তুরস্ক সাম্রাজ্যকে উপলক্ষ্য করিয়া জার্মানীর স্বার্থান্বেষণে তথায় রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করেন। এতদ্ব্যতীত বল্কানে তিনি অষ্ট্রিয়ার স্বার্থরক্ষার জন্য অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুতরাং রাশিয়া জার্মানীর সঙ্গে মৈত্রীর আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ফ্রান্সের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। ১৮৯১—৯৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বিপক্ষ চুক্তি (Dual Alliance) সম্পাদিত হইল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড জাপানের সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হইয়া স্বপক্ষে একটি শক্তিশালী দেশকে মিত্ররূপে প্রাপ্ত হইল। কাইজার তাঁহার নানাবিধ আচরণের দ্বারা ইংলণ্ডের মিত্রতাও নষ্ট করিলেন। আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধের সময় কাইজার ইংরেজ বিরোধী বুয়রদিগকে সমর্থন করিয়া ইংলণ্ডের বিরাগভাজন হইলেন। অধিকন্তু তুরস্কের সুলতানের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া কাইজার যখন বার্লিন-হইতে বাগদাদ পর্যন্ত এক রেলপথ স্থাপনে উদ্যত হইলেন, তখন ইংলণ্ড স্বভাবতই তাহার প্রাচ্য সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়িল। জার্মানীর জন্য নৌ-বাহিনী নির্মাণ বা প্রাচ্যের সাম্রাজ্য সম্বন্ধে ইংলণ্ড বিরোধী কার্যকলাপের ফলে ইংলণ্ডের পক্ষে জার্মানীর সহিত দীর্ঘকাল

রাশিয়া ফ্রান্সের দ্বিপক্ষ চুক্তি

সদ্ভাব রক্ষা ক র সম্ভবপর হইল না। অগত্যা ইংলণ্ড রাশিয়া ও ফ্রান্সের সহিত তাহার বিরোধ মিটাইয়া ১৯০৪ ও ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইল। এই তিন রাষ্ট্রের মৈত্রীচুক্তি ট্রিপল আঁতাত (Triple Entente) নামে পরিচিত। ইহা ইউরোপে জার্মানী-অষ্ট্রিয়া-ইটালী জোটের প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। এইরূপে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপে দুইটি পরস্পর বিবদমানি রাষ্ট্র-জোটের সৃষ্টি হইলে দুইপক্ষের মধ্যে সমরায়োজন অব্যাহতগতিতে আরম্ভ হইল।

ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মৈত্রী

ইউরোপের বিশ্বব্যাপী বিস্তার ঃ পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই ইউরোপের প্রভাব প্রতিপত্তি বাণিজ্য বা অন্যান্য কারণে ইউরোপের বাহিরে বিস্তৃত হইতেছিল। প্রধানতঃ স্পেন, পর্টুগাল, হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ এই প্রভাব প্রতিপত্তির বাহক ও ধারক ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে এই ইউরোপীয় অধিপত্য বিস্তার এত দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিল যে, বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ স্থানই ইউরোপের শ্বেতজাতি বা তাঁহাদের বংশ-সম্ভূতদের অধিকারে বা ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভাবক্ষেত্রে পরিণত হইল।

ইউরোপের এই উপনিবেশিক বিস্তার বা সাম্রাজ্যবাদের মূলে বহু কারণ বর্তমান রহিয়াছে। প্রথমতঃ, অর্থ নৈতিক কারণে এই বিস্তার ঘটিয়াছে। শিল্প বিপ্লবের ফলে পাইকারী ভাবে শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হওয়ায় কাঁচামাল সংগ্রহ বা প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য উপনিবেশের প্রয়োজন হইল। সত্বর প্রস্তুত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য ইউরোপের উপনিবেশিক রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতেই উপনিবেশ সমূহ সম্পূর্ণ নিজস্ব করার প্রচেষ্টা হইল এবং ইহা হইতেই সাম্রাজ্যবাদ উগ্ররূপে প্রসার লাভ করিল। আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা বা ব্যবসায়ে অধিকতর লাভের জন্যও ইউরোপ হইতে জনসাধারণ দূরদেশে যাইয়া বসতি স্থাপনের দ্বারা উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়াছে। এই বাণিজ্যিক অধিকারই রাষ্ট্রনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের অগ্রদূত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, অর্থ নৈতিক কারণ ব্যতীত রাষ্ট্রনৈতিক কারণও রহিয়াছে। ইউরোপের যে সকল দেশের বড় বিস্তৃত সাম্রাজ্য ছিল তাহাদের পক্ষে এই সকল সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহ রক্ষার জন্য নৌ-ঘাঁটিরও প্রয়োজন ছিল। তৃতীয়তঃ, ইউরোপের বাহিরে ইউরোপের সাম্রাজ্য বিস্তারের মূলে খৃষ্টধর্ম প্রচারেরও উদ্দেশ্য ছিল। বিধর্মীদের

উপনিবেশিক বিস্তারের কারণ

(ক) অর্থ নৈতিক

(খ) রাষ্ট্রনৈতিক

(গ) খৃষ্টধর্ম প্রচার

মধ্যে স্বধর্ম প্রচার খৃষ্টধর্মের অন্যতম অঙ্গ এবং এই উদ্দেশ্যে বিশ্বের সর্বত্র খৃষ্টান মিশনারী বা ধর্মপ্রচারক গমন করিয়াছে। ধর্মপ্রচার তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও তাহারা বিধর্মী দেশের রাষ্ট্র বা জনসাধারণের প্রতিকূলতা হইতে আত্মরক্ষার জন্য স্বীয় মাতৃরাষ্ট্রের নিকট সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করিতে দ্বিধা করে নাই। ধর্মপ্রচারকদের রক্ষার অজুহাতে ইউরোপের বহুরাষ্ট্র বিদেশে রাষ্ট্রনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। উপরন্তু ইউরোপের উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার স্থান সঙ্কুলানের জন্যও উপনিবেশিক বিস্তারের প্রয়োজন হইয়াছিল।

(ঘ) উদ্বৃত্ত লোক সংখ্যার স্থান সঙ্কুলান

ইউরোপের এই উপনিবেশ বিস্তারের ইতিহাসে দুইটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যে সকল দেশের সভ্যতা ও ঐতিহ্য প্রাচীন, সেই সকল দেশে ইউরোপ শুদ্ধ রাষ্ট্রনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখিয়াছে এবং অর্থ নৈতিক শোষণের বন্দোবস্ত করিয়াছে, কিন্তু সেই সকল দেশের প্রাচীন সভ্যতার স্থলে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করে নাই। এশিয়ার সর্বত্র এবং আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলে বিশেষতঃ মিশরের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত দেশে সভ্যতা বা সংস্কৃতির বালাই নাই সেই সমস্ত অনগ্রসর দেশে ইউরোপ ভিন্ন নীতি অনুসরণ করিয়াছে। তথায় শ্বেত জাতি আসিয়া পাকাপাকি ভাবে বসতি স্থাপন করিয়াছে এবং স্থানীয় অধিবাসীদিগকে হয় সম্পূর্ণ উৎসাদিত না হয়, সকল অধিকার হইতে বিচ্যুত করিয়া কোণঠাসা করিয়া রাখিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকা মহাদেশ, মিশর ব্যতীত আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চল বা প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দ্বীপসমূহের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

উপনিবেশের বৈশিষ্ট্য

উপনিবেশিক সাম্রাজ্য সম্পদে ইংলণ্ড সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ছিল। পৃথিবীর সকল মহাদেশেই ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য কম বেশী বিস্তৃত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের সর্বত্র ও ব্রহ্মদেশে বৃটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। চীন দেশের কয়েকটি বন্দরও ইংলণ্ডের অধিকারে আসিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইজিপ্টও ইংলণ্ডের রক্ষণাধীনে আসে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়াও সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করিয়া মধ্য-এশিয়ায় ও চীনে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল; ফ্রান্স ইন্দোচীনে, ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়ায় দ্বীপপুঞ্জে এবং জাপান ও আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জে আধিপত্য বিস্তার করিল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র স্পেনকে পরাজিত করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিল।

ইউরোপের উপনিবেশ বিস্তার

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীনদেশের অধিকাংশ স্থান ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের দ্বারা বণ্টিত ও অধিকৃত হইতে আরম্ভ করিল। জাপান, রাশিয়া, জার্মানী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে চীনের উপকূলের সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি অধিকার করিয়া স্ব স্ব 'প্রভাব ক্ষেত্র' নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল।

আফ্রিকা বিভাগ: আফ্রিকা মহাদেশ বিভাগের ইতিহাস চমকপ্রদ। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আফ্রিকা মহাদেশের উপকূল ভাগ ব্যতীত আভ্যন্তরীণ অঞ্চল ইউরোপের নিকট অজ্ঞাত ছিল। এই জন্য আফ্রিকা 'অন্ধকার মহাদেশ' (Dark Continent) নামে পরিচিত ছিল এবং মহাদেশের অধিকাংশ স্থানের সন্ধানই ইউরোপের জনসাধারণের অগোচরে ছিল। বিখ্যাত অভিযাত্রী লিভিংষ্টোন, ষ্টানলী এবং ধর্মপ্রচারকদল বহু প্রয়াসের পর এই মহাদেশকে ইউরোপের দৃষ্টিগোচরে আনয়ন করেন এবং এই মহাদেশের অতুল সম্পদের কাহিনী সর্বত্র সুবিদিত হয়। অতঃপর ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ নিজেদের মধ্যে আফ্রিকা ভাগ করিতে আরম্ভ করে। বেলজিয়মের রাজা লিওপোল্ড সর্ব্বপ্রথম কঙ্গো-ফ্রি ষ্টেটের পত্তন করেন। ১৮৮৭-৮৫ খৃষ্টাব্দের বার্লিন কনফারেন্সে আফ্রিকা বিভাগ স্থিরীকৃত হয় এবং লাইবেরিয়া ও আবিসিনিয়া ব্যতীত ইহার সকল অঞ্চলই ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিকারে চলিয়া যায়। পর্তুগাল পূর্ব আফ্রিকার কতকাংশ এবং ইটালী, এরিত্রিয়া, সোমালিল্যাণ্ড ত্রিপোলী ও সাইরেনিসিয়া অধিকার করে। জার্মানী দক্ষিণ পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা এবং স্পেন উত্তর-পশ্চিম কোণের ভূখণ্ড হস্তগত করে। ফ্রান্স পূর্বাধিকৃত ভূখণ্ড সমূহের সঙ্গে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে টিউনিসিয়া ও ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মরক্কো যুক্ত করে। ইংলণ্ড ইজিপ্টে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রণের সুযোগে আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে এবং ১৯৯০ খৃষ্টাব্দে ইহা ইঙ্গ-ফরাসীর দ্বৈত শাসনাধীনে রাখা হয়। পরিশেষে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইজিপ্টকে ইংরেজ রক্ষণাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়। এইরূপে ইংলণ্ড আফ্রিকার কাইরো হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগের উপরে (জার্মান-পূর্ব আফ্রিকা ব্যতীত) আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

ইংলণ্ডের উপনিবেশিক নীতির পরিবর্ত্তন: উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলি ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থ নৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। উপনিবেশের স্বার্থ ও কল্যাণ সম্বন্ধে ইংলণ্ড সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। ইংলণ্ডের এই স্বার্থপর নীতির জন্যই আমেরিকার উপনিবেশ সমূহ হস্তচ্যুত হয়। ইহার পর হইতে ইংলণ্ডের উপনিবেশিক নীতির পরিবর্তন হইতে লাগিল এবং ইহা উপনিবেশ সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করিতে লাগিল। প্রথমতঃ, বাণিজ্য

ব্যাপারে উপনিবেশকে সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করার পরিবর্তে বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত যে শর্তে বাণিজ্য হওয়া সম্ভব সেই প্রকার শর্তের ভিত্তিতেই ইংলণ্ড ও তাহার উপনিবেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যনীতি অনুসৃত হইতে লাগিল। দ্বিতীয়তঃ; অতঃপর ইংলণ্ড উপনিবেশকে শুদ্ধ শোষণের ক্ষেত্র মনে না করিয়া তাহার, সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইল। তাহার সাম্রাজ্য হইতে দাস-প্রথা রহিত করা হইল বা সেখানে ধর্ম-প্রচারক প্রেরণ করা মানব প্রেমিকতা হইতেই উদ্ভূত হইতে লাগিল। যে সমস্ত সংস্কার বা আইন কানুন উপনিবেশিকদের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন সেই সমস্ত স্থানীয় জনমতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রবর্তিত হইতে লাগিল। তৃতীয়তঃ, ক্রমশঃ উপনিবেশ সমূহের স্বায়ত্তশাসনের দাবিও স্বীকৃত হইতে থাকে। উপনিবেশ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের এই পরিবর্তিত মনোভাবের প্রথম ফলভোগী উপনিবেশ কানাডা। কানাডার আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দাবি অস্বীকার করিতে না পারিয়া ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কানাডাকে স্বায়ত্তশাসন প্রদত্ত হয়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়া, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে নিউজিল্যাণ্ড, এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় সমুদয় বৃটিশ উপনিবেশ কানাডার অনুরূপ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রাপ্ত হয়। বিংশ শতাব্দীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে আয়র্ল্যাণ্ড ও মিশর এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, মালয়, চীনের উপকূলস্থিত সমস্ত স্থান ইংলণ্ডের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা অর্জন করে। সাম্রাজ্য সম্বন্ধে ইংলণ্ডের উদারনীতি এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও এই সমস্ত দেশের স্বাতন্ত্র্য অর্জনে সাহায্য করিয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Describe the main features of the period between 1878 to 1914.

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা সমূহ বিবৃত কর।

উত্তর সূত্র :—(১) ভূমিকাঃ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দকে এক হিসাবে যুগ-সন্ধিকাল বলা যাইতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে ইউরোপের সর্বত্র যে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের ধ্বনি উত্থিত হয়, তাহা বার্লিন কংগ্রেসে এক প্রকার সার্থকতার মধ্যে পরিসমাপ্ত হয়। তদুপরি দুইটি প্রধান রাষ্ট্র জার্মানী ও সম্পূর্ণাঙ্গ হওয়াতে ইউরোপের রাজনৈতিক ভারসাম্য এক নূতন অবস্থায়

সম্মুখীন হয়। নব নব রাষ্ট্রীয় আদর্শবাদ ও নব নব সমস্যা ইউরোপকে বিচলিত করিয়া তোলে।

(২) শিল্পপ্রধান দেশ সমূহ কাঁচামাল সংগ্রহ ও প্রস্তুত মাল বিক্রয়ের জন্য নিজস্ব বাজার খুঁজিতে আগ্রহশীল—বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার ভিত্তিতে সামরিক ও পররাষ্ট্রীয় নীতি পরিচালিত—নিজস্ব উপনিবেশ বা বাজার স্থাপনের উৎকট প্রতিযোগিতা—ভাবী মহাসমরের বীজ।

(৩) সমরোপকরণ বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা : সশস্ত্র শান্তির যুগ (period of Armed Peace).

(৪ উগ্র জাতীয়তাবাদ (Aggressive Nationalism) : জার্মানীর রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপে এই মনোভাবের প্রকাশ।

(৫) অপূর্ণ জাতীয়তাবাদ : বিদেশীর অধিকারভুক্ত বহু অঞ্চল পরাধীনতার জন্য অ-তৃপ্ত; ফ্রান্সের আলসেস লোরেণ জার্মানীর অধিকারে, শ্লেসউইগ-এর ডেনগণ ও পোজেন-এর পোলগণ জার্মানীর প্রজা হওয়ার জন্য বিক্ষুব্ধ—সার্ব, শ্লাভ, পোল প্রভৃতি জাতি অ-পরিতৃপ্ত জাতীয়তাবাদে অসন্তুষ্ট।

(৬) শ্রমিক সমস্যা ও শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিযুক্ত সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার।

(৭) বিশ্বের অন্যতম প্রধান শক্তিরূপে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের অভ্যুদয়।

2. Give an account of relations among the European powers between 1878 to 1914.

১৮৭৮-১৯১৪ খৃষ্টাব্দের অন্তবর্তী কালে ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক বিবৃত কর।

উত্তর-সূত্র :—(১) ভূমিকা : (পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর-সূত্রের ভূমিকা)। (২) ঐক্য-বন্ধন সম্পন্ন হইবার পর জার্মানী ইউরোপের মধ্যে সমস্ত দিক দিয়া অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করার চেষ্টা করিতে লাগিল। বিসমার্ক শান্তিবাদী ছিলেন—তিনি নানা প্রকার প্রচেষ্টার দ্বারা জার্মানীর উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রসার বন্ধ রাখিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার পদত্যাগের পরে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম ত্রুটিপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতির দ্বারা জার্মানীর অসংখ্য শত্রুর সৃষ্টি করিলেন। তিনি রাশিয়া ও

ইংলণ্ডকে শত্রুতে পরিণত করিলেন। ফলে জার্মানীর বিরুদ্ধে বিপক্ষ শিবিরের সৃষ্টি হইল। দীর্ঘকাল মিত্রচ্যুত ফ্রান্স ইউরোপে মিত্ররাষ্ট্র খুঁজিয়া পাইল।

(৩) ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ফরসী-রাশিয়ার মৈত্রী।

(৪) ইঙ্গ-জাপান চুক্তি, ১৯০২।

(৫) ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি, ১৯০৪। (৬) ইঙ্গ-রুশ চুক্তি—১৯০৭।

ইউরোপ এইভাবে দুইটি পরস্পর বিবদমান শিবিরে বিভক্ত হইল—ইংলণ্ড-রাশিয়া-ফ্রান্স ও জার্মানী-অষ্ট্রিয়া-ইটালী।

(৭) ফলাফল: ইউরোপ এক বিরাট যুদ্ধের সম্মুখীন হইয়া রহিল। বল্কানের এক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

3. Give an account of the expansion of Europe in the 1!th and 20th centuries.

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের বাহিরে বিস্তারের কাহিনী বিবৃত কর।

উত্তর-সূত্র:—(১) ভূমিকা: পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই ইউরোপের প্রভাব প্রতিপত্তি বাণিজ্য বা অন্যান্য কারণে ইউরোপের বাহিরে বিস্তৃত হইতেছিল। প্রধানতঃ, স্পেন, পর্তুগাল, ও হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ এই প্রভাব প্রতিপত্তির বাহক ও ধারক ছিল। এই সকল রাষ্ট্র পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নিজস্ব উপনিবেশ বা প্রভাবের বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের এই সম্প্রসারণ নীতি অত্যন্ত দ্রুতবেগে চলিতে থাকে এবং বিশ্বের অধিকাংশ স্থানেই ইউরোপের শ্বেতজাতি বা তাহাদেব বংশধরগণের রাষ্ট্রনৈতিক আধিপত্য বা ব্যবসায়-বাণিজ্যের নিজস্ব প্রভাবক্ষেত্র বিস্তৃত হয়।

(২) উপনিবেশিক বিস্তারের কারণ: অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, খৃষ্টধর্মপ্রচার উদ্বৃত্ত লোকসংখ্যার সংকুলান।

(৩) উপনিবেশের বৈশিষ্ট্য।

(৪) ইউরোপের সম্প্রসারণ: (ক) ভারতে, ব্রহ্মদেশে, চীনে ও মিশরে বৃটিশ, (খ) মধ্য-এশিয়ায় চীনের অঞ্চলবিশেষে রাশিয়া, (গ) দক্ষিণ-পূব এশিয়ায় ফ্রান্স, (ঘ) ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ, (ঙ) জাপানে বাণিজ্য সংক্রান্ত অধিকার, (চ) ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'অন্ধকার মহাদেশ' আফ্রিকা বাটোয়ারা—বেলজিয়ম কংগো, পর্তুগাল, পূর্ব আফ্রিকা, এবং ইরিট্রিয়া, সোমালিল্যাণ্ড, ত্রিপোলী ও সাইরেনেসিয়া—ফ্রান্স,

উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা, মরক্কো ও টিউনিসিয়া। ইংলণ্ড কাইরো হইতে উত্তমাশা পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করে। লাইবেরিয়া ও আবিসিনিয়া ব্যতীত আফ্রিকার সকল অঞ্চল ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিকারে চলিয়া যায়।

4. Give a brief history of the Partition of Africa by the European powers.

ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ কর্তৃক আফ্রিকা-বাঁটোয়ারার ইতিহাস বর্ণনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আমেরিকা

Syllabus :—America U. S. A. from Independence to the First war. Outline of the South-American history.

পাঠসূচী :—আমেরিকা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্য্যন্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্র। দক্ষিণ আমেরিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আমেরিকার ইতিহাস (১৭৮৩-১৮৬১) :—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যুদয় বিশ্বের ইতিহাসের অন্যতম তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করিলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্য্যাদায় ভূষিত হয়। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নূতন সংবিধান রচিত হয় এবং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে জর্জ ওয়াশিংটনকে নবগঠিত যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত করা হয়। নূতন সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেণ্ট জনসাধারণের ভোটে চারি বৎসরের জন্য নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা হয়। প্রেসিডেণ্ট কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার সর্বময় কর্ত্তা হন। সেনেট ও প্রতিনিধি-সভা এই দুইটি পরিষদ লইয়া কেন্দ্রীয় আইনসভা গঠিত হয়।

আমেরিকার সুবিধা

একমাত্র ভৌগোলিক বন্ধন ব্যতীত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে কৃষ্টিগত, ভাষাগত বা নৃতাত্ত্বিক ঐক্যের আভাস ছিল না। এত প্রতিকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যে বিশ্বের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বগ্রাহ্য ও সর্বস্বীকৃত হইবার মত শক্তি সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ, এই মহাদেশের ভৌগোলিক নিরাপত্তালাভের সুযোগ। ইউরোপ হইতে বহু দূরে অবস্থিত এবং একক ও বিচ্ছিন্ন থাকার জন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সম্ভাব্য আক্রমণ করিতে আত্মরক্ষার ব্যাপারে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয় নাই। এই সুযোগ পাওয়ার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ শক্তি-সামর্থ্যই তাহার ঘরোয়া সমস্যার সমাধান ও আভ্যন্তরীণ উন্নতির কার্য্যে ব্যয়িত হওয়ার সুযোগ মিলিয়াছে। ইউরোপের মত সেই সমস্ত সমস্যা তত জটিল না হইলেও সেই সমস্ত আমেরিকার নিজস্ব

সমস্যা এবং যখন প্রয়োজন হইয়াছে তখন আমেরিকা অন্তর্যুদ্ধ বা আপোষ আলোচনার দ্বারা সেই সেই সমস্যার নিজস্ব ধরনে সমাধান করিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় আসিয়া এক এক অঞ্চলে এক একটি করিয়া উপনিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও তাহার অনুকূল আঞ্চলিক সমস্যাও উদ্ভূত হইয়াছে। সমস্ত সমস্যার মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যাই ছিল সর্বাধিক। উত্তরাঞ্চল শিল্পপ্রধান হওয়ায় সস্তায় মজুরসংগ্রহ ও শুল্করক্ষণের পক্ষপাতী ছিল। দক্ষিণাঞ্চলে ধনাঢ্য উপনিবেশিকদের প্রাধান্য থাকায় কৃষিকর্মের সুবিধার জন্য এই অঞ্চল কঠোর দাস-প্রথা ও সুলভে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনের পক্ষপাতী ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের স্বার্থ নির্ভর করিতেছিল কৃষিকার্যের উন্নতির উপরে। এদিকে পূর্বাঞ্চলের জনসাধারণ ছিল প্রধানতঃ বিত্তশালী, কাজেই এই অঞ্চলের লোকেরা টাকা ধার দেওয়া বা ব্যবসায়ে অর্থনিয়োগ করার উপর বেশী নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে রাজনৈতিক অপেক্ষা অর্থনৈতিক সমস্যা যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

বিভিন্ন সমস্যা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে (১৭৮৯—৯৭) বিভিন্ন দিক দিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধন সাধিত হইয়াছিল। এই বিষয়ে তাঁহার সহযোগী ছিলেন পররাষ্ট্রসচিব জেফারসন এবং রাজস্ব সচিব হ্যামিল্টন। ইঁহাদের সহযোগিতায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য ব্যাঙ্ক ইত্যাদি স্থাপন, রাজস্ব হইতে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রভৃতি অর্থনৈতিক উন্নতিমূলক সংস্কারের প্রবর্তন হইয়াছিল। ফরাসীবিপ্লবের সময়ে এবং পরবর্তীকালে নেপোলিয়নের সঙ্গে ইউরোপের যুদ্ধবিগ্রহের কালে আমেরিকা কোন পক্ষ অবলম্বন না করিয়া নিরপেক্ষ হইয়া রহিল। ইহাতে আমেরিকার অর্থনৈতিক সুবিধা হইল। যুদ্ধে রত সমস্ত দেশ আমেরিকা হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে লাগিল। ইংলণ্ড প্রত্যাশা করিয়াছিল আমেরিকা এই যুদ্ধে ফ্রান্সের বিপক্ষে ইংলণ্ডের সহিত যোগদান করিবে। এই প্রত্যাশা ভঙ্গ হইলে ইংলণ্ড ফরাসী দেশে মালপ্রেরণকারী কয়েকটি আমেরিকান জাহাজ আটক করে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিবাদের মীমাংসা হইয়া যায়।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে জর্জ ওয়াশিংটন তৃতীয় প্রেসিডেণ্ট হইতে অস্বীকৃত হইলে জন এ্যাডামস্ প্রেসিডেণ্ট হইলেন (১৭৯৭—১৮০১)। তাঁহার শাসনকালে বিদেশী ও রাষ্ট্রদ্রোহিতা সংক্রান্ত আইন (Alien and Sedition Act) নামে চারিটি আইন পাশ

করা হয়। এই গুলি দ্বারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সঙ্কোচন, আমেরিকায় বিদেশী বসবাসের নিয়ন্ত্রণ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বর্দ্ধন করা হইল। পররাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে। নেপোলিয়নিক যুদ্ধ বিগ্রহে আমেরিকা কোন পক্ষে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত করে। তাঁহার সময়ে আমেরিকার দুইটি রাজনৈতিক দল 'ফেডারেলিষ্ট' ও 'ডেমোক্রাট' দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। ফেডারেলিষ্ট দল যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গরাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা খর্ব করিয়া কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিল। 'ডেমোক্রাট' দলের লক্ষ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করিয়া অঙ্গ-রাজ্যগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা। জন এ্যাডামস ফেডারেলিষ্ট দলভুক্ত ছিলেন।

জন এ্যাডামস্ (১৭৯৭—১৮০১)

ফেডারেলিষ্ট ও ডেমোক্রাট দল

পরবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্রেট দলের নেতা জেফারসন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হইলেন। তাঁহার সময়ে ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল। জেফারসন বিদেশী ও রাষ্ট্রদ্রোহ সংক্রান্ত আইনের বলে যাহারা কারারুদ্ধ হইয়াছিল তাহাদিগকে মুক্ত করিলেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি নেপোলিয়নের নিকট হইতে দেড কোটি ডলার দিয়া লুসিয়ানা ক্রয় করিয়া আমেরিকার সীমানা বর্দ্ধিত করেন। এই স্থানে পরে ছয়টি রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সময়ে নেপোলিয়নের 'কন্টিনেণ্টাল সিষ্টেম' প্রবর্তিত হওয়ায় আত্মরক্ষার জন্য ইংলণ্ডও নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক অবরোধ ঘোষণা করিয়াছিল। উভয় পক্ষের অবরোধ ঘোষণার ফলে সমুদ্রগামী মার্কিন জাহাজ খানাতল্লাসী হইতে লাগিল। ইংরেজ নৌবহর মার্কিন জাহাজে কার্যারত ইংরেজ নাবিকগণকে ধৃত করিতে লাগিল। এই ব্যাপারে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মধ্যে এক তিক্ত মনোভাবের সৃষ্টি হইল।

জেফারসন

জেফারসনের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ম্যাডিসন (১৮০৯—১৭) ইংলণ্ডের মার্কিন জাহাজ আটক ও মার্কিন জাহাজ হইতে পলায়িত বৃটিশ নাবিকদের ধরিয়া লইয়া যাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে (১৮১২—১৪) প্রথম দিকে মার্কিন নৌবহর পরাজিত হইল। বৃটিশ বাহিনী ওয়াশিংটন অধিকার করিয়া 'হোয়াইট হাউস' ভস্মীভূত করিল। অপর একটি বাহিনী নিউ অর্লিয়েন্স অধিকার করিতে গিয়া এণ্ড্রু জ্যাকসনের নেতৃত্বে পরিচালিত মার্কিন বাহিনীর হস্তে পরাজিত হইল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা হইল। সন্ধির ফলে ইংরেজ অধিকৃত কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সীমারেখা নির্দিষ্ট হইল।

ম্যাডিসনের পরে জেমস মনরো (১৮১৭—২৫) প্রেসিডেণ্ট হইলেন। তাঁহার সময়ে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা বিখ্যাত মনরো নীতি (Monroe Doctrine) ঘোষণা করে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকাস্থ স্পেনের উপনিবেশগুলি বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে স্পেন বিদ্রোহী উপনিবেশগুলিকে পুনরধিকার করার জন্য ইউরোপের রাষ্ট্রবর্গের নিকট সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করে। প্রেসিডেণ্ট মনরো উপলব্ধি করিলেন যে, যদি ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ আমেরিকা মহাদেশকে তাহাদের রাজনৈতিক দ্বন্দের লীলাক্ষেত্র করিয়া তোলে, তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক অধিকার ও আভ্যন্তরীণ উন্নতি ব্যাহত হইবে। এই জন্য তিনি তাহার ঘোষণায় আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিলেন।

মনরো ঘোষণা, ১৮২৩

এই ঘোষণার মূলকথা এই যে, অতঃপর আমেরিকা মহাদেশে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের আর কোন উপনিবেশ স্থাপন করা বা ইউরোপ প্রচলিত শাসনপদ্ধতির প্রচলন করা চলিবে না। ইহার পরিবর্তে ইউরোপের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না। এই ঘোষণায় 'আমেরিকা আমেরিকানদের জন্য' এই নীতিই ব্যক্ত করা হইল। এই ঘোষণার ফলে ইউরোপের শক্তি সমবায় আমেরিকার ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইল না। আমেরিকার গণতন্ত্র নিরাপদ হইল।

যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম দিকে সম্প্রসারণ:—১৮১২ খৃষ্টাব্দের পর হইতে যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমাঞ্চলের লোকবিরল অংশ সম্প্রসারণের দিকে মনোযোগ দিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যুক্তরাষ্ট্র লুসিয়ানা ও ইষ্ট ফ্লোরিডা নিজের অধিকারে আনয়ন করিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মেক্সিকো-র টেক্সাস অধিকৃত হইল এবং মেক্সিকোর সহিত যুদ্ধের ফলে টেক্সাস ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী সমস্ত অঞ্চল ইহার দখলে আসিল। পরিশেষে ক্যালিফোর্ণিয়া অধিকার ও স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। ১৮৪৪—৪৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন দ্বিগুণ হইল।

এইভাবে ভৌগোলিক পরিসর বর্দ্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের জীবনে নানাবিধ পরিবর্ত্তন আসিয়া বহু সমস্যার সৃষ্টি করিল। প্রধানতঃ এই বিস্তৃতির ফলে মেক্সিকোর সঙ্গে যুদ্ধ, ইংলণ্ড ও স্পেনের সঙ্গে কূটনৈতিক সঙ্কটের সৃষ্টি এবং ক্রীতদাস সমস্যা ও আভ্যন্তরীক গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল। পশ্চিম অঞ্চলে সম্প্রসারিত হওয়ার পূর্বে প্রেসিডেণ্টের পদ ভার্জিনিয়া প্রদেশ-বাসীর একচেটিয়া ছিল। অতঃপর যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে পশ্চিম অঞ্চলের প্রতিনিধিসংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ার সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশও প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আরম্ভ

বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি

করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে টেনেসী অঞ্চলের এণ্ড্রু জ্যাকসন প্রথম পশ্চিমাঞ্চল হইতে

প্রেসিডেন্টের পদ অধিকার করিলেন। এণ্ড্রু জ্যাকসনের সময়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারের অধিকারের প্রশ্নটি পুনরায় মাথা তুলিয়া উঠে। দেশীয় শিল্পগুলিকে প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষার ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে বিদেশী দ্রব্যের উপর অত্যধিক শুল্ক স্থাপন করা হয়। কৃষিপ্রধান দক্ষিণের রাজ্যগুলি এই রক্ষণনীতির প্রতিকার করে এবং ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ক্যারোলিনা কেন্দ্রীয় সরকারের আইন অসিদ্ধ ঘোষণা করে। প্রেসিডেন্ট জ্যাকসন ঘোষণা করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও আইনকে অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করার অধিকার কোন রাজ্যের নাই। এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া গৃহযুদ্ধের উপক্রম হয়, কিন্তু অবিলম্বে আপোষে এই বিবাদের মীমাংসা হইয়া যায়। মোটকথা আমেরিকার উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থের মৌলিক পার্থক্য থাকায় উভয় অঞ্চলের মধ্যে বিরোধিতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চল শিল্পপ্রধান হওয়ায় শিল্পসম্বন্ধে রক্ষণনীতির সমর্থক ছিল। পক্ষান্তরে দক্ষিণ অঞ্চল কৃষিনির্ভর হওয়ায় রক্ষণনীতি বর্জনের বিনিময়ে সুলভে বিদেশী দ্রব্য প্রাপ্তি এবং কৃষির জন্ম দাস প্রথা চালু রাখার পক্ষপাতী ছিল। প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের সময়ে উত্তর-দক্ষিণের বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করিল এবং গৃহযুদ্ধ ব্যতীত এই বিরোধের সমাধানের উপায়ান্তর রহিল না।

আব্রাহাম লিঙ্কন

আব্রাহাম লিঙ্কন (১৮৬১—৬৫) ও আমেরিকার গৃহযুদ্ধ:—আব্রাহাম লিঙ্কন 'কেণ্টাকি' প্রদেশের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ তাঁহার অদৃষ্টে জোটে নাই, কিন্তু জননীর চেষ্টার ফলে তাঁহার মনে এক অদম্য জ্ঞান-পিপাসার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং পুস্তকপাঠের দ্বারা তিনি তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করিতেন। নানা বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া তিনি জীবনে উন্নতি করেন। কিছুদিনের জন্ম তিনি নিউ সালেমের কোন গুদামে কেরানীর কার্য্য করেন এবং কিছুকাল মেকানিকের কাজে ব্রতী হন কিছুকাল তিনি কংগ্রেসের সভ্য হইয়া দুই বৎসরকাল যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। কয়েক বৎসর তিনি ডাকঘরের কেরানীর কার্য্য করিয়াছিলেন চাকরীক্ষেত্রে সুবিধা

না হওয়ায় তিনি আইন অধ্যয়ন করিয়া ব্যবহারজীবী হন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইলিয়োনস হইতে একটি সিনেটর পদের নির্বাচন প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়া তিনি ষ্টিফেন ডগলাস নামে জনৈক প্রতিপক্ষীয় ব্যক্তির সহিত বিতর্ক করেন। এই বিতর্কে স্বীয় দলের আদর্শ ও কর্মপন্থা সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করিলে সমগ্র আমেরিকা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে নির্বাচনে লিঙ্কন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হইয়া নির্বাচিত হন। দাস-প্রথা এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গরাষ্ট্রগুলির স্বাতন্ত্র্য প্রধানতঃ এই দুইটি বিষয় লইয়া উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে মতান্তর হয়। এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে লিঙ্কনের মতামত অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। ঘৃণ্য দাস-প্রথার উচ্ছেদ তাঁহার জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা বজায় রাখার ব্যাপারে তিনি কোন আপোষ করিতে রাজি ছিলেন না। দাস-প্রথার বিলুপ্তি যুক্তরাষ্ট্রের গৌণ ব্যাপার। দাস-প্রথা থাকুক বা লুপ্ত হউক দক্ষিণী রাষ্ট্রসমূহকে যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে দেওয়া হইবে না—ইহাই তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর হইতেই নানা কারণে উত্তর ও দক্ষিণী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐক্যের অভাব ঘটিতেছিল। উত্তরাঞ্চল শিল্পপ্রধান হওয়াতে তাহাদের স্বার্থ ছিল শুল্ক-রক্ষণে ও সস্তার মজুরীতে। 'পক্ষান্তরে' দক্ষিণাঞ্চল উত্তরের উৎপন্ন শিল্পপণ্যের ক্রেতা হওয়ার জন্য সুলভ দ্রব্য মূল্য এবং অবাধ বাণিজ্যের প্রবর্তন চাহিতেছিল। দীর্ঘকাল যাবৎ উত্তরাঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববিধ কর্তৃত্ব করিয়া আসিতেছিল এবং প্রেসিডেন্ট উত্তর হইতে নির্বাচিত হইত। উত্তরের এই প্রাধান্য লইয়া দুই অঞ্চলের মধ্যে মনান্তরের সৃষ্টি হইয়াছিল। সর্বপ্রকার শিল্পদ্রব্যের জন্য দক্ষিণকে উত্তরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকার দরুণ উত্তরাঞ্চলের মনে বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছিল। সর্বোপরি দাস-প্রথা লইয়া উভয় অঞ্চলের বিরোধ চরমে উঠিল। স্বাধীনতা ঘোষণার কালে মানুষের সমানাধিকারের নীতি যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইলেও নিগ্রোদের ক্ষেত্রে ইহা প্রযুক্ত হয় নাই। আমেরিকার উত্তর অঞ্চলে এই বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং আইনের সাহায্যে উত্তর অঞ্চল হইতে দাস-প্রথা তুলিয়া দেওয়া হয়। আমেরিকার উত্তর অঞ্চলে দাস-প্রথা রহিত হইলেও বিশেষ কারণে দক্ষিণ অঞ্চল হইতে তুলিয়া দেওয়া হয় নাই। উত্তর অঞ্চলের জনমত দক্ষিণের এই প্রগতি ও মানবিকতা বিরোধী দাস-প্রথা রক্ষার বিপক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ হইল। দাস-প্রথা রহিত করার স্বপক্ষে আন্দোলনের জন্য 'লিবারেটর' নামে এক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইল। মিসেস ষ্টোয়ে রচিত 'টম কাকার কুটির' প্রকাশিত হওয়াতে দাস-প্রথার নৃশংস বর্বরতা সর্বসমক্ষে উদ্ঘাটিত হইল

উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে বিরোধের কারণ

এবং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে দাস-প্রথা নিষিদ্ধ করার জন্য উত্তরে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। ক্রীতদাস-প্রথার সমর্থক দক্ষিণীদলের সহিত মুক্তি-আন্দোলনের সমর্থক উত্তর অঞ্চলের সঙ্ঘর্ষের সম্ভাবনা আসন্ন হইল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট ড্রেড-স্কট মামলা উপলক্ষে এই মর্মে রায় দেন যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার আইনতঃ কোন অঞ্চলে ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে না। সুপ্রীম কোর্টের এই রায়ের পরে উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীদের মনে এই ধারণা হইল যে যুদ্ধ ব্যতীত এই সমস্যার সমাধান হওয়া অসম্ভব। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আব্রাহাম লিঙ্কন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হওয়ায় গৃহযুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। কেননা, আব্রাহাম লিঙ্কন দাস-প্রথার ও দক্ষিণাঞ্চলের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারের ঘোরতর বিরুদ্ধবাদী বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। দক্ষিণাঞ্চল তাহাদের অধিকার রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্র হইতে বাহিরে আসিয়া 'দক্ষিণের রাষ্ট্রসঙ্ঘ' (Confederacy of the South) নামে স্বতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করিল। কেরোলিনার নেতৃত্বে আরও ছয়টি রাজ্য এই নূতন যুক্তরাষ্ট্র সৃষ্টি করিল। অতঃপর উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই গৃহযুদ্ধ চলে। যুদ্ধের প্রথম দিকে দক্ষিণাঞ্চল জয়লাভ করিল এবং আরো কয়েকটি রাজ্য দক্ষিণের সঙ্গে যোগদান করিল। ইতিমধ্যে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আব্রাহাম লিঙ্কন বিদ্রোহী রাজ্যসমূহের সকল ক্রীতদাসকে মুক্ত বলিয়া ঘোষণা করেন।

গৃহযুদ্ধ ১৮৬১-৬৫

এযাবৎকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংহতি রক্ষাকেই যুদ্ধের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইতেছিল। বর্তমানে ক্রীতদাস প্রথার বিলুপ্তি ঘোষিত হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সহানুভূতি অর্জন করিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের পর হইতে দক্ষিণী সেনাবাহিনী ক্রমাগতঃ পরাজয়ের সম্মুখীন হইতে থাকে, দক্ষিণের সেনাপতি জ্যাকসনের মৃত্যু ও গেটিসবার্গ-এর যুদ্ধে অন্যতম সেনাপতি লী-র পরাজয়ে দক্ষিণীর জয়ের আশা লুপ্ত হয়। পরিশেষে তাহারা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর বাহিনীর সেনাপতি শেরম্যান ও গ্রাণ্টের নিকট আত্মসমর্পন করিতে বাধ্য হন। এইরূপে চারি বৎসর লোকক্ষয়কারী যুদ্ধের শেষে যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের অবসান হইয়া ইহার অখণ্ডতা রক্ষা পায়।

ক্রীতদাসের মুক্তি ১৮৬৩

দক্ষিণের পরাজয়

গৃহযুদ্ধের অবসানে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ইহার অখণ্ডতা রক্ষা পায় এবং আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণের অবকাশ পায়। উপরন্তু মানিকর দাসত্ব প্রথা বিলুপ্ত হওয়াতে সর্বশ্রেণীর

সমাধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজ পুনর্গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা হয়। গৃহযুদ্ধের অবসানে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যুক্তরাষ্ট্র ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নকে মেক্সিকো হইতে ফরাসী সৈন্যদল সরাইয়া নিতে এবং 'আলবামা' সংক্রান্ত ব্যাপারে ইংলণ্ডকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রভূত অর্থদানে বাধ্য করে। গৃহযুদ্ধের সময়ে 'আলবামা' নামে একখানি বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজ আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের উপনিবেশগুলির অধীনে কার্য্য গ্রহণ করে এবং উত্তরাঞ্চলের উপনিবেশগুলির জাহাজ আক্রমণ করিয়া সেইগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই বিষয় লইয়া জেনিভা নগরে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে বিচারের রায় অনুযায়ী ইংলণ্ড আমেরিকাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়।

দক্ষিণের আত্মসমর্পণের পাঁচদিন পরে আব্রাহাম লিঙ্কন এক অভিনয় গৃহে জন উইলকস বুথ নামে এক উন্মাদ অভিনেতার গুলিতে নিহত হন (১৪ এপ্রিল, ১৮৬৫) আমেরিকার ইতিহাসে লিঙ্কনের দান অপরিমেয়। তাঁহার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও রাজনীতি-কুশলতার জন্যই যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষা পায়। ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ সাধন করিয়া তিনি যে মানবহিতৈষণার পরিচয় দিয়াছেন তাহার তুলনা দুর্লভ। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি যে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা কেবল যুক্তরাষ্ট্রের নহে পৃথিবীর যে কোন জাতির পক্ষে অনুকরণীয়। ("That this nation, under God, shall have a new birth of freedom, and that Government of the people, by the people, for the people shall not perish from the earth.")

গৃহযুদ্ধের পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস :—গৃহযুদ্ধের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নানাদিক দিয়া উন্নতির পরিচয় দিতে লাগিল। আধুনিক যন্ত্র শিল্প ও সভ্যতার তিনটি মূল উপকরণ কয়লা, লোহা আর পেট্রোলিয়ম এই তিনটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রচুর ছিল। সুতরাং যন্ত্রশিল্পে এবং কারখানার দিক দিয়া যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশই উন্নত হইল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল। পেট্রোলিয়ম, মোটর শিল্প ও অন্যান্য বৃহৎশিল্পের উৎপাদনে আমেরিকা অপরাপর শিল্প প্রধান রাষ্ট্রকে অতিক্রম করিয়া ফেলিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী দেশে পরিণত হইল। যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও বিশ্বের সকল দেশ অপেক্ষা উন্নত হইল।

আভ্যন্তরীণ নীতি

দাসত্ব প্রথা লুপ্ত হওয়ায় নিগ্রোরা শ্বেতকায়দের সঙ্গে সমানাধিকার লাভ করিলেও

যুক্তরাষ্ট্র হইতে নিগ্রো-বিরোধী মনোভাব বা নিগ্রো জাতির সমস্যা দূরীভূত হয় নাই। নিগ্রোদের প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হওয়ার আশঙ্কায় দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলিতে নিগ্রো নির্যাতন আরম্ভ হইল। বহু গুপ্ত নিগ্রো-দমন সমিতি গঠিত হইল। ইহাদের সভ্যবৃন্দ নিগ্রোদিগকে গোপনে হত্যা করিয়া তাহাদের মধ্যে বিভীষিকার সঞ্চার করিতে আরম্ভ করিল। ইহাদের মধ্যে 'Ku Klux Klan', 'White Brotherhood' প্রভৃতি সমিতির নিষ্ঠুর কার্যকলাপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আইনতঃ নিগ্রোরা সমাধিকার প্রাপ্ত হইলেও সামাজিক ক্ষেত্রে নিগ্রো-বিদ্বেষ অদ্যাপি যুক্তরাষ্ট্র হইতে লোপ পায় নাই। মাঝে মাঝে এই বিদ্বেষ স্পষ্ট উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতে গৃহযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত প্রায় এক শতাব্দী আমেরিকা 'মনরো নীতি' অর্থাৎ আমেরিকা মহাদেশের বাহিরের ব্যাপারে নির্লিপ্ত ও নিস্পৃহ থাকার নীতিই অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল। গৃহযুদ্ধ মিটিয়া যাওয়ার পর যেমন আভ্যন্তরীণ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান হইল তদ্রূপ যুক্তরাষ্ট্রের আত্মপ্রত্যয়ও অনেকাংশে বাড়িয়া গেল। সুতরাং এই সময় হইতেই তাহার পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে দুইটি মুখ্য প্রচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করিল—প্রথমতঃ সমগ্র আমেরিকা মহাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্রগামী প্রভাব বিস্তার, দ্বিতীয়তঃ প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও প্রাচ্য অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্ররূপে যুক্তরাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আমেরিকা ইউরোপের পৃথিবীর অন্যান্য অংশের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিয়া বিশ্বের অন্যতম প্রধান শক্তিরূপে পরিগণিত হইতে থাকে।

পররাষ্ট্রনীতি

১৮১২-১৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। পরিশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষ হওয়াতে ইহা সহজেই মিটিয়া যায়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশ মেক্সিকো বিদ্রোহ করিলে ইউরোপের রাষ্ট্র সমবায় স্পেনের পক্ষ হইতে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিলে, প্রেসিডেন্ট মনরো তাঁহার বিখ্যাত ঘোষণার দ্বারা ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিকে আমেরিকা মহাদেশের ব্যাপারে বিরত থাকিতে নির্দেশ দেন। আমেরিকাও ইউরোপের রাজনীতি হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত থাকিয়া আভ্যন্তরীণ উন্নতির কার্যে আত্মনিয়োগ করে। গৃহযুদ্ধের পর আমেরিকা পুনরায় পররাষ্ট্রক্ষেত্রে সক্রিয় হয়। মনরো নীতি অনুসারে আমেরিকা ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নকে মেক্সিকো হইতে ফরাসী সামরিক শক্তি অপসৃত করিতে বাধ্য করে। 'আলবামা'র ব্যাপারেও যুক্তরাষ্ট্র অনমনীয় দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়া ইংলণ্ডের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ

পররাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান ঘটনা

আদায় করে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার নিকট হইতে আলাস্কা ক্রয় করিয়া আমেরিকা৷ম পক্ষে ভবিষ্যৎ লাভজনক এক৷বন্দোবস্ত করে। বর্তমানে আলাস্কা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ভেনেজুয়েলা ও ইংলণ্ডের মধ্যে সীমানাসম্পর্কিত বিরোধ ঘটিলে যুক্তরাষ্ট্র 'মনরো নীতি'-র দোহাই দিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করে এবং আপোষ-মীমাংসায় পৌঁছিতে উভয় রাষ্ট্রকে বাধ্য করে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্পেনের অধিকৃত কিউবার কুশাসন লইয়া যুক্তরাষ্ট্র ও স্পেনের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে স্পেন পরাজিত হইলে যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণাধীনে "কিউবা-র স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। অতঃপর যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত পোর্টোরিকো ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও গুয়াম দ্বীপ, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ স্পেনের নিকট হইতে গ্রহণ করে। এইভাবে যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশঃ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আটলান্টিকের সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোগের নিমিত্ত যুক্তরাষ্ট্র প্রায় অবৈধভাবে পানামা রাষ্ট্রের নিকট হইতে ভূমিখণ্ড গ্রহণ করিয়া পানামা-খাল খনন করে। এতদ্ব্যতীত আমেরিকা নানা কৌশলে ও অজুহাতে ল্যাটিন-আমেরিকার সর্বত্র কম বেশী একাধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে। আমেরিকার এই নীতি 'প্যান অ্যামেরিকানিজম্' (Pan Americanism) নামে পরিচিত। আমেরিকার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কাহারও কর্তৃত্ব থাকিবে না—ইহাই এই নীতির মর্ম-কথা।

আমেরিকা মহাদেশের সর্বত্র যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রতিহত প্রভাব

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমেরিকা প্রাচ্যদেশে জাপানে ও চীনে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র জাপানের সহিত চুক্তি অনুযায়ী জাপানের বন্দরসমূহে বাণিজ্যাধিকার লাভ করে। যুক্তরাষ্ট্র চীনদেশকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের বা জাপানের একচেটিয়া ভোগদখলের বা বাণিজ্যের ক্ষেত্ররূপে না রাখিয়া সকল রাষ্ট্রের জন্য 'উন্মুক্ত-দ্বার' (Open Door) নীতি গ্রহণের জন্য চাপ দিলে যুক্তরাষ্ট্রও চীনে বাণিজ্যাধিকারের সুবিধা লাভ করিল।

প্রাচ্যনীতি

বিশ্বরাষ্ট্ররূপে সচেতন হইয়া পৃথিবীর সর্বত্র রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক ব্যাপারে আত্মপ্রকাশ করার নীতি ইতিপূর্বেই যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছিল। বিংশ শতাব্দীতে এই নীতি বলিষ্ঠরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। মনরো নীতির দোহাই দিয়া যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গকে আমেরিকায় হস্তক্ষেপ হইতে বিরত রাখিয়াছিল। অথচ ইউরোপের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায় প্রয়োজন হইলে যুক্তরাষ্ট্র মনরো নীতি অনুযায়ী নির্লিপ্ততা বজায় রাখিল না। ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যস্থতা

করিয়া সন্ধির বন্দোবস্ত করে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে জাপানকে অভ্যুদিত হইতে দেখিয়া জাপানকে কূটনৈতিক পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য করে। যুক্তরাষ্ট্রের এই জাপবিরোধী মনোভাবের পরিচয় পাইয়া জাপান তাহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে থাকে। ক্রমশঃ জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায়। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ পর্য্যন্ত এই বিরোধ ততটা দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিরোধ উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে পরিণতি লাভ করে। প্রাচ্য খণ্ডে জাপান-যুক্তরাষ্ট্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বিংশ শতাব্দীর যুক্তরাষ্ট্রীয় পররাষ্ট্রনীতির উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। মরক্কোর অধিকার লইয়া জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, যুক্তরাষ্ট্র আলজেসিরাস-এর কনফারেন্সে মধ্যস্থতা করিয়া এই বিরোধের মিটমাট করে।

বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যোগদান তাহার বিংশ শতাব্দীর পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। অবশ্য মনরো নীতি অনুযায়ী যুদ্ধের প্রথমে যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ ছিল। উত্তমর্ণ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র মিত্রশক্তিকে প্রচুর অর্থঋণ প্রদান করিয়া যুদ্ধজয়ে সাহায্য করিল। পরিশেষে যখন জার্মানী অবাধ সাবমেরিণ নীতির সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যতরী ডুবাইয়াদিতে লাগিল, তখন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীর বিপক্ষেযোগদান করিয়া মিত্রপক্ষের জয় অনিবার্য্য করিয়া তুলিল। এই যুদ্ধে যোগদানের দ্বারা 'মনরো নীতি' সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইল। যুদ্ধাবসানে ভার্সাই সন্ধিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের প্রস্তাবক্রমেই 'লীগ-অফ্-নেশানস্' নামে আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ...ষ্ট্রের অংশগ্রহণ

উইলসন

উইলসন কর্তৃক প্রদত্ত চৌদ্দ দফা শর্তের উপর ভিত্তি করিয়াই এই সংস্থাটি গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধান্তে বিজয়ী ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ যুক্তরাষ্ট্রের মতামত উপেক্ষা করিয়া যে ভাবে স্বার্থগৃধ্নুতার পরিচয় দেয়, তাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের জনমত অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয় এবং ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র যাহাতে আর ইউরোপীয় ব্যাপারে জড়িত না হয়, তদনুরূপ

মত প্রকাশ করে। উপরন্তু ইংলণ্ড প্রমুখ ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ যুদ্ধকালীন প্রদত্ত ঋণ পরিশোধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ব্যাপারে নিস্পৃহ থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করিল।

কিন্তু দীর্ঘকাল যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের রাজনীতি হইতে নিরপেক্ষ দর্শকের ন্যায় অবস্থান করিতে পারিল না। সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থও জড়িত থাকায় অচিরেই যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বের রাজনৈতিক ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে হইল। লীগ অব্ নেশানস বা রাষ্ট্রসঙ্ঘ হইতে দূরে থাকিলেও আমেরিকা নানাভাবে ইহার শর্ত সমূহ কার্য্যকরী করার কাজে সাহায্য করিতে ত্রুটি করিল না। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে ইউরোপে যখন জার্মানীতে হিটলার, ইটালীতে মুসোলিনী, স্পেনে ফ্রাঙ্কো, রাশিয়ায় ষ্টালিন, পোল্যাণ্ডে পিলসুডস্কি, চেকোশ্লোভাকিয়ায় বেনেস প্রভৃতি ডিক্টেটর বা একনায়কের অভ্যুত্থানে ও কার্যকলাপে বিশ্বের গণতন্ত্র সঙ্কটাপন্ন হইতে চলিল তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেন্ট পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের নিরপেক্ষ থাকার নীতি পরিত্যাগ করিলেন। পুনরায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র স্বীয় সামরিক শক্তি ও আর্থিক সম্পদ লইয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী, ইটালী ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য সম্পদের বলেই মিত্রশক্তি এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সমস্ত দিক দিয়া যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর অদ্বিতীয় রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়াইল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যুক্তরাষ্ট্র অর্থ সাহায্য করিয়া এবং শিল্পাদির পুনরুজ্জীবন করিয়া যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ইউরোপের বিভিন্ন দেশের আর্থিক পুনরুত্থানে সাহায্য করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য হইল—কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র রাশিয়া, চীন ও ইহাদের প্রভাবিত রাষ্ট্রবর্গের আধিপত্য হইতে পৃথিবীর তাবৎ গণতন্ত্র নিরাপদ করা। এই লক্ষ্যসাধনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করার বিনিময়ে সাহায্য প্রাপ্ত দেশসমূহ লইয়া কমিউনিজম বিরোধী এক শক্তি জোট গঠন করিয়াছে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিজোট পৃথিবীর সর্বত্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ স্ব স্ব আধিপত্য বিস্তারের জন্য সচেষ্ট।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

সাময়িকভাবে নিরপেক্ষ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অংশ গ্রহণ

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি

দক্ষিণ আমেরিকার ইতিহাস : দক্ষিণ আমেরিকার ভূখণ্ড উত্তর আমেরিকার সহিত পানামা যোজকের সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ড দিয়া যুক্ত ছিল। এই সুবিশাল মহাদেশের

জনসাধারণ ইউরোপীয় (স্পেনীয় ও পর্টুগীজ), নিগ্রো ও রেড ইণ্ডিয়ান লইয়া গঠিত। এখানে স্পেন ও পর্টুগালের আধিপত্য অধিক থাকায় এখানে লাটিন ইউরোপের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য বেশী। যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডার মত বৃটিশ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব এখানে মোটেই নাই। এখানে লাটিন ইউরোপের (ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, স্পেন ও পর্টুগালের) প্রভাব বেশী থাকায় এই মহাদেশ লাটিন আমেরিকা নামে পরিচিত।

ল্যাটিন ইউরোপের প্রাধান্য

দক্ষিণ আমেরিকার আবিষ্কারের ব্যাপারে ব্যালবোয়া, পিজারো, কর্টেজ প্রভৃতি ইউরোপীয় অভিযাত্রীদের নাম উল্লেখযোগ্য। কলাম্বাসের সহিত যে সকল পর্টুগীজ নাবিক সহযোগী ছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই পৃথকভাবে দক্ষিণ আমেরিকায় নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার করিতে সচেষ্ট হন। ইহাদের মধ্যে জনৈক পর্টুগীজ ব্রাজিল আবিষ্কার করিলে ব্রাজিলে পর্টুগীজদের আধিপত্য স্থাপিত হয়। অতঃপর স্পেন মেক্সিকো, পেরু, চিলি, ভেনজুয়েলা প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে। মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি দেশে 'আজটেক সভ্যতা' নামে এক উন্নত ধরনের নিজস্ব সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্পেন এই দুইটি দেশ হস্তগত করিয়া 'আজটেক' সভ্যতার ধ্বংস সাধন করে এবং তৎস্থলে ইউরোপীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রাজিল ব্যতীত দক্ষিণ আমেরিকার সর্বত্র স্পেনের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। স্পেন দক্ষিণ আমেরিকাস্থিত উপনিবেশগুলি হইতে অজস্র স্বর্ণ ও রৌপ্য আহরণ করিয়া ইউরোপের সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী দেশে পরিণত হইয়াছিল। উপনিবেশিক শাসন-ব্যাপারে স্পেনের আচরণ অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিল। আমেরিকার

স্পেনের আধিপত্য

স্পেনিস আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনিস উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা অর্জনের জন্য স্পেনের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে পেরুতে বিদ্রোহ হয়। অত্যন্ত নৃশংস দমনমূলক নীতির দ্বারা এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। নেপোলিয়নের আধিপত্যের যুগে নেপোলিয়ন যখন স্পেন অধিকার করেন, তখন তিনি দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনিস সাম্রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করিলে তাহারা নেপোলিয়নের আধিপত্য অস্বীকার করে। ফরাসী বিপ্লব প্রসূত জাতীয়তাবাদের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া দক্ষিণ আমেরিকাস্থ স্পেনিস উপনিবেশগুলি স্পেনের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিল। মেক্সিকো-তে সর্বপ্রথম স্বাধীনতার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই স্বাধীনতা আন্দোলনের নায়কদের মধ্যে ফ্রান্সিস মিরাণ্ডা ও ডন সাইমন বলিভারের নাম উল্লেখযোগ্য। মেক্সিকো অঞ্চলের স্বাধীনতা

আন্দোলন ক্রমশঃ দক্ষিণ আমেরিকার সর্বত্র বিস্তৃত হইতে থাকে এবং সর্বত্র স্পেনিস শাসন অস্বীকার করিতে আরম্ভ করে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে স্পেনে এক বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে স্পেনের আমেরিকাস্থ উপনিবেশ সমূহ স্পেনের শাসন হইতে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ইংলণ্ড এই সমস্ত উপনিবেশের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে দ্বিধা করিল না।

মনরোনীতি (Monroe Doctrine)

স্পেন বিদ্রোহী উপনিবেশ সমূহকে হস্তগত করার জন্য ইউরোপের রাষ্ট্র সমবায়ের (Concert of Europe) সাহায্য প্রার্থনা করে। ইউরোপের রাষ্ট্র সমবায় স্পেনের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট মনরো তাঁহার বিখ্যাত মনরো নীতির (Monroe Doctrine) দ্বারা ইউরোপের রাষ্ট্র-সমবায়কে আমেরিকা মহাদেশের কোন অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করা যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুতামূলক হইবে ইহা ঘোষণ করিলে ইউরোপের রাষ্ট্র-সমবায় আর আমেরিকার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইল না। এইভাবে সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকাতে স্পেনের শাসনের অবসান হয় ১৮২৪)।

স্পেনিস আধিপত্যের অবসান

মেক্সিকো ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু নানা কারণে ইহার আভ্যন্তরীণ গোলযোগ চলিতে থাকে। এই সকল গোলযোগের জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেন মেক্সিকোতে যে অর্থ লগ্নী করিয়াছিল, মেক্সিকো তাহার উপর সুদ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিল। এই সময়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গৃহযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। এই সুযোগে উক্ত রাষ্ট্রত্রয় একযোগে মেক্সিকো-তে অভিযান প্রেরণ করা স্থির করিল। ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ছিল মেক্সিকোর স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া তথায় ফ্রান্সের অধীনে একটি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। অবিলম্বে ইংলণ্ড ও স্পেন অভিযান হইতে নিবৃত্ত হইলে ফ্রান্স একাকী তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য রহিল। ফরাসী-বাহিনী বলপূর্বক মেক্সিকো অধিকার করিয়া মেক্সিকোর সিংহাসনে অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের ভ্রাতা আর্কডিউক ম্যাক্সিমিলিয়ান-কে প্রতিষ্ঠিত করিল। মেক্সিকোবাসীরা জুয়ারেজ-এর নেতৃত্বে ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের অবসান হওয়াতে যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো হইতে ফরাসী সৈন্য প্রত্যাহার করার জন্য ফ্রান্সকে চাপ দিল। ফরাসী সৈন্যদল মেক্সিকো হইতে প্রত্যাহৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অসহায় ম্যাক্সিমিলিয়ান মেক্সিকোবাসীদের দ্বারা নিহত হইলেন (১৮৬৭)। মেক্সিকোর স্বাধীনতা পুনরায় অর্জিত হইল।

মেক্সিকো

পর্টুগীজরা ব্রেজিল অধিকার করিয়া তিন শতাব্দী কাল সেই স্থানে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকার উপনিবেশসমূহ স্বাধীনতা অর্জন করিলে এবং ফরাসী বিপ্লবের জাতীয়তাবাদী ভাবধারা সর্বত্র প্রসারিত হইলে ব্রেজিলের অধিবাসীবৃন্দও স্বাধীনতা লাভের জন্য উৎসুক হয়। নেপোলিয়ন কর্তৃক ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে পর্টুগাল আক্রান্ত হইলে পর্টুগালের রাজপরিবার স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রেজিলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৮০৭ হইতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পর্টুগাল কার্যতঃ ইংলণ্ডের শাসনাধীনে থাকে। সুতরাং পর্টুগালের রাজপরিবার ব্রেজিলেই এই সময়ে অবস্থান করিতেন। এই সময়েই ব্রেজিল উপনিবেশের স্তর হইতে একটি রাষ্ট্রের পর্য্যায়ে উন্নীত হয়। পর্টুগালের নরপতির অধীনে ইহা একটি পৃথক রাষ্ট্রের মর্য্যাদা অর্জন করে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সৈন্য পর্টুগাল হইতে অপসৃত হইলে পর্টুগালের নরপতি জন যুবরাজ ডন পেড্রোকে রাজপ্রতিনিধি রূপে ব্রেজিলে রাখিয়া পর্টুগালে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিল ডন পেড্রোর নেতৃত্বে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিল এবং তিন বৎসর বাদে পর্টুগাল ব্রেজিলের স্বাধীনতা স্বীকার করিল। ডন পেড্রো স্বাধীন ব্রেজিলের প্রথম নরপতি বলিয়া ঘোষিত হইলেন। ডন পেড্রো উদারমনা শাসক ছিলেন। তিনি প্রজাগণকে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টারী শাসনতন্ত্রের অনুরূপ এক উদার শাসনতন্ত্র প্রদান করিলেন। ডন পেড্রো পর্টুগালের সিংহাসন কন্যা মেরিয়ার অনুকূলে পরিত্যাগ করেন। অনতিবিলম্বে ব্রেজিলে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে পেড্রো তাঁহার নাবালক পুত্র দ্বিতীয় পেড্রো-কে ব্রেজিলের সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া (১৮৩১) পর্টুগালে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দ্বিতীয় পেড্রো প্রগতিশীল শাসক ছিলেন। তিনি ১৮৩১ হইতে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তিনি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিল হইতে দাস-প্রথা রহিত করেন। এই নূতন সংস্কার ব্যবস্থার ফলে তিনি অভিজাত ও বিত্তশালী শ্রেণীর সমর্থন হইতে বঞ্চিত হন এবং ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের ফলে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর ডাঃ মোরায়োসের নেতৃত্বে ব্রেজিলে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss in brief the main problems of U. S. A. after her independence.

স্বাধীনতা লাভের পরবর্ত্তীকালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান সমস্যা আলোচনা কর।

উত্তর-সূত্র : (১) ভূমিকা : ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতার মর্য্যাদায় ভূষিত হয়—১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নূতন সংবিধান রচিত হয় এবং জর্জ ওয়াশিংটন ইহার প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। একমাত্র ভৌগোলিক বন্ধন ব্যতীত ইহার অধিবাসীদের মধ্যে কৃষ্টিগত বা ভাষাগত ঐক্য ছিল না। বিভিন্ন সময়ে ইউরোপের নানাদেশ হইতে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় আসিয়া এক একটি অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে। ফলে স্বাধীনতার পরবর্ত্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রকে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়।

(২) আভ্যন্তরীণ সমস্যা : (ক) উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে স্বার্থের সংঘর্ষ ; উত্তরাঞ্চল শিল্পপ্রধান আর দক্ষিণাঞ্চল কৃষিপ্রধান—উভয়ের মধ্যে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পার্থক্য, (খ) দাসপ্রথা লইয়া উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে বিরোধ, উত্তর দাসপ্রথা বিরোধী ও দক্ষিণ দাসপ্রথার সমর্থক : (গ) সার্ব্বভৌম অধিকার লইয়া উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের বিরোধ, (ঘ) অর্থনৈতিক সমস্যা।

(৩) পররাষ্ট্র নীতি : (ক) নেপোলিয়নিক যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে ইংলণ্ডের সঙ্গে বিরোধ (১৮০৯—১৪). ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সঙ্গে বিরোধের অবসান ; (খ) মনরোনীতি (১৮২৩), আভ্যন্তরীণ উন্নতিসাধনের জন্য বিদেশী রাষ্ট্রকে আমেরিকার কোন আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হইতে বিরত রাখা ; মনরো-নীতির ফলে আমেরিকার সুবিধা—ইহার তাৎপর্য্য ও তৎকালীন সার্থকতা।

2. Discuss the causes and effects of the American Civil War, 1861 65.

১৮৬১—'৬৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।

উত্তর-সূত্র : (১) ভূমিকা : নানা কারণে উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে মতদ্বৈধতা উপস্থিত হয়। এই মতবিরোধ শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়। '৬১, ৬৫ পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহের পর উত্তর অঞ্চল দক্ষিণকে পরাভূত করে এবং আমেরিকার অখণ্ডতা রক্ষা পায়।

(২) কারণ : (ক) উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত, (খ) উত্তরের প্রাধান্যে দক্ষিণের ঈর্ষা, (গ) দাসপ্রথা লইয়া উভয় অঞ্চলের মধ্যে বিরোধ : মিসৌরী চুক্তিনামা ; ড্রেডস্কট মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায় দক্ষিণের সপক্ষে গেল, (ঘ) ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে আব্রাহাম লিংকনের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলের আশংকা, (ঙ) দক্ষিণাঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া এক স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রসংঘ স্থাপনে

উদ্যোগী হইল, (চ) উত্তরাঞ্চল আমেরিকার সংহতি রক্ষার জন্য দক্ষিণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইল—যুদ্ধে উত্তরাঞ্চলের জয়লাভ।

(৩) ফলাফল: (ক) যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষা, (খ) দাসপ্রথা লুপ্ত, (গ) দক্ষিণে শিল্পের প্রসার, (ঘ) পররাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন—সমগ্র আমেরিকায় প্রভাব বিস্তার ও মনরো-নীতির প্রয়োজন মাফিক পরিবর্তন, (ঙ) নিগ্রোদের সমস্যা।

3. Sketch the career and achievements of Abraham Lincoln.

আব্রাহাম লিঙ্কনের জীবনী ও কার্যাবলী বিবৃত কর।

উত্তর-সূত্র: (১) কেন্টাকী প্রদেশের এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম (১৮০৯); (২) প্রথম জীবন: বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ অদৃষ্টে জোটে নাই—কেরাণীর কাজ—ইলিওনিস আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত—কিছুকাল পোষ্ট মাষ্টারের চাকুরী: ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে আইনজীবী (৩) উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে বিরোধ; (৪) আব্রাহামের প্রেসিডেন্ট পদ লাভ; (৫) দক্ষিণাঞ্চলের আশংকা ও নূতন রাষ্ট্র গঠন; (৬) গৃহযুদ্ধ; (৭) ক্রীতদাস মুক্তিনামা, ১৮৬৩, (৮) যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষা সম্বন্ধে দৃঢ় সংকল্প; (৯) গৃহযুদ্ধে জয়লাভ; (১০) আততায়ীর হস্তে নিহত।

কৃতিত্ব: (১) অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও রাজনীতি কুশলতা, (২) অন্তর্বিরোধের হস্ত হইতে দেশরক্ষা; (৩) গণতান্ত্রিক আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত উক্তি; (৪) পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আমেরিকার মর্যাদা রক্ষায় যত্নবান—ট্রেন্ট ও আলবামা-র ঘটনা; (৫) তাঁহার মৃত্যু—চরিত্র।

4. Write briefly the history of U. S. A from 1856 to 1919.

১৮৫৬—১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালের আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস লিখ।

উত্তর সূত্র: (১) ভূমিকা: গৃহযুদ্ধ মিটিয়া যাওয়ার পরে যেমন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান হইল তদ্রূপ তাহার বৈদেশিক নীতিতেও পরিবর্তন আসিল। (২) আভ্যন্তরীণ ঘটনা: (ক) পশ্চিমদিকে মিসিসিপি অঞ্চল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা সম্প্রসারিত, (খ) রেড-ইণ্ডিয়ানদের সহিত সংঘর্ষ, (গ) কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের সম্বন্ধে অসহিষ্ণু নীতি—নিগ্রো পীড়নকারী কু-ক্লুক্স-ক্লান ও হোয়াইট ব্রাদারহুড প্রভৃতি দল, (ঘ) শিল্প বাণিজ্যের দ্রুত বিস্তার—খনিজ তৈল, লৌহ, মোটরগাড়ী প্রভৃতির উৎপাদনে আমেরিকা বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, (ঙ) অর্থনৈতিক মানের উন্নতি।

(৩) পররাষ্ট্রনীতি : (ক) ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ঘোষিত 'মনরো-নীতি' বা স্বাতন্ত্র্যনীতি প্রথম দিকে অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল। (খ) 'মন্‌রো-নীতি' প্রয়োজনানুরূপ প্রয়োগ আবার ক্ষেত্রবিশেষে মন্‌রো-নীতি পরিত্যক্ত; মন্‌রো-নীতির সাহায্যে আমেরিকা মহাদেশ হইতে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপ বন্ধ করিয়া সর্বত্র আমেরিকার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। (গ) বিভিন্ন বিষয়ে স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য মধ্য ও ল্যাটিন আমেরিকার অংশ বিশেষকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বা তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া সাম্রাজ্যবাদের সূচনা করা। (ঘ) স্বীয় বাণিজ্যিক স্বার্থানুকূল বাজার ও কাঁচামালের যোগানদার হিসাবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কয়েকটি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করা। (ঙ) ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যুক্তরাষ্ট্র সকল দিক দিয়া একটি শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃত হওয়ায় ইউরোপ ও বিশ্বের বহু ব্যাপারে সার্থকতার সহিত হস্তক্ষেপ করা; দৃষ্টান্ত : ১৯০৪-০৫ খৃষ্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধে মধ্যস্থতা, চীনের ব্যাপারে সকল রাষ্ট্রের জন্য উন্মুক্ত দ্বার (open door) নীতি গ্রহণের জন্য চাপ দেওয়া। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মরক্কো-ফ্রান্সের বিরোধে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতা—পরিশেষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান।

সপ্তম অধ্যায়

চীন ও জাপান

Syllabus: Japan and China. From mid-nineteenth Century to the First World war.

পাঠসূচী :- জাপান ও চীনের ইতিহাস—ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা :—সুদূর অতীত কাল হইতে চীন ও জাপান পাশ্চাত্য দেশের নিকট পরিচিত। বিশেষতঃ চীনদেশের ধনসম্বন্ধে ইউরোপে রূপকথার মত কাহিনী প্রচারিত ছিল। বাণিজ্যোপলক্ষে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ ও রুশ জাতি চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিবার জন্য যথেষ্ট ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু চীন কাহারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা দূরে থাকুক, বিশেষ অনুরোধ উপরোধেও সে কোন পাশ্চাত্য রাষ্ট্রকে স্বদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার দিতে সম্মত হয় নাই। রাশিয়া চীনের একমাত্র সন্নিহিত প্রতিবেশী বলিয়া কোন এক সুযোগে ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে সাইবেরিয়া অধিকার করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে উপনীত হইয়াছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় শক্তিসমূহ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র চীন ও জাপানের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করিতে লাগিল। চীনের আপত্তি ও নিষেধ সত্ত্বেও তাহারা অধ্যবসায়ের সহিত লাগিয়া রহিল এবং পরিশেষে তাহারা তথায় প্রবেশের অধিকার অর্জন করিল। বাহুবলের সাহায্যে চীনের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইল। জাপানের সঙ্গে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের আচরণ চীনের অনুরূপ। এই যে পাশ্চাত্যের প্রাচ্য অঞ্চলে বলপূর্বক অনাহূত প্রবেশ তাহাতেই সুদূর প্রাচ্য সমস্যার (Far Eastern Problem) সৃষ্টি হইয়াছে।

সুদূর প্রাচ্যে চীন ও জাপানের উপর পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের এই যে অবাঞ্ছনীয় ও অনাহূত প্রবেশ তাহার প্রতিক্রিয়া এই দুইটি রাষ্ট্রে দুই প্রকারের ফল উৎপন্ন করিল। চীন তাহার ধনসম্পদের জন্যই ইউরোপীয় শক্তিবর্গের লুণ্ঠনের লক্ষ্য হইল। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া চীন পাশ্চাত্য সভ্যতার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। ক্রমাগত চীনের অঙ্গ-ব্যবচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন অংশ পাশ্চাত্য শক্তির অধিকারে গেল। সর্বপ্রকারে শোষিত ও লুণ্ঠিত হইয়াও চীন এই দুরবস্থার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিল না। জাপানে কিন্তু পাশ্চাত্য

অভিযানের ফলে স্বতন্ত্র হইয়া দেখা গেল। পাশ্চাত্যের এই অনাহূত প্রবেশে জাপান প্রথমে একটু কর্তব্যবিমূঢ় হইলেও ক্রমশঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ বুঝিতে পারিল এবং ইহার গ্রাস হইতে আত্মরক্ষার জন্যই ইহাকে অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করিয়া রক্ষা পাইল। জাপান পোশাক-পরিচ্ছদে, আচারে-ব্যবহারে, শিক্ষা-দীক্ষায়, অস্ত্রে-শস্ত্রে এবং কূটনীতিতে পাশ্চাত্য আদর্শ গ্রহণ করিল এবং পাশ্চাত্যকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিল। তখন জাপানী সম্রাট (মিকাডো) ছিলেন আইনতঃ দেশের কর্তা এবং শাসন ক্ষমতা ছিল "সোগান" বা প্রধান মন্ত্রীর হাতে। সামন্তগণ (দাইমিও) এবং উপসামন্তগণ (সামুরাই) সোগানের আদেশ মানিয়া চলিতেন। সময়মত পাশ্চাত্যমতে দীক্ষিত হওয়ার জন্যই জাপান পাশ্চাত্য সমাজে পাংক্তেয় হইয়া পাশ্চাত্যের শক্তিবর্গের মতই প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন-শোষণে যোগদান করিল। পরিশেষে পাশ্চাত্য শক্তি রাশিয়াকে পরাজিত

সামুরাইর পোশাক

মিকাডোর পোশাক

করিয়া বিশ্বশক্তির অন্যতমরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। সুদূর প্রাচ্যসমস্যার তিনটি স্তর—প্রথমে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের বাণিজ্যাধিকার, পরে রাষ্ট্রাধিকার এবং সর্বশেষে তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে জাপানের আবির্ভাব। তৃতীয় স্তর অর্থাৎ

প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানের আবির্ভাব—ইহা বর্তমান শতাব্দীর ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

চীন :—দীর্ঘকাল যাবৎ চীনদেশ ইউরোপের নিকট পরিচিত হইলেও উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে পাশ্চাত্যের সঙ্গে চীনের বিশেষ কাজ কারবার ছিল না বলিলেই চলে। চীনের মত ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার জন্য ইউরোপের রাষ্ট্রবর্গের চেষ্টার অন্ত ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্টুগীজরা চীনের দক্ষিণ উপকূলে ম্যাকাওতে এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজরা ফরমোসা দ্বীপে এবং ইংরেজরা ক্যাণ্টনে প্রতিষ্ঠিত হইল। চীনা গভর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে সরকারীভাবে মোটেই স্বীকার করে নাই—ইহাদের উপর যথেষ্ট বিধি নিষেধ আরোপ করিয়া ইহাদের ব্যবসা বাণিজ্যকে অসুবিধা-জনক করিয়া তুলিল। একমাত্র রাশিয়ার সঙ্গেই ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিল। অবশ্য সেই যুগে রাশিয়ার সঙ্গে ইউরোপ অপেক্ষা এশিয়ার মিলই বেশী ছিল। বিদেশী কোন দূতের প্রবেশ চীনদেশে নিষিদ্ধ ছিল আর চীনও কোনও পাশ্চাত্য দেশে দূত প্রেরণ করিতে সম্মত ছিল না।

প্রথম চীন যুদ্ধ

চীনদেশকে ইউরোপের আধিপত্যে আনয়নের উদ্যোক্তা ছিল ইংলণ্ড। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চীনে বিশেষ লাভজনক অহিফেনের ব্যবসা চালাইত। চীনা গভর্ণমেণ্ট দেশবাসীকে অহিফেনের কুপ্রভাব হইতে রক্ষার জন্য অহিফেন আমদানী নিষিদ্ধ করিলেও গোপনে অবৈধভাবে এই ব্যবসা চালু ছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে চীনা গভর্ণমেণ্ট স্পষ্টতঃ অহিফেন আমদানী বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করে এবং ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে লিন্ নামে একজন অতিরিক্ত কমিশনারকে অহিফেনের অবৈধ আমদানী বন্ধ করার জন্য নিযুক্ত করে। লিন্ ইংরাজ বণিকদের নিকট হইতে প্রায় ২০,০০০ বাক্স চোরাই আমদানী অহিফেনের বাক্স উদ্ধার করিয়া সেইগুলি ধ্বংস করার আদেশ দেন। এই অহিফেন ধ্বংসের ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করিয়া বহু বাদানুবাদের পর বৃটিশ বণিকদের পক্ষ হইতে প্রথম গুলিবর্ষণ এবং পরিণামে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইহা প্রথম চীন যুদ্ধ বা অহিফেন যুদ্ধ বলিয়া খ্যাত। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়া ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত এই যুদ্ধ চলে। চীন পরাজিত হইয়া নানকিং এর সন্ধির শর্ত্ত মানিতে বাধ্য হয়। নানকিং এর সন্ধিতে চীন বৃটেনকে হংকং প্রদান করে এবং দক্ষিণ চীনের পাঁচটি বন্দর ক্যাণ্টন, ফুচৌ, নিংগপো, আময় ও সাংহাই ইউরোপীয়দের জন্য উন্মুক্ত করিতে এবং অধিকন্তু যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংরেজ বণিকগণকে প্রচুর অর্থ দিতে বাধ্য হয়। ইংলণ্ড এইভাবে চীনের দ্বার ইউরোপীয়

নানকিং এর সন্ধি, (১৮৪২)

অপরাপর জাতির প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত করে। একে একে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদের এই বিজয়ের সুযোগ গ্রহণ করে। পরের দশকে হল্যাণ্ড বেলজিয়াম, পর্টুগাল ও প্রাশিয়া উক্ত পাঁচটি সন্ধি-বন্দরে (Treaty Port) বাণিজ্যের সুবিধা আদায় করে।

দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ (১৮৫৬)

প্রথম অহিফেন যুদ্ধে চীনের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়ায় ইংলণ্ড নানকিং-এর সন্ধিতে প্রাপ্ত সুবিধার আরও অতিরিক্ত সুবিধা আদায় করার সুযোগ খুঁজিতে থাকে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে একজন অত্যুৎসাহী ফরাসী খৃষ্টান মিশনারী বিদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে কোয়াংসি কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ফ্রান্স ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। ঐ বৎসরই 'Arrow' নামে একখানা বৃটিশ জাহাজ নিষিদ্ধ মাল চালান করার অভিযোগে ধৃত ও বাজেয়াপ্ত হয়। এই সমস্ত ঘটনাতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার কারণ খুঁজিয়া পায় এবং সম্মিলিত ইংরেজ ও ফরাসী বাহিনী চীনের বিরুদ্ধে অভিযান করে। ইহা দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ নামে পরিচিত।

তিয়েনসিনের সন্ধি (১৮৫৮)

তিয়েনসিনের সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটে (১৮৫৮)। এই সন্ধির শর্ত্ত অনুসারে চীন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে প্রচুর অর্থ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। এতদ্ব্যতীত চীন আরও এগারোটি নূতন বন্দর ইউরোপীয় বণিকদের নিকট উন্মুক্ত করিতে এবং চীনের অভ্যন্তরে বিদেশীকে অতিরাষ্ট্রিক অধিকার (Extra territorial Rights) দিতে বাধ্য হইল। শেষের শর্ত্ত অনুযায়ী সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ রাষ্ট্রের প্রজাগণ চীন সাম্রাজ্যে চীন দেশের আইনের আমলে পড়িবে না। তাহারা স্ব স্ব রাষ্ট্রের আইনের অধীনে থাকিবে বলিয়া স্থির হইল।

অতঃপর চীনের প্রতিরোধ শক্তির অভাবের পরিচয় পাইয়া ইউরোপের বিভিন্ন শক্তি চীনের অভ্যন্তরে শোষণ ব্যবস্থা ও চীনের বিভিন্ন অঞ্চল নিজেদের মধ্যে বণ্টনের

চীন জাপান যুদ্ধ

ব্যবস্থা করিল। রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ায় অধিকার বিস্তার করিতে লাগিল, ফ্রান্স ইন্দোচীনে আনাম ও টঙ্কিন অধিকার করিয়া লইল এবং ইংলণ্ড তিব্বত ও ব্রহ্মদেশ অধিকার করিল। ক্রমশঃ জাপান চীনের বণ্টন ব্যবস্থায় অংশীদার হইল এবং কোরিয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া চীনের বিরুদ্ধে

চীনের পরাজয়

যুদ্ধ ঘোষণা করিল (চীন জাপান যুদ্ধ ১৮৯৪-৯৫)। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চীন জাপানকে পোর্ট আর্থার, ফরমোসা দ্বীপ, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এবং বাণিজ্যিক অন্যান্য সুবিধা দিতে বাধ্য হইল।

জাপানের হস্তে চীনের পরাজয় চীনদেশে এক জাতীয় সচেতনতা ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল। দেশময় এক বিদেশী বিরোধী আন্দোলন উগ্র আকারে আত্মপ্রকাশ করিল। ইহা ইতিহাসে 'বক্সার বিদ্রোহ' নামে খ্যাত। অবশেষে ইউরোপের রাষ্ট্রবর্গের সম্মিলিত বাহিনী আসিয়া এই বিদ্রোহ দমন করিল। বক্সার বিদ্রোহের ব্যর্থতার মধ্য দিয়া চীনদেশ উপলব্ধি করিল যে চীনকে আত্মরক্ষা করিতে হইলে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে ও সামরিক বিদ্যায় পারদর্শী হইতে হইবে। যে আদর্শের দ্বারা জাপান উন্নত হইয়াছে, সেই পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসরণের জন্য চীন ব্যগ্র হইল। চীনে নূতনভাবে বিভিন্ন সংস্কার প্রচেষ্টা চলিতে লাগিল। জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত 'তরুণ চীন' দল এযাবৎ অনুসৃত সংস্কারে সন্তুষ্ট না হইয়া দ্রুত পরিবর্তন আনয়নের জন্য উগ্র আন্দোলন আরম্ভ করিল। ডাক্তার সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে দক্ষিণ ও মধ্যচীনে এক প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলন দেখা দিল।

বক্সার বিদ্রোহ

অপদার্থ মাঞ্চু রাজবংশের হাত হইতে চীনে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করাই এই দলের উদ্দেশ্য ছিল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলন জয়যুক্ত হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সান ইয়াৎসেন মাঞ্চুবংশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া নানকিং অধিকার করেন এবং তথায় প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজধানী স্থাপন করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চুবংশের শেষ সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করিলে সমগ্র চীনে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হইল এবং ডাঃ সান ইয়াৎ সেন তিনি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। ডাঃ সান ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলন চালাইয়া রাশিয়াকে মিত্ররূপে লাভ করেন। সান ইয়াৎ সেনের প্রতিষ্ঠিত দলের নাম ছিল কুমিংটাং। তাঁহার মৃত্যুর পরে চিয়াং কাইসেক কুমিংটাং দলের নেতা হন। (প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চীন মিত্রপক্ষের হইয়া যোগদান করিয়াছিল এবং আশা করিয়াছিল যে যুদ্ধান্তে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ যুদ্ধে যোগদানের প্রত্যুপকারস্বরূপ চীনের অধিকৃত অঞ্চল

চীনে প্রজাতন্ত্র (১৯১২)
সান ইয়াৎ সেন

সান-ইয়াৎ সেন

পরিত্যাগ করিবে এবং অ-সম সন্ধি সকল বাতিল করিবে। কিন্তু চীনের এই আশা পূর্ণ হয় নাই।' যুদ্ধের মাঝখানে জাপান চীনের নিকট 'একুশ দফা দাবি' (১৯১৫) করিয়া যথেষ্ট সুবিধা আদায় করে। পরবর্তী কালে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বলপূর্বক মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিয়া তথায় মাঞ্চুকো নামে এক তাঁবেদার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিল। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে চীনে একটি কম্যুনিষ্ট দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। কুমিংটাং ও কম্যুনিষ্ট দলের আদর্শ পরস্পর বিরোধী হওয়ায়, উভয় পক্ষের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই আত্মঘাতী যুদ্ধ চলিয়াছিল। জাপানের মাঞ্চুরিয়া অধিকার ও চীন সম্বন্ধে আরও অগ্রসর নীতি প্রতিরোধ করার জন্য ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে উভয় দল আপাততঃ নিজেদের বিরোধ স্থগিত রাখিয়া জাপানের আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেলে চিয়াং কাইসেকের নেতৃত্বে চীনদেশ সম্মিলিত ভাবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধাবসানে পুনরায় চীনের কুমিংটাং ও কম্যুনিষ্টদলের মধ্যে যুদ্ধ হয়। কম্যুনিষ্ট দলের নেতা মাও-সে-তুং চীনের কুমিংটাং দলের চিয়াং কাইসেককে পরাজিত করিয়া ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে চীনে 'জনগণের প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করে। চীন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

চিয়াং কাইসেক

জাপান: জাপানের অভ্যুদয়: উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত জাপান বহির্বিশ্বের নিকট একপ্রকার অজ্ঞাতই ছিল; একটি মাত্র বন্দরের মারফতে ওলন্দাজ বণিকগণকে ব্যবসা বাণিজ্য করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কমোডার পেরি নামে একজন মার্কিন নৌ-সেনাপতি চারিখানা নৌ জাহাজ লইয়া জাপানে উপস্থিত হন এবং জাপানী বন্দর সমূহ আমেরিকার জাহাজের প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত রাখার দাবি করেন, এই দাবির পশ্চাতে সুসজ্জিত নৌ বহর দেখিয়া জাপানী

ইয়োরোপের সহিত পরিচয়

সরকার ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেন। জাপান সরকার ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার দাবি মানিয়া লইয়া আমেরিকার সঙ্গে এক বাণিজ্য চুক্তি করিল। নাগাসাকি ও আরও দুইটি বন্দর মার্কিন বাণিজ্যতরীর জন্য উন্মুক্ত করা হইল।

আমেরিকার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া ক্রমশঃ ইউরোপের শক্তিবর্গ জাপানে আসিতে আরম্ভ করে এবং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইউরোপের প্রায় অধিকাংশ বাণিজ্যকামী রাষ্ট্র জাপানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। এই সমস্ত চুক্তি জাপানের সঙ্গে সমান-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া হয় নাই, বরঞ্চ চুক্তি অনুযায়ী জাপানকে অতিরাষ্ট্রিকতা, বন্দর উন্মুক্ত করা, শুল্ক আরোপের ক্ষমতা ও বিশেষ কূটনৈতিক সুবিধা' প্রভৃতি দিতে হইয়াছে।

এইভাবে পাশ্চাত্যের সঙ্গে সংযোগের ফলে জাপানের অভ্যন্তরের একটা বিরাট পরিবর্ত্তন দেখা দিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হইয়া জাপান স্বদেশের এই দীনতা ও তাহার কারণ উপলব্ধি করিতে পারিল। জাপানের যুব সম্প্রদায় দেশের দুর্দশার প্রতিকারকল্পে দেশের প্রচলিত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধিব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন করিতে লাগিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এইভাবে জাপানে এক আভ্যন্তরীণ বিপ্লব দেখা দিল। জাপানে 'মিকাডো' বা সম্রাট থাকিলেও প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সোগান বা প্রধান সেনাপতির হাতে ছিল। এই সোগানই জাপানের পক্ষে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সহিত অপমানজনক সন্ধি সম্পাদন করিয়াছিল। প্রথমতঃ সোগানের ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া সম্রাটকে পূর্ব ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা হইল। দাইমিও বা অভিজাত শ্রেণী স্বেচ্ছায় তাহাদের বিশেষ অধিকার পরিত্যাগ করিল এবং প্রাচীন 'সামুরাই' শ্রেণী যুদ্ধে যোগদানের একচেটিয়া অধিকার পরিহার করিল। সেনা-বিভাগের দ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হইল। রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিয়া সম্রাটের হস্তে অর্পিত হইল। বিনা রক্তপাতে জাতীয় স্বার্থপ্রণোদিত ও স্বেচ্ছাকৃত ও এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের ফলে জাপানের ইতিহাসে নবযুগের সূত্রপাত হইল। জাপান অনুভব করিল আত্মরক্ষা করিতে হইলে আধুনিক হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। সুতরাং জাপান ইউরোপীয় আদর্শে আধুনিক হওয়ার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা, শিক্ষা, সমাজ, কৃষ্টি, শিল্প জাতীয় জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতা প্রগত পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া জাপান মাত্র পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ইংরেজী ভাষা বিদ্যালয়ে অবশ্যপাঠ্য এবং শিক্ষাদানের জন্য বিদেশী

জাপানের আভ্যন্তরীণ বিপ্লব (১৮৬৭-৬৮)

জাপান সর্বপ্রকারে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হইল

শিক্ষক আনয়ন করা হইল। সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইল এবং স্থলবাহিনী প্রাশিয়ার আদর্শ ও নৌ-বাহিনী ইংলণ্ডের অনুকরণে সংগঠিত হইল। অতি অল্প কালের মধ্যে জাপান আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি করিল। জাপানের শিল্পবাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি পরিলক্ষিত হইল। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, বাষ্পযান, ডাক ও পোতাশ্রয় নির্মিত হওয়াতে জাপান সর্বপ্রকারে আধুনিক রাষ্ট্রের সমকক্ষ হইল।

চীন-জাপানের যুদ্ধ, ১৮৯৪—৯৫

পররাষ্ট্রনীতি, চীন জাপান যুদ্ধ ১৮৯৪-৯৫ :—স্বদেশের অভ্যন্তরে দ্রুত পরিবর্তন হওয়ার ফলে জাপানের পররাষ্ট্রনীতিও সক্রিয় হইয়া উঠিল। জাপানের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পরে যে সকল অসমান সন্ধি হইয়াছে, সেই সকল রদ করা। এই উদ্দেশ্যে জাপান ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে 'ইয়াকুরা মিশন' প্রেরণ করিল। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। তখন জাপান বুঝিতে পারিল যে, ইউরোপীয় রাষ্ট্রে সম-মর্যাদা লাভ করিতে হইলে তাহা তাহাকে বাহুবলের পরিচয় দিয়া অর্জন করিতে হইবে। ইত্যবস্থায় তাহার সামরিক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর রহিল না। জাপান প্রথমে প্রতিবেশী চীনের বিরুদ্ধে তাহার উগ্র ও বলাত্মক নীতি প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিল। কোরিয়ার আধিপত্য লইয়া চীন ও জাপানের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হইল। কোরিয়ার ভৌগোলিক অবস্থিতি এমনই যে জাপানের নিরাপত্তার জন্য কোরিয়া জাপানের হস্তগত থাকা অত্যাবশ্যক। কোরিয়া যদি জাপানের কোন শত্রুপক্ষের হস্তগত হয়—বিশেষতঃ চীনের দিকে সম্প্রসারণবাদী রাশিয়ার—তাহা হইলে জাপানের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িবে। ইত্যবস্থায় জাপান স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করার ভিত্তিতে চীনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। চীন বা জাপান কেহই কোরিয়ার স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করিবে না—উভয়ের মধ্যে এই চুক্তি হয়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কোরিয়াতে এক স্থানীয় বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, চীন কোরিয়া গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে বিদ্রোহ দমনের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করে। এই ঘটনাকে বিশ্বাসভঙ্গের কাজ মনে করিয়া জাপানও কোরিয়াতে সৈন্য প্রেরণ করিল। এইভাবে উভয় পক্ষের মধ্যে এক যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইহা চীন-জাপান যুদ্ধ (Sino-Japanese War) নামে পরিচিত। ইউরোপীয় পদ্ধতিতে সুশিক্ষিত জাপান-বাহিনীর সম্মুখে চীনের সৈন্যদল দাঁড়াইতে পারিল না। নয় মাস যুদ্ধের পরে চীন ভীত হইয়া পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সিমনোসেকি-র সন্ধিতে

কোরিয়ার আধিপত্য লইয়া বিবাদ

চীনের পরাজয় ও সন্ধি

এই যুদ্ধের অবসান হইল। এই সন্ধির ফলে জাপান পোর্ট-আর্থারসহ লিয়াও-টাং উপদ্বীপ পর্যন্ত যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ও বাণিজ্যিক সুবিধা পাইল। চীন কোরিয়ার স্বাতন্ত্র্য ও কোরিয়াতে জাপানের অবাধ অধিকার স্বীকার করিল। কিন্তু জাপানের এই সকল সুবিধালাভে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ, বিশেষতঃ রাশিয়ার ঈর্ষা বর্দ্ধিত হইল এবং ফ্রান্স ও জার্মানীর সমর্থনে রাশিয়া চীনের বন্ধু সাজিয়া জাপানকে পোর্ট আর্থারসহ লিয়াও-টাং উপদ্বীপ প্রত্যর্পণে বাধ্য করিল। চীন দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখিবার জন্যই যে সকল ইউরোপীয় রাষ্ট্র জাপানকে সিমনোসেকির সন্ধির ফল ভোগ করিতে দেয় নাই, সেই সকল দেশই অবিলম্বে চীনের বিভিন্ন অঞ্চলের উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিতে দ্বিধা করিল না। এক বৎসর পরে রাশিয়া যখন যুদ্ধের সময়ে নৌ-ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করার সুবিধাসহ পোর্ট আর্থারের উপর স্বীয় অধিকার চীনের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইল, তখন জাপান রাশিয়ার মনোভাব বুঝিতে পারিল এবং রাশিয়ার উপর অত্যন্ত বিদ্বিষ্ট হইয়া রহিল। রাশিয়ার এই ব্যবহারে ইংলণ্ডও শঙ্কিত হইয়া ১৯০২ খৃষ্টাব্দে জাপানের সঙ্গে পরস্পর সাহায্যমূলক ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী সম্পাদন করিল। এই সন্ধিতে জাপানের মর্য্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। কারণ এই সর্ব প্রথম জাপান ইউরোপের একটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রের সহিত সম-মর্য্যাদার সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিল।

চীন-জাপান যুদ্ধ সুদূর প্রাচ্যের ইতিহাসে একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী ঘটনা। প্রথমতঃ এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে জাপানের সম্মান ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। চীনের ন্যায় বিশাল দেশকে পরাজিত করায় ইউরোপীয় শক্তিবর্গ জাপানের শক্তি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইল। জাপান ইউরোপের শক্তিবর্গের সহিত অসমান সন্ধির অমর্য্যাদা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। অনতিবিলম্বে বিদেশী রাষ্ট্রের অতিরাষ্ট্রিকতার অধিকার জাপান হইতে বিলুপ্ত হইল এবং জাপান শুল্ক-স্বাতন্ত্র্যও ফিরিয়া পাইল। জাপান স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইল। দ্বিতীয়তঃ, এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে জাপানের আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল এবং অত্যধিক আত্মবিশ্বাস হইতেই জাপানের সাম্রাজ্যবাদী জীবনের সূচনা হইল। জাপানের সাম্রাজ্যবাদ উগ্র মাত্রায় আত্মপ্রকাশ করিয়া সুদূর প্রাচ্যে এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্রকল্পে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিল। নব অভ্যুদিত এশিয়ার এই শক্তির পরিচয়

ফলাফল

(১) ইউরোপের রাষ্ট্রবর্গের সহিত সমমর্য্যাদা ভুক্ত হইল

(২) জাপানী সাম্রাজ্যবাদ

(৩) চীনের দুর্বলতা প্রকাশিত

'পীতাতঙ্ক' (Yellow Peril) মনোভাবের সৃষ্টি হইল। তৃতীয়তঃ জাপান চীনকে পরাভূত করায় চীনের মৌলিক দুর্বলতা অধিকতররূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। চীনদেশের উপর ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের শোষণ অভিযান দ্রুতবেগে আরম্ভ হইল। চতুর্থতঃ, এই যুদ্ধেই পরবর্তী রুশ-জাপান যুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল। সিমনোসেকির সন্ধির ফলভোগে জাপানকে রাশিয়াই বেশী বাধা দিয়াছিল। জাপান তাহার উপরই সর্বাধিক রুষ্ট হইয়া রহিল।

(৪) রুশ জাপান যুদ্ধের বীজ

রুশ-জাপান যুদ্ধ ১৯০৪—০৫ :—ইতিপূর্বেই চীন-জাপান যুদ্ধের ফলভোগে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া জাপান রাশিয়ার প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হইয়া ছিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সহিত মৈত্রীচুক্তির ফলে জাপানের মর্যাদা ও শক্তি অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। রাশিয়া চীনের বক্সার বিদ্রোহ ও গোলযোগের অবকাশে মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিয়া তথায় সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিল। ইউরোপীয় শক্তিবর্গের প্রতিবাদে এবং চীনের অনিচ্ছা জানিয়া রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া হইতে সৈন্য অপসৃত করিতে সম্মত হয়। ইঙ্গ-জাপান মৈত্রীর পরে রাশিয়া সম্মত হইয়া ছয়মাসের মধ্যে মাঞ্চুরিয়া হইতে সমস্ত রুশ সৈন্য অপসারিত করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে রাশিয়া সামান্য সংখ্যক সৈন্য সরাইয়া মাঞ্চুরিয়াকে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত প্রদেশরূপে ব্যবহার করিতে লাগিল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মস্কো হইতে পোর্ট আর্থার পর্যন্ত রেলপথ নির্মিত হইল এবং কাষ্ঠছেদনের অজুহাতে রাশিয়া ইয়ালু নদীপথ দিয়া কোরিয়াতে সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিল। রাশিয়ার এই সমস্ত কার্যকলাপে সন্দিগ্ধ হইয়া জাপান রাশিয়ার নিকট প্রস্তাব করিল যে রাশিয়া কোরিয়াতে জাপানের অধিকার এবং পরিবর্তে জাপান মাঞ্চুরিয়াতে রাশিয়ার অধিকার স্বীকার করিবে। রাশিয়া মাঞ্চুরিয়াতে আত্মপ্রাধান্য স্বীকার করিল, কিন্তু কোরিয়াতে জাপানের স্বার্থ স্বীকার না করিয়া জাপানের অধিকারের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করার শর্ত জানাইল। আত্মরক্ষার জন্য কোরিয়ায় জাপানের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন। মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ার অবস্থান জাপানের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া পড়িল এবং জাপান রাশিয়াকে এই বিষয়ে একটা চরমপত্র অর্পন করিল। রাশিয়া অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করাতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে জাপানের সামরিক ব্যবস্থার নিখুঁত বন্দোবস্ত এবং দুঃসাহসী সেনাবাহিনীর বীরত্বের জন্য রাশিয়া বিরাটদেশ হইলেও পরাজিত হইল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মধ্যস্থতায় 'পোর্টস-

যুদ্ধের কারণ

রাশিয়ার পরাজয়

মাউথের সন্ধিতে (১৯০৫) যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হইল। এই সন্ধির ফলে রাশিয়া কোরিয়াতে জাপানের দাবি স্বীকার করিল, লিয়াওটাং উপদ্বীপ জাপানের হস্তে প্রত্যর্পিত হইল, শাখালিন দ্বীপের দাক্ষিণার্দ্ধ জাপান প্রাপ্ত হইল এবং রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগে সম্মত হইল।

পোর্টসমাউথের সন্ধি

এই যুদ্ধের ফলাফল চীন জাপান যুদ্ধের ন্যায় সুদূর প্রসারী হইয়াছিল। প্রথমতঃ এই যুদ্ধে বিজয়ের ফলে জাপানের সম্মান ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বর্দ্ধিত হইল। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়াতে জাপান রাশিয়ার স্থলাভিষিক্ত হইল এবং চীনের উপরে তাহার একটা বিশেষ স্বত্ব জন্মিল এই বিজয় তাহার সুদূর প্রাচ্যের প্রাধান্যের নির্দেশক হইল। অতঃপর জাপানের সাম্রাজ্যবাদ ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিল। দ্বিতীয়তঃ, চীনের ইতিহাসে এই যুদ্ধের ফল দ্বিমুখী হইয়াছিল। একদিকে যেমন ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ চীন হইতে অধিকতর সুবিধা আদায়ের প্রেরণা পাইল অপর দিকে চীনও প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের হস্তে ইউরোপীয় প্রথম শ্রেণীর শক্তির পরাজয়ের ঘটনায় একটু আত্মসচেতন হইবার জন্য প্রেরণা অনুভব করিল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের চীনের বিপ্লব পরোক্ষভাবে এই প্রেরণারই ফল। তৃতীয়তঃ, রুশ জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার দুর্বলতার পরিচয় পাইয়া ইংলণ্ড রাশিয়া সম্বন্ধ পূর্বতন ভীতির মাত্রা হ্রাস করিল। চতুর্থতঃ, এই যুদ্ধে পরাজিত রাশিয়া সুদূর প্রাচ্যে তাহার অগ্রগতি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিয়া বল্কানে এবং মধ্য প্রাচ্যে তাহার মনোযোগ সন্নিবিষ্ট করিল। রাশিয়ার অভ্যন্তরেও পরাজয়ের গ্লানির প্রতিক্রিয়ারূপে অন্তর্বিপ্লব আসন্ন হইল এবং জারতন্ত্রের উপর রাশিয়ার জনসাধারণের অনাস্থা বৃদ্ধি পাইল। এইরূপে রুশ-জাপান যুদ্ধ বিভিন্ন দেশের পক্ষে বিভিন্ন দিক দিয়া ফলদায়ক হইয়াছিল।

(১) জাপানের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ও চীনে বিশেষ স্বত্ব

(২) চীনের আভ্যন্তরীণ বিপ্লব

(৩) ইঙ্গ-রুশ তিক্ততা হ্রাস

(৪) রাশিয়ার দেশে ও বিদেশে মর্য্যাদা হ্রাস

জাপানের সাম্রাজ্যবাদী কার্য্যকলাপ: রুশ জাপান যুদ্ধের পর হইতে জাপান সাম্রাজ্যবাদের পথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। কোরিয়া হইতে রাশিয়াকে চলিয়া যাইতে বাধ্য করার পরে জাপান ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কোরিয়া হস্তগত করিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপান প্রত্যক্ষভাবে যোগদান না করিয়া মিত্রশক্তি যখন যুদ্ধে ব্যস্ত, তখন চীনে জার্মান অধিকৃত কিয়োচাও এবং সানটুং-এ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিল। যুদ্ধশেষে মিত্রশক্তি জাপানকে এই সকল স্থানের অধিকার অর্পণ করিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জাপান আটচল্লিশ ঘণ্টার মেয়াদে কুখ্যাত একুশ দফা দাবি পূরণের জন্য চীনের নিকট চরমপত্র প্রেরণ করে এবং চীনকে তাহা পূরণ করিতে বাধ্য করে। এইসব দাবি পূরণের ফলে জাপান মাঞ্চুরিয়ার অধিকার পাইল এবং চীনের উপর একপ্রকার জাপানের অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠা করিল। এক কথায় জাপান ইউরোপের নিকট চীনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য এই নীতি গ্রহণ করিতে চাহিল। ইহা 'এশিয়ার মনরো নীতি' বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে মিত্রশক্তি 'ভার্সাই' সন্ধিতে চীনের বিরুদ্ধে জাপানের 'একুশ দফা দাবি' সমর্থন করে।

ইউরোপীয় শক্তিবর্গ জাপানের সহিত সঙ্ঘর্ষের আশঙ্কায় সুদূর প্রাচ্যে স্ব স্ব অধিকৃত এলাকায় সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত করিল—বৃটিশশক্তি সিঙ্গাপুরে এবং আমেরিকা প্রশান্তমহাসাগরস্থ গুয়াম-এ। জাপানও ইহার প্রত্যুত্তরে ফরমোসা দ্বীপে স্বীয় নৌ-শক্তি দৃঢ় করিল। জাপানের এই শক্তিবৃদ্ধি ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের নিকট আতঙ্কের কারণ হইল। ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে ওয়াশিংটনে যে চুক্তি হয় তদনুযায়ী জাপান চীনকে সানটুং প্রত্যর্পণ করে এবং ইংলণ্ড আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি প্রশান্তমহাসাগরে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রবর্গ ভবিষ্যতে আর নৌ-বল বৃদ্ধি করিবে না এইরূপ চুক্তিবদ্ধ হয়। জাপান ইতিমধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যে সামরিক প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল, তাহা অক্ষুণ্ণ রহিল এবং ওয়াশিংটনের চুক্তিতে স্বীকৃত হইলেও প্রশান্ত মহাসাগরে তাহার আধিপত্য সর্বাধিক রহিল।

ওয়াশিংটন চুক্তি (১৯২১-২২)

জাপানের সাম্রাজ্যবাদের মূলে ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার স্থান ও জীবিকা সঙ্কুলানের সমস্যাও ছিল। অষ্ট্রেলিয়ায় বা আমেরিকায় জাপানীদের বসবাস বা চাকুরী ইত্যাদি করার কোন উপায় ছিল না—বিভিন্ন আইনের দ্বারা সেই সব দেশ জাপানীদের পক্ষে নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। উপরন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার শিল্পপ্রধান দেশ সমূহ তাহাদের দেশে বা উপনিবেশ সমূহে জাপানের শিল্পজাত দ্রব্যাদির আমদানী নিষিদ্ধ করিয়া জাপানকে এক বিরাট অর্থ নৈতিক সমস্যার সম্মুখীন করিয়াছিল। সুতরাং জাপানের পক্ষে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার স্থান সঙ্কুলান, খাদ্যশস্য আমদানী এবং শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য কাঁচামাল প্রাপ্তি ও বিক্রয় কেন্দ্রের জন্য নিজস্ব উপনিবেশ বা ভূখণ্ডের প্রয়োজন হইয়া পড়িল। এই অর্থ নৈতিক প্রয়োজন হইতেই তাহার সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি ও প্রসার লাভ করিল।

জাপানের সাম্রাজ্যবাদের মূলে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা ও অর্থ নৈতিক কারণ

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে চীনে কুমিণ্টাং ও কমিউনিষ্ট দলের মধ্যে গৃহবিবাদের সুযোগে জাপান মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিয়া সেখানে মাঞ্চুকো নামে এক তাঁবেদার রাজ্য সৃষ্টি করিল। চীন জাপানকে মাঞ্চুরিয়া ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। ক্রমশঃ জাপান অপ্রতিহত গতিতে চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বহু স্থানে জাপানের আধিপত্য বিস্তার করিল। জাপানের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনের দুইটি বিবদমান দলই একযোগে জাপানকে বাধা দিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে জাপানের বিরুদ্ধে চীনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধের সময়েই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান, জার্মানী ও ইটালীর পক্ষে অবতীর্ণ হয় এবং ১৯৪১ হইতে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, ইন্দোনেশিয়া, মালয় ও ব্রহ্মদেশ আক্রমণ ও অধিকার করিয়া মিত্রশক্তিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। পরিশেষে জাপানের নাগাসাকি ও হিরোসিমায় এ্যাটম বোমা নিক্ষেপ করিলে জাপান আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয় (১৯৪৫)।

প্রশ্নোত্তর

1. State briefly the history of China up to 1911.

উত্তর-সূত্র :—(১) ভূমিকা : চীন ইউরোপের নিকট পরিচিত হইলেও উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে পাশ্চাত্য দেশ সমূহের সঙ্গে চীনদেশের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজরা ম্যাকাও-তে, ওলন্দাজরা ফরমোসা দ্বীপে এবং ইংরেজগণ ক্যান্টনে প্রতিষ্ঠিত হইল। চীন সরকারীভাবে একমাত্র রাশিয়া ব্যতীত আর কাহাকেও স্বীকার করে নাই এবং কোন বিদেশী রাষ্ট্রকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার অনুমতি প্রদানে সম্মত হয় নাই। কিন্তু ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ চীনকে এইভাবে থাকিতে দিলনা—তাহারা বলপূর্বক চীনে প্রবেশ করার নীতি গ্রহণ করিল। এইরূপে বহির্জগতের নিকট চীনের দ্বার উন্মুক্ত হইল। ইহার উদ্যোক্তা ছিল ইংলণ্ড।

(২) প্রথম চীন যুদ্ধ (অহিফেন যুদ্ধ—Opium war): চীনের পরাজয় ও নানকিং-এর সন্ধি (১৮৪২); চীনের পাঁচটি বন্দর বিদেশীদের নিকট উন্মুক্ত।

(৩) দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ : তিয়েনসিনের সন্ধি : আরও এগারটি বন্দর চীনের জন্য উন্মুক্ত।

(৪) চীনের দুর্বলতা প্রকাশিত এবং ক্রমশঃ চীন ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের দ্বারা বণ্টিত ও লুণ্ঠিত।

(৫) চীন-জাপান যুদ্ধ (১৮৯৪-৯৫)—জাপানের হস্তে পরাজয় : সিমনোসেকির সন্ধি।

(৬) ক্রমাগতঃ পরাজয়ের ফলে চীনের জাতীয় সচেতনতা ও প্রতিক্রিয়া—বক্সার বিদ্রোহ (Buxar Rebellion)।

(৭) চীনের নবজাগরণ : 'তরুণ-চীন' দল—সান ইয়াৎ সেন—চীন-সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা (১৯১২ খৃষ্টাব্দ)—ডঃ সানের কুয়োমিণ্টাং দল।

(৮) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চীন কর্তৃক জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদান করে।

2. Narrate the history of the gradual ascendancy of Japan in the 19th and the 20th centuries.

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে জাপানের আধিপত্য বিস্তারের ইতিহাস বর্ণনা কর।

উত্তর-সূত্র : (১) ভূমিকা : ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত জাপান বিদেশীকে স্বদেশে প্রবেশাধিকার দিতে স্বীকৃত হয় নাই। এই আত্মগোপন হইতে জাপানকে বিশ্বের দৃষ্টির সম্মুখে আনিলেন ১৮৫৩ সালে আমেরিকার নৌ-সেনাপতি কমোডোর পেরী। পাশ্চাত্যের এই অনাহূত আক্রমণে জাপান প্রথমে একটু দিশাহারা হইলেও সে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ বুঝিতে পারিল এবং ইহার গ্রাস হইতে আত্মরক্ষার জন্যই ইহাকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করিয়া রক্ষা পাইল। জাপান সর্বপ্রকারে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহণ করিল এবং পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের মতই প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীনের শোষণে যোগদান করিল। ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া জাপান বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অপরাপর রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইল। সুদূর প্রাচ্য সমস্যায় জাপানের অভ্যুদয় অন্যতম জটিলতার সৃষ্টি করিল। চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের ফলে জাপানের আত্মপ্রত্যয় বর্ধিত হইল এবং জাপান সাম্রাজ্যবাদী ও বাণিজ্যিক রাষ্ট্র হিসাবে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবর্গের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল। এইরূপে জাপানের অভ্যুদয় সুদূর প্রাচ্য তথা বিশ্বের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। (২) ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার সহিত চুক্তি এবং জাপানের দ্বার পাশ্চাত্যের সকল রাষ্ট্রের নিকট উন্মুক্ত। (৩) ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, রাশিয়া ও জার্মানীর সহিত সন্ধিবদ্ধ। জাপানকে বাধ্য হইয়া বিদেশী রাষ্ট্রের অতিরাষ্ট্রিকতা, বন্দর, উন্মুক্ত করা, শুল্ক ক্ষমতা প্রদান এবং বিশেষ কূটনৈতিক অধিকার স্বীকার করিতে হইল। (৪) জাপানের বিপ্লব ও নবজাগরণ (Restoration), ১৮৬৭-৬৮—সামন্তপ্রথা প্রত্যাহৃত—অল্পকালের মধ্যে জাপান সর্বপ্রকার আধুনিক হইল। (৫) ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের স্বীকৃতি লাভের জন্য সামরিক শক্তির পরিচয় প্রদানে আগ্রহ—চীন-জাপান যুদ্ধ : ফল—ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ জাপানের সার্বভৌম অধিকার স্বীকার করিল। অতিরাষ্ট্রিকতা প্রভৃতি বিশেষ সুবিধা প্রত্যাহার করিয়া লইল। ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী, ১৯০২—জাপানের আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি ও

রুশ-জাপান যুদ্ধের বীজ বপন। (৬) রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-০৫)—জাপানের জয়—জাপান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত। (৭) ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কোরিয়া হস্তগত—প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান না করিয়া জাপানের সুবিধা—চীনের নিকট একুশ দফা দাবি—প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আধিপত্য লইয়া আমেরিকার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। (৮) ওয়াশিংটন কনফারেন্স—জাপানের 'মনরো-নীতি'—জাপানের ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রতিরক্ষামূলক কার্যাবলী—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের অবতরণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জয়লাভ—পরিণামে পরাজয়।

3. Discuss the causes and effects of the (a) Sino-Japanese War and (b) Russo Japanese War.

উত্তর সূত্র: চীন জাপান যুদ্ধ (১৮৯৪-৫)—১) যুদ্ধের কারণ—কোরিয়ার আধিপত্য লইয়া চীনের সঙ্গে বিরোধ—যুদ্ধ ও চীনের পরাজয়। (২) সিমনোসেকির সন্ধি—ফলাফল (ক) জাপানের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি—ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত অ-সম সন্ধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি, (খ) জাপানের আত্মপ্রত্যয় ও সাম্রাজ্যবাদের সূত্রপাত, (গ চীনের পরাজয়ে চীনের মৌলিক দুর্বলতার প্রকাশ ও চীন-শোষণের দ্রুতায়ন, (ঘ) জাপানের অভ্যুদয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমস্যার সৃষ্টি, (ঙ রাশিয়ার বিপক্ষা রণ ও রুশ জাপান যুদ্ধের বীজ বপন।

রুশ জাপান যুদ্ধ (১৯১৪-০৫): (১) কারণ—সিমনোসেকির সন্ধিতে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের ফলে জাপান ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইয় ক্ষুব্ধ ও প্রতিকারের চেষ্টা, রাশিয়ার প্রতিপত্তি বৃদ্ধিত ইংলণ্ডের শঙ্কা—ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী, ১৯০২। (২) মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ার সৈন্য সমাবেশ—জাপানের আপত্তি—মাঞ্চুরিয়া হইতে পশ্চাদপসরণে রাশিয়ার অসম্মতি ও যুদ্ধ—পোর্ট আর্থারের সুৎসিমা-র নৌ যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়। ৩ পোর্টসমাউথের সন্ধি—কোরিয়াতে জাপানের অধিকার স্বীকৃত—রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগে সম্মত। (৪) ফলাফল: (ক) জাপানের মর্যাদা বর্ধিত—ইউরোপীয় রাষ্ট্রকে পরাজিত করার ফলে জাপান বিশ্বশক্তিরূপে স্বীকৃত, (খ) জাপান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত, (গ) রাশিয়া সুদূর প্রাচ্যে তাহার সম্প্রসারণনীতি স্থগিত রাখিয়া নিকট প্রাচ্যে মনোযোগ নিবদ্ধ করিল, (ঘ) রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়া ও জারতন্ত্রের উপর জনসাধারণের অনাস্থা বৃদ্ধি, (ঙ জাপানের সাম্রাজ্যবাদ নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ—১৯১০ খৃষ্টাব্দে কোরিয়া অধিকার—চীনের নিকট 'একুশ দফা দাবি'।

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও পরবর্তীকাল

Syllabus :—The first world war and after. Causes and course of the war (without details of military history) Peace settlement and new states. Turkey-Arab Nationalism.

পাঠ্যসূচী :—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী ঘটনা। যুদ্ধের কারণ ও গতি। শান্তি-চুক্তি ও নূতন রাষ্ট্রবর্গ। তুরস্ক-আরব জাতীয়তাবাদ।

ভূমিকা :—১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়, তাহার পশ্চাতে একদিকে ছিল ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পরবিরোধী স্বার্থের সংঘাত অপরদিকে ছিল ইউরোপের জাতিসমূহের মধ্যে যুদ্ধানুকূল মানসিক প্রস্তুতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বৈরাচারী বা গণতান্ত্রিক সকল রাষ্ট্রই যুদ্ধকে রাষ্ট্রনীতির অপরিহার্য্য অঙ্গ এবং জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করিত। এই নীতির সার্থকতাও কার্য্যক্ষেত্রে দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। নেপোলিয়ন সামরিক বলের সাহায্যেই বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিল. আবার ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই জার্মানী ও ইটালী সামরিক শক্তির উপরেই ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল। নেপোলিয়ন ও বিসমার্কের নীতির সাফল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া ইউরোপের ছোট বড় সকল রাষ্ট্রই ক্রমশঃ যুদ্ধের উপযোগিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল এবং জাতীয় উচ্চাশার পরিপূর্তি ব্যতীত জাতীয় অন্যায় অবিচারের প্রতিকারের জন্যও যুদ্ধকরা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পূর্বে প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে পারস্পরিক বিরোধের অন্ত ছিল না এবং বহু ক্ষেত্রেই তাহা আশঙ্কাজনক অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। পরাজয়ের প্রতিশোধ স্পৃহা, নিষ্পেষিত জাতীয়তাবাদের পরিপূর্তির আগ্রহ, পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মর্য্যাদালাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নিজস্ব বাণিজ্যক্ষেত্র লাভের প্রত্যাশা ইত্যাদি কারণে ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রের জনমানসে যুদ্ধানুকূল উত্তেজনা সৃষ্টির অবকাশ ঘটিয়াছিল। ইতিমধ্যে—জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও ইটালীর মধ্যে 'ট্রিপল এলায়েন্স' বা ত্রি-শক্তি মৈত্রী এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে 'ট্রিপল আঁতাত' বা ত্রিরাষ্ট্রশক্তিজোট ইউরোপকে পরস্পর বিরোধী দুইটি প্রতিপক্ষের শিবিরে পরিণত করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বার্লিনের চুক্তিতে (১৮৭৮) যে সকল সমস্যার সমাধানের কথা ছিল কর্মকর্তাদের স্বার্থদ্বন্দ্বে সেই সকল সমস্যা

পূর্ববৎ কম বেশী রহিয়া গেল। জার্মানীর নূতন নরপতি দ্বিতীয় উইলিয়ম জার্মানীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রগলভ দম্ভোক্তি করিয়া ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করিলেন। 'ইউরোপের শক্তিসমতা' রক্ষার জন্য একটি মাত্র অব্যর্থ জিনিস আছে—স্বয়ং আমি ও আমার পঞ্চবিংশ সৈন্যবাহিনী—তিনি অকারণ এই জাতীয় উক্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই 'তরবারি আস্ফালনের' সদম্ভ উক্তি ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রকে জার্মানীর বিরুদ্ধে সন্দিহান করিয়া তুলিল। ইংলণ্ড দীর্ঘকাল জার্মানী সম্বন্ধে একটা মৈত্রীভাব পোষণ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের বিভিন্ন আচরণের ফলে ইংলণ্ডও শঙ্কিত হইয়া পড়িল। মরক্কো ঘটনাবলী (১৯০৫ ও ১৯১১), বল্কান যুদ্ধ (১৯০৮ ও ১৯১১), জার্মানীর নৌবলের জন্য অপর্য্যাপ্ত ব্যয় বাহুল্য, কিয়েল খাল খনন, বার্লিন বাগদাদ রেলপথ পরিকল্পনা, সকল ব্যাপারেই জার্মানী ইংলণ্ডের শক্তিকে যেন প্রতিস্পর্দ্ধা করিতেছে বলিয়া ইংলণ্ডের মনে হইল। এতদ্ব্যতীত ফ্রান্সের জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধাত্মক মনোভাব, ইটালী অষ্ট্রিয়ার মনোমালিন্য, বল্কানে অষ্ট্রিয়া-সার্বিয়া ও অষ্ট্রিয়া-রাশিয়া বিরোধ সমস্ত মিলিয়া যুদ্ধের সম্ভাবনাকে অনিবার্য্য করিয়া তুলিয়াছিল।

সংক্ষেপে যুদ্ধের কারণ সমূহ:—উপরি-উক্ত পর্যালোচনার ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য সংক্ষেপতঃ নিম্ন কারণ সমূহ উল্লেখ করা যাইতে পারে—(১) বিশ্ব রাজনীতিতে জার্মানীর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার উগ্র আগ্রহে ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রবর্গের মনে আশঙ্কার সঞ্চার (২) ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জার্মানী-অষ্ট্রিয়া ইটালী রাষ্ট্রজোটের প্রতিপক্ষরূপে ইংলণ্ড-ফ্রান্স-রাশিয়ার ত্রিশক্তি আঁতাতের সৃষ্টি; এইরূপে ইউরোপ দুই বিরোধী শিবিরে বিভক্ত। (৩) বল্কান অঞ্চলে আধিপত্য লইয়া রাশিয়া-অষ্ট্রিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বৈরিতা। শ্লাভ জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা ও তাহাতে সার্বিয়ার সক্রিয় সমর্থন দ্বারা এই বিরোধে ইন্ধন জোগাইয়াছিল। (৪) উপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উপযোগী বিশ্বের উল্লেখযোগ্য স্থান সমূহ পূর্বে আগত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বণ্টিত হওয়ায় জার্মানী, ইটালী, জাপান, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি বিলম্বে আগত রাষ্ট্র বর্গের মনে তীব্র অসন্তোষ এবং এই দুই শ্রেণীর মধ্যে উপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা (৫) অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদের জন্য অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারী, তুরস্ক ও জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত জাতি গোষ্ঠী বিশেষের মধ্যে অসন্তোষ (৬) জার্মানীর হস্তে পূর্ব পরাজয়ের গ্লানি মোচনের এবং আলসেস-লোরেন প্রদেশদ্বয় পুনরধিকারের জন্য জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্সের তীব্র প্রতিশোধ স্পৃহা (৭) জার্মানীর নৌবল সৃষ্টিতে ইংলণ্ডের মনে তাহার সুদূর প্রসারী সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিপত্তি বিপদাপন্ন হওয়ার আশঙ্কা। (৮) ইউরোপের অভ্যন্তরে কয়েকটি রাষ্ট্রযুগের

মধ্যে স্বার্থের সংঘাত—ফ্রান্স ও জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও ইটালী, অষ্ট্রিয়া ও সার্বিয়া, অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া (৯) পরিশেষে বসনিয়ার সেরাজেভো শহরে অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ফার্ডিনাণ্ডের হত্যাকাণ্ড বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হইল।

যুদ্ধের সূচনা :—উপরি-উক্ত কারণ সমূহের ফলে যখন ইউরোপের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি শঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছে, তখন ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ফ্রানজ্ ফার্ডিনাণ্ড বসনিয়ার রাজধানী সেরাজিভো শহর পরিভ্রমণ করিতে গেলে এক আততায়ী তাঁহাকে হত্যা করে। বসনিয়া অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত এবং যুবরাজের হত্যাকারী এবং তাহার সহযোগীবৃন্দ সকলেই বসনিয়ার অধিবাসী ছিল। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার গভর্ণমেণ্ট এই হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে সার্বিয়ার প্ররোচনা ও প্রত্যক্ষ সাহায্য রহিয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত করিল এবং সার্বিয়াকে অপরাধী স্থির করিয়া কতকগুলি শর্ত আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে পূরণের দাবীতে এক চরমপত্র প্রেরণ করিল। সার্বিয়ার কর্তৃপক্ষ স্বরাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা রক্ষার উপযোগী কয়েকটি শর্ত মানিয়া লইয়া অবশিষ্টগুলি সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক বৈঠকে আলোচনার প্রস্তাব করিল। অষ্ট্রিয়া সার্বিয়ার এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিল এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষ সমর্থন করিয়া অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্যসমাবেশের আদেশ দিল। অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়ার সৈন্য সমাবেশ হইতে দেখিয়া জার্মানী অষ্ট্রিয়ার পক্ষ অবলম্বন পূর্বক সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া মাত্র রুশ-ফরাসী মৈত্রীর শর্ত অনুসারে ফ্রান্স রাশিয়ার জন্য অগ্রসর হইল। সুতরাং জার্মানী যুগপৎ রাশিয়া ও ফ্রান্স আক্রমণ করিল। জার্মানী ফ্রান্স আক্রমণের অভিপ্রায়ে বেলজিয়মের মধ্য দিয়া সৈন্য চলাচলের চেষ্টা করিলে বেলজিয়ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ইহাতে সম্মত হইল না। জার্মানী বেলজিয়মের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া বেলজিয়ম আক্রমণ পূর্বক তাহার মধ্য দিয়া ফ্রান্সের দিকে সৈন্য প্রেরণ করিল। ইংলণ্ড এযাবৎ নিরপেক্ষ ছিল। কিন্তু জার্মানী কর্তৃক বেলজিয়মের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করার অভিযোগে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (৪ঠা আগষ্ট, ১৯১৪)। তুরস্ক ও বুলগেরিয়া জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ইটালী ও আমেরিকা প্রথমে নিরপেক্ষ থাকে পরে ইংলণ্ড-ফ্রান্স-রাশিয়ার পক্ষে যোগদান করে। এই যুদ্ধে সার্বিয়ার পক্ষভুক্ত রাশিয়া-ফ্রান্স ইংলণ্ডের জোটের নাম হয় 'মিত্রশক্তি' (Allied Powers) এবং অষ্ট্রিয়া-জার্মানী-তুরস্ক প্রভৃতি জোটের নাম হয় 'কেন্দ্রীয় শক্তি' (Central Powers)। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষে সর্বশুদ্ধ তেত্রিশটি দেশ এবং সাড়েকোটি বত্রিশ লক্ষ লোক সৈনিকরূপে অংশ গ্রহণ করে।

যুদ্ধ :—১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে এক অভিনব ঘটনা। ইতিপূর্বে অপর কোন যুদ্ধে এত বিশাল সংখ্যক সৈন্য এবং ব্যাপক সামরিক অস্ত্র-শস্ত্রের আয়োজন হয় নাই বা রণাঙ্গনের পরিধি এত বিস্তৃত হয় নাই। সমগ্র ইউরোপ, ইউরোপের উপনিবেশিক সাম্রাজ্য আফ্রিকা, ইজিপ্ট, ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিকট প্রাচ্য, চীন, জাপান প্রভৃতি সুদূর প্রাচ্য, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ-আমেরিকা—পৃথিবীর সকল মহাদেশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই যুদ্ধের সহিত লিপ্ত হইয়া পড়িল। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে উভয় পক্ষের শক্তি পরীক্ষা চলিল—রণনীতি, আগ্নেয়াস্ত্র, ধ্বংসলীলা ও ভয়াবহতার দিক দিয়া এই যুদ্ধ অভিনবত্বের পরিচয় দিল। বোমারু বিমান, সাবমেরিণ, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি এই যুদ্ধে প্রথম ব্যবহৃত হয়। প্রতিপক্ষের উপর বিষাক্ত গ্যাস, রোগের জীবাণু প্রভৃতিও ব্যবহৃত হইয়াছিল। মাটির মধ্যে ট্রেঞ্চ বা নালা কাটিয়া তাহার মধ্যে থাকিয়া উভয় পক্ষই দীর্ঘকাল আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ চালাইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে, ট্যানেনবার্গ-এর যুদ্ধ, ফকল্যাণ্ড দ্বীপের সন্নিকটে নৌ-যুদ্ধ, গ্যালিপলি অভিযান, কুট-অল-আমেরার যুদ্ধ, সম্মি-(Somme)-র যুদ্ধ, জুটল্যাণ্ডের নৌ-যুদ্ধ, (১৯১৬) প্রভৃতি যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। ইতিমধ্যে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব সংঘটিত হইলে রাশিয়া যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল আমেরিকা মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে। আমেরিকার অগণিত লোকসংখ্যা, প্রচুর সম্পদ এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাব জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হওয়াতে জার্মানীর পরাজয় সুনিশ্চিত হয়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের গতি মিত্রপক্ষের অনুকূলে যাইতে আরম্ভ করে এবং জার্মানীর পরাজয়ের পালা আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে জার্মানীর সৈন্যদলে বিশেষতঃ নৌ-বিভাগে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং জার্মানীর সর্বত্র বিপ্লবের অশান্তি দেখা দেয়। ৯ই নভেম্বর কাইজার সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া হল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অগত্যা ১১ই নভেম্বর জার্মানী যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা করিলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হইল।

ভার্সাই সন্ধি (১৯১৯) :—যুদ্ধের অবসানে সন্ধির শর্তাদি আলোচনার জন্য প্যারিসে বিজয়ী শক্তিবর্গের মধ্যে এক বৈঠক হয়। সন্ধির শর্ত স্থির করার জন্য আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী ও জাপান এই পাঁচটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্যারিসের বৈঠকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা ও অব্যাহত রাখার জন্য যাহা অপরিহার্য্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন সে সম্বন্ধে একটি তালিকা প্রণয়ণ করিলেন। এই তালিকা 'চৌদ্দ দফা' (Fourteen Points) নামে খ্যাত। সন্ধির শর্ত রচনার সময়ে দেখা গেল অধিকাংশ রাষ্ট্রই উইলসনের চৌদ্দ দফাকে আন্তরিকতার

সঙ্গে গ্রহণ করে নাই। বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের স্বার্থপ্রধান উচ্চাশার নিকট 'চৌদ্দ দফার' আদর্শবাদ চাপা পড়িল। চৌদ্দ দফার ঘোষিত স্থায়ী শান্তি ও কল্যাণের বার্তায় বিশ্বের জনসাধারণের মনে যে আশা-আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার হইয়াছিল, কার্য্যক্ষেত্রে উহার বিপরীত পন্থা অনুসরণ করাতে সর্বত্র নৈরাশ্যের আবির্ভাব হইল।

ভার্সাই সন্ধি

পাঁচটি সন্ধি পত্রের দ্বারা শান্তির প্রস্তাব গৃহীত হয়। জার্মানীর সঙ্গে যে সন্ধি সম্পাদিত হয়, তাহা ভার্সাই সন্ধি নামে পরিচিত। ভার্সাই সন্ধি অনুযায়ী ইউরোপের ভৌমিক বন্দোবস্ত নিম্নরূপ হয়। জার্মানী ফ্রান্সকে আলসেস-লোরেন, বেলজিয়মকে তিনটি প্রাশিয়ান প্রদেশ, মিত্রশক্তিকে বাল্টিক বন্দর মেমেল (পাঁচ বৎসর বাদে লিথুয়ানিয়া ইহা প্রাপ্ত হয়), পোলাণ্ডকে পোজেনের কতকাংশ, পশ্চিম প্রাশিয়া, আপার সাইলেশিয়া ও পূর্ব প্রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। জার্মানীর শিল্প প্রধান সার উপত্যকা (Saar Valley) পনেরো বৎসরের জন্য আন্তর্জাতিক কমিশনের হস্তে অর্পিত হইল। জার্মানী তাহার সমস্ত উপনিবেশ ও অধিকৃত দেশ সমূহ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল এবং চীন, শ্যাম, তুরস্ক, সাইবেরিয়া, মরক্কো ইজিপ্টের উপর বিশেষ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। জার্মানীর সামরিক শক্তি ও

লয়েড জর্জ

নৌবল পঙ্গু করার ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইল এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রভূত অর্থদানের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইল।

সেণ্ট জার্মান সন্ধি

অষ্ট্রিয়ার সহিত বিজয়ী শক্তিবর্গের যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহা সেণ্ট জার্মান সন্ধি নামে পরিচিত। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী অষ্ট্রিয়া দক্ষিণ টাইরল, ট্রিয়েষ্ট, ইষ্ট্রিয়া এবং চেরসো ও লুসিন উপদ্বীপদ্বয় ইটালীকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়, এতদ্ব্যতীত অষ্ট্রিয়া হাঙ্গারী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কয়েকটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি করা হইল। বোহেমিয়া ও মোরেভিয়া সংযুক্তভাবে চেকোশ্লোভাকিয়া নামে একটি নূতন রাজ্য সৃষ্টি করিল। বসনিয়া, হার্জিগভনিয়া, ক্রোয়েশিয়া এবং অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চল সার্বিয়ার সহিত যুক্ত হইয়া যুগোশ্লাভিয়া নামে একটি শ্লাভপ্রধান রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করিল। ট্রান্স সিলভানিয়াকে অষ্ট্রিয়ার কবল

হইতে মুক্ত করিয়া রুমানিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হইল। এতদ্ব্যতীত দীর্ঘকাল পরে পুনর্গঠিত দেশ পোলাণ্ডকে গ্যালিসিয়া এবং রুমানিয়াকে বুকোভিনা দিতে বাধ্য হইল। অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্তৃত্বাধীনে রহিল এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভ্যগণের সর্বসম্মতি ব্যতীত জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া মিলিত হইতে পারিবে না।

টিয়ানন-এর সন্ধি

হাঙ্গেরী ও বিজয়ী শক্তিগুলির মধ্যে টিয়ানন-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই সন্ধির দ্বারা হাঙ্গেরী রুমেনিয়াকে ট্রান্সিলভ্যানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়াকে শ্লোভাক অঞ্চল ও যুগোশ্লাভিয়াকে ক্রোয়েশিয়া দিতে বাধ্য হইল।

নিউলির সন্ধি
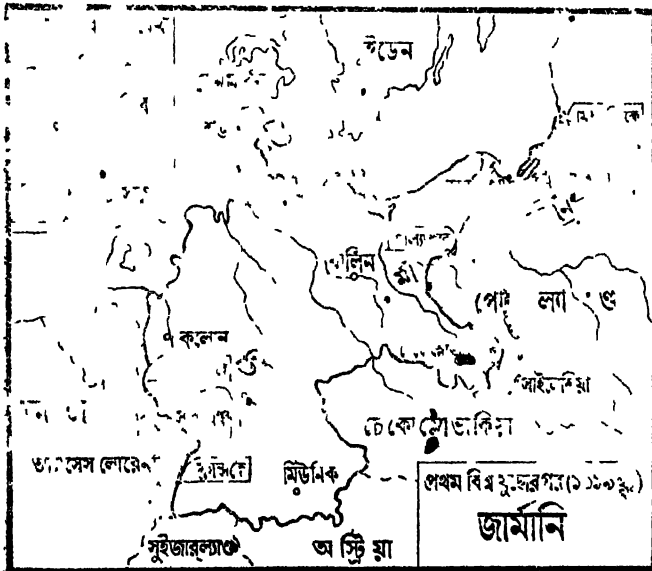
জার্মানীর পক্ষে যোগদান করিয়াছিল এই অপরাধে নিউলি-র সন্ধির শর্ত অনুযায়ী বুলগেরিয়াকে গ্রীসের অনুকূলে সমগ্র ইজিয়ান উপকূল এবং নবগঠিত যুগোশ্লোভিয়া রাষ্ট্রের স্বপক্ষে কয়েকটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করা হইল।

সেভার্স-এর যুদ্ধবিরতি ও পরে লুজানের সন্ধি (১৯২৩) অনুযায়ী তুরস্ক সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, মেসোপটেমিয়া (ইরাক) ও ইজিপ্টের উপর সকল স্বত্বস্বামিত্ব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। ইউরোপ খণ্ডে তুরস্কের অধিকারে রহিল কেবলমাত্র কনষ্টান্টিনোপল, আড্রিয়ানোপোল, পূর্ব থ্রেস, এনাটোলিয়া, আর্মেনিয়া ও স্মার্ণা। অন্তর্বিপ্লবের ফলে তুরস্কের মুস্তাফা কামালপাশা (আতাতুর্ক)-র নেতৃত্বে সাধারণতন্ত্রী শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল।

সেভার্সের যুদ্ধবিরতি ও ১৯২৩-পরে লুজানের সন্ধি, ১৯২৩

ভার্সাই সন্ধির সমালোচনা: ভার্সাই সন্ধির পশ্চাতে কোন মহান্ আদর্শ ছিল না। প্রধানতঃ প্রতিহিংসা বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গের প্রতিনিধিগণ শর্তাবলী রচনা করিয়াছিলেন। জার্মানীর সম্বন্ধে অত্যধিক কঠোর নীতি অবলম্বন করা অন্যায় হইয়াছে, যুদ্ধ বাধাইবার অপরাধের শাস্তিস্বরূপ জার্মানীর স্কন্ধে যে সকল দায়দাবি চাপাইয়া দেওয়া হইল, তাহাতে জার্মানজাতি ক্ষুব্ধ হইয়া রহিল। জার্মানীর মত প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রকে বলপূর্বক চিরকালের জন্য নিষ্পিষ্ট করিয়া রাখা যায় না। এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য ইউরোপকে পরিণামে পূর্বাপেক্ষাও প্রলয়ঙ্কর অপর একটি বিশ্বযুদ্ধের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

(১) জার্মানীর উপর অধিকার

দ্বিতীয়তঃ পূর্বাহ্নে প্রতিশ্রুত হইলেও কার্য্যকালে বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গ কর্তৃক সর্বত্র জাতীয়তার নীতি অনুসৃত হয় নাই। অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীর ব্যাপারে জাতীয়তা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকৃত হইল। নানা দিক দিয়া অঙ্গহানি করার পরেও অষ্ট্রিয়ার জনসাধারণ প্রধানতঃ জার্মান রহিল। ইত্যবস্থায় অষ্ট্রিয়ার পক্ষে জার্মানীর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়াই সঙ্গত ছিল। উপরন্তু ভার্সাই সন্ধির অষ্টি-নীতি জাতীয়তা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতির বিরোধী হইয়া পড়ে। এইভাবে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করা ভার্সাই সন্ধির অন্যতম ত্রুটি।

(২) জাতীয়তার নীতি অস্বীকার

তৃতীয়তঃ এই সন্ধির মধ্যে আর একটি যুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল। জার্মান রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া পোলিস করিডর (Polish Corridor) সৃষ্টির দ্বারা জার্মানীকে দ্বিখণ্ডিত করা, জার্মানীর শিল্পাঞ্চল সাইলেসিয়া পোলাণ্ডকে এবং সার উপত্যকা ফ্রান্সকে অর্পণ করা, বা ক্ষতিপূরণের মোটা আর্থিক দাবি তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ হইয়াছিল। এই অবস্থায় জার্মানী আপাততঃ দায়ে পড়িয়া ভার্সাই

(৩) অপর একটি যুদ্ধের বীজ নিহীত

সন্ধি মানিয়া লইলেও ভবিষ্যতে একটু শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিলেই ইহার শর্তাবলী অগ্রাহ্য করিবে এবং বর্তমান দূরবস্থা হইতে প্রতিকারের সংক্ষিপ্ততম উপায় হিসাবে আর একটি যুদ্ধের জন্য আগ্রহশীল হইবে ইহা নিতান্ত অকল্পনীয় ছিল না।

ক্লিমেনশু

তুরস্ক সাম্রাজ্য: আরব জাতীয়তাবাদ :—প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যোগদান করে। জার্মানী যুদ্ধে পরাজিত হইলে তুরস্ক মিত্রপক্ষের সহিত সেভার্স-এর সন্ধি-চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হয়। এই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তুর্কী সাম্রাজ্যের আয়তন সাতলক্ষ বর্গমাইল হইতে একলক্ষ বর্গমাইলে সঙ্কুচিত করা হইল। এই চুক্তি কার্যকরী হইলে তুরস্ক একটি অতি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হইত। তুর্কী সম্রাট ষষ্ঠ মহম্মদ এই চুক্তি অস্বীকার করিতে না পারিলেও তুরস্কের জাতীয়তাবাদীদের পক্ষ হইতে কামাল আতাতুর্ক নামে একজন নেতা এই সন্ধি মানিতে অস্বীকার করিলেন এবং তুরস্কের পক্ষ হইতে সুলতানের এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত করার অধিকার নাই বলিয়া মিত্রশক্তিকে জানাইলেন।

কামাল আতাতুর্ক

কামাল আতাতুর্ক ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে স্যালোনিকায় জন্মগ্রহণ করেন এবং কনস্টান্টিনোপলের মিলিটারী একাদেমী হইতে সামরিক শিক্ষা সম্পন্ন করিয়া ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি 'তরুণ-তুর্কী' দলে যোগদান করেন এবং জাতীয়তাবাদী সৈন্যদলের সঙ্গে যোগদান করিয়া তদানীন্তন সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে প্রজাদের গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার

কামাল আতাতুর্ক

করাইতে বাধ্য করাইলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আতাতুর্ক জেনারেল পদে উন্নীত হন এবং দার্দানেলিস, ককেসাস ও প্যালেষ্টাইন অঞ্চলে যুদ্ধ করেন। অতঃপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পরে যখন মিত্রপক্ষ তুরস্কের উপর সেভার্স-এর অপমানজক সন্ধি চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিল, তখন আতাতুর্ক সুলতানকে এই চুক্তি প্রত্যাখ্যানের জন্য আবেদন জানান। এই সময়ে আনাতোলিয়ায় জাতীয়তাবাদীরা সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে আতাতুর্ককে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরণ করিলে, তিনি বিদ্রোহ দমনের পরিবর্তে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। এই জাতীয়তাবাদী

জাতীয়তাবাদীদের নেতৃত্ব

বিদ্রোহীরা আতাতুর্কের নেতৃত্বে নূতন রাজনৈতিক ভিত্তিতে তুরস্কের স্বাধীনতা ঘোষণা করিল এবং জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম-পরিচালনার জন্য একটি কার্যকরী সমিতির গঠন করিল। আঙ্কারা ইহাদের কর্মকেন্দ্র হইল এবং কামাল আতাতুর্ক ইহার প্রেসিডেণ্ট হইলেন। তুরস্কের সুলতান জাতীয়তাবাদীদের নেতৃত্বে তুরস্কে যে রাজনৈতিক বিপ্লবের সূচনা হইতেছিল তাহার গুরুত্ব স্বীকার করিয়া তুরস্কের সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করিলেন। এই নির্বাচনে আতাতুর্কের জাতীয়তাবাদী দলই জয়লাভ করিল। এইবার আতাতুর্ক তুরস্কের পক্ষ হইতে মিত্রশক্তিকে সেভার্সের সন্ধির শর্তাদি পরিবর্তনের জন্য চাপ দিলেন। মিত্রশক্তি আতাতুর্কের দাবি মানিতে অসম্মত হইলেন। উপরন্তু ইংলণ্ড সৈন্য প্রেরণ করিয়া কনস্টাণ্টিনোপল অধিকার করিল এবং কয়েকজন জাতীয়তাবাদী নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়া নির্বাসিত করিল। আতাতুর্ক ও অন্যান্য নেতা আঙ্কোরায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেইখানে তাঁহারা এক নূতন গভর্ণমেণ্ট ও একটি পৃথক পার্লামেণ্ট স্থাপন করিয়া আততুর্ককে তাঁহাদের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত করিলেন। এইভাবে তুরস্কে দুইটি সরকারের প্রতিষ্ঠা হইল—একটি কনস্টাণ্টিনোপলে সুলতানের সরকার, অপরটি আঙ্কারায় জাতীয়তাবাদী সরকার।

কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী সরকার সেভার্সের সন্ধির শর্তাদি অগ্রাহ্য করিয়া তুর্কী সাম্রাজ্য হইতে বিদেশী বিতাড়নের জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ১৯২২

জাতীয়তাবাদী তুরস্কের নেতৃত্ব

খৃষ্টাব্দে তুরস্ক হইতে আক্রমণকারী গ্রীক সৈন্য বিতাড়িত হইল। অবশেষে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে লোজানে তুরস্ক ও মিত্রশক্তির মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। কামাল আতাতুর্ক পূর্বে ইউরোপীয় শক্তিবর্গকে যে সকল শর্ত মানিবার জন্য দাবী করিয়াছিল তাহারা তাহাই মানিয়া লইল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তুরস্কে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হইল এবং মুস্তাফা কামাল পাশা তুর্কী প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইলেন। তুরস্ক হইতে

সুলতান ও খলিফার পদ লুপ্ত করিয়া দেওয়া হইল। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তুরস্ককে আধুনিক ও প্রগতিশীল রাষ্ট্রে উন্নীত করার জন্য কামালপাশা বহু সংস্কারের প্রবর্তন করেন। অশিক্ষা ও ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করার জন্য তিনি কোন চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নাই। নারীদের উন্নতির জন্য তিনি বহু বিবাহ ও পর্দাপ্রথা তুলিয়া দেন; শিক্ষা-সংস্কৃতিতে স্ত্রী জাতির অংশ গ্রহণ, সরকারী প্রদেশে শিক্ষিত নারীর নিয়োগ, স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহের জন্য নূন্যতম বয়স নির্দ্ধারণ প্রভৃতি সংস্কারের দ্বারা সমাজে স্ত্রীজাতির স্থান মর্য্যাদাপূর্ণ করিয়া তোলা হইল। পরে স্ত্রীলোকদিগকে ভোটাধিকার দেওয়া হয়। বর্ষপঞ্জী সংস্কার, স্কুল কলেজ স্থাপন, আরবী হরফের পরিবর্ত্তে রোমান হরফের প্রবর্ত্তন, দশমিক মুদ্রানীতির প্রবর্তন, ব্যাঙ্ক স্থাপন ইত্যাদি উন্নতিমূলক কার্য্যের দ্বারা কামাল তুরস্ককে একটি প্রগতিশীল আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করিলেন।

প্রজাতন্ত্র

প্রগতিশীল সংস্কার সমূহ

প্রজাতন্ত্র সৃষ্টির প্রথমদিকে কামাল আতাতুর্ক রাশিয়ার মৈত্রী ও সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি রাশিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ কমিউনিষ্ট মতবাদ তুরস্কে প্রচারিত হইতে দেখিয়া তিনি রাশিয়ার প্রতি মৈত্রী হইতে বিরত হন। তিনি ইটালী ও ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তুরস্ককে লীগ অফ নেশানস্-এর সভ্যপদভুক্ত করেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ইটালীর ডিক্টেটর মুসোলিনী আফ্রিকার আবিসিনিয়া অধিকার করিলে তুর্কীরাষ্ট্রের নিরপত্তার জন্য কামাল আতাতুর্ক ইরাক, ইরান ও আফগানিস্থানের সহিত চুক্তিবদ্ধ হন। এতদ্ব্যতীত রুমানিয়া, গ্রীস ও যুগোশ্লোভিয়ার সহিত তিনি পূর্ব্বেই একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এইভাবে সকল দিক দিয়া তুরস্কের উন্নতি ও নিরাপত্তা বিধান করিয়া ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে কামাল আতাতুর্ক মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আরব জাতীয়তাবাদ: আরব জাতি বলিলে আরব, সিরিয়া, ইরাক, মিশর, লিবিয়া, টিউনিশিয়া, আলজেরিয়া ও মরক্কো বসবাসকারী জাতি গোষ্ঠীকে বুঝায়। আরব, সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি এশিয়াস্থ অঞ্চলগুলি তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মিশরে তুরস্কের সুলতানের অধিকার থাকিলেও মিশর ইংলণ্ডের রক্ষণাবেক্ষণের অধীনেই ছিল। আফ্রিকাস্থ লিবিয়া ও টিউনিশিয়া ইটালীর অধিকারে এবং আলজিরিয়া ও মরক্কো ফ্রান্সের শাসনাধীনে ছিল। এশিয়া ও আফ্রিকার সকল অঞ্চলের আরবগণের মধ্যেই জাতীয়তাবাদের আন্দোলন দেখা দিয়াছিল। এশিয়ার আরব জাতিবর্গ তুরস্কের

বিরুদ্ধে এবং আফ্রিকার আরব জাতিগুলি ইউরোপীয় শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সচেতন ও সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছিল।

মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন আরব রাষ্ট্র সিরিয়া, আরব, প্যালেষ্টাইন, ইরাক প্রভৃতি তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহারা দীর্ঘকাল তুরস্কের শাসনাধীন থাকিলেও ইহাদের জাতীয়তাবোধ বিলুপ্ত হয় নাই এবং কখনও আন্তরিকতার সঙ্গে তুরস্কের শাসন মানিয়া লয় নাই। তাঁহারা তুরস্কের অধিপতির পরিবর্তে মক্কার শরিফ হজরত মহম্মদের পরিবারের বংশধর হুসেনকে মুসলমানের ধর্মগুরু খলিফা বলিয়া স্বীকার করিতেন। তুরস্কের সুলতান হুসেনকে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী জানিয়া তাঁহাকে দীর্ঘকাল কনস্টান্টিনোপলে অন্তরীণ করিয়াছিলেন। অবশ্য পরে তাঁহাকে মুক্ত করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করিলে ইংলণ্ড তুরস্ককে দুর্বল করিবার জন্য তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আরব জাতির মধ্যে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করে। আরব জাতির মধ্যে তুরস্কবিরোধী আন্দোলনের ব্যাপারে জনৈক ইংরেজ কর্ণেল লরেন্সের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে হুসেনের নেতৃত্বে হেজাজ প্রদেশ তুর্কীশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং হুসেনের পুত্র ফৈজল সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস অধিকার করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময়ে আরবজাতির সাহায্য ও সমর্থন লাভের জন্য ইংলণ্ড হুসেনের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তিতে ইংরেজরা যুদ্ধের অবসানে আরব, সিরিয়া ও ইরাকের স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে আশ্বাস প্রদান করে। কিন্তু ভার্সাই সন্ধিতে আরবজাতির জাতীয়তাবোধ মোটেই স্বীকৃত হইল না। আরব অঞ্চলের উপর ইউরোপীয় শক্তিবর্গের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য অধিকাংশ আরব দেশগুলিকে 'ম্যাণ্ডেট' রাজ্য (Mandated Territory) বা রক্ষণাধীন রাজ্যে পরিণত করা হইল। হুসেনকে হেজাজের স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করা হইল। হুসেনের এক পুত্র ফৈজল ইরাকের নরপতি ও অপর এক পুত্র আবদুল্লা ট্রান্স-জর্ডানের আমীরের পদলাভ করিলেন। প্যালেষ্টাইনকে বৃটিশের অধীনে এবং সিরিয়াকে ফ্রান্সের অধীনে 'ম্যাণ্ডেট' রাজ্য রূপে ঘোষণা করা হয়। আরবদের জাতীয়তাবাদ এইভাবে অস্বীকৃত হইলে আরব জাতির মধ্যে অত্যন্ত বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

আরব জাতীয়তাবোধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

ভার্সাই সন্ধিতে আরবের জাতীয়তাবাদ অস্বীকৃত

ইরাকের নরপতি ফৈজলের সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা ও কূটনৈতিক বুদ্ধি কৌশলে ইরাকে

বৃটিশ প্রাধান্য প্রভাবের বিরুদ্ধে দেশময় তীব্র জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনের ফলে বৃটিশকে ইরাক হইতে সরিয়া আসিতে হয় এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ইরাক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কিন্তু অপর দুইটি আরব রাষ্ট্র ট্রান্স-জর্ডান ও হেজাজ বৃটিশের প্রাধান্য ও অর্থনৈতিক শোষণ-ব্যবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিল না। এই রাজ্যদ্বয় ক্রমশঃ বৃটিশের উপর সমস্ত দিক দিয়া অনুগত হইয়া পড়িল। এই দুই রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে বৃটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। এই সুযোগে ইবন সউদ হেজাজের সিংহাসন অধিকার করিল এবং হেজাজের নূতন নামকরণ হইল সৌদী আরব। ইবন সউদ সুদক্ষ শাসক ছিলেন। তাঁহার শাসন সময়ে সৌদী আরবের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটিল। দেশের পেট্রোলিয়ম বা তৈল সম্পদের একচেটিয়া মালিকানা বিদেশীদের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া তিনি নূতনভাবে দেশের স্বার্থের দিক বজায় রাখিয়া বিদেশী তৈল-কোম্পানীদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলেন। ইবন্ সউদের বংশধরগণই বর্তমানে সৌদী আরবে রাজত্ব করিতেছে।

ইরাক

হেজাজ বা সৌদী আরব

আরব রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ ও সংহতি বজায় রাখার জন্য ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন আরব রাষ্ট্র লইয়া 'আরব লীগ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। সৌদী আরব, ট্রান্স-জর্ডন, ইরাক, মিশর, লেবানন, ইয়ামেন, প্রভৃতি দেশ আরব লীগের সভ্য। আরব দেশগুলির স্বাধীনতা রক্ষা ও পারস্পরিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যেই এই আরব লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে নিজেদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাতের ফলে শেষ পর্যন্ত আরব লীগের ঐক্য বজায় রহিল না। সম্প্রতি মিশর আরব লীগ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী একটি লীগের সৃষ্টি করিয়াছে।

আরব লীগ

ভার্সাই-র সন্ধির দ্বারা প্যালেষ্টাইনকে বৃটিশের অধীনে একটি 'ম্যাণ্ডেট' রাজ্যে পরিণত করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ডাঃ ওয়াইজম্যান নামে একজন ইহুদী বৈজ্ঞানিক যুদ্ধে সাফল্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক একটি আবিষ্কারের দ্বারা মিত্রপক্ষের কৃতজ্ঞতা ভাজন হন। এই কর্মের পুরস্কার স্বরূপ বৃটিশ কর্তৃপক্ষ প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র মাতৃভূমি ও রাষ্ট্র স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন। মধ্য ইউরোপের ইহুদী জাতিকে জার্মান বিরোধী করিয়া তুলিবার জন্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনী ইহুদীদের সাহায্য পাইবার জন্যও এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়। বৃটেনের তৎকালীন বৈদেশিক মন্ত্রী বালফুর-এর নাম অনুসারে উহা বালফুর ঘোষণা

প্যালেষ্টাইন

নামে পরিচিত। প্যালেষ্টাইনের শতকরা নব্বই জন লোক আরব ছিল। সুতরাং এই ঘোষণা আরব জাতীয়তাবাদের পরিপন্থী হইল। যুদ্ধ শেষে প্যালেষ্টাইন বৃটিশের অধীনে 'ম্যাণ্ডেট' রাজ্য স্থাপিত হইলে তথায় বসবাসের জন্য ইহুদীরা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহুদীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকায় আরব জাতির বিদ্বেষ ও বিক্ষোভ ক্রমেই বাড়িতে থাকে।" প্যালেষ্টাইনে আরব ও ইহুদীদের মধ্যে অনবরত দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিতে থাকে। প্যালেষ্টাইনের সমস্যা সমাধানের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট একটি কমিশন নিযুক্ত করিল। এই কমিশন প্যালেষ্টাইনকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া আরব-অঞ্চল ও ইহুদী অঞ্চলে বিভক্ত করার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু প্যালেষ্টাইনের আরব বা ইহুদী কেহই কমিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। ফলে পূর্ববৎ আরব-ইহুদী সংঘর্ষ তীব্রভাবে চলিতে লাগিল। প্যালেষ্টাইন সমস্যা সমাধানের পূর্বেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্যালেষ্টাইন আরব ইহুদী দুইটি পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত হইল। নবসৃষ্ট ইহুদী রাষ্ট্রের নাম হইল ইজরাইল। ইহুদীরাষ্ট্র ইজরাইলকে আরব জাতীয়তাবাদীরা তাহাদের জাতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির 'কণ্টক স্বরূপ' বিবেচনা করে।

প্যালেষ্টাইন দ্বিধা বিভক্ত হইল

আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ইয়েমেন একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইটালী ও তুর্কীর মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে ইয়েমেন স্বাধীনতা লাভের সুযোগ লাভ করে। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের অবসানে ইয়েমেনের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ইয়েমেন আরব লীগে যোগদান করে।

ইয়েমেন

সিরিয়া আরব লীগের অন্যতম প্রতিপত্তিশালী সদস্য। ভার্সাই-এর সন্ধি অনুসারে সিরিয়া ও লেবাননকে ফ্রান্সের অধীনে 'ম্যাণ্ডেট' রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সিরিয়ার অধিবাসীরা তাঁহাদের এই অধীন অবস্থাকে কিছুতেই মানিয়া লইতে পারিল না। তাহারা ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে রীতিমত আন্দোলন করিতে লাগিল এবং ফরাসী কর্মচারিগণকে আক্রমণ করিতে লাগিল। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য ফরাসী সরকার কঠোর দমন-নীতি অনুসরণ করিতে লাগিল, কিন্তু কোন মতেই সিরিয়াবাসীদের স্বাতন্ত্র্যকামিতা দমন করিতে পারিল না। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সরকার বাধ্য হইয়া এক চুক্তির দ্বারা সিরিয়াবাসীদের হস্তে শাসন ব্যবস্থা অর্পণ করিলেন। লেবানন সম্বন্ধেও ফরাসী গভর্ণমেণ্ট অনুরূপ ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে ফরাসী সরকার কোন চুক্তি অনুযায়ীই ব্যবস্থা করিলেন না।

সিরিয়া ও লেবানন

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সরকার সিরিয়ার শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে মিত্রশক্তি সিরিয়া ও লেবানন অধিকার করিলেন এবং ইঙ্গ-ফরাসীর চুক্তির দ্বারা সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যোগদান করিলে বৃটেন মিশরকে আশ্রিত দেশ বলিয়া ঘোষণা করে। মিশরে অবস্থিত সুয়েজখালের নিরাপত্তার জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। বৃটেনের এই আচরণের ফলে মিশরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নূতনভাবে দেখা দেয়। যুদ্ধের পরে মিশরের জাতীয়তাবাদী 'ওয়াফদ' দলের নেতা জগলুল পাশা মিশরের স্বাধীনতার দাবি উপস্থাপিত করেন। বৃটিশ সরকার জগলুল পাশা ও তাঁহার অনুচরবৃন্দকে বন্দী করিয়া মাল্টায় নির্বাসিত করেন। জাতীয় নেতাদের গ্রেপ্তার ও নির্বাসনের সংবাদে মিশরে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন তীব্রভাবে দেখা দেয়। অগত্যা বৃটিশ সরকার ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মিশরের সঙ্গে একটা আপোষ-রফা করেন। এই আপোষ-চুক্তি অনুযায়ী বৃটিশ সরকার মিশরের উপর হইতে সংরক্ষণ অধিকার প্রত্যাহার করেন এবং সুলতান ফুয়াদকে মিশরের নরপতি বলিয়া স্বীকার করেন। মিশরে তখন পর্য্যন্ত বৃটিশ সৈন্যদল অবস্থান করিবে বলিয়া স্থির হইল। কিন্তু ওয়াফদ দল মিশরে বৃটিশের আধিপত্য আরও হ্রাস করার জন্য আন্দোলন চালাইয়া যাইতে লাগিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বৃটেন একমাত্র সুয়েজখাল অঞ্চলে বৃটিশ সৈন্য রাখিয়া মিশরের অন্যান্য স্থান হইতে বৃটিশ সৈন্য প্রত্যাহার করিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মিশরে অন্তর্বিপ্লব দেখা দিল। মিশরের সুলতান ফুয়াদের পরে তাঁহার পুত্র ফারুক সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে মিশরে এক অন্তর্বিপ্লব দেখা দেয়—সামরিক নায়ক জেনারেল নাগুইব ও কর্ণেল নাসের এই বিপ্লবের নেতা ছিলেন। তাঁহারা ফারুককে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মিশরে প্রজাতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাদের দাবির ফলে সুয়েজ অঞ্চল হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারিত হয়। পরে এক দ্বিতীয় বিপ্লবের ফলে নাগুইব ক্ষমতাচ্যুত হন এবং কর্ণেল নাসের মিশরের সর্বময় কর্তা হন। কর্ণেল নাসের সুয়েজখালের উপর মিশরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করিলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্ররোচনায় এবং এই দুই রাষ্ট্রের সামরিক সাহায্যপুষ্ট ইজরাইল মিশর আক্রমণ করে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের এই আচরণের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র জনমত সক্রিয় হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার চাপে বাধ্য হইয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্স অগত্যা মিশর হইতে সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করে। ইহাদের বশংবদ ইজরাইল ইতিপূর্বেই পরাজিত হইয়া পশ্চাদপসরণ করিয়াছিল। সুয়েজ খালের পূর্ণ কর্তৃত্ব মিশরের হস্তগত হয়।

উত্তর আফ্রিকার মরক্কো, লিবিয়া, টিউনিসিয়া ও আলজিরিয়াতে বিদেশী শক্তির আধিপত্যের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী চেতনা দেখা দেয়। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স আলজিরিয়া অধিকার করে এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে টিউনিসিয়াতেও ফরাসী আধিপত্য বিস্তার করে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স মরক্কোর উপর প্রটেক্টোরেট বা রক্ষণাধিকার প্রতিষ্ঠা করে। মরক্কোর পশ্চিমে রিফ্ (Riff) নামে পরিচিত অঞ্চল স্পেনের অধীন ছিল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মরক্কোর সুলতান নিজেকে ফ্রান্সের আশ্রিত বলিয়া স্বীকার করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মরক্কোর জাতীয়তাবাদী নেতা আবদুল করিম প্রথমে স্পেনের আধিপত্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। স্পেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তিনি প্রায় তিন বৎসর যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া পরিশেষে পরাজিত হন এবং ইউনিয়ন দ্বীপে নির্বাসিত হন। ১৯৩৬—৩৭ খৃষ্টাব্দে মরক্কোতে পুনরায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দেখা দেয়। ফরাসী সরকার কঠোর হস্তে এই আন্দোলন দমন করেন।

মরক্কো

টিউনিসিয়া-তেও ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, আরম্ভ হইয়াছিল। টিউনিসিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের নায়ক থাল্‌বী 'দস্তুর পার্টি' নামে একটি জাতীয়দল গঠন করিয়া টিউনিসিয়ার জন্য স্বাধীনতা দাবি করে। কিন্তু ফরাসী সরকার মরক্কোর ন্যায় টিউনিসিয়া-তেও কঠোর দমননীতি অনুসরণ করিয়া টিউনিসিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন বিনষ্ট করে।

টিউনিসিয়া

আলজিরিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তীব্রভাবে অনুসৃত হয়। আলজিরিয়ার সমগ্র অধিবাসী ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে একযোগে বিদ্রোহ করে এবং ফরাসী দুর্গ, সেনানিবাস সরকারী গৃহ ধ্বংস করিতে থাকে। জাতীয়তাবাদীদের সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের লক্ষ্য হইতে ফরাসী নাগরিকরাও নিষ্কৃতি পায় নাই। অপরপক্ষে ফরাসী-সরকার এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য সরকারের সর্বশক্তি নিযুক্ত করিয়াছেন। এই বিরোধের কোন মীমাংসা এখনও হয় নাই। নাসের পরিচালিত মিশর আলজিরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক।

আলজিরিয়া

সমাজ ব্যবস্থা

উত্তর আফ্রিকার লিবিয়া ইটালীর অধিকারভুক্ত উপনিবেশ। লিবিয়াতেও উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা দেয়। ইটালীতে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার পর মুসোলিনীর অনুচর মার্শাল গ্রাৎসিয়ানী দশ বৎসর দমননীতির দ্বারা লিবিয়াতে ইটালীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

লিবিয়া

প্রশ্নোত্তর

1. Analyse the causes of the World War

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ সমূহ বিশ্লেষণ করা :--

উত্তর-সূত্র : (১) ভূমিকা: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য কোন এক বা একাধিক রাষ্ট্র বা কারণকে দায়ী করা যায় না। দীর্ঘকালব্যাপী বহু ঘটনা-পরম্পরা সমবায়ের ফলে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

(২) কারণসমূহ :--

(ক) জার্মানীর উগ্র সম্প্রসারণনীতির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রবর্গের মনে সন্দেহের সঞ্চার। (খ) ইউরোপ দুইটি বিপক্ষ শিবিরে বিভক্ত—জার্মানী ইটালী-অষ্ট্রিয়া এবং ইংলণ্ড-ফ্রান্স-রাশিয়া। (গ) বল্কানে রাশিয়া-অষ্ট্রিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। (ঘ) উপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ব্যাপারে বিলম্বে আগত জার্মানী, ইটালী, জাপান, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতির তীব্র অসন্তোষ। (ঙ) বল্কান অঞ্চলে অষ্ট্রিয়া, তুরস্ক, রাশিয়াতে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীদের অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ। (চ) জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্সের মনে পূর্ব-পরাজয়ের প্রতিশোধ-স্পৃহা। (ছ) জার্মানীর নৌ-শক্তি বৃদ্ধিতে ইংলণ্ডের আশংকা। (জ) ইউরোপের অভ্যন্তরে কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত—ফ্রান্স-জার্মানী, অষ্ট্রিয়া-ইটালী, অষ্ট্রিয়া-সার্বিয়া, অষ্ট্রিয়া-রাশিয়া। (ঝ) সেরাজিভো হত্যা-কাণ্ড—যুদ্ধ ঘোষণা (১৯শে জুলাই, ১৯১৪)

2. Discuss critically the main provisions of the Treaty of Versailles.

উত্তর-সূত্র : (১) ভূমিকা : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গের সঙ্গে জার্মানীর যে সন্ধি সম্পন্ন হয় তাহাই ভার্সাই সন্ধি নামে পরিচিত। (২) ইহার সর্তাবলী : জার্মানী ফ্রান্সকে আলসেস-লোরেন ও বেলজিয়ামকে তিনটি প্রাশিয়ান প্রদেশ, পোলাণ্ডকে পোজেনের কতকাংশ, পশ্চিম প্রাশিয়া, আপার শাইলেসিয়া ও পূর্ব-প্রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। জার্মানীর সার উপত্যকা (Saar Valley)-র আধিপত্য ফ্রান্সের হস্তে আসিল। এতদ্ব্যতীত জার্মানী তাহার সমস্ত উপনিবেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। জার্মানীর সামরিক শক্তি ও নৌ-বল পঙ্গু করা হইল; এতদ্ব্যতীত যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ দিতে বাধ্য হইল।

(৩) সমালোচনা : (ক) জার্মানীর উপর অবিচার, (খ) জাতীয়তার নীতি অস্বীকার, (গ) অপর একটি যুদ্ধের বীজ নিহিত।

3. Discuss the part played by Kamal Ataturk in the history of modern Turkey.

উত্তর সূত্র : (১) ভূমিকা : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যোগদান করার অপরাধে সেভার্স-এর সন্ধিতে বিজয়ী শক্তিবর্গ তুর্কী সাম্রাজ্যকে ক্ষুদ্রায়তন করিয়া সঙ্কুচিত করিলে তুরস্কের জাতীয়তাবাদীদের পক্ষ হইতে কামাল আতাতুর্ক এই সন্ধি মানিতে অস্বীকার করেন এবং এই এইভাবে তুরস্ককে অপমান হইতে রক্ষা করেন। (২) কামাল আতাতুর্কের প্রথম জীবন : ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের সেনাবাহিনীতে এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তরুণ-তুর্কীদলে যোগদান এবং সুলতানকে গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। (৩) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান—যুদ্ধান্তে সেভার্স-এর সন্ধির বিপক্ষতা—জাতীয়তাবাদী দল গঠন—আঙ্কারায় স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট গঠন। (৪) ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে লুজানে মিত্রশক্তি কামালের দাবি মানিয়া লইলেন—প্রজাতন্ত্র ঘোষিত—কামাল প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত। (৫) তাঁহার প্রগতিশীল সংস্কারসমূহ—আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত। (৬) পররাষ্ট্রনীতি—প্রথমে রাশিয়ার মৈত্রী ও সাহায্যলাভ—পরে কমিউনিজম্ মতবাদ তুরস্কে প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া রাশিয়ার প্রতি মৈত্রী হইতে বিরত—ইটালী ও ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ—১৯৩১ খৃষ্টাব্দে লীগ অব্ নেশানস্-এর সভ্য—সকল দিক দিয়া তুরস্কের উন্নতি ও নিরাপত্তা বিধান—১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু।

4. Write briefly the history of the Arab Nationalism,

উত্তর সূত্র : (১) ভূমিকা : আরব জাতি অর্থাৎ আরব, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, ইরাক, ইরাণ, আফ্রিকার মিশর, লিবিয়া, টিউনিসিয়া, আলজিরিয়া, মরক্কোতে বসবাসকারী জাতিগোষ্ঠী। আরব, সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি এশিয়াস্থ অঞ্চল তুর্কী-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আফ্রিকাস্থ মিশর ইংলণ্ডের রক্ষণাধীনে, লিবিয়া, টিউনিসিয়া ইটালীর এবং আলজেরিয়া ও মরক্কো ফ্রান্সের শাসনাধীনে ছিল। এই সকল দেশস্থ আরবজাতি পরাধীন থাকিলেও স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য ও সংস্কৃতির কথা বিস্মৃত হয় নাই—আরব জাতির মধ্যে জাতীয়তাবাদের সঞ্চার। এশিয়ার আরব জাতিবর্গ তুরস্কের বিরুদ্ধে এবং আফ্রিকার আরব জাতিগুলি ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে সচেতন ও সজ্ঘবদ্ধ হইতেছিল। (২) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আরবজাতির মিত্রপক্ষে যোগদান কিন্তু

যুদ্ধান্তে ভার্সাই সন্ধিতে আরবদের জাতীয়তাবাদ অস্বীকৃত—'ম্যাণ্ডেট' বা রক্ষণাধীন রাষ্ট্র সৃষ্ট। (৩) ইরাক ও সৌদী আরব (হেজাজ)। (৪) ট্রান্স-জর্ডান। (৫) প্যালেষ্টাইন —ইহুদী-আরব সমস্যা—দ্বিধা বিভক্ত; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইহুদী রাষ্ট্র 'ইজরাইল (৬) সিরিয়া ও লেবানন—প্রথমে ফ্রান্সের অধীনে ম্যাণ্ডেট রাজ্য-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত। (৭) মিশর—ওয়াফদ দলের নেতা জগলুল পাশার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন—১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে সুয়েজ খাল ব্যতীত সর্বত্র বৃটিশ আধিপত্যের অবসান—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মিশরে অন্তর্বিপ্লব—সুলতান সিংহাসনচ্যুত—নাগুইব ও নাসের। (৮) আরব লীগ। (৯) আফ্রিকার অন্যান্য দেশ—মরক্কো, টিউনিসিয়া, আলজিরিয়া ও লিবিয়া।

নবম অধ্যায়

রাশিয়া ও বলশেভিক বিপ্লব

Syllabus : The Russian Revolution. State and society under the Czars. Karl Marx. Russia, 1917—1939—its impact on the world.

পাঠ্যসূচী : রুশবিপ্লব। জারদের শাসনাধীনে রাষ্ট্র ও সমাজ। কার্ল মার্ক্স। রাশিয়া, ১৯১৭—১৯৩৯, বিশ্বে ইহার প্রভাব।

জারতন্ত্রের অধীনে রাশিয়ার রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা : বিপ্লবের কারণ :— বিংশ শতাব্দীর রুশ-বিপ্লব আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই বিপ্লবের ফলে রাশিয়া হইতে জারতন্ত্রের অবসান হইয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রবর্তন হয়।

রাশিয়াকে সর্বপ্রকারে আধুনিক রাষ্ট্রে উন্নীত করার মূলে রাশিয়ার বিভিন্ন জারদের কৃতিত্ব রহিয়াছে। পিটার দি গ্রেট, ক্যাথারিণ দি গ্রেট, প্রথম আলেকজাণ্ডার, প্রথম নিকোলাস, দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি জারদের শাসনকালে রাশিয়া আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতিলাভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও রাশিয়ার প্রতিপত্তি যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু জারতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা দুর্বলতা ছিল স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার মধ্যে। জার স্বয়ং সাড়ে চার কোটি প্রজার ভাগ্যবিধাতা ছিলেন। তিনি স্বয়ং স্বমনোনীত কয়েকজন ব্যক্তির সাহায্যে এই বিরাট দেশ শাসন করিতেন, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট তাঁহার দায়িত্ব ছিল না। প্রদেশগুলি গভর্ণর উপাধিধারী শাসনকর্তাদের দ্বারা শাসিত হইত। প্রদেশের উপর কেন্দ্রীয় শাসন খুব ক্ষীণ থাকাতে অধিকাংশ প্রাদেশিক গভর্ণর স্বৈরাচারের সহিত শাসন করিতেন। সমগ্র দেশে প্রতিনিধি সভা বা ব্যক্তিস্বাধীনতার কোন বালাই ছিল না। গ্রাম অঞ্চলে 'মির' নামক গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ ধরনের প্রতিষ্ঠান ছিল। ইহারা কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যাদি ব্যাপারে সামান্য স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাশিয়াকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ, রুশ-জাপান যুদ্ধ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এই চারিটি বিরাট লোকক্ষয়ী ও অর্থক্ষয়ী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ায় ফলে জাতীয় ঋণ ও বিরাট করের বোঝা প্রজাদের উপর চা[illegible] ভাবে জাতীয়

জারতন্ত্রের দুর্বলতা : স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্র

উন্নতিমূলক কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার উপায় ছিল না। শাসনব্যবস্থা দুর্নীতির জন্য অচল অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল।

রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থাও অত্যন্ত দুরবস্থাপূর্ণ ছিল। রাশিয়ার সমাজে মাত্র দুইটি শ্রেণী ছিল—অভিজাত ও কৃষককুল। সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশেষ অস্তিত্ব ছিল না। কৃষককুলের মধ্যে অধিকাংশই ছিল 'সার্ফ' বা অর্দ্ধদাস।

সমাজ ব্যবস্থা

রাশিয়া ছিল কৃষিপ্রধান দেশ এবং কৃষিকার্য্যের ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত আদিম শ্রেণীর। কৃষক শ্রেণী, শিক্ষায়, সামর্থ্যে বা উদ্যমে অনগ্রসর ছিল। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে 'সার্ফদের মুক্তিনামা' ঘোষণার দ্বারা কৃষকদিগকে অর্দ্ধদাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে জমির স্বত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু সার্ফদশা হইতে মুক্ত হইলেও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাহারা পায় নাই। 'মির' নামক গ্রাম্য সমবায় সমিতি তাহাদের উপর অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব করিত। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর কৃষকগণ স্ব স্ব জমি বিক্রয় করার অধিকার পাইয়া অর্থাভাবে তাহাদের জমি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। ফলে কৃষকরা আরও দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থাও মোটেই ভাল ছিল না। অর্থ-নৈতিক উন্নতির জন্য শ্রমিকগণ 'ট্রেড ইউনিয়ন' করা অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিত না। আইনতঃ এই সমস্ত নিষিদ্ধ ছিল। এইভাবে জারতন্ত্র ও শিল্পপতিদের উপর জনসাধারণের বিরাগ ও বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হইতেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রাশিয়াতে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে মতবাদ ও আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত মতবাদের মধ্যে 'নিহিলিজম' উল্লেখযোগ্য। নিহিলিষ্টগণ দেশের অভ্যন্তরে নানাভাবে সঙ্গোপনে জার-বিরোধী মত প্রচার করিতে আরম্ভ করে। রুশ গভর্ণমেণ্ট এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে কঠোর দমননীতি আরম্ভ করেন। নিহিলিষ্টদের হস্তে বহু সরকারী কর্মচারী নিহত হয়। স্বয়ং জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার নিহিলিষ্টদের দ্বারা নিহত হন।

নিহিলিষ্ট মতবাদ

জারতন্ত্রের অকর্মণ্যতা ও দুর্বলতা শেষ জার দ্বিতীয় নিকোলাসের শাসনকালে অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠে। তিনি পূর্ববর্তী জারদের ন্যায় দমন নীতিতেই বিশ্বাসী ছিলেন এবং সমস্ত রাজত্বকালে ব্যাপিয়া দমননীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিলেন। জার স্বয়ং দুর্বলমনা ছিলেন বলিয়া রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত সকল কার্য্যভার জারিনা আলেকজান্দ্রা এবং তাঁহার প্রিয়পাত্র রাসপুটিন নামে জনৈক সন্ন্যাসীর দ্বারা নির্বাহিত হইত। ইহাদের শাসন ব্যবস্থায় জার বিরোধী কোন প্রকার মত ধারণা বা পোষণ করার কোন উপায় ছিল না—নির্যাতন নীতি এত কঠোর ভাবে প্রযুক্ত হইত। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া

জার দ্বিতীয় নিকোলাসের অপদার্থতা

জাপানের নিকট পরাজিত হওয়াতে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং শাসনতন্ত্রের অকর্মণ্যতার ফলে এই পরাজয় ঘটিয়াছে মনে করিয়া জনসাধারণ শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের জন্য দাবি করে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রাশিয়াতে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। জার নিষ্ঠুর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করিলেও শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে জার দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্টের উপযোগী শাসনতন্ত্র রচনার জন্য 'ডুমা' বা জাতীয় পরিষদ আহ্বান করেন। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতভেদের সুযোগে জার ডুমা-র নির্বাচনী অংশ প্রত্যাহার করিয়া ইহাকে সামান্য একটি উপদেষ্টা কমিটিতে পর্যবসিত করেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর হস্তে রাশিয়ার ক্রমাগত পরাজয়ের ফলে জার বিরোধী মনোভাব দেশের সকল শ্রেণীর মধ্যে সংক্রমিত হইতে থাকে। রুশ শাসনতন্ত্রের অযোগ্যতা ও অকর্মণ্যতা জনসাধারণের দৃষ্টিতে পরিস্ফুট হইল। দেশের সর্বত্র গণ-আন্দোলন দেখা দিল—কৃষক, শ্রমিক ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এই অসন্তোষ পরিব্যাপ্ত হইল। নানাস্থানে ধর্মঘট দেখা দিল, সৈন্যবাহিনীও ধর্মঘটদের পক্ষে যোগদান করিল। অবশেষে কেরেনেস্কীর নেতৃত্বে ডুমা জারকে সিংহাসন ত্যাগে বাধ্য করিয়া একটি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অবসান ঘটিল এবং রুশ বিপ্লবের প্রথম অধ্যায় সম্পন্ন হইল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

জারের পদত্যাগ, ১৯১৭

রুশ-বিপ্লবের মুখ্য কারণ—প্রথমতঃ স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের অকর্মণ্যতা। সামরিক নিষ্ফলতাকে স্বৈরতন্ত্রের পতনের অন্যতম কারণ বলা হইয়া থাকে। রাশিয়ার জারতন্ত্রের অদৃষ্টেও ইহাই ঘটিয়াছিল। ক্রিমিয়ায় ও রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় জনসাধারণের নিকট জারতন্ত্রের অসারতা প্রতিপন্ন করিল। এই সকল পরাজয়ের গ্লানি এবং অন্যদিকে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধি এই সকল পরিস্থিতিতে জারতন্ত্রের উৎসাদনের জন্য অভ্যন্তরীণ বিপ্লব অনিবার্য হইয়া উঠিল। দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়ার অদ্ভুত সমাজ-ব্যবস্থা জারতন্ত্র পতনের জন্য দায়ী। রাশিয়ার সমাজ-ব্যবস্থায় উচ্চ ও নিম্নস্তরে অভিজাত ও সার্ফ ব্যতীত কোন মধ্যবর্তী শ্রেণী ছিল না। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের সময়ে সার্ফগণ মুক্ত ও রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রাপ্ত হইলেও অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য অসন্তুষ্ট হইয়া রহিল এবং অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে যে কোন পরিবর্তনকে তাহারা সাহায্য করিতে উদ্যত হইল। তৃতীয়তঃ, প্রকৃত বিপ্লব আসিবার পূর্বেই রাশিয়ার ভাবজগতে বিপ্লব আসিয়া দেশের গণমানসকে আসন্ন বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিল। গোগোল, পুস্কিন, ডষ্টয়েভস্কি, টলষ্টয়, গোর্কি, কার্ল

রুশ বিপ্লবের কারণ

মার্কস্ প্রভৃতি খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও চিন্তামনীষীগণ তাঁহাদের সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়া রাশিয়ার বর্তমান অসহায় অবস্থা ও অপদার্থ জারের শাসনতন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন এবং রাশিয়ার উদারপন্থী ব্যক্তিগণ শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন দাবি করিল। এতৎ সঙ্গে কার্ল মার্কসের প্রচারিত সমাজতন্ত্রবাদ কলকারখানার শ্রমিকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করিল এবং গণমানসকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল।

কার্ল মার্কস : রাশিয়ার বিপ্লবের পশ্চাতে সমাজতন্ত্রবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতা কার্ল মার্কসের গভীর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। কার্ল মার্কস্ জাতিতে ইহুদী ছিলেন। জার্মানীতে তিনি বাস করিতেন। তিনি জার্মানীর বন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ইতিহাস ও দর্শনে তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি দার্শনিক হেগেলের আদর্শ ও মতবাদের দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবিত হন। তিনি জার্মানীতে একখানা সংবাদ পত্রের সম্পাদনা করিতে আরম্ভ করেন বিপ্লবী কার্যকলাপ ও চিন্তাধারার জন্য তিনি জার্মানী হইতে বিতাড়িত হইয়া ফ্রান্সে আসেন। তথায় ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ নামে একজন বিপ্লবী চিন্তা-নায়কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠিত হন। অচিরেই

কার্ল মার্কস্

মার্কস ফ্রান্সেও 'অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি' হইয়া উঠেন এবং ফরাসী সরকারের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া ব্রাসেলস-এ আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় এঙ্গেলস্-এর সহযোগিতায় মার্কস্ বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করেন। ইহা 'কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো' নামে পরিচিত। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের সময়ে উহা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিতরিত হয়।

কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো

কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো-তে মার্কস সমাজতন্ত্রবাদের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করেন এবং পৃথিবীর সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীকে ক্যাপিটালিষ্ট বা মূলধনীদের অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতে আহ্বান করেন। মার্কস সমাজতন্ত্রবাদের যে ব্যাখ্যা করেন, তাহা পূর্বগামী সমাজতান্ত্রিকদের ব্যাখ্যা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এইজন্য মার্কস-এর মতবাদ কম্যুনিজম বা সাম্যবাদ নামেই পরিচিত।

বিপ্লবী চিন্তাধারার জন্য তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া অবশিষ্ট জীবন লণ্ডনে অতিবাহিত করেন এবং সেইখানেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ড্যাস ক্যাপিটাল' প্রণয়ন করেন। তাঁহার জীবিতকালে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে অবশিষ্ট দুই খণ্ড প্রকাশিত হয়। 'ড্যাস ক্যাপিটাল' মূলতঃ অর্থনীতি গ্রন্থ—কিন্তু নূতন মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত বলিয়া এই গ্রন্থ সমাজতন্ত্রীদের নিকট বাইবেলের তুল্য সমাদৃত, এই গ্রন্থ রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাজগতে এক বিরাট বিপ্লবের দ্যোতনা সৃষ্টি করিয়াছে। মুখ্যতঃ এই গ্রন্থোক্ত মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াই রাশিয়ার বলশেভিক বিদ্রোহ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ড্যাস ক্যাপিটাল

কার্ল-মার্কসের পূর্বে ইংলণ্ডে টমাস হজকিন, উইলিয়াম টমসন ও রবার্ট আউয়েন ফ্রান্সে ফুরিয়ার, সেণ্ট সাইমন ও প্রুধন প্রভৃতি বিখ্যাত সমাজতান্ত্রিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মার্কস যেমন তাঁহার মতবাদের যুক্তিসঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং নিজস্ব মতবাদকে কার্যকরী করার পন্থার নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন, পূর্বগামী সমাজ-তান্ত্রিকগণ সেইরূপ কিছু করিতে পারে নাই। এতদ্ব্যতীত কার্ল মার্কস নিজস্ব মতবাদকে ভিত্তি করিয়া যে সুসংবদ্ধ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এমনটি তাঁহার পূর্ববর্তী অপর কেহ করিতে পারেন নাই।

পূর্বগামী সমাজতন্ত্রবাদ হইতে মার্কসের মতবাদের পার্থক্য

সমাজতন্ত্রবাদের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা কি তাহা সঠিকভাবে নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে সমাজতন্ত্রবাদের সর্বসম্মত যে তিনটি মৌলিক নীতি তাহা এই—প্রথমতঃ ইহা ব্যক্তিগত ধনবাদে অবিশ্বাসী; দ্বিতীয়তঃ ইহা ধনবাদের বিপক্ষে শ্রমজীবীদের স্বার্থরক্ষী; তৃতীয়তঃ, ইহা জমি, মূলধন, সম্পত্তি এবং জনকল্যাণমূলক ব্যবসায়াদি ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালনার পরিবর্তে সমষ্টিগত মালিকানায় রাখা বিশ্বাস করে। মার্কসবাদ সমাজতন্ত্রবাদেরই পরিশোধিত রূপান্তর মাত্র। মার্ক্সীয় সাম্যবাদ ফরাসী সমাজতন্ত্রবাদ ও হেগেলের মতবাদের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। মার্কসবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় তিনটি—ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, মূলধনের গতিবিধির সূত্র ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ।

মার্কসবাদ সংক্ষেপতঃ এই: মার্কস ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন যে—ইতিহাসের গতি অর্থোৎপাদন নীতিকেই লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে। পৃথিবীর সর্বদেশেই এবং সর্বকালেই দেশের শিল্প, সমাজ, রাজনীতি ও শিক্ষা সংস্কৃতি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনুগামী। মানব সমাজের অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ, খাদ্য ও

মার্কসবাদ

পণ্যের উৎপাদন এবং সমস্ত বিনিময়ের রীতিনীতি—এক কথায় জীবিকা উপার্জনের পদ্ধতি বা উদর সমস্যাকেই কেন্দ্র করিয়াই মনুষ্যজাতির সমাজ-ব্যবস্থা ও সভ্যতা অগ্রসর হইতেছে। একমাত্র অর্থনৈতিক প্রেরণাই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে মনুষ্য সমাজের স্থূল ও সূক্ষ্ম সমস্ত কর্ম ও মানসবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। মার্ক্‌স্ তাহার দ্বিতীয় সূত্রেরদ্বারা ইতিহাসের বিভিন্ন ধারা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিত্তবানের সঙ্গে বিত্তহীনের সঙ্ঘর্ষের মধ্য দিয়াই ইতিহাস অগ্রসর হইতেছে। এই শ্রেণী সংগ্রামই ইতিহাসের মূল কথা।. অতীতে স্বাধীন মানবে ও ক্রীতদাসে, প্যাট্রিসিয়ানে ও প্লিবিয়ানে, লর্ড ও সার্ফে সংগ্রাম চলিয়াছে এবং বর্তমান যুগে মূলধনী ও শ্রমিকের মধ্যেও অনুরূপ শ্রেণী সংগ্রাম চলিতেছে। শ্রেণীগুলির আকৃতির পরিবর্তন হইলেও সংগ্রামের ধারা একই ভাবে চলিয়া আসিতেছে। ইতিহাসের শিক্ষা এই—এই শ্রেণী সংগ্রামের ফলে সর্বত্র শোষক শ্রেণী ক্রমাগত পরাজিত ও নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। বিজয়ী শোষিত শ্রেণীর পূর্ণমুক্তি আসন্ন। মার্ক্‌স পরিশেষে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন বর্তমান যুগে মূলধনী ও শ্রমিক (প্রোলেটারিয়েৎ) শ্রেণীর মধ্যেই পৃথিবীর সর্বশেষ শ্রেণী-সংগ্রাম হইবে এবং এই সংগ্রামে শ্রমিকরাই জয়লাভ করিবে। এইজন্যই মার্ক্‌স পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণীকে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। মার্ক্‌সবাদ-এর তৃতীয় তত্ত্বটি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ নামে পরিচিত। মার্ক্‌সের মতে অগ্রগতিই জগতের প্রাণবস্তু এবং এই অগ্রগতি নির্ভর করে সঙ্ঘর্ষমূলক দুই বিরোধী শক্তির সমন্বয়ে। মার্ক্‌স-এর ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা বা শ্রেণী সংগ্রাম এই তত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত। সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দুই বিরোধী শক্তির সংগ্রামের মধ্য দিয়াই অগ্রগতির দিকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতের সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিণতির জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

মার্ক্সীয় সাম্যবাদ ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিরূপণে ও তাহার বিশ্লেষণে অপূর্ব। ইহার মধ্যে ধনবাদীদের উৎসাদন ও শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠার যে আশ্বাস তাহা বিশ্বের শোষিত শ্রেণীর মধ্যে আশা ও উৎসাহ উদ্দীপিত করিয়াছে।

সমালোচনা

মার্ক্সীয় তত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া সোভিয়েট রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে এবং পৃথিবীর প্রজাকল্যাণ কামী সকল রাষ্ট্রই কম বেশী মার্ক্‌সবাদে বিশ্বাসী। সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুকরণে চীন, যুগোশ্লোভিয়া প্রভৃতি দেশে সাম্যবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। তবে সর্বত্র মার্ক্‌সবাদকে অপরিবর্তিত বা অপরিশোধিত অবস্থায় গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় নাই। প্রত্যেক দেশের স্থানীয় বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া ইহা প্রবর্তিত করিতে হইয়াছে।

রুশ বিপ্লবের পরবর্তী অবস্থায় :—১৯১৭ খৃষ্টাব্দে জারের পদচ্যুতির সঙ্গে রুশ-বিপ্লবের প্রথম পর্ব সম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু নব-প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট উপস্থিত সমস্যা সমূহের সমাধান করিতে সক্ষম হইলেন না। এই নূতন গভর্ণমেণ্টের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন নরমপন্থী সমাজতন্ত্রী বা মেনশেভিক। কেরেনেস্কির সঙ্গে উগ্রপন্থী সমাজতন্ত্রী বলশেভিকদের বিরোধ উপস্থিত হইল। মেনশেভিকরা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পরিবর্তন আনয়নের পক্ষপাতী আর বলশেভিক দল বলপ্রয়োগে বর্তমান দুরবস্থার অবসান করিয়া দ্রুত বিপ্লব আনয়নে বিশ্বাসী ছিল। কেরেনেস্কি বহু চেষ্টা করিয়াও রাশিয়ার অভ্যন্তরে জার্মানবাহিনীর অগ্রগতি রোধ করিতে পারিলেন না। জার্মান বাহিনী রিগা অধিকার করিয়া পেট্রোগ্রাড-এ সন্নিহিত হইল ও দেশময় অশান্তি দেখা দিল। অশান্তিময় পরিস্থিতির সুযোগে বলশেভিক দলের নেতা লেনিন তাঁহার দুই সহযোগী ষ্টালিন ও ট্রটস্কির সাহায্যে বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করিলেন (নভেম্বর, ১৯১৭)। ইহা হইল রুশ-বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্য্যায়, বলশেভিকদল রাশিয়ার সর্বময় কর্তা হইল।

বলশেভিক গভর্ণমেণ্ট :—বলশেভিক গভর্ণমেণ্টের শাসনের প্রথম অবস্থায় রাশিয়ার ঘরে ও বাহিরে বহু সমস্যা দেখা দিল। ইহার প্রথম কর্তব্য হইল যুদ্ধরত জার্মানীর সহিত একটা আপোষ মীমাংসা করা, নতুবা আভ্যন্তরীণ সমস্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। ইত্যবস্থায় লেনিন কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের সহিত কথাবার্তা চালাইয়া জার্মানীর সঙ্গে ব্রেষ্ট লিটভস্ক এর সন্ধিতে আবদ্ধ হইলেন। এই সন্ধিতে দুইশত বৎসরের অধিককাল যে সমস্ত স্থানের ভোগ দখল রাশিয়ার ছিল সেই সকলের অধিকাংশই জার্মানীর হস্তে সমর্পণ করিতে হইল। রাশিয়ার পক্ষে এই সন্ধি অপমানজনক হইলেও লেনিনের পক্ষে গত্যন্তর ছিল না—কেননা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য রাশিয়ার পক্ষে অবকাশের প্রয়োজন ছিল। এই অবকাশ পাওয়ার জন্য রাশিয়াকে এই অঙ্গচ্ছেদ মানিয়া লইতে হইল।

বিভিন্ন সমস্যা

জার্মানীর সহিত সন্ধি

অতঃপর লেনিন মার্ক্সীয় নীতি অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করার উপযোগী বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সমস্ত ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ করিয়া জমির অধিকার যৌথভাবে কৃষকদের হস্তে অর্পণ করিলেন এবং কলকারখানা সমূহও মালিকদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া শ্রমিকদের স্বার্থের অনুকূলে এবং শ্রমিকদের পরিকল্পনায় রাষ্ট্রায়ত্ত করিলেন। জারের আমলে কৃত সমস্ত রাষ্ট্রীয় ঋণ অস্বীকার করা হইল এবং রাশিয়ার চার্চকে সরকারী সাহায্য ও সমর্থন হইতে বঞ্চিত করা হইল।

আভ্যন্তরীন পরিবর্তন

এই সমস্ত পরিবর্তনে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী ব্যতীত অন্য সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সুতরাং তাহারা বলশেভিক শাসনের প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিল—মেনশেভিকরাও ইহাদের সঙ্গে যোগ দিল। বলশেভিক সরকার বিপক্ষদলকে দমন করার জন্য সর্বশক্তি নিযুক্ত করিলেন এবং নির্বিচারে বিপক্ষদলকে উচ্ছেদ পূর্বক দেশময় সন্ত্রাস রাজত্বের সৃষ্টি করিলেন। এই কঠোর ব্যবস্থার ফলে বিপক্ষদলের সংহতি নষ্ট হইয়া গেল এবং বিরুদ্ধতা হ্রাস পাইল। বলশেভিক রাষ্ট্রের আদর্শ ছিল পৃথিবীতে সর্বত্র সাম্যবাদী শাসন ও সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ নিজেদের দেশে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচারিত হইলে স্ব স্ব রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে এই আশঙ্কায় বলশেভিক গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিতে চাহিলেন না বরঞ্চ বলশেভিক গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদের জন্য সম্মিলিতভাবে রাশিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। বলশেভিক বিরোধী রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ শক্তি সমূহ মিত্র শক্তিকে সাহায্য করিতে লাগিল। দক্ষিণের কসাকরা বলশেভিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। রাশিয়ার কৃষক শ্রমিক ও জনসাধারণের অকুণ্ঠ আনুগত্যের ফলে বলশেভিক সরকার শেষ পর্য্যন্ত বৈদেশিক আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ প্রতিহত করিতে সমর্থ হইলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বিদেশী সৈন্যবাহিনী রাশিয়া হইতে প্রত্যাহৃত হইল। অবশিষ্ট প্রতিকূল শক্তি সমূহ ট্রটস্কি সংগঠিত লালফৌজের পরাক্রমের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না। সর্বত্র বলশেভিক গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা স্বীকৃত হইল।

প্রতিকূলতা দমন

লেনিন

রুশ-বিপ্লব ও বলশেভিক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার মূলে প্রধানতঃ লেনিন ও ট্রটস্কির কার্য্যদক্ষতা বর্তমান ছিল। লেনিনের আসল নাম ছিল ভ্লাডিমির ইলিচ উলিয়ানভ। শিক্ষা-সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই ছাত্র বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করার জন্য লেনিন রাশিয়া হইতে বহিষ্কৃত হন। পরে অবশ্য এই শাস্তি প্রত্যাহৃত হওয়ায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিয়া আইন অধ্যয়ন করেন। মার্কস্-এর রচিত গ্রন্থাবলী পাঠে তাঁহার এই দৃঢ়বিশ্বাস হয় যে সাম্যবাদী বিপ্লব ব্যতীত রাশিয়ার বর্তমান দুরবস্থা হইতে নিষ্কৃতি লাভ অসম্ভব। তিনি এই উদ্দেশ্যে একটি বিপ্লবী সঙ্ঘের সভ্য হইলেন। এই অপরাধে

তাঁহাকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। তিনি জার্মানীর মিউনিক শহর হইতে একটি মার্ক্সবাদী পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় তাঁহার রচনা লেনিন এই ছদ্মনামে প্রচারিত হইতে থাকে। অতঃপর তিনি লেনিন এই নামেই পরিচিত হন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে 'রুশ সোসালিষ্ট ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি'-র এক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে লেনিন, পার্টিতে একমাত্র সক্রিয় মার্ক্সবাদী কর্মী ব্যতীত অপর কেহ সদস্য হইতে পারিবে না, এই প্রস্তাব করেন। কংগ্রেসে লেনিনের প্রস্তাবই ভোটে গৃহীত হয়। ফলে পার্টির মধ্যে দুইটি উপদলের উদ্ভব ঘটে। লেনিনও তাঁহার সমর্থকরা বলশেভিক এবং উপদল মেনশেভিক নামে পরিচিত হয়। পার্টির কার্যক্রম লইয়া উভয় দলের মধ্যে অনবরত বিরোধ দেখা দেয়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে জারতন্ত্রের পতনের পরে লেনিন রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরে অস্থায়ী সরকারের সহিত কর্মপন্থা লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে লেনিন ও ট্রটস্কি অস্থায়ী সরকারের উচ্ছেদ করিয়া বলশেভিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে বলশেভিক সরকারকে একটি ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। কৃষকগণ জমিদারের নিকট হইতে জমির মালিকানাস্বত্ব লাভ করিলেও তাহারা সেই যৌথ অধিকারে অর্পণ করা বা জমির উদ্বৃত্ত ফসল সরকারের হস্তে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইল না। সরকার বলপূর্বক এবিষয়ে কৃষকদের বাধ্য করিতে গেলে কৃষকগণ উৎপাদন হ্রাস করিয়া দিল। ফলে দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল এবং খাদ্যাভাবে লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেল। এই দুর্দিনে বলশেভিক সরকার বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিয়া দেশকে রক্ষা করিলেন। শিল্পাদির ক্ষেত্রেও নানা প্রকার অব্যবস্থা দেখা দিল। শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহ সরকারী মালিকানায় আসায় মালিকের পরিবর্তে শ্রমিকগণ এইগুলির পরিচালনা ক্ষমতা নিজেদের হস্তে গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু যথেষ্ট অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য এই সমস্ত পরিচালনব্যবস্থায় নানা প্রকার ত্রুটি দেখা দিল। এই সমস্ত দোষ-ত্রুটি ও অব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি কৃষি, শ্রমশিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বহুল পরিমাণে শিথিল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিল। কৃষকদের নিকট হইতে বাধ্যতামূলক শস্যগ্রহণের নীতি পরিত্যক্ত হইল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পব্যবসা-বাণিজ্য, এমন কি ব্যক্তিগত অর্থসঞ্চয়েও উৎসাহ দেওয়া হইল। উত্তরাধিকারীদের জন্য পূর্বাপেক্ষা অধিক অর্থ রাখিয়া যাইবার অনুমতি পর্যন্ত দেওয়া হইল। রাশিয়ার বাহিরের রাষ্ট্র হইতে সরকারী ঋণ গ্রহণ করা হইল এবং উন্নত ধরণের কলকারখানা নির্মাণের জন্য বাহির হইতে বিশেষজ্ঞ আমদানী করা হইল। বলশেভিক সরকার কর্তৃক পূর্বতন নীতির পরিবর্তনমূলক এই নব পরিকল্পনাকে "নব অর্থনীতি"

(New Economic Policy বা N. E. P.) নাম দেওয়া হইয়াছে। এই নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ১৯২১ হইতে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার ফলে দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বলশেভিক রাষ্ট্রের নূতন সংবিধান রচিত হয়। এই নূতন সংবিধান অনুযায়ী সংযুক্ত সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রিপাব্লিকের (Union of the Soviet Socialist Republics—U. S. S. R.)-এর প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হয়। সংবিধানে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সাধারণতন্ত্রী অঞ্চল গুলিকে স্বায়ত্তশাসনের এমন কি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে আসিবার অনুমতি দেওয়া হয়। প্রত্যেক জাতির নিজ নিজ ভাষা সংস্কৃতি যাহাতে পরিপূর্ণভাবে বিকাশলাভ করে, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য ও উৎসাহ দেওয়া হইতে থাকে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যু হয়।

'নব অর্থনীতি' (N. E. P.)

লেনিনের পররাষ্ট্রনীতিক কুশলতাও উল্লেখযোগ্য। জার্মানীর সঙ্গে ব্রেষ্ট লিটভস্কের সন্ধির দ্বারা তিনি যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়াছিলেন। লেনিন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদের প্রসারের সমর্থক ছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে লেনিন তৃতীয় ইণ্টার ন্যাশানাল বা কমিণ্টার্ণ-এর অধিবেশনের আহ্বান করেন। পৃথিবীর সমস্ত দেশে সাম্যবাদ বিস্তারের নীতি এই অধিবেশনে গৃহীত হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ধীরে ধীরে ইউরোপের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রবর্গ সোভিয়েট রাশিয়াকে স্বীকার করিতে আরম্ভ করে এবং রাশিয়ার সঙ্গে অর্থনীতিক ও কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আগ্রহান্বিত হয়। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ইটালী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অপর কয়েকটি রাষ্ট্র রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভ্য হওয়ার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। অতঃপর রাশিয়া ধীরে ধীরে ইউরোপে আপন প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে থাকে।

ষ্টালিন-ট্রটস্কি বিরোধ :—১৯২৪ খৃষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যুর পরে সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়কের পদ লইয়া ট্রটস্কি ষ্টালিনের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। ইহা মাত্র ব্যক্তিগত ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্ব ছিল না—ইহার মধ্যে আদর্শের দ্বন্দ্বও ছিল। রাশিয়ার বিপ্লবে ট্রটস্কির দান অসামান্য ছিল। তিনি রাশিয়ার লালফৌজ সংগঠন করিয়া রাশিয়ার গৃহযুদ্ধে এবং বৈদেশিক আক্রমণের সময়ে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং সাফল্যের সহিত সমরবিভাগ পরিচালনা করিয়া দুর্দিনে রাশিয়াকে রক্ষা করেন। মার্ক্স্‌বাদের ব্যাখ্যা ও তৎকালীন সোভিয়েট রাষ্ট্রের আদর্শ ও কর্মসূচী সম্বন্ধে ষ্টালিন ও ট্রটস্কির মধ্যে যথেষ্ট মতদ্বৈধতা

ট্রটস্কি

ছিল। ট্রটস্কি আন্তর্জাতিক বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন। তাঁহার মতে পৃথিবীর সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশে সাম্যবাদী বিপ্লব না ঘটাইতে পারিলে, সোভিয়েট রাষ্ট্রের সাম্যবাদ এমন কি তাহার অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। এই আদর্শ কার্যে পরিণত করার জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রকে নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করিতে হইবে। এমন কি ইহাতে যদি রাশিয়ার উন্নয়নকার্য্য ব্যাহত হয়, তাহাতেও রাশিয়ার পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। ষ্টালিন ইহার বিপরীত মত পোষণ করিতেন। তাঁহার মতে রাশিয়া যদি আন্তর্জাতিক বিপ্লবের নীতি গ্রহণ করে তাহা হইলে রাশিয়া ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির শত্রুতা অর্জন করিবে এবং এই শত্রুতা সোভিয়েট নবজাত রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া পড়িবে। সুতরাং রাশিয়াকে আত্মরক্ষার জন্য সাম্যবাদ নীতি সম্বন্ধে আন্তর্জাতিকতার নীতি পরিহার করিতে হইবে। এই বিরোধে ট্রটস্কি প্রমুখ বহু সোভিয়েট নেতা সোভিয়েট দেশ ও পার্টি হইতে বিতাড়িত হন। নির্বাসিত অবস্থায় থাকাকালীন ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে মেক্সিকোতে এক গুপ্তঘাতকের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বিরোধের কারণ

ট্রটস্কি পার্টি ও দেশ হইতে নির্বাসিত

মৃত্যু (১৯৪০)

ট্রটস্কি

ষ্টালিন :—ষ্টালিনের প্রকৃত নাম জোসেফ ভাসারিওনোভিচ্ জুগাশ্ভিলি। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে হইতে তিনি 'ষ্টালিন' বা 'ইস্পাতের মানুষ' এই ছদ্মনামে পরিচিত হন। ষ্টালিনের পিতা মুচির কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাসের সময়ই তিনি মার্কস্‌বাদীদের সম্পর্কে আসেন। রাজনীতিক কার্য্যকলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার জন্য তিনি বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত হন এবং লেনিনের অনুগামীরূপে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন। এই রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের জন্য ষ্টালিনকে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ও নির্বাসন বরণ করিতে হয়। প্রতিবারেই তিনি সুকৌশলে পলায়ন করিয়া বলশেভিক পার্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় জারতন্ত্রের পতন হইলে, তিনি বলশেভিক গভর্নমেণ্টের প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সাম্যবাদী দলের সাধারণ

সম্পাদকের পদ সৃষ্ট হইলে ষ্টালিন ঐ পদে নিযুক্ত হন। তিনি কমিউনিষ্ট দলের সংগঠন ব্যবস্থাকে অত্যন্ত শক্তিশালী করিয়া তোলেন এবং বলশেভিক দলের মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যুর পরে ষ্টালিন সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ণধার হন।

ষ্টালিন

সোভিয়েট রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করার পর ষ্টালিন লেনিনের প্রবর্তিত 'নব অর্থনীতি' (New Economic Policy) চালু রাখেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ষ্টালিন রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতিবিধানের জন্য সর্বপ্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপন্ন দ্রব্যাদির ন্যায্য বণ্টন, কৃষি, শিল্প, পরিবহণ—রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার উন্নয়ন প্রচেষ্টা এই পরিকল্পনার মূলে ছিল। ষ্টালিনের এবং দেশবাসীর আন্তরিক উদ্যমের ফলে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯২৮—৩৩) সমস্ত দিক দিয়া সাফল্যলাভ করে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৩৩—৩৮) গৃহীত হয় এবং ইহাও পরিকল্পিত সময়ের পূর্বেই অভাবনীয়রূপে সাফল্য লাভ করে। দ্রুত দেশের শিল্পায়ন, বৈদ্যুতীকরণ, খাদ্যশস্যের উৎপাদন, গ্রাম ও শহরের মধ্যে পার্থক্য দূরীকরণ, শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার প্রভৃতি পরিকল্পনার অঙ্গীভূত কাজগুলি সংশোধিত হয়। ১৯৩৮ হইতে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া রাশিয়া পৃথিবীর শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলির অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইল। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও অগ্রগতির দিক দিয়া সোভিয়েট রাষ্ট্র পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রকে পশ্চাৎপদ করিয়া ফেলিয়াছে। সাম্প্রতিক কালে রাশিয়ার চন্দ্রগ্রহে প্রাণীসমেত 'রকেট' প্রেরণের সাফল্য রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি—ষ্টালিনের শাসনকালে সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার সর্ববিধ ব্যবস্থা করা। সাম্যবাদী রাষ্ট্র বলিয়া রাশিয়া জন্মাবধি ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের ভীতি ও অবিশ্বাসের পাত্র হইয়া রহিয়াছিল। ইংলণ্ড বা আমেরিকা সোভিয়েট রাশিয়াকে নানা প্রকারে বিপন্ন করার ত্রুটি করে নাই। সোভিয়েট মতবাদ যাহাতে ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত না করিতে পারে, তাহার প্রতিরক্ষা হিসাবে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ জার্মানী বা

ইটালীকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছিল। ইত্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় নির্বিঘ্নতার জন্য ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে রাশিয়া তাহার চারিপার্শ্বে রক্ষাবলয় গঠনের চেষ্টা করিল।

(১) আত্মরক্ষা ও নির্বিঘ্নতার বন্দোবস্ত

তদনুযায়ী রাশিয়া প্রথমে সোভিয়েট রাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত প্রদেশ সমূহকে আঞ্চলিক স্বাধীনতা দান করিল। পশ্চিম জার্মানীর সম্ভাব্য আক্রমণের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য রাশিয়া, ফ্রান্স ও পোলাণ্ডের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। এদিকে আমেরিকাও রাশিয়ার সহিত আদান-প্রদান আরম্ভ করিল। এইভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়া ক্রমশঃ মর্য্যাদা লাভ করিতে থাকিলে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে রাশিয়াকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদ দেওয়া হইল। পশ্চিমে যেমন জার্মানী, ইটালী রাশিয়ার শত্রু ছিল তদ্রূপ পূর্বদিকে জাপান রাশিয়াকে বিব্রত করার চেষ্টা করিতেছিল। জাপান ক্রমাগত চীনের অভ্যন্তরে আধিপত্য বিস্তার করিয়া রুশ সীমান্তস্থিত মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া প্রভৃতি স্থানে ক্রমাগত আধিপত্য কায়েম করিতেছিল। জাপানের শক্তি প্রতিরোধ করার জন্য রাশিয়া চীনে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িয়া তোলার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে অবশ্য রাশিয়ার এই কামনা সফল হয়—চীনে রাশিয়ার তাঁবেদার সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠিত হয়। ইউরোপের মন হইতে কম্যুনিজম্ ভীতি সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য রাশিয়ার প্রতিপক্ষরূপে হিটলার শাসিত জার্মানীকে ক্রমাগত প্রশ্রয় দিয়া আসিতে লাগিল। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মিউনিক চুক্তিতেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের এই উদ্দেশ্য স্পষ্টীকৃত হইয়া পড়িল। ইত্যবস্থায় রাশিয়া স্বীয় নিরাপত্তার জন্য জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করিতে বাধ্য হইল। ইহাতে হিটলারের ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধা যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল এবং জার্মানী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণা করার অবকাশ প্রাপ্ত হইল।

দ্বিতীয়তঃ, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের পর হইতে রাশিয়া সাম্যবাদী মতবাদ সম্বন্ধে

(২) আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ সম্বন্ধে পরিবর্তিত মনোভাব

আন্তর্জাতিকতার নীতি পরিত্যাগ আরম্ভ করিল। ষ্টালিনের সময়ে রাশিয়ার কম্যুনিজমের সম্বন্ধে আন্তর্জাতিকতার নীতির কঠোরতা বহুলাংশে শিথিল করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই আন্তর্জাতিক মনোভাব একেবারে পরিত্যক্ত হয়। এমন কি 'কমিণ্টার্ণ' অর্থাৎ কম্যুনিজমের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানকেও বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই নীতির ফলে রাশিয়া সম্বন্ধে ইউরোপ বা আমেরিকার অবিশ্বাস লাঘব করিয়া যায়।

সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি স্বদেশের স্বার্থরক্ষার অনুকূল হইলেও সোভিয়েট সম্বন্ধে বিরোধিতা বা সন্দেহ ইউরোপ বা আমেরিকার ধনতন্ত্রী দেশ সমূহের মন হইতে লুপ্ত হয় নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে প্রয়োজনের তাগিদে রাশিয়ার সহিত আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রের মৈত্রী সম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধান্তে পুনরায় রুশ-বিদ্বেষ প্রচার এই সকল দেশের অন্যতম কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইল। রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই কথা বলা যায় রাশিয়া 'ন্যাশনাল ওয়ার' বা জাতিগত যুদ্ধ প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করিলেও পৃথিবীর সর্বত্র 'শ্রেণীগত যুদ্ধ' (Class war) সম্বন্ধে প্রচার কার্য্য মোটেই পরিত্যাগ করে নাই। সোভিয়েট রাষ্ট্রের কৌশলী প্রচারকার্য্যের ফলে এশিয়া বা আফ্রিকায় ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রবর্গের যে প্রভাব রহিয়াছে তাহা স্খলিত হইবার আশঙ্কায় তাহারা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সোভিয়েট বিরোধী রাষ্ট্রজোট করিতেছে। অর্থ নৈতিক সাহায্যের মধ্য দিয়াও তাহারা প্রকারান্তরে বিভিন্ন অনুন্নত দেশকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে দলভুক্ত করিতেছে।

রুশ-ভীতি এখনও দূর হয় নাই

প্রশ্নোত্তর

1. Narrate the circumstances leading to the Revolution of 1917 in Russia.

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের রুশ-বিপ্লবের পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহ বিবৃত কর।

উত্তর-সূত্র: (১) ভূমিকা: বিংশ শতাব্দীর রুশ-বিপ্লব আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই বিপ্লবের ফলে রাশিয়া হইতে জারতন্ত্রের অবসান হইয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রবর্তন হয়। এই বিপ্লব সংঘটনের পশ্চাতে দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত নানাবিধ অভাব-অভিযোগ বর্তমান ছিল।

(২) জারতন্ত্রের অধীনে রাশিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক দুরবস্থা। (৩) উনবিংশ শতাব্দীর জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন—'নিহিলিজম'। (৪) জার দ্বিতীয় নিকোলাসের অপদার্থতা—জারিনা আলেকজান্দ্রা ও প্রিয়পাত্র রাসপুটিনের জনস্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপ ও নির্যাতন নীতি—১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জাপানের হস্তে পরাজয়ের ফলে জনসাধারণের জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে অনাস্থা। (৪) রাশিয়ার সামাজিক অ-ব্যবস্থা—কৃষকদের অর্থ নৈতিক দুর্গতি—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাব। (৫) গোগোল, পুসকিন, ডষ্টয়েভস্কি, টলষ্টয়, গোর্কি প্রভৃতি সাহিত্যিকদের রচনা। (৬) কার্ল মার্কস-এর সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব। (৭) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়। (৮) ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বিদ্রোহ ও জারতন্ত্রের অবসান।

2. Write what you know about Karl Marx and Marxian Communism.

কার্ল মার্কস্ ও মার্ক্সীয় সাম্যবাদ সম্বন্ধে বিবরণ দাও।

উত্তর সূত্র : (১) ভূমিকা : সমাজতন্ত্রবাদের সাম্যবাদী ব্যাখ্যাতা ছিলেন কার্ল মার্কস্। (২) প্রথম জীবন—দার্শনিক হেগেলের মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত—বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য জার্মানী হইতে বিতাড়িত—কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো—শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ডাস ক্যাপিটাল' রচনা—রাজনৈতিক ও সমাজিক চিন্তাজগতে বিরাট বিপ্লব। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু।

(৩) মার্কসবাদের সংজ্ঞা—'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ'—বিত্তবানের সঙ্গে বিত্তহীনের সঙ্ঘর্ষ—পরিণামে বিত্তহীনদের জয়লাভ—ইতিহাসের অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যা।

(৪) মার্কসবাদের বাস্তব সাফল্য প্রথমে রাশিয়ায় পরে চীন, যুগোশ্লাভিয়া ও বল্কানের কয়েকটি রাষ্ট্রে।

(৫) মার্কসবাদের সমালোচনা—শোষিত জনগণের পরিত্রাতা—ইহার ত্রুটি-সমূহ।

3. Write the history of the Soviet Russia—both internal and foreign from 1917.

১৯১৭ খৃঃ হইতে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক কাহিনী বর্ণনা কর।

উত্তর-সূত্র : (১) ভূমিকা : ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে জারের পদচ্যুতির সঙ্গে রুশ-বিপ্লবের প্রথম পর্ব সম্পন্ন—লেনিন ও সহযোগীবৃন্দ কর্তৃক ক্ষমতা অধিকার নভেম্বর, ১৯১৭)—সোভিয়েট রাষ্ট্রের পত্তন।

(২) সমস্যাসমূহ : আভ্যন্তরীণ—(ক) ব্রেষ্ট লিটভস্ক-এর সন্ধি, (খ) ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে শ্রমিক ও কৃষকদের কল-কারখানা ও জমির উপর যৌথ মালিকানা, (গ) জারের আমলে কৃত রাষ্ট্রীয় ঋণ অস্বীকার, (ঘ) রাশিয়ার চার্চ সরকারী সাহায্য ও সমর্থন হইতে বঞ্চিত, (ঙ) নব-অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা (New Economic Policy বা N. E. P.), (চ) আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ নিবারণ।

পররাষ্ট্রনৈতিক : (ক) আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ প্রচারের সমর্থক, (খ) ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় ইণ্টারন্যাশানাল বা কমিণ্টার্ণ-এর অধিবেশনের আহ্বান, (গ) মিত্র-শক্তিবর্গ কর্তৃক বলশেভিক সরকারের উচ্ছেদের জন্য সৈন্য প্রেরণ কিন্তু ট্রটস্কি-সংগঠিত লালফৌজের হস্তে পরাজিত, (ঘ) ক্রমশঃ ইউরোপের রুশ-বিরোধী মনোভাবের পরিবর্তন—১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদের অনুমতিপ্রাপ্ত।

4. What were the main features of the Russian foreign policy during the time of Stalin ?

ষ্টালিনের সময়ে রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির মূল সূত্রগুলি আলোচনা কর।

উত্তর সূত্র : (১) ভূমিকা : ষ্টালিনের শাসনকালে সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিধান ও আত্মরক্ষার সর্বাধিক ব্যবস্থা করা। (২) এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য রাশিয়া চারিপার্শ্বে রক্ষাবলয় গঠন করিল—তদনুযায়ী দক্ষিণাঞ্চলের উপজাতি অধ্যুষিত প্রদেশসমূহকে আঞ্চলিক স্বাধীনতা প্রদান করিল। (৩ ফ্রান্স ও পোলাণ্ডের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ। (৪) আমেরিকার সঙ্গে সৌহার্দ স্থাপন। (৪) জাপানের সম্প্রসারণ নীতি প্রতিহত করার জন্য রাশিয়া কর্তৃক চীনে তাঁবেদার সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাফল্যলাভ। (৫) রাশিয়াকে বিব্রত করার জন্য রাশিয়ার প্রতিপক্ষরূপে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কর্তৃক হিটলার-শাসিত জার্মানীকে প্রশ্রয় প্রদান। (৬) নিরাপত্তার জন্য রাশিয়া জার্মানী ও জাপানের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করিল। (৭) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া—প্রথম দিকে জার্মানী ও জাপানের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তির জন্য রাশিয়ার সুবিধা—যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ-আয়োজনের অবকাশ প্রাপ্তি। (৮) ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের পর সাম্যবাদ সম্বন্ধে আন্তর্জাতিকতার মনোভাব শিথিল করা হয়—ইহাতে রাশিয়া সম্বন্ধে ইউরোপ ও আমেরিকার অবিশ্বাস অনেকটা কমিয়া যায়। (৯) কিন্তু রাশিয়ার মৌলিক নীতি অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বত্র 'Class War' বা শ্রেণীগত যুদ্ধ প্রচার করা সম্বন্ধে মনোভাবের পরিবর্তন হয় নাই।

দশম অধ্যায়

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় ঃ ইউরোপ ও এশিয়া ঃ লীগ অফ নেশানস

Syllabus · Inter-War years Europe and Asia from 1919 to 1938. League of Nations.

পাঠসূচী ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকাল। ১৯১৯ হইতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইউরোপ ও এশিয়া। লীগ অফ্ নেশানস্।

লীগ অফ নেশানস্ ঃ—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নিষ্ঠুরতা পৃথিবীর মানুষের মনে যুদ্ধ সম্বন্ধে এমন এক আতঙ্ক ও বিরূপ ভাবের সৃষ্টি করে যে, যাহাতে পুনরায় এইরূপ যুদ্ধ না ঘটিতে পারে এবং পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, এই উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা সকলেই বোধ করেন। ভবিষ্যতে যুদ্ধ নিবারণ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ ইত্যাদি সমাধানের জন্য 'ভার্সাই সন্ধি'র শর্তাবলীর মধ্যে, লীগ অফ্ নেসানস সৃষ্টির শর্তও গৃহীত হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উইলসনের চৌদ্দদফা দাবির মধ্যে লীগ অফ নেশানস-এর শর্তও ছিল।

উদ্দেশ্য

লীগ অফ নেশানস্ এর উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখা। রাষ্ট্রবর্গ পরস্পরের সহিত আচরণে ন্যায় ও সততার নীতি মানিয়া চলিবে, আন্তর্জাতিক আইন বা বিধিনিষেধ অমান্য করিবে না, যুদ্ধ না করিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের বিবাদবিরোধ মিটাইয়া লইবে। লীগের নির্দেশ অমান্যকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সদস্য রাজ্যসমূহ অর্থনৈতিক 'বয়কট' নীতি গ্রহণ করিবেন। যদি ইহাতে ফলোদয় না হয় তাহা হইলে সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে লীগের আদেশ অমান্যকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপনীতি প্রযুক্ত হইবে। এই সমস্ত শর্তসম্বলিত একটি চুক্তিপত্র ভার্সাই-এর সম্মেলনে সমবেত রাষ্ট্রপ্রতিনিধিবর্গ স্বাক্ষর করিয়া লীগ অফ নেশানস গঠন করিয়াছিলেন। আমেরিকা এই সঙ্ঘের উদ্যোক্তা ছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকা উহাতে স্বাক্ষর করে নাই।

লীগ অফ নেশানস-এর সদর দপ্তর জেনেভা শহরে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং এই

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য পঞ্চশক্তির একটি কাউন্সিল সভা এবং লীগে যোগদানকারী সমস্ত রাষ্ট্রসদস্যের দ্বারা গঠিত একটি এসেম্বলী গঠিত হইল। এতদ্ব্যতীত আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

জেনেভাতে কার্যালয়

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দপ্তর নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তরও জেনেভাতে খোলা হইল। ইহার উদ্দেশ্য হইল বিশ্বের শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়ন করা।

লীগ অফ নেশানস্ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে প্রথম দিকে লীগের আধিপত্য যথেষ্ট পরিমাণে স্বীকৃত হইয়াছিল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লীগের আন্তর্জাতিক বিচারালয় ছাব্বিশটি বিবাদে মধ্যস্থতা, এগারটি বিবাদে রায় প্রদান এবং তেরোটির ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান করিয়াছিল। লীগের চেষ্টায় তুরস্ক ও ইরাকের সীমানা সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা হয়; গ্রীস-বুলগেরিয়ার, লিথুয়ানিয়া-পোলাণ্ডের বিরোধের ক্ষেত্রে মীমাংসার জন্য লীগ প্রশংসনীয় কার্য করিয়াছিল। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে লীগের তত্ত্বাবধানে 'লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জার্মানী, ফ্রান্স ও বেলজিয়মের মধ্যে ভার্সাই সন্ধির দ্বারা যে সীমানা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহা দেখাশোনার দায়িত্ব লোকার্ণো-চুক্তি অনুযায়ী লীগের উপর ন্যস্ত হইল। লীগ অফ নেশানস্-এর তত্ত্বাবধানে 'কেলগ চুক্তি (Kellog Pact) স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সকল দেশই যুদ্ধ হইতে বিরত থাকার নীতি অনুসরণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল। জাপান এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী অন্যতম রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু অত্যল্পকাল পরেই জাপান এই চুক্তি অমান্য করিয়া মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করাতে এই চুক্তির উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। অতঃপর জাপান রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদ পরিত্যাগ করে। সামরিক অস্ত্রশস্ত্রাদি হ্রাস করার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে সম্মেলন আহ্বান করে। কিন্তু জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে মতানৈক্য হওয়ায় জার্মানী এই সম্মেলন হইতে বাহির হইয়া আসে এবং স্বেচ্ছানুরূপ সামরিক প্রস্তুতি আরম্ভ করে।

ইহার কার্যাবলী

লীগ অফ নেশানস্ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে প্রথম দিকে ইহার আধিপত্য যথেষ্ট বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রের স্বার্থের সংঘাতে ইহা দুর্বল হইয়া পড়িল এবং স্বীয় স্বার্থের পরিপন্থী মনে করা মাত্রেই সদস্যরাষ্ট্র সভ্যপদে ইস্তাফা দিয়া লীগের নির্দেশ অমান্য করার চেষ্টা করিল। জাপান, ইটালী ও জার্মানী প্রথমে যোগদান করিয়া পরে ইহারা দূরে সরিয়া যায়। যে উদ্দেশ্যে লীগ গঠিত হয় নানা কারণে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পরে নাই। সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে বিবাদের মীমাংসা

কারতে সক্ষম হইলেও বড় বড় রাষ্ট্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘ কিছুই করিতে পারে নাই। তাহার কারণ রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিজস্ব এমন কোন সৈন্যদল ছিল না যাহার সাহায্যে সে ইহার নির্দেশকে কার্য্যকরী করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, বড় বড় সদস্যরাষ্ট্র ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিতে মোটেই সম্মত হয় নাই। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করিলে আবিসিনিয়ার করুণ আবেদন সত্ত্বেও রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইটালীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া চুপচাপ থাকে। জাপান, জার্মানী, রাশিয়া প্রভৃতি বৃহৎ রাষ্ট্র বহু ক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক আচরণের পরিচয় দিলেও লীগ ইহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিল না। লীগ অফ নেশানস্-এর এতৎ শুভ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পৃথিবী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল না।

ইউরোপ, ১৯১৯—১৯৩৯ঃ জার্মানী ও হিটলারের উত্থানঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে কয়েকটি যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় হইলে জার্মানীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। প্রথমে সামরিক বিভাগে এই বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়; কিয়েলে অবস্থিত নৌ-বাহিনী কর্তৃপক্ষের আদেশ মানিতে অসম্মত হয়। ক্রমশঃ এই বিদ্রোহ জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সোস্যালিষ্ট দল চারিদিকে কাইজারের শাসনের বিরুদ্ধে মতবাদ প্রচার করিতে থাকে। জার্মান জনসাধারণর যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য কাইজারকে দায়ী করিয়া কাইজারের শাসনের অবসান কামনা করিতে থাকে। অগত্যা কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম সোস্যালিষ্ট দলের নেতা এবার্ট (Ebert)-এর উপর ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া হল্যাণ্ডে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। জার্মানীতে রাজতন্ত্রের অবসান ও এবার্টের নেতৃত্বে সাধারণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্মানীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাইশ জন নরপতি সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে উইমার (Weimar) নামক

কাইজার উইলিয়ম

জার্মানীতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত

স্থানে জার্মানজাতির প্রতিনিধিবর্গ মিলিত হইয়া জার্মানীর জন্য সাধারণতন্ত্রী সংবিধান রচনা করেন। নূতন সংবিধান অনুযায়ী জার্মানীও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ ফেডারেল রিপাব্লিক বা সাধারণতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া পরিচিত হইল। সার্বজনীন ভোটাধিকারে নির্বাচিত একজন প্রেসিডেন্ট ও দুই কক্ষযুক্ত আইন-সভার ব্যবস্থা হইল। প্রেসিডেন্টের অধীনে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাবিশিষ্ট চ্যান্সেলার ও তাঁহার মন্ত্রিসভা থাকিবেন। এবার্ট এই নূতন সংবিধান অনুযায়ী জার্মান সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলেন।

নূতন সংবিধান

নূতন সাধারণতন্ত্রী সরকারকে নানাবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। যুদ্ধের পর জার্মানীর প্রধান সমস্যা ছিল দেশবাসীকে তাহাদের আপত্তি সত্ত্বেও ভার্সাই সন্ধির শর্ত স্বীকারে সম্মত করানো, দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার অবসান করা, পুনরায় জার্মানীকে শিল্পপণ্যে অগ্রগামী করিয়া দেশে বা বিদেশে জার্মানীর আর্থিক মর্য্যাদার পুনরুদ্ধার করা এবং দেশের অগণিত বেকারের কর্মসংস্থান করিয়া দেওয়া। কিন্তু নানাকারণে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হইবার আর উপায় ছিল না। প্রথমতঃ, জার্মান জনসাধারণ কোন মতেই ভার্সাই সন্ধির দ্বারা আরোপিত বহু অসম্মানজনক শর্ত মানিয়া লইতে পারে নাই, অথচ নূতন গভর্ণমেণ্টকে উক্ত শর্তসমূহ স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। জার্মানীর অঙ্গচ্ছেদ করিয়া জার্মানীকে ক্ষুদ্ররাষ্ট্রে পরিণত করা তাহারা কোনমতে স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ যে পরিমাণ অর্থের দাবি জার্মানীর নিকট করা হইল, তাহার আংশিক পরিমাণও জার্মানীর পক্ষে পরিশোধ করা অসম্ভব ছিল। মিত্রপক্ষ কোনমতেই তাহাদের দাবির পরিমাণ হ্রাস করিতে সম্মত হয় নাই। তৃতীয়তঃ, জার্মানীকে সবপ্রকারে নিরস্ত্র করিয়া তাহার সৈন্যসংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ করা হইল। তখন এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল যে জার্মানীর ন্যায় বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সমরোপকরণ হ্রাস করা হইবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এই প্রতিশ্রুতি মোটেই রক্ষা করা হয় নাই। জার্মানীকে সর্ববিধ উপায়ে পঙ্গু করিয়া রাখার যাবতীয় বিধি নিষেধ আরোপিত হইল। এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে এবার্টের সাধারণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। এবার্টের সাধারণতন্ত্রী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ১৯২০ ও ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ হইয়াছিল, কিন্তু উভয় বিদ্রোহই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল। ইতিমধ্যে জার্মানী সময়মত ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয় অর্থ দিতেছে না, এই

বিভিন্ন সমস্যা

দুইবার বিদ্রোহ

অজুহাতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও বেলজিয়ম জার্মানীর রুঢ় (Ruhr) নামক শিল্প-সমৃদ্ধ অঞ্চল অধিকার করিয়া বসিল। এই ব্যাপারে জার্মানীর অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইল। রুঢ় অঞ্চলের কলকারখানার জার্মান শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করিয়া ফ্রান্সের এই আচরণের উত্তর দিল। জার্মান গভর্ণমেণ্ট গুস্তাফ্ ষ্ট্রেসম্যানের নেতৃত্বে অর্থ নৈতিক দুরবস্থার হাত হইতে কোন প্রকারে উত্তীর্ণ হইলেন। এই সময়ে ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রশক্তিবর্গ জার্মানীর নিকট প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের সুসমঞ্জস ব্যবস্থা করার জন্য ডাওয়েস নামক একজন মার্কিন অর্থনীতিবিদের অধীনে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। দীর্ঘ মেয়াদে বাৎসরিক কিস্তিতে ক্ষতিপূরণের টাকা জার্মানী দিবে এই কমিটি অনুমোদন করে। জার্মানী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে ফ্রান্স ও বেলজিয়ম রুঢ় পরিত্যাগ করে। জার্মানী লোকার্ণো চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়া ফ্রান্স বা বেলজিয়মের সীমা স্বীকার করিলে তাহাকে লীগ অফ্ নেশানস্ এর সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ডাওয়েস পরিকল্পনা অনুযায়ী দেয় অর্থ পরিশোধে জার্মানী অক্ষম হইলে পুনরায় মিত্রপক্ষ 'ইয়ং কমিশন' নিযুক্ত করিয়া জার্মানীর ক্ষতিপূরণের সামর্থ্য বিচারের চেষ্টা করিলেন। জার্মানী আমেরিকার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া ক্ষতিপূরণের টাকা মিটাইতেছিল। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্বব্যাপী অর্থ নৈতিক মন্দা দেখা দিলে আমেরিকা জার্মানীকে ঋণদানে অক্ষম হইলে এবং জার্মানীও ক্ষতিপূরণ দেওয়া বন্ধ করিল। এই সমস্ত ঘরোয়া ও বাহিরের সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের ক্ষমতা জার্মানীর কোন গভর্ণমেণ্টেরই সাধ্যায়ত্ত ছিল না। ক্রমাগত গভর্ণমেণ্টের পরিবর্তন হইতে লাগিল এবং জার্মানীতে দাঙ্গা হাঙ্গামা, বিদ্রোহ, বেকারের দলপুষ্টি প্রভৃতি উপদ্রব লাগিয়াই রহিল। এই দুঃসময়ে দেশের দুঃখদুর্দশার অবসানের পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়া জার্মানীতে এক নূতন রাজনৈতিক দলের অভ্যুদয় হয়। এই নূতন দলের নেতা ছিলেন একজন অতি সাধারণ অষ্ট্রিয়ান যুবক—নাম এডলফ্ হিটলার।

ফ্রান্স কর্তৃক রুঢ় অঞ্চল অধিকার

হিটলার

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি সৈনিকরূপে যোগদান করেন এবং যুদ্ধে আহত হন। যুদ্ধান্তে তিনি জার্মানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া জার্মানীর দুঃখদুর্দশা লক্ষ্য করেন এবং জার্মানীর পুনরুদ্ধারের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তিনি 'ন্যাশানাল সোসিয়ালিষ্ট' নামে একটি দল গঠন

করিয়া দেশের দুরবস্থায় প্রতিকারের জন্য দলের পক্ষ হইতে উপযুক্ত কর্মসূচী দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। তাঁহার দল সাধারণতঃ নাৎসী নামেই পরিচিত।

দেশব্যাপী দুরবস্থা ও গভর্ণমেণ্টের অক্ষমতার সুযোগে হিটলার দেশের অসংখ্য লোককে স্বীয় দলভুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে একবার বলপূর্বক তদানীন্তন সরকারের উচ্ছেদ করিয়া ক্ষমতা হস্তগত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। হিটলার ধরা পড়িয়া কারারুদ্ধ হন। কারামুক্তির পরে তিনি পুনরায় দলীয় আন্দোলন আরম্ভ করেন। তাঁহার আত্মজীবন Mein Kampf (My Struggle)-এ তিনি তাঁহার নাৎসী দলের কর্মসূচী বিবৃত করেন। হিটলার ভার্সাই সন্ধির অবিচারের কথা উল্লেখ করেন এবং জার্মানীর পক্ষে পরাজয়ের কলঙ্ক চিহ্ন স্বরূপ ভার্সাই সন্ধির বিধিসমূহ অমান্য করার প্রস্তাব করেন। তাঁহার দলের অন্যতম কর্মসূচী ছিল ইউরোপের সমস্ত জার্মান ভাবাভাষী লোককে এক রাষ্ট্রের অধীনে আনিয়া বৃহত্তর জার্মান রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে এবং ক্রমবর্দ্ধমান জার্মান জাতির স্থান সঙ্কুলানের জন্য অতিরিক্ত স্থান জার্মানীর অধিকারে আনিতে হইবে। কয়েক বৎসরের মধ্যে হিটলারের জনপ্রিয়তা এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে নাৎসী দল জয়লাভ করিল। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে হিটলার জার্মানীর চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইলেন। হিটলার জার্মান রাষ্ট্রের ক্ষমতা হস্তগত করিয়া নাৎসী দল ব্যতীত জার্মানীতে অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকিতে দিলেন না। কমিউনিষ্ট ও ইহুদীদের উপর সর্বাধিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যু হইলে হিটলার স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট ও চ্যান্সেলারের পদ এক করিয়া নিজেকে জাতির 'ফ্যুহ্‌রার' (Fuehrer) বা নেতা বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

হিটলার ও তাঁহার কর্মসূচী

জার্মানীর সর্বাধিনায়ক

জার্মানীর নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রশাসকের পদ অধিকার করিয়া হিটলার তাঁহার কর্মসূচীকে কার্যে পরিণত করার পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য অত্যাবশ্যক ছিল জার্মানীর অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ও সামরিক শক্তিবৃদ্ধি। এই জন্য হিটলার জার্মানীর শিল্পোন্নয়নের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইলেন। ডাঃ সাখেট নামক জনৈক অর্থনীতি বিশেষজ্ঞের সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে জার্মানীর অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়া গেল এবং জার্মানীর বেকার সমস্যা বহুলাংশে সমাধান হইল। অতঃপর হিটলার ইউরোপে জার্মানীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জার্মান রাষ্ট্রকে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ

হিটলারের পররাষ্ট্র নৈতিক কার্যাবলী

করিলেন। ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানীর সামরিক শক্তি সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে হিটলার ভার্সাই সন্ধির শর্ত অস্বীকার করিয়া জার্মানীর অস্ত্রীকরণে মনোনিবেশ করিলেন। জার্মানীর জল, স্থল ও বিমান বাহিনীকে বিশেষ রূপে শক্তিশালী করা হইল। এইভাবে জার্মানীকে শক্তিশালী করার পরে হিটলার ইউরোপ বিজয়ে অগ্রসর হইলেন, হিটলারের প্রধান লক্ষ্য হইল অষ্ট্রিয়া অধিকার করা। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে হিটলার অষ্ট্রিয়া অধিকার করিতে যাইয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে হিটলার বিনা রক্তপাতে অষ্ট্রিয়া অধিকার করিয়া জার্মানীর অঙ্গীভূত করিলেন। ভার্সাই সন্ধির শর্ত উপেক্ষা করিয়া তিনি প্রথমে রাইন অঞ্চল সুরক্ষিত করিলেন এবং পরে উহা অধিকার করিয়া লইলেন। জার্মানীর অঙ্গচ্ছেদ করিয়া চেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছিল। চেকোশ্লোভাকিয়ায় যথেষ্ট জার্মান ছিল—ইহারা সুডেটেন জার্মান নামে পরিচিত ছিল। এই সুডেটেন জার্মানদের রক্ষার অজুহাতে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করিলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ভীত হইয়া 'মিউনিক' চুক্তির দ্বারা হিটলারকে চেকোশ্লোভাকিয়ার অংশ বিশেষ সুডেটেনল্যাণ্ড অর্পণ করিল। ছয়মাস বাদে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করিয়া অধিকার করিলেন। অতঃপর হিটলার লিথুনিয়ার মেমেল নামক স্থান দখল করিলেন। ইউরোপ হিটলারের আক্রমণকারী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য যুদ্ধ ঘোষণার পরিবর্তে হিটলারের তোষণনীতি আরম্ভ করিল। এযাবৎকাল ইউরোপের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ভরসা ছিল যে, হিটলারের সাহায্যে কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার ক্ষমতা নষ্ট করা যাইবে। কিন্তু অকস্মাৎ রাশিয়া ও জার্মানী কুড়ি বৎসরের অনাক্রমণ চুক্তি (১৯৩৯) করিয়া বসাতে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র বিপন্ন হইয়া পড়িল। হিটলার ইতিপূর্বে পোলাণ্ডের নিকট ডানজিগ দাবি করাতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও পোলাণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে এক মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিল। রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তির পর হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করিলেন। অগত্যা ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, চীন প্রভৃতি রাষ্ট্র জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)।

ইটালী ও মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদ :—প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করিয়া ইটালী জার্মানীর পরাজয়ে মিত্রপক্ষকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধান্তে ইটালী প্রত্যাশানুযায়ী পুরস্কৃত হয় নাই। আড্রিয়াটিকের উপকূলান্তর্গত আলবানিয়া এবং ইহার অন্তর্গত ফিউম বন্দর পাওয়া সম্বন্ধে ইটালীর প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু আলবানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া নামে দুইটি রাজ্য সৃষ্ট হইলে ইটালী অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইল। এতদ্ব্যতীত মিত্রশক্তি ইটালীকে আশ্বাস দিয়াছিল

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর ইটালী

যে, যুদ্ধান্তে ইটালী উত্তর আফ্রিকার অঞ্চল বিশেষ পাইবে এবং এশিয়ামাইনরের তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আনাতোলিয়া নামক স্থানকে ইটালীর প্রভাবভুক্ত করা হইবে। কিন্তু কার্যাতঃ কিছুই হইল না—ইটালী আফ্রিকার পূর্বপ্রান্তে বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড এর অংশবিশেষ পাইল এবং আনাতোলিয়া লোজেন-এর সন্ধিতে তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত হইল। এইভাবে ইটালীর সাম্রাজ্য বিস্তারের আশা ধূলিসাৎ হওয়ায় ইটালী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে অসন্তুষ্ট ও অতৃপ্ত রাষ্ট্রে পরিণত হইয়া রহিল।

ভার্সাই সন্ধিতে অবিচার

ইটালীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও শান্তি ছিল না। যুদ্ধের পরে ইটালীতে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অত্যধিক বাড়িয়া যায়। মুনাফাখোরদের লাভের অঙ্ক বর্দ্ধিত হইতে থাকে অথচ দেশের লোকের দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ত থাকে না। যুদ্ধ ফেরৎ সৈনিক, কারখানার মজুর, সাধারণ চাকরীজীবী সকলেই উপযুক্ত কর্মের অভাবে দেশের বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে থাকে। দেশের সর্বত্র উপদ্রব, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অশান্তি প্রতিনিয়ত চলিতে লাগিল। সোসালিষ্ট ও কম্যুনিষ্টরা এই সকল অশান্তিতে ইন্ধন জোগাইয়া দেশকে রাশিয়ার অনুরূপ বিপ্লবমুখী করার চেষ্টা করিল।

আভ্যন্তরীণ গোলযোগ

বেনিটো মুসোলিনী

বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার হাত হইতে উদ্ধার করার কার্য্যে নূতন এক রাজনৈতিক দল অগ্রসর হইয়া আসিল। ইটালীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কতিপয় দেশাত্মবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি 'ফ্যাসিষ্ট' দল নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করিলেন। বেনিটো মুসোলিনী এই দলের নেতা ছিলেন। এই দল দেশবাসীর নিকট ইটালীর প্রাচীন ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করার জন্য আবেদন জানাইল। এই দল সোস্যালিজম্ ও কম্যুনিজম-এর বিরোধী ছিল এবং অচিরেই এই দল স্বদেশবাসীকে ইহাদের মতবাদের দ্বারা আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইল। ইতিমধ্যে ইটালীর কোন মন্ত্রিসভ যুদ্ধোত্তর ইটালীর বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে অকৃতকার্য্য হওয়ায় তাহারা দেশবাসীর

সমর্থন লাভে সক্ষম হইল না। অগত্যা ইটালীর নরপতি তৃতীয় ভিক্টর ইম্মানুয়েল ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ফ্যাসিষ্ট দলের নায়ক মুসোলিনীকে প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। নরপতির ইচ্ছানুযায়ী মুসোলিনী ইটালীর প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়া বাস্তবপক্ষে ইটালীর ভাগ্যনিয়ন্তা হইলেন। দুই বৎসর পরে ইটালী পার্লামেণ্ট স্বেচ্ছায় মুসোলিনীর হস্তে ডিক্টেটরের অনুরূপ ক্ষমতা অর্পণ করিল (১৯২৪ খৃঃ)।

আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা

মুসোলিনী প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, তীক্ষ্ণধী ও কুশলী রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। দেশের সর্ববিধ সমস্যা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। যুদ্ধান্তে ইটালী যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুরবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিল, সেই অসহনীয় অবস্থা হইতে দেশকে ত্রাণ করার কাজে তিনি ব্রতী হইলেন। বিদেশে ইটালীর মর্য্যাদার পুনরুদ্ধার করাই মুসোলিনীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ছিলেন সাম্যবাদের ঘোরতর শত্রু। প্রথমে তিনি কঠোর হস্তে দেশের অরাজকতা দূর করার কাজে অগ্রসর হইলেন। মুসোলিনীর শাসনের বিরোধী যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ছিল তাহাদিগকে নির্মূল করা হইল। শিল্পের উন্নতি যাহাতে ব্যাহত না হয়, তজ্জন্য কল কারখানায় ধর্মঘট বা লক-আউট (মালিক কর্তৃক সাময়িকভাবে বন্ধ করা) বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল। শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য উপযুক্ত কর্মচারী নিযুক্ত হইল। মুসোলিনী প্রজাকল্যাণ মূলক বহু কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন এবং সৈন্যবাহিনী সম্প্রসারিত করিলেন। দক্ষিণ ইটালীর বহু জলাভূমির সংস্কার করার ফলে ইটালীর কৃষিভূমির পরিমাণ বর্দ্ধিত হইল এবং খাদ্য সমস্যার যথেষ্ট উন্নতি হইল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে পোপের সঙ্গে ইটালীর নরপতির যে মনান্তর চলিতেছিল মুসোলিনীর চেষ্টায় তাহার অবসান হইল। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের আপোশনামার ফলে পোপের ভ্যাটিকান শহর স্বাধীন বলিয়া ঘোষিত হইল।

পররাষ্ট্রনীতি

মুসোলিনীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কার্য্য পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইটালীর মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইটালী সম্বন্ধে যে অবিচার করা হইয়াছিল, তাহার প্রতিকার করা এবং ইটালীর জন্য উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার পররাষ্ট্রমূলক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। সামরিক সামর্থ্য ব্যতীত এই সকল অন্যায়ের প্রতিকার হইবে না, ইহা উপলব্ধি করিয়া মুসোলিনী ইটালীর সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে মুসোলিনী সাম্রাজ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় আফ্রিকার আবিসিনিয়া রাজ্য আক্রমণ করেন এবং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বিনা বাধায় আবিসিনিয়া অধিকার করেন। লীগ অব নেশানস্ প্রথমে এই নির্লজ্জ বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ ইটালীর বিরুদ্ধে

অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহা অনুসরণ করা হইল না। লীগের এই নিষ্ক্রিয়তায় মুসোলিনীর প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইল। ফ্রান্সের সঙ্গে ইটালীর বিরোধ, স্যাভয়, জিস, কর্সিয়া ও আফ্রিকাস্থ টিউনিশিয়ার উপনিবেশের অধিকার লইয়া দীর্ঘকাল চলিতেছিল। আবিসিনিয়া অভিযানের প্রাক্কালে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ইটালী বিরোধী আচরণে মুসোলিনী এই দুই রাষ্ট্রের উপর অত্যন্ত রুষ্ট হন। তিনি হিটলারের সঙ্গে একযোগে ইউরোপে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন। জার্মানী ও ইটালী উভয় দেশেই ভার্সাই সন্ধি-শর্ত স্ব স্ব দেশের স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিল। সুতরাং উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মতবাদের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে বিলম্ব হইল না। নাৎসী ফ্যাসিষ্ট মতবাদের ও কার্য্যপ্রণালীর সম্মুখে ইউরোপ সন্ত্রস্ত হইয়া রহিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে জেনারেল ফ্রাঙ্কো স্পেনের সাধারণতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। হিটলার ও মুসোলিনী ফ্রাঙ্কোকে সৈন্য ও সমরোপকরণ দিয়া সাহায্য করেন। ইহাতে মুসোলিনীর স্বদেশে ও বিদেশে মর্য্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়। মুসোলিনী ভূমধ্যসাগরকে ইটালীয় হ্রদে পরিণত করার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। জাপানের সঙ্গে জার্মানী ও ইটালীর মৈত্রী সংস্থাপিত হইল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই রাষ্ট্রত্রয় একই পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধে যোগদান করে এবং শেষ পর্য্যন্ত তিনটি রাষ্ট্রই পরাজিত হয়।

স্পেন :—বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে স্পেনের নরপতি ছিলেন ত্রয়োদশ আলফান্সো। আলফান্সো নিয়মতান্ত্রিক নরপতি ছিলেন। স্পেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নিরপেক্ষ থাকিয়া যুদ্ধরত পক্ষদ্বয়কে মাল সরবরাহ করে এবং এই সুযোগে শ্রমশিল্পের প্রচুর উন্নতি করে। যুদ্ধের পরে স্পেনে অর্থনৈতিক দুরবস্থা দেখা দেয় এবং দেশে নানাপ্রকার অশান্তির উদ্ভব হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মরক্কোর নেতা আবদুল করিমের নিকট স্পেন পরাজিত হইলে, স্পেনের জনসাধারণ রাজতন্ত্রের উপর বিরূপ হইয়া উঠিল। এই পরিস্থিতির সুযোগে জেনারেল প্রিমো-ডি-রিভেরা শাসনক্ষমতা হস্তগত করিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে প্রিমো ডি-রিভেরা প্রচলিত সংবিধান বাতিল করিয়া ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় স্পেন শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন-কানুন সমস্ত দিক দিয়া উন্নতি লাভ করিল। ইটালীর সহিত স্পেনের মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইল এবং মরক্কোর বিদ্রোহও আয়ত্তাধীনে আনীত হইল। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে জনসাধারণ প্রিমো-ডি-রিভেরা শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন

প্রিমো-ডি-রিভেরা

রাজার পদত্যাগ ও প্রজাতন্ত্রের সূচনা

করিল। রিভেরা পদত্যাগ করিলেন। রাজা আলফান্সো ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে নূতন নির্বাচন ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন। এই নির্বাচনে প্রজাতন্ত্রী দল সর্বাধিক ভোট লাভ করিলে, রাজা আলফান্সো সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। স্পেনে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হইল।

ফ্রাঙ্কো

নূতন প্রজাতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টে প্রথম প্রেসিডেণ্ট ছিলেন নিসেটো জামোরা।

ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহ :— ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রজাতন্ত্রী শাসন বর্তমান ছিল। এই বৎসর জেনারেল ফ্রাঙ্কো সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা হস্তগত করার চেষ্টা করিলেন। ফ্রাঙ্কো এই বিদ্রোহে মুসোলিনী ও হিটলারের নিকট যথেষ্ট সমর্থন ও সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ মৌখিক প্রতিবাদ জানাইলেও কার্যক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্রকে রক্ষার জন্য কোন চেষ্টা করিল না। ফ্রাঙ্কো জয়লাভ করিয়া স্পেনে প্রজাতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের স্থলে হিটলার, মুসোলিনীর ন্যায় একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

স্পেনে একনায়কতন্ত্র

ইউরোপের অন্যান্য দেশ :—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কুড়ি বৎসরকাল ইউরোপের সর্বত্র এক অর্থ নৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। সর্বত্র ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দা, কলকারখানা অচল এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রে বেকারের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সার্বজনীন দুরবস্থার সময়ে ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রের জনসাধারণ স্ব স্ব রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিল। সর্বত্র রাজতন্ত্রের স্থলে এক নায়কতন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল। এই নবাভ্যুদিত ডিক্টেটরগণ দেশের জন সাধারণকে আশার বাণী শোনাইতে লাগিলেন—দেশকে আর্থিক দুরবস্থা বা রাজনৈতিক অসম্মান হইতে ত্রাণ করার প্রতিশ্রুতি দিতে লাগিলেন। এই সমস্ত ডিক্টেটরগণের মধ্যে হিটলার ও মুসোলিনী ও ফ্রাঙ্কো ব্যতীত পোলাণ্ডের পিলসুডস্কি, চেকোশ্লোভাকিয়ার বেনেস, রাশিয়ার ষ্টালিন ও তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের নাম উল্লেখযোগ্য। এই অর্থ নৈতিক মন্দার প্রভাব হইতে ইংলণ্ডও মুক্ত ছিল না এবং ইহার প্রতিকারের

জন্য সচেষ্ট ছিল বলিয়া হিটলারের শাসনকালে জার্মানীর সমরসজ্জার বিরুদ্ধে প্রস্তুত হইতে পারে নাই। সামরিক অনগ্রসরতার জন্যই ইংলণ্ড হিটলারের আক্রমণাত্মক নীতিকে বাধা দিতে পারে নাই বরঞ্চ মিউনিক চুক্তিতে হিটলারকে সাহায্যই করিয়াছিল। ফ্রান্সও সম্ভাবিত জার্মানীর আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উদ্যোগ আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্ত্তীকালে পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানই শিল্পের উন্নতিবিধান করিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেকখানি অগ্রগামী হইতে পারিয়াছিল।

প্রশ্নোত্তর

1. Write a short essay on the origin and activities of the League of Nations. Account for its ultimate failure.

রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্ভব ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা কর। ইহার ব্যর্থতার কারণ কি?

উত্তর-সূচী: (১) ভূমিকা: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ভবিষ্যতে যুদ্ধ নিবারণ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধাদি নিষ্পত্তির জন্য 'লীগ অফ্ নেশানস্' বা রাষ্ট্রসঙ্ঘ নামে এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। (২) উদ্দেশ্য: আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি-সৌহার্দ্য বজায় রাখা—আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলিবে সঙ্ঘের নির্দেশ অমান্যকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রথমতঃ অর্থনৈতিক বয়কট এবং শেষ পর্য্যায়ে সামরিক হস্তক্ষেপ। (৩) সংগঠন: জেনেভায় সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয়—আন্তর্জাতিক বিচারালয়- শ্রমিক দপ্তর। (৪) প্রতিষ্ঠার সময় হইতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার কার্য্যাবলী; আন্তর্জাতিক বহু বিবাদে মধ্যস্থতা ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের লোকার্ণোর চুক্তি—সদস্যবর্গ যুদ্ধ হইতে বিরত থাকার জন্য কেলগ-চুক্তি (Kellog Pact)-তে আবদ্ধ। (৫) ইহার আচরণে বৃহৎ রাষ্ট্র সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্ব: দৃষ্টান্ত, ইটালী কর্ত্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণকালে সঙ্ঘের নিষ্ক্রিয়তা; দ্বিতীয়তঃ, সঙ্ঘের কোন নজস্ব সৈন্যবাহিনী না থাকায় ইহার নির্দেশ কার্যকরী করার অসুবিধা। (৬) ইহার ব্যর্থতা—জার্মানী, জাপান, ইটালী প্রভৃতি রাষ্ট্র স্বার্থরক্ষার জন্য সঙ্ঘ হইতে পদত্যাগ করে; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ইহার অন্যতম স্রষ্টা হইলেও ইহার সদস্য না থাকায় যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতার অভাব।

2. Give the history of Germany from 1919 to 1939 A. D.

১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জার্মানীর ইতিহাস বিবৃত কর।

উত্তর-সূচী: (১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের ফলে জার্মানীতে রাজতন্ত্রের অবসান ও সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়—Weimar Constitution অনুযায়ী নূতন সংবিধান। (২) প্রথম দিকে বহুবিধ সমস্যা—(ক) বেকার সমস্যা, (খ) অর্থনৈতিক দুরবস্থা, (গ) অসম্মানজনক ভার্সাই সন্ধির সর্তাবলী গ্রহণে অসম্মতি, (ঘ) বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ ও ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের জন্য বাহিরের চাপ, (ঙ) এই সমস্ত সমস্যার সমাধানে সাধারণতন্ত্রী সরকারের অক্ষমতা।

(৩) এই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার অবসানের পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়া নূতন রাজনৈতিক দলের অভ্যুদয় হইল—হিটলারের নেতৃত্বে 'ন্যাশনাল সোসিয়ালিষ্ট' বা নাৎসী দলের উদ্ভব। (৪) ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে নাৎসী দলের জয়লাভ এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে হিটলারের সর্বময় ক্ষমতা লাভ। (৫) হিটলারের উদ্দেশ্য—ভার্সাই সন্ধি অস্বীকার ও ইউরোপে জার্মানীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা; এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কর্মসূচী—জার্মানীর অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ও সামরিক শক্তি-বৃদ্ধি। (৬) ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ভার্সাই সন্ধি অস্বীকার—জার্মানীর অস্ত্রীকরণ—অষ্ট্রিয়া, সুডেটেনল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার—রাশিয়া-জার্মানী অনাক্রমণ চুক্তি—পোল্যাণ্ডের নিকট ডানজিগ দাবি—পোলাণ্ড আক্রমণ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

3. Write briefly the history of Germany under Hitler.

হিটলারের শাসনাধীন জার্মানীর ইতিহাস লিখ।

[২নং প্রশ্নের উত্তর-সূত্র দ্রষ্টব্য এবং (১) ও (২) সংক্ষেপে লিখিয়া অবশিষ্ট ৩-৬ বিশদভাবে লিখিতে হইবে।]

4. Write the history of Fascist Italy under Mussolini.

মুসোলিনীর শাসনকালীন ফ্যাসিবাদী ইটলীর ইতিহাস লিখ।

উত্তর-সূচী: (১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়া ইটালী জার্মানীর পরাজয়ে মিত্রপক্ষকে সাহায্য করিয়াছিল। যুদ্ধান্তে ভার্সাই সন্ধিতে ইটালী প্রত্যাশানুরূপ পুরস্কৃত হয় নাই—বরঞ্চ ইটালীর উপর অবিচার করা হইয়াছিল। ইহাতে যুদ্ধের পরবর্তীকালে ইটালী অসন্তুষ্ট ও অতৃপ্ত রাষ্ট্রে পরিণত হইয়া রহিল। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দেশে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সুযোগে ইটালীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কতিপয় ভদ্রলোক বেনিটো মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসিষ্ট নামে এক রাজনৈতিক দল গঠন করিলেন।

(২) ফ্যাসিষ্ট দলের দেশবাসীর সমর্থনলাভ—মুসোলিনী রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক। (৩ মুসোলিনীর উদ্দেশ্য—দেশের অর্থ নৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধান ও অরাজকতা দূর করা এবং পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইটালীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা। (৪) 'আভ্যন্তরীণ কার্যাবলী'—বিবিধ উন্নতিমূলক কার্য। (৫) পররাষ্ট্রনীতি—বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ইটালী সম্পর্কিত অবিচার দূর করা ও ইটালীর জন্য উপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা; সামরিক শক্তি বৃদ্ধি—আবিসিনিয়া আক্রমণ ও অধিকার—ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সহিত মনোমালিন্য—জার্মানীর সহিত উদ্দেশ্যের ঐক্য—স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্রাঙ্কো-কে সাহায্য প্রদান—হিটলার-মুসোলিনী মৈত্রী—অক্ষশক্তি (Axis Power) স্থাপন—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর সঙ্গে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যোগদান, পরাজয় ও পতন।

একাদশ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঃ যুদ্ধোত্তর পৃথিবী

Syllabus: The Second World War. Causes and Course (without details) United Nations Organisation. Revolution in China. New map of the World.

পাঠসূচী ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের কারণ ও গতি (সামরিক ঘটনার বিশদ বিবরণ থাকিবে না)। রাষ্ট্র সঙ্ঘ, চীন বিপ্লব, পৃথিবীর নূতন মানচিত্র।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ ঃ—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে মিত্রপক্ষ যে ভার্সাই সন্ধি রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার শর্তগুলির মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল। যুদ্ধ বাধাইবার শাস্তিস্বরূপ জার্মানীর স্কন্ধে যে সকল দায়দাবি চাপাইয়া দেওয়া হয়, তাহা পূরণ করা জার্মানীর পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল বলিয়া জার্মান জাতি নিদারুণ ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। বিজয়ী রাষ্ট্র বর্গের প্রতিনিধিরা শর্তাবলী রচনা করিয়া জার্মানীর সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া এই সব শর্ত জার্মানীর পক্ষে অবশ্য পাল্য হওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

(১) ভার্সাই সন্ধির অপমানজনক শর্তসমূহ

জার্মান জাতি মনে করিল অপরাধের অনুপাতে শাস্তির মাত্রা অত্যধিক হইয়াছে। জার্মানীকে সামরিক ক্ষেত্রে দুর্বল করার জন্য জার্মান সৈন্য বাহিনীর সর্বোচ্চ সংখ্যা বাঁধিয়া দেওয়া হইল। জার্মান নৌ-পোতের সংখ্যা ও আয়তন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি এতৎসঙ্গে স্ব স্ব সামরিক শক্তি হ্রাস করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহা অনুসরণ করে নাই। জার্মানীর মত একটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রকে চিরকালের মত পঙ্গু করিয়া রাখার প্রচেষ্টা অসঙ্গত হইয়াছে। যুদ্ধারম্ভের জন্য জার্মানীর যতটুকু দায়িত্ব থাকুক না কেন জার্মানীর মত রাষ্ট্রের পক্ষে প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বেলজিয়ম অপেক্ষা অস্ত্র ও সৈন্যবলে হীন হইয়া থাকা অসম্ভব। জার্মান রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া পোলিস করিডর (Polish Corridor) সৃষ্টির দ্বারা জার্মানীকে দ্বিখণ্ডিত করা, জার্মানীর শিল্পাঞ্চল সাইলেশিয়া পোলাণ্ডের হস্তে অর্পণ করা বা সার অঞ্চলের মূল্যবান খনিজ পদার্থের উপস্বত্ব ভোগের অধিকার ফ্রান্সকে সমর্পণ করার অর্থ জার্মানীর জাতীয় বা আর্থিক প্রতিপত্তিকে আহত করা। উপরন্তু জার্মানীর অধিকার হইতে জার্মানীর উপনিবেশগুলি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে আরও দুর্বল করা

হইল। জার্মানীর উপর ক্ষতিপূরণের মোটা আর্থিক দায় চাপাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু আর্থিক দুরবস্থা হইতে প্রতিকারের সমস্ত উপায় তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল। ইত্যবস্থায় জার্মানী আপাততঃ দায়ে পড়িয়া ভার্সাই সন্ধি মানিয়া লইলেও ভবিষ্যতে শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিলে ইহার শর্তাবলী অগ্রাহ্য করিবে এবং বর্তমান শোচনীয় অবস্থা হইতে প্রতিকারের সংক্ষিপ্ততম উপায় হিসাবে আর একটি যুদ্ধের জন্য আগ্রহশীল হইবে ইহা নিতান্ত অকল্পনীয় ছিল না। উদারনীতির দ্বারা পরাজিত শত্রুকে মিত্রে পরিণত করার পরিবর্তে প্রতিহিংসামূলক নীতি অনুসরণের দ্বারা মিত্রপক্ষ অত্যন্ত অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ইংলণ্ড কর্তৃক জার্মানীকে নানাবিধ ব্যাপারে সমর্থন করা বা প্রশ্রয়দান জার্মানীর শক্তি বৃদ্ধির অনুকূল হইয়াছিল। যুদ্ধের পরে জার্মানীর ধ্বংস হইয়া যাওয়ারই সম্ভাবনা অধিক ছিল, কিন্তু ইউরোপের অপরাপর রাষ্ট্রের বিশেষতঃ ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষার কল্যাণেই তাহা হইতে পারে নাই। পৃথিবীর মধ্যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সেরই সাম্রাজ্য সম্পদ অধিক ছিল। ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র-নীতির মূল সূত্র ছিল ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে শক্তি-সমতা রক্ষা করা। ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে একজন যাহাতে অপরের অপেক্ষা যথেষ্ট শক্তিশালী না হইয়া উঠে, ইহাই ছিল ইংলণ্ডের প্রচেষ্টা। জার্মানী যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় ফ্রান্স অত্যন্ত শক্তিমান হইয়া উঠে। ইত্যবস্থায় যদি জার্মানী বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা ইউরোপে এবং সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে ইংলণ্ড অপেক্ষা ফ্রান্সের অধিকতর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আশঙ্কা বর্তমান। এতদ্ব্যতীত রাশিয়ার সমাজতন্ত্রবাদকে প্রতিহত করার জন্য জার্মানীকে বাঁচাইয়া রাখার প্রয়োজন। জার্মানীকে যদি পুনরুজ্জীবিত করা হয়, তাহা হইলে জার্মানীর দ্বারা রাশিয়ার সাম্যবাদকে ইউরোপে প্রসারিত হওয়ার বিরুদ্ধে কাজে লাগানো যাইতে পারে। জার্মানীর নায়ক হিটলার ইংলণ্ডের এই উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন এবং রাশিয়াকে ধ্বংস করার কথা তোলেন। ইংলণ্ডের উৎসাহে ও সমর্থনে হিটলার এক এক করিয়া ভার্সাই সন্ধির শর্তসমূহ ভঙ্গ করিতে থাকেন। আসলে কিন্তু হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল রুশ বিদ্বেষের নাম করিয়া জার্মানী পুনর্গঠনের প্রথমতঃ ইউরোপের সহানুভূতি অর্জন করা। অতঃপর তাঁহার পরিকল্পনা হইল, ভার্সাই সন্ধির সমস্ত কলঙ্কময় শর্ত বিলুপ্ত করিয়া জার্মানীকে পুনরায় পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করা। ইংরেজ ও ফরাসীর ন্যায় সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া জার্মানীকে সমৃদ্ধ করাও হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল। প্রশমিত জার্মানীর শক্তিসঞ্চয়কে কেহ বাধা দিতে অগ্রসর হইল না।

(২) ইংলণ্ডের প্রশ্রয় ও সহানুভূতি

ইটালী এবং জাপানও ইংরেজ ফরাসীর সাম্রাজ্য সম্পদকে ঈর্ষা করিত। এই রাষ্ট্রদ্বয়ও সাম্রাজ্যবিস্তারের জন্য সচেষ্ট হইতে থাকে। ইটালীর রাষ্ট্রনায়ক মুসোলিনী সাম্রাজ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্র আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) আক্রমণ করে এবং নিষ্ঠুর হত্যালীলার পর আবিসিনিয়া-কে ইটালীর কুক্ষিগত করে। রাশিয়া ইটালীর এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিল, কিন্তু ইউরোপের অন্য কোন দেশ হইতে সমর্থন না পাওয়ায় রাশিয়া একাকী কিছু করিতে পারিল না। এদিকে এশিয়ার নবাভ্যুদিত রাষ্ট্র জাপানও ইটালী ও জার্মানীর ন্যায় ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছিল। জাপান চীনদেশের বিরাট অঞ্চল অধিকার করিয়া সমগ্র চীনদেশ দখল করার জন্য হস্ত প্রসারিত করিতেছিল। ইতিপূর্বে চীনে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ সমাজতান্ত্রিক আদর্শও ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। জাপান যদি এই আদর্শকে অঙ্কুরে বিনাশ করিতে পারে, তাহা হইলে রাশিয়ার সমাজতন্ত্রবাদ পূর্বদিকে আর অগ্রসর হইতে পারিবে না। এতদ্ব্যতীত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপান স্বীয় আধিপত্য বিস্তারের জন্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং জার্মানী, ইটালী ও জাপান পরস্পরের সঙ্গে সন্ধি করিয়া রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তির (Axis) সৃষ্টি করিল। ইতিমধ্যে স্পেনের গৃহযুদ্ধে জার্মানী ও ইটালী ফ্রাঙ্কোকে সমর্থন করিয়া তাঁহার জয়লাভে সাহায্য করিল।

অতঃপর হিটলার ভার্সাই সন্ধির শর্ত অগ্রাহ্য করিয়া অষ্ট্রিয়া অধিকার করিলেন। হিটলারের এই কার্যে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ উদাসীন থাকাতে হিটলারের উচ্চাশা আরও বৃদ্ধি পাইল। অতঃপর হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার সুডেটেনল্যাণ্ড নামক অঞ্চল দাবি করিয়া চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করিলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স হিটলারকে এই আক্রমণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য মিউনিক চুক্তি (১৯৩৮)-র দ্বারা চেকোশ্লোভাকিয়ার অঙ্গচ্ছেদ মানিয়া লইলেন। হিটলার এইটুকু আশ্বাস দিলেন যে, জার্মানী শুধু চেকোশ্লোভাকিয়ার সুডেটেন অঞ্চল লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে—চেকোশ্লোভাকিয়ার অবশিষ্ট অংশ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু হিটলার তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করিয়া পরবর্তী কার্যক্রমরূপে চেকোশ্লোভাকিয়ার অবশিষ্ট অংশও অধিকার করিয়া লইলেন। অতঃপর হিটলার পোলাণ্ডের নিকট হইতে ডানজিগ শহরটি দাবি করিলে বৃটেন ও ফ্রান্স পোলাণ্ডের সহিত মৈত্রী চুক্তি করিয়া হিটলারকে বাধা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল। ইতিমধ্যে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া হিটলারের ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে ক্রমাগ্রসর নীতিতে শঙ্কিত হইয়া জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি

অষ্ট্রিয়া অধিকার

মিউনিক চুক্তি ১৯৩৮
চেকোশ্লোভাকিয়া দখল

(Non-aggression Pact) করিল। এই অনাক্রমণ চুক্তির এই অর্থ ছিল না যে রাশিয়া হিটলারের জার্মানীকে বিশ্বাস করিয়াছিল। বস্তুতঃ রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রস্তুত হওয়ার জন্য এবং তাহার সীমান্তগুলি সুরক্ষিত করার জন্য সময় চাহিতেছিল মাত্র। এই একই উদ্দেশ্যে রাশিয়া জাপানের সঙ্গেও অনাক্রমণ চুক্তি করিয়াছিল। জাপানের সহিত চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ার পূর্ব সীমান্তকে নিরাপদ করার ব্যবস্থা করা। যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)।

যুদ্ধের গতি :—জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে মিত্রশক্তিবর্গ অর্থাৎ ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও বৃটেনের উপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহ জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। যুদ্ধের প্রথম দিকে মিত্রপক্ষ সামরিক দিক দিয়া যথেষ্ট প্রস্তুত না থাকায় জার্মানী জয়লাভ করিতে সমর্থ হইল। পোলাণ্ড অতি সহজেই জার্মানীর হস্তগত হইল।

পোল্যাণ্ড অধিকৃত

অতঃপর হিটলার বাল্টিক উপসাগরীয় অঞ্চলে মিত্রশক্তির জল ও স্থলঘাঁটি বন্ধ করার জন্য প্রথমে ফিনল্যাণ্ড অধিকার করিলেন এবং পরে ডেনমার্ক ও নরওয়ে অধিকার করিলেন (১৯৪০)।

ফিনল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ও নরওয়ে অধিকার

জার্মানীর সামরিক প্রস্তুতির পূর্বাভাস পাইয়া ফ্রান্স ইতিপূর্বেই পূর্বদিকে বিখ্যাত প্রতিরক্ষা-প্রাচীর ম্যাজিনো লাইন (Maginot-line) প্রস্তুত করিয়াছিল। হিটলারের সৈন্যবাহিনী ম্যাজিনো লাইন এড়াইয়া ফ্রান্স আক্রমণ করার জন্য নেদারল্যাণ্ডস্ ও বেলজিয়মের দিকে অগ্রসর হইল। এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির পক্ষে হিটলারের সুসজ্জিত বাহিনীর প্রতিরোধ করা অসম্ভব হইল। স্বল্প সময়ের মধ্যে বেলজিয়ম ও নেদারল্যাণ্ডস্ অধিকার করিয়া জার্মান বাহিনী দ্রুত ফ্রান্সে প্রবেশ করিল এবং ফ্রান্সের উপর আক্রমণ চালাইল। হিটলারের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রেরিত ইঙ্গ বৃটিশ বাহিনী ডানকার্ক বন্দরে জার্মান বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়িল। এই সৈন্যদলের অধিকাংশ নিহত হইল এবং অবশিষ্ট স্বল্পসংখ্যক সৈন্য কোন মতে ইংলণ্ডে অপসারিত হইল। জার্মান বাহিনী বিদ্যুৎগতিতে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্যারিস অধিকার করিলেন (জুন, ১৯৪০)। বৃদ্ধ সমরনায়ক প্রেসিডেণ্ট মার্শাল পেঁতা জার্মানীর সহিত সন্ধি শর্তে সম্মত হইতে বাধ্য হইলেন। সন্ধির শর্ত অনুসারে ফ্রান্সের উত্তর

জার্মানীর বেলজিয়ম ও নেদারল্যাণ্ডস অধিকার

ফ্রান্সের পরাজয়

অঞ্চল জার্মানীর অধিকারে রহিল। ইতিমধ্যে জার্মানীর মিত্রশক্তি ইটালীও ইটালীর সংলগ্ন ফরাসীদের শতকাংশ জয় করিয়া লইয়াছিল। দক্ষিণ ফ্রান্সের ভিসি (Vichy) নামক স্থানে জার্মানীর তাঁবেদার এক ফরাসী গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। জার্মানীর হস্তে পরাজয়ের ফলে ফ্রান্সের 'তৃতীয় সাধারণতন্ত্র'-এর পতন ঘটিল।

ভিসি সরকার

এইভাবে যুদ্ধারম্ভের প্রায় এক বৎসরের মধ্যে মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপে জার্মানীর আধিপত্য বিস্তৃত হইল। অতঃপর হিটলারের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডের উপনিবেশিক সাম্রাজ্য আক্রমণ করা। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের আগষ্টমাস হইতে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ হইল। দলে দলে নাৎসী বোমারু বিমান ইংলণ্ডের উপর যাইয়া বোমা বর্ষণ করিতে লাগিল—ইংলণ্ডের সমুদ্রোপকূলে জার্মান সৈন্য অবতরণ করাইবারও চেষ্টা চলিতে লাগিল। বৃটেনের নব নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী উইনষ্টন চার্চিল জার্মানীর আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য ইংলণ্ডের দৃঢ় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিলেন। জার্মান বিমান আক্রমণের ফলে ইংলণ্ডের পথঘাট, কলকারখানা, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইল এবং দেশের অসামরিক ও সামরিক জীবন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। ইংলণ্ডের অসংখ্য অধিবাসী বোমাবর্ষণে নিহত হইল, কিন্তু ইংলণ্ড কিছুতেই নতি স্বীকার করিল না।

ইংলণ্ডের উপর বিমান আক্রমণ

বৃটেনের বিরুদ্ধে বিমান আক্রমণ কার্য্যকরী না হইযায়, হিটলার ইংলণ্ড অবরোধের চেষ্টা করিলেন। বাহির হইতে যাহাতে বৃটেনে খাদ্য-সামগ্রী বা অন্যান্য দ্রব্য আসিতে না পারে, তজ্জন্য জার্মান বিমান-বহর বাণিজ্যপোতগুলি আক্রমণ করিতে লাগিল। লণ্ডনের বন্দর ও পোতাশ্রয়গুলি জার্মান বিমানের গোলাবর্ষণে বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। আটলাণ্টিক মহাসাগরে নাৎসী সাবমেরিণসমূহ অসংখ্য বৃটিশ জাহাজ ধ্বংস করিল। ভূমধ্যসাগরে ইটালীয় নৌবহর ও বিমানবহর প্রাধান্য বিস্তার করায় প্রাচ্যের সহিত ইংলণ্ডের যোগাযোগ রক্ষা করাও দুরূহ হইয়া পড়িল।

সামুদ্রিক অবরোধ

ফ্রান্স জার্মানীর নিকট আত্মসমর্পণ করাতে আফ্রিকাস্থ ফরাসী বাহিনী জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডকে সাহায্য করিতে পারিল না। ফলে আফ্রিকা মহাদেশে ইংলণ্ডের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িল। ইটালীয় সৈন্যদল বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড অধিকার করিয়া মিশর আক্রমণ করিল। মিশর ও সুয়েজখাল অধিকার করিয়া প্রাচ্যে এবং ভূমধ্যসাগরে বৃটিশের প্রাধান্য নষ্ট করাই এই আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল। ইংরেজ সেনাপতি ওয়াভেল পর্য্যাপ্ত সৈন্য ও অন্যান্য

আফ্রিকায় যুদ্ধবিগ্রহ

সরবরাহ প্রাপ্ত হইয়া ইটালীয় বাহিনীর মিশর আক্রমণ প্রতিহত করিলেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ওয়াভেল আফ্রিকা হইতে ইটালীয় সৈন্যদলকে বিতাড়িত করিলেন। ইটালীয় সমরঘাঁটি সাইরেনেইকা বৃটিশের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল এবং আফ্রিকাস্থ ইটালীর অধিকৃত স্থান ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ড, ইরিট্রিয়া, ইটালীয় পূর্ব-আফ্রিকা, বৃটিশের হস্তগত হইল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ইটালীর দ্বারা অধিকৃত আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া)-র পুনরুদ্ধার হইল (১৯৪১)।

ইটালী পরাজিত

বল্কান অঞ্চলে ইটালী গ্রীস আক্রমণ করিলে ইংলণ্ড গ্রীসের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইল। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বুলগেরিয়া জার্মানী-ইটালীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিলে হিটলারের সুবিধা হইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বুলগেরিয়া গ্রীসের নিকট যে সকল অঞ্চল অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল সেই সমস্তস্থান পুনরুদ্ধার করার জন্যই বুলগেরিয়া অক্ষশক্তির পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। জার্মান সৈন্যদল বুলগেরিয়া অধিকার করিয়া যুগোশ্লাভিয়ার দিকে অগ্রসর হইল। প্রথমে যুগোশ্লাভিয়া জার্মানীর আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু যুগোশ্লাভিয়ায় এক আভ্যন্তরীন বিপ্লব ঘটিলে রাজা পল সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং রাজপুত্র দ্বিতীয় পিটার পল সিংহাসনে আরোহণ করেন। নূতন রাজা জার্মানীর অনুরাগী ছিলেন, সুতরাং জার্মানবাহিনীর পক্ষে যুগোশ্লাভিয়া অধিকার করা অসুবিধাজনক হইল না। যুগোশ্লাভিয়ার পরে গ্রীস অধিকার করা জার্মানীর পক্ষে সহজ হইল যুগোশ্লাভিয়াকে ইটালী, হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়ার মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল। গ্রীস জার্মানীর অধিকারে আসায় ক্রীট জার্মানীর হস্তগত হইল এবং ভূমধ্যসাগরে বৃটিশের অবস্থা সঙ্কটজনক অবস্থায় উপনীত হইল। সমগ্র ইউরোপের মধ্যে মিত্রশক্তির দলভুক্ত আর কোন দেশ রহিল না।

বল্কানে যুদ্ধবিগ্রহ

রাশিয়া হিটলারের সহিত অনাক্রমণ সন্ধি করিলেও এই সন্ধির যে কোন মূল্য ছিল না এবং যে কোন মুহূর্ত্তে জার্মানীর দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিল এবং আসন্ন যুদ্ধের জন্য সামরিক ব্যবস্থা ও অন্যান্য বিষয়েও রাশিয়া প্রস্তুত হইতেছিল। ইতিমধ্যে হিটলার ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন অকস্মাৎ রাশিয়া আক্রমণ করিলেন। হিটলার ভাবিয়াছিলেন যে আভ্যন্তরীণ নানা বিশৃঙ্খলার ফলে রাশিয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা নিশ্চয়ই যৎসামান্য আছে। সুতরাং ফ্রান্স, নরওয়ে, ডেনমার্কের ন্যায় অতি সহজেই রাশিয়াকে অধিকার করা যাইবে এবং রাশিয়ার অজস্র ভূমিজ বা খনিজ সম্পদ হস্তগত করিতে পারিলে, ইংলণ্ডকে পরাজিত করা সহজ হইবে। রুশ সীমান্তে রক্ষিত জার্মান বাহিনীও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা যাইবে। সর্বোপরি

কমিউনিজম্ বিরোধী আমেরিকাও বৃটেনকে সামরিক সাহায্য দানে বিরত থাকিবে। কিন্তু রাশিয়ার প্রকৃত শক্তি সম্বন্ধে হিটলারের হিসাবে একটু ভুল হইয়াছিল। ষ্টালিনের নেতৃত্বে কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সাফল্যের সহিত কার্য্যকরী করিয়া রাশিয়া যে অর্থনৈতিক, সামরিক দিক হইতে পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল, তাহা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নিকট অজ্ঞাত ছিল। আক্রমণের প্রথম দিকে জার্মান বাহিনী কিছু সাফল্য লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ক্রমশঃ জার্মান বাহিনীকে দৃঢ় প্রতিরোধের সম্মুখীন হইতে হইল। "১৯৪১ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে জার্মান বাহিনী উত্তরে লেনিনগ্রাডের উপকণ্ঠে এবং মধ্য অঞ্চলে মস্কোর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। জার্মান সৈন্যদল ওডেসা, খারকভ ও রস্তভ অধিকার করিল। কিন্তু লেনিনগ্রাড ও মস্কোতে সোভিয়েট বাহিনী অভূতপূর্ব বীরত্বের সহিত শত্রুর আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে লাগিল। রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল অধিকার করা সত্ত্বেও জার্মানী রাশিয়ার শস্য সম্পদ বা অন্যান্য কোন শিল্প সম্ভারকে কাজে লাগাইতে পারিল না। জার্মানীর বাহিনীর দ্বারা অধিকৃত হওয়ার পূর্বেই রাশিয়া সেই সমস্ত স্থানে 'পোড়ামাটি' (Scorch earth policy) নীতি অনুসরণ করিয়া সেই সকল স্থানের যাবতীয় দ্রব্য কলকারখানা বিনষ্ট করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও নাৎসী বাহিনী মস্কোর উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার এই অভিযানও ব্যর্থ হইল। অতঃপর রাশিয়া পাল্টা আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে নাৎসীবাহিনীকে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকিতে হইল।

এযাবৎকাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপ ও আফ্রিকা খণ্ডে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু অচিরেই জাপান ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধে যোগদান করাতে রণাঙ্গণ প্রাচ্য অঞ্চলেও বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জাপান, জার্মানী ও ইটালীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এক মৈত্রীচুক্তি হয়। এই মিত্রতার সুযোগে জাপান জার্মানীর তাঁবেদার ফ্রান্সের ভিসি সরকারের নিকট হইতে ফরাসী ইন্দো-চীনে জাপানী সৈন্য প্রেরণ করার এবং উহা সামরিক ঘাঁটি রূপে ব্যবহার করার অধিকার আদায় করিয়া লইয়াছিল। জাপানের উদ্দেশ্য বুঝিতে যুক্তরাষ্ট্রের বিলম্ব হয় নাই। অচিরেই জাপান যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকৃত স্থানে সামরিক অভিযান আরম্ভ করিবে তাহা তাঁহার কার্য্যকলাপের মধ্য দিয়াই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্র জাপানের এই সামরিক মনোবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া যুক্তরাষ্ট্রে জাপানের যে সমস্ত অর্থ বা সম্পত্তি ছিল, তৎসমুদয় বাজেয়াপ্ত করিল। জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে তাহার নৌবহরের যেরূপ ব্যাপক সন্নিবেশ আরম্ভ করিল, তাহা নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির পক্ষে বিভীষিকার কারণ

যুদ্ধে জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের যোগদান

হইয়া উঠিল। ইত্যবস্থায় সুদূর প্রাচ্যে শান্তি রক্ষার জন্য জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলিল। এই আলোচনার মাঝখানে অকস্মাৎ ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর জাপান প্রশান্ত মহাসাগরস্থ হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পার্ল হারবারে অবস্থিত মার্কিন নৌ-ঘাঁটির উপর বোমারু বিমানবহর গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অগত্যা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইংলণ্ডও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। জাপানের মিত্রশক্তি হিসাবে জার্মানী ও ইটালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যোগদান করিল।

জাপানের যুদ্ধে যোগদান ১৯৪১

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালেই অক্ষশক্তি বিভিন্ন রণাঙ্গণে জয়ী হইতেছিল। জার্মান-বাহিনী রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ক্রিমিয়ার সিবাস্তোপল অধিকার করায় রাশিয়া কৃষ্ণসাগরের প্রধান নৌঘাঁটি হইতে বঞ্চিত হইল। নাৎসীবাহিনী পূর্ব ও দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া ককেসাস অঞ্চলে প্রবেশ করিল এবং তৈলখানি সমূহও অধিকার করিয়া লইল। ইতিমধ্যে জার্মান জেনারেল রোমেল আফ্রিকার বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে নূতন করিয়া অভিযান আরম্ভ করিয়াছিলেন। বৃটিশ বাহিনী রোমেলের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া পশ্চাদপসরণ করিতে করিতে উত্তর আফ্রিকার মধ্য দিয়া মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার সন্নিকটে উপস্থিত হইল।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে অক্ষশক্তির সাফল্য

মিত্র শক্তির পক্ষভুক্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার অভাবে যুদ্ধের ব্যাপারে মিত্র শক্তি বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছিল। ইহার প্রতিকারের জন্য ওয়াশিংটনে, চুংকিং-য়ে এবং মস্কোতে মিত্রশক্তির প্রতিনিধিরা মিলিত হইয়া কি ভাবে বিভিন্ন রণাঙ্গনে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চার্চিল মরক্কোয় কাসাব্লাঙ্কায় এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হইয়া বিভিন্ন রণাঙ্গণে কি ভাবে সংযুক্তভাবে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিলেন। রাশিয়ার জন্য ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্র পর্য্যাপ্ত সমরোপকরণ প্রেরণ করিল এবং একক রাশিয়া নাৎসীবাহিনীকে পাল্টা আক্রমণ করিল। রাশিয়ার প্রবল আক্রমণের ফলে নাৎসীবাহিনী মাত্র রাশিয়া হইতে বিতাড়িত হইল তাহা নহে রুশ বাহিনী জার্মান সৈন্যদলকে ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোলাণ্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লোভিয়া প্রভৃতি অধিকৃত অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করিয়া পূর্ব প্রাশিয়া

রাশিয়ার সাফল্য

পর্যন্ত অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। এদিকে ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত বৃটিশবাহিনী আসিয়া গ্রীসকে জার্মানীর কবল হইতে মুক্ত করিল।

মিত্রপক্ষের সাফল্য

মিত্রপক্ষের বন্দোবস্ত অনুযায়ী মার্কিন জেনারেল আইসেনহাওয়ার মিত্রপক্ষের বাহিনী লইয়া ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ করিল। জার্মানী এইভাবে পূর্বদিক হইতে রাশিয়া এবং পশ্চিম দিক হইতে মিত্রপক্ষের সৈন্যদলের দ্বারা আক্রান্ত হইল। মিত্রপক্ষের সৈন্যদল

ফ্রান্স

ফ্রান্স পুনরায় অধিকার করিল। ইতিপূর্বেই ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে জেনারেল আইসেনহাওয়ারের নেতৃত্বে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী রোমেলের সৈন্যদলকে পর্যুদস্ত করিয়া উত্তর আফ্রিকায় জয়ী হইয়াছিল। উত্তর

ইটালী

আফ্রিকার পর ইটালীর উপর আক্রমণ আরম্ভ হইল। ইটালী এই যুদ্ধে আশানুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে না পারায়, হিটলার ইটালীকে আর সহায়তা করিতে অস্বীকার করিল। মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদল সিসিলীতে অবতরণ করিলে ইটালীতে মুসোলিনীর শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল এবং জনসাধারণ মুসোলিনীর পদত্যাগ দাবি করিল। মুসোলিনী প্রথম পদচ্যুত এবং পরে জনতার হস্তে নিহত হইলেন। মুসোলিনীর মৃত্যুর পরে

জার্মানী

ইটালী যুদ্ধবিরতির জন্য প্রার্থনা করিল। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর, ইটালী যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে স্বাক্ষর করিল জার্মানী ও পূর্ব ও পশ্চিম হইতে রাশিয়া ও মিত্রশক্তির বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মিত্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিল (মে, ১৯৪৫)। প্রতিরোধ ও পলায়ন অসম্ভব জানিয়া হিটলার আত্মহত্যা করিলেন।

জাপানের অগ্রগতি

দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুয়াম ও ওযেক দ্বীপ এবং হংকং, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি চীনের দক্ষিণ উপকূলস্থ ঘাঁটিগুলি অধিকার করিয়া লইল। ক্রমশঃ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ মালয়, শ্যাম (থাইল্যাণ্ড) ও ব্রহ্মদেশ জাপানের হস্তগত হইল। জেনারেল ওয়াভেল ও ষ্টিলওয়েল জাপানের

জাপানের পরাজয়: জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত

অগ্রগতি রুদ্ধ করিতে অসমর্থ হওয়ায় বৃটিশ বাহিনী ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। জাপবাহিনী ভারতবর্ষের সীমান্ত পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে সুদূর প্রাচ্যঅঞ্চলে মার্কিনবাহিনী জাপানের উপর নিয়মিত আক্রমণ চালাইয়া জাপানকে অনেকটা দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। ইতিমধ্যে

আণবিক বোমা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট তারিখে জাপানের হিরোসিমা শহরের উপর আণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ৮ই আগষ্ট তারিখে রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মাঞ্চুরিয়া অধিকার করে। ৯ই আগষ্ট তারিখে নাগাসাকি শহরের উপর দ্বিতীয় আণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ১০ই আগষ্ট জাপান আত্মসমর্পণে সম্মত হয় এবং ২রা সেপ্টেম্বর জাপান অনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিসমাপ্ত হয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জঃ—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে পৃথিবী হইতে যুদ্ধ বন্ধ করা এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লীগ অফ নেশন্স প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু লীগ অফ নেশন্সের সংগঠনিক ত্রুটির জন্য ইহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। কুড়ি বৎসরের মধ্যেই পৃথিবী পুনরায় এক প্রচণ্ড ধ্বংসকারী যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশ্বব্যাপী নিষ্ঠুর হত্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের মনে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি রক্ষার উপযোগী একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার স্পৃহা জাগাইয়া তুলিল। লীগ অফ নেশনস্ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ও কার্য্যকরী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করিল। এই কামনায় ফলস্বরূপ 'ইউনাইটেড নেশনস্ অর্গানাইজেশন' (United Nations Organisation) বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গড়িয়া উঠিল।

রুজভেল্ট

যুদ্ধের মাঝখানে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী উইনষ্টন চার্চিল সংযুক্তভাবে আটলান্টিক চার্টার (Atlantic Charter) নামে এক সনন্দের শর্তাবলী ঘোষণা করেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ঐ সনদের শর্তাবলীতে সম্মতি প্রকাশ করিয়া ২৬টি রাষ্ট্র উহাতে স্বাক্ষর করে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে মস্কো সম্মিলনে এবং ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ওয়াশিংটনের ডাম্বার্টন ওক্স (Dumberton Oaks)-এ ও বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান রাষ্ট্র এই প্রস্তাবিত

ইহার প্রতিষ্ঠা

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শর্ত সম্বন্ধে আলোচনা করে। ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে স্থার ফ্রান্সিসকোতে দুইমাস ব্যাপী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবেশন হয় এবং সেখানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনন্দে (United Nations Charter) পঞ্চাশটি রাষ্ট্র স্বাক্ষর করিল।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য হইল—(১) বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক নির্বিঘ্নতা বজায় রাখা (২) পৃথিবীর সমস্ত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে এই সত্যের ভিত্তিতে জাতিগত সম্প্রীতি বৃদ্ধি করা (৩) পৃথিবীর যাবতীয় মানবের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান এবং দুঃখদুর্দশার অবসানের জন্য চেষ্টা করিয়া মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা স্বীকার করা (৪) স্বাস্থ্য, খাদ্য, শিক্ষা, চাকরী-সংস্থান প্রভৃতি ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করা (৫) জাতি ভাষা ও ধর্মনির্বিশেষে পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে সমান স্বীকৃতি প্রদান (৬) আন্তর্জাতিক সন্ধি বা আইন কানুন মান্য করা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিভিন্ন বিবাদ-বিরোধের মীমাংসা করা। (৮) অনগ্রসর দেশ সমূহের উন্নয়নে সকলের সাহায্যের জন্য অগ্রণী হওয়া।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনন্দ

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনন্দ লীগ্ অফ নেশনস্-এর কর্তাবলী অপেক্ষা বিশদতর হওয়ায় এই সকল সনন্দের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কয়েকটি শাখা ও উপশাখা রহিয়াছে। এই গুলির মধ্যে—সাধারণ পরিষদ (General Assembly), নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council), অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council), ন্যাস পরিষদ, (Trusteeship Council), আন্তর্জাতিক আদালত, এবং সেক্রেটারিয়েট বা সদর কার্য্যালয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সাধারণ পরিষদে সকল সদস্যের সমান অধিকার এবং প্রত্যেক দেশের একটি মাত্র ভোটদানের অধিকার আছে। নিরাপত্তা পরিষদের উপর প্রধানতঃ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদটি মানব সভ্যতার উন্নয়ন ও শান্তিপূর্ণ সংগঠনের দিক হইতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি, সমাজ-নীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে উন্নয়ন ব্যবস্থা করাই এই পরিষদের প্রধান কর্তব্য। এই পরিষদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বেকার সমস্যা, যানবাহন ও যোগাযোগ, হিসাব ও পরিসংখ্যান, মানবাধিকার, সামাজিক প্রশ্ন ও সমস্যা, শরীর মর্য্যাদা ও অধিকার, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও জনসংখ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের সমাধানের জন্য বিভিন্ন উপবিভাগ

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ : ইহার বিভিন্ন উপশাখা

রহিয়াছে। লীগ অফ্ নেশনস্-এর ন্যায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (I. L. O) ইহার অন্যতম উপশাখা। বিভিন্ন দেশের খাদ্য ও পুষ্টির সমস্যা সমাধানের জন্য 'খাদ্য ও কৃষি সংস্থা' (F. A. O) রহিয়াছে। শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত সংস্থাটিও (U. N. E. S. C. O) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ন্যাস পরিষদটির হস্তে অনুন্নত দেশগুলির তত্ত্বাবধানের ভার রহিয়াছে। আন্তর্জাতিক আদালত আন্তর্জাতিক বিচারের ভার প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (W. H. O) ও বিশ্বব্যাঙ্ক (World Bank) প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থাও রহিয়াছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্তর্গত নিরাপত্তা পরিষদের প্রকৃত ক্ষমতা আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও ফরমোসা দ্বীপে আশ্রিত কুয়ো মিং তাং চীন প্রভৃতি পাঁচটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের হস্তে রহিয়াছে। আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদে এই সকল রাষ্ট্রের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী থাকায় সকল সময়ে ন্যায় বিচার হয় না। উপরন্তু কোনও একজন স্থায়ী সদস্য মতদ্বৈধতা প্রকাশ করিলে নিরাপত্তা পরিষদ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে না। কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে এই ত্রুটি লক্ষিত হয়।

এই সংস্থার ত্রুটি

ইংলণ্ড বা যুক্তরাষ্ট্রের অপক্ষপাত মনোভাবের অভাবেই ইহার সমাধান বিলম্বিত হইতেছে। নিরাপত্তা পরিষদ কাশ্মীরে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিলে রাশিয়া তাহার 'ভেটো' বা বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা ইহা বাতিল করিয়া দিযাছিল। আমেরিকার আপত্তির জন্য প্রজাতান্ত্রিক চীনকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যরূপে স্বীকার করা হয় নাই। ফরমোসার গভর্ণমেণ্টকে চীন সরকারের মর্য্যাদা দেওয়া হইযাছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বেনামীতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিযাছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা রক্ষার নামে অনেকগুলি আঞ্চলিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি করিয়াছে। বস্তুতঃ নামে ইহা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হইলেও ইহা কম্যুনিজম নিরোধের নামে সাম্রাজ্যবাদীদের আধিপত্য রক্ষা ও বিস্তারের শাণিত অস্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরবর্ত্তী পৃথিবী :—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভের প্রধান কৃতিত্ব আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ও সোভিয়েট রাশিয়ার। যুদ্ধোত্তর যুগে এই দুইটি রাষ্ট্রই বিশ্বের প্রধানতম শক্তিতে পরিণত হইযাছে। যুদ্ধের বিপুল ব্যযভার বহন করিলেও যুদ্ধের সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোন অঞ্চল বোমাবর্ষণে আক্রান্ত বা বিধ্বস্ত হয় নাই বলিয়া ছয় বৎসরব্যাপী যুদ্ধের সময়ে আমেরিকার শিল্প, কৃষি বা ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি অর্থোন্নয়নমূলক অগ্রগতি ব্যাহত হয় নাই। সুতরাং যুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ বা দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলি যখন অর্থনৈতিক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

দুরবস্থার সম্মুখীন হইল তখন যুক্তরাষ্ট্র 'মার্শাল প্ল্যান' নামে এক অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা করিয়া এই সকল দুর্দশাগ্রস্ত রাষ্ট্রকে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইল। প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্রের এই ঋণদান ও সাহায্য পরিকল্পনার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ড প্রমুখ পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবর্গ তাহাদের অর্থ নৈতিক দুরবস্থার অনেকখানি প্রতিকার করিতে সমর্থন হইয়াছিল। ভারতবর্ষ, পাকিস্তান প্রভৃতি এশিয়ার দেশগুলিও এই ঋণের সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। যুদ্ধোত্তর যুগে যুক্তরাষ্ট্রে পররাষ্ট্রনীতিতে কম্যুউনিজম প্রতিরোধনীতি গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী কার্যক্রম অনুসরণ করিতেছে। রাশিয়ায় ও চীনে স্বীকৃত সাম্যবাদ যাহাতে পৃথিবীতে প্রসারিত হইতে না পারে, তজ্জন্য রুশ বিরোধী বহু আঞ্চলিক চুক্তি অনুষ্ঠানে, যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছে। এই সমস্ত চুক্তি সঙ্ঘের মধ্যে সিয়াটো (SEATO), ন্যাটো (NATO) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ষ্টালিনের মৃত্যুর পরে রাশিয়ার সাম্যবাদের আন্তর্জাতীয়তার সুর একটু নরম হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়ার বিদ্বিষ্ট মনোভাবের অনেকটা উপশম হইয়াছে। বিশ্বশান্তি ভঙ্গকারী কয়েকটি বিরোধের সমাধানে রাশিয়া ও ও যুক্তরাষ্ট্রকে একমত হইতে দেখা গিয়াছে। সুয়েজখাল সংক্রান্ত বিরোধে এই উভয় রাষ্ট্র মিশরের পক্ষে সমর্থন করায় সহজেই বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ইংলণ্ড বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রথমপর্য্যায় হইতে নিম্নে নামিয়া যায়। যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডে রক্ষণশীল দলের প্রাধান্য ছিল কিন্তু যুদ্ধের অবসানে সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীল দল পরাজিত হয় এবং শ্রমিকদল জয়ী হইয়া শাসনভার গ্রহণ করে। শ্রমিদলের হস্তে ক্ষমতা আসায় ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষিত হয়। শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থ নৈতিক উন্নয়নে মনোনিবেশ করে। যুদ্ধের পরে গভর্ণমেণ্টের প্রথম দায়িত্ব হইল যুদ্ধোবিধ্বস্ত শহরগুলির পুনর্নির্মাণ এবং দেশের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন। বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা, কৃষিব্যবস্থার উন্নয়ন এবং অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির র‍্যাশানিং-এর বন্দোবস্ত করিয়া শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট পুনরায় যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। 'মার্শাল প্ল্যান'-এর সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ড আমেরিকার নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ করিল। বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি করার জন্য ইংলণ্ড পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস করিয়া দিলে ইংলণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস পাইল এবং ইংলণ্ড হইতে দ্রব্যাদি আমদানী করা লাভজনক হইল। বলা বাহুল্য পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস করাতে ইংলণ্ডের যুদ্ধ ঋণের পরিমাণও হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডের জাতীয় করণ, কয়লা-

ইংলণ্ড

শিল্প-জাতীযকরণ, বিভিন্ন শহব পুনর্গঠন পরিকল্পনার মধ্য দিয়া ইংলণ্ডে সমাজতান্ত্রিক নীতি গ্রহণের পরিচয় পাওয়া গেল। যুদ্ধোত্তরকালে অংশতঃ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপে এবং অংশতঃ স্বাতন্ত্র্যকামী ভাবধারার প্রসারের ফলে ইংলণ্ড ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি সাম্রাজ্যভুক্ত দেশকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে বাধ্য হইল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের প্রাক্কালে রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই রাষ্ট্র চতুষ্টয়ের সৈন্যবাহিনী জার্মানী অধিকার করে। ইহার ফলে জার্মানী, রাশিয়া, বৃটিশ, মার্কিন ও ফরাসী এই চারিটি রাষ্ট্রের অধিকৃত অঞ্চলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। জার্মানীর রাজধানী বার্লিন মিত্রশক্তি ও রাশিয়া এই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিভক্ত হয়। পশ্চিম জার্মানী অর্থাৎ রাশিয়া ভিন্ন অপর তিন শক্তির দ্বারা অধিকৃত জার্মান অঞ্চলের রাজধানী বন (Bonn)-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিম জার্মানীতে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান কার্য্যকরী করা হইয়াছে এবং তদনুযায়ী ইহার সাধারণ নির্বাচনও হইয়া গিয়াছে। নূতন নির্বাচনে ডক্টর আদেনেয়ার পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন। জার্মান অধিকৃত অঞ্চলেও রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র নামে একটি নূতন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। রুশ অধিকৃত বার্লিন শহরে এই নূতন প্রজাতন্ত্রের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছে। সমগ্র দেশ হইতে বিদেশী অধিকার প্রত্যাহৃত করিয়া পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীকে সম্মিলিতভাবে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করা বর্তমানে অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে রাশিয়া এবং মিত্রপক্ষ একমত না হইতে পারাতে জার্মানীর ঐক্যসাধন হয় নাই। বলা বাহুল্য এক পক্ষ অপর পক্ষের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান থাকাতে জার্মানী সম্বন্ধে উভয় পক্ষ একমত হইতে পারিতেছে না।

ফ্রান্স :—যুদ্ধের সময়ে ফ্রান্স জার্মানীর দ্বারা অধিকৃত হইলে মার্শাল পেঁতার নেতৃত্বে জার্মানীর তাঁবেদার ভিসি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এই সময়ে জার্মানীর তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটে এবং জার্মানীতে একনায়কত্ব স্থাপিত হয়। যুদ্ধাবসানে জার্মানীর কবলমুক্ত হইলে ফ্রান্সে পুনরায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের প্রধান সমস্যা ছিল দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রতিকার করা এবং তাহার এশিয়া ও আফ্রিকাস্থ উপনিবেশ সম্বন্ধে একটা সন্তোষজনক বন্দোবস্ত করা। ভারতবর্ষ ইংরেজের অধীনতা হইতে মুক্ত হইলে ফরাসী সরকারও ভারতের জনমতের চাপে বাধ্য হইয়া ভারতীয় উপনিবেশ সমূহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইন্দো-চীন হইতেও ফরাসী শাসন প্রত্যাহৃত হইয়াছে কিন্তু ফরাসী সরকার আফ্রিকাস্থ উপনিবেশিক সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হওয়ায় নানারূপ গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। আলজিরিয়া

ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ফরাসী সরকারকে ক্রমাগত বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। টিউনেশিয়া, মরক্কো ও ভিয়েৎনামেও গোলযোগ চলিতেছে। আলজিরিয়া সম্পর্কিত ফরাসী সরকারের নীতিকে উপলক্ষ্য করিয়া ফ্রান্সের সংবিধান সংশোধিত হইয়াছে এবং জেনারেল দ্যগলের হস্তে অতিরিক্ত ক্ষমতাসহ ফরাসী রাষ্ট্রের শাসনদায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে।

রাশিয়া :—দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর কালে রাশিয়া পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার দ্বারা রাশিয়া দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন করিতে সমর্থ হইয়াছে। শিল্প-সৃষ্টির দিক দিয়া বর্তমানে রাশিয়া প্রায় আমেরিকার সমকক্ষ রাষ্ট্র হইতে সমর্থ হইয়াছে। সামরিক সাজসরঞ্জাম সৃষ্টির ব্যাপারে রাশিয়া বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে প্রায় একপ্রকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেও হয়। বিভিন্ন প্রকারের দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, যন্ত্রচালিত রকেট, পরমাণবিক শক্তিচালিত মারণাস্ত্র ইত্যাদির উদ্ভাবনে রাশিয়া সকলকে পরাজিত করিয়াছে।

রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির প্রধান উদ্দেশ্য পৃথিবীর সর্বত্র কম্যুনিষ্ট বিপ্লব সংঘটিত করা। যুদ্ধের সময়ে রাশিয়া ইঙ্গ-আমেরিকার সহিত প্রয়োজনের তাগিদে হাত মিলাইয়াছিল এবং সাময়িকভাবে সাম্যবাদী সম্প্রসারণনীতি স্থগিত রাখিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরে রাশিয়া পুনরায় এই নীতি কার্যক্ষেত্রে অনুসরণ করিতে থাকে। রাশিয়া প্রকাশ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠার বাণী প্রচার করিলেও পূর্ব ইউরোপে এবং এশিয়ার দেশ সমূহে সাম্যবাদ বিস্তারের দ্বারা ইঙ্গ-আমেরিকার মনে সন্দেহ ও উদ্বেগের সৃষ্টি করিতেছে। রাশিয়ার দ্বারা এস্থোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে এবং পূর্ব-ইউরোপের পোলাণ্ড, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, আলবানিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া ও পূর্ব-জার্মানী রাশিয়ার তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। চীন সাম্রাজ্যবাদী সরকারের প্রতিষ্ঠা করিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি করিতেছে। আমেরিকায় সোভিয়েট সাম্যবাদকে পৃথিবীর গণতন্ত্র, ইউরোপের খৃষ্টানী সভ্যতা ও মানব সমাজের পক্ষে নিদারুন বিঘ্নস্বরূপ মনে করে। এই সভ্যতা বিধ্বংসী সোভিয়েটের রাহুগ্রাস হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য আমেরিকা বিশ্বব্যাপী সর্বত্র রুশ-বিরোধী শিবিরের সৃষ্টি করিয়াছে। রাশিয়াও অনুরূপ অন্য এক শিবিরের অধিনায়করূপে বিরোধী রাষ্ট্রজোট গঠনের দিকে তৎপর হইয়াছে। এইভাবে উভয় পক্ষের মধ্যে 'ঠাণ্ডা লড়াই' (Cold War) এর মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। ষ্টালিনের মৃত্যুর পরে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে তাহার অনমনীয় মনোভাবের পরিবর্তন আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এশিয়া ও আফ্রিকা :— দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। যুদ্ধের পরে এই দুই মহাদেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সর্বত্র দানা বাঁধিয়া উঠে এবং উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সর্বত্র আন্দোলন উপস্থিত হয়। সামরিক শক্তির দ্বারা দীর্ঘকাল সাম্রাজ্যবাদ বজায় রাখা যাইবে না ইহা উপলব্ধি করিয়া পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ অধীনস্থ দেশসমূহের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, আরব রাষ্ট্র সমূহ, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি, ইন্দো-চীন এশিয়ার প্রায় সকল দেশই পাশ্চাত্য শক্তির অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়াছে।

জাপান

বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পরে জাপান মার্কিন জেনারেল ম্যাকআর্থারের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘকাল ছিল। মিত্রশক্তির বিশ্বাসভাজন ও নিয়ন্ত্রিত একটি সরকারের উপর জাপানের শাসনভার ন্যস্ত ছিল। জাপানের মত দেশকে দীর্ঘকাল স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা সম্ভবপর নহে উপলব্ধি করিয়া ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে জাপানের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় এবং জাপান হইতে মিত্রশক্তির দখলী সৈন্য প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয়। যুদ্ধোত্তর স্বাধীন জাপানের প্রধান সমস্যা তাহার অর্থ নৈতিক দুরবস্থার পুনরুজ্জীবন।

যুদ্ধোত্তর কালে আফ্রিকা মহাদেশে উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বত্র তীব্র আন্দোলন চলিতেছে। উত্তরে মরক্কো টিউনিশিয়া, আলজিরিয়ায় এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। ইতিমধ্যে ঘানা স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হইয়াছে। এখনও এই মহাদেশের অধিকাংশ স্থান পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের অধীনে আছে।

আরব রাষ্ট্র সমূহ :— প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে আরব রাষ্ট্র সমূহ তুরস্কের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হয়, কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ নিজেদের স্বার্থের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইহাদের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইহারা স্বাধীন হয়। এশিয়ায় আরবজাতি অধ্যুষিত সাতটি স্বাধীন রাজ্য আছে—তাহাদের নাম হেজাজ, প্যালেষ্টাইন, ইজরায়েল, ট্রান্স-জর্ডন, সিরিয়া, ইরাক, ইয়েমেন এবং সৌদি আরব। ইহাদের মধ্যে প্যালেষ্টাইনের একাংশ ইহুদীরা অধিকার করিয়া নূতন ইহুদী রাষ্ট্র ইস্রায়েলের সৃষ্টি করিয়াছে। আফ্রিকাস্থ আরব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র ইজিপ্ট (আরব জাতি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে)।

দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া :— দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অসংখ্য দ্বীপ লইয়া ইন্দোনেশিয়া গঠিত। ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত দ্বীপসমষ্টির মধ্যে সুমাত্রা ও জাভা আয়তনে বড়। ইন্দোনেশিয়া দীর্ঘকাল হল্যাণ্ডের অধীনে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপান

ইন্দোনেশিয়াকে হল্যাণ্ডের হাত হইতে মুক্ত করে এবং তাহাদের সহানুভূতি অর্জনের জন্য ইন্দোনেশিয়াকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে। মিত্রশক্তির হাতে জাপানের পরাজয়ের পরে জাপানীরা যখন ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া যায়, তখন তাহারা তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র সামরিক দ্রব্যাদির বেশী অংশই ইন্দোনেশীয়দের হাতে দিয়া যায়। এই সমস্ত যুদ্ধাস্ত্র হস্তগত হওয়ায় ইন্দোনেশীয়দের শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের শেষে যখন হল্যাণ্ড পুনরায় ইন্দোনেশিয়ার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, তখন ইন্দোনেশীয়া বাধা দেয়। পরিশেষে ইংলণ্ডের মধ্যস্থতায় হল্যাণ্ড ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডোনেশিয়াকে স্বাধীনতা প্রদান করে। নূতন রাষ্ট্রের নাম হয় সংযুক্ত-রাষ্ট্র ইণ্ডোনেশিয়া।

চীনের প্রজাতন্ত্র :—চীনের দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল কুয়োমিণ্টাং এবং কম্যুনিষ্ট দলের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ বহু পূর্ব হইতেই ছিল এবং দীর্ঘকাল যাবৎ দুই সমর্থকদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ লাগিয়াই ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এবং যুদ্ধের সময়ে যখন জাপান চীন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল আক্রমণ করে, তখন উভয় দল নিজেদের পাম্পরিক বিরোধ স্থগিত রাখিয়া একযোগে জাপানকে প্রবল বেগে বাধা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পরে পুনরায় উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। কুয়োমিণ্টাং দলের নেতা চিয়াং কাইসেক কম্যুনিষ্ট নেতা মাও সেতুংকে আমন্ত্রণ করিয়া একটি মিটমাটের চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল। কম্যুনিষ্টরা কিছুতেই ধনী ভূস্বামী ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষী কুয়োমিণ্টাং দলের হাতে দেশের শাসনভার ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইল না। কুয়োমিণ্টাং সরকার চীনের প্রতিনিধিরূপে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জে স্থান পাইলেও চীনের জনসাধারণ এই সরকারকে সমর্থন করিতে পারে নাই। কুয়োমিণ্টাং-এর বিশ বৎসরব্যাপী কুশাসন দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। কুয়োমিণ্টাং সরকার কৃষি প্রধান চীনের অগণিত লোকের স্বার্থের প্রতি একান্ত উদাসীন ছিল। জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে চীনের কম্যুনিষ্ট দল মাঞ্চুরিয়ার জাপানীদের পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্রগুলি হাতে পাইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কম্যুনিষ্ট দল সুসংবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। ইত্যবস্থায় কম্যুনিষ্টগণ অস্ত্রের সাহায্যে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হইল। পুনরায় চীনদেশে গৃহবিপ্লব আরম্ভ হইয়া গেল। দেশের জনসাধারণ দলে দলে কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে যোগদান করিল এবং প্রদেশের পর প্রদেশ কুয়োমিণ্টাং দলের হস্তচ্যুত হইতে লাগিল। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে [illegible]কে চিয়াং কাইসেক কম্যুনিষ্টদের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া সদলবলে

কুয়োমিণ্টাং ও কম্যুনিষ্ট দলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ

চীনের সন্নিহিত ফরমোসা দ্বীপে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর কম্যুনিষ্টদের নয়া চীন পিপলস রিপাব্লিক অফ চায়না (People's Republic of China) বা 'চীন গণতন্ত্র' [illegible] হয়। মাও সে-তুং ইহার সভাপতি, চৌ-এন-লাই প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। চীনের রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার আদর্শ ও লক্ষ্য প্রায় সোভিয়েট রাশিয়ার অনুরূপ, তবে তাহা রাশিয়ার পূর্ণ অনুকরণ নহে। চীনের নিজস্ব রীতিনীতি এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়াই নূতন গভর্ণমেণ্ট চীনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে যত্নবান হইয়াছেন।

কম্যুনিষ্টদের সাফল্য

সোভিয়েট সরকার ও পরে অন্যান্য দেশ এই নূতন সরকারকে স্বীকার করিয়া লইল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহাকে স্বীকার করিতে সম্মত হইল না। ফরমোসা দ্বীপে চিয়াং কাইশেক যে সরকার গঠন করিয়াছিলেন, তাহাকে চীনা সরকার বলিয়া স্বীকার করিল এবং মার্কিন গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে ফরমোসা সরকার চীনের প্রতিনিধিরূপে রাষ্ট্রসংঘে স্থান লাভ করিল। চীনের প্রকৃত প্রতিনিধি প্রজাতন্ত্র সরকার সেখানে স্থান লাভ করিতে পারিল না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রজাতন্ত্রকে স্বীকার করিল না

নূতন প্রজাতন্ত্রী সরকারের আমলে চীনের অভ্যন্তরে এক বিপ্লবী পরিবর্তনের সূচনা হইল। সমাজতন্ত্রী মতের আদর্শ অনুযায়ী জমিদারী প্রথা, ব্যক্তিগত মালিকানা বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা বাণিজ্যের রাষ্ট্রীয়করণ হইল। সংস্কার বন্দোবস্ত, রাস্তাঘাট, রেলপথ, যানবাহন ইত্যাদির সাহায্যে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতির ফলে অল্পকালের মধ্যে দীর্ঘকাল অবহেলিত ও অনুন্নত দেশ একটি সর্বপ্রকারে আধুনিক প্রগতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত হইল। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে প্রথম দিকে প্রজাতন্ত্রী সরকার ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রীতি ও সহানুভূতি অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কয়েকটি আচরণে সরকার চীন ভারত সৌহার্দ্যের মধ্যে একটু ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে। চীনের তিব্বত-নীতি এবং ভারত-চীন সীমান্ত সম্পর্কিত নীতিকে উপলক্ষ্য করিয়া এই দুই উপ-মহাদেশের মধ্যে এই তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রজাতন্ত্রের উন্নতি

পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে তিক্ততার সৃষ্টি

পৃথিবীর নূতন মানচিত্র :—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে পৃথিবীর মানচিত্রের বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইউরোপে জার্মানী দ্বিধাবিভক্ত হইয়া একাংশ সোভিয়েট রাশিয়ার ও অপরাংশ বৃটিশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের প্রভাবাধীনে দুইটি বিভিন্ন রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পৃথিবীর [illegible]

হইয়া নূতন মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান এই দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে। ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ইন্দোচীনও দ্বিধাবিভক্ত হইল এবং একাংশ ভিয়েৎমিন নামে সাম্যবাদী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিল। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতা স্বীকার করিল। মানচিত্রের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় আদর্শবাদেরও বিপ্লবী পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছে। গণতন্ত্রের প্রতিপক্ষরূপে পৃথিবীর সর্বত্র কম বেশী কম্যুনিষ্ট মতবাদ প্রভাবিত শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব ইউরোপের পোলাণ্ড, পূর্ব-জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশ মার্কসবাদ-এর ভিত্তির উপর নূতন শাসনতন্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছে। সমগ্র পৃথিবী বর্ত্তমানে প্রধানতঃ কম্যুনিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট বিরোধী এই মতবাদের ভিত্তিতে বিভক্ত।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the causes of the World War II.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ সমূহ আলোচনা কর।

উত্তর সূত্র :—(১) ভূমিকা : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে মিত্রপক্ষ যে ভার্সাই সন্ধি-রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সর্ত্তগুলির মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল। (২) ভার্সাই সন্ধি জার্মানীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল—ভার্সাই সন্ধির অসম্মানজনক সর্ত্তাবলী মুছিয়া ফেলার জন্য জার্মানী কৃতসঙ্কল্প (৩) জার্মানীর এই মনোভাব ইংলণ্ডের প্রশ্রয় ও সহানুভূতিতে বর্দ্ধিত—ফ্রান্স ও রাশিয়ার ক্রমবর্দ্ধমান আধিপত্যের বিরুদ্ধে রাষ্ট্ররূপে জার্মানীকে সঞ্জীবিত করা ইংলণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল। (৪) হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানীতে নাৎসী দলের আধিপত্য—ভার্সাই সন্ধি লঙ্ঘন করিয়া জার্মনীর পুনর্গঠন ও ইউরোপে জার্মানীর আধিপত্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠা হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল। (৫) লোকার্ণো চুক্তি, কেলগ চুক্তি প্রভৃতিতে ফ্রান্স-জার্মান মতানৈক্য। (৬) জার্মানীর রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ ও ভার্সাইর সন্ধি লঙ্ঘন—ইটালী ও জাপানের সঙ্গে অক্ষশক্তি স্থাপনের দ্বারা মৈত্রী। (৭) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ—হিটলারের অষ্ট্রিয়া অধিকার—সুদেতেনল্যাণ্ড দখল—ডানজিগ শহর পোলাণ্ড আক্রমণ—মিত্রশক্তিবর্গের আপোষমূলক ও ইতস্ততঃ মনোভাব—বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

2. Write what you know about the United Nation's Organisation and its activities.

সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ ও ইহার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে বিবরণ লেখ।

উত্তর-সূত্র: (১) ভূমিকা: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে, পৃথিবী হইতে যুদ্ধ বন্ধ করা এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লীগ অফ নেশানস্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার দ্বারা যুদ্ধ নিবারণ করা যায় নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পুনরায় যুদ্ধ বন্ধ করা এবং স্থায়ী শান্তি রক্ষার জন্য লীগ অফ নেশানস্ অপেক্ষাও কার্য্যকরী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের কামনার ফলস্বরূপ 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জই' (United Nations' Organisation) গড়িয়া উঠিল। (২) ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের আটলান্টিক চার্টার—ইহার উদ্দেশ্য—বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক ইহার অনুমোদন ও সদস্যপদ গ্রহণ—১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ—৪০টি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাক্ষরিত। (৩) ইহার উদ্দেশ্যমূলক সর্তাবলী। (৪) ইহার বিভিন্ন শাখা—সাধারণ পরিষদ (General Assembly), নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council), অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council), আন্তর্জাতিক আদালত ইত্যাদি। (৫) ইহার ত্রুটি—(ক) কয়েকটি বৃহৎ রাষ্ট্রের স্বার্থমূলক দৃষ্টিভংগীর প্রাধান্য—দৃষ্টান্ত কাশ্মীর ও প্রজাতান্ত্রিক চীনের ব্যাপারে অবিচার, (খ) 'ভেটো' ক্ষমতা, (গ) সাম্যবাদ নিরোধের নামে সাম্রাজ্যবাদীদের আধিপত্য রক্ষা ও বিস্তার।

3. Give a brief account of the Post-War (2nd World-War) conditions in Europe and Asia.

উত্তর-সূত্র: (১) ভূমিকা: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভের প্রধান কৃতিত্ব আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ও সোভিয়েট রাশিয়ার। যুদ্ধোত্তর যুগে এই রাষ্ট্রদ্বয়ই বিশ্বের সর্বপ্রধান শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই এই রাষ্ট্রদ্বয়ের একের বা অপরের দলভুক্ত হইয়াছে। (২) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর অনগ্রসর দেশসমূহের সাহায্য করার জন্য 'মার্শাল প্লান' নামে এক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করিয়াছে—প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান, পরোক্ষ উদ্দেশ্য সাম্যবাদ নিরোধ; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাম্যবাদ নিরোধ; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য SEATO, NATO প্রভৃতি আঞ্চলিক চুক্তি। (৩) রাশিয়ার সাম্যবাদ প্রসারের চেষ্টা—এশিয়ার চীনে এবং ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্রে সাম্যবাদ প্রসারিত—ষ্টালিনের মৃত্যুর পর সাম্যবাদের আন্তর্জাতিকতার সুর নরম হওয়াতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের [illegible]

রাশিয়ার কিঞ্চিৎ মতৈক্য। ইংলণ্ড—যুদ্ধের পরে শ্রমিকদলের হস্তে শাসনভার—অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন—পরিবর্তিত সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভংগী পরিবর্তিত—ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতিকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান। (৪) জার্মানী—পরাজিত জার্মানী রাশিয়া ও মিত্রশক্তি কর্তৃক দ্বিধাবিভক্ত—পূর্ব জার্মানী ও পশ্চিম জার্মানী; জার্মানীর ঐক্যবন্ধনের আকাঙ্ক্ষা কিন্তু অধিকারী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে একমতের অভাব। (৫) ফ্রান্স—যুদ্ধোত্তরকালের সমস্যা—অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং এশিয়া ও আফ্রিকাস্থ উপনিবেশ সম্বন্ধে সন্তোষজনক বন্দোবস্ত করা—ভারতবর্ষীয় ও ইন্দো-চীনস্থ উপনিবেশসমূহকে স্বাধীনতা প্রদান কিন্তু আফ্রিকাস্থ আলজিরিয়া, মরক্কো টিউনিসিয়া সম্বন্ধে অনমনীয় মনোভাব। (৬) এশিয়া—যুদ্ধান্তে সর্বত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন—পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ স্বাধীনতা স্বীকারে বাধ্য—ভারত, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, আরব রাষ্ট্রসমূহ, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি ইন্দো-চীন প্রভৃতি পাশ্চাত্য শক্তির অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত; পরাজিত জাপান দীর্ঘকাল মিত্রশক্তির সৈন্যদলের দ্বারা শাসিত ছিল ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে বিদেশী দখলী সৈন্যের প্রত্যাহার ও জাপানের স্বাধীনতা স্বীকার।

(৬) আফ্রিকা: ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন—আন্দোলনের চাপে কয়েকটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত—ঘানা, কংগো প্রভৃতি—কিন্তু অধিকাংশ স্থান পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের অধিকৃত। দক্ষিণ আফ্রিকায় উগ্র বর্ণবিদ্বেষ—শ্বেতজাতির অত্যাচার।

(৭) আরব রাষ্ট্রসমূহ: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাতটি স্বাধীন রাজ্য—হেজাজ, প্যালেস্টাইন ইস্রায়েল, ট্রান্সজর্ডান, সিরিয়া ইরাক ইয়ামেন ও সৌদী আরব। মিশর: মিশরের উপর বিদেশী কর্তৃত্বের অবসান—সুয়েজখালের উপর মিশরের পূর্ণ কর্তৃত্ব।

সমাপ্ত